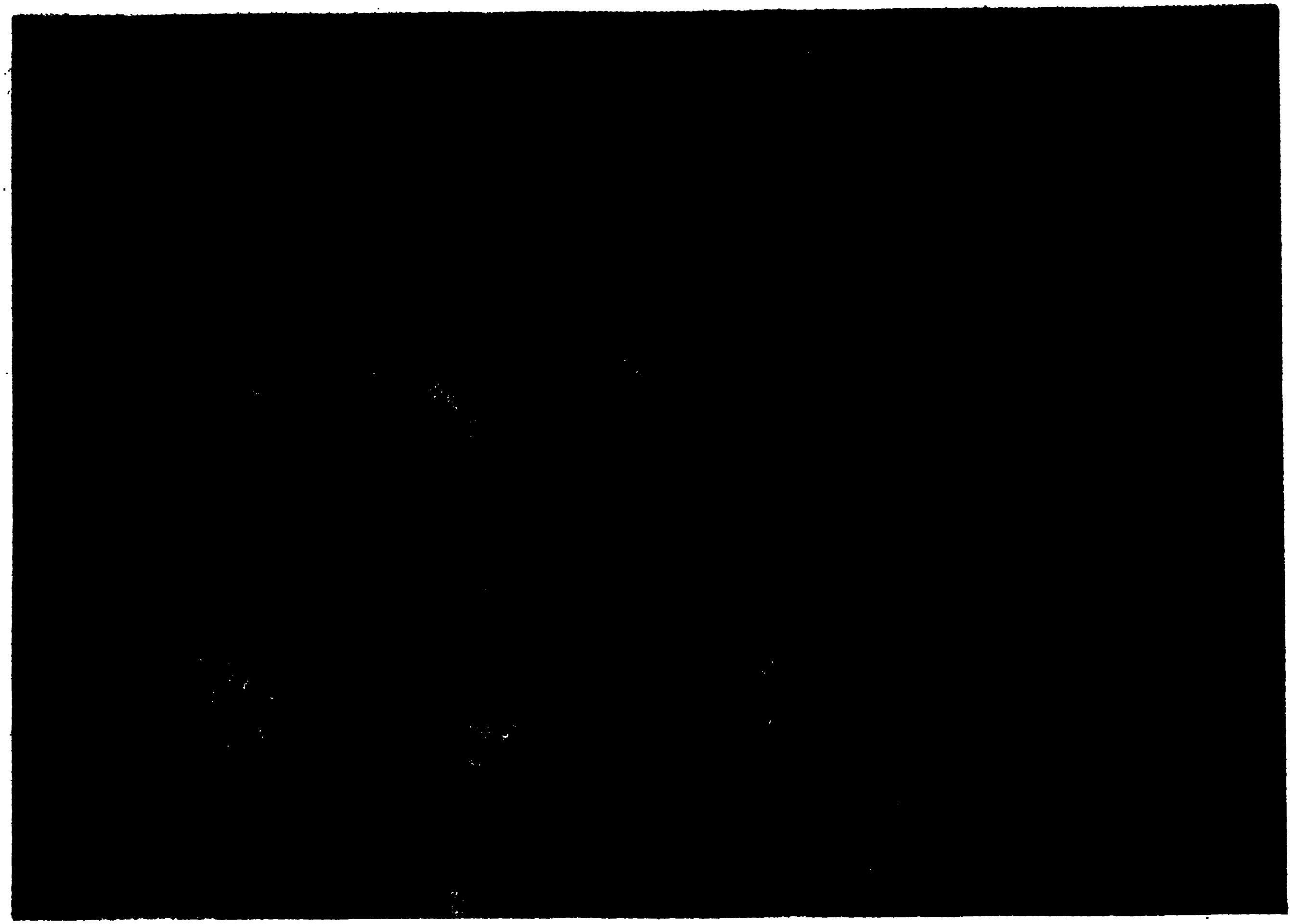


মহেন্দ্রের সিংহল যাত্রা

(বিদ্যাসাগর স্মৃতি-ভবন, মেদিনীপুর)

শ্রীখগেন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫১

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

১৩৫০ সাল শেষ হইয়াছে। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে পুরানো বছরের কথা ভাবিতে গেলে গভীর বেদনার সহিত সর্বাগ্রে মনে পড়ে দুর্ভিক্ষের কথা। শুধু অন্নের দুর্ভিক্ষ নয়, এই এক বৎসরে বাঙালীর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে দুর্ভিক্ষের মহাশূন্য মানুষের প্রাণে শুধু নিরাশার সঞ্চার করিয়াছে। রাষ্ট্রের ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের মধ্যে দূরদর্শিতা নাই, সত্যলিপ্সা নাই, সত্যশক্তি নাই—জাতীয় জীবনের মহা সন্ধিক্ষণে অনাবিল চিত্তে অগ্রসর হইয়া কোটি কোটি নরনারীর প্রাণরক্ষার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জনের আগ্রহ নাই। দলাদলি ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া একমন একপ্রাণ হইয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের সৎসাহস নাই। নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন যে পৌর প্রতিষ্ঠান, দায়িত্ব পালনে তাঁহারাও সমান পরাঙ্মুখ। শিক্ষাক্ষেত্রও সমান বিপর্য্যস্ত। স্কুলের অধিকাংশই বন্ধ, যেগুলি খোলা আছে তাহাতেও পড়াশুনা হয় না বলিলেই চলে। পড়িবার বই নাই, বই ছাপিবার কাগজ নাই, লিখিবার শ্লেট নাই—সর্বোপরি অন্নাভাবে জর্জরিত শিক্ষকের শিক্ষাদানে মন নাই। জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তর শৃঙ্খলিত—কণ্ট্রোলের উপর কণ্ট্রোলের চাপে ব্যবসায় পরিচালনা অসাধ্য, শিল্পোন্নতি অসম্ভব। যুদ্ধের আগে যে-সব কারখানা বা ব্যবসায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ভারত-রক্ষা বিধানের নাগপাশে জর্জরিত হইয়া তাহারা শুধু ধুঁকিবার অধিকার মাত্র লাভ করিবে, উন্নতির সুযোগ পাইবে না, নূতন কোন প্রতিষ্ঠানও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবে না, ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগের ইহাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সর্ববিধ সুযোগ তাহারা পাইবে, ভারতরক্ষা বিধি প্রয়োগ ব্যবস্থায় ইহা আরও বেশী স্পষ্ট। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের সহিত যে-সব ভারতীয় আপন স্বার্থ জড়াইয়া লইবে ইহাদের সহিত পাশ কাটাইয়া বাহির হইতে পাইবে শুধু তাহারাই। তাঁত ও চরকা এই এক বৎসরে প্রায় উচ্ছন্ন গিয়াছে, বস্ত্রের জন্য সমগ্র দেশ কলওয়ালাদের উপর নির্ভরশীল। এই সুবর্ণ সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিতে ইহারাও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। বস্ত্র অগ্নিমূল্য, দরিদ্র চাষী ও গৃহস্থকে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া বৎসর কাটাইতে হইয়াছে। রোগে ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তারের ফী দিবার সামর্থ্য নাই। দেশে প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈয়ারি করিয়া লইবারও উপায় নাই। গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ঔষধহীন লক্ষ লক্ষ বাঙালী নরনারী শিশু বৃদ্ধকে মুক্ত আকাশতলে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়াছে তাহাদের দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত কাগজের নোটে পরিণত হইয়া অন্ন বস্ত্র ও ঔষধ ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কের খাতা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, মানবদ্রোহী এই অতিলোভী অর্থপিপাসুর দল একবারও ভাবিয়া দেখিল না কোটি কোটি দরিদ্র নরনারীর অশ্রুজলে সিক্ত নোটের তাড়া হয়ত তাহারই বংশধরের সম্মুখে পাপের পথের সিংহদ্বার খুলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে লাগিবে না। কি শহরে কি গ্রামে স্থানান্তর গমন অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পেট্রোল নাই, বাস বন্ধ। রেলে পা দিবার উপায় নাই। দিনের পর দিন ঘুরিয়া টিকিট জুটিলেও ট্রেনে স্থান সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। কামরা অন্ধকার, বাল্ব নাই; অন্ধকারে মালপত্র চুরি তো নিত্যনৈমিত্তিক

ব্যাপার। জাপানীর ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত সর্ জন হার্বার্টের আদেশে দক্ষিণ- ও পূর্ব- বাংলার সমস্ত নৌকা হয় জলমগ্ন, নতুবা আটক, ফলে নদীপথে যাতায়াত ও মালচলাচল বন্ধ। ধীবর ও ছোট ব্যবসায়ীদের উপার্জনের পথও রুদ্ধ। সাত ঘণ্টার টেলিগ্রাম সাত দিনে পৌঁছায়, তিন দিনের চিঠি সেন্সরের কাঁচি বাঁচাইয়া তেরো দিনে পৌঁছিলে লোকে ভাগ্য জ্ঞান করে।

গত বৎসরের সর্বপ্রধান ঘটনা দুর্ভিক্ষ। বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া বিলাতের ভারত-সচিব পর্য্যন্ত নিরক্ষর গ্রাম্য চৌকিদার-প্রদত্ত সংখ্যাকেই অসীম ভক্তিভরে নির্ভুল ঘোষণা করিয়া জানাইয়াছেন দুর্ভিক্ষে প্রায় ৭ লক্ষ লোক মাত্র মরিয়াছে। বে-সরকারী হিসাবে মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ লক্ষ; দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলসমূহে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহাদের মতে উহা ২৫ লক্ষের কম নহে। দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল বাংলার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে তল্লাসী করিয়া দেখিয়াছিলেন দেশে পর্য্যাপ্ত আহার্য্য নাই, বহু স্থানে ঘাটতি আছে। তল্লাসীর সময় বড় বড় ব্যবসায়ীদের গুদামগুলি বাদ রাখা হইয়াছিল; তথাপি দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে চাষীর ঘাড়ে এই বলিয়া যে তাহারা অতিরিক্ত ফসল না ছাড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। বাংলা-সরকার, ভারত-সরকার এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তিন জনেরই দুর্ভিক্ষ আসিতেছে ইহা জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ এবং উপায় ছিল; তথাপি তাঁহারা সময় থাকিতে সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। এই দুর্ভিক্ষ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট—দেশের প্রতিটি লোকের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। দুর্ভিক্ষের ন্যায় উহার পরবর্তী মড়ক নিবারণেও যথাসময়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার ন্যায় প্রতিষেধযোগ্য রোগে আজও সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে।

সর্ জন হার্বার্টের চক্রান্তে হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর স্থলে খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন কর্তৃক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা বর্তমান যুগের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত্তিভূমি। ইউরোপীয় দল নিরপেক্ষ প্রগতিশীল মন্ত্রিমণ্ডলীকে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের প্রতিকূল হইয়া উঠিতে দেখিয়া বিলাতী কায়েমী স্বার্থ শঙ্কিত হইল। সর্ জন হার্বার্ট বাঁকা পথে মৌলবী ফজলুল হকের পদত্যাগ-পত্র সংগ্রহ করিয়া সাহেব দলের প্রিয়পাত্র খাজা নাজিমুদ্দীনকে গদীতে বসাইলেন। পরিষদের ভারকেন্দ্র পুনরায় শ্বেতাঙ্গ দলের হাতে ফিরিয়া আসিল। সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের যে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া মৌলবী ফজলুল হক গবর্ণরের হাতে পদত্যাগ-পত্র দিয়াছিলেন, লীগ-ইউরোপীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে সর্ জন হার্বার্ট কুণ্ঠিত হইলেন না। হক-মন্ত্রিমণ্ডলীতে নয় জন মন্ত্রী এবং তিন জন পার্লামেণ্টরি সেক্রেটরী প্রায় ১৩০ জনের দল ঠিক রাখিয়াছিলেন। সর্ নাজিম মন্ত্রীদলকে ১৩ জন মন্ত্রী, ১৩ জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটরী এবং ৪ জন হুইপ, মোট এই ৩০ ব্যক্তিকে মোটা বেতনে নিযুক্ত করিয়া প্রায় এক শত লোকের দল ঠিক রাখিবার সুযোগ দেওয়া হইল। অর্থাৎ তিন জনের "দলে"র নেতা হইলেই তাঁহার ভাগ্যে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকার চাকুরী জুটিল। ভোটক্রয়ের এই যে ব্যবস্থা সর্ জন হার্বার্ট করিয়া গেলেন, বাংলা দেশকে সারাটি বৎসর তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। প্রতি পদে প্রতি ধাপে ঘুষ ভিন্ন কোন কার্য্য উদ্ধার হইবার উপায় ছিল না, এ যাবৎও প্রায় নাই। নালিশ জানাইবার স্থান নাই, প্রতিকারেরও পথ নাই।

বৎসরের তৃতীয় ঘটনা কলিকাতায় রেশনিং। বাংলা-সরকারের গড়িমসি দেখিয়া ভারত-সরকার নীরব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের নির্দেশে অবশেষে রেশনিঙের দিন স্থির হইল ৩১শে জানুয়ারী। এখানেও বাংলা-সরকারের সেই চিরন্তন অযোগ্যতা ও অক্ষমতা কলিকাতাবাসীর পীড়ার কারণ হইয়া রহিয়াছে। রেশনের পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত, চাউল অখাদ্য এবং মূল্য স্বাভাবিক সময়ের চতুর্গুণ। রেশনিঙের কল্যাণে রোগীর পথ্য চাউল পাইবারও উপায় নাই। রেশনিঙের বাহিরে লবণ ও কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কেরোসিন তৈল তো বহুকাল যাবৎ অদৃশ্য। বাংলা সরকার চিরন্তন নাবালকের ন্যায় ভারত-সরকার ও রেল-বিভাগের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া যথারীতি নিষ্ক্রিয়। অথচ সমুদ্র উপকূলের জেলাগুলিতে অনায়াসে লবণ তৈরি হইতে পারে, এবং বাংলারই পশ্চিম প্রান্তে কয়লার খনি বর্তমান। চাউল ও গম প্রচুর পরিমাণে জন্মিবার পর সেগুলিকে চতুর্গুণ মূল্যে রেশন করা হইয়াছে, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি রেশনিঙের তালিকাভুক্ত হয় নাই।

নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং বাংলার নূতন গবর্ণর মিঃ কেসী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের প্রথম দিকে লর্ড ওয়াভেল যে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। দুর্ভিক্ষে বিপর্য্যস্ত বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের প্রতি তাঁহার

মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। নূতন গবর্ণর মিঃ কেসী আবার দুর্ভিক্ষ হইবে না বলিয়া আশার বাণী শুনাইয়াছেন কিন্তু দেশবাসী উহাতে ভরসা রাখিতে পারিতেছে না। যে মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করিয়া সর্ জন হার্বার্ট দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, যাহাদের কথায় প্রলুব্ধ হইয়া সর্ টমাস রাদারফোর্ড জানুয়ারী মাসে চাউলের দর দশ টাকা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই মন্ত্রীদেরই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করিয়া মিঃ কেসী দেশবাসীর সুপ্ত অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত। অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার দ্বারা ছয় কোটি মানব অধ্যুষিত একটা বিরাট্ দেশের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র, এই সাধারণ জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত যাহাদের নাই, তাহাদেরই হাতে বাংলার শাসনভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় বহু নারী পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে বাংলা-সরকার ইহা জানেন। অনাথা আশ্রম প্রতিষ্ঠাকে ইহার প্রতিকারের উপায় বলিয়া প্রকাশ্য ঘোষণায় ইহারা লজ্জিত হন নাই। ধানভানা, সুতাকাটা প্রভৃতি কাজ করিয়া অনাথা নারীরা যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় জীবিকা নির্বাহে প্রবৃত্ত হইতে পারে তাহার কোন আয়োজন সরকার করিতে পারেন নাই। চাউলের কল ও কাপড়ের মিলের মুখ চাহিয়া তাঁহাদের এই নীরবতা কি-না কে বলিবে? খাদি সঙ্ঘগুলিকে তো আজও পর্য্যন্ত বে-আইনী করিয়া রাখা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষোত্তর পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় বাংলা-সরকারের সঙ্গে সঙ্গে জননায়কদের উদাসীনতাও সমান বেদনাদায়ক।

সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ। ভারতরক্ষা আইনের নাগ-পাশে বাঁধা সংবাদপত্র মারফৎ জনমতের অভিব্যক্তি অসম্ভব। খাদ্যসমস্যা লইয়া আলোচনার অভিযোগেও কোন কোন পত্রিকাকে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগবিধি দেখিয়া সন্দেহ হয় ভারতরক্ষা উহার গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, উহার আসল লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা; কিন্তু ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগে দেশবাসীর চিত্ত যে ভাবে বিষাক্ত করিয়া তোলা হইতেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষাতেই বা উহা কত দূর সহায়ক হইবে মালয় ও ব্রহ্মের অভিজ্ঞতালব্ধ ওয়াভেল প্রমুখ উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। জাপসৈন্য ভারতের পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করিবার পর এই সত্য আরো ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু সে ক্ষমতার অভাব—দুর্ভিক্ষ আজ শুধু অন্নের নয়, দুর্ভিক্ষ দূরদর্শিতার, দুর্ভিক্ষ সাধুতার, দুর্ভিক্ষ সৎসাহসের। রাষ্ট্র শক্তির সঙ্গে যেখানে প্রজাসাধারণের যোগ নাই, রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত সেখানে ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতে থাকে। মানুষের সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক না রাখিয়া তাহাকে শুধু যন্ত্রের দ্বারা শাসন করিতে গেলে সে স্পর্দ্ধা বিশ্ববিধাতা কখনই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না, এ অস্বাভাবিকতা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেই জন্য সুশাসন ও দয়ার দ্বারা হৃদয়-দুর্ভিক্ষ কখনও পূরণ হইতে পারে না। আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিস সর্পফণা তুলিতে পারে, কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য কোটি কোটি প্রজার মর্ম্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোন মানবের হাতে নাই, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সত্য।

—

ব্যবসায়ে বাঙালী

যুদ্ধের গত ৫ বৎসরে বাংলা ব্যবসায় ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। গত এক বৎসরে বরং এ দিকে বাঙালী অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে ইহাই বলা চলে। বাংলায় ৯৭টি চটকলের মধ্যে মাত্র তিন-চারিটির উপর বাঙালীর কর্তৃত্ব আছে। ৩৩টি কাপড়ের কলের মধ্যেও অনেকগুলি অবাঙালীর, বাঙালীর কোন কোন পুরানো কল পর্য্যন্ত তাহার হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ৪১২টি চা-বাগান আছে, তন্মধ্যে অতি অল্প কয়েকটি মাত্র বাঙালীর। ভারতবর্ষের মোট কয়লা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ আসে রাণীগঞ্জ হইতে, উহার অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ ও অবাঙালীর সম্পত্তি। একমাত্র লোহার ব্যবসায়ে বাঙালীর স্থান অনেকটা আছে ইহা সত্য, কিন্তু ইস্পাত ও ঢালাই লোহের কারখানা শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত। বাঙলায় ছোট ছোট জাহাজ তৈরি হইতেছে কিন্তু বাঙালীর দ্বারা নয়; এঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে দুই চারিটির বেশী বাঙালীর নাই। চিনির কল আছে নয়টি, তন্মধ্যে বাঙালীর কয়টি? তিনটি বৃহৎ কাগজের কার-খানার মধ্যে একটিও বাঙালীর নয়। ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কারখানা অবশ্য বাঙালীর কয়েকটা আছে। কিন্তু সেগুলি এই যুদ্ধে যে ভাবে বড় হইতে পারিত তাহা হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে বাংলায় জাহাজ, রেলের এঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, রং, কয়লা হইতে বেন্জল প্রভৃতির নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে,

কিন্তু তাহার মধ্যে বাঙালী নাই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ছোটখাটো দুই-চারিটা জিনিসের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে দরজা বন্ধ করিতে হইয়াছে।

বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৮ জন এখনও কৃষিজীবী এবং মাত্র ৯ জন শিল্পজীবী, বাংলার কারখানাগুলির মজুর অধিকাংশই অবাঙালী, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে আগত। শ্রমবিমুখ বাঙালী না খাইয়া মরিবে, তবু কারখানায় কাজ করিতে আসিবে না। মধ্যবিত্ত বাঙালী পঁচিশ টাকা বেতন সম্বল করিয়া বৃহৎ পরিবার স্কন্ধে অর্দ্ধাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইবে তবু ব্যবসাক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিবে না। সংসারের ঝুঁকি যখন ঘাড়ে চাপে নাই, তখনও বাঙালী যুবক একবারের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে অবতীর্ণ হইবার কথা কল্পনাও করে না ইহাই আশ্চর্য্য। গত পাঁচ বৎসরে বাংলায় শিল্প ও ব্যবসায়ের যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালের মধ্যেই সম্ভব হইয়াছে। অবাঙালী ইহা পারিয়াছে কিন্তু বাঙালী পারিল না।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর ব্যর্থতার একটা প্রধান কারণ এস্থলে উল্লেখযোগ্য। মাড়োয়ারী বা পঞ্জাবী বড় ব্যবসায়ীদের নিকট মাড়োয়ারী বা পঞ্জাবী নবাগতেরা যে সাহায্য লাভ করে বাঙালী বড় ব্যবসায়ীদের নিকট তরুণ বাঙালী তাহা পায় না। পঞ্জাবী মুসলমান চামড়াওয়ালারা ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে; বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা কানপুর, কলিকাতায় তাহাদের বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত ব্যবসা-কেন্দ্র। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ধারে মাল সরবরাহ করে এবং নিজ নিজ কেন্দ্রের বাজারের সেরা জিনিস সংগ্রহ করিয়া দেয়। কেহ কাহাকেও ঠকায় না। এই বিশ্বাসের উপর ইহাদের কারবার চলে। বাঙালীর বেলায় পাকা ও নূতন উভয়বিধ ব্যবসায়ীই সমান। প্রবীণ ব্যবসায়ী দুই একবার ঠকিয়াই সমস্ত জাতিটাই খারাপ ধরিয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে নবাগতও ঠকাইতে দ্বিধা করে না। ইহাতেই কিন্তু বাঙালী অসৎ ইহা প্রমাণিত হয় না, ইহাদের অধিকাংশই দ্বিধান্বিত চিত্তে ব্যবসাটা কিরূপ ইহা দেখিতে আসে, কাজেই পাঁচ দশ হইতে সুরু করিয়া পাঁচ শত বা হাজার টাকা মারিয়া সরিয়া পড়া ইহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। ইহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমগ্র জাতিকে ব্যবসায়-বিমুখ সাব্যস্ত করা দূরদর্শিতার পরিচয় নহে। বাঙালী তরুণের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রতি যাহাদের যথার্থ আকর্ষণ আছে সুযোগ পাইলে তাহাদের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক অক্রূর দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন মুখুজ্যে বাহির হইতে পারে ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

আর একটি বিষয়ের প্রতি বাঙালী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। বড়বাজারের শুধু ব্যবসা নয়, মাটি পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর হস্তগত হইতেছে, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শ্বেতাজ প্রভুত্ব, এদিকে কলুটোলা হইতে পূর্ব দিকে পঞ্জাবী মুসলমানদের অভিযান সুরু হইয়াছে। সম্প্রতি কলুটোলার বিখ্যাত বাঙালী বাড়ীগুলি পর্য্যন্ত পঞ্জাবী মুসলমানরা কিনিয়া লইয়াছে। এইভাবে কলিকাতা তথা বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রস্থলের মাটি পর্য্যন্ত অবাঙালী ও অ-ভারতীয়দের হস্তগত হইতে থাকিলে এই সব অঞ্চলে বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে কোনদিন আর ঘরভাড়া লইয়া প্রবেশ করিবারও উপায় থাকিবে না।

—

ভারতবর্ষে স্বর্ণ বিক্রয়

ব্রিটিশ ও আমেরিকান গবর্ন্মেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ ভারতবর্ষে স্বর্ণ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। বিষয়টি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচিত হইলে সর্ জেরেমি রেইসম্যান এই কার্য্য সমর্থন করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ইহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি নাই, বরং উপকারই আছে। বিক্রীত স্বর্ণ প্রচুর পরিমাণে কৃষকদের হস্তগত হইতেছে, এত সোনা তাহারা কখনও চোখে দেখে নাই এবং ইহার ফলে ইনফ্লেশন কমিবার সম্ভাবনা আছে। পরিষদের জনৈক সদস্য মিঃ বেটিয়ার অভিযোগ করেন যে, আমেরিকায় যে সোনার দর ভরি প্রতি পঁয়তাল্লিশ টাকা তাহাই ভারতবর্ষে আনিয়া পঁচাশি টাকায় বিক্রয় করিয়া প্রতি ভরিতে চল্লিশ টাকা করিয়া লাভ করা হইতেছে। সর্ জেরেমি রেইসম্যান বাধা দিয়া বলেন যে, কিছুদিন যাবৎ সোনার দর একাত্তর টাকা আছে। মিঃ বেটিয়ার উত্তর দেন যে সর্ জেরেমির কথা মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, প্রতি ভরিতে ত্রিশ টাকা লাভ রাখা হইতেছে এবং এই ব্যাপারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতা অতিশয় নিন্দনীয়। ভারতবাসীর কোটি কোটি টাকা এইরূপে অন্যায় ভাবে দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

বলা বাহুল্য, এই প্রতিবাদে ভারত-সরকার ব্রিটিশ বা আমেরিকান গবর্ন্মেণ্ট কেহই লজ্জিত হন নাই। ভারতবর্ষে সোনা আমদানী রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া উহাকে আন্তর্জাতিক সোনার বাজার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৩১ সালে

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট স্বর্ণমান ত্যাগের পর ভারতবর্ষ হইতে বহু কোটি টাকার সোনা বিদেশে চালান গিয়াছে, তাহার উপর আন্তর্জাতিক বাজার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এদেশে সোনার দর হু হু করিয়া চড়িয়াছে। সোনা ক্রয়-বিক্রয় সাধারণতঃ মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি ফাটকাবাজ ব্যক্তি এবং যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ-নবাবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদেশে এক শ্রেণীর বড়লোক আছে যাহারা বিশ্বাস করে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ অরাজকতা পূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইবে এবং ইহারাই যেকোন মূল্যে সোনা ক্রয় করিয়া ভাবে, যে উপায়ে অর্থ অর্জিত হইয়াছে তাহার এক ভগ্নাংশ বাঁচিলেও তাহাই লাভ। কয়জন চাষী সোনা ক্রয় করিয়াছে তাহার হিসাব ভারত-সরকার না দেওয়া পর্য্যন্ত সত্তর-পঁচাত্তর টাকা দরে কৃষকের হাতে সোনা গিয়াছে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

বর্ত্তমান স্বর্ণ-বিক্রয়ের আর একটি তাৎপর্য্য আছে। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দরে যে সোনা ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে গিয়াছিল তাহাই আবার এখানে সত্তর-পঁচাত্তর টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। অর্থাৎ ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঐ একই সোনা বিক্রয় করিয়া আড়াই গুণ লাভ করিতেছেন। নিজ নিজ দেশে চলতি বাজার দরে সোনা কিনিয়া ভারতবর্ষে বিক্রয় করিলেও তাঁহাদের দ্বিগুণ লাভ থাকে। অথচ এই কার্য্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজেই করিতে পারিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকায় এই সোনাগুলি ক্রীত হইলে লাভের টাকাটা সম্পূর্ণ রূপে ভারতবর্ষের হইত, ফলে দেশবাসী করভার হইতে অনেকটা রেহাই পাইতে পারিত। ইহাতে ইনফ্লেশন বন্ধেরও সহায়তা হইত এবং দেশের টাকা দেশেই থাকিত। এই সোজা বন্দোবস্ত না করিবার কারণ অনুমান করা আদৌ কঠিন নয়, ব্রিটেনের পক্ষে ইহা স্বাভাবিকও, কিন্তু স্বাধীনতার ধ্বজাধারী আমেরিকার পক্ষে ইহা গভীর লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। সহজ ভাষায় ব্যাপারটি দাঁড়ায় এই যে, ভারত-সরকার চালাকি করিয়া এদেশে কৃত্রিম উপায়ে সোনার দর অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ ব্রিটেনকে ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে দিয়াছেন। আমেরিকাও লোভ সামলাইতে না পারিয়া এই অন্যায় লুণ্ঠনে যোগদান করিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল। সেখানে অর্থ বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ জোন্সের উক্তিতে আর একটি নূতন কথা জানা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "দুই উদ্দেশ্যে ঐ স্বর্ণ বিক্রয় করা হয়। একটি উদ্দেশ্য ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকার এদেশে যে মালপত্র প্রভৃতি ক্রয় করেন তাহার জন্য তাহাদিগকে টাকার জোগান দেওয়া; অপর উদ্দেশ্য মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা।" দ্বিতীয় যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, প্রথমটি আরও মারাত্মক। এদেশে অন্যায় লাভ করিয়া সেই লাভের টাকায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের খরচ চালানো হইতেছে। ইহা না করিলে উঁহাদিগকে হয় নিজ নিজ দেশের টাকা দিতে হইত, নতুবা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হইত। স্বর্ণ বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে এদেশে উঁহাদের সৈন্যদের রসদ যোগাইতে এক পয়সাও শেষ পর্য্যন্ত খরচ হইবে না। যুদ্ধের আগে ত্রিশ টাকায় কেনা সোনা সত্তর টাকায় বেচিয়া যে চল্লিশ টাকা লাভ রহিল তাহাতেই সৈন্যসামন্তদের খরচ চলিতে থাকিল। যুদ্ধের পর সোনা আমদানী রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দিলেই উহার দর ত্রিশ টাকায় তো নামিবেই, তখন আবার উহা কায়দা করিয়া কিনিয়া লইলে ঘরের সোনা ঘরেই ফিরিবে, মাঝ-খানে ফাটকা লাভের টাকায় সৈন্যসামন্তের খরচাটাও চলিয়া যাইবে। এইরূপে ঘর হইতে একটা পয়সাও বাহির না করিয়াই এত বড় বিরাট্ বাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব হইলে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া ভারতবর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী কার-খানা খাড়া করিতে চাহিবে এত বড় নির্বোধ কে আছে?

—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী

কেনিয়ায় বসবাসের জন্য ভারতীয়দের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করিয়া সম্প্রতি যে-সকল বিধি বলবৎ হইয়াছে, অবিলম্বে সেগুলি প্রত্যাহারের সুপারিশ করিয়া মিঃ পি এন সপ্রু রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া মিঃ সপ্রু বলেন,

বিধিগুলিতে ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে কোন আইনগত বৈষম্য না থাকিলেও শাসন-কর্তৃপক্ষের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের নামে এরূপ করা হইতেছে। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন প্রায় দশ হাজার ভারতীয় পূর্ব-আফ্রিকার উপনিবেশ ত্যাগ করে। তাহারা যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্য্য করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ফিরিয়া গেলেই তাহারা যুদ্ধে সর্বাধিক সাহায্য করিবে। দুই বৎসরের অধিককাল অনুপস্থিত লোকদিগের সম্বন্ধে যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে বহু ভারতীয়—যাহাদিগের দক্ষিণ-আফ্রিকায় সম্পত্তি ও বাড়ী আছে—ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মিঃ সপ্রু বলেন যে, এই সকল নূতন বিধির অনুকূলে দুইটি

কারণ দেখান হইয়াছে—খাদ্যের অভাব ও বাসগৃহের অভাব; কিন্তু এই দুইটি কারণ গ্রহণযোগ্য নহে। মিঃ সপ্রু বলেন যে, এই সকল উপনিবেশ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত। সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সম্মিলিত জাতিসমূহ ও ব্রিটিশ রাজনীতিকদিগের প্রতিশ্রুতির ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক পরিণতি। আফ্রিকা ও অন্যান্য রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যগণ যখন বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়াছে তখন আফ্রিকার ভারতীয়দিগের প্রতি এইরূপ অসঙ্গত ব্যবহার অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

প্রবাসী ভারতীয় বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ আর. এন. ব্যানার্জি সরকার পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া বলেন যে, গত যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ এই সকল উপনিবেশ হইতে এশিয়াবাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এই সম্পর্কে সকল প্রস্তাব ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অগ্রাহ্য করেন। সেই সময় হইতে এই সকল উপনিবেশে ভারতীয়দিগের প্রবেশ সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। গত ১লা মার্চ কেনিয়া ও উগাণ্ডায় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী টাঙ্গানিকায় বিদেশী লোকের বসবাস নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারত-সরকারের প্রতিনিধি স্বীকার করিয়াছেন এই সকল উপনিবেশে খাদ্যাভাব হওয়া উচিত নহে এবং বড় বড় শহরে বাসস্থানেরও অভাব নাই। ভারতবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য এই দুই মামুলি কৈফিয়ৎ অচল। আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রবেশ সম্পর্কে এই সব অন্যায় আইন প্রণয়ন বন্ধ করিবার জন্য ইচ্ছা করিলে ভারত-সরকার অতিশয় কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতে পারিতেন। গত যুদ্ধে এবং এই যুদ্ধে আফ্রিকার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে ভারতীয় সৈন্যদল; দক্ষিণ-আফ্রিকার ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনী নয়। এই কৃতজ্ঞতার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে পারে স্বাধীন ভারতবর্ষ, বর্তমান ভারত-সরকার নহে।

—

আমেরিকান স্পেশাল ট্রেনের ভাড়া

বোম্বাই ও করাচী হইতে যে সমস্ত মিলিটারী স্পেশ্যাল ট্রেন আমেরিকা হইতে আগত সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করিয়া লইয়া যায় সেই সমস্তের দরুন ভাড়া আদায়ে অসমর্থ হওয়ায় এবং ভাড়া আদায়ে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনে অপারগ হওয়ায় রেলওয়ে রাজস্বের প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে সর্ জিয়াউদ্দীন আমেদ একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনিতে চাহেন।

সামরিক যান-বাহন সদস্য বলেন যে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আদান-প্রদানে প্রায় এক শত এক লক্ষ টাকা কম খরচ লেখা হয়। ইহার মধ্যে সাড়ে বাহান্ন লক্ষ টাকা হিসাবের মধ্যে খাপ খাওয়ান হইয়াছে এবং অবশিষ্ট টাকা সম্বন্ধে তিনি ফাইনান্সিয়াল কমিশনারের সহিত ব্যবস্থা করিতেছেন।

সর্ জিয়াউদ্দীন জিজ্ঞাসা করেন যে, যে কর্মচারী এই ভুল বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে, এ কথা সত্য কি-না?

যান-বাহন সদস্য—না মহাশয়।

সর্ জিয়াউদ্দীন অতঃপর জানিতে চাহেন যে, উক্ত রাজকর্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে কি-না?

যান-বাহন সদস্য বলেন, ঐ কর্মচারীকে অন্যত্র বদলী করা হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার মনে হয়, তবে যে-বিষয় লইয়া প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ বদলীর কোন সংস্রব নাই।

প্রস্তাবটি বিধিবহির্ভূত এই যুক্তি দেখাইয়া সভাপতি উহা উত্থাপনের অনুমতি দেন নাই। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে এসম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। সরকারী বিভাগীয় চুরি বা ঘুষ ধরিতে গেলে সৎ কর্মচারী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে এরূপ একটা প্রবল ধারণা দেশে বদ্ধমূল হইতেছে। তদপেক্ষা বড় ব্যাপারও ঘটিতে পারে এবং জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে তাহার ত্রুটি ধরিতে গেলে সৎ ও বিশ্বাসী কর্মচারীর বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, এরূপ বিশ্বাস লোকের মনে জন্মিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে অকর্তব্য।

—

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি না করিবার সিদ্ধান্ত

যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সর্ এডোয়ার্ড বেন্থল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে জানাইয়াছেন যে ভারত-সরকার রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিবেন না।

দেশরক্ষার ব্যাপারে বর্তমান পরিস্থিতি আসিবার বহু পূর্বে ব্যবস্থা-পরিষদের ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত জানান যাইতে পারিত এবং সব দিক দিয়াই উহা শোভন হইত।

—

ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২১শে চৈত্র সোমবার রাত্রিতে একনিষ্ঠ দেশসেবক কংগ্রেস জাতীয় দলের বঙ্গীয় শাখার ভূতপূর্ব সম্পাদক ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অল্প কয় দিন রোগভোগ করিয়া মাত্র

৪৯ বৎসর বয়সে তাঁহার টালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। বহু বৎসর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কয়েক বার কারাবরণ করেন। অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে ভারতব্যাপী জাতীয়তাবাদী হিন্দুর প্রাণে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহারই ফলে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরেশবাবু সেই সময় মালবীয়জীর সহিত যোগদান করিয়া বাংলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এই নির্ভীক দেশকর্মীর অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

—

কলিকাতায় সামরিক লরী কর্তৃক দুর্ঘটনা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার রাজপথে সামরিক লরীতে এক হাজার নয় শত আশীটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এই সকল দুর্ঘটনায় ১ শত ৪২ জন মারা গিয়াছে। এই সকল দুর্ঘটনার উনিশটি সম্পর্কে মামলা উপস্থাপিত করা হয়। তিনটি মামলায় আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। অবস্থার গুরুত্ব ও সামরিক লরী প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আরও কড়া করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বদাই সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানান হইতেছে এবং তাঁহারা এই বিষয়ে অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সামরিক ট্রাফিক পুলিসের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ান হইয়াছে এবং টহলদারী সামরিক পুলিস এখন কলিকাতা অঞ্চলে টহল দিয়া বেড়াইতেছে। টহলদারী অফিসারগণও ট্রাফিক সংক্রান্ত অপরাধীদিগকে মধ্যে মধ্যে গ্রেপ্তার করিতেছেন। তাহাদিগের প্রথম বারের গ্রেপ্তারের ফলে দুই শত ড্রাইভারকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এখনও আরও সামরিক পুলিস প্রয়োজন এবং বিষয়টির প্রতি পুনরায় সামরিক কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে।

কয়েক দিন পূর্বে ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও জানাইয়াছিলেন যে, মিলিটারী লরীর ধাক্কা লাগিয়া এত অধিক সংখ্যক ট্রামগাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, চালু গাড়ীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। দুর্ঘটনায় ১৫২ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে কিন্তু মামলা দায়ের হইয়াছে মাত্র ৬৭টি, এবং তিনটির অধিক মামলায় আসামীরা অপরাধী সাব্যস্ত হয় নাই, ইহা ট্রাফিক পুলিসের কর্মদক্ষতার পরিচয় নহে। সামরিক পুলিসের কড়াকড়ি আরও আগে কেন করা হয় নাই, এবং করিবার পর উহার ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাস্তবিকই কমিয়াছে কি-না, বাংলা-সরকারের তরফ হইতে তাহা জানান উচিত।

—

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ

ভারতবর্ষের সাত জন বৈজ্ঞানিককে ছয় সপ্তাহের জন্য ইংলণ্ডে যাইতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে আমন্ত্রিত করা হইতেছে। তাঁহারা ইংলণ্ডের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিষদে আলোচনা করিবেন।

ডাঃ সর্ এস. ভাটনগর, ডাঃ এস. কে. মিত্র, কর্ণেল এম. এল. ভাটিয়া, সর্ ফিরোজ খারেগাট, সর্ জে. সি. ঘোষ, অধ্যাপক এম. এন. সাহা ও ডাঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

ইঁহারা মে মাসের প্রথম ভাগে ভারত ত্যাগ করিবেন। ইংলণ্ডে তাঁহারা ডিপার্টমেণ্ট অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ, মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল, রেডিয়ো বোর্ড ও রয়েল সোসাইটী পরিদর্শন ও ঐ সমস্ত পরিষদে আলোচনা করিবেন।

—

কাঁথিতে সরকারী ঋণ আদায়

১৮ই ফাল্গুন তারিখের সাপ্তাহিক হিজলী হিতৈষী পত্রিকায় কাঁথির দুঃস্থদের পক্ষ হইতে জনৈক পত্রলেখক লিখিয়াছেন :—

স্থানীয় অধিবাসীদের খয়রাতী দান না হইলে যে বাঁচিবার উপায় নাই এবং লোন ও রাজস্ব দিবার যে ক্ষমতা নাই তাহা পুনঃ পুনঃ সরকার বাহাদুরকে জানান সত্ত্বেও সরকার বাহাদুরের ঋণ আদায়ের কর্মচারী গত ২৩।২।৪৪ তারিখে চৌকীদার মারফত গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া দেন যে "সমূহ ঋণের কিস্তির টাকা ও রাজস্ব যদি আগামী কল্য ২৪।২।৪৪-এর মধ্যে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইবে।"

সরকার বাহাদুরের নিকট আমাদের স্থানীয় দুঃস্থদের নিবেদন এই যে, গত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আমাদের অধিকাংশ জিনিসপত্র নষ্ট ত হইয়াছিলই, তদুপরি বাকী যাহা ছিল তাহা এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহ গত মন্বন্তরে সমস্তই গিয়াছে। বর্তমানে সরকার বাহাদুরের খয়রাতী দানে প্রাপ্ত আমাদের সম্বল মাত্র একখানি কম্বল, ট্যার্ভাও কাপড় একখানি ও একখানি করিয়া টিনের ডিস

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাও আবার সকলের নয়। অধিকন্তু অধিকাংশের ঘরের চালে খড় নাই।

এমতাবস্থায় আমাদের লোন ও রাজস্ব আদায় মকুব না করিয়া সরকার বাহাদুর বর্তমান বৎসর আদায়ের ব্যবস্থা করিলে, আমাদের বিশ্বাস আদায় অপেক্ষা ঘাট্‌তির পরিমাণই বেশী হইবে।

মেদিনীপুর সম্বন্ধে বাংলা-সরকার যে কোন কাজ করিয়া থাকেন তাহারই অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একটা কঠোরতা বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে জনমতের চাপে খয়রাতি দান করিতে গবর্মেণ্ট বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু ঐ টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ঋণ পরিশোধে বুভুক্ষু লোকগুলিকে বাধ্য করিয়া দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইতেছে। খয়রাতি দানের বিনিময়ে ঋণ ও রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা অত্যন্ত নিম্ন স্তরের মনোবৃত্তির লক্ষণ একথা আমরা কাহাকে বুঝাইব?

—

কণ্ট্রোলের ফলে রোগীর পথ্য দুষ্প্রাপ্য

নানাবিধ কণ্ট্রোলের ফলে রোগীর পথ্য সংগ্রহ করা অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। পুরানো চাউল পাকাশয়ের রোগী এবং জ্বরের পর আরোগ্যমুখ রোগীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। উহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াও যায়, কিন্তু কণ্ট্রোলের বিধি-নিষেধের ফলে সংগ্রহ করা অসাধ্য। ডাক্তারখানাগুলিতেও কিছু কিছু করিয়া পুরানো চাউল রাখিতে দিলে অনেক উপকার হইত। দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য, কলিকাতায় টাকায় দেড় সের পাঁচ পোয়া এখনও পাওয়া যায়, তাহাও প্রচুর পরিমাণে জলমিশ্রিত। সাগু যেমন দুর্মূল্য তেমনি দুষ্প্রাপ্য এবং ভেজাল বার্লি পাওয়াও কঠিন। মিছরি পাওয়া যায় না। ভারতীয় রেড-ক্রশ কি এদিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারেন না? গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা বৃথা।

—

স্কুল সব-ইন্‌স্পেক্টরের দারোগা মনোবৃত্তি

সিলেট ক্রনিকেলের ১৪ই মার্চের সংবাদে প্রকাশ করিমগঞ্জ জলঢুপ সার্কেলের সব-ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর গলসজন প্রাথমিক স্কুল (২৫২ নং) পরিদর্শনে গিয়া ইন্‌স্পেকশন বহিতে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন: "সামান্য বারো টাকা বেতনের একজন শিক্ষকের পক্ষে আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাওয়া একেবারে অসহনীয়। তাঁহার মনে রাখা উচিত যে আমার সঙ্গের পিয়নটিও তাহার চেয়ে অধিক বেতন পায়।"

যে-দিন তিনি পরিদর্শনে গিয়াছিলেন সেদিন পূজার ছুটি আরম্ভ হইবার কথা, ছাত্রেরা প্রত্যুষে স্কুলে আসিয়াছিল। বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত শিক্ষক সব-ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তখনও আসেন নাই। ছোট ছোট ছেলেদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় অগত্যা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইহারও পরে সব-ইনস্পেক্টরটি স্কুলে আসিবার সময় পান।

যে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রদের প্রথম জীবনে লেখাপড়ার প্রথম ছাপ পড়ে তাহার শিক্ষকের পক্ষে বার টাকা বেতন সমগ্র জাতির পক্ষে গভীর লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। আমেরিকা বা ইংলণ্ডের কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকেরা এই অবস্থা কল্পনা করিতেও পারিবে না। শিক্ষকদের প্রতি ইনস্পেক্টরদের এরূপ মনোভাব অতিশয় নিন্দনীয়।

—

বাংলায় লবণের অভাব

বাংলায় লবণের অভাব এখনও ঘুচে নাই। বাংলা-সরকার জানাইয়াছিলেন যে, ৩রা এপ্রিল হইতে সরকারী দোকানগুলিতে লবণ পাওয়া যাইবে, কিন্তু ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত উহা সর্বত্র পাওয়া যায় নাই। বাংলায় লবণের অভাব কত তীব্র হইয়াছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী তাহার বিবরণ দেন এবং অতিরিক্ত বরাদ্দের আলোচনার সময় লবণের বরাদ্দ সম্বন্ধে বলেন,

"এই বিশেষ বরাদ্দ সম্পর্কে আমার দুই-একটি সাধারণ কথা বলিবার আছে। এই বরাদ্দ সম্পর্কে ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটির সুপারিশের সুবিধা পরিষদ পান নাই। কিন্তু, এই বরাদ্দ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই পূর্বদিকে অবস্থিত প্রদেশগুলির পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ আছে। পরিষদ ভালভাবেই জানেন যে, এই প্রদেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রবাহিত লবণের উপর নির্ভরশীল এবং এই মন্তব্যে দেখিতে পাইতেছি যে, বিদেশী লবণের আমদানী বন্ধ হওয়ায় উত্তর-ভারতের বর্ধিত দাবী পূরণের জন্য গবর্মেণ্টকে লবণের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। পূর্বপ্রান্তবর্তী প্রদেশগুলিতে বর্তমানে লবণ সরবরাহের অবস্থা কি তাহা আমি ভারপ্রাপ্ত সদস্যের নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। বর্তমানে এই সকল প্রদেশে লবণের তীব্র অভাব সম্পর্কে শঙ্কাজনক সংবাদ পাইতেছি। অনেক স্থলেই এক টাকার কম এক সের লবণ পাওয়া যায় না। সংবাদপত্রে প্রকাশ, উত্তর-বাংলার কোন জেলা শহরে প্রতি সাত ছটাক লবণের মূল্য দুই টাকা

গ্রহণ করায় এক দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে। এই জন্য আমি প্রথমতঃ কলিকাতার মজুত মাল এবং মফস্বলের সরবরাহের অবস্থা জানিতে চাহি। পূর্বপ্রান্তবর্তী প্রদেশসমূহে, বিশেষতঃ বাংলার কতকগুলি জেলাতে, অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, আমি বিশ্বাস করি, ইহার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণে গবর্মেণ্ট মনোযোগ প্রদান করিবেন।"

ভারত-সরকারের মুখ চাহিয়া করুণ আর্তনাদ ভিন্ন বাংলার খাদ্য-বিভাগ লবণের অভাব ঘুচাইবার জন্য আর কিছুই করিতে পারেন নাই।

সংবাদপত্রের কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের সংশোধন

সংবাদপত্রের কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের নিম্নলিখিত রূপ দুইটি সংশোধন ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে—

(১) পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত অনুমতি না লইয়া কোন ব্যক্তি কোন সংবাদপত্রের নাম অথবা তাহা মুদ্রণের স্থান অথবা তাহা প্রকাশের স্থানের পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(২) সংবাদপত্রের যে স্বত্বাধিকারীকে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ক্রয় ও ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ছাড়া অপর কোন কাগজ সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

হুকুমনামার দ্বিতীয় দফার ফলে বহুসংখ্যক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। ভারত-সরকারের মূল উদ্দেশ্য সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ 'নিউজ প্রিণ্ট' ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, কারণ উহা এদেশে তৈরি হয় না এবং জাহাজে স্থানাভাবের জন্য বিদেশ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী করাও সম্ভব নয়। কাজেই সংবাদপত্রগুলিকে এই কাগজ ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া উক্ত আদেশের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রথমে বলা হইয়াছিল। পরে দেখা গিয়াছে কোন পত্রিকা সরকারের বিষনজরে পড়িলে তাহার উপর ভারতরক্ষা আইনে নিষেধাজ্ঞা জারি না করিয়া উক্ত নিয়ন্ত্রণাদেশে কাগজ সরবরাহ বন্ধ করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বর্তমান সংশোধনের ফলে বেপরোয়া ভাবে যে-কোন কাগজ বন্ধ করিবার ক্ষমতা গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিলেন। নিউজ প্রিণ্টের পরিবর্তে অধিকতর মূল্যে মিলের তৈরি কাগজ অথবা হাতে-তৈরি কাগজ ব্যবহার করিলে তাহা আপত্তিজনক হইবে কেন ইহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। নাগপুরের দৈনিক হিতবাদ হাতে-তৈরি কাগজে ছবি-সমেত কয়েক সংখ্যা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, হাতে-তৈরি কাগজ এখন সংবাদপত্র মুদ্রণ পর্য্যন্ত চলিতে পারে। বর্তমান আদেশে হাতে-তৈরি কাগজ উৎপাদনও নিরুৎসাহিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

তুলসীদাসী রামায়ণ বাজেয়াপ্ত

নাগপুরের সেওনি হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় পুলিস খানাতল্লাসী করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণের ২০টি শ্লোক সমন্বিত একখানি বই বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সম্পর্কিত শ্লোকটি লেখা বা ব্যবহার করা পুলিস নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। রামের বন-গমন সময়ের ঘটনা উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে রাম লক্ষ্মণকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহার অনুপস্থিতিতে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলেন। উক্ত শ্লোকের মর্মার্থ এই—যে রাজ্যে প্রজাগণ অসুখী থাকে সেই রাজ্যের রাজা নরকে গমন করে।

পুলিস কেন বইখানি বাজেয়াপ্ত করিল, গবর্মেণ্ট কর্তৃক পূর্বে এ সম্বন্ধে কোন হুকুমনামা জারি হইয়াছিল কি না, উল্লিখিত সংবাদে তাহা বুঝা যায় না। ১৯৩২ সালে কলিকাতার একটি বড় জেলে পুস্তক সেন্সরের একটি ঘটনার কথা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছিলাম, তাহার সহিত পূর্বোক্ত পুলিসী সেন্সরের মিল আছে। জেলে আটক জনৈক রাজবন্দী ছয় পেনি বেন সিরিজের 'লাইফ অফ এ সেল' নামক একখানা পুস্তক অন্যান্য পুস্তকের সহিত অর্ডার দেন। অর্ডারের খাতাখানি ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল ঐ বইখানির নাম লাল কালি দিয়া কাটা। ডেপুটি-জেলারের উপর জিনিষপত্র এবং পুস্তক সরবরাহের ভার ছিল। রাজবন্দীটি তাঁহার নিকট গিয়া ঐ বইখানি কেন পাস করা হইল না তাহা জানিতে চাহিলেন। জেলারটি বলিলেন, "এত সেলের মধ্যে কি আবার একটা লাইফ অফ এ সেল দেওয়া যায়?" বন্দীটি বুঝিতে পারিলেন যে ভদ্রলোক 'লাইফ অফ এ সেল'কে 'লাইফ ইন এ সেল' অর্থাৎ কোন বিপ্লবীর কারাজীবনী বলিয়া ভাবিতেছেন। তখন বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন, ওটা তো বায়োলজির বই; এ বই দিতে কি আপত্তি আছে?" জেলারটি এবার অতিশয় বিজ্ঞের ন্যায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বায়োলজির মত বায়োলজি হ'লে কি আর দেওয়া চলে? ধরুন আপনারা যদি গান্ধীর বায়োলজি চেয়ে বসেন, সেটা কি আর দিতে পারি?"

বাংলার গবর্ণরের বক্তৃতা

বাংলার নূতন গবর্ণর মিঃ কেসী গত ১লা এপ্রিল এক বেতার-বক্তৃতায় অর্দ্ধাশনে জর্জরিত এবং দুর্ভিক্ষে গৃহহারা বিপর্য্যস্ত নরনারীকে আশ্বাসবাণী শুনাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় দুই মাস হইল গবর্ণর রূপে মিঃ কেসী এ দেশে আসিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যেই এদেশের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতেই তিনি জানাইয়াছেন যে, অতীতে যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে, ১৯৪৪ সালে আর যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। খাদ্যসম্পর্কে বস্তুতঃ বাংলার যে আশঙ্কার কারণ নাই, ইহা তিনি অনুমানের উপর বলেন নাই। এই বিশ্বাসের কারণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, (১) গত বৎসর এদেশে সত্যই চাউলের অভাব ছিল এবং অজন্মা ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় উহাকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসরে শস্যের উৎপাদন অত্যন্ত আশাপ্রদ। (২) গত বৎসর বাংলা দেশকে একা কলিকাতার ন্যায় বিরাট্ নগরীকে আহার্য্য যোগাইতে হইয়াছে; এ বৎসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় বৃহত্তর কলিকাতার চল্লিশ লক্ষেরও অধিক লোকের জন্য এক কোটি উননব্বুই লক্ষ মণ খাদ্য-সামগ্রী বাহির হইতে কলিকাতায় আনা সম্ভব হইবে। (৩) গত বৎসর সরকারের ভাণ্ডার ছিল শূন্য এবং শস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের কোন সঙ্গত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু আজ সরকারী ভাণ্ডার খাদ্য-সামগ্রীতে পূর্ণ, সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপক ও বিপুল ব্যবস্থা বহু গুণে উন্নততর। (৪) গত বৎসর যানবাহনের নানারূপ অসুবিধা ছিল; জলপথ, স্থলপথ, রেলপথ, সবদিকেই ছিল বহু বাধবিঘ্ন। কিন্তু এ বৎসর পূর্ব্বাহ্নেই কর্তৃপক্ষ সজাগ ও সতর্ক এবং চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিও সুস্পষ্ট, শুধু তাহাই নহে, যাহাতে সুব্যবস্থা সম্ভব এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, সে জন্যও তাঁহারা বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ভারত গবর্মেণ্টের সহিত প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিয়া, অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ দ্বারা, প্রয়োজনমত যানবাহন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা শস্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের ব্যবস্থায় তাঁহাদের ঐকান্তিক শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বাড়্তি অঞ্চল হইতে শস্য আনাইয়া ঘাট্তি অঞ্চলে উহা বণ্টনের প্রস্তাবে অনেকের মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছিল যে, বাড়্তি অঞ্চল হইতে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে শস্য সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহা হইলে বাড়্তি অঞ্চলই বা ঘাট্তি অঞ্চলে পরিণত হইতে কতক্ষণ? গবর্ণর এই সকল সংশয়বাদীদের আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন, এ আশঙ্কা অমূলক। অভিজ্ঞতা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই যথেষ্ট সতর্ক করিয়াছে। এ আশঙ্কা যাহাতে দেখা না দেয়, সেজন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কৃষকগণ কর্তৃক ধান আটকাইয়া রাখাই দুর্ভিক্ষের একটা প্রধান কারণ—এই কথাটা মিঃ কেসীর ন্যায় সর্ জন হার্ব্বার্টও বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কার্য্যকালে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, বাড়্তি ধান কাহারও নিকটেই ছিল না। এবার বেশী ফসল হওয়ায় সম্বৎসরের খোরাকী মজুত রাখিবার চেষ্টা হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার পর ইহা দোষাবহও নহে, সর্ টমাস রাদারফোর্ড বাংলা ত্যাগের পূর্বে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৃষকের ঘরে সম্বৎসরের খোরাক মজুত থাকিলে তাহার জন্য বাজারে বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ ক্রেতাহিসাবে তাহার চাহিদা ও জোগানের সঙ্গে সরিয়াই গেল। প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান লাভের লোভে যাহারা মজুত রাখে বিপদ ঘটাইতে পারে তাহারাই। এবার চাষীদের হাতে চাউল প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে জমিয়া গিয়াছে, মিঃ কেসী কোন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা জানাইলে ভাল হইত। ভারতবর্ষে তিনি নবাগত, বাংলার অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ দেশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রাথমিক জ্ঞান সম্ভবতঃ মিঃ আমেরীর আপিসে সঞ্চিত হইয়াছে। এখানে যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রণাদাতা, দেশবাসী তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না, তাহাদের উপর লোকের আস্থা ফিরাইয়া আনা দরকার, ইহা ভারত-সরকারও স্বীকার করিয়াছেন। মাস দুয়েকের মধ্যে দুই-দশটা রেশনিং কেন্দ্র অথবা হঠাৎ গড়িয়া-উঠা দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র দেখিয়া এই ধরণের গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কতদূর সঙ্গত গবর্ণর তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

বাড়্তি জেলা হইতে ঘাট্তি জেলায় সরকারী এজেণ্ট মারফৎ চাউল প্রেরণের অসুবিধা, আবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ও অপচয়ের সম্ভাবনার কথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। মিঃ কেসীও দেখিতেছি সর্ জন হার্ব্বার্টের অনুসৃত এই অস্বাভাবিক বন্দোবস্তই সমর্থন করিতেছেন। কলিকাতায় চাউল বাহির হইতে আসিতেছে, বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে এবং এবার আশাতিরিক্ত ফসলও ফলিয়াছে। এই অবস্থায় বাংলা দেশের অভ্যন্তরে অবাধ

বাণিজ্য চলিতে দেওয়াই মূল্য হ্রাসের ও সম-বণ্টনের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য উপায় ছিল। গবর্ন্মেণ্টের উদ্দেশ্য সাধু হইলে এই ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহারা সৎ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া একটি সুদক্ষ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ পুলিসবাহিনী গঠনের দ্বারা অন্যায় লাভ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে পারিতেন। সরকারী এজেণ্টদের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে ইহাতে তাহার অধিকাংশই বাঁচিয়া যাইত।

বাংলার দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়াছে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত যে মৃত্যুসংখ্যা ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে দেখা যায় এখনও সপ্তাহে প্রায় ২৫০ জন করিয়া অর্থাৎ মাসে প্রায় এক হাজার 'পপার' মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। হাসপাতালে মৃত বুভুক্ষুর যে তালিকা প্রতিদিন সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয় তাহা যোগ করিলে সপ্তাহে ২০৷২৫টির বেশী হয় না। তবে কর্পোরেশনের হিসাবে প্রদত্ত এই সব 'পপার' কাহারা, এবং ইহারা মরিতেছেই বা কোথায়? মফস্বল হইতেও উদ্বেগজনক সংবাদ আসিতেছে। কোন কোন শহরের দিকে বুভুক্ষুর অভিযান সুরু হইয়াছে, শেয়াল কুকুর কর্তৃক মানুষের মৃতদেহ ভক্ষণের সংবাদও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। চৈত্র মাসে যে সময়ে খাজনার কিস্তি দেওয়ার জন্য চাউলের দর সর্বাপেক্ষা কম থাকে সেই সময়ে সমগ্র দেশে বিশ টাকার কাছাকাছি দর থাকা রীতি-মত আশঙ্কার কথা। গত বৎসর মাস কয়েকের জন্য মাত্র দর বিশ টাকা হইতে চল্লিশ টাকা উঠিয়াছিল; এবার ধান উঠিবার পর হইতেই চার টাকার চাউলের দর ষোল টাকার নীচে নামিতে চাহিতেছে না। ভূমিহীন সাধারণ চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এই মূল্যাধিক্য সাংঘাতিক। নূতন বৎসরের দর দশ টাকায় নামাইবার প্রতিশ্রুতি সর্ টমাস রাদারফোর্ড এবং মিঃ সুরাবর্দ্দী দুজনেই দিয়াছিলেন কিন্তু কেহই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় অনাহারে হাজার হাজার লোক এখনও মরিতে থাকিবে এবং অর্ধাশনে শীর্ণ লক্ষ লক্ষ লোক রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

মিঃ কেসী যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। দেশবাসী কিন্তু ভরসার বিশেষ কারণ পাইতেছে না। চাউল অপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম লাগে লবণ এবং কয়লা, ইহাই আনিবার মালগাড়ী যেখানে জোটে না, সেখানে জেলায় জেলায় চাউল প্রেরণের ভরসা তিনি কোথায় পান? রেলের অসুবিধা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না মণিপুরের যুদ্ধের পর ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অন্ততঃ রেলের উপর চাপ যত দূর সাধ্য কমাইয়া দেওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। লর্ড ওয়াভেলের দয়ায় মিলিটারী লরী যতগুলি একাজে পাওয়া গিয়াছিল তাহা চিরদিনই বজায় থাকিবে ইহা আশা করাই অন্যায়। আসামের যুদ্ধে যে কোন মুহূর্তে উহাদের প্রয়োজন হইতে পারে। সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছিল নৌকা এবং গরুর গাড়ী। মিঃ কেসী এদিকে মন দিলে ভাল করিতেন। অবশ্য ২৫টি নৌকার 'কনভয়' অপেক্ষা অনেক বেশী নৌকা ইহাতে প্রয়োজন হইত।

যে-সব ভ্রান্ত ধারণা ও বে-বন্দোবস্তের ফলে সর্ জন হার্বার্ট বাংলায় দুর্ভিক্ষ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, মিঃ কেসী তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করিবেন এমন কোন পরিচয় আমরা তাঁহার বক্তৃতায় পাইলাম না। যে কয়েকটি মন্ত্রণাদাতার উপর সর্ জন হার্বার্ট নির্ভর করিয়াছিলেন মিঃ কেসীও তাঁহাদেরই পরামর্শে চলিতেছেন। এই অবস্থায় মিঃ কেসীর সাফল্য সর্ জন হার্বার্টের চেয়ে বেশী হইবে এই ভরসা রাখিতে আমরা অক্ষম।

—

দলনিরপেক্ষ নেতৃসম্মেলনে সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর অভিভাষণ

লক্ষ্ণৌ শহরে দলনিরপেক্ষ নেতৃসম্মেলনে সভাপতি সর্ তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহার অভিভাষণে বর্তমান রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক অবস্থার আলোচনা করিয়া বলেন,

"আমি সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের বিষয়টি অবহেলা করিতে চাহি না। কিন্তু চেষ্টা দ্বারা এই পার্থক্য দূরীভূত হইতে পারে। আমার মতে সরকারের কেবল প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের গুরুত্ব প্রচার করিলেই চলিবে না, পরন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেস, মুসলেম লীগ এবং সরকার-সহ অন্যান্য দলের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত কিরূপে ইহা সম্ভব? মীমাংসার চেষ্টা করিবার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে যত দিন না স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে, তত দিন আমরা অবস্থার কোনও পরিবর্তনের আশা করিতে পারি না। এ জন্য গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাকে মুক্তি দিয়া একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। কংগ্রেসের ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তাবের সহিত আমার মতের যত পার্থক্য থাকুক না কেন, বিনাবিচারে আটক নেতৃবৃন্দের নিকট তাঁহাদিগের ত্রুটি স্বীকারের দাবী করা পীড়নমূলক নীতির তুল্য বলিয়া মনে হয় এবং ইহাতে সুফল লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ দেশে ও বিদেশে এরূপ ভাবে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, যেন ইহা অধিকাংশ দেশবাসীর বিদ্রোহ। নেতৃবৃন্দের সহিত সংযোগ স্থাপন করা কি সরকারের পক্ষে এতই অসম্ভব? ব্রিটিশ-সরকার ও ভারত-সরকার এ বিষয়ে যে অদূরদর্শী মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।"

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একযোগে ভোট দেওয়ার ফলে অনেকবার ভারত-সরকারের পরাজয় ঘটিয়াছে। কংগ্রেস ও লীগের এই সাময়িক মিলনও গবর্ন্মেণ্টের নিকট আনন্দদায়ক না হইয়া আতঙ্কজনকই হইয়াছিল, সরকারী বে-সরকারী উভয়বিধ শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের উক্তিতে ইহা একাধিকবার প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিলেও গবর্ন্মেণ্ট কখনও এই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন না, কেন্দ্রীয় পরিষদের গত অধিবেশনে ইহা একরূপ নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হইয়াছে।

গান্ধীজীকে ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দান করিয়া জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা এখন যত অধিক এরূপ কোন সময়েই হয় নাই। আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য পীড়াপীড়ি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। মিশর এবং আয়র্লণ্ডে ইহা অপেক্ষা অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, অনেক বেশী রক্তপাত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে বিপ্লবী নেতাদের সহিত সন্ধিসর্ত্ত স্বাক্ষরের সময় ক্ষমা চাহিবার বা কোন প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা কেহ তোলে নাই।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সর্ তেজ বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দশ বৎসর পূর্বে ভারতের মনের অবস্থা যেরূপ ছিল এখন আর সেরূপ নাই। ইংরেজরা বর্ত্তমানে যেরূপ ভারতবর্ষের সহানুভূতি হারাইয়াছে, সেরূপ আর কখনও হারায় নাই। প্রচলিত গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের নিজস্ব গবর্ন্মেণ্ট এই ধারণা প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তরে গাঁথিয়া না দিলে বিপদের সময় জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে ও গান্ধীজীকে কারাগারে রাখিয়া মৌলিক সহযোগিতা প্রার্থনায় কোন ফল হয় নাই, হওয়া অসম্ভব।

—

বস্ত্রব্যবসায়ে অতিলাভ

বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাজ ঠাকরসি বোর্ডের গত বোম্বাই অধিবেশনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে চোরাবাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বিক্রয়কেন্দ্রে তাড়াতাড়ি ও বিনা-বাধায় মাল স্থানান্তরের ব্যবস্থা না হওয়ায় চোরাবাজার ফাঁপিয়া উঠিতেছে। ভারতের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সমপরিমাণে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাহাজে ও মালগাড়ীতে মাশুলের পার্থক্য দূর করা, মালগাড়ীতে বস্ত্র ও সূতা প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত মাশুল দেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি বড় বড় উৎপাদনকেন্দ্রে মজুত মাল সরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা দরকার।

কয়লার ঘাটতি উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, জাহাজযোগে মাদ্রাজে ও বোম্বাই-এ কয়লা সরবরাহের ও ফিরতি পথে ঐ সকল জাহাজে বস্ত্র ও সূতা পাঠাইবার ব্যবস্থা ব্যতীত উহার প্রতিকার হইবে না। এখন আসামে, বিহারে ও পূর্ব-উপকূলের ঘাটতিপূর্ণ অঞ্চলে বস্ত্রের গুরুতর অভাব ঘটিয়াছে।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মূল্য টাকায় চার পাঁচ আনা কমিয়াছিল বটে, কিন্তু উহাও যুদ্ধের পূর্বের দরের তিন গুণেরও অধিক। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও শেষ পর্য্যন্ত যথার্থ ভাবে বলবৎ করা হয় নাই। গবর্ন্মেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, পড়তার উপর বাঁধা লাভ দিয়া কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদিগকে ন্যায্য দরে বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে এবং উৎপন্ন মাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিতে উহাদিগকে বাধ্য করিলে দাম কমিবেই। এই উদ্দেশ্যে আদেশ দেওয়া হয় যে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত তৈয়ারী মার্কাবিহীন মাল অক্টোবরের মধ্যে বিক্রয় শেষ করিতে হইবে এবং তারপর তৈরি মার্কাযুক্ত মালের গাঁইট তিন মাসের মধ্যে খুলিতে ও ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয় শেষ করিতে হইবে। ঐ সময় মার্কাবিহীন দুই শতাধিক কোটি গজ বস্ত্র বাজারে মজুত ছিল এবং উহাতে সারা ভারতের প্রায় সাত মাসের চাহিদা মিটিত। এই আদেশ কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হইলে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ কতকটা সফল হইত সন্দেহ নাই, যদিও প্রায় তিনগুণ চড়া দরেই অধিকাংশ মার্কা পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদিগকে বার বার অব্যাহতি দেওয়ায় নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উহার মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইল। মার্কামারা বস্ত্র বিক্রয়ের সময় ক্রমাগত বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। এই সুযোগে ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বস্ত্র বিক্রয় শেষ করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া ধীরে সুস্থে নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা চড়া দরে মাল বিক্রয় করিতেছে। যান-বাহনের অসুবিধার জন্য বস্ত্র-শিল্পকেন্দ্রগুলিতে প্রচুর মাল জমিয়া

যাইতেছে, ফলে যে-সব দূরবর্তী অঞ্চলে সময়মত মাল না আসায় ঘাটতি পড়িতেছে সেখানে চোরাবাজারও তেমনি ভাবেই ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত অব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব ভারত-সরকারের।

এই ব্যাপারে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে কাহারও কাহারও যে সন্দেহ ছিল, মাদ্রাজের "হিন্দু" একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধে তাহা সমর্থন করিয়াছেন। উহার সার সঙ্কলন করিয়া "যুগান্তর" লিখিয়াছেন যে, কলওয়ালা, এজেন্ট, পাইকার ও খুচরা দোকানী—সকলেই পরবর্তী ক্রেতার উপর চাপ দিয়া নির্দিষ্ট লাভের অতিরিক্ত কিছু টাকা পকেটস্থ করিতেছে। কলওয়ালারা পাইকারের সহিত লেনদেন না করিয়া এজেন্টের নিকট পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে মাল বেচিতেছে এবং এজেন্টের সংখ্যাও কয়েক গুণ বাড়িয়াছে। ঐরূপ এজেন্ট-প্রীতির কারণ আপাতদৃষ্টিতে রহস্যাবৃত হইলেও সে রহস্য দুর্ভেদ্য নহে। কেননা অনেক পাইকারী ব্যবসায়ী অভিযোগ করিয়াছে যে, বাঁধা দরের উপর নির্দিষ্ট কমিশন দিয়া তাহারা মাল কিনিতে পারে না, রসিদবিহীন লেন-দেনের মারফতে আরও কিছু টাকা না দিলে তাহাদিগকে মাল দেওয়া হয় না। খুচরা ব্যবসায়ীরাও পাইকারদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছে। নির্দিষ্ট দরের অতিরিক্ত যে টাকাটা এই ভাবে পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফতে এজেন্টের পকেটস্থ হইতেছে, তাহাই চোরা-বাজারের লাভ, এই লাভের সহিত কলওয়ালাদের এজেন্ট-প্রীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই অনেকে সন্দেহ করেন। শ্রীযুক্ত ঠাকরুসিও অনুরূপ সন্দেহ পোষণ করেন, নতুবা তিনি পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেন না যে, "আইন অমান্য করিলে কলওয়ালা বা ব্যবসায়ী—কাহাকেও রেহাই দেওয়া হইবে না। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অমান্যকারীদিগকে শাস্তি দেওয়ার যুথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে।"

ছোটখাটো কাপড়ের দোকানদার কেহ কেহ অতি-লাভের দায়ে ধরা পড়িলেও বড় এজেন্ট বা কলওয়ালা কেহই এ যাবৎ ধরা পড়ে নাই ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অতিরিক্ত লাভ-করের মোটা অংশ আদায়ের লোভে ভারত-সরকার কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে প্রথম দিকে অতিলাভ করিবার যে সুযোগ দিয়াছিলেন, এখন তাহার প্রতিকার তাঁহাদেরই সাধ্যাতীত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ভারত-সরকারের সহিত কায়েমী স্বার্থের নাড়ীর যোগ অজানা নয়।

—

আমেরিকায় আটলাণ্টিক চার্টার

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে টেক্সাসের নিগ্রোদের ভোটদানের অধিকার আছে বলিয়া সুপ্রীম কোর্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমেরিকার রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। ১৯৪০ সালে টেক্সাসে ডেমোক্রাটিক দলের প্রাথমিক নির্বাচনে জনৈক নিগ্রোকে ভোট দিতে দেওয়া হয় না। এই ব্যাপার হইতে মামলার উদ্ভব হয়।

—

দুর্ভিক্ষের পর নারীসমস্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি অসদুদ্দেশ্যে নারী বিক্রয়ের ব্যবসা বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্মেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, দারিদ্র্যের নিদারুণ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ববঙ্গে অসংখ্য দুঃস্থা নারী 'বেশ্যাবৃত্তি' অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, বহু অভিভাবক তাহাদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিয়াছে। এই সমস্ত দুঃস্থা ও 'পদস্খলিতা' নারীকে উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গবর্মেণ্ট বহু অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অসৎ উদ্দেশ্যে নারী-বিক্রয়-ব্যবসা বন্ধ করার ও দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য গবর্মেণ্ট রেল স্টেশনে ও নদীর ঘাটে প্রখর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরের সময় সরকারপক্ষ জানাইয়াছেন যে, গত দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক নারী একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে উপার্জনক্ষম স্বামীপুত্র হারাইয়াছে, অনশনে, অর্ধাশনে অনেকের খাটিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। গবর্মেণ্ট আদেশ জারি করিয়াছেন, যেখানে এই সমস্ত নারীর সংখ্যা অধিক, সেখানে এক বা ততোধিক অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই সমস্ত অনাথাশ্রম পরিচালনা সম্পর্কে গবর্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা এইগুলিতে আশ্রয় পাইবে তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে এবং যে আধা-সরকারী স্থানীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত আশ্রম পরিচালিত হইবে, যথেষ্ট সংখ্যক নারীকে উক্ত কমিটিতে নিয়োগ করা হইবে।

জনৈক সদস্য একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ সিংহ জিজ্ঞাসা করেন, "বাংলা দেশে বিদেশী সৈন্যদল আমদানীর জন্য কি অসৎ উদ্দেশ্যে নারী-বিক্রয়-ব্যবসা বৃদ্ধি পাইয়াছে?" পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জবাব দেন, "গবর্মেণ্ট তাহা জানেন না।" এই প্রশ্ন এখানেই শেষ না করিয়া বাংলা-সরকারের তরফ হইতে বিশেষ ভাবে

ইহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং অভিযোগ সত্য হইলে অবিলম্বে তাহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

বাংলা সরকার অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কোন আশ্রম এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না, অথবা হইলে কয়টি হইয়াছে তাহাও জানান নাই। দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাস পাইবার পর প্রায় চারি মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে, আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে গবর্মেণ্ট এই সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাময়িক ভাবে কিঞ্চিৎ সুফল হইলেও উহা এই সমস্যা সমাধানের উপায় নহে। দয়া বা অর্থ ভিক্ষা দিয়া কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না, ইহার দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেশের ও জাতির ক্ষতিই করা হয়। 'দরিদ্র আইনে' ব্যাপক ভিক্ষা দানের ফলে ইংলণ্ডের নিজেরও কম ক্ষতি হয় নাই। ইহার দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধানও হয় নাই। ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা দেখিবার পরও দুর্ভিক্ষোত্তর পুনর্গঠনে বাংলা-সরকার অনাথ আশ্রম, 'ওয়ার্ক হাউস' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা দরিদ্র দেশবাসীর আরও কিছু অর্থ অপচয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুপরিকল্পিত উপায়ে কুটীর-শিল্প প্রসার ভিন্ন এই সমস্যার সমাধান হওয়া একেবারে অসম্ভব। ইংরেজ দরিদ্রের ন্যায় বাঙালীও কখন বসিয়া খাইতে চাহে নাই। অনাথাশ্রম এবং ওয়ার্ক হাউসে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সরকারী অন্ন ধ্বংসের সুযোগ পাইয়াও লোকে সেখানে যাইতে চাহে না, গবর্মেণ্টও নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

বাংলা দেশে আপাততঃ চাউলের কলগুলির কার্য্য কমাইয়া দিয়া অনাথা স্ত্রীলোকদের দ্বারা ধান ভানিবার বন্দোবস্ত করিলে সরকারী খরচ ব্যতীতই লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয়া নারীর অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে ইহা আমরা পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি।

—

বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপের প্রয়াস ঃ হাসেম আলির মামলা

কলিকাতা হাইকোর্টে দুইটি দরখাস্তের বিচারকালে বিচারপতিগণ আদালতের আইনসঙ্গত কার্য্যে শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের প্রয়াসের নিন্দা করিয়াছেন। দুইটি দরখাস্তেই মামলা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। একটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন বরিশালের খাঁ সাহেব হাসেম আলি জমাদার এম-এল-এ এবং দ্বিতীয়টি করিয়াছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সোম নামক বর্ধমানের জনৈক ব্যক্তি।

খাঁ সাহেব হাসেম আলি জমাদার সমবায় ঋণ সমিতির তহবিল তছরূপ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমা হাকিমের আদালত হইতে মামলা সরাইয়া লইয়া মুন্সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, রায়ের এজলাসে মামলা চালাইবার আদেশ দেন। এই আদালত হইতে মামলাটি মহকুমা হাকিমের নিকট ফিরাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা হয়। বাংলা-সরকারের সমবায় ও ঋণ বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ হিল এবং বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পামারের মধ্যে মামলা সম্পর্কে কতকগুলি পত্র বিনিময় হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমা হাকিমের আদালতে মামলা চলিতে দিতে অসম্মত হন এই কারণে যে, ইহার উপর চাপ দিয়া শাসন বিভাগ কর্তৃক কার্য্যোদ্ধার করা সহজ হইবে। মিঃ হিলের পত্র পাঠে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত মামলাটি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি লজ হাসেম আলির দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া রায়ে বলিয়াছেন, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, শেষ পর্য্যন্ত বর্জন করিবার মতলবেই মামলাটি ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। এই মামলা সম্পর্কে বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ, জে, পামার এবং বাংলা-সরকারের কৃষি, সমবায় এবং পল্লী ঋণ বিভাগের সেক্রেটরীর যে সমস্ত পত্রাদি বিনিময় হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সরকারী দপ্তরে আসামীর কোন কোন বন্ধুলোক রহিয়াছে। আসামী তদ্বির তদারক করিয়া ঐ সমস্ত চিঠি লেখাইয়াছেন। ঐ সমস্ত বন্ধুলোক যে কে তাহা আদালতকে জানান হয় নাই। গবর্মেণ্ট ঐ সমস্ত চিঠির দায়িত্ব লইয়াছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত লোক যে কে, তাহা গবর্মেণ্টের জানা উচিত বা বাহির করা উচিত ছিল। গবর্ণর এবং মন্ত্রীরা এই শপথ করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন যে, কোন অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ধার না ধারিয়া তাঁহারা ভারতীয় আইন ও প্রথামত সর্বপ্রকার লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিবেন।

বর্তমান ক্ষেত্রে যাহা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শপথের প্রতিকূল। যাহাতে কেহ এরূপ প্রতিকূল চেষ্টা না করিতে পারে, তাহা দেখা গবর্মেণ্টের উচিত। শাসনকার্য্য সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যাপারে সরকারী বিভাগের সেক্রেটরীসমূহ গবর্ণরের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ কার্য্য করা কর্তব্যসঙ্গত হয় নাই।

—

বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপের প্রয়াস : রাজেন্দ্র সোমের মামলা

হাসেম আলির মামলার সঙ্গে ঐ দিনই প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি লজ রাজেন্দ্র সোমের দরখাস্ত সম্পর্কেও রায় দিয়াছেন।

এই দরখাস্ত সম্পর্কে বাংলা-সরকারের দুইটি গোপন ইস্তাহারের কথা প্রকাশ পায়। একটি ১০ই জানুয়ারী ও অপরটি ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের। গত ছয় মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষের দায়ে পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে সমস্ত লোক অপরাধ করিয়া বিচারাধীন আছে তাহাদের সম্পর্কে কি করিতে হইবে তাঁহার নির্দেশ ইস্তাহার দুইটিতে ছিল। অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য যাহারা অপরাধ করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইবার জন্যই ঐরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। জেলখানায় কয়েদীর ভিড় কমানোও ছিল একটা উদ্দেশ্য। উক্ত ইস্তাহার অনুযায়ী কোর্ট সব-ইন্স্পেক্টর মিঃ শ্যামদাস চ্যাটার্জির আদালতে মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত করেন। মিঃ চ্যাটার্জি সম্মতি না দেওয়ায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই নির্দেশ দিয়া মামলাটি সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে পাঠান যে, দাক্ষিণ্য সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ পালন করিতে হইবে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে বলেন যে, সরকারী নির্দেশের উদ্দেশ্যের মধ্যে আপত্তিকর কিছুই নাই। কোর্ট সব-ইন্সপেক্টার মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদানকালে বিচারকের নিকট বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি না দিয়া কোন স্বেচ্ছাচার করেন নাই। বরং তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন যে যদি উপযুক্ত কারণ দেখান হয় তাহা হইলে তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা পরিষ্কার বিচারকসুলভ মনোবৃত্তি। কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেই পুনর্বিবেচনার সুযোগ না দিয়া সমস্ত নথিপত্র সদর মহকুমা হাকিমের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে মামলা তুলিয়া লওয়ার ক্ষমতা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আছে বটে, কিন্তু এরূপ আদেশ দেওয়ার পূর্বে তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, ঐরূপ আদেশ দেওয়ার আইনসঙ্গত কোন কারণ আছে কিনা। এই মামলায় যেরূপ করা হইয়াছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা যদি সেভাবে কার্য্য করিতে থাকেন তাহা হইলে ন্যায়বিচারের জন্য আইনের ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যাইবে। প্রধান বিচারপতির মতে মিঃ এস চ্যাটার্জির আদালত হইতে মামলা সরাইয়া লইবার আদেশ অসঙ্গত হইয়াছে। সুতরাং ঐ আদেশ নাকচ হইবে। মিঃ এস চ্যাটার্জির আদালতেই মামলা চলিবে। সাক্ষ্যসাবুদ এবং অন্যান্য বিষয়দৃষ্টে তিনি বিচার করিবেন। মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা বা আইন অনুযায়ী মামলার বিচার শেষ করা হইবে কিনা তাহা মিঃ চ্যাটার্জিই ঠিক করিবেন।

প্রধান বিচারপতি অতঃপর বলেন যে, আর একটি বিষয়ে মন্তব্য করা প্রয়োজন—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের এক স্থানে আছে দাক্ষিণ্য দেখাইবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা অবশ্যপালনীয়। অর্থাৎ গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা চাহিতেছেন সদর মহকুমা হাকিমকে সেই আদেশই দিতে হইবে। এভাবে নিজের অভিপ্রায় কোন বিচারককে জানাইয়া দেওয়া বিচারকার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপ।

মিঃ হাসেম আলির দরখাস্তের কথা উল্লেখ করিয়া প্রধান বিচারপতি বলেন যে, ঐ মামলা বিচার বিভাগের কর্মচারীর আদালতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই মামলা বিচার বিভাগীয় কর্মচারীর আদালত হইতে শাসন বিভাগীয় কর্মচারীর আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কোন কোন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করেন যে, শাসন বিভাগের কর্মচারীরা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী যতটা চলিবেন বিচার বিভাগের কর্মচারীরা ততটা চলিবেন না। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের মন হইতে এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ঠিকভাবে আইন অনুসারে বিচার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন করিবার জন্য অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ আন্দোলন হইতেছে। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি লণ্ডনে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করিবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এদেশেও কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের বাহিরের বহু নেতা এই দাবী করিয়াছেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলগুলি নিজ নিজ প্রদেশের বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করিবার চেষ্টাও আরম্ভ করিয়াছিলেন। এদেশের গবর্ন্মেণ্ট বরাবর এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে কেন বাধাসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন উপরোক্ত মামলাদ্বয় হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রয়োজন হইলে গবর্ন্মেণ্ট নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী বিচার করাইবার সুযোগ হাতছাড়া করিতে অনিচ্ছুক এবং

দেখা যাইতেছে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকেই তাঁহারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

—

ঢেকিয়াজুলি গুলিচালনার মামলা

আসামের ঢেকিয়াজুলি গুলিচালনা মামলায় দণ্ডিত আসামীদের পুনর্বিচার প্রার্থনা করিয়া দরং-এর ডেপুটি কমিশনার কলিকাতা হাইকোর্টে যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি লজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ঘটনাটি ১৯৪২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঘটে। ঐ দিনে আসামে ঢেকিয়াজুলি থানার সম্মুখে প্রায় ২০০০ লোক সমবেত হয়। অভিযোগে বলা হয় যে, থানায় অনধিকারপ্রবেশ করিয়া তথায় কংগ্রেসপতাকা উত্তোলন করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। জনতাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আসামী কমলাকান্ত দাস পুলিসকে আক্রমণ করিয়া থানা দখলের জন্য জনতাকে আদেশ প্রদান করে। জনতা তদনুসারে নিরস্ত্র কনষ্টেবলদিগকে, সহকারী সব-ইনস্পেক্টর এবং সব-ইনস্পেক্টরকে আহত করে। এই সময় সশস্ত্র কনষ্টেবলদিগকে গুলি চালাইবার আদেশ প্রদান করা হয়। অভিযোগে বলা হয় যে, জনতা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের রাইফেল কাড়িয়া লয় এবং হেড কনষ্টেবল ও সাত জন সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর কনষ্টেবলকে আহত করে। গুলিচালনা চলিতে থাকে এবং অবশেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। ছয় জন মৃত ও ছয় জন আহত হইয়া পড়িয়া থাকে। অভিযোগে বলা হয় যে, হাঙ্গামাকারীরা চলিয়া যাইবার সময় তিনটি রাইফেল, কিছু গুলি এবং অন্য কিছু কিছু সম্পত্তি লইয়া যায়। অনেকের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করা হয়, তাহার মধ্যে কয়েক জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকে।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ ছিল এবং তাহারা থানা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র গুলি চালানো আরম্ভ হয় এবং এই সময়ে পুলিস কর্মচারী প্রহৃত হয়। তেজপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৪ জন খালাস পায় এবং কমলাকান্ত দাস ও অপর দুই জন দোষী সাব্যস্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন, "গুলি চালনার প্রয়োজন থাকিলেও তাহা নির্বিচারে অনিয়ন্ত্রিত এবং কাপুরুষোচিত ভাবে চালানো হইয়াছে।" দুই জন আসামীর দণ্ডকাল শেষ হওয়ায় তাহারা মুক্তি পায়; কমলাকান্তের দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয় নাই। দরং জেলার ডেপুটি কমিশনার আসাম উপত্যকার দায়রা জজকে মামলাটির বিষয় জানান। তিনি বলেন যে, আসামীরা আপীল করিলে তবে তিনি প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবেন। কমলাকান্ত আপীল করিতে অস্বীকার করে। ডেপুটি কমিশনার সাধারণ আদালতে দণ্ডিত এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত আসামীদের পুনর্বিচার বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন।

আসাম গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে ডেপুটি লিগাল রিমেমব্রান্সার গুলি চালনা সম্পর্কে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিন্দাসূচক মন্তব্য তুলিয়া দিবার জন্য আবেদন করেন।

রায়ে বিচারপতিদ্বয় বলেন যে, ১৯৪৩ সালের ১১ নং অর্ডিনান্সের দ্বারা স্পেশাল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি বিধিসঙ্গত করা হইয়াছে। ইহাও দেখা যায়, কয়েক জন আসামী পলাতক আছে। যখন সাধারণ আদালতে তাহাদের বিচার হইবে তখন আদালতের ঘটনা হইতে প্রকৃত তথ্য পাইবার সুবিধা হইবে। এই ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া মামলা নাকচের আদেশ দেন।

গত আন্দোলনের সময় পুলিস যে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বিচারে গুলি চালাইয়াছে ঢেকিয়াজুলির মামলা তাহার একটি প্রমাণ। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিন্দাসূচক মন্তব্য অপসারণে হাইকোর্টের অসম্মতি জ্ঞাপনের পর ঘটনাটি সম্বন্ধে পুনরায় তদন্ত করিয়া যে-সব পুলিস কর্মচারীর বেপরোয়া গুলি চালানোর ফলে ছয় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে তাহাদিগের দণ্ড বিধান করা দরং জেলার ডেপুটি কমিশনারের কর্তব্য। অবশ্য ন্যায়বিচারের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা আমলাতন্ত্রের নিকট আশা করা চলে কি না তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। মামলা সম্পর্কে যে আগ্রহ ও তৎপরতা ইহারা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শুধু আসামীদের পুনর্বিচার ও দণ্ড বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, না ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য? হাইকোর্টে নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির ব্যবস্থা না থাকিলে শাসন-বিভাগের দাপটে রাজনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করাও কঠিন। দেশের শাসন ব্যবস্থার যে দুর্গতি হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। হাইকোর্টের জজদিগের আক্ষেপেই তাহা প্রমাণিত হয়।

—

বাঙ্গালা দেশে মীর্জ্জা-রাজা মানসিংহ

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম্-এ

১

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিক বিক্রমাদিত্য ছিলেন; উজ্জয়িনীর রাজসভাও ছিল। রত্নগর্ভা ভারতজননী কালিদাস-বররুচি-বরাহ-মিহির প্রমুখ নব-রত্ন সত্যই প্রসব করিয়াছিলেন; কিন্তু সিপ্রাতীরে মহাকালের ক্রোড়ে উক্ত নবরত্নের একত্র সমাবেশ ঐতিহাসিক সত্য নয়। উহা প্রাচীন ভারতের আদর্শ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি;—অপূর্ণ বাসনার কল্পনা-বিলাস। কিন্তু মধ্যযুগের মোগল-বিক্রমাদিত্য আকবরের দরবার-ই-নব-রতন ষোড়শ শতাব্দীর জাতীয়তা-দৃপ্ত প্রবুদ্ধ ভারতের জাগ্রত স্বপ্ন নয়;—অতি সত্য ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। তোডরমল-মানসিংহ, ফৈজী-আবুলফজল, বীরবল-তানসেন, আব্দুর রহিম-আবুলফতেজীলানী ও চিত্রকর দসবন্ত শোভিত দরবার-ই-নবরতনের স্মৃতি এখনও ফতেপুর সিক্রীর দিবান-ই-খাস হইতে মুছিয়া যায় নাই। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিদ্বারা বিচার করিলে মনে হয় আকবর বাদশাহ শকারি বিক্রমাদিত্য হইতে ব্যক্তিত্ব, রাজনীতি ও পরাক্রমে ছিলেন শ্রেষ্ঠতর; তাঁহার দরবার উজ্জয়িনীর রাজসভা হইতে মহীয়ান্ এবং সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবপূর্ণ;—শৌর্য্য ও ললিতকলার অপূর্ব্ব সমন্বয়। গুণগ্রাহী ভেদবুদ্ধিহীন মোগল সম্রাট রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মে নবযুগের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ—ভারতের জাতীয়তার প্রতীক; তাঁহার দরবার সমসাময়িক ভারতের প্রতিচ্ছবি। রত্ন-আহরণে তিনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, হিন্দুস্থান-ইরাণ ইতরবিশেষ করেন নাই। অবতার-বাদী হিন্দু মহামতি আকবর ও রাজা মানসিংহকে কলিযুগের অবসানে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবতার জ্ঞানে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে।

খণ্ডশঃ বিভক্ত, হিংসাদ্বেষজর্জ্জরিত, পশুবল-প্রপীড়িত ভারতবর্ষে সাম্য-মৈত্রীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং নবমহাভারত সৃষ্টির সহায়কারীরূপে সেই অপ্রমেয় পুরুষ বিষ্ণুরূপী জলালদীন "জিষ্ণু" অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়াছিলেন; পার্থসারথির আহ্বানে পার্থরূপী মানসিংহ আবির্ভূত হইলেন—ইহা সংস্কৃতকাব্য 'মানপ্রকাশ'-রচয়িতা কবি মুরারিদাস রায়ের অলীক স্তুতি নয়—সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী উদার হিন্দুসমাজের অন্তরের বাণীর ঐতিহাসিক প্রতিধ্বনি। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা ঐতিহাসিক চরিত্র বিচার করিয়া থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক অংশ মানসিংহ এবং আকবরকে স্বাধীনতার শত্রু, সমাজের ও ধর্ম্মের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিত—ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। রাঠোর রাজকুমার কবি পৃথ্বীরাজ দেখিয়াছিলেন আকবর-রূপী অতল সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই গ্রাস করিয়াছে—বাকী শুধু মহারাণা প্রতাপ। ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিব্রত এই বাঙ্গালা দেশেও আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। বৃদ্ধ পুত্রশোকাতুর কেদার রায় সিংহবিক্রান্ত মানসিংহের-"সিংহ"ত্বের উপর ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—কচ্ছবাহ-পতি যথার্থ ই "সিংহ" বটেন; তবে বাদশাহী চিড়িয়াখানাই তাঁহার উপযুক্ত স্থান—মানুষের মধ্যে পশুরাজের গণনা হয় না। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> ভিনত্তি ভীমং করী-রাজকুম্ভং।
> বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকঃ॥
> করোতি বাসং গিরিবর শৃংঙ্গং।
> তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

অর্থাৎ ভীমকায় গজরাজের কুম্ভবিদীর্ণকারী, পবন অপেক্ষা দ্রুত দুর্ব্বারগতি, উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ-বিহারী হইলেও সিংহ পশুব্যতীত অন্য কিছু নয়।

২

রাজপুতানার "খ্যাত" বা চারণ-কবিতার ন্যায় বাঙ্গালা দেশের ঘটকগণ একশ্রেণীর অর্দ্ধঐতিহাসিক, অর্দ্ধসামাজিক ছন্দোবদ্ধ পুস্তিকা বা কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন। "চন্দ্রদ্বীপ-কারিকা" হইতে প্রতাপাদিত্য-মানসিংহ বিষয়ক কয়েকটি ছত্র* নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে বলিতেছেন—

> অয়ে রাজেন্দ্র ধর্ম্মজ্ঞ ইক্ষ্বাকু-কুল ভূষণ।
> কথং যবনদাসত্বং করোষি নৃপসত্তম॥
> ... ...
> যবনানাং যথার্থায় প্রতিজ্ঞা চ ময়া কৃতা।
> কথং বিঘ্নপ্রদানার্থমাগতো বঙ্গদেশকে॥

[হে রঘুবংশতিলক ধর্ম্মজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি কারণে যবন (মোগল) দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন? আমি

* ৺নিখিলনাথ রায়-কৃত 'প্রতাপাদিত্য,' পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।

যবন সংহারের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ। এই কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য বঙ্গদেশে আপনি কি হেতু পদার্পণ করিয়াছেন?]

অত্যন্ত লজ্জাযুক্ত হইয়া মানসিংহ ভূপেশ্বরকে বলিলেন—

কথং দূষয়সে প্রাজ্ঞ কলিং কিং ত্বং ন পশ্যসি॥
আগম্যতাম্ ময়া সার্দ্ধং দিল্লীশস্য চ সন্নিধিং।
সর্ব্বদোষাদ্বিনির্ম্মুক্তশ্চক্রপালো ভবিষ্যসি।

[হে ধীমান! আমার প্রতি কেন দোষারোপ করিতেছেন? কলিকাল আপনি কি প্রত্যক্ষ করিতেছেন না? আমার সহিত দিল্লীশ্বরের নিকট আগমন করুন। সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত হইয়া আপনি চক্রপাল পদ লাভ করিবেন।]

কেদার রায় মানসিংহের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তথা-লিখিত সতেজ সংস্কৃত পত্র ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য না হইলেও উহাতে বঙ্গবীরের অন্তরের বাণীর সত্যকার প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কখনও মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন নাই, বরং মোগলের অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। এই কারিকার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। ইহাতে মানসিংহ **জয়পুরাধীশঃ** বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, অথচ বর্ত্তমান জয়পুর স্থাপিত হইয়াছিল মানসিংহের মৃত্যুর প্রায় ১২০ বৎসর পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে। এই কারিকা-রচয়িতার মুসলমানবিদ্বেষ পলাশী-পরবর্ত্তী যুগের এক শ্রেণীর হিন্দু লেখকগণের এক প্রকার সংকীর্ণ স্বজাতিপ্রবণতা—দেশপ্রেমের নিন্দনীয় বিকৃতি। বারভূঁইয়া আমলের বাঙ্গালী পরস্পরকে কোনদিন হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে আধুনিক পাইকারী মাপে অবিশ্বাস করিত না, ধর্ম্মান্ধতা তাহাদের রাজনীতিকে সে-যুগে বিপথগামী করে নাই। উভয় সমাজের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতে ব্যক্তিগত শত্রুতা যেমন ছিল মিত্রতাও কম ছিল না, মুসলমান মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সৈন্যদল হিন্দু ভূঁইয়াগণের প্রধান ভরসাস্থল ছিল; প্রমাণ, ভুলুয়ার ভূঁইয়া অনন্তমাণিক্যের উজীর ইয়ুসুপ খাঁ বারলাস, প্রতাপাদিত্যের অতিবিশ্বস্ত সুচতুর সেনাপতি "কমল খোজা" [খাজা কামালউদ্দীন] এবং সুমন্ত্র [Envoy] শেখ বদী। ভারতবর্ষে ষোড়শ শতাব্দীর মোগল পাঠান-সংঘর্ষ একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—একথা ঐতিহাসিক সত্য এবং বাঙ্গালার স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমান ভূম্যধিকারীমণ্ডল মানসিংহ-ইস্লাম খাঁ প্রভৃতিকে দিল্লীশ্বরের পোষমানা সিংহ বলিয়া হয়ত ঘৃণা করিত; সুন্দরবনের ব্যাঘ্ররাজ কোনদিন সার্কাসের সিংহকে পশুরাজ মনে করিতে পারে না।

বাঙ্গালার বারভূঁইয়ার এই ঘৃণাদৃপ্ত মনোভাব এদেশের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ঐতিহাসিক ও কবিগণ বাঙ্গালার নবপ্রসূত জাতীয়তা অভিমানে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহিত্য ও ইতিহাসে নূতন রূপ দিয়াছেন। যিনি ইহার প্রতিবাদ করিবেন বাঙ্গালী আবালবৃদ্ধ হিন্দু-মুসলমান তাহাকে দেশদ্রোহী বাঙ্গালীকুলকলঙ্ক বলিয়াই গালাগালি করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী যতই মনোরম এবং জনপ্রিয় হউক না কেন, বাঙ্গালার সুবাদার হিসাবে রাজা মানসিংহকে উহার দ্বারা বিচার করিলে শাশ্বত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটিবে। দেশ, ধর্ম্ম ও কুলাভিমান নিরপেক্ষ হইয়া ইতিহাস বিচার না করিলে সত্যের সন্ধান কখনও মিলিবে না। যে-ইতিহাস দেশ, ধর্ম্ম ও জাতিপ্রেমের প্রেরণায় লিখিত হয় প্রচার-পুস্তিকা হিসাবে উহার মূল্য থাকিতে পারে, কোন সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজনও উহার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু উহার স্থায়ী মূল্য নাই। অখণ্ড ভারতে এক বিরাট্ ভারতসমাজ এবং একই ভারতীয় সংস্কৃতি-সৃষ্টির প্রেরণা যিনি সর্ব্বপ্রথম পাইয়াছিলেন, যাঁহারা এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ আকবর ও মানসিংহ প্রমুখ নবরত্নকে ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করাই একমাত্র সুবিচার এবং উহাই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস।

৩

রাজা মানসিংহের সুবাদারী আমলের (১৫৯৪-১৬০৬ ইং)* ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহার প্রমাণপঞ্জী সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ইতিহাসরসিকগণের নিকট নিবেদন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বাঙ্গালাদেশে মানসিংহ সম্বন্ধে সমসাময়িক কিংবা পরবর্ত্তী শতাব্দীদ্বয়ের মধ্যে কোন বাঙ্গালী হিন্দু কিংবা মুসলমান উল্লেখযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই।

বর্ত্তমান যুগের দ্রোণাচার্য্যপ্রতিম সর্ যদুনাথ জয়পুর-দরবারের পুরাতন দপ্তরখানা খুঁজিয়া মানসিংহ সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন। Baharistan-i-Ghaibi-প্রণেতা

* 39th year of Akbar's reign. *Akbarnama* iii 999, *Viceroyalty* of Bihar 1587. *Ibid.* p. 891

মীর্জ্জা নথনের মত কোন ঐতিহাসিক মানসিংহের আমলে বাদশাহী ফৌজের সহিত এদেশে আসিয়া থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালার সহিত দিল্লীর সদ্ভাব না থাকিলেও বাঙ্গালীকে নিজের কথা পরের মুখে, আবুলফজল নিজামুদ্দীন বদায়ুনীর নিকট হইতে শুনিতে হইবে। উক্ত ঐতিহাসিকগণের কথা খণ্ডন করিতে পারে এরূপ সমসাময়িক দলিলপত্র কিংবা মুদ্রার পাল্টা সাক্ষ্য বাঙ্গালী যত দিন উপস্থিত করিতে পারিবে না তত দিন ইতিহাসের একতরফা ডিক্রী আমাদের বিরুদ্ধে বলবৎ থাকিবে। আবুলফজল যাহা লিখিয়াছেন উহা ব্যতীত সব কিছুই অপ্রামাণ্য এ মনোভাব কিন্তু ধৃষ্টতা—নিছক গোঁড়ামী। আমাদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন কারণে আবুলফজলের শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল।* ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবনান্ত হয়। 'আকবর-নামার' শেষ অংশ ইনায়ৎউল্লা কিংবা অপর কাহারও দ্বারা সরকারী দলিল অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও আকবর-রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; ঐতিহাসিকের দৃষ্টি বাঙ্গালা হইতে দাক্ষিণাত্যের উপরই অধিক নিবদ্ধ; বাঙ্গালার বিবরণ স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং অশুদ্ধ।

'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' আবিষ্কারের পূর্ব্বে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেরূপ সীমাবদ্ধ ছিল মানসিংহের সুবাদারী আমলের ইতিহাস-জ্ঞানও বর্ত্তমানে তদ্রূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাহারিস্তান গ্রন্থে মানসিংহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। আম্বের রাজগণ মির্জ্জা-'রাজা' নামে ইতিহাসে পরিচিত। রাজা মানসিংহই যে প্রথমে মীর্জ্জা-রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন উহার উল্লেখ আকবর-নামায় নাই; সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ বাহারিস্তানেই পাওয়া যায়। আকবরের নবরত্নের মধ্যে কুমার মানসিংহ ও বৈরাম খাঁর পুত্র আব্দুর রহিম ছিলেন আকবরের বিশেষ স্নেহের পাত্র। সম্রাট্ তাঁহাদিগকে 'ফরজন্দ' বা পুত্র উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ছিলেন যুদ্ধ এবং রাজনীতি শাস্ত্রে আকবরের মন্ত্রশিষ্য—সেযুগের কর্ণার্জ্জুন। আকবর-চরিত্রের সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন এই মন্ত্রশিষ্যদ্বয়—শাহজাদা সলিম, মুরাদ দানিয়াল নহে; 'মান-প্রকাশ'-রচয়িতা লিখিয়াছেন—

মানেন সিংহো ভবিতেতি নূনং।
অবেক্ষ্য ক্ষৌণিপতিঃ কৃতজ্ঞঃ।
নাম্না রিপুব্রতে ভয়ঙ্করেণ
শ্রীমানসিংহং তনয়ং চকার।

রাজপুতের শৌর্য্য ও স্বামীধর্ম্ম, মোগলের উদারতা ও কূটনীতি এবং মুসলমানদের কার্য্যদক্ষতা ও 'আখ্‌লাখ্' বা সুমার্জ্জিত সামাজিকতার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ মানসিংহ চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া তাঁহার মীর্জ্জা-রাজা উপাধি সার্থক করিয়াছিল।

মাসির-উল-উমারায় লিখিত আছে আচারনিষ্ঠ হইয়াও তিনি সহকর্ম্মী মুসলমান আমীরগণের ভোজনের সময় উপস্থিত থাকিতেন। পারিবারিক কিংবা সামাজিক মোগলাই দস্তারখান্ (Dining-sheet) মাদ্রাজী কিংবা কনৌজিয়ার চৌকা নহে—ভব্যতা, শিষ্টাচার এবং সরস আলাপ-চাতুর্য্যের শিক্ষাকেন্দ্র—কোপ্তা কাবাব উহার উপলক্ষ মাত্র। এক দিন মানসিংহ বলিয়াছিলেন আমি মুসলমান হইলে প্রত্যেক দিন আপনাদের সঙ্গে অন্ততঃ একবার খানা খাইতাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইলেও মাসির-উল-উমারায় মানসিংহ-জীবনী উপেক্ষণীয় নহে।

৪

আজীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মানসিংহ লেখাপড়া হয়ত আকবর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী জানিতেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও পণ্ডিতপোষণে মুক্তহস্ততা আকবরশাহী পরিমাপেই ছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভক্তিবিলাস এবং জগন্নাথকৃত মানসিংহ—কীর্ত্তি—মুক্তাবলী কাব্যে (Aufrecht, II. 104) মানসিংহের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। কচ্ছবাহ-পতি মানসিংহের কাব্যানুরক্তির পরিচয় হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস 'মিশ্রবন্ধু-বিনোদ'-প্রণেতা লিখিয়াছেন—মানসিংহ স্বয়ং কবি এবং কবিগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। মানচরিত্র নামক একখানা হিন্দীকাব্য ১৬৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং মহারাজা মানসিংহ; আসলে তাঁহার আশ্রিত কবিগণ উক্ত জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। এ সময়ে বয়স ৬০ বৎসরের কিছু কম হইলেও ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া

† *Akbarnama* p. 1119,

ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা যায় মানচরিত্র প্রবাসী হিন্দী কবিগণ কর্তৃক বাঙ্গালা দেশেই রচিত হইয়াছিল।

অন্যের দ্বারা বই লিখাইয়া নিজের নাম জাহির করা রাজারাজড়াদের একটা বাতিক মোগল যুগে ছিল—এ যুগেও আছে বলিয়া শুনা যায়; বৈরাম খাঁ নগদ প্রায় সাড়ে নয় হাজার টাকা দিয়া নিজের নামে প্রচার করিবার জন্য একখানা ফার্সি কবিতা বা মসনবী কিনিয়াছিলেন। দানসাগর-প্রণেতা মহারাজ বল্লাল সেনের ন্যায় রাজা মানসিংহও এদেশে ঐ কার্য্যই করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে একখানি সংস্কৃত পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি ১৭৩৮ শকাব্দে শ্রীহট্টের দিনারপুর পরগণায় নকল করা হইয়াছিল। পুথির নাম 'তুলাপুরুষ দান প্রমাণ' বা 'তুলাপুরুষ পদ্ধতি'। আরম্ভে লিখিত আছে—

প্রণম্য গোবিন্দ পদারবিন্দ,
নত্বা গুরুংশ্চৈব
বিচার্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রানি দানসাগর সংহিতান।
ক্রীয়তে মানসিংহেন
তুলাপুরুষ পদ্ধতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিবিভাগে একখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে নাম 'সভারঞ্জন পুথি' (১১নং) বিষয়বস্তু কয়েকটি গল্প যাহা এ যুগে মনে মনে পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়; ভাষা ভারতচন্দ্রের সময়কালীন কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তীও হইতে পারে; রচনার কোন তারিখ নাই; রচয়িতা দ্বিজমোহন, গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে:—

সংগ্রাম সিংহের পুত্র মানসিংহ রাজা।
পরম ধার্ম্মিক রায় সুখী সব প্রজা।
খাজনা ছুকরা নাই ভুম যত খায়
নৃপতির চাইলে ধন————
প্রতাপে শশক শিবা করী পৃষ্ঠে ধায়।
মৃগশিশু বাঘিনীর কোলে ঘুম যায়।
দিবাভাগে রাজকার্য্য করে প্রজা সঙ্গ।
খেলোয়াতে বসি রাত্রে শুনেন প্রসঙ্গ।
————রাজা বড় রসিক সুজন
কাব্য শাস্ত্রে থাকে রাজা সতত মগন।
পাঠক লিখিত আছে পুরাণ পঠিতে।
নকলী চাকর আছে গল্প শুনাইতে।

দ্বিজমোহন রাজা মানসিংহের বাপের নাম ভুল করিয়াছেন—আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মানসিংহের প্রতাপ ও জবরদস্ত শাসন কবির অত্যুক্তি নহে। বাঙ্গালা বিহারে বদলী হইবার পূর্ব্বে কুমার মানসিংহ জালালাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই অদম্য কাবুলীগণকে তিনি হরিসিংহ নালুয়ার মত ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়াইয়াছিলেন। আকবর পাঠানগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র সংবরণ করিলেন এবং প্রয়োজন বোধে সেই ব্রহ্মাস্ত্রই দুর্দ্ধর্ষ ভোজপুরিয়া, উড়িষ্যার কতলু লোহানী, এবং বাঙ্গালার বার ভূঁইয়ার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সভারঞ্জন পুথির গল্পগুলি যদি সত্যই মানসিংহ হজম করিয়া থাকেন তবে আমরা তাঁহার সুরুচির প্রশংসা করিতে পারি না। আকবরী দরবারের রাজা বীরবল ও মোল্লা দোপেয়াজা বাঙ্গালা দেশে ছিল না—এ দেশে গোপাল ভাঁড়ই জন্মিয়াছে। মানসিংহ বোধ হয় ঐ রকম কয়েকটা "নকলী চাকর" যোগাড় করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতেন।

রাজা মানসিংহের আমলে কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। এক দিকে কবির দুর্দ্দশা, ঐ সময়ের কুশাসন ও অত্যাচারের বিভীষিকার ছায়া; অন্য দিকে মোহন কবি বর্ণিত রামরাজ্য—এই আলোছায়ার মধ্যে কোন্‌টি ঐতিহাসিক সত্য? ঐতিহাসিক কোনটিই অবিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ জগতের সর্ব্বত্রই আলোছায়ার খেলা। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের মানসিংহ খণ্ডের ঐতিহাসিক সমালোচনা স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

এক মাসেও রামচন্দ্রের চেহারার বিশেষ উন্নতি হইল না। যোগমায়া মনঃক্ষুন্ন হইয়া প্রায়ই বলেন, কই, তোমার চেহারা সারছে না তো?

রামচন্দ্র বলেন, বল কি? বুড়ো বয়সের চেহারা কি যুবার মত হবে! আগে কত ক'টি ভাত খেতাম বল দেখি।

—না গো, মুখ তোমার তেমনি শুকনো শুকনো।

—আগেকার মত আপিস থেকে এসে কি বিছানায় শুয়ে পড়ি?

—রংও তামাটে হয়ে রইল! তুমি ভাল কবিরাজ দেখাও।

—দেখাব—দেখাব। আর ন'টা মাস যেতে দাও, যত ইচ্ছে কবিরাজ এনে জড়ো কর—কিছুটি বলবো না।

যোগমায়ার মন প্রবোধ মানে না। এই অগ্রসরোন্মুখ শীর্ণতার মধ্যে—ক্রমবর্দ্ধমান পাণ্ডুতার মধ্যে বার্দ্ধক্য বুঝি আসিয়া গেল! বার্দ্ধক্য আসুক—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার পিছনে কালদণ্ড হাতে মহাকালের ছায়াটিও যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। হাতের নোয়া মাথায় ঠেকাইয়া যোগমায়া কোন্ অলক্ষিত দেবতার উদ্দেশে এই সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। চুলের শুভ্রবিন্দুর মাঝে সিন্দুর-রেখা তখনও জল জল করে। শেষরাত্রির শুকতারাকে সূর্য্যের আলোকে ধরিয়া রাখা দায়, আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়া নিত্য সে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়! আকাশের তারা দেখিয়া তো মনকে বুঝানো যায় না।

একদিন মাত্র বুড়িগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন যোগমায়া। স্নান করিয়া তৃপ্তি হয় নাই। এই চওড়া খালকে গঙ্গা নাম দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে যেন খর্ব্বই করা হইয়াছে। জলের সে রং নাই, জলে সে স্রোত নাই। দু'ধারে পলিমাটি আস্তৃত তীর-ভূমির সেই মন-ভুলানো রূপই বা কোথায়? ঐ সুসজ্জিত ভাউলিয়াগুলি নদীর শোভা বাড়াইয়াছে বটে, পাল তোলা নৌকার তরতরে গতির কাছে এ গুলিকে নিষ্প্রাণ বলিয়াই বোধ হয়।

রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, কেমন সুন্দর নৌকা দেখেছ এখানে! যেন ঘরবাড়ি।

সুগঠিত নৌকাকে প্রশংসা করিয়াছেন যোগমায়া—মন ভরে নাই। এই গঙ্গাকে লইয়া খেলা করা চলে, পূজা করা চলে না।

নিত্য অনুযোগ করেন যোগমায়া, চিরটা কাল বিদেশেই থাকবে? দেশ কি তোমাদের জন্যে নয়?

অন্নগত-প্রাণ কলির জীব আমরা—দেশ আমাদের চাকরিস্থল।

এখানেও রাত্রি আসে। পূর্ণিমার চাঁদ বুকে করিয়া আকাশের সঙ্গে এই নবাবী আমলের শহরও মাঝে মাঝে স্বপ্নাতুর হয়। সেই জ্যোৎস্নালোকিত তিথিগুলিতে ক্ষুদ্র বাসাবাড়ির দ্বিতলের জানালা খোলা থাকে। খণ্ড আকাশের গায়ে, সেই জানালা ভেদ করিয়া, দুইজোড়া স্বপ্নালস দৃষ্টিও মাঝে মাঝে আসিয়া পড়ে। চিরনূতন চাঁদের সঙ্গে—চিরনূতন আকাশের খেলায় চিরনির্ম্মল নক্ষত্রগুলিও যেন মাতিয়া উঠে। মতিয়া উঠে চিরনূতন আত্মা—পুরাতন দেহের মাঝে।

যোগমায়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ান। শোভা দেখিতে নহে, জানালা বন্ধ করিতে।

রামচন্দ্র বলেন, আর একটু খোলা থাক, মায়া, বেশ লাগছে।

—না। শরৎ কালের ঠাণ্ডা লাগলে অসুখ করে। কাল থেকে তো খালি কাসছ।

—বুড়ো বয়সের কাসি সঙ্গের সাথী।

—হাঁ—তা বৈকি, বদ্যি দেখালে আবার অসুখ সারে না!

—তাহলে ভাল ভাল ডাক্তার থাকতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছেলে মারা গেল কেন?

—তোমার এই কথা! আয়ু যার নেই—

আয়ু! হাসিয়া রামচন্দ্র তর্ক করিতে চান।

যোগমায়া ধমকের সুরে বলেন, থাম, খুব বীর পুরুষ!

—রামচন্দ্র অন্য কথা পাড়েন, গৌরীকে ঢাকায় আসতে লিখে দাও বরঞ্চ। এদিকের শহরটা দেখে যাক।

—ছাই শহর। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এখানে কেন আসবে। প্রথম বার এত দূরে আসে কখনও?

—প্রথম বার ত বাপের বাড়ি আসা নিয়ম। তোমাদের মেয়েলি শাস্ত্রে বলে না?

—বলেই ত। ঢাকা ত আর বাপের বাড়ি নয়।

—আহা—যেখানে বাপ মা থাকেন সেইখানেই—

—ব্যাখ্যানাতে কাজ নেই, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে না?

—দাও। মোগলের হাতে পড়েছি যখন—খানা খেতে হবে বৈকি।

—আচ্ছা, ওষুধ খেতে অত ছেলেমানুষি কর কেন?

—কেন করি জান? একটু থামিয়া বলিলেন, না, বলব না, শুনলে তুমি দুঃখ পাবে।

—হোক দুঃখ—বল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, ওষুধ দেখলেই আমার শেষ দিনের কথা মনে পড়ে।

—যোগমায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কক্ষত্যাগ করিতে গেলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, চোখে জল এল ত? আহা—শোনই না।

অল্পক্ষণ পরে যোগমায়া ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, মানুষের মজাই এই—কঠিন কথা সে শুনতে চায় না। শুনতে পারে না। যা একদিন ঘটবেই—তাকে ভয় করলেই কি ঠেকিয়ে রাখা যায়, মায়া?

যোগমায়া উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রের পানে চাহিলেন। সে চাহনিতে ভৎ'সনা ছিল না, অনুযোগ বা আশঙ্কাও ছিল না—সে চোখের তারায় ও পাতার কোলে আশ্বাসহারা সুকোমল দিব্য দৃষ্টির জ্যোতি ঝলমল করিতেছিল। যাহা ঘটিবে তাহা যেন যোগমায়ার অজানা নহে, যাহা আসিতেছে তাহার পদধ্বনি বহুদিন হইতেই শুনিতেছেন তিনি, এবং যাহা লইয়া এত আশঙ্কা অকল্যাণের বিভীষিকা তাহাকে জয় করিবার মন্ত্রটিও যেন তাঁহার জানা। কয়টি নারী আর অবৈধব্যের শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া অমৃতানন্দ পান করিতে পারেন!

পরদিন অবুঝ হইয়া উঠিলেন যোগমায়া। কহিলেন, আমার আর একদণ্ডও ভাল লাগছে না এখানে, বাড়ি চল।

—চাকরি ছেড়ে দেব?

—দাও। প্রশান্ত স্বরে যোগমায়া উত্তর দিলেন।

—মায়া—

—না না,—তুমি বাড়ি যাবে কি না। যদি বাড়ি না যাও—আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব এখানে।

রামচন্দ্র তাঁহার কাছে আসিয়া মাথার উপর ডানহাতখানি ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, হঠাৎ এমন করছ কেন? কি হ'ল তোমার?

—জানি না। রামচন্দ্রের বুকের মাঝে মাথাটি গুঁজিয়া দিয়া প্রথম যৌবনের অভিমানিনী যোগমায়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন যোগমায়া। দুই একবার বৃথা সান্ত্বনা দিতে গিয়া রামচন্দ্র আর সে চেষ্টা করিলেন না। যোগমায়ার এই উত্তাল কান্নার স্রোত তাঁহার রুদ্ধ বুকের দুয়ার খুলিয়া সেখানেও প্লাবন আনিয়া দিল। এ ত কান্না নহে, এ ঘরে ফিরিবার আকুল আহ্বান। দিন বুঝি শেষ হইয়া আসিল, সূর্য্য পাটে বসিবেন। কিন্তু অস্তাচল-চূড়া রাঙাইয়া আকাশকে ভালবাসিয়া সেখানেও একটি রূপলোক সৃষ্টি করিয়া তবে না তাঁর গৌরবময় অস্ত-অভিযান। অকাল বর্ষার মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশে যে-দিন দিনদেব অন্তর্হিত হন—সে-দিনের শোক রাত্রির অন্ধকারেও চাপা পড়ে না।

যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের চোখের উপর শান্তিপুরের সেই দ্বিতল বাড়িখানি ভাসিয়া উঠিল। বনের মধ্যে মহিমময়ী মায়ের রূপলাবণ্যভরা মূর্ত্তিখানি লইয়া সেই বাড়িখানি ভাসিয়া উঠিল। সেই বাড়ি হইতে অতীতের অনেক ঘটনা—অনেক স্মৃতি পল্লববাহু-আন্দোলিত বনস্পতির মতই নিকটে আসিবার আকুতিতে মুখর হইয়া উঠিল।

যোগমায়ার অশ্রুকলুষিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, কালই ছুটির দরখাস্ত করে দেব—মায়া।

—পদ্মার বুকে আবার ষ্টীমার ভাসিয়াছে। পদ্মার কূলে কূলে সুপারি-নারিকেল-শ্রেণী-চিহ্নিত গ্রামগুলি আবার দেখা দিয়াছে। যাত্রীদের কোলাহলে সেই ষ্টীমারে আবার নানা সংসারের বিচিত্র কলরব উঠিয়াছে। পদ্মার ঢেউয়ের মত সেই অস্ফুট কলরবের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিস্ময় বাড়িয়াই চলিয়াছে। যোগমায়ার মন আজ পদ্মার মতই পরিপূর্ণ। দু'চোখ ভরিয়া দিগন্তলীন মাঠের শ্যামরূপ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন, দেখ—দেখ জলের কূলকিনারা নেই। কি সুন্দর!

শরৎকালে পদ্মার ধার এমনই মনে হয়। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যেতে নৌকা লাগে। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন।

—সাপের ভয় আছে তো?

—আরও অনেক ভয় আছে! তবু ওরা সুখী।

ভয়ের কথা যোগমায়ার ভাল লাগে না। বলিলেন, বাড়ি গিয়ে রোজ ভোরবেলায় তোমায় গঙ্গা স্নান করতে হবে কিন্তু। শুনেছি প্রাতঃস্নানে অনেকের অনেক রকম রোগ সেরেছে।

—আর সকাল সকাল খাওয়া?

—ওখানে তো সকাল-সকাল বাজার বসে না, বারোটার কম খাওয়া হবে না।

—আর?

—আর কি? ভ্রূভঙ্গী করিয়া যোগমায়া বলিলেন, আর গুচ্ছেক মাছ বা তরিতরকারী এ-ও চলবে না।

—কি করব বল—ঢাকায় তো হরেকরকম তরকারী মেলে না, যা করে মাছ আর দুধ।

—দুধ খেলে বুঝি অসুখ করে?

—তবে মাছ খাওয়াটাই বুঝি দোষের?

—তোমায় নিয়ে আর পারি না, যা ইচ্ছে কর। ওদিকে জুল্ জুল্ করে তাকাচ্ছ যে?

—খালাসীরা কেমন চাকা চাকা করে ইলিশ মাছ কুটছে—দেখে লোভ লাগছে।

—এমনও পেটুক! ওদের রান্না তুমি খেতে পার?

—কেন পারব না। সেবার ষ্টীমারে আসবার সময়—

—খুব হয়েছে। বেশি বয়স হলে—মন্তর না নিলে মানুষের এমন ধারাই হয়। বিমলের আর দোষ কি!

—বিমল আবার করলে কি?

—তোমারই ছেলে তো। ঘরের রাঁধা আলুর দম ছেলেবেলায় ওর ভাল লাগতো না। এখন কলকাতায় কি মাংস-টাংস খায়—কে জানে!

—খাক না, তবু গায়ে একটু জোর হবে।

—জোর কত, বাতাসে উড়ছেন ছেলে। কথায় কথায় শরতের কথা আসিয়া পড়িল।

যোগমায়া বলিলেন, গায়ে জোর নেই—ওরা স্বদেশী করে কি ক'রে বল তো?

—গায়ের জোরটাই সব নয়—মায়া। মন ওদের তাজা।

—তুমিও ওসব কাজ ভালবাস নাকি?

রামচন্দ্র কথা কহিলেন না।

যোগমায়া ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, চুপ করে রইলে যে?

—আমি ওসব বুঝতে পারিনে—মায়া। বুঝতেই যদি পারব তো কোর্ট ইন্‌সপেক্টরের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলাম কেন? আমি ছেলেবেলা থেকে গরিব হওয়ার দুঃখ জানি; অনেক কষ্ট ভোগ করেছি—তাই সেই দুঃখ দূর করতেই সারা জীবন চেষ্টা করলাম।

যোগমায়া বলিলেন, সংসারের দুঃখ দূর করতে সবাই চেষ্টা করে, তাইতেই তো মানুষের শান্তি।

রামচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, বাড়ি থেকে ঢাকা যাওয়া-আসার কালে দু'ধারের এই গাঁগুলো দেখে আমার খালি মনে হয়—এই দেশের দুঃখ দূর করতেই কি ওরা নতুন মন্ত্র উচ্চারণ করে—নতুন গান বেঁধে চীৎকার ক'রে গলা ফাটায়! এমন সোনার দেশকে নিয়ে ওরা হৈ চৈ করে কেন বুঝি নে। আগেকার কালে ধন নিয়ে লোকের সুখ ছিল না, রূপসী বউ নিয়ে লোকের শান্তি ছিল না, দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক গাছের পাতা খেয়ে থাকতো—

—আগেকার কথা বাদ দাও। এখন হাঁড়ির মিষ্টিগুলো হাঁড়িতেই পচবে—না মুখে উঠবে?

—নিশ্চয় মুখে উঠবে—কৈ, দাও।

জলযোগ হইলে যোগমায়া রহস্য করিলেন, ভাজা ইলিশ মাছের জন্ম প্রাণ কাঁদছে না তো?

—কাঁদলেই বা উপায় কি! মিষ্টি খাইয়ে পেট ভরালে বটে—জাত রক্ষে করতে পারলে না।

—কেন, ওতেই তো জাত রক্ষে হ'ল।

—কৈ আর হ'ল! ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের কাজ হয়ে যাচ্ছে।

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে রামচন্দ্রের হাতে একটি পানের খিলি তুলিয়া দিলেন।

আমবাগানের মধ্যে ট্রেন আসিয়া থামিল। শরতের খর রৌদ্রভরা দুপুর।

যোগমায়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—বাঁচলাম!

৬

বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোগমায়ার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড সদর দরজায় ক্ষুদ্রকায় একটি তালা ঝুলিতেছে।

ঘোড়ার গাড়ির শব্দে পাড়ার কয়েকটি উলঙ্গ শিশু ছুটিয়া আসিয়াছে। খানিক পরে দুই একজন বর্ষীয়সীও দেখা দিলেন।

—ওমা, দিদি কখন এলে? এই আসছ? শোননি?

শুষ্কস্বরে যোগমায়া প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে? এদের কি অসুক-বিসুক—

—না না, অসুখ হোক শত্রুর। একদিন সন্ধ্যে বেলা বেয়াই এলেন। এসে দেখেন, এত বড় বাড়িটায় বউমা ঘরে দুয়োর দিয়ে রয়েছেন—আর জনপ্রাণী নেই। অনেক ডাকাডাকিতে তবে বউমা দুয়োর খুললেন।

—কেন, বাড়ি আগলাতে ভূষণের বউকে রেখে যাইনি? সে শুতো না রোজ?

—শোবে না কেন দিদি, রাত্ত করে আসত। কোথায় রামায়ণ হচ্ছে—তার শোনা চাই, কোথায় কথকতা হচ্ছে যাওয়া চাই। কে জানে রাত দশটা—কে জানে বারোটা। কচি বউ, একলা এই নিবন্দ্যি পুরীতে থাকতে পারে কখনও?

এমন সময় খবর পাইয়া চাবি হাতে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে ভূষণের বউ আসিল।

আজ এই মাত্তর তোমাদের পত্তর পেলাম, মা। পেয়েই ছুটতে ছুটতে আসচি।

গম্ভীর মুখে যোগমায়া চাবি লইয়া দুয়ার খুলিলেন।

প্রতিবেশিনী কথা কহিতে কহিতে যোগমায়ার অনুসরণ করিলেন, মেয়েকে একলা দেখে বেয়াইয়ের হ'লো রাগ। ভূষণের বউকে কি সব যাচ্ছেতাই করলেন। তার পরদিন সকালেই মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

যোগমায়ার কানে সে কথা প্রবেশ করিল কি না—কে জানে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি বাড়ির চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। উঠানে জঙ্গল ঘন হইবার উপক্রম হইয়াছে, শসার মাচাটা ভাঙ্গিয়া প্রাচীরের পাশেই হেলিয়া পড়িয়াছে, গাছ মরে নাই—তবে একটিও ফল আর গাছে নাই। অপরিষ্কার বারান্দা—কড়ি বারান্দায় ঝুলের রাশি, কতকগুলি ইটে নোনা ধরিয়া এখানে-ওখানে বালির চাপ খসিয়াছে।

—হাঁরে—ভূষণের বউ, তুই তো বাড়িতে ছিলি, না মরে গিয়েছিলি? একটু ঝাঁটপাট করতেও কি গতরে শুঁয়োপোকা লাগতো!

—ঝাঁট তো রোজ দিতাম মা। যে তোমার উঠোনে ধুলো—আর যে ঝড়টা গেল—

—থাম—থাম, ঠিক দুপুর বেলায় কতকগুলো মিথ্যে কথা বলিস নে। বাড়ি ঝাঁট দিতে তো তোকে রেখে যাইনি—রেখে গিয়েছিলাম রামায়ণ-মহাভারত শুনতে।

—ওমা, কোন গতরখাগি বলেছে একথা। হাউ হাউ করিয়া ভূষণের বউ কাঁদিয়া উঠিল।

তাহাকে ধমক দিয়া যোগমায়া নিজের হাতে ঝাঁটা তুলিয়া লইলেন। ভূষণের বউ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত হইতে ঝাঁটা

কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এই তেতে পুড়ে এলে—এখন কি—

—যার কপালের লেখা জলে পুড়ে মরা তাকে ঠেকাবে কে? দে—ঝাঁটা দে। অমন আলগোছে আলগোছে ঝাঁট দিলে কখনও ধুলো যায়! সর।

সে বেচারি সরিয়া দাঁড়াইল।

রামচন্দ্র জিনিসগুলি গুছাইয়া কতক বারান্দায় তুলিলেন, কতক বা ঘরে পুরিলেন। এক সময়ে রহস্য করিয়া বলিলেন, বলি ঝাঁট দিলেই কি আজ পেট ভরবে? তার চেয়ে বরঞ্চ—

যোগমায়া মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন, যা হোক জলটল তো খাওয়া হয়েছে—অবেলায় আর রাঁধব না। একেবারে রাত্তিরে ভাত খাওয়া যাবে।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রাণটা কিন্তু ভাত ভাত করছে।

ধন্যি বাপু, একটি বেলা ভাত না খেয়ে তোমার কাটে না। এমন পেটনাদ্‌রা মানুষ! ঝাঁটা ফেলিয়া যোগমায়া ইদারা তলায় চলিয়া গেলেন।

ভূষণের বউ বলিল, সকালে ঘর নিকিয়ে রেখেছি মা। বলতো আকার আগুন দিয়ে দেই।

—তোমার নিকুনোয় হবে কিনা। ভাল করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে—বলি গঙ্গাজলটল আছে তো ঘরে? না—

—পরশু এক কলসী জল যে এনেলাম মা। বলি শুটু করে কবে যে আসবে!

অপরাহ্ন বেলায় খাওয়া সারিয়া যোগমায়া আর শয়ন করিলেন না। উঠানের জঞ্জাল সাফ্ করিতে লাগিয়া গেলেন। আগাছা সাফ্ করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত গেল। বাহিরের দুয়ারে দু'টি গরু আসিয়া হাম্বা রবে ডাকিতে লাগিল।

—ওমা, একি ভাগাড় মূর্ত্তি গো! ঘরে ডাঁই করা খোল রয়েছে—পালা ভর্ত্তি বিচিলি রয়েছে—একটা শানিও বুঝি বাছাদের মেখে দেয় নি গো! পরে আর কত করে বল। গজ গজ করিতে করিতে যোগমায়া গোয়ালে গরু বাঁধিলেন। সন্ধ্যা দেখাইয়া যখন উপরের ঘরে আসিলেন—তখন দালানের চেয়ারে হেলান দিয়া রামচন্দ্রের একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে।

ভরসন্ধ্যেবেলায় মানুষের ঘুম দেখেছ! ওগো শুনছ?

—অ্যাঁ! কেমন ঘুম ধরে গেল। বারান্দায় বসে বসে দেখছিলাম ওই গাছপালাগুলো; ভারি মিষ্টি লাগছিল মায়া।

—তবু তো বাড়ি আসতে মন সরে না।

—সাধে কি আর···আরে ওকি! মাথায় তোমার একমাথা ঝুল যে!

—কি করি বল— একমাসে বাড়ির দশা হয়েছে যেন মা-মরা বাপে-খেদানো ছেলের মত। পরের মার ভালবাসা আর আলুনি তরকারি কথায় বলে না! আবাগীরা যেন বাড়িটার সঙ্গে যুদ্ধু করেছে। পশ্চিম দিকের কার্ণিশটা ভেঙেছে—আর মাঝখানের থামের চূণ বালি খসিয়েছে।

—এখন কি কি কাজ হ'ল?

—যা গতরে কুলুলো তাই হ'ল। বাড়ির এমন অবস্থা দেখে কি আর আজ ঘুমুতে পারতাম!

—একটু বসবে?

একটা টুল টানিয়া যোগমায়া বসিলেন। পূবের দিক হইতে আধখানা চাঁদ উঁকি মারিতেছে। আলোটা তত প্রখর নহে—গাছের মাথায় পাতলা একখানি হিমের চাদর বিছানো; সেই চাদরে ছাঁকা বলিয়া চাঁদের আলো কেমন স্তিমিত দেখাইতেছে। যোগমায়ার মনে খুসীর সুরটুকু আমবাগানে ট্রেন থামিবার সঙ্গে সঙ্গে—রাগিণীময় হইয়া উঠিয়াছিল, বাড়িতে পা দিবামাত্রই সেই সুরের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। বাড়ির এই দুরবস্থা দেখিয়া মন তাঁহার খারাপ হইয়াছে, না বউয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি বেদনা অনুভব করিতেছেন—সে কথা বলা শক্ত। ভূষণের বউকে অনেকগুলি কড়া কথা শুনাইয়াও তাঁহার ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই।

রাত্রিতে প্রদীপ নিবাইয়া শুইবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র বলিলেন, কালই বউমাকে আনবার জন্যে বেয়াইকে একখানা চিঠি লিখতে হবে।

—না। যোগমায়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিলেন।

—সে কি—জানাব না তাঁকে?

—না। সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

রামচন্দ্র বিস্মিতভাবে খানিক যোগমায়ার পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে কি বলিবার উপক্রম করিতেই যোগমায়া বলিলেন, মেয়ে নিয়ে যাবার সময় বেয়াই কি জানিয়েছিলেন আমাদের?

—তাঁর জানাবার সুবিধা ছিল না।

—ছিল। তবু তিনি খবর দেওয়া উচিত মনে করেন নি। যাক, তিনি বেশ করেছেন। আমরাও যা বুঝবো—

—কিন্তু কুটুমের সঙ্গে কি মনান্তর করা ভাল?

যোগমায়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, পরে ধীরস্বরে বলিলেন, লোকেরও বিবেচনা থাকা দরকার। যাদের আক্কেল থাকে না—তাদের আক্কেল দিতে হয়।

—বউমা ছেলেমানুষ, একলা এই বাড়িতে—

—আমি যখন এ বাড়িতে আসি—তখন ক' বছর বয়স ছিল আমার? বরণের সময় ভয়ে শাশুড়ীর আঁচল চেপে ধরেছিলাম।

—তবে?

—তের বছর বয়সে—আমায় ফেলে শাশুড়ী বাঁড়েশ্বরে গেছেন জল দিতে। তারকেশ্বরে গেছেন হত্যে দিতে। বুড়ো পিসিমাকে নিয়ে এই ভাঙা বাড়িতে রাত কাটিয়েছি।

—তবু তো পিসিমা ছিলেন।

—ষোল বছরে বিমল কোলে যখন বাপের বাড়ি থেকে এলাম —তার সাত দিন পরে বাঘনাপাড়ায় গোপেশ্বরের পুজো দিতে গিয়ে শাশুড়ী তিন দিন বাড়ি-ছাড়া হয়ে রইলেন। কাটাই নি

কটি ছেলে নিয়ে একলা বাড়িতে? বউমার বয়স এই ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পড়েছে।

থমথমে আওয়াজ যোগমায়ার। মনের গভীর দুঃখ ও অভিমানে সে স্বর যেমন ভারি—তেমনি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। সে তো অভিযোগ নহে—স্পষ্ট নির্দ্দেশ। যে নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের যুক্তিগুলিকে দাঁড় করানো শক্ত। প্রদীপ নিবাইয়া যোগমায়া মেঝের উপর মাছুরটা একটু টানিয়া লইলেন। খস্ খস্ করিয়া একটু শব্দ উঠিল মাত্র। শব্দটা মাছুরেরই—দীর্ঘনিশ্বাসের নহে।

খানিক পরে রামচন্দ্র ডাকিলেন, মায়া?

দেওয়ালে একটা টিকটিকি—টিক্ টিক্ ধ্বনি করিয়া উঠিল—যোগমায়ার দিক হইতে কোন সাড়া আসিল না। বোধ হয় তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

যোগমায়া সে-দিন প্রায় শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছিলেন। কাঠের আগুন বুকের মাঝে জ্বালাইয়া নিশ্চিন্তে সুখনিদ্রা দেওয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার নহে। অপমানের উত্তাপে অশ্রু তখন উপাধান ভিজাইয়া দিতেছে। এই বাড়িকে যে অবহেলা করিতে পারে—যোগমায়ার কাছে তাহার নিষ্ঠুরতার তুলনা নাই। বাড়ির মর্য্যাদাকে নিজের মর্য্যাদা হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিবার অবসর যোগমায়া কোনদিন পান নাই। বাড়ির অঙ্গে যতখানি ক্ষত—যোগমায়ার আঘাতপ্রাপ্ত মন সেই পরিমাণেই রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েক দিন পরে গৌরী আসিলে যোগমায়া খানিকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

গৌরী একা আসে নাই—সঙ্গে জামাই আসিয়াছে। একা বলিয়া যোগমায়া কোন দিন ক্ষোভ করেন নাই, খাটুনি লইয়া অভিযোগ জানাইবার কথাও তাঁহার মনে হয় নাই কখনও। এমন অনেকে আছেন—অভিযোগ জানাইবার লোকাভাববশতঃ নিজের মনেই দিনরাত বকিয়া সে অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, সে স্বভাব যোগমায়ার নাই।

রামচন্দ্রকে বলিলেন, বাজারে ভাল মাছটাছ পাও তো এনো। আর ময়রার দোকান থেকে কিছু ভাল সন্দেশ ও সিঙ্গাড়া কচুরি ভাজিয়ে আন। তোমার জামাইয়ের আবার চা খাওয়া অভ্যাস আছে।

—চা খাওয়া অভ্যাস আমারও ছিল।

—তুমিও চা খেতে! কৈ, এক মাস ঢাকায় রইলাম একদিনও তো—

সে কি আর আত্মনেপদী! তোমার বেয়াইয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে রোজই এক কাপ—

—ওসব বদ্ অভ্যাস না থাকাই ভাল। বলিয়া সে কথার নিষ্পত্তি করিয়া যোগমায়া পিছন ফিরিলেন। পরে কি ভাবিয়া পুনরায় মুখ ফিরাইয়া হাসি টানিয়া বলিলেন, দেখ—যদি মন খুঁৎ-খুঁৎ করে, বেশি করে জল গরম করতে বলি গৌরীকে। সব জিনিসের পার আছে, নেশাকে তো—

—মা মা। ও নেশা অনেকদিন ত্যাগ করেছি। রামচন্দ্র সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

—হঠাৎ ধরলেই বা কেন—আবার ছাড়লেই বা কেন শুনি?

—ধরেছিলাম পাঁচ জনের অনুরোধে। সবাই খায়, খেতে খেতে গল্প করতাম। ওঁদের সামনে কাপ হাতে না নিয়ে কেমন লজ্জা লজ্জা করত। আর ছাড়লাম—ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার তাগাদায়।

—তাই বল। হাসিয়া যোগমায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

—হাঁরে গৌরী, তোদের খাওয়া-দাওয়া এখনও সেই রকম আছে? ওঁরা খুব মাংস খান তো?

—খান বৈকি মা। উনিও আজকাল মাংস না হ'লে ভাত শ্রীবিষ্ণু করেন না।

—তোর শ্বশুররা বুঝি শাক্ত?

—হবে। আমার তো এখনও মন্তর হয় নি।

—বলি বাড়িতে কালী পুজোটুজো হয় না?

—কোন পুজোই তো হতে দেখি নি। শাশুড়ী এখনও মন্তর নেন নি।

—বলিস কি! চল্লিশ বছরের বুড়ো মাগী...সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তাহ'লে ওঁকে কিছু মাংস আনতে বলি, তুই বরঞ্চ রাঁধিস।

—কেন—তুমিই রেঁধো মা। তোমার হাতের রান্না কতকাল খাই নি।

—না বাপু, তোদের হালফ্যাসানের গুচ্ছেক পেঁয়াজ দিয়ে রান্না আমি পারি নে, গা বমি বমি করে।

গৌরী একটু থামিয়া নত মুখে বলিল, বাবাকে বল না—ভাল ইলিশ মাছ যদি পাওয়া যায়।

—কার্ত্তিক মাসে কি আর ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে! দেখি ওঁকে বলে। হাঁরে, সাধটাধ ওঁরা দিয়ে পাঠিয়েছেন বুঝি?

ঘাড় হেঁট করিয়া গৌরী সলজ্জ মৃদু স্বরে বলিল, হাঁ।

—তা হোক, পাঁচখানা ভাজাভুজি করে এখানেও একদিন সাধ দিতে হবে। তা সাধে ওঁরা কি কাপড় দিলেন?

—কি সিল্কের শাড়ী।

—কালই ঘরামি ডাকিয়ে ওদিককার রোয়াকে একখানা চালা তোলাতে হবে। যাই, কত কাজ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় আছে কি?

—মা?

গৌরীর ডাকে ফিরিয়া বলিলেন, কি রে?

—আমার একটা কথা রাখবে?

যোগমায়া বিস্মিত হইয়া গৌরীর পানে চাহিয়া হাসিলেন, যেন কত দোষঘাট করেছিস—এমনি তো মুখের চেহারা।

যেই করুক—দোষঘাটের কথাই ত। মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া ঢক করিয়া সে কহিল, বউকে আনাও না। একা একা ভাল লাগছে না।

যোগমায়ার মুখ তেমন গম্ভীর হইল না। লঘু স্বরে তিনি কহিলেন, আমরা ত তাঁকে পাঠাই নি।

—ছেলেমানুষ বউ—

—তা জানি। তার ঘরদোর সে এসে বুঝে নেবে না ত আমি রেহাই পাব কি করে! ওদের নিরু এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, বলিস ত তাকে আসতে বলি দুপুরবেলায়।

—সে ত আসবেই। আজই আমি বউকে চিঠি লিখব মা।

—বেশ ত লেখ। কিন্তু আসবার কথা লিখো না।

মায়ের মুখের হাসি অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে, গলার স্বরটিও ঈষৎ গাম্ভীর্য্যে ভার ভার শোনাইতেছে।

বিস্মিত হইয়া গৌরী বলিল, কেন?

—ধরে-বেঁধে কখনও টান আনা যায় না, মা। যায় না। যার হয়—আপনিই হয়।

—না মা, আসতে লিখি। গৌরী আব্দারের ভঙ্গিতে যোগমায়ার গাম্ভীর্য্য দূর করিবার চেষ্টা করিল।

—লেখ, কিন্তু ওই সঙ্গে জানিয়ো—বেয়াই যেন নিজে মেয়ে দিয়ে যান। এঁর শরীর খারাপ যেতে পারবেন না। কোন লোক পাঠাবার সুবিধেও হবে না।

মায়ের এ মূর্ত্তি গৌরীর কাছে নূতন। তথাপি সে বুঝিল, অনুনয় বা স্নেহ দিয়া সে মতের পরিবর্ত্তন অসম্ভব। চিঠি লিখিবার ইচ্ছা তাহার আর রহিল না।

শনিবারে বিমল বাড়ি আসিলে সে বলিল, দাদা, তোমাদের কি আক্কেল বল ত? কত দিন পরে বাপের বাড়ি এলাম—তা তোমাদের সব এক জায়গায় পাওয়াই মুশকিল।

বিমল বলিল, তাই ত বাড়ি এলাম রে।

মুখভঙ্গি করিয়া গৌরী বলিল, তাই ত বাড়ি এলাম রে! বউ না থাকলে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী থাকে? কবে আনছ বউকে?

বিমল হাসিবার ভঙ্গি করিয়া কহিল, তোদের বউকে আনবার কর্ত্তা কি আমি?

—তুমি না হয় মা—যে হয় একজনা ত? না, সত্যি বলছি, এ তোমাদের ভারি অন্যায়। পুজোর সময় বউ বাপের বাড়ি থাকে—এ ভারি অন্যায়।

বিমল কহিল, কি জানিস, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়। মাকে বল না।

—বলি নি বুঝি? ওঁর ধনুকভাঙ্গা পণ। বাবা ত সদাশিব—কোন বিষয়েই নেই। যত জ্বালা হয়েছে আমার! গৌরী বর্ষীয়সী গৃহিণীর মত মুখ ভার করিয়া স্খলিত আঁচলটা মাথায় টানিয়া গমনোন্মুখী হইল।

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিমল হাসিয়া ফেলিল। কহিল, বুড়ো শ্বশুরকে বুঝি এমনি করে শাসন করিস?

—হ্যাঁ, বুড়োরা শাসন মানে কি না? মুখ ফিরাইয়া ঝঙ্কার দিয়া গৌরী বলিল, এই মা যেমন—মানছেন! আর তালুই মশায়! দিয়ে যাবেন না তালুই মশায় মেয়েটিকে—দেবেন?

বিমলের হাসি বাড়িয়া চলিল দেখিয়া সত্য সত্যই রাগে গর গর করিতে করিতে গৌরী চলিয়া গেল।

সোমবারে বিমল যথারীতি মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। বধূ-প্রসঙ্গ কেহই উত্থাপন করিলেন না।

(ক্রমশঃ)

বারাণসীর লোক-শিল্প

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শিব-ক্ষেত্র বারাণসী। দেশদেশান্তর থেকে ভ্রমণক্লান্ত পর্য্যটকের দল এখানে এসে সমবেত হয়। নতজানু হয়ে মন্দিরের পাদপীঠে তারা তাদের হৃদয়ের মৌন বেদনা জানায়। অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যে নীরবে প্রার্থনা করে। শিবপুরীতে জড় এবং চেতন সৃষ্টির এই দ্বিবিধ বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের প্রতীক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। শিব সৃষ্টির উৎস আবার তাতেই সৃষ্টির পরিপূর্ণতা। তাই, তাঁর মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতি একীভূত।

মন্দিরে অন্ধকার গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের সম্মুখস্থিত কম্পমান দীপশিখা রহস্যঘন অধ্যাত্ম-লোকের আভাস জাগিয়ে হৃদয়ে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতির উদ্রেক করে। স্ত্রী-পুরুষ দীপশিখা হস্তদ্বারা স্পর্শ করণানন্তর ঈষত্তপ্ত করতল বক্ষদেশে সংস্থাপিত করে। সেই পূতস্পর্শ তাদের ভগ্ন হৃদয়কে নবীন উৎসাহে সঞ্জীবিত করে তোলে। এই পবিত্র ধাম পরিত্যাগ করে চলে যাবার সময় হয়ত কত পর্য্যটকের মর্ম্মস্থল মথিত করে নির্গত হয় বিষাদের দীর্ঘশ্বাস। মন্দিরে দাঁড়িয়ে দেখি কোথাও নববিবাহিত দম্পতি দেবতার কাছে কম্পিত কণ্ঠে ব্যক্ত করছে তাদের একান্ত মনের কামনা, কোথাও বা যষ্টির ওপর ন্যস্ত দেহভার কোনো বৃদ্ধা দেবতার চরণমূলে নিঃশেষে আত্মনিবেদনে



গণেশ

নিমগ্না। সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে হিন্দুজাতির প্রাণ,—আধ্যাত্মিকতা। সেই যুগযুগসঞ্চিত ভক্তি এবং বিশ্বাসের বীজই যেন এই প্রার্থনারত নরনারীর হৃদয়ে উপ্ত।

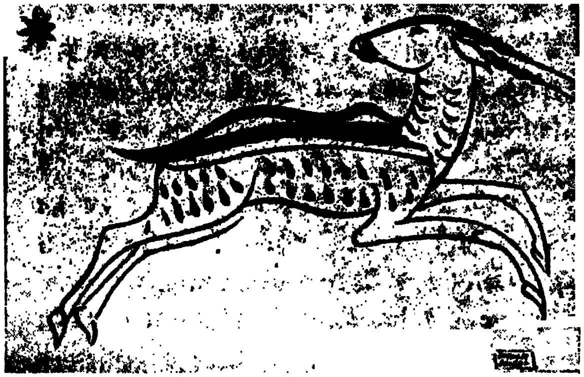
মন্দিরাভ্যন্তর থেকে মন্দিরচত্বরে এসে দেখি, সেখানে শিবের বাহন নন্দী দৃপ্তভঙ্গীতে সমাসীন। রক্তাভ দেহে তার সৃষ্টির উন্মাদনা, তার অঙ্গের দ্যুতি যেন জড়ত্বের নির্জীবতার মধ্যে সঞ্চারিত করছে অপূর্ব প্রাণ-চেতনা। কেন জানি না, অকস্মাৎ আমার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে এল গভীর দীর্ঘশ্বাস আর প্রার্থনারত নরনারীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে তা উত্থিত হ'ল মাথার উপরকার কুহেলিকাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশের পানে।

এই পুণ্য তীর্থনগরীতে ভ্রমণকালে এক দিন হঠাৎ আমার সাক্ষাৎ হ'ল দেয়াল-চিত্রণে রত এক দল শিল্পীর সঙ্গে। বারাণসীর প্রাচীনতম বংশের লোক এঁরা। এঁদের রূপ ভাবনা এবং রূপ-দক্ষতা ভারতীয় শিল্পের সুগভীর আধ্যাত্মিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত। নিজেদের পরম্পরাগত পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরা রামায়ণের কাহিনী দ্বারা দেয়ালগুলো বিচিত্রিত করছিলেন। এই সমস্ত খাঁটি, নিরাড়ম্বর স্বভাব-শিল্পীদের একাগ্র নিষ্ঠা আমার কল্পনাকে এমনি উদ্দীপ্ত করেছিল যে, এই নগরীতে অবস্থান-কালে আমার একমাত্র কাজই ছিল এঁদের শিল্পসৃষ্টির নব নব নিদর্শন আবিষ্কার করা যাতে করে এঁদের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য পুরোপুরি ভাবে আমি উপভোগ করতে পারি, মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি এঁদের প্রতিভার প্রকৃত স্বরূপ। আমি দেখলাম যে, কেবলমাত্র ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণেই নয়, দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যচিত্রাঙ্কনেও তাঁরা নিপুণহস্তের পরিচয় দিচ্ছেন। মণ্ডনশিল্পের ক্ষেত্রেও তাঁদের দক্ষতা সুপরিস্ফুট। খেলনা, মুখোস ইত্যাদি নির্ম্মাণেও এই প্রতিভাবান্ শিল্পীরা সুদক্ষ।

এই সমস্ত শিল্পীদের শিল্প-কলা এবং তাঁদের অঙ্কন-শৈলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই দুই শিল্পের বৈষম্যের কথা আমার মনে জাগল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করাই পাশ্চাত্য শিল্পীর উদ্দেশ্য ব'লে প্রত্যক্ষ বাস্তবের হুবহু অনুকরণই তিনি করে থাকেন; কিন্তু রূপের ভিতর দিয়ে অরূপকে প্রকাশ করা প্রাচ্য শিল্পকলার লক্ষ্য,—আত্মসমাহিত শিল্পীর গভীর ধ্যানে তার জন্ম এবং যুগযুগান্তরের অনুধ্যান এবং অনুশীলনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ। দৃশ্যমান্ জগতের বাস্তব-



রামচন্দ্রের চরণবন্দনারত হনুমান



স্বর্ণ-মৃগ

রূপ অঙ্কনের সংস্কার থেকে প্রাচ্যের শিল্পী মুক্ত। প্রাচ্য-কলা সহজ এবং সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে চায় শিল্পীর আত্মাকে,—আর তার ধ্যানলব্ধ অনুভূতিকে। এই শিল্প যে পথ ধরে চলে আসছে তা অনন্ত,—সীমা-রেখা তার কোথাও নেই। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয়কে প্রকাশ করাই তার সাধনা।

আপাতদৃষ্টিতে এদের শিল্প-সৃষ্টিকে উৎকট বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রসজ্ঞের চোখে দরদ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, কারু-কৌশলে এগুলো বাস্তবিকই আধুনিক যুগোপযোগী। কবে না জানি কোন্ সুদূর অতীতে হিন্দুর আধ্যাত্মিক সংস্কারের সঙ্গে এই শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত হয়েছিল। তার পর বহু যুগের একাগ্র সাধনায় হ'ল এর সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা। দীর্ঘ কালান্তরেও তা স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নি। বৈদেশিক প্রভাব থেকে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত এই শিল্পকলাকে কল্পনা-শক্তি-বিবর্জ্জিত অরসিকেরা আদিম এবং অপকৃষ্ট মনে করে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। আসলে কিন্তু এ ধারণা ভিত্তিহীন। তলিয়ে দেখলে এই সহজ অঙ্কন-পদ্ধতির মধ্যে গভীর এবং উচ্চস্তরের শিল্প-জ্ঞানের পরিচয়

পাওয়া যায়। জরদা, পাটল, পিঙ্গল, লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ ইত্যাদি যত মূল রং আছে তার সবগুলিই শিল্পীরা ছবিতে ব্যবহার করেছেন। সবল তুলির টানে আঁকা কালো রেখার আবেষ্টনীর মধ্যে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত আর রচনার সুসঙ্গতি দেখে মনে হয় যে, আধুনিক শিল্প-সমালোচনার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলেও এগুলো সার্থক রূপসৃষ্টি বলে গণ্য হবে।

বারাণসীর উপকণ্ঠে যেখানে এই পটশিল্প দিনে দিনে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে এবং যেখানে কাঠ এবং মাটির পুতুল ইত্যাদি ব্যবহারিক শিল্প-দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে তার নাম 'হর মহল্লা'। এই শিল্প-কলা বারাণসীর কতকগুলো পুরনো পরিবারের লোকদের জন্মস্বত্ব এবং এর জন্যে পরিবারের প্রত্যেককেই অল্প-বিস্তর খাটতে হয়। এঁদের বাড়ীতে গেলে দেখা যায় কেউ পাথর এবং লতাপাতা ইত্যাদি থেকে রং নিষ্কাশিত করছেন, আরএকজন হয়ত বসে বসে কাদার তাল পাকাচ্ছেন আর কেউ বা মুখোসের জন্যে কাগজের মণ্ড তৈরি করছেন। এমনিভাবে অপরেরা প্রাথমিক আবশ্যক কাজগুলো সম্পন্ন করে দিয়ে পটুয়ার শ্রম লাঘব করে দেন এবং তাতে করে



অশ্বারূঢ় যোদ্ধা



হনুমান কর্তৃক সীতার নিকট রামচন্দ্রের বার্তা আনয়ন

তিনি তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি এবং কর্মকুশলতা বর্ণাঢ্য চিত্র-রচনায় নিয়োজিত করতে পারেন।

পরিমিত রেখা এবং বর্ণসমাবেশে অঙ্কিত রামায়ণের কাহিনীগুলো রচনা-সৌষ্ঠবের জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। রামের বনগমন শিল্পীদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়-বস্তু। রামচন্দ্রের চরণবন্দনারত মহাবীরের চিত্রটি উচ্চাঙ্গের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই চিত্রে রাম, লক্ষ্মণ এবং মহাবীর রামায়ণের এই তিনটি মূল চরিত্রকেই শিল্পী নির্বাচন করেছেন। চিত্রটির ছন্দোময় ব্যঞ্জনা এবং বর্ণসুষমা অপূর্ব। পটভূমিকায় বৃক্ষটি যেন সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের ভারসাম্য রক্ষা করছে। প্রধান প্রধান বর্ণযোজনায় শিল্পী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রামের নীল এবং মহাবীরের লাল বর্ণ আর হালকা তুলির টানে আঁকা তাদের জরদা বসন রং এবং রেখার ওপর শিল্পীর দখল যে বেশী তাই সপ্রমাণ করে। হিন্দু-পদ্ধতিতে আঁকা গণেশ আর একটি নিদর্শন যা সরাসরি দর্শকের শিল্প-বোধকে উদ্বোধিত করে। রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে আধ্যাত্মিকতার সুর। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জিনিসের অন্তরালস্থিত সেই অধ্যাত্ম-সত্তার অনুভূতি শিল্পী লাভ করেছেন এবং শিল্প-রচনায় সেই অনুভূতিকে যথাযথ-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কদম্বমূলে কৃষ্ণ কেলিকলায় রত, রাধার কেশে পরিয়ে দিচ্ছেন পুষ্পগুচ্ছ। এই ছবিটির নয়নাভিরাম বর্ণ-সৌসামঞ্জস্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ম্যাটিসির অঙ্কন-রীতির কথা। কিন্তু হায়, কোথায় ম্যাটিসি আর কোথায় এক আত্ম-বিস্মৃত জাতির এই সমস্ত হতভাগ্য রূপদক্ষের দল।

এই পদ্ধতিতে আঁকা মণ্ডন-শিল্পের নিদর্শন হরিণ, মৎস্য, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর ছবি নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে। একটা বিশেষ ধরণের নক্‌সার ছাপ থাকলেও শিল্পী যে তার বিষয়-বস্তুর স্বভাব-গত বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি-ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। প্রাচীরে আঁকা এই ছবিগুলো তাঁদের আন্তরিকতা এবং রূপদক্ষতার পরিচয় প্রদান করে।

গৃহ-প্রাচীরের শোভাবর্ধক একবর্ণ চিত্রগুলো পুরনো



শিষ্যগণ-পরিবৃত আচার্য্য

আমলের রূপ-পতিদের রচনা। এগুলোতে শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে প্রচুর। প্রাত্যহিক জীবনের দৃশ্যগুলো যেন শিল্পীর তুলির টানে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

পটশিল্প-পদ্ধতি অনুধাবনের ফলে এই চিন্তাটাই আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করল যে, পর-শিল্পের (Foreign Art) প্রভাব থেকে সর্বাংশে মুক্ত এই খাঁটি ভারতীয় অঙ্কন-পদ্ধতি অনুসরণ করে চললে আমাদের দেশের 'আর্টিষ্ট'রা বিশেষ ভাবে লাভবানই হবেন। এই পদ্ধতিকে মূল ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন করলে নিজেদের কল্পনা এবং ভাবাবেগকে (emotion) অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে রূপায়িত করবার অফুরন্ত সুযোগ তাঁরা লাভ করবেন। প্রাচ্য-শিল্পের মূল কথা হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। প্রকৃতির একটি রহস্য যদি আমরা অন্তরে-অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি তাহলে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে যে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সমক্ষে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য-যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না। আমাদের অন্তর্লোকে প্রকৃতি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ সুপ্তই থেকে যায়।

জগতের যে-সকল বড় বড় শিল্প-কলা 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' এই নীতি অনুসরণ করে চলে, হিন্দু লোক-শিল্পের করণ-কৌশল (technique) সেগুলোর চেয়ে বিভিন্ন। রূপের ভিতর দিয়ে অরূপ-লোকের সৃষ্টি করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সরলতা এবং আন্তরিকতাই এই শিল্পের প্রাণ,—প্রত্যক্ষ বাস্তবিকতার জবরদস্তি থেকে লোক-শিল্পীদের চিত্র-কলার কাঠামো (form) মুক্ত। শিশুদের আঁকা ছবির মত এঁদের ছবিতেও একটা অনায়াস-লব্ধ, সহজ সাবলীলতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। সেইজন্যেই দেখি, শিল্পীর বর্ণ-নির্বাচন-পদ্ধতি যদিও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু তা তার ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যের সঙ্গে হিন্দু-সংস্কার-সম্মত এক নবীন সঞ্জীবতা এবং প্রাণশক্তির সমন্বয়ই লোকশিল্পের চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। মণ্ডন-শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের খুঁটিনাটিকে উপেক্ষা করে নব নব রূপসৃষ্টির ঝোঁক

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সর্বোপরি প্রকৃতির বহিরঙ্গের হুবহু অনুকরণের পরিবর্তে অন্তরের ধ্যান-লব্ধ অনুভূতির রূপায়ণেই শিল্পীর একান্ত প্রয়াস। খেয়ালী শিল্পী নিজের অজ্ঞাতেই কারবার করেন নিত্যকালের জিনিস নিয়ে।

হিন্দু লোক-শিল্পের মূলগত আদর্শ এক। কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ বিশেষ সংস্কার এবং রীতিনীতি-সমূহ মূল ধারাকে প্রভাবান্বিত করে উত্তর-ভারতীয়, রাজপুত, উড়িষ্যা, কাংড়া, বঙ্গদেশীয় ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষা এক কিন্তু উচ্চারণ-প্রণালী বিভিন্ন। হিন্দু-লোকশিল্পের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, আজও পর্য্যন্ত তা পরপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। এমন কি যে বৌদ্ধধর্ম প্রাচ্যের শিল্প-কলাকে বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত করেছিল তাও পর্য্যন্ত হিন্দু-লোকশিল্পের ওপর কোনো ছাপ রাখতে পারলে না।

বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনেও বিভিন্ন পদ্ধতির শিল্পীদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। বারাণসীর প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত হরিণ, অশ্ব, মৎস্য প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর নয়নানন্দকর চিত্রসমূহ জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত শিল্পীর কল্পনার স্বতঃউৎসারিত অভিব্যঞ্জনা। অতীতের প্রাণ-লীলা যেন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর তুলির আঁচড়ে। মনে হয়, প্রত্যেকটি মূর্ত্তি যেন প্রাণ-রসের প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ জীবন্ত সত্তা,—এদের যেন আত্মা আছে। তুলির মুখে উৎসারিত হচ্ছে রঙের ফোয়ারা আর সঙ্গে সঙ্গে তুলির আঁচড়ে রূপপরিগ্রহ করছে কত সব বিচিত্র মূর্ত্তি। সরলতা, আন্তরিকতা এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম ভারতীয় শিল্পী-মনের সহজাত সংস্কার বলেই আর্টের ক্ষেত্রে একটা সার্বজনীন আদর্শ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছিল।

এক-রঙা ছবিগুলোরও নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। একটি মাত্র রং দিয়ে আঁকা হলেও সেগুলোতে অফুরন্ত ভাবৈশ্বর্য্য এবং হৃদয়াবেগের কি অনায়াস এবং সার্থক অভিব্যক্তি। অভিনিবেশ সহকারে রীতিমত 'অধ্যয়ন' করে তবে এই ছবির ভাষা বুঝতে হয়। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ বাহ্যরূপের সঙ্গে পরিচয় হলেই শুধু চলবে না; ছবির ভিতর দিয়ে শিল্পী কোন্ আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, অঙ্কিত বিষয় বা বস্তুটি দ্রষ্টা শিল্পীর কোন কল্পনার আভাস প্রদান করছে—এ সমস্ত ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। দর্শকের মনে সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগানো এবং কল্পনার উদ্বোধন করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য। তিনি প্রকাশ করেছেন যতটুকু গোপন রেখেছেন তার চেয়ে ঢের বেশী। ছবিতে একটিমাত্র রঙের প্রলেপ দেখে দর্শককে কল্পনা করে নিতে হবে পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকসমৃদ্ধ, ঘনসবুজ পল্লবভারাবনত শাখান্বিত বনস্পতির বর্ণ-এবং-রূপবৈচিত্র্য। ছবিগুলো মনে যে কত বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে তার আর অন্ত নেই। ব্যাখ্যা করে এর স্বরূপ বোঝানো যায় না, ধ্যান করে এর অন্তর-সত্তার পরিচয় লাভ করতে হয়। উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা যাঁদের শিল্প-বোধ উন্নত এবং পরিমার্জিত হয় নি, তাঁরা হয়ত এই শিল্প-কলার মধ্যে কতকগুলো বিষয় এবং বস্তুর শুদ্ধমাত্র চিত্ররূপ ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাবেন না।



রচনা-রত

হিন্দু-লোকশিল্পে দেশপ্রেম এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ ভাবে অভিব্যক্ত। সুদূর অতীতকাল থেকে যে আদর্শ এবং ভাবধারা আমা-দের জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে রয়েছে তা-ই সংপ্রত

করেছে ভারতের লোক-শিল্পীর অন্তরে নব নব রূপসৃষ্টির প্রেরণা। আর্টের জগতে শুধুমাত্র এই ভাবধারায় সঞ্জীবিত শিল্প-রচনাগুলোরই স্থায়ী মূল্য আছে। যে সকল রূপ-কারদের অনুপ্রাণিত করেছিল এই চিরন্তন আদর্শ তাদের শ্রেষ্ঠ কৃতিসমূহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অমর হয়ে বেঁচে থাকবে।*

* শিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের "The Walls of Benares" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

পরমাণুর তেজ ও তাহার ব্যবহার

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শক্তিমত্তার পরিবর্ধনই জীবের ক্রমোন্নতির মূলকথা। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অন্তরে রহিয়াছে অধিকতর শক্তির সন্ধান। প্রাচীনকালের মানুষের চেয়ে আধুনিক মানুষ উন্নত বস্তুত বেশী শক্তির অধিকারী বলিয়াই; সভ্যতার স্তর বিচারেও শক্তির ব্যবহার পরিমাণই মাপকাঠিরূপে বিবেচিত হয়। আদিম জীবের শক্তির ভাণ্ডার ছিল দেহগত, তাই তদানীন্তন কালে দৈহিক বলই ছিল উচ্চ-নীচ প্রভেদের মানদণ্ড। তারপর আসিল যান্ত্রিক যুগ, কৌশলে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইবার উদ্ভাবনী বুদ্ধি। বনের কাঠে আগুন লাগাইয়া যে-দিন মানুষ আলো ও তাপ উৎপন্ন করিল সেই দিন হইতেই প্রকৃতির গোপন শক্তি-ভাণ্ডারের সন্ধান মিলিয়াছে। সেই আবিষ্কারের অনুসরণেই যুগে যুগে প্রকৃতিকে নানা উপায়ে অধিকতর বশ্য করিবার চেষ্টা চলিতেছে, যাহার ফলে কয়লা ও তৈল বর্তমান যুগে শক্তির প্রধান উৎস। এত শক্তির অধিকারী হইয়াও মানুষের তৃপ্তি আসে নাই, নিত্য প্রচেষ্টা হইতেছে আরও অধিকতর শক্তিকে করায়ত্ত করিতে। প্রাকৃতিক নানা কার্যের অনুধাবন করিতে গিয়া মানুষ দেখিতে পাইতেছে নৈসর্গিক কত ব্যাপারে শক্তির কত বিচিত্র খেলা চলিতেছে, কি প্রচণ্ড তেজ কত না বিবিধ রূপে নিয়ত উদ্ভূত হইতেছে। সূর্য হইতে সর্বদা আলো ও তাপের আকারে প্রভূত শক্তি বিকীরিত হইতেছে বিজ্ঞানী ভাবিয়া পায় না কোথায় তাহার উৎস। দুরাকাঙ্ক্ষায় সে হইতে চায় তাহারই প্রতিস্পর্ধী, কল্পনা করে অমনি শক্তির অধিকারী হইবার, আতিপাতি করিয়া খোঁজে সে শক্তি-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি। বিজ্ঞানীর কার্যধারা অনুসরণ করিলে এ কথা আজ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে অনাগতকালে মানুষ নিশ্চয়ই কয়লা ও তৈলোৎপন্ন শক্তি লইয়াই তৃপ্ত থাকিবে না, ভবিষ্যতে পদার্থের পরমাণুনিহিত তেজ মানুষের যন্ত্র-ফাঁদে ধরা দিবে। সেই সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যাইতেছে, সিদ্ধি অচিরে মিলিতে পারে।

পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ—৯২টি মাত্র। আমরা চতুর্দিকে যত বিচিত্র ও বিবিধ জিনিসই দেখি সেগুলি সবই এই মৌলিক পদার্থসমূহের একের সহিত অপরের বা বহুর নানাপ্রকার সংযোগ ও সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুতে আবার প্রোটন ও ইলেকট্রন নামে পরিচিত দুই বিপরীত-ধর্মী যথাক্রমে সমপরিমাণ ধন ও ঋণাত্মক বিদ্যুদ্‌গ্রস্ত কণিকা রহিয়াছে। ইহারা বিদ্যুতের এককও বটে। পরমাণু বিদ্যুৎবিহীন কারণ প্রত্যেক পরমাণুতেই সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমাবেশ। প্রোটন-ইলেকট্রনের সংখ্যাধিক্যই বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্নতার হেতু। এক জোড়া প্রোটন ও ইলেকট্রনে তৈয়ারী হয় হাইড্রোজেন পরমাণু। প্রোটন ভারী কণিকা ও ইলেকট্রন প্রোটনের তুলনায় কার্যত ভরশূন্য। তাই পরমাণুর ভর প্রোটনজাত। প্রত্যেক পরমাণুর ভর প্রোটনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্য সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন মোটামুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের গুণিতক। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটি মাত্র প্রোটন বলিয়া ইহা লঘুতম পদার্থ, পক্ষান্তরে গুরুতম পরমাণু য়ুরেনিয়ামের—ইহাতে প্রোটনের সংখ্যা ২৩৮। বোহ্‌রের পরিকল্পনানুসারে পদার্থের পরমাণুর গঠন অনেকটা সৌর জগতের মত। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এবং কেন্দ্র হইতে অনেকটা দূরে থাকিয়া যেমন গ্রহমণ্ডলী পরিভ্রমণ করে তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন; এবং ইলেকট্রনেরা থাকে দুই ভাগ হইয়া—কতক থাকে কেন্দ্রের প্রোটনের সঙ্গে মিশিয়া—বাকীগুলি থাকে বাহিরে, উহারা ঘূর্ণমান। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটি কেন্দ্রীণ প্রোটনকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র ইলেকট্রন। পরবর্তী ভারী পদার্থ হিলিয়াম, তাহার পরমাণু কেন্দ্রে চারিটি প্রোটন ও দুইটি ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রের বাহিরে এক জোড়া ইলেকট্রন ঘূর্ণমান। হিলিয়ামের আণবিক ওজন ৪। প্রোটনের সংখ্যানুসারে পরমাণুর ভর বৃদ্ধি পায় বা পদার্থের

গুরুত্ব বাড়ে আবার বাহিরে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের সংখ্যা (যাহা প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব আণবিক সংখ্যা) নিয়ন্ত্রণ করে পদার্থের স্ব-স্ব ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য। এমন দুই পরমাণুর অস্তিত্ব সম্ভব যাহাদের কেন্দ্রীণ প্রোটনের সংখ্যা সমান না হইলেও বাহিরে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান অর্থাৎ একই পদার্থের পরমাণুর ভর বিভিন্ন হইতে পারে। অক্সিজেনের কেন্দ্রে ১৬টি প্রোটন থাকে এবং ঐ সঙ্গে থাকে ৮টি ইলেকট্রন। কেন্দ্রের বাহিরে থাকে ৮টি ইলেকট্রন—যেজন্য পরমাণু বিদ্যুৎবিহীন। যে কোন পরমাণুর কেন্দ্রের বাহিরে ৮টি ঘূর্ণমান ইলেকট্রন থাকিলেই উহা অক্সিজেন হইবে। এমন পরমাণু থাকিতে পারে যাহার কেন্দ্রে ১৭টি প্রোটন ও ৯টি ইলেকট্রন—ইহারও বাহিরে ৮টি ইলেকট্রনই থাকিবে। এই পরমাণুও অক্সিজেনের সমধর্মী যদিও উহার ভর হইবে ১৭। এই প্রকার সমধর্মী অথচ বিভিন্ন আণবিক ওজন বিশিষ্ট পদার্থের নাম 'আইসোটোপ'। পারদের ছয় রকম পরমাণু পাওয়া যায়। উহাদের আণবিক ওজন ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৪। পরমাণুর গঠন-ব্যাপারানুসন্ধানে আরও কয়েকটি মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে 'নিউট্রন' অন্যতম। নিউট্রন বিদ্যুৎবিহীন এবং উহার ভর প্রোটনের সমান। এইরূপ অনুমান করা হয় নিউট্রনে প্রোটন ও ইলেকট্রন একত্রীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং উহারা সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে যেমন একটি প্রোটনকে একটি মাত্র ইলেকট্রন প্রদক্ষিণ করে—নিউট্রনেও তেমনি ইলেকট্রন প্রোটন রহিয়াছে অথচ উহাদের ব্যবধান নিউট্রনে অনেকাংশে কম। তাই নিউট্রন কার্যত একটি স্বতন্ত্র কণিকা যাহার ভর আছে কিন্তু বিদ্যুৎ নাই। পরমাণুর কেন্দ্রে যে ইলেকট্রন থাকে বলিয়া পূর্ব বলা হইয়াছে উহারা খালি প্রোটনের দেহে জড়িত থাকে—সেখানে ইলেকট্রনের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—কেন্দ্র গঠিত হয় প্রোটন ও নিউট্রনে। পূর্বোক্ত বিবৃতির সংশোধন করিয়া বলিতে হয় সর্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ য়ুরেনিয়ামের কেন্দ্রে ২৩৮টি প্রোটন নহে, ১৪৬টি নিউট্রন ও ৯২টি প্রোটন ও সেইজন্য কেন্দ্রের বাহিরে ৯২টি ইলেকট্রন।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে মৌলিক পদার্থ ৯২টির বেশী নাই কেন? কি তাহার রহস্য? ইহার কারণস্বরূপ অনুমান করা হয় যে কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যত বেশী হইবে কেন্দ্রের বাঁধন তত শিথিল হইয়া আসিবে। প্রোটনগুলি ধনাত্মক বিদ্যুৎ-কণিকা। তড়িতের ধর্মানুসারে উহারা একে অন্যকে বিকর্ষণ করে। কেন্দ্রে উহাদের যত বেশী ভিড় জমে (অর্থাৎ পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব বা আণবিক ওজন যত বাড়ে) একত্র বাস করা উহাদের পক্ষে তত বেশী অসুবিধা হয়। তাই দেখা যায় ভারী পদার্থের পরমাণুতে ভাঙন লাগিয়াই আছে। য়ুরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতির পরমাণু স্বতঃই কোন অজানা আঘাতে নিরন্তর ভাঙিয়া যাইতেছে এবং তাহারই ফলে স্তরে স্তরে প্রোটন ত্যাগ করিয়া য়ুরেনিয়াম, রেডিয়াম এবং অবশেষে সীসাতে পরিণত হইয়া স্থায়ী পদার্থ রূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতেছে। য়ুরেনিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাধিক্যই উহার বিনাশের অন্যতম কারণ যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে কে এই প্রক্রিয়া ঘটায় বা কেনই বা একটি বিশিষ্ট পরমাণু একদা ভাঙে তাহা আজও রহস্যাবৃত। কিন্তু অনুরূপ কারণেই ৮৩ আণবিক সংখ্যা পর্যন্ত সকল পদার্থই ভঙ্গপ্রবণ ও তেজ-ক্রিয়। রেডিয়ামের বৈশিষ্ট্যের হেতুও ইহাই। এই ভঙ্গ-প্রবণতার জন্যই য়ুরেনিয়াম অপেক্ষা ভারী পরমাণুর অস্তিত্ব সম্ভব নহে। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বিরানব্বইতে আসিয়া শেষ হইবার রহস্য ইহাই।

কোন কোন বিজ্ঞানী বিশ্বকর্মার উপরও কেরামতি করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা ছিল য়ুরেনিয়াম অপেক্ষা ভারী পরমাণু নির্মাণ করা। ইতালীয় বিজ্ঞানী ফারমী য়ুরেনিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রে একটি নিউট্রন জুড়িয়া দিবার কল্পনা করিলেন। নিউট্রন বিদ্যুৎবিহীন ও ভরযুক্ত। য়ুরেনিয়াম পরমাণু কেন্দ্রে একটি নিউট্রন যুক্ত হইলে উহার ভর হইবে ২৩৯ কিন্তু বিদ্যুদ্‌গ্রস্ত নহে বলিয়া উহার কেন্দ্রে প্রবেশ বা স্থান লাভে কোন বাধা নাই। বেরিলিয়াম নামক পদার্থের সহিত রেডিয়াম মিশ্রিত করিলে উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে নিউট্রন নির্গত হয়। এই প্রকার কোন নিউট্রন-নিঃসারী পদার্থের সঙ্গে য়ুরেনিয়ামকে রাখিয়া দিবার ফলে এক অতি বিস্ময়কর আবিষ্কারের সূচনা হইল। নিউট্রন সংযোগ করিবার পর য়ুরেনিয়াম হইতে কয়েকটি ভিন্নধর্মী পদার্থ পাওয়া গেল। প্রথমত, গবেষণারত বিজ্ঞানীরা ভাবিলেন সত্যই বুঝি নবতম পদার্থ সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল নূতন কোন পরমাণু (যাহা য়ুরেনিয়াম অপেক্ষা ভারী) তৈয়ারী হয় নাই—পক্ষান্তরে পরমাণুকেন্দ্র ভাঙিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে এবং নিউট্রনের আঘাতে এক পরমাণু হইতে দুই পরমাণু সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের একটি বেরিয়াম। য়ুরেনিয়ামে প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যা ২৩৮টি তাহার মধ্যে একভাগে গিয়াছে মোটামুটি ১৩৬টি ও তন্মধ্যে ৮০টি নিউট্রন যেজন্য ৫৬ আণবিক সংখ্যা-সম্বলিত বেরিয়াম উৎপন্ন হইল। কিন্তু

ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? অধিকসংখ্যক প্রোটনবিশিষ্ট ভারী পরমাণুরা স্বতই শিথিল বাঁধন এবং সেজন্ত কোন অজ্ঞাত আঘাতে সর্বদাই আপনা হইতেই কিছু কিছু ভাঙিয়া যায়—বহিরাগত নিউট্রন এই বারুদের ঘরে আগুন দিল, বিভাজনটা হইল আরও দ্রুত ও বিস্ময়কর পরিণতি লইয়া।

'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'—কিন্তু স্পর্শমণি আজও ক্ষ্যাপার হাতে আসে নাই। লৌহকে স্বর্ণ করিবার পদ্ধতি আজও অজানাই রহিয়াছে সত্য কিন্তু এক মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে ভাঙিয়া অন্ত দুই পদার্থ তৈয়ারীর কৌশল আজ মানুষের কাছে ধরা পড়িয়াছে। য়ুরেনিয়ামকে স্তরে স্তরে ভাঙিয়া রেডিয়াম ও সীসা হইতে দেখিয়া বিজ্ঞানীরা ভাবিতেছিলেন এমনি ভাঙাগড়ার রহস্য কি করিয়া তাঁহাদের আয়ত্তে আসিবে। লৌহের পরমাণুতে কিছু সংখ্যক প্রোটন জুড়িয়া দিলে বা পারদের পরমাণু হইতে তিনটিমাত্র প্রোটন বাহির করিয়া দিতে পারিলে স্বর্ণের পরমাণু পাওয়া যায়। কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন সংযোগ-বিয়োগের গোপন তথ্য আজও আমাদের অজ্ঞাত, তাই পরশপাথর আজও কল্পনারই বস্তু। কার অঙ্গুলি সঞ্চালনে যে য়ুরেনিয়াম পরমাণুরা নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাঙিয়া যাইতেছে এই প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর আজও পাওয়া যায় নাই সত্য, তবুও দেখা যাইতেছে যে পরমাণুর রূপান্তর সাধন আজ মানুষের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে অন্তত আংশিক ভাবে। রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্কর পদার্থ হইতে যে-সকল বিদ্যুদ্‌গ্রস্ত কণিকা প্রচণ্ড গতিবেগে বিচ্ছুরিত হয় উহাদের দ্বারা অন্য কোন পদার্থের পরমাণুকে আঘাত করিলে বহিঃস্থ ইলেকট্রনদের ওলট-পালট ঘটান সম্ভব। কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রকে আঘাত করিতে হইলে আরও বেশী শক্তিশালী ও গতিবেগসম্পন্ন কণিকা দরকার। সাইক্লোট্রোন নামক নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা প্রভূত তেজসম্পন্ন কণিকা সৃষ্টি করিয়া পরমাণুর কেন্দ্র বিভাজন সম্ভব হইয়াছে। নিউট্রনের আঘাতে কেন্দ্রকে ভাঙা তেমনি ব্যাপারই যদিও অনেকাংশে সহজসাধ্য বলা চলে।

এই পরীক্ষার আরও একটা চাঞ্চল্যকর সম্ভাবনার দিক আছে। এই আবিষ্কারের ফলে তেজ উৎপাদনের এক নূতন সূত্র বা বহুবাঞ্ছিত পথের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কয়লা পোড়াইয়া যখন তাপ অর্থাৎ তেজ উৎপন্ন করি তখন একটি কয়লার পরমাণুকে অক্সিজেনের দুইটি পরমাণুর সঙ্গে সংযোগ করাইয়া দিয়া এক যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী করা হয়, যাহাকে বলে কারবন-ডায়ক্সাইড। এই সংযোগের ফলে কয়লার অণু তাপ ত্যাগ করে। দুই মৌলিক পদার্থের এইরূপ মিলনে তেজের উদ্ভব হয়। আবার কখনও বা উহাদের মিলন ঘটাইতে তেজ প্রয়োগ করিতে হয়। মৌলিক পদার্থের অণুতে যে প্রোটন দল সংঘবদ্ধ থাকে উহাদেরও বিমুক্ত করিয়া দিলে তেজ উৎপন্ন হয়। যে শক্তির বাঁধনে উহারা একত্রিত ছিল, প্রোটন বিমুক্ত হইলে সে শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরেনিয়াম পরমাণু ভাঙিয়া সীসাতে পরিণত হইলে তৎসঙ্গে হিলিয়াম পাওয়া যায়। এক আউন্স য়ুরেনিয়াম হইতে ·৮৬৫৩ আউন্স সীসা, ·১৩৪৫ আউন্স হিলিয়াম পাওয়া যায়। এক আউন্সের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ·০০০২ আউন্স পরিমিত পদার্থের কোন হদিস পাওয়া যায় না। এইটুকু পদার্থের বিলোপে তেজ উৎপন্ন হয়। এক আউন্স য়ুরেনিয়ামে যে-সংখ্যক প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন থাকে রূপান্তরিত হিলিয়াম ও সীসাতে সেই সংখ্যক প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনই থাকে অথচ ইহাদের সম্মিলিত ওজন মূল য়ুরেনিয়ামের ওজন হইতে সামান্য কম। য়ুরেনিয়ামের রূপান্তরে চারি হাজার আউন্সে এক আউন্স পদার্থ বিলুপ্ত হয়। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর উপাদান তাই প্রোটন, ইলেকট্রন ও খানিকটা তেজ। সুতরাং পদার্থের পরমাণু ভাঙিয়া ফেলিলে প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে তেজও পাওয়া যাইবে। পরীক্ষায় দেখা যায় পরমাণু হইতে প্রোটন বা ইলেক্‌ট্রন বিমুক্ত হইলে উহাদেরও সঙ্গে প্রচণ্ড গতিবেগ সংযুক্ত থাকে। যে তেজের বলে উহারা একত্রীভূত ছিল সেই তেজ বিভাজনের সঙ্গে গতিরূপে দেখা দেয়। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে বা বিশ্লেষণে তাপ বা তেজ উৎপন্ন করিবার কৌশল আমাদের জানা আছে। কয়লা পোড়াইয়া আবার তাপের ব্যবস্থা করি, চূণের ভিতর জলসংযোগে তাপ উৎপন্ন করিতে পারি বা তড়িৎকোষের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-শক্তি পাইবার ব্যবস্থাও আমরা জানি। কিন্তু যৌগিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রের প্রোটন বিমুক্ত করিয়া দিয়া তেজ পাইবার পদ্ধতি মানুষের আজও অজ্ঞাত। অথচ প্রকৃতিতে ঐরূপে তেজের উৎপত্তি হইতেছে। য়ুরেনিয়াম পরমাণু হইতে যখন স্তরে স্তরে প্রোটন বহির্গত হইয়া রেডিয়াম ও সীসা উৎপন্ন হয় তখন প্রভূত তাপ উদ্ভূত হয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সম্মিলনে এক গ্রাম পরিমিত জল উৎপন্ন হইবার সময় যে তাপ উৎপন্ন হয় (৩৮০০০ কেলোরী)—এক গ্রাম রেডিয়াম ইমানেশন গ্যাসের প্রতি পরমাণু হইতে বারটি মাত্র প্রোটন বিমুক্তির ফলে উৎপন্ন তাপ

(২৪৪ কোটি কেলোরী) তদপেক্ষা ষোল লক্ষ গুণ বেশী। প্রতি গ্রাম রেডিয়াম ইমানেশন গ্যাস প্রতি ঘণ্টায় ১৮২ লক্ষ কেলোরী তাপ প্রদান করিতে পারে। পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে এত প্রচুর তেজ পুঞ্জীভূত রহিয়াছে জানিয়াও মানুষ তাহার সম্যক্ ব্যবহার করিতে পারে না। রেডিয়াম বা রেডিয়াম গ্যাস এত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না যাহা হইতে পূর্বোক্ত পরিমাণ তেজ একসঙ্গে পাইতে পারি। নানা কৃত্রিম ও ব্যয়সাধ্য এবং কষ্টবহুল উপায়ে প্রভূত গতিবেগসম্পন্ন বিদ্যুদ্‌গ্রস্ত কণিকা দ্বারা আঘাত করিয়া পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র হইতে প্রোটন বহির্গত করা বা পরমাণুকে ভাঙিয়া দুই খণ্ড করা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল পরীক্ষার্থেই করা চলে, ঐ প্রকারে প্রাপ্ত তেজের কোন ব্যবহারিক সার্থকতা নাই, কারণ এই প্রকার ব্যবস্থায় কেবলমাত্র বিপুল শক্তি ব্যয়েই পরমাণুকেন্দ্রকে ভাঙা সম্ভব। য়ুরেনিয়াম বা রেডিয়াম কেন্দ্র যেমন করিয়া স্বতই ভাঙে তেমনি কোন উপায়ে বাহ্যিক শক্তি ব্যয় না করিয়া পরমাণুকে দুই টুকরা করিবার ও তৎসহ প্রভূত তেজমোচনের ব্যবস্থা আজও অজ্ঞাত। কিন্তু নিউট্রন প্রয়োগে য়ুরেনিয়াম-কেন্দ্রকে ভাঙিবার উপায় উদ্ভাবনের পর এই বিষয়ে নূতন সূত্র পাওয়া যাইতেছে। নিউট্রনের সংঘর্ষে যখন য়ুরেনিয়াম কেন্দ্র ভাঙে তখন খণ্ডীভূত অংশ দুইটি প্রচণ্ড গতিবেগ লইয়া বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহাই তাপরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে এই প্রকারে প্রাপ্ত তাপের অনুপাত প্রণিধানযোগ্য।

১ গ্রাম কয়লা + অক্সিজেন = কারবন-ডায়কৃসাইড + ৮২০০ কেলোরী তাপ

১ গ্রাম য়ুরেনিয়াম (বিভাজনে) = বেরিয়াম + অন্য পদার্থ + ১৭০০ কোটি কেলোরী তাপ

ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহা উৎপন্ন করিতে মোটামুটি এক শত কোটি মণ কয়লা পোড়ান দরকার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ য়ুরেনিয়াম অক্‌সাইড নামক খনিজ প্রস্তরে য়ুরেনিয়াম পাওয়া যায়। এক গজ দীর্ঘ, এক গজ প্রস্থ ও এক গজ উচ্চ এক খণ্ড য়ুরেনিয়াম-অক্‌সাইডের ওজন হইবে এক শত মণের কাছাকাছি। সহজ কথায় বলা চলে এক শত কোটি মণ কয়লা পোড়াইয়া যতটুকু কার্য্যকরী তাপ পাওয়া যায় এক শত মণ য়ুরেনিয়াম-অক্‌সাইডে প্রাপ্তব্য সমস্ত য়ুরেনিয়ামকে দুই টুকরা করিতে পারিলে উহা ততটুকু তাপ প্রদান করিবে। কিন্তু য়ুরেনিয়াম পরমাণুকে এই প্রকারে ভাঙিয়া ফেলা খুব সহজ কথা নয়, অন্তত যত সহজে কয়লা পোড়াইয়া গ্যাস উৎপন্ন করি তার চেয়ে অনেকাংশে জটিল ব্যাপার। অঙ্কের হিসাবে তেজের পরিমাণ নিরূপণ করা কঠিন নয় কিন্তু পরমাণু বিভাজন একান্তই দৈবাধীন, অন্তত অদ্যাপি তাই আছে। সাধারণ অবস্থায় নিউট্রনের আঘাতে য়ুরেনিয়াম-পরমাণু ভাঙে বটে, কিন্তু সে প্রায় কদাচিৎ—বহু কোটি নিক্ষিপ্ত নিউট্রনের মধ্যে দুই-একটি মাত্র ($১০^{২৭}$এর মধ্যে ১টি) নিউট্রন য়ুরেনিয়ামের পরমাণুকে ভাঙিতে পারে—বাকী সব বৃথাই যায়।

য়ুরেনিয়ামের এক দোসর অর্থাৎ আইসোটোপ আছে যাহার আণবিক ওজন ২৩৫। ২৩৮ আণবিক ওজনের য়ুরেনিয়ামের সঙ্গে উহা সাধারণতঃ ১৩৭:১ এই অনুপাতে পাওয়া যায়। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, য়ুরেনিয়াম (২৩৫-এর) পরমাণু নিউট্রনের সংঘর্ষে সহজে ভাঙে। কিন্তু ইহা পাওয়া যায় খুব কম অনুপাতে সেইজন্য য়ুরেনিয়াম বিভাজন সহজে সম্ভব হয় না। যদি বিশুদ্ধ য়ুরেনিয়াম (২৩৫) পাওয়া যাইত তবে এই কার্য সহজ হইত। বিশেষ প্রক্রিয়ায় য়ুরেনিয়াম ২৩৫কে, য়ুরেনিয়াম ২৩৮ হইতে পৃথক্ করা যায়—যদিও এই প্রক্রিয়া খুবই কষ্টসাধ্য। প্রচুর পরিমাণে য়ুরেনিয়াম (২৩৫) পাওয়া সম্ভব হইলে উহা হইতে প্রভূত তেজ উৎপন্ন করার চেষ্টা চলিতে পারে। এক টুকরা কয়লাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া আমরা স্তূপীকৃত কয়লাকে ভস্মীভূত করি। কয়লার পরমাণুকে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত না করিলে উহা অক্সিজেনের সহিত সম্মিলিত হয় না। একটুখানি কয়লাকে উত্তপ্ত করিয়া উহার ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ার সূচনা করিয়া দিলে ইহারই ফলে উত্তাপ উদ্ভূত হয় এবং সেই উত্তাপে পার্শ্ববর্তী কয়লার অণুতেও দহনকার্য বা অনুরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ইহা ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া স্বতই উত্তরোত্তর বেশী তাপের সৃষ্টি করে।

য়ুরেনিয়াম হইতে প্রাপ্ত তাপকেও ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে য়ুরেনিয়াম-বিভাজন ব্যাপারটাও অমনি অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমপ্রসারী হওয়া প্রয়োজন। য়ুরেনিয়াম-ঘটিত পদার্থ লইয়া তাহার অভ্যন্তরে কোন নিউট্রন-নিঃসারী পদার্থ পুরিয়া দিলে মাঝে মাঝে কোন পরমাণু-কেন্দ্র হয়ত ভাঙিবে। পরমাণু-কেন্দ্র ভাঙিবার কালে নূতন নিউট্রনও বহির্গত হইবে, এই নিউট্রন দল আবার পরমাণু-বিভাজন কার্য করিতে সক্ষম। এইরূপে য়ুরেনিয়ামের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ নিউট্রনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে এবং তাহারা ক্রমবর্ধমান

হারে পরমাণুকেন্দ্রে ভাঙিতে থাকিবে। এইভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে পরমাণু-বিভাজন ও তেজ-উৎপাদন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে।

এই প্রকার কোন প্রক্রিয়ায় য়ুরেনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রকে ভাঙিয়া তেজ সৃষ্টি সম্ভব হইলে তাহাকে ব্যবহারে লাগাইবার জন্য আরও অনেক ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল ব্যাপারে তেজ উদ্ভূত হয় খুবই দ্রুত অর্থাৎ স্বল্পকাল মধ্যে প্রভূত তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তাপকে সাধারণ কাজে লাগাইবার পূর্বে উহাকে মৃদু করিয়া আনিতে হইবে এবং তার পর তাহার সাহায্যে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থার মত উপায়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে।

এই প্রচণ্ড তেজ যেমন মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে তেমনি ধ্বংসাত্মক কার্যেও অনুরূপ সাফল্যের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ডিনামাইট ফাটাইয়া বা বোমার বিস্ফোরণে যে ধ্বংসকার্য করা হয় তাহার মূল কথা অতি অল্পকাল মধ্যে প্রভূত তেজ উৎপন্ন করা। তিন পরিমাণ য়ুরেনিয়াম (২৩৫) প্রয়োগে একটি অতিকায় যুদ্ধজাহাজকে ঘায়েল করা যাইতে পারে—যে কার্য করিতে বর্তমানে হাজার হাজার মণ ভারী টর্পেডোর দরকার হয়।

আজ যাহা অস্পষ্ট কল্পনায় রহিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে তাহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। সে দিন কয়লার কৌলীন্যের অবসান ঘটিবে। বর্তমান কালের শক্তি-উৎপাদনকারী অতিকায় যন্ত্রদানবেরা ক্ষুদ্র য়ুরেনিয়াম-কণিকার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া অবসর গ্রহণ করিবে একথা হয়ত নিছক কাহিনী বা কল্পনা নয়।

প্রমাণ পঞ্জী

Ions, Electrons, etc.,—Crowther.
Universe Around us—Jeans.
Science and Culture, Vols. V. No. 7 and VI. No. 12.
Age of the Earth.—A. Holmes.

প্রভাতের চাঁদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মনে যে পড়িছে সেই সমারোহ উঠিবার,
ভূতলে গগনে আলোকোৎসব ফুটিবার।
কাঁচা স্বর্ণের থালা হলো ম্লান,
আলোক-রথের খসা চাকাখান,
শিথিল কমল আর দেরী নাই টুটিবার।

২

বিশাল রাজ্য, ভাণ্ডার মণি রতনের,
মহিমা হারায়ে গণিতেছে দিন পতনের।
মেলায় ধুলোট,—অভিনয় শেষ,
একাকী দাঁড়ায়ে আছে অবশেষ—
ধূলি-লাঞ্ছিত নাট্যমঞ্চ যতনের।

৩

এ যেন রে বীর জনগণাধিপ তেজীয়ান,
কথায় যাহার মরেছে বেঁচেছে ধরাখান।
আজি নিষ্প্রভ, প্রভাব তাহার,
হয়েছে মানুষ, দেব নাহি আর,
মমতার ছবি, ক্ষমতার সবই অবসান।

৪

অতি উচ্ছল সেই বিপুলতা কোথা হায়?
সুধাহারা সুধাকরে দেখে বুক ব্যথা পায়।
একি ভাব দীন মহাকবি আজ?
ছন্দ গাঁথিতে লাগে তার লাজ,
জ্যোতি নাই আর কপিধ্বজের পতাকায়।

৫

অর্দ্ধ ধরণী আলোকিত যার দানে ভাই—
সে আজ ভিখারী কোন্ প্রাণে তার পানে চাই
মহাসাগরে যে আনিল জোয়ার,
ঠাঁই ছিল নাকো কনক থোয়ার,
ধন জন বল চল চঞ্চল মানে তাই।

৬

যাঁহার তেজেতে সব জ্যোতিষ্ক তেজোময়,
যাঁর মহিমার নাহি উপচয় অপচয়,
সব শক্তির উৎস যে-জন,
ইঙ্গিতে যাঁর লয় ও সৃজন,
কতখন তাঁর ফিরায়ে আনিতে সুসময়?

শিশু-সাহিত্য

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি তো সাহিত্যিক নই,—কাজেই বলতে পারিনে দেশের সাহিত্য কি করে গ'ড়ে ওঠে। এটুকু জানি—সাহিত্য জিনিষ যে কোন দেশেরই হোক—গ'ড়ে তোলা যায় না—গ'ড়ে ওঠে। জানি ইমারত একটা গ'ড়ে তোলা যায় মালমশলা দিয়ে, মিস্ত্রী লাগিয়ে। কেল্লাও গড়া যায়—তাজমহলও গড়া যায়। তেমনি ফুলবাগানও গ'ড়ে তোলা যায় মালী সংগ্রহ করে। কিন্তু আমি বলতে চাই সে ভাবে গ'ড়ে তোলা যায় না সাহিত্যকে। কোমর বেঁধে দেশের সাহিত্য গ'ড়ে তুলবো—এর যদি কোনও সহজ উপায় থাকতো তবে বাংলা দেশের সাহিত্য এত বড় স্থান পেল—অন্য দেশ পেল না কেন? এ ভাবতে হবে। গ'ড়ে তোলা গেলে অন্য দেশও তুলতো। তাই বলি সাহিত্য গ'ড়ে তোলা জিনিষ নয়।

নদীর ধারা চলতে চলতে গড়ে। দেশ গড়ে—রাস্তা গড়ে;—গ'ড়ে তুলে চলে। তার ভিতর লক্ষ্য করবার জিনিষ ঐটুকু যে, চলতে চলতে গ'ড়ে ওঠে একটা বড় নদী;—সুজলা সুফলা দেশ নদীর দুই পারে। প্রকৃতির মধ্যেও সব চেয়ে বড় গঠন হচ্ছে পাহাড়। সে কি কেউ ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে গড়েছে? পৃথিবীর ভিতরের ধাক্কা—নানা আবর্জ্জনা নানা অঙ্গারের স্তূপ দিলে খাড়া ক'রে। তারই উপর আস্তে আস্তে কালের হস্ত পড়লো। কত রকমের পাহাড়, কত রকমের বন, উপবন, অরণ্য। অরণ্য কি কেউ গ'ড়ে তুলতে পারে;—না, তার উপায় আছে? বড় সাহিত্যও তেমনি বড় জিনিষ। এ জনকতকে মিলে বৈঠক ক'রে, উপায় ভেবে গ'ড়ে তোলা যায় না। বহু যুগ ধরে রসের ধারা ক্রিয়া করছে কোনও এক জাতের মনে। তারা চাচ্ছে নিজের মনের প্রকাশ সাহিত্যের ধারা ধ'রে। কোথায়ও বা দেখি এইভাবে রসের ধারা ক্রিয়া করছে শিল্পের দিক দিয়েও। কোন কোন দেশ শিল্পে বড় হয়ে উঠেছে,—কোন কোন দেশ সাহিত্যে। যেমন কোন কোন দেশ হয়ে উঠেছে পর্ব্বতময়, কোন কোন দেশ অরণ্যময়, কোন কোন দেশ মরুভূমি। এই রকম সব বড় প্রেরণা—তাই থেকেই বড় সাহিত্যের উৎপত্তি। গ'ড়ে তুলবে কে সাহিত্যকে?

পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে কত কালের কত আবর্জ্জনার স্তূপের উপরে। সাহিত্যও চর্চ্চা করে দেখি—কত আবর্জ্জনা গোড়ায়—তার উপরে আস্তে আস্তে ফুটতে থাকলো শ্যামল শোভা, সৌরভ, ফুল ফল কত কি,' যে ভাবে ফুটেছে কঙ্করময় কর্দ্দমময় ভূমির উপর শস্যশ্যামল বঙ্গ-দেশের শোভা। সাহিত্যের ইতিহাস চর্চ্চা করলেই দেখতে পাই—অনেক ছেলেমানুষি—অনেক মন্দ ভালো—জমা হ'তে হ'তে ধবলগিরির চূড়া যেমন গগন স্পর্শ করেছে—এ'ও সেই রকমেরই একটা ব্যাপার। এ ভেবে চিন্তে উপায় ঠাওরে হ'বার জো নেই।

একটা কথা বলতে চাই—জগৎ-সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখতে পাই—ইউরোপে সাহিত্য যেমন সকল দিক দিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে—আমাদের দেশে তেমনটি হয় নি এখনও। পরিপুষ্টির বাকী আছে অনেক। একটা সামান্য নিদর্শন দিই। শিশু-সাহিত্য বলতে যা' বোঝায়—আমাদের দেশে তা' এখনও সৃষ্টিই হয় নি। শিশুর মন গ'ড়ে তুলতে হ'লে সাহিত্যের খুবই দরকার—এ' আমরা সবাই জানি। কিন্তু কোথায় হচ্ছে তা'? শুধু ছেলে-ভুলানো ছড়া গেয়ে তো তাদের ভুলিয়ে রাখা চলে না, ঠাকুরমার গল্প বলেও নয়। শুধুই কল্পনার রাজত্বে শিশুর মনকে অবাধ বিচরণ করতে দিলে বাস্তব জগতে লড়াই দিতে তারা সক্ষম হয় না। শৈশব থেকেই যেমন কোলের শিশুর দেহের প্রতি নজর দেওয়া—মনের প্রতি নজর দেওয়া দরকার; সেই রকম মানসিক বল, দৈহিক বল সঞ্চয় করতে পারে যা'তে ছেলেরা—তারই উপায় করতে হবে সাহিত্য দিয়ে। বড় হ'য়ে কি পড়বে না পড়বে সে. তো পরের কথা; কিন্তু তার আগে ঐ কয়টা বছর অভুক্ত শিশুর মতো থাকবে—তার পর হঠাৎ বড় হ'য়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইয়ের বোঝা ব'য়ে চলবে—এ'তে শিশুদের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ অসম্ভব। গোড়া থেকেই সাহিত্যকদের প্রতি এই আমার অনুরোধ—আমাদের ঘরের শিশুদের এই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির জন্য তাঁরা প্রস্তুত হোন। শিল্পের দিক দিয়ে ছেলেদের জন্য ছবির বই নেই; পড়ার জন্য সুপাঠ্য বই পাই নে। বই কিনতে গিয়ে 'পিটার প্যানে'র জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হ'তে হয়;—এ কি কম দুঃখের কথা? বঙ্গ-সাহিত্যের শৈশব নেই—আর সব বয়েস আছে। ছেলেরা অভিনয় করবে—নাটক নেই; খেলা করবে—পুতুল নেই; ছবিও তথৈবচ। অবশ্যি

এই জন্য এখন আমি—যখন হাত চলবার বয়েস চলে গেছে—এই অথর্ব্ব অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্ত নিজেকে দায়ী বোধ করছি। কে আসবে—তুলে নেবে নিজের হাতে এই সব ছোট খাটো কাজ, ছোট ছোট শিশুদের মনের পরিপুষ্টির জন্য। *

* দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

দুঃস্বপ্ন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হরগোবিন্দ যে এমনটি হইবে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

গঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া সে আহারে বসে। সেটা অবশ্য বেলা দ্বিপ্রহরে। তাহা হইলেও—অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ কোন দিন কেহ দেখে নাই। পিত্ত বাড়িবার হেতুটিকে সে সমূলে বিনষ্ট করিয়া যায়—সকাল আটটায় গঞ্জে বাহির হইবার মুখে। প্রত্যূষে স্নান সারিয়া ও পিত্ত বিনষ্ট করিবার উপকরণ ছোলাগুড় ও খানকয়েক পরেটা জলযোগ করিয়া বাইকে চাপিয়া দু'মাইল দূরের গঞ্জে প্রত্যহ তাহাকে যাইতে হয়। সেখানে ব্যাপারীদের সঙ্গে, মহাজনদের সঙ্গে এবং ক্রেতাদের সঙ্গে নানাপ্রকার দ্রব্যের দরদস্তর ও কেনা-বেচায়—এমন নিঃশব্দে বেলা গড়াইয়া চলে যে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করার সুযোগ পর্য্যন্ত সে পায় না।

ভাইপো মণি কাকার নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা ভাল মতেই জানে। খাতার উপর কলমটা মিনিটখানেকের জন্য উদ্যত রাখিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলে, বেলা একটা বাজলো কাকা।

বিক্রেতাদের সঙ্গে বচসা থামাইয়া হরগোবিন্দ বলে, একটা! আচ্ছা। দেখ ভাই, সওয়া ষোল পর্য্যন্ত উঠতে পারি। মর্জ্জি হয় দাও—না হয় অন্য কোথাও দেখ।

হতাশ চাষী বলে, এত বেলা পর্য্যন্ত এ'কে রাখলে কর্ত্তা, কোথায় দর পাব বল ত?

হরগোবিন্দ হাসিয়া বলে, মাল না জমলে কখনও বাজার দর ওঠে? তোরা যদি এক কথার মানুষ হতিস আমাদের এত বকতে হয়!

আমাদের মুগ কলুইয়ের দর দেখছ কর্ত্তা—চালের দর—কাপড়ের দর দেখছ না। কি খাই বল ত?

হুঁ, চাষার ঘরে ভাতের অভাব! তোরাই ত রাজা আজকালকার দিনে।

আর দুই পয়সা পর্য্যন্ত দর তুলিবার জন্য লোকটা পুরা পাঁচ মিনিট ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে থাকে। এক পয়সা পর্য্যন্ত উঠিয়া হরগোবিন্দ বাইকটা টানিয়া বাহির করে ঘর হইতে।

দোকানের সামনে বাইক বার করিয়া বলে, মণি, মালটা ওজন করে দাম চুকিয়ে দিও। বারোয়ারির চাঁদা—দস্তুরি বুঝে নিও।

তা বলিতে নাই এমন করিয়া যুদ্ধের বাজারে হরগোবিন্দ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কয়েক হাজারের পুঁজি—লাখে দাঁড়িয়েছে এবং লাখের অঙ্কগুলি দ্রুত ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতেছে।

কোন দেশে বোমা—শেলের ঘায়ে মাটি বিধ্বস্ত হইতেছে, জনপদবাসীরা বিদীর্ণ দেহে মৃত্যুবরণ করিতেছে—সে সংবাদ ছাপার হরফে নিত্য পরিবেশিত হইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দুঃখ-দর্শনের দায়িত্ব তাহার মধ্যে নাই বলিয়াই ভয়ঙ্করকে তত দূর হইতে আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হয়। হরগোবিন্দের হিসাবে—জনপদ বা মানুষ উৎসন্ন যাওয়ার সঙ্গে তৎপ্রদেশজাত দ্রব্যাদির চাহিদাও সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে। অবশ্য জন বা জনপদের ধ্বংস কামনা সে করে নাই, কিন্তু গুদামজাত দ্রব্যাদি যাহাতে অধিকতর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হয়—এই প্রার্থনা অহোরাত্র সে করিতে থাকে। যাহা হউক, আজ গঞ্জ হইতে ফিরিয়া তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল।

পরিপাটি পঞ্চ ব্যঞ্জনের পরিবেশিত মিহি চালের সুগন্ধি ভাত থালার শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। গরম গাওয়া ঘি পাতে দিতে আসিলে হরগোবিন্দ হাত বাড়াইয়া নিষেধ করিল। ঘন দুধের বাটিটাও বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিল। মাছের মুড়াটার পানে বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, নিয়ে যাও।

বড় মেয়ে বলিল, কেন বাবা, শরীর খারাপ হয়েছে?

—না।

—তবে? নন্দাপুকুরের মাছ—তুমি ভালবাস—

—ভাল লাগছে না, নিয়ে যা।

কোন রকমে আহার সারিয়া হরগোবিন্দ উঠিয়া পড়িল।

দুগ্ধফেননিভ শয্যা। টান মারিয়া সাদা চাদরখানি উঠাইয়া দিল। একটা মাদুর মেঝের উপর পাতিল ও একটা পাশবালিশ ও মাথার বালিশ লইয়া ঘুমাইবার আয়োজন করিল। ঘুম কি কিছুতে আসিবে? গুরু মাধ্যাহ্নিক আহারের আলস্যকে ধরিয়াই না তাহার আবির্ভাব! আজ আহার গুরুতর হয় নাই, চিন্তার ভারে আলস্য আত্মগোপন করিয়াছে। খানিক এপাশ ওপাশ করিয়া হরগোবিন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এর জন্য আমিই দায়ী? এমন ত নয় যে—লোকে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে—আর আমার টাকা বাড়ছে দিন দিন। এর আগে কি না খেতে

পেয়ে লোক মরত না, না ব্যবসাদারের টাকা বাড়ত না। লাভের অঙ্ক কিছু বেড়েছে বটে, সেটা বাজারের জন্যই। চার গুণ চড়া দাম দিয়ে জিনিস কিনছি কম ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে? চার গুণ লাভ—ও ত ন্যায্য লাভই। আজ জিনিষের দাম আট দশ গুণ বেড়েছে বলেই টাকার অঙ্ক ফেঁপেছে। যুদ্ধের আগেও টাকার মালিক ছিলাম—হিসাব মিলিয়ে দেখলে—আজও তাই আছি।

কিন্তু এই স্তোকবাক্যে মন প্রবোধ মানিতেছে না। বাইক করিয়া আসিবার পথে বুনো ও দুলে পাড়া পড়ে। সেখানে কোনদিন নামিবার দরকার হয় না। বড় অশ্বত্থ গাছতলাটায় একপাল উলঙ্গ ছেলে মেয়ে ধুলাবালি মাখিয়া হৈ হৈ করে, কয়েকটা অতিকায় কুকুর বাইকের আবির্ভাবে ঘেউ ঘেউ শব্দে তাড়া করিয়া খানিক দূর আসে, ভাঙা চালাঘরের দাওয়া হইতে ছিন্নবসনাবৃতা কোন মেয়ে হয়ত মুখ বাড়াইয়া সুবেশ আগন্তুককে খানিকক্ষণের জন্য দেখিয়া লয়। ময়লা রং—ময়লা কাপড়—তৈলাভাবে পিঙ্গল বর্ণের চুল—দেহও প্রায় কঙ্কালসার—সেদিকে চাহিবার প্রয়োজন হরগোবিন্দের কোন দিন হয় না, বরং বাইকটা জোরে চালাইয়া দেয়।

আজকাল ধুলাবালি মাখা উলঙ্গ শিশুর দল বড় অশ্বত্থ গাছতলায় হৈ হৈ করিয়া খেলা করে না, অতিকায় কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ শব্দে তাড়া করিয়া আসে না। দাওয়ার ছিন্নবসনা প্রেতিনীমূর্ত্তিও চোখে পড়ে কম।

তবু ওই গাছতলাটায় আসিয়া হরগোবিন্দ থামিল।

কয়জন শীর্ণকায় লোক—একটা বছরদশেকের ছেলেকে ঘিরিয়া 'হায়' 'হায়' করিতেছে। বিলাপের ধ্বনি উচ্চ নহে, মনকে স্পর্শ করে। অন্তত ব্যাপারটা জানিবার কৌতূহলেই হরগোবিন্দ বাইক থামাইল।

শুধাইল, কি হয়েছে রে?

—আজ্ঞে, কুঞ্জর ছাওয়ালটা গেল।

—মরে গেল? কেন?

—কেনে? এক মুঠো জুটাতে নারলে, আজ চারদিন ভুঁখা। একটু পানি খেয়ে বেঁচে বাবু!

—ওর বাপ কাজ করে না!

—ভুখা। দশ আনা মজুরি—গুষ্টিশুদ্ধ খেতে। এক পালি চালের দাম আট আনা। এক কাঠা না হলে চলে?

—ছেলেটার অসুখ হয়েছিল বুঝি?

—প্যাটের ব্যামো।

আর একজন বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া বলিল, কচু। না খেতে পেলে আমরাও মরবো বাবু! হাঁ বাবু, চাল কি পাওয়া যাবেক না। আমরা ভুঁখা থাকবো?

জনতা হরগোবিন্দর পাশে জমিতেছিল। অশ্বত্থতলায় সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল। ওটা কি নরদেহ না আধপোড়া কাঠ একখানা ধুলার উপর পড়িয়া আছে? মানুষের দেহ এত কুশ্রী হইতে পারে? গঠনে নয়—বর্ণে নয়—ওর শক্ত দেহটার আড়ষ্ট ভঙ্গির মধ্যে কঠিন মৌন অভিযোগ এই অবসরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ওষ্ঠ রৌদ্রঝলসিত কচি পাতার মত এলাইয়া পড়িয়াছে—কালো শীর্ণ মুখে সব কয়টি দন্ত সুপ্রকট। চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে—তবু আধনিমীলিত। অন্নবঞ্চিতের তীব্র অভিযোগের রূপ এমন করিয়া কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নাই হরগোবিন্দ।

তাড়াতাড়ি বাইকে উঠিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। এবং স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একটা টাকা জনতার পানে ছুঁড়িয়া দিয়া গেল।

টাকার আওয়াজও অবশ্য হইল না, অনশনজনিত মৃত্যুর বীভৎস রূপটি তার বাইকের সঙ্গ লইল। বালির রাস্তায় নিঃশব্দে চলিতেছিল বাইক—নিঃশব্দে বিকশিতদন্ত উলঙ্গ কঙ্কাল অনুসরণ করিতেছে হরগোবিন্দের। সভয়ে সে পিছনে চাহিল। দু'পাশে আস-শ্যাওড়া ও বনকুলের ঝোপ। সেগুনের জঙ্গলও বাঁ পাশের বাগানে ঘন হইয়াছে। ডান ধারে নীল কুঠির ভগ্নাবশেষ ঢাকিয়া বুনো নীল চারায় ফুল ফুটিয়াছে অজস্র। ঝোপে গা ঢাকিয়া ক্লান্তকণ্ঠ ঘুঘু ডাকিতেছে। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ও ডাক সময়ে সময়ে মিঠা লাগে, আজ অত্যন্ত করুণ বোধ হইতেছে।

শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও মনের বিমুখতা গেল না। সব কিছুতেই বিষাদের একটি সূক্ষ্ম পরদা প্রসারিত। স্বর্ণ-সৌধের জৌলুসে একদিক ভাবী আনন্দ ও গর্ব্ব-কল্পনায় বিস্ফারিত—অন্য দিকে গাঢ় ছায়া বুনো পাড়ায় অশ্বত্থ গাছতলাটায় আজ প্রথমে নজরে পড়িল। স্বর্ণের দাহ আছে—দীপের দাহে সে উজ্জ্বল হয়, কিন্তু তলাকার খাদ? কতখানি খাদের ভারে কতটুকু সোনা চিক্ চিক্ করে!

না তৃপ্তি হইল পাতকুয়ার শীতল জল মাথায় ঢালিয়া—না আসিল আহারে রুচি।

কেন মরিল বুনো ছেলেটা! রোগেই ও মরিয়াছে। রোগ নহিলে মানুষ মরে? কিন্তু রোগের হেতু যদি অনাহার হয়—হরগোবিন্দর অনুশোচনাকে ঠেকাইবে কে! রোগই তো রোগের যথার্থ কারণ নয়।

বারকতক এপাশ ওপাশ করিয়া হরগোবিন্দ চক্ষু বুজিবার উপক্রম করিল।

পত্নী সুরবালা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ওমা, এখনও ঘুমোও নি!

—না। ঘুম না হ'লে জোর আছে? তিক্তস্বরে হরগোবিন্দ উত্তর দিল।

—ওমা, তা মারমুখো কেন! না হয় নাই ঘুমুলে।

—নাই ঘুমুলে। নিজেদের ত শিরদাঁড়া খাড়া করে দোকানের গদিতে গিয়ে বসতে হয় না রাত বারোটা পর্য্যন্ত। খদ্দেরের সঙ্গে বক্ বক্ করতেও হয় না। দুপুরের একদফা ঘুম না হ'লে আর ক্ষতি কি?

সুরবালা ঈষৎ কাঁদিয়া কহিল, তা আমি কি বারণ করেছি তোমাকে ঘুমুতে ?

—না, তুমি বারণ করবে কেন, বক্‌বক্‌ করছ তো মেলাই।

বাবাঃ—বাবাঃ—এই গেলাম। সুরবালা বাহির হইয়া যায় দেখিয়া হরগোবিন্দ সজোরে পাশবালিশটা একদিকে আছড়াইয়া তড়াক্‌ করিয়া মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল।

সুরবালা ফিরিয়া কহিল, উঠলে যে।

—নাঃ—ঘুমোব না আর। একটা পান দাও।

—না, গো—না, শুয়ে পড়। শেষকালে খোঁটা দিয়ে পোঁটা বার কর আর কি !

—না, পান দাও।

পান চিবাইতে চিবাইতে মনে হইল, চিন্তা অনেকখানি তরল হইয়াছে। প্রসন্ন কণ্ঠে কহিল, একটু দোক্তা দেবে ?

—হাঁ তারপর মাথা ঘুরে পড় আর কি।

—একটুখানি। বেশ মুখ চোক কান গরম হয়ে উঠবে, মাথাটা একটু ঘুরবে—

—তারপর দোকান কামাই করে আমার ওপর তম্বি কর।

—তুমি বুঝছো না, দোক্তা না পেলে মদ খেতে হবে।

—বল কি, এতদূর অধঃপাতে গেছ ?

হরগোবিন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দোকানে মন্দ কাটিল না।

দক্ষিণপাড়ার দীনু কৈবর্ত্ত আসিল। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল বলিয়া লোকটার চেহারা শাঁসে-জলে। অগ্নিমূল্যের অন্ন লইয়া যে আক্ষেপ করে—তাহার চেহারা অনেকটা রসিকতার মত। বলে, কি হে দত্তের পো, টাকা টাকা সের দাঁড়াবে চাল ? হিসেবের বালাই নেই—তোফা ওজন দাও—আর দাম বুঝে নাও। কি চেহারা কি হয়েছে বল দেখি। বলিয়া নেয়াপাতি গোছ ভুঁড়িটায় একটা টোকা মারে।

হরগোবিন্দ হাসিয়া উত্তর দেয়, আমাদের কি খুড়ো—চিনির বলদ বই ত না। কিনছি—চড়া দামে—ছাড়ছি চড়া দামে। লোকে খেয়ে বাঁচে তাতে কি অসাধ আমাদের।

—তা ত বটেই। নিজেদের বাঁচাটাই বা কম কি হে ? আচ্ছা ভায়া, গবর্ণমেণ্ট ত রেট বেঁধে দিচ্ছে জিনিসপত্তরের—অথচ ও দামে বাজারে মাল পাওয়া যায় না কেন ?

হরগোবিন্দ চোখ টিপিয়া বলে, বোঝ ব্যাপার। বাঁধা দরে যদি জিনিস পেতাম—এত দিনে লাল হয়ে যেতাম।

—তা মন্দই বা হয়েছে কি। কালো চামড়া বলে ভেতরের লাল যতই বাড়ছে—ওপরে কালোর চেক্‌নাই মারছে। হেঃ—হেঃ—

ওধারে গোলযোগ হইতেই হরগোবিন্দ মনোযোগ দিলেন, কি রে ভিনু—গোল কিসের ?

আজ্ঞে—দেখুন না, এক পয়সায় নুন নিয়ে আবার ফাউ চায় ?

—ফাউ ! চক্ষু বিস্তৃত করিয়া হরগোবিন্দ বলে, যুদ্ধের বাজারে ফাউ ! ওহে মোড়লের পো—ও ব্যবসা আমরা করি নে। অন্য দোকানে দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি করুণ কণ্ঠে বলে, দেখুন না কর্ত্তা—এক পয়সার নুনে দু'বেলা চালানোই মুশকিল !

—কি হে—কি এত তরকারি রাঁধছ এই আক্রার বাজারে ? হরগোবিন্দ ধারালো কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—আজ্ঞে তরকারি পাব কোথায়, নুন ভাতই ত সম্বল। তাই ত নুন একটু বেশিই লাগে।

তা হ'লে দু' পয়সার নাও। রায় দিয়া বিচারক যেমন প্রসন্ন দৃষ্টিতে এজলাসের দিকে চাহিয়া জন-মনোভাব পরীক্ষা করেন—তেমনই প্রসন্ন আস্যে হরগোবিন্দ ক্রেতৃমণ্ডলীর পানে চাহিয়া হাসিল।

ভবতারণ ভট্টাচার্য্যের হাতে মতিহারি দোক্তাপাতা ও কয়েক প্রকারের মশলার মোড়ক ছিল। তিনি হরগোবিন্দের হাসিতে মনে করিলেন—তাঁহার মতামতের প্রয়োজন এখানে সর্ব্বাধিক। একেবারে গদ্‌ গদ্‌ চিত্তে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন। তা যা বলেছ ভায়া, চাওয়াও দোষের—না চাইলেও নয়, অথচ—

হরগোবিন্দ কহিল, বসুন না দাদা, এই যে কেরোসিন কাঠের বাকসোটায় চট পাতা আছে, তুমিও একটু বসো দীনুখুড়ো—পরামর্শ আছে।

ভবতারণ সাগ্রহে আসন গ্রহণ করিলেন, দীনু একটু নড়িয়া নিজের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকট করিল।

হরগোবিন্দ বলিল, বলছিলাম কি জান খুড়ো, এই যে মাগ্যিগণ্ডা—এতে দেশের লোক বাঁচবে না, শেয়াল কুকুরের মত মরবে। দিন থাকতে এর প্রতীকার করা দরকার নয় কি।

সাগ্রহে মাথা নাড়িয়া ভবতারণ কহিলেন, এতো তোমার উপযুক্ত কথা ! দেশের লোকের জন্যে আর ক'জন ভাবে !'

হরগোবিন্দ বলিল, যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে দিন দিন—তাতে আর উদাসীন থাকা উচিত নয়। আজ বুনো পাড়া দিয়ে আসছিলাম। দেখি না—অশ্বত্থ গাছতলায় একটা ছোঁড়া না খেতে পেয়ে---

—বল কি, না খেতে পেয়ে ভিক্ষে চাইছিল ?

নিজেকে সংবরণ করিয়া হরগোবিন্দ কহিল, ঠিক না খেতে পেয়ে নয়—অবশ্য রোগেই ছোঁড়াটা মরে গেছে।

—মারা গেল। অ্যাঁ !

ভবতারণের বিস্ময় দেখিয়া দীনু বলিল, মারা যাওয়াটা আর আশ্চর্য্যের কি দাদা, বরং বেঁচে থাকাটাই—

হরগোবিন্দ বলিল, যাই হোক, লোকে বলছে, রোগ—না হয় ধরে নিলাম—অনাহার। বলি মারা তো গেল ! একটু থামিয়া বলিল, বিদেশে যা হয় হোক—দেশের মাটিতে এসব কি কাণ্ড বল তো দাদা ?

ভবতারণ বলিলেন, কলির চার পো পূর্ণ হ'য়ে এলো আর কি !

—যাই হোক, আমাদের কি উচিত নয় এর প্রতীকার করা!

দীনু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আমরা তুচ্ছ প্রাণী—আমাদের কতটুকু সাধ্য যে—

ভুবতারণ বলিলেন, এই দেখ না, ষষ্ঠীপুজোর দক্ষিণে পেলাম—তবে দোক্তাপাতা কিনতে পারলাম। একদিন হাই তুলে তুলে নাচিয়ে পড়েছিলাম ভাই।

হরগোবিন্দ বলিল, আপনারা যা পারেন দেবেন—সে আমি চাইছি না, কিন্তু নিজে তো কিছু লাভ করলাম। তাই ভাবছি, গরিব ভিখিরীকে কিছু কিছু দেব। প্রত্যেক ভিখিরীকে এক পালি করে খুদ কি এক পালি করে কলাই।

—ভাল—ভাল। ভবতারণ সাধুবাদ করিলেন।

—কিন্তু কি করে কাজ আরম্ভ করব তোমরা পরামর্শ দাও খুড়ো।

—পরামর্শ আর কি, একটা শুভদিন দেখে—

দীনু হাসিয়া বলিল, পাঁজি দেখবার দরকার নেই। কাজটা শুভ হ'লেও ব্যাপারটা বিবেচনা বিচারের ওপর দাঁড় করিও না। যত দেরি হবে—ততই মুশকিল।

—তা হ'লে—

—কালই আরম্ভ করে দাও। তবে একার সাধ্যে তোমার কতটুকু হবে জানি না। অন্তত ব্যবসায়ী মহলকে যদি টানতে পার আর কন্ট্রোলের চাল জোগাড় করতে পার তো বেশ কিছুদিন চলবে।

—বেশ তো, কন্ট্রোলের চালের জন্ম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একখানা দরখাস্ত দিই—আর ব্যাপারীদের জানাই।

বড় ব্যাপারী কানাই সাধুখাঁ বলিল, তোমার মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়েছে গোবিন্দ। না খেতে পেয়ে লোক মরছে—সে দায়িত্বও তোমার?

—কেন নয় বলুন? আমরা যদি কিছু কম লাভ করি—

—তা হ'লেও লোক মরবে। যারা কিনতে পারে তারা পঁচিশ আর পঁয়ত্রিশ টাকার তফাৎ খুব বেশি মনে করে না; বুনো বাগ্দীদের বাঁচাতে হলে যে রেটে চাল দিতে হবে তা যুদ্ধের বাজারে আকাশকুসুম।

—তবে কি বলতে চান লোক মরবে?

—উপায় কি! দ্বাপরে ভূভার হরণের জন্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন। মরাটাই হচ্ছে জগতের মুক্তি—এটা ভুলে যেয়ো না। ভাল কথা, যুদ্ধে এত লোক মরছে কেন? ওরা কি জানে না এ কি বিষম খেলা!

—যাই হোক—যুদ্ধে মরার সান্ত্বনা আছে, সে কৈফিয়ৎ রাষ্ট্র দেয়, আমার মৃত্যুর কৈফিয়ৎ যে আপনাকে দিতে হবে।

—কেন, তোমার কর্মফল তা'হলে আমি বইব বল। ও কিছু না। বলি হিন্দুর ছেলে গীতা মান ত? কে কাকে মারে। নিমিত্ত মাত্র। যে মরবার সে মরবে—যে থাকবার সে থাকবে, মাঝে হতে নিজের শান্তি নষ্ট করো না।

—আমি মনে করেছি—আপনারা সাহায্য না করেন—আমি নিজেই কিছু সাহায্য ওদের করব।

—বেশ ত—ভালই ত।

—একশ মণ খুদ, আর একশ মণ কলাই বিলুব।

—খুব ভাল। তবে কি না লাভ পুরতে যদি তিন কি সাড়ে তিন হাজার বাকি থাকে—আপশোষ ঘুচবে না। পুকুরের জল হাজারটা কলসীতে ভরলে কমে যায়—নদীর জল কমে না—ভায়া।

—নাই বা করলাম লাভ।

—বেশ ত, অন্যে ফাঁপলে যেন হিংসে কর না।

—হিংসে করব কেন?

—মানুষের স্বভাব ত, তাই বললাম। তিনি হাসিলেন।

কথাটা খোঁচার মত—তথাপি হরগোবিন্দ রাগ করিল না। ঠকে হারিয়াও মনে যে আনন্দ হয়—সে অভিজ্ঞতা এই প্রথম লাভ করিল।

রাত্রির আহারটি তৃপ্তি সহকারেই হইল। প্রতীকার না হউক—প্রতীকার করিবার বলবতী ইচ্ছাতেই নিজেকে খানিকটা হাল্কা মনে হইল। যেন দশ মণের বোঝাটা কাঁধ হইতে নামিয়া গেছে।

বিছানায় শুইয়া হরগোবিন্দ ভাবিতে লাগিল, মাত্র দুশো মণ জিনিস—তিন বড় জোর সাড়ে তিন হাজার টাকা। তাও লাভের অঙ্ক আধাআধি, তাইতেই আমার লক্ষ টাকা পুরবে না? পাগল! বড় ব্যবসাদার হলেই মন বড় হয় না। জানি ত সাধুখাঁকে।

নিজেকে আর একটু দৃঢ় করিয়া পাশবালিশটা চাপিয়া বাঁ পাশ ফিরিল। সকলের দায়িত্ব আমার নয়, কিন্তু নিজের পড়শীকে দেখাও ত কর্তব্য। কাল আসতে আসতে বাজারে শুনলাম—জোলারা বলাবলি করছে, না খেতে পেলে আমরা চুরি করব—ডাকাতি করব, না হয় খুন করব। কোম্পানী ফাঁসি দেয়—দেবে। এমনিতেও মরবো—অমনিতেও…। আচ্ছা, ধর—ওরা সত্যিই যদি চুরি ডাকাতি করে…

বাঁ পাশে বেদনা বোধ হইতেই বালিশ সমেত হরগোবিন্দ ডান ধারে কাত হইল।—না, রাজার আইন বড় কড়া। মুখে যে যাই বলুক—সাহস করবে না। তা'হলে বুনোরাই কি রেয়াৎ করতো আমাদের। যে ডাকাতের দল! হাঁ—কড়া আইন বটে। এমন শাসন করছে যে—মরবে জেনেও আঙুলটি তুলতে পারে না।

আপন মনে হাসিল। তারপর খানিকটা সুস্থির হইয়া চিৎ হইয়া শুইল।

—নাঃ, লাভ ত যথেষ্ট করলাম, কিছু দিলে আর ক্ষতি কি! যদিও আমি ওদের মুখের গ্রাস কাড়ছি নে—তবু অনেকে বলছে ত—যে পাপের ভাগী হচ্ছি। দিলামই বা কিছু। কালই বিলোবার ব্যবস্থা করব। যে ভিক্ষেয় আসবে তাকেই কিছু খুদ বা কলাই দেব। আচ্ছা, ওদের বলেই দিই।

হরগোবিন্দ ডাকিল, শুনছো ?

সুরবালা মেঝের শুইয়া তালপাখা নাড়িতেছিল। ভাদ্রের গুমোটে শীঘ্র ঘুম আসে না। তা ছাড়া মুখের মধ্যে পান ও দোক্তা এখনও সম্পূর্ণ মজে নাই।

উত্তর দিল, কি বলছ ?

সুরবালার কণ্ঠস্বরে হরগোবিন্দের চমক ভাঙিল। তাই ত, এত শীঘ্র বিচার-বিবেচনা না করিয়াই একশো মণ ক্ষুদ ও একশো মণ কলাই বিতরণের সঙ্কল্প ব্যক্ত করা উচিত কি ? দানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া—ধর যদি কোন কারণবশত না দিতে পারা যায় ত অপযশের একশেষ। তার চেয়ে আর একটু ভাল করিয়া হিসাব করিয়া শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করা ভাল। ক্ষুদ ও কলাই কিছু কালই গুদাম হইতে পলাইয়া যাইতেছে না। সাধুরা মিথ্যা বলে নাই, পুকুরের জল কলসীতে ভরিলে কতক্ষণ থাকে ! তার চেয়ে নদীর জল···দ্বিতীয় লাখ পূরিতে কত অর্থের প্রয়োজন সেটা হিসাব করিতে ক্ষতি কি ! দান করিতে কে নিষেধ করিতেছে, কিন্তু হিসাব না রাখাও মূর্খতা।

সুরবালা বলিল, কৈ—বললে না কিছু ?

হরগোবিন্দ বলিল, না, একটু জল চাইছিলাম। তা থাক !

—থাক কেন, দিচ্ছি।

—না, না থাক। আলো জ্বেলে ঘুমটাকে মাটি করব না। সাগ্রহে সে নিষেধ করিল।

সুরবালা খানিক হত-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল পরে আপন মনে বলিল কত খেলাই জান। তোমার আজ কি হয়েছে বল তো ?

হাই তুলিয়া হরগোবিন্দ বলিল, আজ ঘুম আসছে—থাক কাল বলবো।

সত্য সত্যই হরগোবিন্দ ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রতিবেশী চীনের রাজ্যে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম্. এ., পিএইচ. ডি

আজ পাঁচ দিন হ'ল চীন দেশে এসেছি। বিমানপোতে উঠবার আগে দেশের অনেক বন্ধুবান্ধবের কাল্পনিক ভয়ের কথায় মনে একটা ধাক্কা লাগত—একেবারে লড়াইয়ের অবস্থা বলেই। তথাপি আমার মনের গোঁড়ামি ঠিকই ছিল। মা এবং স্ত্রী উভয়েই তা জানতেন বলে বাধা দেন নি—তাতে অমঙ্গল হতে পারে। প্রাণের আবেগ চাপা দিয়ে নীরবে আমার চীনযাত্রার সব ঠিক করে দিয়েছিলেন। এসব কথা বিমানপোতে চড়েও ভুলতে পারি নি। অথচ উপরে মেঘলোক থেকে মর্ত্যের সুন্দর দৃশ্য অনুক্ষণই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে চঞ্চল মনকে ভুলাবার চেষ্টা করছিল। দেবতাত্মা হিমালয়ের বিশাল পূর্ব্বভাগের উপর দিয়েই আমরা উড়ে এসেছি। সারি সারি ছোট বড় শৃঙ্গ—গায়ে সবুজের আবরণ মাথায় বরফের ধবল টুপী, শূন্য পথে বসে এসব দেখার সুযোগ আর হয় নি। বাড়ীর চিন্তা, প্রিয়জনের চিন্তা মনকে ঘোলায়িত করা সত্ত্বেও সে দৃশ্যের ছবি এ বিবরণে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কেবল সময় ও সামর্থ্যের অভাবে সে রূপ পরিস্ফুট হওয়ার সম্ভাবনা এখানে নেই।

আমাদের বিমানপোতখানি ঘরর্ ঘরর্ শব্দের তেজ কমিয়ে যখন ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছিল, তার অনেক পূর্ব্বেই সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ডুবে গিয়েছে। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়েই আমরা চলছি। কিছুক্ষণ পর নিম্নদেশে দুই-চারটি আলো দেখা দিল; ক্রমে আরও, আরও আলো। চীনা সহযাত্রিকরা তা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। "কুন্‌মিং, কুন্‌মিং" বলে চেঁচিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিল তাদের দেশে এসে পড়েছি। মিনিট দশেকের মধ্যেই বিমানপোতখানি মাটিতে নেমে সোজা ষ্টেশনের রাস্তায় ছুট দিয়ে গিয়ে থামল। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে সাতটা বেজেছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে আস্তে গিয়ে নামলাম। চীনা পুলিস ও কাষ্টমসের লোক দাঁড়িয়ে আছে—আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল কাষ্টমসের ঘরে। চীনা যাত্রিকদের সুটকেশ ইত্যাদি খুলে দেখবার হুজুগ সুরু হ'ল। আমি চুপ করে আমার লাগেজের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। খানিক পরে আমার মালও দেখা হ'ল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। আমাকে নেবার জন্যে লোক সেখানে থাকবে বলে আশা ছিল। কিন্তু কাউকেও আমার সন্ধান করতে না দেখে অবশেষে সি, এন, এ, সি'র গাড়ীতে চড়ে তাদের আপিসে গিয়ে উঠলাম। আপিসের একজন কুন্‌মিঙের ওয়াই, এম, সি, এ'র সেক্রেটরীকে ফোন করে আমার কথা বলল—সেখানে রাত্রিটা আমার থাকার কোন বন্দোবস্ত হতে পারে কিনা। ভাগ্যক্রমে সেক্রেটরী সে-দিন তাদের কোন M.

D. Roy নামক জনৈক আমেরিকানকে আশা করছিলেন। আমার D.N. Roy নাম শুনে তাকেই ভাবলেন এবং সত্বর ওয়াই, এম, সি, এ-তে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন। সেখানে গিয়ে উঠলাম। সেক্রেটরী আমাকে ভাল করে দেখে তাঁর আশ্চর্য্য ভাবটি চাপা দিয়ে যথারীতি অভ্যর্থনা করলেন। গাড়ীর ভাড়াটিও তিনি চালিয়ে দিলেন, কারণ আমার কাছে চীনা টাকা ছিল না। তারপর তাদের স্পেশাল গেস্ট রুমে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন যে সেখানেই আমি থাকতে পারব। ঘরটি বেশ ভালই মনে হ'ল। কিন্তু আমার তখন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, কি করা যায় তাই ভাবনা। ভাগ্যক্রমে দেখি সেক্রেটরী একটি ছোট মোচায় করে খাবার এনেছেন,—বললেন, "কেক"। তারপর বিদায় নেবার সময় একটি তালা ও চাবি আমার হাতে দিয়ে বললেন যেন ঘর তালাবদ্ধ না করে কখনও বাইরে না যাই। তাই করে আমি 'ওয়াশ রুমে' গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। মোচাটি খুলে যখন কেক দেখলাম তখন ক্ষুধার উপরই রাগ হ'ল। যাক কোনমতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন রাত প্রায় এগারটা, ঘুম মোটেই হ'ল না। চিন্তা, কি করে আমার গন্তব্যস্থানে যাব; চীনাভাষা যে একটুও বুঝি না, রাস্তায় নামলে আর কোন ভাষা ত চলে না! ভোরে উঠে সেক্রেটরীর কাছে গিয়ে বললাম যে, আমার চেংকং যাওয়ার কোন উপায় তিনি করে দিতে পারেন কি না। উত্তরে বললেন, "আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।"

কিন্তু কোন উপায়ই হতে দেখছি না। একবার চার-তালায় আমার সেই ঘরে যাই, সেখান থেকে জানালা খুলে রাস্তার লোক দেখি, আবার তালা বন্ধ করে নীচে সেক্রেটরীর ঘরের কাছে গিয়ে ঘুরি। সেক্রেটরী আবার আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "আপনি আমাদের কাফেতে গিয়ে প্রাতর্ভোজন করুন। আমি বলে রেখেছি, আপনার হিসাবটা লিখে রাখবে। আপনার ভারতীয় টাকা বদলি করে চীনা টাকা হলেই তখন সব দিতে পারবেন। আর আমি সে টাকা বদলির বন্দোবস্ত করছি।" আমি ধন্যবাদ দিয়ে কাফেতে গিয়ে খেতে বসলাম। খাবার এল,—একটা বাটিতে কিছু সুপ-মিশ্রিত নুড্‌লস্, আর একটায় কিছু সব্‌জী সিদ্ধ। দুখানা সরু লাঠি (chop sticks) খাবার বন্দোবস্ত, আমি ভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে লাঠি দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই—একখানা চামচ হলে ভাল হয়। কাফেওয়ালা হাসতে হাসতে গিয়ে একখানা সাদা চীনা চামচ নিয়ে এল। তাই দিয়ে দড়িদড়ি নুড্‌লস্‌গুলি সুপসহ গিলে ফেললাম। খাওয়া শেষ করে আবার সেক্রেটরীর সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলাম, কি উপায় করা যায়। চেংকং কুন্‌মিং থেকে প্রায় আঠার-উনিশ মাইল হবে। ট্রেনে কিম্বা বাসে চড়ে যেতে হয়। কিন্তু কোথায় ষ্টেশন, কি করে চীনাভাষা না জেনে গিয়ে টিকিট কিনব,—ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলাম না। ওয়াই, এম, সি, এ-র আরও দুই-চার জন চীনার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তারাও চেষ্টায় রত হ'ল। ইতিমধ্যে একবার 'ওয়াশ রুমে' গেলাম। সেখানে আয়না ছিল তাতে নিজের মূর্ত্তি দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। দেখি, আমার সমস্ত দাঁতগুলি একেবারে কালো রং হয়েছে। সুপ খেয়ে এই বিকট মূর্ত্তি হয়েছে আমার! মুখ খুলে কথা বললেই হ'ল। খুব করে দাঁত ঘষতে লাগলাম,—বিশেষ কিছু ফল পেলাম না। অবশেষে কাছের চুল্লী থেকে ছাই ও অঙ্গার দিয়ে দাঁত ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে কিছু ফল হ'ল। তারপর রুমাল দিয়ে ঘষে আরো খানিকটা কাজ হ'ল।

হঠাৎ দূর থেকে শুনতে পেলাম, "ডক্টর রয়! ডক্টর রয়!" এই বলে সেক্রেটরী আমাকে সজোরে ডাকছেন। গিয়ে দেখি তাঁর কাছে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। আমার কাছে পরিচয় দিলেন যে উনি ওয়াং সিয়েন সন (Mr. Wang), চেংকং কলেজের ক্যাশিয়ার। দৈবক্রমে উনি আজ এখানে এসেছেন। আমাকে মিঃ ওয়াং আগ্রহের সহিত বললেন যে তিনি আমার যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করবেন। একটায় ট্রেন। আমি যেন শীঘ্র খাওয়াটা সেরে নি, একটু পরেই এসে তিনি আমাকে নিয়ে ষ্টেশনে যাবেন। তাই হ'ল। আমার খাওয়ার সব খরচ দিলেন। পরে কুলী ডেকে মাল নিয়ে আমরা ষ্টেশনে চললাম। গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে কি গাড়ী! মনে হ'ল যেন পুরানো কাঠের বজরা কয়েকখানা নীচে চাকা লাগিয়ে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত তার দরজা জানালা, অদ্ভুত তার মসীবরণ রং, অদ্ভুত তার ভিতরে বসবার ব্যবস্থা। শুনলাম, এ গাড়ী পূর্ব্বে ইন্দো-চীনের ফরাসী প্রভুদের জিনিস ছিল, এখন চীন-সরকার তা নিয়ে নিয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ীতে দাঁড়াবার স্থানও রইল না; তবে আমাদের দেশের মত ভীড়ের অসহ্য হৈ চৈ এখানে শুনতে পেলাম না, কেবল মাঝে মাঝে দুই এক জন মহিলা ভীষণ ধাক্কা খেয়ে আস্তে আস্তে প্রতিবাদ করছিল দেখলাম। মিঃ ওয়াং

কোনমতে আমার মাল তুলে দরজার কাছে রেখে দিলেন, আমরা তার পাশে কষ্টে দাঁড়াবার স্থান পেলাম। ইতিমধ্যে চেংকং কলেজের একটি ছাত্রও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। চাপাচাপি ঠেলাঠেলির ভিতর অস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাটল। অবশেষে বাঁশীর শব্দ হ'ল, আমরা চেংকং চললাম।

ঘণ্টাখানেক সুন্দর সবুজবরণ সব্জীর মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে আমরা এসে চেংকং ষ্টেশনে পৌছলাম। গাড়ী থেকে নামা মাত্রই এক জন কুলী দুইটি ঝুরি-ঝুলানো ভার কাঁধে নিয়ে এসে আমাদের মাল ধরল, অপর কুলীগুলি তাই দেখে পাশ কাটিয়ে অন্যত্র গেল। আমরা ষ্টেশনের পিছনে গিয়ে দেখলাম,—কতকগুলি জিন দেওয়া ছোট ছোট ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, পাশে অধিকারিগণ আমাদের ঘোড়ায় চড়ে খাবার জন্ত আহ্বান করছে। মালগুলি কুলীর কাঁধে চাপিয়ে কলেজের ছাত্রটী তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমি এবং মিঃ ওয়াং দুটি ঘোড়ায় দুজনে চড়ে চললাম কলেজের পথে। ষ্টেশন থেকে কলেজ প্রায় তিন মাইল, রাস্তা যেমন সরু তেমন আঁকা-বাঁকা। এক বার আমার ঘোড়াটা একটি মহিষের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে যেতে একেবারে পা ফস্কে নালায় পড়ে গেল। আমি ঘোড়াকে তবু না ছেড়ে শক্ত করে ধরলাম। ঘোড়াটা শেষে বসে পড়ল দেখে নামলাম। খানিক পরে ঘোড়াটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল, আর আমিও পিঠে চড়ে চাবুক লাগিয়ে ছুটলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পর কলেজে এসে পৌছলাম।

৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪৪

রুশ নারী

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মানব-ইতিহাসের এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময়ে রুশিয়াতে সর্ব্বহারাদের কর্ত্তৃত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান যুগের দুইটি যমজ জাতক লেনিনবাদ এবং গান্ধীবাদের মধ্যে একটি—লেনিনবাদ—জয়যুক্ত হইল।

বহির্জ্জগতের চক্ষে সোভিয়েট রুশিয়া একটি জটিল প্রহেলিকা। কেহ বলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিশ্বমানবের ইতিহাসে বৃহত্তম এবং মহত্তম প্রচেষ্টা। কাহারও মতে মানুষের ইতিহাসে এত বড় অনর্থ আজ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। কেহ বলেন সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে। কেহ কেহ আবার এই মত পোষণ করেন যে ইহার ফলে মানুষের সর্ব্বপ্রকার প্রগতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং মানব-সংস্কৃতির অপঘাত ঘটিবে।

বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সোভিয়েট-রাষ্ট্র গত ছাব্বিশ বৎসরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিকোণের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন এত বিরাট্ এবং ব্যাপক যে, একটি প্রবন্ধে তাহার ক্ষীণতম আভাস দেওয়াও সম্ভবপর নয়। সোভিয়েট শাসন-পদ্ধতি যে রুশিয়াকে শক্তিশালী করিয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। ১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধে যে-রুশিয়া টেনেনবুর্গ যুদ্ধের পর দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া জার্ম্মানীর সহিত ব্রেষ্ট লিটভ্স্কের সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে সে-রুশিয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বার সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রতিযোগিতায় এ পর্য্যন্ত নিজের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব না হইলেও সমকক্ষতা প্রমাণ করিয়াছে।

এখন আলোচ্য বিষয়ে আসা যাউক। ভালই হউক আর মন্দই হউক, রুশ নারী পুরুষের সমকক্ষ। কেহ বলেন এ সমকক্ষতা নারীর প্রাপ্য। কেহ কেহ আবার এমতও পোষণ করেন যে, ইহার ফলে মানুষের জীবন হইতে রোমান্সের ঘটিয়াছে অবসান; আর সমাজ হইতে সমস্ত আনন্দ এবং মাধুর্য্যের হইয়াছে নির্ব্বাসন। শুধু তাহাই নহে; তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার ফলে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে।

খ্রীষ্টোত্তর দশম শতাব্দীতে রুশ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুশীয় সমাজ নারীর মর্য্যাদার আসন স্বীকার করিত। কুমারী কন্যা নিজের বর নির্ব্বাচন করিত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীই হইতেন পরিবারের কর্ত্রী। বিবাহ-বন্ধনের ফলে নারীর স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে সঙ্কুচিত হইলেও সে পুরুষের দাসীতে পরিণত

হইত না। প্রাচীন রুশ ইতিহাসে নারীর রাজ্যশাসন করিবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শারীরিক শক্তি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বেই ছিল নারীর স্থান। সেকালের গাথাতে 'Polyanitza' বা 'Amazon' অর্থাৎ পুরুষ-স্বভাব নারীর কাহিনীও পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিত এবং 'Vetcha' বা সামাজিক সমিতিতে তাহার স্থান পুরুষ অপেক্ষা নিম্নে ছিল না।

যুগে যুগে পুরাতনের ধ্বংস হয় আর এই পুরাতনের চিতাভস্মের উপর রচিত হয় নূতনের ভিত্তি। রুশিয়াতেও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নাই। নারীর অবস্থার অবনতি ঘটিল। এইজন্য প্রথমতঃ দায়ী খ্রীষ্টধর্ম্ম। মানুষের দুর্গতির দায়িত্ব এই ধর্ম্ম নারীর স্কন্ধে চাপাইয়াছে। পারিবারিক জীবনে মাতৃকর্ত্তৃত্বের স্থানে পিতৃকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার আক্রমণের ফলে সামাজিক অবস্থার আরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী কাল এই তাতারগণ ছিল রুশিয়ার ভাগ্যবিধাতা। রাজনৈতিক স্বেচ্ছাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঘটে অপঘাত। এই সমস্ত কারণে "দিবসের কর্ম্ম সহচরী" "যামিনীর নর্ম্মসহচরী"তে পরিণত হয়। তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল অন্দরে। পুরুষ হইল তাহার ভাগ্যবিধাতা। নারীকে বশে রাখিবার জন্য পুরুষের বল এবং বেত্র প্রয়োগের অধিকার সমাজ স্বীকার করিয়া লইল।

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে পিটার দি গ্রেটের সিংহাসনারোহণ রুশ ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁহার রাজত্বকালে রুশিয়াতে নূতন করিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার সূচনা হয়। পরবর্ত্তীকালে জারিনা এলিজাবেথ এবং ক্যাথারিন দি গ্রেট তাঁহাদের পূর্ব্বাপর নীতির অনুসরণ করেন। ক্যাথরিন দি গ্রেট তাঁহার স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। দীর্ঘ সুষুপ্তির পর রুশিয়ার নারীশক্তির জাগরণ আরম্ভ হইল। 'ডিসেম্বর বিপ্লবে'র' পরে সমগ্র দেশময় প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্লাবন বহিয়া গেল। মরিস হিণ্ডাসের কথায় বলিতে গেলে,

"a new woman made her appearance on the scene—a woman of initiative, self-reliance aware of her personality, with the will and courage to dash forth into the world to make her own conquests in accord with her own inner spirit."

অন্যান্য দেশের Suffragist বা নারীমুক্তি আন্দোলনের ঢেউ রুশিয়াতেও পৌঁছিয়াছিল। এই আন্দোলন সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম হইতেই এই আন্দোলন শিক্ষিত সমাজের সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জারতন্ত্রের দিনে যাবতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টায় নারীর সাহায্যের পরিমাণ উপেক্ষণীয় নয়। এই প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিয়া দেশে নববিধান প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রুশ নারী পুরুষের মতই অকাতরে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যাকারিণী Sofya Perovskya, Beshkovskya, Figner, Zassulitch এবং Spiridonova প্রভৃতির স্মৃতি কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে আজিও শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছে। অত্যাচারী শাসন-ব্যবস্থার কবল হইতে জাতির মুক্তি সাধন এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্থাপনের জন্য নরনারী সমানভাবে সংগ্রাম চালাইয়াছে এবং অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট মাথা পাতিয়া লইয়াছে। বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার পর এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, নারী-প্রগতিকে এখনও কেহ কেহ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। লেনিন বলিতেন যে, যে-জাতির অর্দ্ধাংশ রন্ধনশালার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ, মুক্তি তাহার জন্য নয়। নারীর শৃঙ্খলমোচন-প্রচেষ্টাকে জয়ী করা ছিল সোভিয়েট তন্ত্রের একটি প্রধান সাধনা। এ সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

নারীর ভোট দেওয়ার এবং যোগ্যতানুসারে যে-কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার অধিকার সোভিয়েট রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অল রুশিয়া সোভিয়েটের সভ্যদের মধ্যে শতকরা আট জন এবং মফস্বল কেন্দ্রে বহু নগর-সোভিয়েটের কর্ণধার নারী। তাহাদের জুরী নিযুক্ত হওয়ার পথে আইনগত কোন বাধা নাই। পক্ষান্তরে যে আমেরিকা গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত সে আমেরিকাতেও কুড়িটি জেলায় নারীর এই অধিকার স্বীকার করা হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আঠার বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল যে, গ্রেট রুশিয়াতে (Russia proper) নারী বিচারক এবং সরকারী উকিলের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৬ এবং প্রায় ২০তে দাঁড়াইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রই সর্ব্বপ্রথম নারীকে রাজদূতের পদে নিযুক্ত করিয়াছে। এপর্য্যন্ত কোন নারী Commissar বা মন্ত্রীর পদ লাভ করেন নাই।

আইনের দৃষ্টিতে সোভিয়েট নারী এবং পুরুষ সমান। পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, নারীও সে অধিকার ভোগ করে। অন্যান্য দেশের মত স্বামী স্ত্রীকে নিজের পদবী গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন না। স্বামী

ভিন্ন দেশীয় হইলেও বিবাহের ফলে নারীর জাতীয়তা বা nationalityর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। নিজের কুমারী অবস্থার নাম (virgin name) পরিবর্ত্তন এবং স্বামীর গৃহে বাস করা-না-করা স্ত্রীর ইচ্ছাধীন।

নারীর কোন বিশেষ অধিকার সোভিয়েট রাষ্ট্র স্বীকার করে না। পুরুষ যে-যে অপরাধে প্রাণদণ্ড-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সে-সে অপরাধে নারীও চরম দণ্ডে দণ্ডিতা হয়। অবশ্য সে যদি অন্তর্বত্নী হয়, প্রসবকাল পর্য্যন্ত দণ্ড প্রয়োগ স্থগিত থাকে। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যদি একজন উপার্জ্জনাশক্ত ও অপরজন উপার্জ্জনশীল হয় এবং যদি তাহাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত যিনি উপার্জ্জনক্ষম তিনি অপর জনকে নিজের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দিতে আইন অনুসারে বাধ্য।

কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য উদ্দিষ্ট স্কুল, কলেজ এবং ক্লাবের অস্তিত্ব সোভিয়েট রাষ্ট্রে অজ্ঞাত। সাধারণ ভোজনাগারে "মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত কোন টেবিলে"র ব্যবস্থা নাই। নারী এবং পুরুষ একই সর্ত্তে ট্রেড ইউনিয়ন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য হইতে পারে। এমন কোন বৃত্তি নাই যেখানে পুরুষের তুলনায় নারীর অধিকার ন্যূন। নারীকে বুঝিতে দেওয়া হয় না যে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তাহার জন্য প্রয়োজন। তাহারা এক সঙ্গে পানশালা, নৃত্যশালা, ভোজ-শালায় এবং অন্যান্য স্থানে গিয়া থাকে। রাত্রিতে যে সমস্ত ট্রেন চলাচল করে, তাহাতে যে ঘুমাইবার কামরা আছে, নারী এবং পুরুষ তাহাতে একত্র ভ্রমণ করিয়া থাকে।

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মেডিকেল স্কুল এবং এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রসংখ্যায় যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৫০ জন এবং ২০ জন নারী। এই হার অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। সামরিক বিদ্যালয়সমূহেও নারীর প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। কয়েক জন নারী লালফৌজের সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক কারণে তাঁহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য।

মার্কসবাদীরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন যে নারীর মুক্তির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সোভিয়েট নারী এবং পুরুষ একই হারে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। কোন ব্যবসায় বা বৃত্তির দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ নহে। অবশ্য শক্তিসাধ্য বৃত্তিসমূহে নারী এখনও পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে নাই এবং কোন দিনই হয়ত পারিবে না। নারী শ্রমিকদিগকে প্রসবের পূর্ব্বে এবং পরে পূর্ণবেতনে ছুটি দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের জন্য প্রসূতি-আগারের বন্দোবস্ত আছে। যে-সমস্ত স্তন্যপায়ী শিশুর মাতা কলকারখানায় কাজ করে, মাতার অনুপস্থিতিতে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিশুকে দেখিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন প্রসূতিকে কিছু সময়ের জন্য ছুটি দেওয়া হইয়া থাকে।

যৌন অধিকারের ক্ষেত্রে সোভিয়েট নারী সম্পূর্ণ ভাবে পুরুষের সমকক্ষ। কুমারী মাতার সামাজিক মর্য্যাদা অবিবাহিত পিতা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। পিতা-মাতার পাপের মূল্য সন্তানকে দিতে হয় না। মরিস হিণ্ডাস বলেন,

"The very word illegitimate has been expunged from the legal vocabulary of the nation."

প্রাচীন নৈতিক আদর্শের স্থান গ্রহণ করিয়াছে অভিনব নৈতিক আদর্শ। প্রাক্-সোভিয়েট সমাজে ব্যভিচার পুরুষের পক্ষে বিশেষ দোষাবহ ছিল না ; কিন্তু নারীর পক্ষে সে অপরাধ ছিল গুরুতর। প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন আদর্শের সন্ধিক্ষণে সমাজে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে, "স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পর নিয়মকে সে আপন হাতে গড়িয়া তুলে—তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।" রুশ-ইতিহাসের এই সময়টা জাতীয় জীবনে এক ঘোরতর দুর্য্যোগের দিন। দেশ জুড়িয়া অন্তর্বিপ্লবের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। দেশের উপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে। জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সকলেই বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার মত অবসর বা প্রবৃত্তি কাহারও বড় একটা নাই। এই যুগের রুশ-চরিত্রের একটি নিখুঁত টাইপ মিখাইল শোলোখভের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Quiet Flows the Don'-এর অন্যতম চরিত্র Eugene Listnitsky. তাঁহার পিতার আশ্রিতা এবং তাঁহাদেরই এক ভৃত্যের রক্ষিতার সহিত ব্যভিচার করিবার পর Listnitsky। এই বলিয়া নিজের কার্য্যের সমর্থন করিতেছেন—

"From the point of view of an honest man, what I have done is shameful, immoral. I have robbed my neighbour; but after all, I have risked my life at the front. If the bullet had gone right through my head I should have been feeding the worms now. These days one has to live passionately for each moment as it comes."

অবস্থা দেখিয়া চিন্তানায়কগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে অবাধ যৌন মিলনের ফলে জাতির

সর্ব্বনাশ ঘটিবে। লেনিন বলিলেন যে একই পানপাত্র বহু জনের জলপানের ন্যায় একই নারীতে বহু পুরুষের বা একই পুরুষের বহু নারীতে উপগত হওয়া অস্বাভাবিক। সৌভাগ্য ক্রমে কিছু দিন পরে আপনা হইতেই এ উচ্ছৃঙ্খলতা কাটিয়া গেল। জাতি নিজের ভুল বুঝিতে পারিল।

সোভিয়েট নারী আজ যে স্বাধীনতা এবং অধিকার ভোগ করে, প্রাক্-সোভিয়েট যুগে তাহা ছিল স্বপ্নাতীত। দেশে একনায়কত্ব অর্থাৎ Dictatorship প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইলেও নারী একা আর নিছক অন্তঃপুরচারিণী নহে। রন্ধনশালাতেই তাহার সমস্ত সময় এবং সামর্থ্য ব্যয়িত হয় না। বাহির-বিশ্বের ডাক তাহার হৃদয়-দুয়ারে পৌঁছিয়াছে। সে ডাককে সে উপেক্ষা করে নাই। এই আহ্বানে সাড়া দিবার পথে রাষ্ট্র বা সমাজ কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি ত করেই নাই বরং সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে।

নারীর যৌন স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে তাহার অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য। যে নূতন আদর্শ সোভিয়েট রুশিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহার মূল সূত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, চিন্তা এবং কর্ম্মের স্বাধীনতা। বলশেভিকগণ একটা কথার উপর খুব জোর দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় যৌন ব্যাপারেও নারীর যে অধিকার নাই, পুরুষ সে অধিকার পাইতে পারে না। তাঁহাদের মতে সমস্ত নৈতিক আদর্শের গোড়ার কথা হইবে এই যে, কেহ কাহারও দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতার সুযোগ লইবে না। অন্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ লওয়া জঘন্যতম অপরাধ। এই নীতি পরিপূর্ণ ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে সোভিয়েট রাষ্ট্রে। আর তাহারই ফলে নারীর পূর্ণ বিকাশের পথে যুগযুগান্তর সঞ্চিত মনুষ্যসৃষ্ট পুঞ্জীভূত বাধা অপসারিত হইয়াছে।

এই হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের নারীর অবস্থা। এই নারী ইব্‌সেনের Doll's House-এর নায়িকা নহে। "এ নারী অন্তঃপুরের দেবী নহে—এ নারী মানুষের চিরারাধ্যা পূর্ণতা রূপিণী নারী।" এ নারী রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা—তাঁহার নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ নারীর আদর্শ—

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে সেও আমি নহি, যদি পার্শ্বে
রাখ মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ
চিন্তার যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

এ নারী পুরুষের বিলাসের সামগ্রী নয়। সে পুরুষের কর্ম্মসহচরী, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু অবস্থার এই পরিবর্ত্তন কি নারীকে সুখী করিতে পারিবে? Margaret Sanger, Elley Key প্রভৃতি অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা এবং তাঁহাদের যুক্তির গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নহে। আবার কেহবা বলেন যে, সোভিয়েট নববিধান নারীকে আনন্দদান করিবে সত্য কিন্তু এই জন্য নিদারুণ মর্ম্মবেদনাও তাহাকে সহ্য করিতে হইবে।

("The new rights and privileges will therefore bring to woman a great joy but at the cost of a great agony"—Maurice Hindus in *Humanity Uprooted*

কালচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কে বলিবে? "কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী।"

ইতিহাস-লিপিহারা ভূমে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পথচলা-অবসরে ভীতিশ্বাসে মুহূর্ত্ত দুঃসহ,
শিহরিছে কিশলয় বাদুড়ের পক্ষ-সঞ্চালনে।
নিভৃত কুহকে ঢাকা অতীতের পুষ্পিত বিরহ,
পরিচিত কণ্ঠস্বর পদধ্বনি পশিল শ্রবণে।
সুপারিগাছের সারি নৈশবায়ে দোলে অনুক্ষণ,
তারকারা সীমাহারা মেঘভাঙা গগনের গায়ে।
হৃদয়-হরিণ হেথা কোন্ জন করে অন্বেষণ!
ছায়া যেন কায়া হয়ে ইমারতে রয়েছে লুকায়ে।
ঘনতরু-অন্তরালে ভাঙা বাড়ী তৃণগুল্মঘেরা
স্বপ্নাবিষ্ট নিরালম্ব অতীতের স্মরণ আবরি'।
প্রেতসম নিয়াতপা স্বেচ্ছাচারে করে চলাফেরা
ইতিহাস-লিপিহারা বনভূমে ডাকে নিশাচরী।
বিস্মৃত কাহিনী মোরে অভ্যর্থিল ইমারতে উঠি'
জন্মান্তর-প্রতিচ্ছায়া আগুপিছু করে ছুটাছুটি।

মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যখন অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ছিল সেই সময়ে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিনিয়াস্ নামে সুইডেনের এক তরুণ জীবতাত্ত্বিক তাঁহার সময় অবধি পরিচিত প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রভৃতি যাবতীয়



পুরুষ ওরাং-উটান্

জীবিত পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের নামকরণ করিয়া এক বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করেন। প্রাণীজগতের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর নাম দিয়াছিলেন তিনি 'প্রাইমেট্স্'। বক্ষঃস্থলে যুগ্ম-স্তন এবং দন্তসংস্থানের বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'প্রাইমেট্স্'-এর মধ্যে মানুষকেই তিনি প্রথম স্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই পর্য্যায়ের দ্বিতীয় স্তরের নামকরণ করিয়াছিলেন—'সিমিয়া'। লাঙ্গুলবিশিষ্ট এবং লাঙ্গুলবিহীন বানরজাতীয় বিভিন্ন প্রাণীকে তিনি এই দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। লেমুর এবং বাদুড় জাতীয় প্রাণীরা 'প্রাইমেট্স্'-এর মধ্যে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের লিনিয়াসের এই তালিকার যখন দ্বাদশ এবং শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখনও পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের বিষয় মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বানরজাতীয় প্রাণীদের প্রধান লীলাভূমি, ইউরোপের তুলনায় তিন গুণ বৃহৎ বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলবর্ত্তী অতি সামান্য অংশের কিছু কিছু বিবরণ মাত্র সভ্য সমাজের জ্ঞানগোচরে আসিয়াছিল। সুদূর প্রাচ্য, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহ, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতির ভীষণ অরণ্যসঙ্কুল স্থানের অসংখ্য রকমারি বানরজাতীয় প্রাণীদের সম্বন্ধে কাহারও কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। দক্ষিণ-আমেরিকার বিশাল অরণ্যের রহস্য তখনও কিছুমাত্র উদ্ঘাটিত হয় নাই। তখন প্রধানতঃ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বানরের বিষয়ই সভ্য সমাজের জ্ঞানগোচরে আসিয়াছিল। তা'ছাড়া দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতের মুখে জাহাজের নাবিকেরা সময় সময় অপরিজ্ঞাত ভূখণ্ডের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল হইতে দুই-একটি অদ্ভুত রকমের বানর ধরিয়া লইয়া আসিত। দেশভ্রমণকারীরা ঐ সকল স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে ভীষণ দর্শন, বিরাট-কায় বানরজাতীয় প্রাণীর সম্বন্ধে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া দেশে আসিয়া প্রচার করিত। কিন্তু এবিষয়ে কাহারও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। এই সকল কাহিনী দ্বারা লিনিয়াস্ও বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কতটুকু সত্য অথবা কতটুকু অতিরঞ্জিত তাহা বাছিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অধিকন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সকল মানুষই একজাতীয় নহে। তিনি 'Homo caudatus' বা লাঙ্গুলবিশিষ্ট মানুষ, 'Troglodyta bontii' বা লোমশ মানুষ এবং কিংবদন্তী-মূলক আরও দুই জাতীয় মনুষ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন।



শত্রুর উপস্থিতিতে গরিলা উগ্রভাবে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে



শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় গরিলার মুখভঙ্গী

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর কোথায় কিরূপ প্রাণীর অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহার প্রায় সকল খবরই মানুষের জ্ঞানগোচরে আসিয়াছে। এমন কি, অতি প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ জাতীয় প্রাণীর বিচরণ করিত, ভূস্তরে প্রাপ্ত অস্থিকঙ্কাল হইতে তাহাদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। কাজেই প্রাচীনেরা যে এক সময়ে পৃথিবীতে বিরাট্ আকৃতির মনুষ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে রকমারি বৈচিত্র্য লক্ষিত হইলেও তাহারা একই জাতীয় (species) প্রাণী। যেমন একই পিতামাতার বিভিন্ন রকমের সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে মনুষ্য-বৈচিত্র্যকে সেইরূপ একটা রকমারি (variety) বলা যাইতে পারে মাত্র। কিন্তু ভূস্তরে সঞ্চিত প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়—মনুষ্যজাতির অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে আকৃতি এবং প্রকৃতিগত এত গুরুতর পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাদিগকে বিভিন্ন জাতি এমন কি বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উপায় নাই।

লিনিয়াস্ 'সিমিয়ান' শ্রেণীর বানরগুলিকে তিনটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করিয়াছিলেন। লেজবিহীন বানরেরা প্রথম পর্য্যায়, স্বল্প লেজবিশিষ্ট বানরেরা দ্বিতীয় এবং লম্বা লেজবিশিষ্ট বানরেরা তৃতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একমাত্র লেজের মাপ-কাঠিতে শ্রেণী বিভাগ সহজ এবং সরল হইলেও তাহার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকিয়া যায়। Manx Cat লেজবিহীন হইলেও সাধারণ বিড়াল ছাড়া আর কিছুই নহে। এরূপ লেজবিহীন কুকুর এবং মুরগীর অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাহারাও সাধারণ কুকুর, মুরগী হইতে বিভিন্ন নহে। অথচ অতি আধুনিক আস্থি-সংস্থান এবং অঙ্গ-সংস্থান বিদ্যার গবেষণার ফলে যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয়, লেজশূন্য বানরদিগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া লিনিয়াস্ বিশেষ একটা অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ লেজের অস্তিত্ব একটা বাহ্য লক্ষণ হইলেও ইহা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মানব-গোষ্ঠীর সহিত লেজবিহীন বানরদেরই অধিকতর সাদৃশ্য বিদ্যমান। কেবল অঙ্গ-সংস্থান বা অস্থি-সংস্থানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়াও ইহাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের দিক হইতে বিবেচনা করিলে লেজবিহীন বানরদিগকে অনেকাংশেই মানুষের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষের পোষাক-পরিহিত একটা শিম্পাঞ্জিকে দেখিলে বিবর্ত্তনবাদে অবিশ্বাসী ব্যক্তিও তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তন না করিয়া পারিবেন না।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূস্তরে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন যুগের অস্থি-কঙ্কাল এবং এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগের বর্ত্তমান অধিবাসী লাঙ্গুলবিহীন বানর জাতীয় প্রাণীদের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়—বর্ত্তমানে মাত্র চার জাতীয় লাঙ্গুলবিহীন বানর জীবিত রহিয়াছে। বাকী সকলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই চার জাতীয় বানরের মধ্যে গরিলা ও শিম্পাঞ্জি নামক দুই রকমের প্রাণী আফ্রিকার অধিবাসী। ওরাং উটান নামক প্রাণীদিগকে কেবল সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং গিবন নামক লাঙ্গুলবিহীন বানরেরা ভারতের সুদূর প্রান্তে, বোর্ণিও, সিলিবিস, জাভা, সুমাত্রা, হেইনান প্রভৃতি দ্বীপে বাস করিয়া থাকে।



বৃক্ষশাখায় ওরাং উটান তাহার বাসায় বসিয়া আছে

বামনেরা খর্ব্বকায় হইলেও যেমন সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন জাতীয় নহে সেরূপ গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীদের মধ্যে অনেকেই দৈহিক গঠনে ছোট-বড় হইলেই বিভিন্নজাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। জাতিগত



ওরাং উটান মানুষের মত সোজা হইয়া হাঁটিতেছে

বৈশিষ্ট্যের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট না হইলে কেবল উচ্চতা বা খর্ব্বতার মাপকাঠিতে জাতিভেদ সূচিত হয় না। কিন্তু 'প্রাইমেটস্' সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির 'প্রাইমেটস্'-এর মধ্যে শারীরিক গঠন এবং চাল-চলনে খুঁটিনাটি অসংখ্য পার্থক্য বিদ্যমান। ভূস্তরে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন যুগের অস্থি-কঙ্কাল হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে ইহারা একটা সাধারণ ইঁদুর অথবা কাঠবিড়ালী অপেক্ষা বড় হইত না। 'প্রাইমেটস' উৎপত্তির আদি যুগ হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এইরূপ ক্ষুদ্র কঙ্কালেরই সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগের পর হইতে কেবল অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির 'প্রাইমেটস্'-কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বহু অনুসন্ধানে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'প্রাইমেটস্'-এর মধ্যে গিবনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তর হইতে ইহাদের ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির কঙ্কাল ও ছাপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অপর দিকে গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং প্রভৃতি বৃহদাকৃতির প্রাণী। অনেকের দৈহিক আয়তন মানুষেরই মত। অনেকে আবার অতিকায়ও বটে। দৈহিক ওজনে গরিলারা শিম্পাঞ্জি অপেক্ষা অনেক ভারী হইয়া থাকে। শরীরের উচ্চতা, অঙ্গসংস্থান এবং মস্তিষ্কের ব্যবহারে মানুষের সহিত ইহাদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। মোটের উপর গিবন, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং উটান্ প্রভৃতি প্রাণীদিগের সহিত মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে কমবেশী নানাবিধ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই মানুষের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ কে?—অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কোন্ জাতীয় প্রাণী হইতে বর্ত্তমান মানবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। অনেকের মতে গিবনজাতীয় প্রাণী হইতেই বহুমুখী বিবর্ত্তনের ধারায় বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন মনুষ্যরা একই বংশধারা হইতে বিবর্ত্তিত হয় নাই—বিভিন্ন জাতীয় লাঙ্গুলবিহীন বানর হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। তাহাদের মতে শ্বেতকায় মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল—শিম্পাঞ্জিদের মত, পীতকায় জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল---ওরাং উটানের অনুরূপ এবং কৃষ্ণকায় জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল গরিলা জাতীয় প্রাণীদের মত। এই মতবাদকে সরাসরি অগ্রাহ্য না করিলেও বিবর্ত্তনবাদের সমর্থক কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণিত ঘটনার সহিত যথেষ্ট অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকায় ইহার অসারতাই প্রতিপন্ন হয়।



সাধারণ ভাবে গরিলার চলিবার ভঙ্গী

— যাহ, হউক, মানুষের অতিপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ বহুবিধ প্রমাণ হইতে সুস্পষ্টরূপে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, লাঙ্গুল-বিহীন বৃহদাকৃতির বানরজাতীয় প্রাণী হইতেই তাহারা আবির্ভূত হইয়াছিল। এই লাঙ্গুল-বিহীন বানরেরা ছিল প্রাচীন ভূখণ্ডের অধিবাসী লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানরের বংশধর। তুলনামূলক অস্থি-সংস্থান এবং চালচলনের বিষয় বিচার করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এই জাতীয় লেজবিশিষ্ট বানরেরা লেমুর নামক এক জাতীয়

ক্ষুদ্রকায় প্রাণী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কীটপতঙ্গভুক্ এবং 'প্রাইমেটস্'এর মাঝামাঝি 'ট্রি-শ্রু' নামক ইঁদুরের মত এক জাতীয় প্রাণী হইতে লেমুরের আবির্ভাব ঘটে।

কিন্তু এই সাধারণ ইঁদুর জাতীয় কীট-পতঙ্গভুক্ প্রাণী হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত লেমুরজাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি হইল কেমন করিয়া? সংক্ষিপ্তভাবে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৃক্ষশাখায় বিচরণকারী প্রাণীদের যে সকল বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য, ভূমির উপর বিচরণকারী প্রাণীদের সে-সকল বৈশিষ্ট্যের কোনই প্রয়োজন নাই। বৃক্ষশাখায় বিচরণ-



দুইটি শিশু-ওরাং



জাভার অধিবাসী একজাতীয় গিবন

কারী প্রাণীদের হাত-পায়ের নানাবিধ দ্রুত গতিভঙ্গী আয়ত্ত করা প্রয়োজন। তাহাদের লেজ এবং হাত পায়ের গঠন এমন হওয়া দরকার যাহাতে সহজেই বৃক্ষশাখা জড়াইয়া ধরিয়া দ্রুত গতিতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে পারে অথচ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। পায়ে খুর বা পাখীর নখের মত পদার্থ থাকিলে তাহাদের সহজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিবারই কথা। হাত পায়ের আঙুলের সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া বরং অধিকতর ধারণক্ষম হইবারই সম্ভাবনা। এক ডাল হইতে অন্য ডালের দূরত্ব সম্বন্ধে অতি দ্রুত বিচারশক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন এবং ইহার জন্য দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা অপরিহার্য। কিন্তু ভূমিতে বিচরণকারী প্রাণীদের যেরূপ ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন ইহাদের সেরূপ তীক্ষ্ণতার কোন প্রয়োজন না থাকাই স্বাভাবিক। 'টুপায়া' প্রভৃতি কীট-পতঙ্গভুক্ 'ট্রি-শ্রু' হয়ত এক সময়ে বাধ্য হইয়া শাখাশ্রয়ী হইয়াছিল এবং বংশ-পরম্পরায় ধীরে ধীরে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। কালক্রমে তাহাদেরই এক শাখা হইতে এই সকল বৈশিষ্ট্যের উন্নত সংস্করণ লইয়া লেমুর নামক প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। লেমুর জাতীয় প্রাণী হইতে 'টারসিয়াস' নামক এক জাতীয় প্রাণীর অভিব্যক্তি ঘটে। ইহাদের সহিতই মানুষের প্রাচীন বংশধারার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্য হইতেই বানর-



শিম্পাঞ্জির মনুষ্যোচিত আচরণ

জাতীয় প্রাণীদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রাচীন-ভূখণ্ডে যখন বানর জাতির উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইতেছিল সেই সময়ে দক্ষিণ-আমেরিকার অরণ্যাঞ্চলে ইহাদের অপর এক শাখা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বংশবিস্তারে সাফল্য অর্জন করে। এই বানর গোষ্ঠি হইতেই বিভিন্ন ধারার বহুবিধ বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়া মার্মোসেট, পশমী-লোমযুক্ত বানর, লম্বা লেজওয়ালা বানর, মাকড়সা বানর এবং উল্লুক জাতীয় মর্কটেরা অভিব্যক্ত হয়। দাঁত, নাক, চোখ মুখের গঠনে এবং অন্যান্য বিষয়ে নব্য-ভূখণ্ডের এই বানরদিগের সহিত মানুষের সাদৃশ্য খুবই কম। তাছাড়া নব্য-ভূখণ্ডে লেজ-বিহীন বানরের অস্তিত্ব নাই। অবশ্য সম্প্রতি ভেনেজুয়েলা হইতে এরূপ একটি বানরজাতীয় প্রাণীর করোটি প্রাপ্তির খবর প্রকাশিত হইয়াছে যাহার লেজের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তবে সন্দেহাতীত ভাবে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। যদি সত্যই নব্য ভূখণ্ডে এরূপ লাঙ্গুলবিহীন বানরের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হয় তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নব্য-ভূখণ্ডেও প্রাচীন-ভূখণ্ডের বানরজাতীয় প্রাণীদিগের অভিব্যক্তির মত পাশাপাশি ভাবে অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল।



শিম্পাঞ্জি মানুষের মত সোজা হইয়া হাঁটিতেছে

লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর হইতে লাঙ্গুলবিহীন অবস্থায় রূপান্তরিত হইতে ইহাদিগকে বহু ক্রম-পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। হয় তো অবস্থা-বিপর্য্যয় অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্যই এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। বেবুন, গিবন প্রভৃতি লেজশূন্য বানরেরা বৃক্ষচারী লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর অপেক্ষা আকার, আয়তনে অনেক বৃহত্তর। লাঙ্গুলবিহীন বানরেরা বৃক্ষ অপেক্ষা ভূমিতেই বেশীর ভাগ বিচরণ করে। বৃক্ষডালে বিচরণ করিবার ফলে লাঙ্গুলের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; কিন্তু ভূমিতে বিচরণ করিবার সময় লেজের তদ্রূপ প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাছাড়া লাঙ্গুলবিহীন বানরেরা বৃক্ষডালে বিচরণ করিলেও তাহারা ক্ষুদ্রকায় মর্কটদিগের মত ডালের উপর হাঁটিয়া বেড়াইতে



অল্পবয়স্ক গরিলা

পারে না। তাহারা লম্বা হাতের সাহায্যে দোল খাইয়া এক ডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইয়া পড়ে। ইহার ফলে ইহাদের হাত ও পায়ের আঙুলের কোন কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার ক্ষমতা ক্রম-বিকশিত হইয়াছিল। শরীরটাকে সোজা ভাবে ঝুলাইয়া দোল খাইবার সুবিধা হইতেও ক্রমশঃ খাড়া হইয়া চলিবার অভ্যাস আয়ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল পরিবর্ত্তনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষও বর্দ্ধিত হইতেছিল। কারণ ইহারা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত; একের পরিবর্ত্তন ঘটিলে অপরের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। কিরূপ অবস্থার চাপে পড়িয়া বানরজাতীয় প্রাণীদের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধেও আমরা মোটামুটি অনুমান করিতে পারি।

জীবজগতের যে-সকল পরিবর্ত্তন আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি তাহা হইতে সহজেই মনে হয় যে, কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিবার

ফলেই ধীরে ধীরে দৈহিক পরিবর্ত্তন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা জানি প্রাচীন বরফ যুগের অনেক পূর্ব্ব হইতেই আবহাওয়া শুষ্ক এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছিল। ইহার ফলে বিশাল অরণ্যানীসমূহ ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে লাগিল। এক অরণ্য বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যবাসী প্রাণীরা তৎসংলগ্ন দূরতর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার প্রাণীরা উত্তর দিকের বিশাল অরণ্যানীসমূহ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী এবং অত্যুন্নত মালভূমিসমূহে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদবর্জ্জিত ভূমিখণ্ডেই বসবাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা। যাহারা জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিল তাহারাই টিকিয়া গেল এবং তাহার ফলে ধীরে ধীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে লাগিল। যে-সকল বানর কোন ক্রমে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল তাহারা গাছপালার উপর বিচরণ করিবার সুবিধা পাইয়া পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেই ভাবেই বানর-জীবন যাপন করিয়া বংশ-বিস্তার করিতে লাগিল। এই জন্যই বিখ্যাত পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে, মধ্য-এশিয়াই মানব-জ



মানুষ এবং তাহার নিকটতম জ্ঞাতিদের ক্রমবিকশিত কঙ্কাল

আদি জন্মভূমি। অবশ্য অন্য ধারায়ও যে মানুষের অভিব্যক্তি ঘটিয়া উঠে নাই তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

প্রেম ও স্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

আজ এই সন্ধ্যালোকে অন্তরের নিভৃত বাসনা—
তাহারে লভিব কাছে হৃদয়ের প্রান্ততটে মোর;
স্পর্শ তার স্পর্শমণি,—এ মুহূর্ত্ত হয়ে যাবে সোনা
সে যদি নিকটে আসে, চোখে যদি থাকে ঘুমঘোর।
আকীর্ণ বকুলকুঞ্জে জ্যোৎস্না-আঁকা মায়াজালখানি
মাটিতে লুটায়ে রহে, যেন এই পৃথিবীরে ঘিরে
একটি রহস্য-ছায়া আনিয়াছে স্বপ্নলোক বাণী;
এই তো সময় হ'ল, আসিবে না মোর মর্ম্ম নীড়ে?
বলিবার কথা ছিল, দিবালোকে যে বাণী ফোটে না,—
মৌমাছি-গুঞ্জন ব্যাপ্ত আজ এই সন্ধ্যাকাশতলে
করুণ সোনালী রঙে কোন কথা সে কি বলিবে না?—
বলিবে না 'ভালোবাসি' দু'টি চক্ষু ভরা অশ্রুজলে।
ভালো যদি নাও বাসে, যদি বলে, 'মোরে ভুলে যেও',
সেও ভালো চলে যাব পৃথিবীর একান্ত নির্জ্জনে;
বিস্মৃত গোধূলিপারে বিচ্ছেদের অনন্ত পাথেয়
প্রেমেরে সুন্দর করি গড়ি দিবে শেষ শুভক্ষণে।

তুমি আমি ক্ষণস্থায়ী, চিরজীবী মোর এই প্রেম;
তোমারে হারাই যদি তবু তারে সঙ্গে আনিলেম।

পৃথিবী সুন্দর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আকাশে বৈশাখী চাঁদ, রূপালি জ্যোছনা
আলো আর ছায়া দিয়ে রচে আলিপনা
হাস্নাহানার বনে। উতলা বাতাস
অশ্বত্থ-পল্লব-পুঞ্জে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
বনের মর্ম্মরে আজি মনে পড়ে যায়—
নির্জ্জন সমুদ্রতীরে কাঁদিয়া লুটায়
সফেন তরঙ্গমালা! আসিছে সেদিন

মৃত্তিকার দেহ হবে মৃত্তিকায় লীন!
সেদিনও এমনি চাঁদ হাসিবে আকাশে,
ভাসিবে হেনার গন্ধ দখিনা বাতাসে,
জাগিবে মর্ম্মর ধ্বনি কাননে কাননে।
তোমরা সেদিন যারা রহিবে ভুবনে—
মনে হবে তোমাদেরও—পৃথিবী সুন্দর!
সুন্দর চাঁদের রাতে বনের মর্ম্মর!

বাংলার স্বাধীন সুলতান-বংশের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, সুলতান কুতব্-উদ্-দীন্ আইবাক হইতে আরম্ভ করিয়া সুলতান গিয়াস্-উদ্-দীন তুঘলক পর্য্যন্ত, পর্য্যায়ক্রমে সতের জন সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসন হইতে উপরাজা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া প্রায় দেড় শত বৎসর কাল বাংলাদেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নামেই বাংলাদেশের মস্জিদে "খুৎবা" পঠিত হইত এবং তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রাই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। সোনার-গাঁও ও লক্ষণাবতী এই দুইটি শহর ছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ তুঘলকের রাজত্ব-কালে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ) কাদের খাঁ লক্ষণাবতী শহরে বাংলার গবর্ণর বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার অধীনে শস্ত্র সচিব বা সিলাহ্-দার ছিলেন মালিক ফকর্-উদ্-দীন্। ইনি রাজ্য-শাসনের নানা বিভাগে কৌশলে প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া, কাদের খাঁকে হত্যা করিয়া দিল্লী-শ্বরের প্রতিনিধির আসন অধিকার করেন। তখন মহম্মদ শাহ তুঘলকের হস্তে দিল্লীর সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল-রীতিতে পরিচালিত হইতেছিল। এই সুযোগে ফকর্-উদ্-দীন দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করিয়া বাংলার মসনদে স্বাধীন সুলতানের পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ৭৩৯ হিজিরা সম্বৎসরে (১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) ঘটে। কারণ, সোনার-গাঁও টাঁকশালে মুদ্রিত ফকর্-উদ্-দীন্ মুবারক শাহ নামাঙ্কিত ৭৩৯-৭৪০-৭৪১ হিজিরা তারিখযুক্ত কয়েকটি রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুবারক শাহের পর, সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র ইখ্তিয়ার-উদ্-দীন্ গাজী শাহ তিন বৎসর কাল (হিঃ সঃ ৭৫০-৭৫৩=১৩৪৯-১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে, রৌপ্য মুদ্রার প্রমাণে, আমরা আর একজন স্বাধীন সুলতানের নাম পাই—আলা-উদ্-দীন্ আলি শাহ। বাংলার একমাত্র লিখিত প্রাচীন ইতিহাস "রিয়াজ-উস্-সালা-তীন," নানা কারণে খুব নির্ভরযোগ্য নির্ভুল ইতিহাস নহে। "রিয়াজে"র উক্তি অনুসারে, আলা-উদ্-দীন মাত্র এক বৎসর পাঁচ মাস কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার নামাঙ্কিত তারিখ-যুক্ত মুদ্রার প্রমাণে বলা যায় যে, তিনি অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল (৭৪২-৭৪৬ হিঃ সঃ) রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ, তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি পশ্চিম বঙ্গেই নিবদ্ধ ছিল,—এবং তাঁহার রাজধানী ছিল ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়া। এই শহরে তিনি হজরৎ শাহ মখদুম্ জলাল্-উদ্-দীন্ তব্রীজী সাহেবের উদ্দেশে একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। "রিয়াজে"র উক্তি অনুসারে সুলতান আলা উদ্-দীন্ ৭৪১ হিজিরা সম্বৎসরে ফকর্-উদ্-দীন্কে হত্যা করিয়া তাঁহার পুরাতন প্রভু কাদের খাঁর হত্যার প্রতিশোধ লইয়া-ছিলেন।*

ইতিমধ্যে পাণ্ডুয়া শহরে উপস্থিত হইলেন একজন নির্ভীক কর্ম্মবীর—হাজী ইলিয়াস্। তাঁহার জননী ছিলেন সুলতান আলা-উদ্-দীনের ধাত্রী। প্রথমে আলা উদ্-দীন হাজী সাহেবকে কয়েক দিন কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু ধাত্রী-মাতার অনুরোধে তাঁহাকে মুক্তি দেন এবং কোনও দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। হাজী সাহেব সুলতানের সৈন্যসামন্ত বশীভূত করিয়া কয়েক জন খোজার সাহায্যে সুলতানকে হত্যা করিয়া সুলতান শামস্-উদ্-দীন্ নাম লইয়া লখ্ণাবতী ও বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তিনি 'ভাঙ্' রসে আসক্ত ছিলেন—এই জন্য তাঁহার আর একটি 'বিরুধ' ছিল—'ভাঙড়'।

রিয়াজের উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে সুলতান শামস্-উদ্-দীন্ তাঁহার রাজ্য উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সৈন্য যাজনগর দখল করিয়া, নানা ধন-রত্ন, হস্তী ইত্যাদি উপঢৌকন সংগ্রহ করিয়া সসম্মানে রাজ-ধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পশ্চিম দিকে তাঁহার রাজ্য কাশী পর্য্যন্ত নাকি বিস্তৃত হইয়াছিল।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক শামস্-ই-শিরাজের লিখিত "তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী"র বিবৃতি অনুসারে,—ঐ যুগে বাংলা-রাজ্যের রাষ্ট্রীয় পরিধি—কামরূপ, কুচবিহার,—এমন কি নোয়াখালি ও ত্রিপুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আসিয়া শামস্-উদ্-দীনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বাংলা জয় করিতে

*"ওরে হতভাগ্য হত! কারে তুমি করেছ হনন
যার লাগি, আজ তারা তোমারে করিল হনন?
আজ যিনি তোমারে দিলেন মরণ,
কাল তিনি নিজে মরণ করিবেন বরণ।"

—রিয়াজ-উস্-সলাতীন্।

অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরিতে হইয়াছিল। রিয়াজের মতে, শামস্-উদ্-দীন দিল্লীর বাদশাহের সহিত একপ্রকার সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হন, যাহার ফলে বাংলা প্রদেশ ও দিল্লীর সাম্রাজ্যের পরিধির নিজ নিজ সীমা নির্দ্ধারিত হয়। এই সময় হইতে (৭৫৫ হিঃ সঃ—১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) সুলতান শামস্-উদ্-দীন্ দিল্লী সম্রাটের নিকট পুনঃপুনঃ দূত পাঠাইয়া নানা উপহারাদি প্রেরণ করিয়া সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখেন। এই দূত প্রেরণ করা ছিল শামস্-উদ্-দীনের একটি অত্যন্ত প্রিয়তম রাজনীতি। দিল্লীর সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদানে সুলতানকে নানা বস্ত্র, আরবী ও তুর্কীদেশের অশ্বাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শামস্-উদ্-দীনের (৭৪৬-৭৫৮ হিঃ সঃ—১৩৪৪-১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) পর আসিলেন সিকান্দার শাহ (৭৫৮-৭৯৫ হিঃ সঃ—১৩৫৬-১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দ), তাহার পরে মসনদে বসিলেন ঘিয়াস্-উদ্-দীন্ আজাম শাহ (৭৯৫-৮১৩ হিঃ সঃ—১৩৯৩-১৪১১ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সুলতানের রাজ্যকাল দুইটি ঘটনায় স্মরণীয়। ইনি জগদ্বিখ্যাত পারস্য কবি হাফেজকে বাংলাদেশে আসিতে নিমন্ত্রণ পাঠান। কবি হাফেজ তাহার উত্তরে একটি কবিতা লিখিয়া বাংলার সুলতানকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনা হইল—হু-সিয়েন্ ও কিই সিন্ নামক চীন-সম্রাটের প্রেরিত দুই জন দূতের বাংলায় আগমন। এক দিকে যেমন সুলতান্ ঘিয়াস্-উদ্-দীনের কাব্য-চর্চ্চা পারস্য-কবির আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া বাংলাদেশকে প্রাদেশিকতার একাকীত্বের অখ্যাতি হইতে মুক্ত করিল,—অন্য দিকে, বাংলাদেশ সুদূর চীন-সাম্রাজ্যের স্পর্শলাভ করিয়া—আন্তর্জ্জাতিকতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলার সুলতান চীন সম্রাটের উপহার গ্রহণ করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাহার প্রত্যুত্তরে, বাংলার দূত চীন রাজার দরবারে প্রেরিত হইল। এই ঘটনা ঘটে সুলতান সঈফ্-উদ্ দীন্ হামজা শাহার রাজত্বকালে।* মুদ্রার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সঈফ্-উদ্-দীনের রাজ্যকাল (৮১৩-৮১৪ হিঃ—১৪১১-১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ) কেবলমাত্র এক বৎসর কয়েক মাস এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। চীনের ইতিহাস হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ হইতে সুলতান সঈফ্-উদ্-দীনের দূত নানা উপঢৌকন লইয়া চীন-সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং, উক্ত সুলতানের রাজত্বকাল অন্ততঃ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়।†

"মিং-চে" নামক চৈনিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চীনের মিং রাজবংশের সহিত বাংলা দেশের মিত্রতার সম্পর্ক ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে সূচিত হয়। চীন-সম্রাট্ কিংবা বাংলার সুলতান প্রথমে দূত প্রেরণ করেন তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, অন্ততঃ ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজনৈতিক দৌত্যের সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসরে বাংলার সুলতান ঘিয়াস্-উদ্-দীনের দূত চীন-দরবারে উপস্থিত হয়। তাহার পর, উপর্য্যুপরি ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে দুই বার, ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে এক বার, এবং ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে এক বার,—ঘিয়াস্-উদ্-দীনের দূত চীন দরবারে উপস্থিত হয়। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজদূত ঘিয়াস্-উদ্ দীনের মৃত্যু-সংবাদ চীন-দরবারে উপস্থিত করেন। এই সংবাদ পাইয়া চীনের সম্রাট্ ইয়ং-লো দূত পাঠাইয়া ঘিয়াস্-উদ্-দীনের পুত্র সঈফ্ উদ্-দীনের রাজ্যাভিষেক সমর্থন করেন। ইহার পরেই ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সঈফ্-উদ্-দীনের দূত এক জিরাফ বা দীর্ঘ-গ্রীবের উপহার লইয়া চীন-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। চীন দেশ হইতে যে কয় জন দূত বাংলায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—ছেং-হুয়ো, ইয়ং-ছে, মা-হুয়েন্, কং-ছেন্, ও ফি-ই-সিন্। বাংলার রাজদূতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভট্টশালী মহাশয় প্রচলিত মুদ্রার তারিখ অবলম্বন করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ঘিয়াস্-উদ্-দীনের রাজ্যকাল মাত্র ১৭ বৎসর ব্যাপী ছিল, এবং সম্ভবতঃ ৮১৩ হিঃতে (১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। চীনের ইতিহাসের প্রমাণে দেখা যায় যে অন্ততঃ ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে (৮১৪ হিঃ সম্বৎসরে) তিনি জীবিত ছিলেন।

যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সুলতান সঈফ্-উদ্-দীন্ চীন সম্রাট্‌কে যে-সকল অদ্ভুত ও দুষ্প্রাপ্য উপহার পাঠাইয়াছিলেন—তাহার মধ্যে ছিল একটি জিরাফ,—চিত্রোষ্ট্র বা দীর্ঘ-গ্রীব। এই জিরাফ জন্তু বাংলা

---

* 'রিয়াজ-উস্-সলাতিনে'র মতে সুলতান সঈফ্-উদ্-দীন্ "একজন সংযমী বদান্য ও সাহসী কর্ম্মবীর ছিলেন। ইনি নাকি দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৭৮৫ হিঃতে (১৩৮৩ খ্রীঃ অব্দে) ইঁহার মৃত্যু হয়। মতান্তরে, ইনি ৩ বৎসর ৭ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন। খোদা জানেন কোন্ কথা সত্য।"

† প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজের মতে, ঘিয়াস্-উদ্-দীনের পুত্র সঈফ্-উদ্-দীন ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আসীন হন এবং তিনি ৩ বৎসর ৪ মাস রাজত্ব করেন, সুতরাং ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাংলার দূত চীনে প্রেরিত হয়, তখন সঈফ্-উদ্-দীন জীবিত ছিলেন (JRAS, 1896, P. 204)।

দেশে জাত জীব নহে, সম্ভবতঃ আফ্রিকা হইতে আনীত।‡ সম্ভবতঃ, বাংলার সুলতান চীনদূতের উপদেশে এই বিচিত্র জন্তুটিকে উপহার রূপে চয়ন করিয়াছিলেন। কারণ, চীন দেশের প্রাচীন সংস্কারে দীর্ঘ-গ্রীব জন্তুর আগমন অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলিয়া গণ্য ছিল। চীনের দূত বোধ হয় সুলতানকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এই জন্তু উপহার দিলে চীন সম্রাটের সন্তোষের অবধি থাকিবে না। এই শুভ লাঞ্ছনের আগমনে, চীন সম্রাটের সভাসদগণ সম্রাটকে অভিনন্দিত করিয়া এক সম্মানসূচক সুদীর্ঘ বিজ্ঞপ্তি বা প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করেন। এই সুদীর্ঘ প্রশস্তি একটি সুন্দর চিত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই চিত্রটি বাংলার সুলতান কর্ত্তৃক প্রেরিত উপরোক্ত জিরাফের প্রত্যক্ষ চিত্র বা প্রতিকৃতি। (চিত্রের প্রতিলিপি অন্যত্র মুদ্রিত হইল)। চিত্রকরের নাম চীন সম্রাটের সভার চিত্র-পাণ্ডিত শেন্ তু। সভাসদগণের প্রশস্তি একটি সুদীর্ঘ চীন-কবিতায় লিপিবদ্ধ হইয়া এই চিত্রটির উপরে লিখিত হইয়াছে এবং কবিতাটিতে চীন রাজ্যের প্রচলিত সন তারিখ সংযুক্ত হইয়াছে। এই প্রশস্তির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"অধীনের সসম্মান নিবেদন এই যে হজরৎ মহারাজ, ৺সম্রাট তাই-সুর বিশাল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন এবং আপনার ধর্ম্ম বুদ্ধি এই ত্রিভুবনকে নূতন রূপ দিয়াছে, এবং জ্যোতিষ্ক-ত্রয়কে সত্য-পথে চালিত করিতেছে, এবং আপনার কর্ম্মচারীদিগকে কর্ত্তব্যের পথে সুচালিত করিতেছে। এই শুভ কালের সূচনা করিয়া এক মাঙ্গলিক পশু "শু-উ"র আবির্ভাব হইয়াছে,† শস্যাদির শীষ আশ্চর্য্য রূপ লইয়া উদয় হইতেছে, সুমধুর শিশিরকণা পৃথিবী চুম্বন করিতেছে, হরিৎ নদ স্বচ্ছ লহরে সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং উপভোগ্য ঝরণার ধারা-বৃন্দ দ্রুত গতিতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। (এই শুভ কালে), সকল প্রকার শুভ-সূচক পশু একে একে উপস্থিত হইতেছে —যাহাদের আগমন শুভ দৈবের সূচনা করে। ইয়াং-লো যুগের (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ) চিয়া বু বৎসরের নবম মাসে, বাংলা দেশ হইতে আসিয়াছে একটি দীর্ঘ-গ্রীব (জিরাফ—চি-ই-লিন্)। ঐ পশু প্রকাশ্য রাজদরবারে সম্মানসূচক উপহার রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। অমাত্য সভাসদ্ প্রভৃতি সমস্ত প্রজাগণ সমবেত হইয়া উৎসুক নেত্রে এই উপহারটি দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদের হর্ষের সীমা নাই।

আপনার এই অধীন দাস এইরূপ শুনিয়াছে যে যখন কোনও রাজর্ষি বা মনীষী প্রভূত বদান্যতার অবতার হইয়া আবির্ভূত হন, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের ছটায় সমস্ত দিকের অন্ধতম প্রদেশ আলোকিত হইয়া উঠে, তখনই একটি দীর্ঘ-গ্রীবের আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাবে প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাজের ধর্ম্মবুদ্ধি স্বর্গীয় গুণাবলীর অনুরূপ, এবং তাঁহার দয়া-পূর্ণ আশীর্ব্বাদ দূর হইতে দূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়াছে— এবং যাহার সুমিষ্ট বাষ্প-রাশি একটি দীর্ঘ-গ্রীবের সৃষ্টি করিয়াছে - যাহা সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর কোটি বৎসর অপরিমিত সুখ-বৃষ্টির সৃষ্টি করিবে।‡

আপনার এই দাসানুদাস এই লোকারণ্যে সমবেত হইয়া শুভ-দৈবতের সূচক ঐ পশুটিকে বিস্তারিত-নেত্রে সম্মানের দৃষ্টি দিয়া বারম্বার দেখিয়াছে। এক্ষণে আপনার সম্মুখে শত বার নতজানু হইয়া মস্তকদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, এই প্রশস্তির প্রার্থনা-স্তোত্র রচনা করিয়া কবিতার উপহার উপস্থিত করিতেছে। (২৬ পদের কবিতা)। (এই কবিতা) আপনার দাস শেন্-তুর দ্বারা রচিত। ইতি—ইয়াং লো যুগের দ্বাদশ বৎসরে, সাম্বৎসরিক চিয়া বু তারিখে, শরৎ-কালে, নবম মাসে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে প্রদত্ত এই সম্মানের উপহারও আপনার দাস শেন্-তু কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়াছে।"

চীনের পশুতত্ত্ব-বিৎ ইয়ান্ চির পশু-পরিচিতির গ্রন্থে এই উপহারের পরিপোষক প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে :— "ইয়াংলো যুগের দ্বাদশ বৎসরে, শরৎ-কালে বাংলা দেশের (প্রতিনিধি) দরবারে উপস্থিত হইয়া একটি দীর্ঘ-গ্রীব উপহার দিয়াছিলেন।"

চিরস্মরণীয় হইলেও অধুনা বিস্মৃত সুলতান সঈফ্-উদ্-

‡ মা-হুয়ানের বাংলা দেশের বর্ণনার মধ্যে অন্য অনেক পশুর উল্লেখ আছে, কিন্তু জিরাফের উল্লেখ নাই :—

"The animals and birds are numerous among which are camels, horses, mules, asses, buffaloes."

† চৈনিক পৌরাণিক বিশ্বাসে,—শু-উ এক প্রকার কাল্পনিক জীব, কাল 'ডল' যুক্ত শ্বেত ব্যাঘ্রের আকৃতিরূপে কল্পিত। বদান্য ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজত্ব কালে এই পশুর আবির্ভাব হয়।

‡ চৈনিক ঋষি কনফিউসিয়স্ তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্বে জিরাফ বা 'চি-ই-লিনে'র আবির্ভাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"When Heaven does not stint the fullness of its course, when Earth does not stint the fullness of its treasures, and Man does not stint the fullness of his natural feelings, then a Chi'-i-lin appears."

'চি-ই-লিন্ বা দীর্ঘগ্রীবের তখনই আবির্ভাব হয়, যখন স্বর্গলোক তাহার অমৃত ধারার প্রাচুর্য্য হইতে কাহাকে বঞ্চিত করে না, যখন মর্ত্তালোকের পৃথ্বীদেবী তাঁহার ভূত রত্ন-রাজি বিতরণে কুণ্ঠিত হন না, এবং যখন মনুষ্যলোক তাহার স্বাভাবিক হৃদয়ের রসধারার পর্য্যাপ্ত বিতরণে কুণ্ঠিত হয় না।'

চীনের এই দূত প্রেরণের সংবাদ ভারতের কোনও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তিনি যে একদিন বাংলা দেশের স্বয়ংমুখী প্রবৃত্তি ও একাকীত্বের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সুদূর চীন-সাম্রাজ্যে দূত পাঠাইয়া, বাংলার গৌরব বিদেশে প্রচারিত করিয়া, বাংলা দেশকে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একথা আজ বাংলা দেশ ও বাংলা দেশবাসী বিস্মৃত হইয়াছে। বাংলার বাহিরে 'ঘর-মুখো' বাঙালীর সৌমিত্রের বাহু-প্রসারণের প্রমাণ বাঙালীর গর্ব্ব করিবার বস্তু।*

* এই প্রবন্ধ রচনায় ভট্টশালী মহাশয়ের *Early Independent Sultans of Bengal* পুস্তিকার বাংলার সুলতানবংশের রাজ্য-কাল-নির্দ্দেশ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

পরলোকগত নেপালচন্দ্র রায়ের জীবন-স্মৃতি

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী

স্বদেশহিতৈষিতা এবং জনহিতের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ কার্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের নাম একাধিক সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং বক্তা দ্বারা সসম্মানের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। গত শতাব্দীতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন নির্ব্বাচনের সময় তিনি নির্ব্বাচনের স্থান হইতে বহু দূরে ছিলেন। নানাবিধ প্রতিবন্ধক এবং অনমুকূল অবস্থা সত্ত্বেও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া যথাস্থানে এবং যথাসময়ে উপস্থিত হইতে বিরত হন নাই। যাঁহারা পরলোকগত অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে স্বদেশের উন্নতিকল্পে নানাবিধ ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন কি অসাধারণ আগ্রহ এবং উৎসাহের সহিত সর্ব্বদা তিনি এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কোন প্রকার নিরুৎসাহজনক বা প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে বিরত করিতে পারিত না। শারীরিক অসুস্থতা ও বয়োভারবৃদ্ধি, জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্য তাঁহাকে ভগ্নোৎসাহ করিতে পারে নাই। কঠোর সমালোচনা ও বিদ্রূপ, বিরুদ্ধাচরণ এবং নির্যাতন কখনও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি যাহা উচিত বা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সর্ব্বদা উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সহকারে তাহা সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি স্বভাবতই নিরভিমান প্রকৃতির ছিলেন এবং নিজের নাম জাহির করিবার প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে নিজেকে সর্ব্বদাই পিছনে রাখিতে চাহিতেন। এই সকল সদ্গুণ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং বিশেষত্ব প্রকাশ করিত। কিন্তু এই দৃঢ়তার সহিত সংযুক্ত ছিল প্রাকৃতিক কোমলতা ও শান্তিপ্রিয়তা, উদারতা ও আশাপ্রবণতা। তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিতে চাহিতেন না, যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার নিকট হইতে আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার পাইতেন; যাঁহারা তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও তিনি কোন অশুভ কথা বলিতে চাহিতেন না।

যে-কোন ব্যক্তির জীবনের কোন আখ্যান অনেক সময় একখণ্ড সম্পূর্ণ জীবন-চরিতের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এইরূপ আখ্যান প্রকাশের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক এবং প্রখ্যাত বাগ্মী উইলিয়াম চ্যানিং এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য খুব সরল এবং স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ আখ্যান হইতে অনেক সময় সেই ব্যক্তির সমগ্র চরিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। নেপালচন্দ্র রায়ের জীবনের একাধিক ঘটনা হইতে আমরা দেখিতে পাই তিনি যৌবন অবস্থা হইতে কি প্রকার উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। নেপালচন্দ্র যখন কলিকাতায় চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এবং বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন কয়েক জন গুণ্ডা তাঁহার গ্রামের কোন মহিলার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে। কিন্তু এই দৌরাত্ম্যকারীদের শাস্তির কোন প্রকার চেষ্টা হইতেছে না, এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তাঁহার অভিভাবকগণের অসন্তোষের কারণ হইতে পারে এই আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে বিধিমত অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বগ্রামে না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনেকে তাঁহাকে এ কাজ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন প্রকার উদাসীন থাকিতে পারিলেন না এবং দুর্বৃত্তদিগের দমনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময় "সঞ্জীবনী" সুপ্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বলিয়া পরিচিত ছিল। পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। নেপালচন্দ্র তাঁহার

গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার পর 'সঞ্জীবনী'তে এই ঘটনা প্রকাশিত হইল। নেপালচন্দ্রের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলী'তেও এবিষয় আন্দোলনে সাহায্য করিলেন। এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ লইয়া নেপালচন্দ্র বাংলা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এবিষয় অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করায় দুর্বৃত্তগণের দমন হইল এবং নেপালচন্দ্রের আন্দোলন সফল হইল।

নেপালচন্দ্র অল্পবয়স হইতেই নির্ভীক ছিলেন এবং যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা বলিতে কিম্বা যাহা উচিত বলিয়া মনে করিতেন সেই অনুসারে কার্য্য করিতে ভয় পাইতেন না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নগ্রহণ করা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহা গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু নেপালচন্দ্র জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান এবং নিম্নজাতির কেহ তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীতে আহার করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সে অনুরোধ অমান্য করিতেন না। তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহাদের বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে তাঁহাকে এই প্রকার কোন বন্ধুর বাটীতে এক রাত্রি কাটাইতে হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রাত্রিতে নেপালচন্দ্র কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি সত্য ঘটনা বলেন। নেপালচন্দ্র ভিন্নবর্ণের বন্ধুর বাটীতে আহার করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ করেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে জাতিচ্যুত হইতে হইবে এই কথা তিনি নেপালচন্দ্রের পিতাকে বলেন। নেপালচন্দ্র প্রথমে প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হন না। কিন্তু তাঁহার জন্য তাঁহার পিতা নিগৃহীত হইবেন, ইহা মনে করিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। তৎপর প্রায়শ্চিত্তের রাত্রেই গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহাকে কর্ম্মজীবনের প্রথমে কিছুকাল সামাজিক এবং পারিবারিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক দিকে যেমন তাঁহাকে তাঁহার নিজের গ্রাম, সমাজ এবং বৃহৎ পরিবারের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে নাই, অন্য দিকে তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ এবং কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ সংযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় কলেজের ছাত্র তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের সেই সময়ের শীর্ষস্থানীয় কোন কোন নেতার সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নেপালচন্দ্রের নিমন্ত্রণে পরে বক্তৃতাদি উপলক্ষে তাঁহার গ্রামে গমন করিয়াছিলেন।

নেপালচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন খুলনা জিলার বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী মূলঘর গ্রাম। খড়রিয়া মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া তিনি প্রশংসার সহিত বাড়ী হইতেই মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর খুলনা জিলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় ফ্রী চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৭ সালে জেনারাল অ্যাসেম্ব্লী ইনষ্টিটিউসন হইতে বি-এ পাস করেন। এই দুই কলেজ ইহার অনেক পরে একত্র হইয়া এখন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৮৭ সালে খড়রিয়া মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় তাঁহাদের গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলরূপে পরিণত হয়। যাঁহাদের পরিশ্রম এবং চেষ্টার ফলে গ্রামের এই উন্নতি সাধিত হয় তাঁহাদের মধ্যে নেপালচন্দ্র একজন প্রধান ছিলেন। নেপালচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি কলিকাতা চলিয়া আসেন। পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়া কয়েক বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্য করেন। তাহার পর কিছু কাল কলিকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করার পর ১৯০০ সালে এলাহাবাদে এংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তখনকার লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সর্ জন হিউয়েট রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয় হইতে অপসারণ করিবার জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে ভয় দেখান হয় যে, তাঁহাকে ঐ স্থানচ্যুত না করিলে বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না এবং সরকারী সাহায্য ব্যতীত ইহার কার্য্য চালান অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাহাতে বিদ্যালয়ের অনিষ্ট হইবে এই মনে করিয়া নেপালচন্দ্র প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিয়া ১৯০৭ সালে কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।

এলাহাবাদ হইতে নেপালচন্দ্র চলিয়া আসিবার পর সর্ জন হিউয়েট অনুসন্ধান করেন তিনি কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন। নেপালচন্দ্র আশঙ্কা করেন তাঁহার পক্ষে হয়ত ভবিষ্যতে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করা সম্ভব না হইতে পারে। সেই জন্য তিনি আইন ব্যবসা অবলম্বন করিবেন স্থির করেন। পূর্ব্বেই তিনি বি-এল লেকচার সমাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় বি-এল পরীক্ষা

দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং তৎপর আলিপুর জজ আদালতের উকীল রূপে তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত হয়। এলাহাবাদ হইতে ফিরিবার পর তিনি কিছুকাল রিপন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় শান্তিনিকেতন হইতে কিছুদিনের জন্য কাজ চালাইবার আহ্বান পান। সেখানে পঁচিশ বৎসরের অধিককাল কার্য্য করিয়া ১৯৩৬ সালে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষরূপে অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যোগ্যতা এবং প্রশংসার সহিত তিনি শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি যখন তাঁহার গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন খান বাহাদুর আবদুল করিম ঐ বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর ছিলেন। বহুদিন পর নেপালচন্দ্রের কোন আত্মীয়ের সহিত পরিচয় হইলে তিনি যখন তাঁহার সহিত নেপালচন্দ্রের সম্পর্কের কথা জানিতে পারেন তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বিভাগে নেপালচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি এত দিন নেপালচন্দ্রের কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া আসিবার বহু দিন পর এলাহাবাদ এংলো-বেঙ্গলী স্কুল যখন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রূপে পরিণত হয় তখন প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার ডাক আসিয়াছিল।

শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিবার সময় হইতেই নেপালচন্দ্র দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি প্রথম হইতেই কংগ্রেসের সেবক ছিলেন। তিনি যখন এলাহাবাদে ছিলেন কংগ্রেসের সহিত তাঁহার তখন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। নেপালচন্দ্র সেখান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নিয়মিতরূপে যোগ দিতেন। মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন, নেপালচন্দ্র শান্তিনিকেতন হইতে অবসর লইয়া এই আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়ায় তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি বীরভূম হইতে বহু বৎসর এবং তাঁহার নিজ জিলা খুলনা হইতে কিছু কাল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সে যখন গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন তিনি ঘোর বিপক্ষতা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতিবাদ জানাইতে এবং স্পষ্ট ভাষায় তাহার কারণ সভার সমক্ষে ব্যক্ত করিতে কোন প্রকার দ্বিধা করেন নাই। খুলনা জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের একটি অধিবেশন তাঁহার গ্রামে হইয়াছিল। তিনি তাহার অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি দুই বার এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মাহাত্মা গান্ধী দ্বারা সমর্থিত কংগ্রেসের "কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড" সম্বন্ধে "না গ্রহণ, না বর্জ্জন" নীতির প্রতিকূলে নেপালচন্দ্র ওজস্বিতার সহিত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস জাতীয় দল সংগঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাংলা দেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ফলে তাঁহার প্রচেষ্টার সফলতা খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণিত হইয়াছিল। একই কারণে তিনি হিন্দু মহাসভাকে শক্তিশালী করিবার জন্য ঐকান্তিকতার সহিত চেষ্টা করেন এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দ্বারা অনুসৃত নীতির ফল দেশের পক্ষে কত বিষময় তাহা তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি অসাধারণ উৎসাহের সহিত এবং তাঁহার সমগ্র শক্তির দ্বারা এই নিরতিশয় অহিতকর নীতির বিরোধিতা করেন। স্বদেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া নেপালচন্দ্র তাঁহার মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানদিগকে ধর্ম্ম অনুসারে দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, দেশের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক এবং সর্ব্বনাশক প্রস্তাব আর হইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন: "শুধু যে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে প্রীতি সম্বন্ধ নষ্ট হইবে তাহা নহে, আমাদের দেশে শান্তি স্থাপনের আশা, সুবিচার লাভের আশা, সর্ব্ব প্রকার উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিতে হইবে। ইতিমধ্যে ইহার বিষময় ফল আমরা হাড়ে হাড়ে বোধ করিতেছি। ইংরেজ রাজপুরুষগণ যে ইহা না বুঝেন এমন নহে, শুধু আমাদের উন্নতির সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে এই শেষ ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান করিয়াছেন।" নেপালচন্দ্র তখন বলিয়াছিলেন যে, এই নীতি গৃহীত হইলে দেশের সকল প্রকার উন্নতির আশা সমূলে বিনাশ পাইবে। এই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইতে তিনি দেখিয়া গিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৭) কলিকাতা টাউন হলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের সুভাষচন্দ্র বসুর দলের সহিত মুসলিম লীগ দলের যে রফা হয় তাহার প্রতিকূলে মত ব্যক্ত করিবার জন্য হিন্দু জনসাধারণের একটি সভার অধিবেশন হয়। নেপালচন্দ্র এই সভার প্রধান উদ্যোক্তাগণের মধ্যে একজন ছিলেন। বিরোধী দল এই সভায় অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা এবং গুণ্ডামির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নেপালচন্দ্র সভার এক পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া ছিলেন। যখন এই প্রকার গণ্ডগোল চলিতেছিল সেই সময় কোন এক ব্যক্তি "অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা" তাঁহাকে দেখাইয়া দিলে এক ব্যক্তি তাঁহার মাথায় আঘাত করে এবং তাহার ফলে গুরুতর রক্তপাত হয়। এই সভায় সভাপতি ছিলেন পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নেপালচন্দ্রের ন্যায় শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানার্হ সপ্ততিপর বৃদ্ধের প্রতি ঘৃণ্য ব্যবহার এবং এই সভায় বিরোধী দলের অপকার্য্য সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্পষ্ট রূপে এবং বিস্তৃত ভাবে সেই সময়ের 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সভায় বিরোধী দলের ব্যবহার যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "এই অভিজ্ঞতা দুঃখকর ও লজ্জাজনক। উপদ্রবকারীরা ভিন্ন দলের লোক, ইহাও ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। আমি কোন দলের নহি। রাজনৈতিক গুণ্ডারা বাঙালী, আমিও বাঙালী, সুতরাং তাহাদের লজ্জাজনক অপকীর্ত্তি আমারও মাথা হেঁট করিতেছে। সকলের চেয়ে অধিক ব্যথা ও লজ্জা পাই উপদ্রবকারীদের সঙ্গে কোন কোন মহিলাকে দেখিয়া।"

চিরদিনই নেপালচন্দ্র নিয়মিতরূপে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য যত্ন করিয়া আসিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি শান্তিনিকেতন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তখনকার গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সাধারণ সমক্ষে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। তিনি সেই সময় প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত সর্ব্বাগ্রে প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্নিহিত বিষময় নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য উদ্যোগী হন। প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহ এবং যত্নের ফলে এই প্রস্তাবের প্রতিকূলে সুনিয়মিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিটির সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন এবং প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলে প্রস্তাবিত বিল তখনকার মত পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী পূর্ব্বের প্রস্তাব পুনরায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রতিবাদ সত্ত্বেও মন্ত্রিমণ্ডলীর নূতন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য শীঘ্রই আইন সভায় উপস্থাপিত করা স্থির হইয়াছে। নূতন শিক্ষা-আইন গৃহীত হইলে বাংলা দেশে শিক্ষার বিষম বিপদ ও বিপত্তি উপস্থিত হইবে। এ বিষয় জনসাধারণের অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রতিকূলে ক্ষিপ্রতা সহকারে দেশব্যাপী কার্য্যকরী আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

গত পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে নেপালচন্দ্র পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-সম্প্রসারণে তাঁহার অতুলনীয় অবদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করায় তাহা কতকটা ফলপ্রসূ হয়। এ সময় তাঁহার চেষ্টাতেই নেপালচন্দ্র এংগ্লো-বেঙ্গলী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। নেপালচন্দ্র শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ বাধা ও অসুবিধা দেখিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তিনি পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করেন। নেপালচন্দ্রের মতে ঐ প্রদেশে অধুনা শিক্ষার যে বহুল বিস্তার ও উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার মূলে রামানন্দবাবুর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা। নেপালচন্দ্র যখন এলাহাবাদে ছিলেন তখন যে কেবল শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি রামানন্দবাবুর প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সহযোগিতা এবং সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা নয়। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের উচ্চনিনাদী প্রতিধ্বনি তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পৌঁছিয়াছিল। সে সময় এলাহাবাদে যে-সকল রাজনৈতিক এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের সূচনা হইয়াছিল প্রায় সে-সকল প্রচেষ্টার সহিতই নেপালচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

যখন কলিকাতায় কলেজের ছাত্র ছিলেন সেই সময় হইতেই নেপালচন্দ্র তাঁহার গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেখানেই থাকিতেন গ্রামের সহিত এবং ইহার বিবিধ ক্ষেত্রের উন্নতিবিষয়ক প্রচেষ্টার সহিত সংযোগ রাখিতেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই সংযোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায় সমিতি দ্বারা গ্রামের নানাবিধ উন্নতির চেষ্টা, গ্রামে উপযোগী শ্রমশিল্পের সংস্থাপন, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি তাঁহার গ্রামে একদল উৎসাহী এবং কার্য্যদক্ষ কর্ম্মীর সাহায্য সর্ব্বদাই পাইয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেও ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং অপটু শরীর লইয়াও দুর্ভিক্ষ এবং বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট নিবারণের চেষ্টায় তৎপরতার সহিত তিনি নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

সমবায় নীতির সমুচিত প্রয়োগে নানাবিধ ক্ষেত্রে দেশের প্রভূত উন্নতি সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

একার্য্যে অন্যান্য দেশে যে সুফল উৎপন্ন হইয়াছে আমাদের দেশেও তাহা হইতে পারে। কিন্তু এক দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এবিষয়ে গভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য, অপর দিকে গবর্ণমেন্টের ভ্রান্ত এবং ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে বাংলাদেশে সমবায় প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল এবং অকৃত-কার্য্য হইয়াছে, ইহা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রামে, বাগেরহাটে, শান্তিনিকেতনে এবং কলিকাতার বিভিন্ন সমবায় সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন যাহাতে সমবায় ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি এবং কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়।

সুলেখক এবং সুবক্তা হিসাবে নেপালচন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, এবং ভূগোল সম্বন্ধে একাধিক পুস্তক প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। তাঁহা দ্বারা লিখিত একাধিক পুস্তক ম্যাট্রিকুলেশন এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য মনোনীত হইয়াছে।

নেপালচন্দ্র অনেক সময় বলিতেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ব্যাপিয়া নানাক্ষেত্রে স্বদেশ ও স্বজাতির যে সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের কোন সময় তাহা উপযুক্তরূপে স্বীকৃত হইয়াছে এ কথা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের কিছুদিন পূর্ব্বে, রামানন্দবাবু অসুস্থ হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার ৭৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তাহার পর একথা কেহ বলিতে পারে না যে, দেশবাসী তাঁহার উচ্চ আদর্শ এবং মহান্ দেশপ্রেমের উপযোগী সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে কোন ত্রুটি করিয়াছে। অনেকেই অবগত নহেন যে, নেপালচন্দ্রের আগ্রহ এবং পরিশ্রমের ফলেই রামানন্দ-জয়ন্তী কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁহারা এবিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করাতেই প্রধানতঃ এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নেপালচন্দ্র রায় শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে কর্ম্মজীবনের প্রথম হইতেই দেশের এবং দশের উন্নতিমূলক নানা প্রকার কার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান, মনীষাসম্পন্ন এবং যোগ্য শিক্ষক বিরল। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্ম্মী, নিঃস্বার্থ, স্বাধীন-চেতা এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেশ-সেবকের অভাবও কম নয়। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী ঔপন্যাসিক ফিলডিং বলিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সৎ এবং উন্নতচেতা তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব অনেক সময়েই জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত ও অব্যক্ত থাকে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই যে, জনসমাজ তাঁহাদের জীবনের সুমহৎ দৃষ্টান্তের বাঞ্ছনীয় ফল হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়। এই প্রকার অবস্থায় দেশের ও দশের যে ক্ষতি হয় তাহা প্রভূত এবং অপূরণীয়। একমাত্র সুলিখিত জীবনচরিত দ্বারা এই অভাব যথোচিত রূপে পূর্ণ হওয়া সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে এই হিতকর অনুষ্ঠানের অবসর অপরিমিত বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে হয় না।

তমলুক এজেন্সীর লবণ-শিল্প

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে বাংলার লুপ্ত লবণশিল্প সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাতে হিজলীর বিষয়েই অধিক ছিল। সম্প্রতি একটি প্রাচীন সরকারী রিপোর্ট* আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তমলুক সল্ট এজেন্ট হ্যামিলটনের রিপোর্ট। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা গেজেট অফিস হইতে প্রকাশিত।

তমলুক এজেন্সী অবস্থিত ছিল রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে—কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইল পঁয়তাল্লিশ দূরে। এই এজেন্সী পাঁচটি লবণোৎপাদক পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেগুলি যথাক্রমে তমলুক, মহিষাদল, গুমগড়, জলামুঠা এবং আওরাংনগর। হুগলী নদীর পশ্চিমে নিম্নে খেজুরী হইতে উপরে তমলুক পর্য্যন্ত, হলদি ট্যাংরা-খালি এবং রায়খালি নদীর দুপাশে অসংখ্য খালাড়ি (manufactories) ছিল। হলদীর উত্তরে তমলুক এবং

* *Selections from the Records of the Bengal Government. No. XIII.*



বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর লবণোৎপাদন-কেন্দ্র

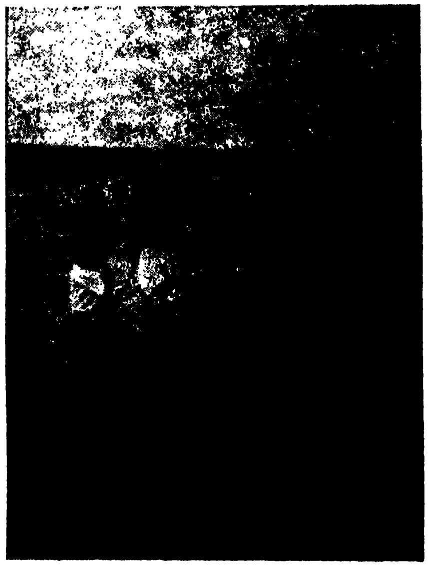
মহিষাদল, দক্ষিণে শুমগড়, জলামুঠা ও আওরাংনগর এই তিনটি। পূর্বে এই তিনটি পরগণা হিজলী এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ সালে ইহাদের তমলুক এজেন্সীর অন্তর্গত করা হয়। শুমগড় জেলা তের-পুকিয়া ঘাট হইতে দক্ষিণে থলপুটী খাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে শুমগড়ের গড়চক্রবেড়েতে গবর্ন্মেণ্টের নুনের খুঁটি গোচের হইয়াছে। হলদী এবং হুগলী নদীর ধারে ধারে এই শুমগড়ের মাটিতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত।

পাঁচটি আড়ং বা manf. dt. (পরগণা) হইতে একটি সীজনেই নয়-দশ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইত। ১৮৫১ সালে ৯,২১,৮৩৫ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। (4th. para—These five Aurungs, in favourable seasons are capable of yielding during one season 9 to 10 lakhs of mds. of salt.)

একটি সীজনে বা বৎসরে কত সওদা লবণ প্রতি আড়ঙে প্রস্তুত হইবে তাহা কলিকাতার বাজার অনুযায়ী প্রথমে ঠিক করিয়া লওয়া হইত। কিরূপ সওদা বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং কত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইত তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

পরগণা	বাঁধিয়া দেওয়া সওদা			মোট প্রস্তুতির পরিমাণ		
	১৮৫০	১৮৫১	১৮৫২	১৮৫০	১৮৫১	১৮৫২
তমলুক	১,৮৫	২,৫০	২,৫০	২,৫৫	২,৮৫	২,০৯ হ্
মহিষাদল	"	২,৭৫	"	২,৬৭	২,৬৫	২,০৩
জলামুঠা	৬৫	১,৫০	১,২০	১,২৩	১,৪৭	১,১২
আওরাংনগর	"	"	১,০০	১,২২	১,২১	১,০০
শুমগড়	৫০	৭৫	৮০	৭৪	১,০২	৮০
মোট...				৮,৪৩,২৬৯	৯,২১,৮৩৫	৭,০৬,৬৯৫ মণ

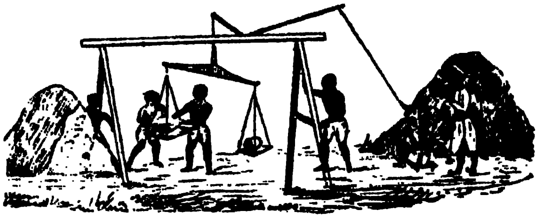
হ্যামিলটন লিখিয়াছেন—কয়েক বৎসর যাবৎ মলঙ্গীদের মণপ্রতি লবণ প্রস্তুত করিতে পারিশ্রমিক হিসাবে সাত আনা দেওয়া হইতেছিল (১৮৫২-৫৩), পরে ছয় আনা সাড়ে ছয় আনা দেওয়া হইবে। এ ছাড়া অবশ্য, মলঙ্গীদের তাহাদের চম্বর বা লবণাক্ত ভূমি অনুযায়ী কিছু জমি দেওয়া থাকে যেখান হইতে উহারা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। এই সব জমিকে 'জলপাই' বলা হইত। জ্বালানি কাঠ জোগাইবার জন্য জলপাই* অর্থাৎ বিস্তৃত বনভূমি রক্ষণ করা হইত। তমলুক পরগণায় ইহার আয়তন ছিল ১৬,৮৬৭ বিঘা, মহিষাদল পরগণায় ২৯,৭৮৭ বিঘা, শুমগড়ে ১৭,৬৪৬ বিঘা ইত্যাদি।



মই দিয়া বাড়ানো হইতেছে। তমলুক লবণ এজেন্সী

প্রতি খালাড়িতে মলঙ্গীদের লবণ-প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করিতে একজন করিয়া জিলাদার নিযুক্ত থাকিত। সে মাঝে মাঝে আসিয়া প্রত্যেক মলঙ্গী কে কত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিত তাহার হিসাব লইত। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ হইত, তাহার পূর্বে মলঙ্গীদের কিছু কিছু দাদন দেওয়া হইত। ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত লবণ প্রস্তুত হইত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মলঙ্গীদের তমলুক এজেন্সীতে বিশ হাজারের অধিক লোক কাজ করিত—মলঙ্গী প্রায় আড়াই হাজার, কুলি ১৪,৪০৭, নৌকার মাঝি ২,৫০০, ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুস্থানে গোলা ছিল—তমলুক পরগণায়

* District Gazetteer Midnapore—p.-137—A curious class of estate consists of what are known as Jalpai lands, i.e., fuel lands, so called, because they used to supply fuel for boiling brine when the manufacture of salt was carried on.



লবণ ওজন করা হইতেছে

নারায়ণপুর, বাসুদেবপুর, গোপালপুর, শুমগড়ে নন্দীগ্রাম, গড়চক্রবেড়ে, কৃষ্ণনগর, গোলপুখরিয়া, খুলবাড়ী প্রভৃতি।

২

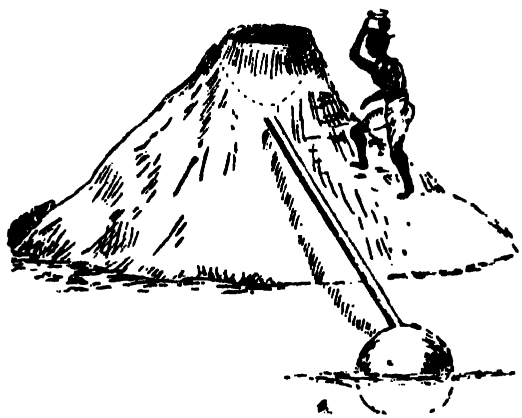
লবণপ্রস্তুতির প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়। যে-সব জমি মলঙ্গীদের বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত তাহারই নাম খালাড়ি—সাধারণতঃ অর্ধ হইতে তিন বিঘা পর্যন্ত ইহার আয়তন হইত। মলঙ্গীরা এইরূপ খালাড়িকে তিন-চারটি চত্বরে ভাগ করিয়া লইত। জমি-গুলি বেশ করিয়া আগাছামুক্ত ও পরিষ্কৃত করিয়া উহার চতুর্দিকে বাঁধ দিয়া দিত, যাহাতে সাগরের বা নদীর জোয়ারের জল ক্ষতি করিতে না পারে। এই জমি তাহারা বর্ষার সময় মাঝে মাঝে লাঙল দিয়া রাখিত যাহাতে লবণ-পদার্থ প্রতি মৃত্তিকাবিন্দুতে মিশিয়া যায় এবং আগাছা জন্মিয়া জমিটি নষ্ট না হয়। পরে তাহার উপর কুলিদিগের দ্বারা বা বলদ-সাহায্যে মই দিয়া সমতল করা হইত। (এই মই দেওয়ার রীতি দক্ষিণ-ভারতে ও পশ্চিম-ভারতের বর্তমান লবণ-শিল্পেও আছে। বাংলার লবণশিল্পেও কিছু কিছু দেখিয়াছি, তার ফটোও তুলিয়াছিলাম।) মই দেওয়ার পর পাঁচ-ছয় দিন ধরিয়া জমিটিকে রৌদ্রে শুষ্ক করা হইত এবং এইরূপ অবস্থায় মৃত্তিকাকে পুনরায় চাপ দিয়া ঠাস করিবার চেষ্টা হইত এবং পুনরায় রৌদ্রে কয়েক দিনের জন্য পড়িয়া থাকিত।

প্রতি চত্বরের এক দিকে একটি করিয়া ডোবা বা চৌবাচ্চাগোছের থাকিত যাহাতে জল পূর্ণ থাকিত। ইহা ভিন্ন তাহার নিকটে একটি করিয়া ফিল্‌টার বেড্‌ (filter bed) থাকিত যাহা হইতে নোনাজল পরিস্রুত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হইত। এই ফিল্টার 'মায়দা' (দবারি বা-গাড়ী বলিতেও কাঁথিতে শুনিয়াছি) বর্তমানে কুটীর-শিল্পে যেরূপ দেখি তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। দবারি সম্বন্ধে পূর্বেকার প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছি, একণে সে সময়কার 'মায়দা' (বড় দবারি) সম্বন্ধে হ্যামিলটনের কথাগুলি তুলিয়া দিই :

41st. para—The molunghee constructs a primitive filterer on each chattur composed of a circular mud wall, 4½ cubits high, 7½ cubits broad at top, 12½ cubits at base; at its summit is a basin of about 1½ cubits depth and 5 cubits diameter; the bottom is prepared of clay, ashes and sand; its clean, hard and impervious to water; a hole in centre of the basin, earthen pot fitted thereto and connected by a bamboo pipe.......

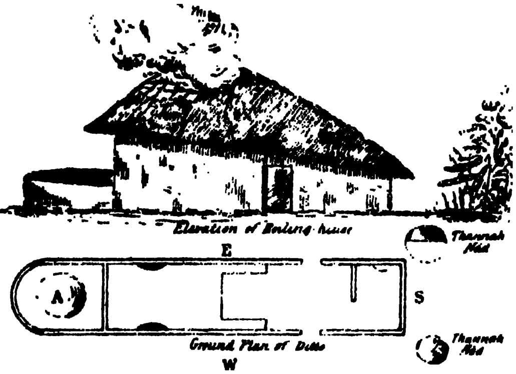
পরের অনুচ্ছেদে আছে—'মলঙ্গীরা তাহাদের খুরপার সাহায্যে খালাড়ি হইতে লবণাক্ত মাটি চাঁচিয়া কতকগুলি ঢিবিতে জড় করিয়া রাখিত এবং কিছু কিছু করিয়া 'মায়দা'র উপর চার্জ করিত। নোনামাটির উপর সাদা জল ঢালিয়া দিত—সেই জল মাটির নোনাভাগ দ্রবীভূত করিয়া লোনাজল (brine) আকারে বাহির হইয়া আসিত।" ইহা ত আজকালও হয়।

মায়দার পাদস্থিত আধার হইতে ব্রাইনকে বহন করিয়া চুল্লীর ঢাকা কুটীরের নিকটে একটি চৌবাচ্চায় জমা করা হইত। ব্রাইনকে এক দিন এই চৌবাচ্চায় রাখা হইত যাহাতে ময়লা নিয়ে থিতাইয়া যায়—তারপর অল্প অল্প করিয়া জাল দেওয়া হইত। হ্যামিল্টন লিখিতেছেন—বয়লার হাউস বা তুনরী ঘর সাধারণতঃ ২৫।২৬ হাত × ৭।৮ হাত মাপের হইত। দক্ষিণ হইতে বাতাস বহে বলিয়া ঘরগুলি উত্তরমুখো করা হইত



মায়দা (ফিল্টার)

এবং উত্তরদিকটাতে চুল্লি গাঁথা থাকিত—সেদিকের দেওয়াল ছয় হাত উচ্চ করিয়া গাঁথা। চুল্লি কোণাকৃতি, (conical) তাহার উপরে ২০০।২৫০টি মাটির পাত্র থাক থাক করিয়া সাজাইত—প্রতিটি মৃৎপাত্রে এক সের আধসের করিয়া লোনাজল ভর্তি করিয়া একত্রে চুল্লীতে জাল দেওয়া হইত। চুল্লী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিলে নোনাজল যখন ফুটিয়া কমিয়া আসিত তখন সেগুলি পুনরায় পূর্ণ করা হইত—এইভাবে মাঝে মাঝে নূতন নোনাজল দিয়া



চুলি-ঘর

যতক্ষণ না চার ভাগের তিন ভাগ লবণ পূর্ণ হইত ততক্ষণ জ্বাল দেওয়া চলিত। চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া এক একটি দফায় ফোটানো হইত।

এইভাবে সদ্যপ্রস্তুত লবণকে বড় বড় ঝুড়িতে ঢালিয়া, বাঁশের সমান্তরাল খুঁটিতে শূন্যস্থিত করিয়া সারাদিন জল ঝাড়ান হইত। তারপর সেগুলি গোলাতে গিয়া জমা হইত। এইভাবে তমলুক এজেন্সীতে সে সময় গড়ে প্রতিদিন নয় হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইত।*

গোলা হইতে লবণ লইয়া যাইবার জন্য নৌকাওয়ালাদের সহিত চুক্তি থাকিত—পাঁচ শত নৌকা সাধারণতঃ এই কাজে লাগিত।

ট্যাংরাখালি নদীর তীরে নারায়ণপুর ঘাটে কোম্পানীর তিনটি খুঁটি ছিল—প্রতিটি খুঁটিতে পাঁচ হইতে পনরটি পর্যন্ত লবণগোলা ছিল। সেগুলিতে যথাক্রমে সাড়ে তিন, সাড়ে চার এবং সাড়ে ছয় লক্ষ মণ লবণ রাখা যাইত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মাত্র এক স্থানেই চৌদ্দ লক্ষ মণ লবণ রাখিবার গোলা নির্মিত ছিল।

তমলুক এজেন্সীর লবণপ্রস্তুতিতে কোম্পানী কতকগুলি খাল এবং নদীপথেই দেশী নৌকা-সাহায্যে চতুর্দিকে লবণ প্রেরণ করিত। নারায়ণপুর খাল রূপনারায়ণ নদ হইতে বাহির হইয়া ট্যাংরাখালিতে পড়িয়াছে। ট্যাংরাখালি এবং হলদী নদী সমস্ত তমলুক 'নিমকমহাল'টাকে ভাগ করিয়া দিয়াছিল, সেজন্য এই জলপথে উভয়দিকের লবণ সরবরাহের সুবিধা হইত। তেরপুকিয়া ঘাট ছিল মহিষাদল ও গুমগড়ের মাঝামাঝি এবং লিছনপুর ছিল জলামুঠা এবং তমলুকের মাঝামাঝি। আওরাংনগর ছিল ক্ষুদ্রতম পরগণা—তাহারও সংযোগ ছিল এই খালের সহিত।

এই পর্যন্তই আমাদের কাজে লাগিবে। ইহার পর লবণ সরবরাহের সম্বন্ধে হ্যামিল্টন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রয়োজন নাই।

উপসংহারে দুই-চারিটি কথা বলিতে চাই। পূর্বে আমাদের যে লবণশিল্প ছিল তাহার কণামাত্র পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখিয়াছিলাম কাঁথির সমুদ্র-উপকূলে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর। সে বিষয়ে বহু বার বলিয়াছি। এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি যে, বাংলাদেশে



চুলি-ঘরের অভ্যন্তর

গবর্মেণ্ট, উপরোক্ত কুটীর-শিল্পের উন্নতির কিছু বিধান করায় লবণশিল্প বেশ একটু একটু করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। বর্তমান লবণোৎপাদক যৌথ কোম্পানীদের কার্য্যের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। বন্যাপীড়িত কাঁথি-অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যে খ্যাতনামা সিভিলিয়ান শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন বাংলা-সরকারকে দিয়া কুটীর-শিল্পে লবণপ্রস্তুতির জন্য অনুমতি এবং সর্ববিধ সাহায্য দান করার বন্দোবস্ত করেন। তাহার ফলে লবণ কোম্পানী-গুলিও "মলঙ্গী"দের নিকট লবণ কিনিয়া কর দিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছেন এবং তথাকথিত মলঙ্গীরা খুব উৎসাহের সহিত লবণ প্রস্তুত করিতেছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও এইভাবে কুটীর-শিল্পে ভিত্তিতেই বাংলার লবণের নিজস্ব প্রাচীন অত বড় বাণিজ্য ও কারবার বজায় রাখিয়াছিল।

এক্ষণে উহাদের সমবেত উৎপাদনের যাহাতে আরও প্রচুর বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সরকার পক্ষ হইতে এবং লবণ কোম্পানীগুলির পক্ষ হইতে রীতিমত উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

*47th.—The total manufacture in one day during a favourable season in the 5 dts. has been as much as, 9,000 mds.

বাংলা সাহিত্য ও আমাদের জাতীয় জীবন

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ হয় বাংলা দেশে। স্বাজাতিক ভারতের জাতীয় সঙ্গীতটি পর্যন্ত বাঙালীর রচনা। দেশাত্মবোধের এই প্রেরণা বাঙালী তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াই লাভ করিয়াছে; বিগত-বৈভব স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্রশাসনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বাঙালী তাহার সাহিত্যের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া বাংলার কবি ও সাহিত্যিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনকের আসন নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারেন। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"—বলিয়া বাঙালী কবি যে আত্মজিজ্ঞাসার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, মুক্তিকামী ভারত আজো তাহারি অনুশীলন করিতেছে। বঙ্কিমের সাহিত্য বাঙালীকে কিরূপ গভীরভাবে দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। স্বদেশী যুগে পুলিস বৃথাই আনন্দমঠের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় নাই। কবিকে যাহারা কল্পনাবিলাসী আকাশচারী বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন, তাহারা জানিয়া বিস্মিত হইবেন যে স্বদেশী যুগে একা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য জাতীয় আন্দোলনকে কি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। শুধু স্বদেশী যুগে নহে, একটু অবধান করিলেই দেখা যাইবে কবির বাণী ও রচনা আমাদের পরবর্ত্তীকালের রাজনৈতিক চিন্তাধারারও বহুলাংশে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ। বস্তুতঃ আমাদের বিগত চল্লিশ বৎসরের রাজনৈতিক কর্ম্ম বা অনুভূতি কবির চিন্তাধারাকে কোন ক্ষেত্রেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই,—যদিও বহুক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছে মাত্র।

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আবেদন নিবেদনের ডালি সাজাইয়া সম্ভব নহে, কেবল মাত্র আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আপন কর্ম্ম সাধনা দ্বারাই সম্ভব—একথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম শুনাইয়া-ছিলেন এবং রাজনৈতিক ভারত আজও সেই আত্মশক্তি উদ্বোধনের দুরূহ ব্রতকেই সফল করিবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন মন্ত্র, বিপিনচন্দ্র করিয়াছেন তাহার প্রচার, আর অরবিন্দ লইয়াছিলেন সেই মন্ত্রের সাধনা।

শুধু রবীন্দ্রনাথই নহেন; বাংলার কবি, নাট্যকার, লেখক ও গীতিকার সকলের মিলিত রচনার মধ্য দিয়াই বাংলার স্বদেশী আন্দোলন শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিকে যেমন "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ" বলিয়া দেশমাতৃকাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, সাজাহান, মেবার পতন প্রভৃতি বহুজনপ্রিয় নাট্য রচনাগুলির মধ্য দিয়া তেমনি উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা'র তেজোদৃপ্ত রচনা কত যুবকের ধমনীর রক্তপ্রবাহকে চঞ্চল করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কুলার সার্কুলারে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যে-দিন বেত্রাঘাতের দ্বারা দণ্ডনীয় হইয়া-ছিল, সে-দিন কাব্য বিশারদের গান "বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমরা কি মার সেই ছেলে। জগৎ মাঝে তোমার কাজে যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম্ বলে।"—গাহিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ জানাই-য়াছে। এমনি করিয়া বাঙালীর কাব্য ও সাহিত্য বাঙালীর রাজনীতিক আন্দোলনের প্রেরণা জোগাইয়াছে; শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নহে, সমাজ-সংস্কার, পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি সংগঠনমূলক কর্ম্মের ক্ষেত্রেও বাঙালীর সাহিত্য, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙালীর চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আধুনিক ভারতবর্ষ বাংলাদেশকে যদি জাতীয়তাবাদের দীক্ষাগুরু বলিয়া মানে, তবে সে গৌরবে বাঙালী সাহিত্যিকগণের অধিকার অকিঞ্চিৎকর নহে।

অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে বাঙালী আজ তাহার পূর্ব্ব গৌরবশিখর হইতে বিচ্যুতির পথে। সর্ব্ববিধ প্রগতির ক্ষেত্রে বাঙালী একদা যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা হইতে সে ভ্রষ্ট হইতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে বাংলার অগ্রগামী চিন্তাধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া মহামতি গোখ্‌লে যে প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা লইয়া অনেক বাঙালী আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে অতীতের সেই সাধুবাদ আমাদের যতই রুচিকর হউক না কেন, আজিকার দিনে তাহা কি অতিশয়োক্তি নহে? শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীর পূর্ব্ব গৌরব-রবি অস্তমিত প্রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সহিত তুলনা করিলেই বাঙালীর এই ক্রমক্ষীয়মান মহিমার তথ্যটি সুস্পষ্ট হইবে। সাহিত্যের কথাই প্রথমে ধরা যাউক। বঙ্কিম বা মধুসূদনের ন্যায় সাহিত্য-প্রতিভার সন্ধান

আধুনিক বাংলায় আর মিলে না, শরৎচন্দ্রের স্থান পূরণ করিতে পারেন এমন সাহিত্যিকও দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টিও উত্তরাধিকারীহীন। দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানের পর হইতে নাট্য-সাহিত্য আজিও অনুরূপ নাট্যকারের প্রতীক্ষাশীল। আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যসৃষ্টিকে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, বিগত শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যে এমন কয়েকজন দিক্‌পালের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যাঁহাদের শূন্যস্থান আজও পূর্ণ হয় নাই। রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের ন্যায় মহারথী আজ নাই; বাগ্মিতায় লালমোহন ঘোষ বা বিপিনচন্দ্র পালের সমকক্ষ দেখা যায় না; ধর্ম্মজগতে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব আর দেখিতেছি না। স্যার রাসবিহারীর ন্যায় ব্যবহারজীবী ও স্যার আশুতোষের ন্যায় শিক্ষাবিদের আজ একান্ত অভাব। একমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রবর্ত্তিত ধারাকে তাঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যমণ্ডলী প্রগতির ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়াছেন; তাঁহারা বাঙালীর গৌরবস্থল। সাংবাদিকতায় বাঙালীর প্রতিভা যে সার্থক সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে, তাহাও আমাদের শ্লাঘার বিষয়। শুধু যে বাংলা দৈনিকের প্রচার সংখ্যা ভারতের অন্য যে-কোন প্রাদেশিক সংবাদপত্র হইতে বহু পরিমাণে অধিক, তাহা নহে; রচনা-রীতি, বিষয়-বিচার, বিশ্লেষণ-ক্ষমতার দিক দিয়াও বাংলার সাময়িক পত্রগুলি অন্যান্য প্রদেশের আদর্শস্থানীয়; এমন কি বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির তাহারা অনেকাংশে সমকক্ষ।

জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টা দ্বারা সাফল্য অর্জ্জন সম্ভব, বাঙালীর প্রতিভায় সেখানে বিস্ময়কর বিকাশ ঘটিয়াছে। সাহিত্য-সৃষ্টি, চিকিৎসা-বিদ্যা, আইন-ব্যবসায়, অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর অনুকূলে ছিল বলিয়াই বাংলাদেশ সর্ব্বভারতের পুরোভাগে আসিতে পারিয়াছিল। অপরপক্ষে এই তীব্র ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তাহাকে সম্মিলিত কর্ম্মের যজ্ঞশালায় অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পবিস্তার শুধু একক মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না—বহুজনের সম্মিলিত সহযোগিতা দ্বারাই তাহা সাফল্যের কূলে উত্তীর্ণ হয়। এই মিলিত কর্ম্মশক্তির অভাবই বাঙালীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রধান কারণ।

স্বদেশীযুগে বিদেশীপণ্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞার উদ্ভব হয় বাংলাদেশে। সে দিনের রাজনৈতিক মন্থনের হলাহল সমস্তটাই পান করিয়াছে বাংলাদেশ; অথচ তাহার সুধা পাইয়াছে অন্য প্রদেশ। স্বদেশী শিল্পসাগর হইতে উঠিয়া সে-দিন লক্ষ্মীদেবী তাহার প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে বোম্বাইর কাপড়-কলওয়ালাদেরই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন,—বাঙালীকে নহে। স্বদেশীযুগে বাংলাদেশেও কয়েকটি শিল্পপ্রচেষ্টা যে সুরু হয় নাই এমন নহে, কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই কীটদষ্ট পুষ্প-কোরকের মত অকালে বিনষ্ট হইয়াছে, বিকশিত শোভা ও গন্ধে গৌরবান্বিত হইতে পারে নাই। সে-দিন যে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রেরণা বাঙালীর উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল, অবাঙালীদের কর্ম্মশক্তিতে অনেকাংশে আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য অনেকেই ঈর্ষাকাতরচিত্তে অবাঙালীদের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে লক্ষ্মীর দরবারে অযোগ্যের স্থান নাই, স্বয়ম্বরা কন্যার ন্যায় তিনি বরমাল্য হস্তে বীরের অন্বেষণ করেন, কারুণ্য তাঁহার ধর্ম্ম নহে।

কিন্তু আমি আশাহীন নহি। জানি, আমাদের সংগঠনী কীর্ত্তির পরিচয় গর্ব্ব করিবার মত নহে। শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর উদ্যম অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর এবং এ পর্য্যন্ত যতটুকু হইয়াছে তাহারও সামান্যই সাফল্যে গৌরবান্বিত। স্বীকার করি, সম্মিলিত কর্ম্মশক্তির যে প্রাচুর্য্য বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও সার্থক করিবার পক্ষে অপরিহার্য্য, আজ পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় বাঙালী বড় বেশী দেয় নাই। তথাপি একথা নিঃসঙ্কোচে বলিব যে বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি সন্দিহান নহি। বাঙালী যুবকেরা যে-দিন ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংগঠনমূলক কর্ম্মের ক্ষেত্রে সত্যকার বিশ্বাস ও প্রেরণা লইয়া অবতীর্ণ হইবে, সে-দিন সাফল্য তাহার দুরধিগম্য রহিবে না।

বহুব্যাপক নিঃস্বতার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অজস্র ঐশ্বর্য্য নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে একক দীপশিখার মত চারিপার্শ্বের আলোকহীনতাটাকেই অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তোলে। সুতরাং বাঙালীর সৃজনী প্রতিভা কেবল ব্যক্তিবিশেষের সাফল্য-গর্ব্বিত বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যেই শেষ হইবে না, সমগ্র বাঙালী জাতির সার্ব্বজনীন উন্নতির পরিচয় বহন করিবে, উর্দ্ধশির-মন্দিরের বহুবিস্তৃত ভিত্তির মত তাহার খ্যাতি পারিপার্শ্বিকের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণকে জড়াইয়া রহিবে—আমি এই আশাই করিতেছি।*

---

* দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণ হইতে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বেদপ্রচার

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল উৎস বেদ হইতে সার সত্য সঙ্কলন করিয়া ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় উহা সর্ব্বসাধারণের নিকট সুলভ ও সহজবোধ্য করিবার প্রথম চেষ্টা ভারতবর্ষেই আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮০৫ সালে প্রকাশিত কোলব্রুকের গ্রন্থ Treatise on Vedasকে বেদচর্চ্চার প্রাথমিক প্রয়াস বলিয়া ধরিয়া লইলেও বেদ অনুবাদ ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮১৬ সালে রামমোহন সামবেদের এক অধ্যায় কেন উপনিষদ এবং যজুর্ব্বেদের এক অধ্যায় ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের দ্বারা বেদের বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুবাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূল বেদের পাঠোদ্ধার বা অনুবাদ তখনও আরম্ভ হয় নাই। কোলব্রুকের গ্রন্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং রামমোহনের অনুবাদগুলিও অল্পদিনের মধ্যেই বিলাতে পৌঁছিয়াছিল। ইংলণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রামমোহনের সহিত কোলব্রুকের মিলন ঘটিবার এক বৎসরের মধ্যেই রামমোহনের মৃত্যু হয়। ইহারই পাঁচ বৎসর পর ১৮৩৮ সালে লণ্ডনে ফ্রেডারিক রোজেন কর্ত্তৃক মূল ঋগ্বেদের কতকাংশ ইংরেজী অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে রোজেনের মৃত্যু হওয়ায় এই সংস্করণটি সমাপ্ত হইতে পারে নাই।

ইহার পর হইতেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী ও রাশিয়ায় বেদের পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদের চেষ্টা চলিতে থাকে; প্যারিসে অধ্যাপক ইউজেন বীরনুফ ছিলেন উহার প্রধান কেন্দ্র। ফ্রান্সের প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শেজি এবং গার্সাঁ দ্য তাসির সহিত রামমোহনের পরিচয় হইয়াছিল এবং প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটিও ইংলণ্ডের এশিয়াটিক সোসাইটির ন্যায় রামমোহনকে সম্মানিত সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৬-এ বীরনুফের শিক্ষকতার প্রথম ফল ফলে; তাঁহার ছাত্র রুডলফ রথ জার্ম্মেনীতে "বেদের ইতিহাস ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রথের উদ্যমে জার্ম্মেনীতে বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। বীরনুফের অপর এক ছাত্র ম্যাক্সমূলারের মনে মূল সহিত বেদ অনুবাদের আগ্রহ জন্মে। লণ্ডনে ম্যাক্সমূলারের সহিত অধ্যাপক উইলসনের মিলন হয়। বেদ অনুবাদের ইচ্ছা উইলসনের মনে বহুকাল যাবৎ জাগ্রত ছিল কিন্তু সুযোগের অভাবে তিনি উহাতে সমর্থ হন নাই। এই যুবক সহকর্ম্মীকে লাভ করিয়া অবিলম্বে তিনি বেদের পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদে মনোনিবেশ করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উহা প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ার অর্থানুকূল্যে বোম্বাইয়ে ইংরেজী অনুবাদ সমেত ঋগ্বেদের এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। উইলসন কর্ত্তৃক রাজা রাধাকান্ত দেবকে লিখিত এক পত্রে ইহা জানা যায়; ইহাতে উইলসনের হাত ছিল কি না তাহা অবশ্য উহা হইতে বুঝা যায় না।

বাংলাদেশে বেদচর্চ্চার যে সূচনা রামমোহন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিবৃত্ত হয় নাই। শুধু উপনিষদ পাঠে সন্তুষ্ট না থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া উহার পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদের সঙ্কল্প করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ প্যারিসে বীরনুফ যখন রথ ও ম্যাক্সমূলারকে শিক্ষাদান করিতেছেন সেই সময়েই, কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বেদচর্চ্চা আরম্ভ হয়। রথের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্ব বৎসর তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক কাশীতে বেদাধ্যয়ন ও বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য প্রথম ছাত্র আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রেরিত হন। ইহা হইতে দেখা যায়, আলাদা ভাবে হইলেও একই সময়ে লণ্ডন, প্যারিস, জার্ম্মেনী ও কলিকাতায় বেদের পাঠোদ্ধার ও অনুবাদের চেষ্টা চলিতে থাকে। ডাঃ রোয়ার কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদান করিবার পর এই প্রতিষ্ঠানটিও বেদ প্রকাশের জন্য আগ্রহশীল হইয়া উঠেন।

১৮৪৮-এ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের মূল সহিত বঙ্গানুবাদ বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং ডাঃ রোয়ারের সম্পাদনায় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক ঋগ্বেদের এক খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯-এ লণ্ডনে ম্যাক্সমূলারের সম্পাদনায় উইলসনের ইংরেজী অনুবাদ সমেত ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ আরও তিন জন ছাত্রকে বেদাধ্যয়নের জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া বেদ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

রোয়ারের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক ঋগ্বেদ প্রকাশের সফল চেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথের সাহায্য অজ্ঞাত

রহিয়াছে। ১৮৪৩ সাল হইতে সোসাইটি বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন। ঐ বৎসর বীরনুফের সাহায্যে ১৫০৲ ব্যয়ে প্যারিস হইতে বেদের পাণ্ডুলিপির কতক অংশ নকল করাইয়া আনা হয়, পর বৎসর এই কার্য্যে আরও ৫০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। প্যারিসের বিব্লিওথেক রয়েলে এবং বীরনুফের নিজের লাইব্রেরীতে মাধবাচার্য্যের ভাষ্য সমেত প্রায় সম্পূর্ণ এবং বেদের অন্যান্য অংশের অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ছিল।

১৮৩৮ সাল হইতে এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য মাসিক ৫০০৲ অর্থ সাহায্য পাইতেছিলেন। প্রধানতঃ বেদ প্রকাশের জন্য এই টাকা ব্যয় হইবে এইরূপ একটা কথা ছিল, কিন্তু সোসাইটি অন্যান্য কার্য্যে টাকাটা খরচ করিয়া ফেলিতেছিলেন। ১৮৪৬-এর ২১শে নবেম্বর ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ বুশবী বেদ প্রকাশের আয়োজন কত দূর কি হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিলেন এবং গত আট বৎসরে এই টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত হিসাব চাহিয়া বসিলেন। ভারত-সরকারের এই পত্র প্রাপ্তির পর ১৮৪৭, ৬ই এপ্রিল এশিয়াটিক সোসাইটি অবিলম্বে বেদ প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। সোসাইটির ওরিয়েণ্টাল কমিটির উপর উহার ভার অর্পিত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসেই দেবেন্দ্রনাথকে সোসাইটির সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বেদ প্রকাশ সুষ্ঠু ভাবে করিতে হইলে তাঁহার সাহায্য অপরিহার্য্য। সদস্য রূপে দেবেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন সোসাইটির সিনিয়র সেক্রেটরী ডাঃ ওশহ্‌নেসী, এফ-আর-এস এবং সমর্থন করিয়াছিলেন সভাপতি সর্ জন পিটার গ্রাণ্ট। সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার পরই দেবেন্দ্রনাথকে ওরিয়েণ্টাল কমিটিতে গ্রহণ করা হয়। এই কমিটিতে তখন ছিলেন ডাঃ হেবারলিন, জি. এ বুশবী, মেজর মার্শাল, রেভারেণ্ড লং, ওয়েলবী জ্যাকসন এবং হরিমোহন সেন। কমিটির সেক্রেটরী ছিলেন ডাঃ রোয়ার। দেবেন্দ্রনাথকে অতঃপর সোসাইটির প্রধান কমিটি গ্রন্থসভা অথবা কমিটি অব পেপার্সে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই কমিটিতে কোন আসন খালি ছিল না। ডাঃ হেবারলিন ঢাকায় থাকিতেন এবং প্রায়ই কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার স্থলে দেবেন্দ্রনাথকে লইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা ডাঃ হেবারলিনকে প্রকারান্তরে অপসারিত করা হইতেছে মনে করিয়া প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। হেবারলিন সংবাদ পাইয়া স্বয়ং পদত্যাগ করেন এবং যে মাসে দেবেন্দ্রনাথ এই কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

রোয়ার বেদের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের চেষ্টায় ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ হইতে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তরে লিখেন যে তাঁহাদের গ্রন্থাগারে দশোপনিষদ ভিন্ন অন্য অংশের পাণ্ডুলিপি নাই ; তবে বেদ অধ্যয়নের জন্য সভা কাশীতে যে, সব ছাত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি লইয়া ফিরিয়া আসিলে আনন্দের সহিত তাঁহারা সোসাইটিকে উহা ব্যবহার করিতে দিবেন। ছাত্রদের অধ্যয়ন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। দেবেন্দ্রনাথ সোসাইটিকে জানাইয়া দেন যে, কাশী হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া এই কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ না করিলে উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না ; কারণ পাণ্ডুলিপিতে অনেক ভুল থাকে, বেদজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা ধরা সম্ভব নহে। এই সঙ্গে তিনি ইহাও জানান যে, কলিকাতায় বেদের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাইবে না। রাধাকান্ত দেবও দেবেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিয়া বলেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণেরা বেদের প্রুফ দেখিতে পারিবে না। কাশী এবং দাক্ষিণাত্য হইতে উপযুক্ত লোক আনিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। ঐ সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, ক্যাপ্টেন পোলিয়ের বেদের যে সম্পূর্ণ মূল পাণ্ডুলিপিটি ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়মে জমা দিয়াছেন সেটি চাহিয়া আনিবার ব্যবস্থা করা হউক। পাণ্ডুলিপিখানি না পাওয়া গেলে অগত্যা উহার নকল আনা দরকার এবং এই কার্য্যের জন্য ব্যয় স্বীকারে এশিয়াটিক সোসাইটি অথবা ভারত-সরকার কাহারও পক্ষেই কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কাশী হইতে বেদজ্ঞ পণ্ডিত আনিবার যৌক্তিকতার কথা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বলেন।

এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট একটি লিখিত মন্তব্য দাখিল করেন। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :

"সোসাইটির গ্রন্থাগারে বেদের কতকগুলি অংশের পাণ্ডুলিপি আছে। কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষে এইগুলি যথেষ্ট হইলেও নিম্নলিখিত কারণে আমি মনে করি যে যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়া এসম্বন্ধে গভীর ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন এরূপ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ না করিলে সোসাইটির এই গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ কার্য্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না।

প্রথম কারণ, পাণ্ডুলিপি তৈয়ারির সময় পদে পদে ভুলভ্রান্তি অপরিহার্য।

দ্বিতীয় কারণ, বেদের পাণ্ডুলিপির বহু খণ্ড সংগৃহীত হইলেও সবগুলি মিলাইয়া উত্তমরূপে পাঠ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে ভাষায় ঐগুলি

লিখিত তাহা অপ্রচলিত হইয়া যাওয়ায় ভাষ্যের সাহায্যেও উহা বুঝা কঠিন। ভাষ্যগুলিও বহুক্ষেত্রে মূলেরই ন্যায় দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বেদের ভাষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান এবং পাণ্ডুলিপির দোষগুণ বিচারক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য যাঁহাদের আছে সেরূপ লোকের সাহায্য গ্রহণ না করিলে এই কার্য্য সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না।

এই সব কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাশী হইতে বেদজ্ঞ পণ্ডিত আনয়ন করা সম্ভব হইলে তাহাই করিতে হইবে এবং প্রস্তাবিত গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্যের জন্য ইঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত করিতে হইবে।

দেবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যের উপর ডাঃ রোয়ার নিম্নলিখিত রিপোর্ট দেন :

"আমাদের গ্রন্থাগারে বৈদিক পাণ্ডুলিপির সংখ্যা কম। দেবেন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন কলিকাতায় উহা পাওয়া যাইবে না। রাধাকান্ত দেবও ইহাই মনে করেন। বিশপস কলেজের গ্রন্থাগারে ঋক সংহিতার একটি সম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট শুদ্ধ পাণ্ডুলিপি আছে এবং ব্যবহারের জন্য উহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে। আমার ইচ্ছা এই সংহিতাটির মুদ্রণ আরম্ভ হউক, ভাষ্য পাওয়া গেলে ভাষ্য সহিত নতুবা ভাষ্য ছাড়াই ছাপা আরম্ভ করা যাউক। এই উদ্দেশ্যে আমি একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিব স্থির করিয়াছি। ইনি আমার তত্ত্বাবধানে ঐ পাণ্ডুলিপিখানি নকল করিবেন। দেবেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যে সব অসুবিধার কথা লিখিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, তাহা একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে।"...

দেবেন্দ্রনাথ ও ডাঃ রোয়ার উভয়ের মন্তব্য বিচার করিয়া সোসাইটি কাশী হইতে বেদজ্ঞ পণ্ডিত আনয়নের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। বেদ প্রকাশের সংকল্প গৃহীত হয়। ডাঃ রোয়ারকে বেদ সম্পাদনের ভার দেওয়া হয় এই সর্ত্তে যে মূল এবং ভাষ্যের সমস্ত প্রুফ তাঁহাকে ওরিয়েন্টাল কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কোন অংশ প্রেসে পাঠানো যাইবে না।

বহু চেষ্টার পর ঋগ্বেদ সংহিতার চারিখানি পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইল। দেবেন্দ্রনাথ এবং রেভারেণ্ড লং এক যুক্ত মন্তব্যে বলিলেন যে, এবার কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। তবে বেদজ্ঞ পণ্ডিত আনিতে যাহাতে বিলম্ব না হয় ইহাও তাঁহারা ঐ সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিলেন। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিতে লাগিল। ঋগ্বেদ সংহিতার পাণ্ডুলিপি অনেকখানি প্রস্তুত হইল, গদ্যে ও পদ্যে ইংরেজী অনুবাদও অনেক দূর অগ্রসর হইল। এমন সময় সেপ্টেম্বর মাসে কর্ণেল সাইক্‌স ইণ্ডিয়া হাউস হইতে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স লণ্ডনে ৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে ঋগবেদ প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার উহা সম্পাদন করিবেন এবং অধ্যাপক উইলসন অনুবাদ করিবেন। একই কাজ দুই জায়গায় স্বতন্ত্র ভাবে করা অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়া সোসাইটির কাউন্সিল ঋগ্বেদ প্রকাশের আয়োজন স্থগিত রাখা সঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন। ডাঃ রোয়ার ঋগ্বেদের পরিবর্ত্তে যজুর্বেদ সংহিতা প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবেচিত হইল। অধিকাংশ সদস্য এই বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স যখন সরকারীভাবে কিছু জানান নাই, তখন ব্যক্তিবিশেষের পত্রের উপর নির্ভর করিয়া আরব্ধ কার্য্য স্থগিত রাখা সমীচীন হইবে না। নির্ভুল ভাবে ভাষ্য ও অনুবাদ সমেত বেদ প্রকাশের সুযোগ এদেশেই আছে এবং বিলম্ব হইলেও এখানে যখন কাজ আরম্ভই হইয়াছে তখন লণ্ডন কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা সঠিক ভাবে না জানিয়া উহা বন্ধ করা উচিত নহে। অবশেষে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটরী এবং ওরিয়েন্টাল কমিটির সদস্য, যিনি ওরিয়েন্টাল ফণ্ডের টাকার হিসাব চাহিয়া সোসাইটিকে তাড়া দিয়াছিলেন, সেই মিঃ বুশবীর প্রস্তাবে স্থির হইল যে, ইণ্ডিয়া হাউস হইতে সঠিক সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের কাজ চলিতে থাকিবে।

নবেম্বর মাসে সোসাইটির লাইব্রেরীয়ান এবং এসিষ্টান্ট সেক্রেটরী রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ওরিয়েন্টাল কমিটিতে লওয়া হইল এবং ঋগ্বেদের কাজ যতদূর অগ্রসর হইয়াছে ডাঃ রোয়ার কমিটির নিকট তাহা দাখিল করিলেন।

ডিসেম্বর মাসে উইলসনের পত্রে জানা গেল লণ্ডনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। উইলসনের পত্রের কতক অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"আমরা অক্সফোর্ডে ঋগ্বেদের মুদ্রণ আরম্ভ করিয়াছি, কোর্ট সমস্ত ব্যয় বহন করিতেছেন। একাডেমি অফ সেণ্টপিটার্সবার্গ যজুর্বেদ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন এবং কয়েক মাস হইল ডাঃ ওয়েবার এখানে আসিয়া পাণ্ডুলিপি মিলাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ডাঃ বেনফী নামক জনৈক ব্যক্তি সামবেদ মুদ্রণের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও সোসাইটির পক্ষে অনেক কাজ করিবার আছে, অবশ্য যদি সেখানে যোগ্য লোক থাকে। শতপথ ব্রাহ্মণ মুদ্রণে হাত দিলে অর্থ এবং পরিশ্রম উভয়েরই সদ্ব্যয় হইবে। সোসাইটি যে অর্থ সাহায্য পাইতেছেন তাহা প্রত্যাহৃত না হইলে অতঃপর ঐ টাকা যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হইতেছে ঠিক সেই কাজেই উহা ব্যয় করিতে হইবে এবং নিয়মিত উহার হিসাব দিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। প্রাণীবিজ্ঞান অবশ্যই সোসাইটির গবেষণার উপযুক্ত বিষয়, কিন্তু একমাত্র উহাতেই মন দিলে চলিবে না। পক্ষী ও সরীসৃপের প্রতি মনোযোগ দিবার সময় মানুষের কথাও মনে রাখা অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যতে ভাল সংবাদ পাইব বলিয়া আশা করি।"

এশিয়াটিক সোসাইটির বেদ প্রকাশ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ দমিলেন না। পর বৎসর ১৮৪৮ সাল তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক কাল। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের এই মহা সন্ধিক্ষণেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করেন এবং

একাদিক্রমে ১৭ বৎসর ধারাবাহিক ভাবে এক মাসের জন্যও বন্ধ না হইয়া উহা প্রকাশিত হয়। রোয়ারের কার্য্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল এশিয়াটিক সোসাইটি অনেক বিবেচনার পর তাহা প্রকাশ করিয়া দেন।

ভাষ্য ও অনুবাদ সমেত মূল বেদ প্রচারের প্রচলিত ইতিহাসে কোলব্রুক, রোজেন, বীরনুফ, রথ, ম্যাক্সমূলার এবং উইলসনের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

টুক্‌রো কাগজ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কাকার কথা আজ মনে পড়ে—সেই সঙ্গে মনে পড়ে, মানুষ কল্পনাকে অপরিসীম স্নেহ দিয়া কেমন করিয়া বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে।

সেদিন বৈঠকখানায় আলমারি ঝাড়িতে ঝাড়িতে পুরাতন একখানা কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। মূল্য তাহার কিছুই নয় কিন্তু সেই সামান্য কাগজখানাই মনটাকে বেদনায় ভরিয়া দিল—সেই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কাকার কথা। তিনি বহুকাল মারা গিয়াছেন কিন্তু এ কাগজটুকুতে যেন তার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি। মৃত্যু যে প্রাণটাকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে নাই—

কাগজটি কাকার হাতে সাধারণ কলম দিয়া আঁকা একটা বাড়ীর প্ল্যান।

তখন আমি ছোট, দশ-বারো বছর বয়স।

বৈঠকখানায় বাবা কাকারা তিন ভাই প্রায়ই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আড্ডা দিতেন। সেখানে তিনটি শাস্ত্র খুব আলোচনা হইত—একটি জ্যোতিষ, আর একটি হোমিওপ্যাথি আর একটি কৃষিবিদ্যা। মাঝে মাঝে এখানে আমি তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইতাম।

ছোট কাকা বিদেশে মাষ্টারী করিতেন। বন্ধে বাড়ী আসিতেন, তাঁহার আসিবার দিনে একটা সমারোহ পড়িয়া যাইত। ঠাকু'মা ডাবের জল, মিছরির জল করিয়া অপেক্ষা করিতেন, বাবা মাছ ধরিবার জন্য প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিতেন। আমরা সাগ্রহে মাঠের রাস্তার পানে চাহিয়া থাকিতাম এবং যে কেহকে দেখিলেই কাকা মনে করিয়া আগাইয়া যাইতাম।

আমার মনে পড়ে···সে-দিন জ্যৈষ্ঠের বর্ষণমুখর রাত্রি। বৈঠকখানায় বসিয়া আলোচনা হইতেছিল, ছোট কাকা কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, বিশ বিঘা জমির একটা বাড়ীতে খেয়ে খরচে বার্ষিক আঠারশ' টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে।

বাবা আপত্তি করিলেন, কাকা একখানা কাগজে এই ছকখানা আঁকিয়া উৎপন্ন শস্য মৎস্য প্রভৃতির দাম ধরিয়া আঠার শত করিলেন, অন্য সকলে দাম কমাইয়া আটশ' করিলেন। কাকা নিরুপায় হইয়া যতই বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে উপযুক্ত চাষ হইলে ইহা সম্ভব, অন্য সকলে ততই প্রতিবাদ করিয়া বলেন তাহা সম্ভব নয়। কাকা বার বার উত্তেজিত হইয়া বলিতেন, আমাকে দয়ে ঠকালে ত হয় না, এসব হিসেবের ব্যাপার—

বাবা কিছু জ্যোতিষ জানিতেন। কাকার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিতেন, চল্লিশ বৎসরের পরে একটা ভাল উপার্জ্জন হবে, সে সময় উন্নতি অনিবার্য্য।

কাকা হৃষ্ট মনে বলিতেন, ঐ সময়ে আর চাকুরী নয়, অমনি একটা বাড়ী করে দেখিয়ে দেব।

চিরপ্রবাসী কাকার অন্তর ঐরকম একটা নিভৃত নির্জ্জন স্বর্ণ-প্রসূ বাড়ীর পাশে যেন ঘুরিয়া বেড়াইত। তিনি কাকীমাকে বাসায় লইয়া যাইতে চান নাই এবং সেটা এ সংসারের রীতিও ছিল না। যখন বন্ধের শেষে বাড়ী হইতে যাইবার সময় হইত তখন তিনি এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, বন্ধটা বড্ড ছোট—কিছুই হ'ল না। আবার সেই থোড়বড়ি খাড়া—

বাড়ী হইতে মনটাকে ছিঁড়িয়া লইয়া আহত অবস্থায়ই যেন বিদেশে যাইতেন—কিছুকাল গৃহের শান্তনীড়ে কাটাইবার সে ব্যাকুল আগ্রহ কোন সময়ই তাঁহার সফল হইত না—উদরান্নের আকর্ষণে যাইতেই হইত—

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে তামাক খাইয়া বাবা ভিতরে যাইতেন। কাকা চাকর ফকিরকে বলিতেন, এক ছিলিম সাজো ফকির—

ফকির তামাকু সাজিয়া দিত। আমি তাঁহার কাছে তাঁহাদের স্কুল প্রভৃতির গল্প শুনিতাম। তিনি অবশেষে ফকিরকে পরিহাস করিয়া বলিতেন, ফকির বলত তোমার থাকুমার ঘর কোন্‌টা ?

ফকিরেরও শুনিতে শুনিতে বাড়ীটার সব মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিত, কেন দালানের পশ্চিমে একটু দক্ষিণ টানে। ফকিরের বয়স তখন ষোল-সতর, তাহারও কল্পনা যেন এই বাড়ীটাকে ঘিরিয়া ঘুরিত। সেও নিত্যই এই একই আলো-চনায় সাগ্রহে যোগ দিত—

—বলত, আমি থাকবো কোথায় ?

—কেন ? দোতলায় পুব-দক্ষিণ কোণটায়, পুকুরের পাড়েই।

—আর ?

—বারান্দার টবে চন্দ্রমল্লিকা, আর গোলাপ গাছ থাকবে—

কাকা খুশী হইয়া বলিতেন, বলত, আনারস হবে কোথায় ?

—কলাবাগানের পাশে।

কাকা বলিতেন, যদি বৃষ্টি না হয় তবে ধানের কি হবে ?

—কেন ? কলমে জল দেবো—ইঞ্জিনে চলবে—

আলোচনা চলিতে চলিতে যখন বেলা পড়িয়া আসিত, তখন কাকা উঠিয়া বলিতেন, বেশ, ফকির বিনা আমার ও বাড়ীটা চলবে না। যাও এখন সুরভীর জন্যে ছুটো ঘাস কেটে আনো—

ফকির বলিত, বেলা ত অনেক আছে—

কাকা পরিহাস করিতেন, এই ত, এমনি হলে ত তোমাকে আর মেম সাহেব এনে দেওয়া হবে না।

ফকির হাসিয়া আবার তামাক সাজিত।

নিত্য মধ্যাহ্নেও এই একই আলোচনা একই রকম আগ্রহের সহিত হইত।

ম্যালেরিয়া জ্বর লইয়া এবং পালকিতে চড়িয়া কাকা সেবার বাড়ী আসিলেন—

বাড়ীর ভিতরে বসিয়া একটু ডাবের জল পান করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র মলয় তখন বছর তিনেকের। সে চোখ পাকাইয়া পাকাইয়া বিদেশ-প্রবাসী পিতার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। ঠাকু'মা বলিলেন,—তোর বাবা রে, নম কর্—

মলয় একবার চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাকা যেন অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই বলিলেন, দেখে ত না, চিনবে কি করে ? নে খা—ডাবের জলের শেষটুকু তাহার হাতে দিয়া দিলেন। পিতাকে না চিনিলেও পুত্র ডাবের জল প্রত্যাখ্যান করিল না।

কাকা বলিলেন, চল, বাগান দেখে আসি।

ক্ষুদ্র একটা সব্‌জী-বাগান ছিল আমাদের। কাকা যে কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিতেন গাছগুলিকে নিড়াইয়া সার দিয়া নানারূপে সতেজ করিতে চেষ্টা করিতেন, এ কাজে যেন তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। রুগ্ন অবস্থায়ই তিনি বাগান দেখিতে গেলেন। ফকিরকে বলিলেন, কই ফকির, গাছ ত বাড়ে নি ? বেগুনগাছের গোড়া বাঁধা হয় নি যে !

তাহার পরেই আরম্ভ হইল, দুই বেলা বাগানে কাজ। বৈকালে খেলিতে না গিয়া তাঁহার সহিত কাজ করিতে হইত বলিয়া মাঝে মাঝে রাগও হইত কিন্তু তবুও প্রবাসী এই পিতৃব্যকে যেন দুঃখিত করিতে ইচ্ছা হইত না। জানিতাম,—বিদেশে গায়ের রক্ত জল করিয়া উনি যাহা পাঠান তাহাতে আমরা স্বচ্ছন্দে দিন কাটাই।

দ্বিপ্রহরে আবার তেমনি আলোচনা হইত—

কাকা বলিলেন, বল ত ফকির কবে এই বাড়ীটা হবে ?

ফকির একটু অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, আর কবে ? কত টাকা জোগাড় করেছেন যে বিশ বিঘে জমি কেনা হবে ?

—আর, এই চাকুরীতে কি টাকা হয়। সংসারই চলে না। তবুও বাড়ীটা হবেই—কেমন করে বল ত—

ফকির নীরব থাকিত। সে যেন একটু নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে—এটা যেন বৃথা গল্পেই পরিণত হইয়াছে।

কাকা হাসিয়া বলিতেন, এইটুকু ধরতে পারলে না ? চল্লিশ বছরে যে রাহুর দশায় চন্দ্রের অন্তরে টাকা পাচ্ছি—লটারী না হোক যে কোন উপায়ে হাজার দশেক পাবই। অমনি জায়গা কিনে—পুকুর আরম্ভ করে দেব। তারপরে বাড়ী—

কাকা গড়গড়া টানিতে টানিতে বিভোর হইয়া কি যেন ভাবিলেন। অকস্মাৎ বলিতেন, জায়গা কিনবো কোথায় বল ত ?—ঐ বাচুরখালির মাঠে।

ফকির আপত্তি করিত, ওখানকার জমি যে বালিমুদা— ওখানে কি ফসল হয় ?

কাকা বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিতেন, ঐ ত। কেমিকেল সার দেব। বালিমুদা হয় কেন জানো ? নাইট্রোজেনের অভাবে, —নাইট্রেট দিলেই সোনার জমি হবে—

ফকির বিশ্বাস করিত না। বলিত, তা কি আর হয় ?

—হয় মানে ? হচ্ছে, আমেরিকার মরুভূমিতে সোনার ফসল ফলছে।

আবার কিছুক্ষণ পরে বলিতেন, বিঘে ভুঁই কত ধান হবে বল ত ?

—বারো মণ, বোলো মণ—

—ধ্যেৎ, জাপানে আটচল্লিশ মণ হয়, তা না হোক, ত্রিশ মণ ত হবেই।

ফকির অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিত, এ ত শুনি নি কোনদিনও—

—শুনিস্ নি তা সত্যি, তবে দেখবি।

কাকা বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেন আর কল্পনার একটা বাড়ীতে ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেন। শুনিতে শুনিতে আমারও মনে হইত এমনি একটা বাড়ী হইতে আর বিলম্ব নাই ; সংসারটা চিরদিন ত আর এমন অসচ্ছল থাকিবে না।

সেবার তাঁহার যাইবার দিনটির কথা মনে পড়ে—

সেদিন প্রথম আষাঢ়ের মেঘ গুরু গুরু করিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া একটু হাওয়ার সঙ্গে টুপটাপ বৃষ্টি পড়িতেছে, বাহির বাড়ীতে তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্যে আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। কাকা ঠাকুমা'কে প্রণাম করিয়া ঠাকুরঘর ও মণ্ডপে প্রণাম করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন—

আমি মলয়কে কহিলাম, তোর বাবা যে যাচ্ছে—

মলয় টানা টানা চোখ মেলিয়া কহিল, না—

—হ্যাঁ, যাচ্ছে, আর আসবে না—

মলয় কাকাকে কহিল, বাবা, আসবে না—

কাকা বলিলেন, আসবো বই কি ? এই ত হাটে যাচ্ছি—কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি যেন অশ্রু গোপন করিয়াই বলিলেন, আসি মা। এবং সঙ্গে সঙ্গে রওনা হইলেন।

বাড়ীর এই নিশ্চিন্ততা ও স্নেহমমতার বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া যাইতে তাঁহার যেন বড়ই ব্যথা লাগিত। বন্ধনটাকে অনাবশ্যকরূপে সংক্ষেপ মনে করিয়া যেন হতাশ হইতেন।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ে—

এক দিন কি কারণে জানি না, কাকা উত্তেজিত ভাবে বাড়ীর ভিতরে সম্ভবতঃ কাকীমার কোন ত্রুটির জন্য বকাবকি করিতেছিলেন। উত্তেজিত বলিলে হয়ত ঠিক বলা হইবে না, বরং অত্যন্ত ব্যথিত ভাবেই বলিয়াছিলেন, দু'মাসের জন্যে ত বাড়ীতে আসি। দেহ মন চায় একটু আরাম, একটু নিশ্চিন্ততা তাতে বিরক্ত হলে বাড়ী আসা চলে না—দু'মাস না হয় একটু উৎপীড়নই করলে একটা লোক। তোমরা বাড়ীতে বসে খাও, জানো না বিদেশে কেমন করে শীতের রাত্রে আধ মাইল গিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে এক গ্লাস জল আনতে হয়, কেমন করে রোগ-শয্যায় একটু ঔষধ, একটু পথ্যের জন্যে অপরের মুখের পানে চেয়ে থাকতে হয়—অথচ পাওয়া যায় না। যদি জানতে, বুঝতে তবে এমনি বিরক্ত হতে না—যাক্, বছরে দু'মাসের জন্যে আসি, না এলেই হবে—

কাকা বৈঠকখানায় চলিয়া আসিলেন মনে মনে বাড়ীর লোকগুলির উপর আমার রাগ হইয়াছিল, যে লোকটি সারাবৎসর প্রবাসে অশেষ কষ্ট পাইয়া বাড়ীতে আসে তাহার জন্য না হয় একটু কাজ বাড়িলই, তাহাতে ক্ষতি কি ? কাকাকে তামাক সাজিয়া দিলাম, কাকা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া তামাক টানিতে টানিতে মাটির পানে চাহিয়া রহিলেন। একটা কিছু কহিয়া সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতেছিল কিন্তু সাহস হইল না। অবশেষে বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম, বাড়ীর লোকগুলো বড্ড কুঁড়ে—

কাকা হাসিয়া বলিলেন, না না, ওরাও ত দিবারাত্রি খাটছে, ছেলেপুলে নিয়ে পেরে ওঠে না। থাক্‌গে—তবে আমারও দোষ আছে, বিদেশে কষ্ট পেয়ে পেয়ে বাড়ীতে এসে এত বেশী চাই যে তা আর দেওয়া যায় না। যাক্‌গে—

একটুক্ষণ তামাক টানিয়া বলিলেন—বাড়ীখানা হয়ে গেলে ত আর ভাবনা থাকবে না, সব একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত চলবে—আর খাওয়া কি, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, বাগানের সব্‌জী। আচ্ছা বল্ ত তোর ঘর হবে কোন্‌দিকে—

পূর্ব্বে জানিতাম, আমার জন্যে একটা ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল কিন্তু কোন্‌টা তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কাকা বলিলেন, তুই আর আমাদের বি-এ পাস বৌমা থাকবে দক্ষিণের দিকে দোতলার ঘরে। বৌমা ত হবে আমার ক্যাশিয়ার, কেরাণী আর হাউজহোল্ড ম্যানেজার। তোমাদের এই গো-মূর্খ মা কাকীমাদের দিয়ে কি হবে ?

আমি লজ্জিত হইয়াছিলাম, ঐ বয়সে বি-এ পাশ পত্নীর কথা আমাকে কোনরূপই উৎসাহ দিতে পারে নাই। আমি বলিলাম, বাবা, আর মণিকাকা ?

—দাদারা ! ওদের ছেড়ে দেব বৈঠকখানা, আর জন প্রতি তিন জন মোসাহেব। এক মটর আফিং, দু-কাপ চা আর যত পারি তামুকের বন্দোবস্ত করে দেব—

আমি হাসিয়া উঠিলাম, আর যাই হোক্ ঐ বাড়ীর প্রতি যেন আমারও একটা অনির্দ্দিষ্ট মোহ দাঁড়াইয়া গেল। সত্যই সুন্দর বাড়ী, সুন্দর ব্যবস্থা, কাহারও কোন অসুবিধা নাই। কাকা বলিলেন, তোর বাবার আফিং কেন জানিস্ ? কারণ কাজের ভার দিলেই ভণ্ডুল হবে, তার বদলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী আর আফিংই ভাল।

কাকা আপন মনেই হাসিয়া উঠিলেন।

তার অনেক দিন পরের কথা মনে পড়ে।

সংসার ক্রমে ক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে কাকাকে দেখিয়াছি জামা জুতা প্রভৃতি সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকিতেন, কোথাও যাইতে হইলে কাচানো কাপড় জামা না হইলে যান নাই। এখন সে বয়স চলিয়া গিয়াছে, যে কোনরূপ একটা জামা হইলেই এখন চলে, জুতা না হইলেও ক্ষতি হয় না। জামা জুতা সম্পর্কে অভিযোগ করিলে বলিতেন, ও বাজে খরচ কি এখন করা যায় ? মলয় বড় হয়েছে, ডলি বড় হয়েছে—

মলয় ও তাঁহার কন্যা ডলি বড় হইয়াছে সত্য কিন্তু দশ বছর পার হয় নাই।

পূর্ব্বতন বাড়ীর গল্প তখনও হইত, বাবা ও মণিকাকাও যোগদান করিতেন। তবে তখন আর সে আগ্রহ ও পরিহাস ছিল না।

সে-দিন বৈঠকখানায় বসিয়া কি যেন কথা হইতেছিল। বাবার জ্যোতিষ লইয়া একটু পরিহাসও হইয়াছে, কাকার চল্লিশ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু জ্যোতিষ মতে প্রাপ্য অর্থ পান নাই। বাবা বলিলেন, হয়ে, জ্যোতিষ মিথ্যা নয় তবে বিলম্ব হতে পারে, তবে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে অনিবার্য্য সে টাকা পাওয়া যাবে।

কাকা তামাক খাইতেছিলেন, আমি বলিলাম, তোমার ত চুল পেকে গেছে কাকা ?

—কই দেখি, তোল্ ত।

—তুলবো কি ? অনেক পেকে গেছে—

কাকা সন্দেহের সহিত বলিলেন, আয়না আন্ ত !

আয়না আনিয়া দিলাম। কাকা দেখিয়া যেন আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সব পেকে গেছে। এ কি রে ! তবে ত আর হ'ল না—

—কি ?

—বাড়ী কবে আর তা হ'লে হবে! তৈরি করবার আগেই শেষে মারা যাবো যে!

কাকা হাসিতে চেষ্টা করিলেন, সে কান্নার হাসি আজও যেন চোখের সাম্‌নে ভাসে। সজল চোখে মাঠের পানে চাহিয়া বলিলেন, যদি আর পনর বছর বাঁচি, তবে বাড়ী তৈরী করবো কবে? পাঁচ বছরের কমে ত বাড়ীই তৈরী হবে না।

—পনর বছর বাঁচবে নাকি মোটে? এখনও কোল ছেড়ে চল্লিশ বছর—

—চল্লিশ! না। বাঁচলেও ত যে চাষ-আবাদ করবার শক্তি থাক্‌বে না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, তবে আর হ'ল না!

কাকার শুষ্ক পাংশু মুখের পানে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে ক্ষরিত হইয়া গিয়াছে—একটা তীব্র ব্যর্থতার বেদনা যেন তাহাকে নিমেষে অসহায় করিয়া দিয়াছে। জীবনে আর কিছুই হইল না,—সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃথা হইয়া গিয়াছে। জীবনে আর কিছুই যেন অবশিষ্ট নাই। তিনি বলিলেন, টাকা আর কোথায় পাবো?

আমি সান্ত্বনা দিলাম, আমি চাকুরী করে দেব।

—তোর চাকুরী! তত দিন কি বাঁচবো রে? অত আয়ু আমাদের বংশে কারও নেই—

—নেই তবে কি? বাবা বললে তুমি ৭০ বছর বাঁচবেই—

—হ্যাঁ। টাকাও পেলাম, ৭০ বছরও বাঁচলাম—

আর কথা না বলিয়া কাকা যেন অকস্মাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। যে কয়দিন বাড়ীতে ছিলেন কি যেন একা একা বসিয়া ভাবিতেন। কাহারও সহিত তেমন করিয়া আর আলাপ করিলেন না।

বাড়ী হইতে যাইবার দিনেও সে ব্যাকুলতা আর লক্ষ্য করিলাম না—কি যেন একটা সংকল্প করিয়াই তিনি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া কাকা দিবারাত্রি ঘুরিতে লাগিলেন —বাদুরখালির মাঠের জমির জন্য। মনিব এক নয়, দিতে রাজি হইলেও দামে পোষায় না, নানারূপ তদ্বির তদারক করিয়া তিনি জমি কিনিতে আরম্ভ করিলেন।

সে-দিন আসিয়া বাবাকে প্রসন্নমুখে বলিলেন, পনর বিঘের বায়না হ'ল, আর পাঁচ বিঘে শিগ্‌গিরই হবে, রাজি হয়েছে—

—কত করে ঠিক হ'ল?

—চল্লিশ টাকা বিঘা, খাজনা আট আনা!

বাবা বলিলেন, বলিস্‌ কি, ও জমি যে বিশ-পঁচিশ টাকারও ত কেউ নেয় না। টাকাগুলো এমনি করে নষ্ট করলি!

কাকা হাসিলেন, নষ্ট? বল কি? ওরা কি জমির মর্ম জানে? এখন সস্তার জন্যে বসে থাকলে আর কবে আবাদ করবো—আস্তে আস্তে কিনি।

বাবা বলিলেন, আচ্ছা যা, খাওয়াদাওয়া কর গিয়ে।

মণিকাকাকে বাবা বলিলেন, ও টাকা পেয়েছে কি করে? একেবারে উড়িয়ে দিলে,—ভাবতুম বাড়ীটা শুধু গড়া, শেষে এমন-ভাবে টাকা নষ্ট করতে আরম্ভ করলে—

মণিকাকা বলিলেন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা ছাড়া ত আর কিছু হ'তে পারে না। তবে করতে পারলে জমিতে লোকসান নেই—

বাবা বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, ওই পাগলামির প্রশ্রয় তুমি আর দিও না।

বহু রকম বাগ্‌বিতণ্ডা হইল, বায়না ফেরত আনিবার চেষ্টা হইল কিন্তু কাকা কিছুতেই রাজি হইলেন না।

বাবা বলেন, মেয়ে বড় হয়েছে, টাকাগুলো এমনি করে অপব্যয় করলে, মেয়ে পার হবে কেমন ক'রে!

কাকা হাসিয়া বলিলেন, ও ত একটা কপাল নিয়ে জন্মেছে, যা লেখা আছে হবে—

অবশেষে এই জমি ক্রয় লইয়া একটু বচসাও হইল কিন্তু কাকা কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি কেবল একটিমাত্র যুক্তি দেখাইতেন, এখন না করলে আর কবে করবো? বয়স বাড়ছে ছাড়া ত কমছে না।

বাবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—কর্‌ তোর যা ইচ্ছে—

বন্ধের শেষে কাকা যখন বাড়ী হইতে গেলেন তখন এক আমি আর মণিকাকা ছাড়া বোধ হয় সকলেই পাগলামির অজুহাতে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি একদিন প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। চিরপ্রবাসী কাকার এই বাড়ীর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণটা আমাকে মনে মনে ব্যথিত করিত। বাবা বলিয়াছিলেন—চুপ কর্‌ ছেলেমানুষের এর মধ্যে কথা বলতে নেই।

ফাল্গুনের প্রথমে হঠাৎ খবর আসিল, কাকা বাড়ী আসিতেছেন একখানা গাড়ী ও দুইটি লোক যেন পাঠান হয়। গাড়ীতে নানাবিধ মালপত্র, বই বাক্স বিছানা প্রভৃতি আসিল। আমি কাকাকে প্রশ্ন করিলাম,—এসব নিয়ে এলে যে!

—চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এলাম।

—কেন?

কাকা হাসিয়া বলিলেন,—এইবার এই জমি সব আবাদ করতে হবে। দেখবি সোনা ফলবে। চাকুরী ক'রে কি আর পেট ভরে? ফকিরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এইবার ফকির বোঝা যাবে তোমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। এখন পুকুর কাটাবার লোক জোগাড় কর।

ফকির সোৎসাহে কহিল, কেন? ওই মজুমদাররা পুকুর কাটাচ্ছে, তাদের খবর দিলেই হবে—

—দেখো ভগবান আগের থেকেই সব জোগাড় করে রাখেন। তারপর কাকা একদিন ফকিরকে লইয়া জমি প্রভৃতি মাপিয়া

পুকুরের স্থান ও আয়তন নির্দ্দেশ করিয়া আসিলেন। তাঁহার হুকটাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া পনর বিঘার মত করা হইল।

শুভদিন দেখিয়া পুকুর কাটা আরম্ভ হইল

কিন্তু কাকার সামান্য পুঁজির বেশীর ভাগই জমি কিনিতে ব্যয়িত হইয়াছিল, যাহা সামান্য বাকী ছিল তাহা পুকুরের জন্য দেখিতে দেখিতে খরচ হইয়া গেল। পুকুর প্রায় দশহাত নামিল কিন্তু তখনও জলের সন্ধান মিলিল না।

কাকা দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তামাক টানিতেছিলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, পুকুর আর কত দূর হ'ল কাকা?

তুই যত দূর দেখেছিস্ তার থেকে আরও কিছু নেমেছে, তবে জল ত উঠছে না।

—ভাঙামাঠ, একটু বেশী ত কাটতে লাগবেই।

—হুঁ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আপনমনেই বলিলেন, কিন্তু টাকা ফুরিয়ে এল যে, এখন টাকা কোথায় পাওয়া যায়, আবার কি বিদেশে যাবো টাকা আনতে?

—কেন? হবে না—

—না, পুকুর শেষই বোধ হয় হবে না। আর দু'হাত নাম্‌লে হয়ত—টাকা অবশ্য পাওয়া যায়। মলয়ের মার গহনাগুলো বাঁধা রাখলে হয়, ধর দু'বছরেই ত খালাস করে নিয়ে আসা যাবে না!

আমি কথাটাকে অনুমোদন করিতে পারিলাম না। বলিলাম, মণিকাকা কিছু দেয় না?

—না, পাগলামির প্রশ্রয় কি দেওয়া সম্ভব ওদের পক্ষে?—কাকা একটু ম্লান হাসিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, না, জীবনে যখন কিছু দিতেই পারলাম না তখন ওর বাপের দেওয়া জিনিষ থেকে আর বঞ্চিত করি কেন?

চৈত্রের প্রথমে হঠাৎ একদিনের ঝড়বৃষ্টিতে পুকুরে কিছু জল দাঁড়াইয়া গেল। মজুরেরা বলিল, জল সেচ করিতে অন্ততঃ একশ টাকা লাগিবে—

কাকা চিন্তা করিয়া বলিলেন, থাক তবে, সামনের বছর কাটা শেষ করব।

মজুররা পাওনা মিটাইয়া নিয়া চলিয়া গেল—

মজুররা তাহাকে মাপ করিয়া গেল কিন্তু দেহ মার্জ্জনা করিল না—

বাল্যকাল হইতে শারীরিক কষ্ট বিশেষ করেন নাই। শরীরও কোনদিন সুদৃঢ় ছিল না, তাহা লইয়াই চৈত্রের রৌদ্রের সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া পুকুরকাটা তদারক করিতেন। তাহার পরে টাকা ফুরাইয়া যাওয়ার পর হইতে মনটাও যেন ভাঙিয়া পড়িল—

ম্যালেরিয়া জ্বরের পরে আমাশয় দেখা দিল। ভুগিতে ভুগিতে কঙ্কালসার হইয়া গেলেন—ঔষধপথ্য ভাল জুটিল না। রোগ পুরাতন হইলে লোকে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যাদি দিতে বিরক্ত হয়—তাহারও অন্যথা হইল! আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি আবার শয্যা গ্রহণ করিলেন।

আষাঢ়ের বর্ষণমুখর রাত্রি। সে রাত্রিটা আজও ছবির মত চোখের সামনে ভাসে—

বাবা মণিকাকা ও আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিলাম। জ্বর প্রায় ১০৪° ডিগ্রি হইয়াছিল। তিনি নানারূপ প্রলাপ বকিয়া যাইতেছিলেন—

কাকা বাবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, যদি অসুখটা না সারে একটা কাজ ক'র। মলয় যদি অন্ততঃ চার-শ টাকার চাকুরী না পায় তবে যেন বিদেশে না যায়, নইলে যেন ঐ বাদুর-খালির মাঠের বাড়িটা শেষ করে। বিদেশে বড় কষ্ট—আর ঐ বাড়িতে আয় ত কম হবে না। ঐ বইগুলো আছে, বড় হ'লে মলয়কে পড়তে দিও—

বাবা বলিলেন—ম্যালেরিয়া জ্বর, এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? জ্বর ছেড়ে যাবে কালই—

জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল সকালে। দ্বিপ্রহরে আমি বসিয়া কাকার পা টিপিয়া দিতেছিলাম, কাকা বলিলেন—আর হ'ল না রে, তাই না?

—কি?

—বাড়িটা আর হ'ল না, সত্যিই আর হ'ল না।

রোগক্লান্ত মুখখানির মাঝে কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার ব্যর্থতাটা বুঝিবার বয়স হইয়াছিল। আমি বলিলাম, আমি আর মলয় দু'জনে বাড়ী করব, আরও পনের বিঘে জমি নেব—আমার ত চাকুরী করতে ইচ্ছে করে না।

কাকা অত্যন্ত নিরুৎসাহের সহিত বলিলেন, তাই করিস বাবা। যদি পরপার থাকে তবে সেখান থেকে দেখে সুখী হব। বুকের রক্ত দিয়ে অর্জ্জন করা টাকা তা ত ওই অনুর্ব্বর মাঠেই ঢেলে রেখে এসেছি—

—পুকুরের পশ্চিমে বাড়িটা করিস—

কাকা ক্লান্তি বশতঃ থামিলেন। আজও বুঝি মনে মনে তিনি তখনও কোনরূপ সান্ত্বনা পান নাই। তাহার কিছুদিন পরে কাকা মারা যান।

আর একটি দিনের কথা মনে পড়ে—

ডলি বড় হইয়াছিল। মলয় কলেজে পড়িতেছিল—এবং ভগ্নীর বিবাহের জন্য চেষ্টাও করিতেছিল। একটা ভাল সম্বন্ধ ছিল কিন্তু অর্থাভাবে কথাবার্ত্তা প্রায় বন্ধই রহিয়াছে—

রান্নাঘরে আমরা খাইতে বসিয়াছিলাম। কাকীমা দুধের বাটিতে কলা ছুলিয়া দিতেছিলেন।

মলয় কহিল—মা, মুখুজ্জেদের সম্বন্ধটাই ভাল। ছেলেও লেখাপড়া জানা, বাড়িতেও জমিজমা আছে—

কাকীমা কহিলেন—কি চায় তারা?

—নগদ হাজার, আর সোনা পনর ভরি—

—এত টাকা কোথায় পাবি ?

মলয় কহিল—বাহুরখালির মাঠের জমির খাজনা টেনেই ত যাচ্ছি। ওটা বেচে দিলে হয়ত শ' পাঁচেক টাকা পাওয়া যায়। তা হলে নগদটার ত কিছু হয়—

কাকীমা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, ধীরে দুধের বাটি কয়েকটি প্রত্যেকের সামনে রাখিয়া দিলেন কিন্তু কোন জবাব দিলেন না।

মলয় পুনরুক্তি করিল, কি বল মা ওটার খদ্দের দেখবো—

কাকীমা হঠাৎ যেন একটা আঘাত পাইয়াছেন এমনি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন—না বাবা, ও থাক বরং আমার গহনা যা আছে বিক্রী করে ফেল।

তিনি আর কহিতে পারিলেন না। চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া গেলেন। হয়ত কাকার সঙ্গে সঙ্গে কাকীমাও স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাই অনুর্ব্বর ঐ মাঠটি এত আপনার হইয়া রহিয়াছে।

এক টুকরা কাগজ ও উষর বন্ধ্যা ওই মাঠ আর তাহার মাঝে অর্দ্ধখনিত পুষ্করিণীর মাঝে কাকার আকাঙ্ক্ষা ও সারাজীবনের ব্যাকুল সাধনার ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। আজ সে মাঠে কাশের ফুল ফুটিয়া বাতাসে মাথা নত করে কিন্তু আমার চোখের তারা যেন রাঙা হইয়া উঠে—ওরা কাকার হৃদয়শোণিতে রক্তাক্ত হইয়া রহিয়াছে।

কাকা আজ নাই কিন্তু তাঁহার ব্যর্থতার অক্ষয়কীর্ত্তি ঐ অনুর্ব্বর মাঠে হাহা করিতেছে। সেদিকে চাহিলে মনে পড়ে রোগশয্যায় তাঁহার সেই অশ্রুসজল চোখ দুটি আর আর্ত্তকণ্ঠস্বর—আর হ'ল না রে।

অথচ মলয়ের কাছে ও একেবারেই অর্থহীন।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৯ সালের প্রথম অর্দ্ধে অক্ষশক্তির দিগ্বিজয়ের প্রবাহে ভাটা পড়ে। সেই বৎসরের শরৎকালে সোভিয়েট রুশ গণসেনার অটল শৌর্য্যের সম্মুখে ইউরোপীয় অক্ষশক্তি প্রথম প্রতিহত হয় এবং তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই জাপানের অষ্ট্রেলিয়ামুখী গতি রুদ্ধ হয়। আফ্রিকায় রোমেলের দুর্দ্ধর্ষ "আফ্রিকা কোর" তাহার অল্প পরেই মিশর জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে আরম্ভ করে। ১৩৫০ সালের প্রথমে অক্ষশক্তির অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায় তাহাতে অনেক পশ্চিম দেশীয় যুদ্ধবিশারদ মনে করেন যে এক বৎসরের মধ্যেই অক্ষশক্তির ইউরোপীয় অংশের সম্পূর্ণ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবে এবং তাহার বৎসরকাল পরেই এসিয়াতেও অক্ষশক্তির ক্ষমতার অবসান ঘটিবে। কয়েক মাস পূর্ব্বেও মিত্রপক্ষের কয়েকজন উচ্চ অধিকারী (উচ্চতম নহে) জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ ইউরোপের যুদ্ধাবসান দেখিবে এবং তাহার পর জাপানের উপর মিত্রপক্ষের সম্মিলিত শক্তি প্রবল ভাবে প্রযুক্ত হইয়া তাহার ধ্বংসসাধন করিবে।

১৩৫০ সালে জার্ম্মানীর পূর্ব্ব রণাঙ্গনের সেনাদল সমষ্টিগুলি সোভিয়েট গণসেনার আক্রমণের আঘাতে ক্রমাগত পশ্চাৎপদ হইয়া আত্মরক্ষায় বাধ্য হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে ওরেল নগরী পুনরধিকার করার পর সোভিয়েট সেনা ক্রমে ক্রমে শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের প্রায় সমস্ত অংশই উদ্ধার করে। প্রথম চারি মাসে যে ভাবে রুশ সেনা অগ্রসর হয় তাহাতে মিত্রপক্ষের সকল বিজ্ঞ-ব্যক্তিরই ধারণা হয় যে, জার্ম্মান রক্ষীদল শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং রুশসেনা মহাপ্লাবনের জলস্রোতের ন্যায় জার্ম্মানীতে প্রবেশ করিবে। রুশকর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু ক্রমাগতই বলিতে থাকে যে, শত্রু এখনও বিলক্ষণ শক্তি ধারণ করে এবং অন্ততঃপক্ষে তাহার ৩০।৪০ ডিভিসন সেনা রুশ রণক্ষেত্র হইতে না সরিয়া গেলে অক্ষশক্তির রক্ষণ-ব্যূহ বিনাশ করা দুরূহ ব্যাপার হইবে। এই ৩০।৪০ ডিভিসন সৈন্য সরাইতে শত্রুকে বাধ্য করার একমাত্র উপায় বিরাট্ অনুপাতে পশ্চিম-ইউরোপে দ্বিতীয় রণপ্রাঙ্গ যোজনা করা, এবং সেইরূপ করার জন্য সোভিয়েট উত্তরোত্তর অধীর ভাবে অনুযোগ করিতে থাকে।

পশ্চিমের মিত্রদল ইতিমধ্যে আফ্রিকায় বহু সৈন্যবাহিনী এবং বিশাল অনুপাতে যুদ্ধাস্ত্র লইয়া যায় এবং আকাশে ও স্থলে নিজের শক্তিকে বিশেষ গরিষ্ঠ ভাবে অধিষ্ঠিত করে যাহার ফলে রোমেলের অধীনস্থ অক্ষশক্তি সেনা আফ্রিকা ত্যাগে বাধ্য হয় এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের একটি ছোট পর্ব্ব শেষ হয়। কিন্তু রোমেলের অপসরণ সম্পর্কে ইহা লক্ষিত হয় যে সুদক্ষ সেনাচালনের ফলে তাহার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয় নাই এবং তাহারা দলবদ্ধ ভাবেই পলায়নে সমর্থ হয়, কেবলমাত্র একটি বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আফ্রিকার পালা শেষ করিয়া মিত্রপক্ষ ভূমধ্যসাগর ডিঙাইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে বৃহৎ দ্বীপ লঙ্ঘন করিয়া ইটালী

আক্রমণ করে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের কথায় ইহা "ইউরোপের উদরের কোমল অংশ" বিদারণের চেষ্টা হয় অর্থাৎ ইউরোপ দুর্গমালার ধ্বংসসাধনের চেষ্টা সহজ পথে করার ব্যবস্থা হয়। ব্যবস্থা প্রথম দিকে খুবই সফল হয় কেননা ইহার প্রথম অবস্থাতেই মুসোলিনী স্থানচ্যুত ও কারারুদ্ধ হয় এবং ইটালী-নরেশ ও মন্ত্রী বাদোলীয়ো দেশকে অস্ত্রত্যাগের আদেশ দিয়া বিনাসর্ত্তে মিত্রপক্ষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষশক্তির এই বড় অংশীদার মহাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। ইটালী সরিয়া যাওয়ায় জার্ম্মান দল বিষম বিপন্ন হইয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করে এবং মিত্রপক্ষও সমুদ্র ও আকাশ পথে ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া শত্রুর পশ্চাতে গিয়া তাহার সেনা-বাহিনীগুলিকে বেড়াজালে ফেলিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করে।

আকাশপথে জার্ম্মানীর উপর আক্রমণ প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। প্রায় কুড়ি মাসব্যাপী অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণের ফলে পশ্চিম ও উত্তর জার্ম্মানীর প্রায় সকল নগরীই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যাহার ফলে এক দল মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধবিশারদ বলিতে থাকেন যে অদূর ভবিষ্যতেই জার্ম্মানীর যুদ্ধ-প্রচেষ্টা শেষ হইয়া যাইবে এবং স্থলপথে আর বিশেষ কিছু করা প্রয়োজন হইবে না। ১৩৫০ সালের শীতের গোড়ায় যে অবস্থা মিত্রপক্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহাতে জার্ম্মানীর পতনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধ-বিশারদেরা মত প্রকাশ করিলেন।

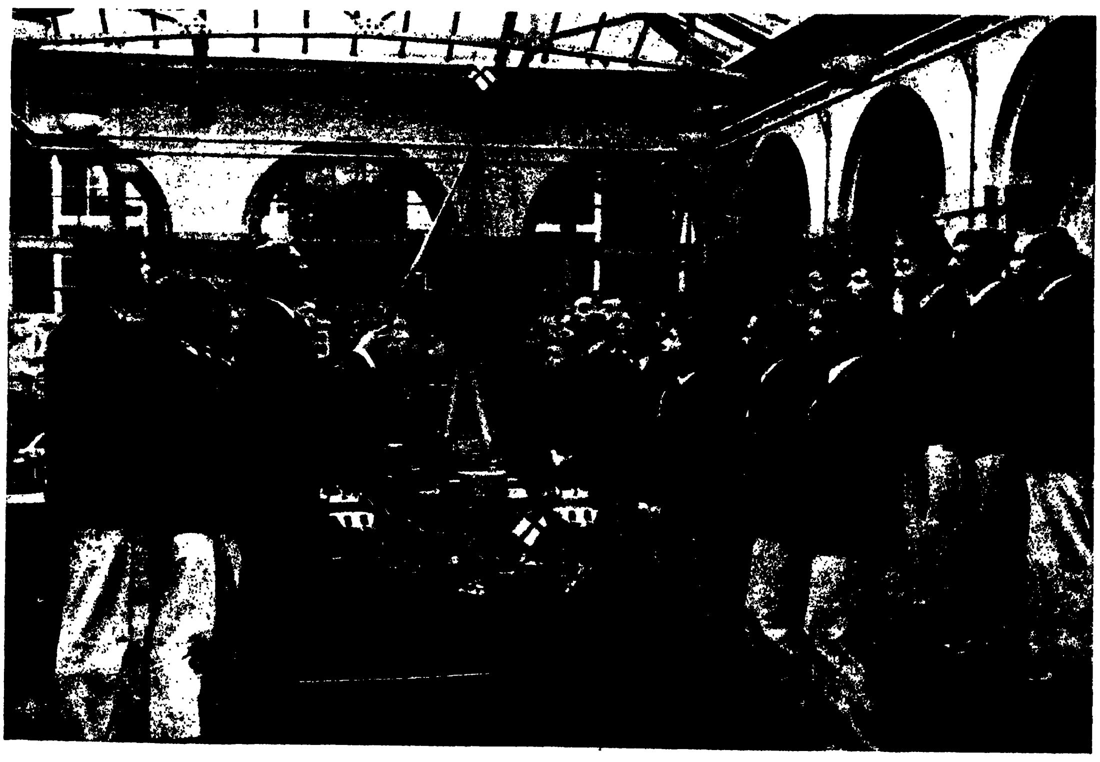
কিন্তু তাহার পর দেখা গেল রুশপ্রান্তের জার্ম্মান রক্ষী-দলের সৈন্যনাশ, বলক্ষয় বা পশ্চাদপসরণের গতি কোনটারই সেইরূপ বৃদ্ধি ঘটিতেছে না। ইটালীতে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি ক্রমে মন্থর হইতে মৃদু হইয়া ১৩৫০ সালের শেষে প্রায় স্থাণু হইয়া গেল। রুশপ্রান্তের উত্তর ও মধ্যম অংশের যুদ্ধও কমিয়া গেল, একমাত্র দক্ষিণ দিকে প্রবল যুদ্ধ চলিল কিন্তু সে যুদ্ধেও শেষ নিষ্পত্তির কোনও চিহ্ন নাই। বরঞ্চ সেখানে রুশ সেনানায়কদিগের পক্ষে রণচালনার অন্তরায় বাড়িয়াই গেল, কেননা দিগন্ত প্রসারিত পথঘাট—রেলশূন্য ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়া সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র, রসদ আনয়নের পথ দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতরই হইতে থাকিল এবং শত্রুপক্ষ ক্রমেই দৃঢ়তর আশ্রয়-স্থলের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ফলেও জার্ম্মানীর ভিতরে জনবিক্ষোভ বা অন্তর্বিদ্রোহের কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইল না। এক কথায় বুঝা গেল যে, পশ্চিমে দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত সম্যক্‌ভাবে যোজনা ভিন্ন ইউরোপের যুদ্ধের আশু নিষ্পত্তির আর কোনও উপায় নাই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের বক্তৃতায় এ সকল কথাই প্রকাশ পাইল। ১৩৫০ সালের শেষের দিকে মিত্রপক্ষের লোকে বুঝিল যে, জার্ম্মানী এখনও শক্তিশালী এবং তাহাকে দমন করার জন্য সম্মিলিত জাতিদলের চরম শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন অন্য উপায় নাই এবং সে শক্তি প্রয়োগও যথাযথভাবে হওয়া প্রয়োজন, কেননা জার্ম্মানীর রণনায়কগণ বিশেষ রণ-কুশলী। দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত যোজনের আয়োজনে ১৩৫০ সাল কাটিয়া গিয়াছে, এখন সময় নিশ্চয়ই অতি নিকটে। মহাযুদ্ধের এই পর্ব্বের উপর পৃথিবীর ভাগ্যফল নির্ভর করিতেছে সন্দেহ নাই।

অন্য দিকে এক জার্ম্মানীর উপর সম্মিলিত জাতিবৃন্দের সমস্ত শক্তি ও আয়াস-প্রয়াস নিযুক্ত হওয়ায় জাপান প্রায় দুই বৎসরের অবসর পাইয়া গিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-যাত্রা চলিয়াছে তাহা কোন অংশেই সম্যক্ অভিযান বলিয়া ধরা যায় না। কিসের জন্য এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিচার বৃথা, কেবলমাত্র বলা চলে যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের মত, "এসিয়া এখন অপেক্ষা করুক," এখনও সবল আছে। জাপানের মত বেপরোয়া জুয়াড়ী বৃহৎ শক্তিবৃন্দের মধ্যে অন্য কেহ নাই। অন্য দিকে সে নির্ম্মম দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রবণ এই কারণে তাহাকে অবহেলা করা যে বিশেষ বিপজ্জনক একথা অনেক বিশেষজ্ঞ বারংবার বলিয়াছেন। জাপান সম্পদহীন অবস্থা হইতে এখন অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছে একথাও সর্ব্বজনবিদিত এবং সে সম্পদ নিজের আয়ত্তে রাখিবার জন্য সে যে শেষ পর্য্যন্ত অতি বিষম যুদ্ধদান করিবে ইহাও নিশ্চিত।

বর্ত্তমানে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের কয়েক অংশে যে যুদ্ধ চলিয়াছে তাহাতে দেশজয় অভিযানের সুস্পষ্ট কোনও চিহ্ন এখনও প্রকাশ পায় নাই। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কোনও বিশেষ বিচার চলে না, কেননা অবস্থা এখন জটিল এবং সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেও কোন মীমাংসা করিতে যাওয়া বৃথা। বর্ম্মা অভিযানের মধ্যে এরূপ ঘটনা কেন ঘটিল সে-কথা অধিকারীবৃন্দই বলিতে পারেন। ১৩৫০ সালের বর্ম্মা অভিযান শেষ হইতে বিশেষ দেরী নাই কেননা বর্ষাকাল নিকট। এই বর্ষাকালের পূর্ব্বে যদি জাপান মণিপুর ও নাগা পর্ব্বতমালা অধিকার করিয়া বসে, তবে তাহাদের হটাইতে পরে অনেক প্রয়াস ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং অতি শীঘ্রই প্রতিকারের প্রয়োজন, নহিলে সমস্ত বর্ম্মা অভিযানের পরিকল্পনা বিপন্ন হইতে পারে। জাপানের মণিপুর ও ইম্ফল অঞ্চলে অগ্রগতিতে বর্ত্তমানে আসাম বর্ম্মা সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই এবং যে ভাবে আক্রান্ত অঞ্চলে জাপানী-গণের কার্য্যকলাপ চলিতেছে তাহাতে জটিলতর যুদ্ধাবস্থার উৎপত্তি যে তাহাদের উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।



ডারমাউথের রাজকীয় নৌ-যুদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে প্রাতঃকালীন উপাসনা এবং 'প্যারেড'



নৌ-যুদ্ধ শিক্ষার্থীদিগকে জাহাজের পালের দড়ি-দড়া ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সকল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে



রোমের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, ইটালীর পশ্চিম উপকূলস্থ আনজিও এবং নেত্‌তুনোর মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র-তট হইতে একটি আমেরিকান ট্যাঙ্কের পর্ব্বতারোহণ



লেডো-রোডের নবনির্ম্মিত একটি অংশের উপর দিয়া মিত্রপক্ষের স্কাউট-কার এবং মাল-বোঝাই গাড়ী চলাচল করিতেছে



আন্‌জিও-নেত্‌তুনো অঞ্চলে শত্রু বিতাড়নের উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষীয় আমেরিকান সৈন্যদের জাহাজে আরোহণ



একটি জার্ম্মাণ বিমান-ঘাঁটির উপর দিয়া মার্কিন বিমানসমূহ মানষ্টারে বোমাবর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে



সুলতান সঈফ্-উদ্-দীন কর্ত্তৃক চীন-সম্রাটকে প্রেরিত জিরাফের ছবি
চীনা চিত্রকর শ্বেন্-তু কর্ত্তৃক অঙ্কিত। (পৃ. ৫৪-৭ দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

বাজে লেখা—শ্রীগোপাল হালদার। পুঁথিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

নামে যা-ই হোক 'বাজে লেখা'র লেখাগুলি বাজে নয়। সূচীপত্র, বাজে লেখা, মুদ্রাদোষ, কোদালি ও কলম, সাহিত্যে স্বরাজ, কয়েদীর আকাশ, কবিতার রাত, স্বপ্ন ও সত্য—বইখানি এই আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূলতঃ একটি ঐক্য রচনাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অধিকাংশ প্রবন্ধই বন্দী-নিবাসে লেখা। শেষের তিনটি একটু ভিন্ন ধরণের হইলেও আর সব রচনাই কোন-না-কোন দিক দিয়া সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা। সাহিত্যের আলোচনা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। একটি নূতন সত্যের সাক্ষাৎ মিলিলে—তা সে বিজ্ঞানের হোক, দর্শনের হোক, মনস্তত্ত্বের হোক, সমাজতত্ত্বের হোক—সেই সত্যকে সাহিত্য-বিচারে প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যগ্র চেষ্টা চলে। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ একদা সাহিত্যালোচনার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। মার্কসীয় সোশিয়লিজমের অন্তর্নিহিত সত্যটির নিরিখে সাহিত্য-বস্তুকে যাচাই করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান যুগে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 'সূচীপত্র' অর্থাৎ সূচনা পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ হইলেও পরে লেখা। 'সাহিত্য কি'—এ প্রশ্ন লেখকের মনে বার বার উঠিয়াছে; সে প্রশ্নের যে সমাধান তিনি পাইয়াছেন এ-প্রবন্ধে লেখক তাহাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। "এ যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা এ যুগের মত করেই ভাবতে বসেছে সাহিত্য কি, কি-ই বা সাহিত্য নয়। ...সাহিত্য জীবন-জিজ্ঞাসারই একটি রূপ।...জীবনের গোড়ার কথা জীবিকা। মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে প্রসাদ আদায় করে নেয়, নূতন করে আপনার প্রাণ ধারণের উপায় আবিষ্কার করে—এটাই হ'ল জীবিকা। জীবিকার বাস্তব এলাকা আয়ত্ত করাতেই মানুষের মনের এলাকা বিস্তৃত হয়েছে।...জীবিকা, জীবন ও সংস্কৃতির (সাহিত্যের) এই হ'ল সংবন্ধ, ইকনমিক্স আর আর্টের এমনি নিবিড় বন্ধন।" 'বাজে লেখা' প্রবন্ধটিতে ভাব ও ভাষার বিচার করা হইয়াছে। 'মুদ্রাদোষে'র মুখবন্ধ এইরূপ: "কাগজ জিনিসটাই মুদ্রাযুগের জিনিস, আর মুদ্রাদোষ ওর সমস্ত দেহে—দেহে মনে চেতনায়। মুদ্রাযন্ত্র আসলে মুদ্রার হাতের যন্ত্র, ধনিকতন্ত্রের উপকরণ।" আর একটি প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন, "কিন্তু কোদালিই কি সব?...কলমের কাজও আছে। এই জমি তৈরীর দায়েই আবার দরকার মনের জমিও সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করা।" লেখকের মতে "মনের সৃষ্টিশক্তিকে ভাষায় প্রকাশ করা এই হ'ল 'সাহিত্যে স্বরাজে'র মূল কথা।...জীবিকার দাবিকে বুঝে জীবনযাত্রা গড়া তা-ই হ'ল স্বাধীনতা।" লেখকের একটি বিশেষ প্রকাশ-ভঙ্গিমা আছে। লেখক বহু দিক দিয়া সাহিত্যকে পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে সাহিত্যের উপকরণের উপর তিনি বেশী জোর দিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত অনেকে হয়ত একমত হইবেন না, কিন্তু বইখানি ভাবুক পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক জোগাইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই

রূপকথার একটি গল্পে আছে কোনও এক ব্যক্তিকে ভগবান এবার দেখা দিয়ে বলেছিলেন, তুমি কি বর চাও বল, আমি তাই তোমাকে দান করব।

লোকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বহুক্ষণ ধরে ভগবানের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে পারল না। অর্থাৎ হৃদয়ে সমুদ্র মন্থন করেও সে ঠিক বুঝতে পারল না সমস্ত মন দিয়ে সে কি চায়, কোন বস্তু পেলে জীবনে সে সত্যিকারের আনন্দ ও সুখ পেতে পারে।

দিকে দিকে যে দিকে তাকাই দেখি সকলেরই এই অবস্থা। ভগবানের কাছে কি যে চাই, কি যে আমার সমগ্র জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা নিজেরাই জানি না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা হাতড়ে মরি এমন একটা কিছুর জন্য যা অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সত্যিকারের সুখের জন্য এই মিথ্যে খোঁজার তৃষ্ণার শেষে ব্যর্থতার বেদনা মনকে অভিভূত করে' ফেলে। কখনও আমরা ভাবি সারা জীবন ধরে পেট ভরে খেয়ে পরে কোন রকমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারাই বুঝি জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, কখনও ভাবি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে না পারলে জীবন বুঝি বৃথাই গেল। কখনও ভাবি খ্যাতি ও সম্মান যদি না পেলাম তবে অর্থের প্রাচুর্য্যে আমার কিসের প্রয়োজন, আবার কখনও ভাবি "ধন নয় মান নয়, এতটুকু আশা—শুধু ভালবাসা!"

এমন করে অর্থে ও সামর্থ্যে, খাদ্যে ও খ্যাতিতে, সমৃদ্ধিতে ও সম্মানে আমরা ক্রমাগত সারা জীবন ধরে কি যে খুঁজি, তাকে খুঁজেই বেড়াই।

এই সকল চাওয়ার মূলে রয়েছে একটি চাওয়া যা আমরা জেনেও জানি না—পেয়েও নষ্ট করি। মানুষ চায় বাঁচতে আর তার জন্যেই চাই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রোগহীন নির্মল দেহ। জীবন-জোড়া সুখের চাবিকাঠি রয়েছে মানুষের সুস্থ সবল সুগঠিত দেহে। দেহকে সতেজ সক্রিয় করে' রাখতে পারলে মনও থাকে সদা প্রফুল্ল। সহরের রুদ্ধ প্রাচীরের কারাগারে চিমনীর ধোঁয়ায় কলুষিত আকাশের নীচে আমাদের স্বাস্থ্য আমরা পলে পলে ক্ষীণ, জীর্ণ, দুর্ব্বল করে এনেছি এবং তার জন্য জীবন-জোড়া অনুশোচনায় কাটাতে হয়। আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ঠিক কোন জিনিষের প্রয়োজন, কি আমাদের চাওয়া উচিত এ বিষয়ে যদি প্রথম থেকেই একটু সচেতন হই তাহলে **"বাই-ভিটা-বি"** আমাদের নষ্ট স্বাস্থ্যের অনুশোচনা থেকে মুক্তি দিতে পারে; আমরা বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে পারি।

শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া যে আমাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য অনেক সময় আমরা তা ভুলে থাকি। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলার দরুণ অনেক সময় আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ি এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা রকমের দুরারোগ্য কঠিন রোগ—সামান্য শারীরিক অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতির লক্ষণ থেকে যখন বড় আকার ধারণ করে' আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে' তোলে তখন জলের মত টাকা ঢেলেও আমরা হারানো স্বাস্থ্য আর ফিরে পাই না। অনেক খাদ্যে 'ভিটামিন বি'র অভাবই শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। গোড়ায় যদি আমরা এই অভাব উপলব্ধি করি এবং "বাই-ভিটা-বি'র কথা মনে করি তা হ'লে অনায়াসে এই স্বাস্থ্যহানির দরুণ গুরুতর বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

আমাদের এই চাওয়ার সামান্যতম ত্রুটির জন্য সারা জীবন আমরা রোগজীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দেহ নিয়ে বেঁচেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকার দুর্ব্বিবহ জ্বালা ভোগ করি এবং অবশেষে একদিন মরে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাই।

নিষ্কৃতির উপায়

চঞ্চল মহানগরী—উদ্দাম জনস্রোত—চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ততা। এরই মাঝে একটি সংসারের অবগুণ্ঠন তুলে দেখা গেল দু'টী প্রাণীর ছোট একটি নিটোল নিখুঁত হিসেবী সংসার—মাত্র দু'টি লোক—স্বামী ও স্ত্রী। ঐশ্বর্য্যও নেই অস্বচ্ছলতাও নেই। স্বামী কোন এক আফিসে অল্প বেতনের কেরাণী তবু তাদের সংসারে আনন্দ বিদ্যমান। দুঃখ তার কালো হাতের কঠিন পরশ এই গৃহের অধিবাসীদের উপর বুলিয়ে দেয় নি। ভোরের আলো যখন এই মহানগরীর সৌধের উপর তার সোনার ছোঁয়াচ দিতে সুরু করে তখন বউটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাংসারিক কাজ নিয়ে—স্বামীর চা ও জলখাবার তৈরী করে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আফিসের রান্না আরম্ভ করে। স্বামী দশটায় আফিস যান। বউটি দুপুরবেলা পাশের ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে তার ঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে আলাপ করে' নিঃসঙ্গ সময়টাকে টেনে ছোট করে' আনে—আবার চারটে বাজতে-না-বাজতেই স্বামীর বিকেলের জলখাবার তৈরী করে' ও তার ছোট সংসারের খুঁটিনাটি অনেক কাজ সেরে রাখে। স্বামী আফিস থেকে ফিরে আসেন—আসবার সময় বাজার থেকে এটা-ওটা আনতে ভোলেন না। রাত্রে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে সুখ-দুঃখের কথা হয়—এমনি নিছক আনন্দের ভেতর বছর গড়িয়ে যায় আবার নতুন বছর ঘুরে আসে —নতুন অতিথির আগমনে সংসারে আনন্দের জোয়ার ব'য়ে যায়—কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই ধীরে ধীরে দেখা যায় দারিদ্র্যের কালো ছায়া। সংসারে খরচ বেড়ে গেছে — খোকার দুধ এবং আরও অনেক কিছু। অল্প বেতনে আর স্বচ্ছলতা হয়ে ওঠে না, তাই আরও রোজগারের জন্য টিউশনী নিতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃই গৃহস্বামী দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগলেন।—একটুতেই হাঁপিয়ে ওঠেন—আফিসে আর পূর্ব্বের মতন পরিশ্রম করতে পারেন না—ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্রও দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে টিউশনী ছাড়তে হ'ল। এই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহে গৃহে হচ্ছে। কিন্তু এর সমাপ্তি এ ভাবে নাও হ'তে পারতো যদি সময়মত হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র সবল করার ঔষধ তাদের খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হ'ত। দরিদ্র কেরাণীর পক্ষে বেশী দামের ঔষধ খাওয়া অবশ্য কঠিন এবং হয়ত সম্ভবও নয় কিন্তু অব্যর্থ কার্য্যকরী অথচ সস্তা ঔষধ যেমন, "ভাইনো-মণ্ট" খাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার হয়ত হ'ত না এবং এরূপ ভাবে নির্জীব ও অকর্ম্মণ্য না হয়ে অজ্ঞাত শত্রুর হাত থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেত।

চোর যখন চুরি করতে আসে তখন ঢাক-ঢোল না বাজিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গৃহস্বামীকে সজাগ না করেই আসে তেমনি রোগও ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে' আমাদের জীবনী-শক্তি হরণ করে। তাই যথাসম্ভব রোগ-বীজাণুর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শ্বাস-যন্ত্র ও হৃদযন্ত্র সবল করার জন্য **"পেট্রোমালসন উইথ গোয়াইকল"**এর মত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। এর দামও অল্প অথচ কার্য্যকরী।

বিজ্ঞাপন

জগৎ কোন্ পথে ?—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক—এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। পৃঃ ২২০+৬। মূল্য এক টকা ছয় আনা।

তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্য-রচনায় যোগেশবাবু দক্ষ ও সুপরিচিত লেখক। আলোচ্য পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ মাত্র গেল বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যেই ইহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বৎসরকাল মধ্যে বর্ত্তমান পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে-সকল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে সে-সকল ঘটনার বিবরণে সমৃদ্ধ ও বহু চিত্রে শোভিত হইয়া চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। পাঠকমহলে "জগৎ কোন্ পথে ?" কিরূপ সমাদৃত হইয়াছে, সংস্করণের বাহুল্যই তাহা প্রমাণিত করে। ইহার কারণও স্পষ্ট। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাসমরের মধ্যে মানব-সভ্যতায় যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিবার ও জানিবার ঔৎসুক্য আজ সকলেরই মনে জাগিয়াছে—শুধু বিদ্যালাভের খাতিরে নয়, প্রয়োজনের খাতিরেও বটে। পুস্তকের সূচনাটি জাগ্রত ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা-সমূহের বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া লেখক পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন শাসননীতি, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিগত বৈষম্য প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়-সমূহ সহজ সরল ভাষায় এমন ভাবে আঁকিয়াছেন যে, বিষয়বস্তু পরিবেশন পদ্ধতির গুণে তাহা বড়দের পক্ষেও শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

শান্তিপুর-পরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ)—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কলিকাতা, ভবানীপুর ১।১৪নং রূপচাঁদ মুখার্জি লেনস্থ 'লীলাবাস' হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৸৵০+৭৮৬+১৬। মূল্য আড়াই টাকা।

শান্তিপুর তথা বঙ্গগৌরব শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য নামাঙ্কিত এই দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম ভাগ প্রকাশের প্রায় পাঁচ বৎসর পর প্রকাশিত হইল। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, শাসন ও বিচার, মিউনিসিপ্যালিটি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম ও সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং ছয়টি প্রবাহযুক্ত অদ্বৈতাচার্য প্রসঙ্গ এই সাত অধ্যায়ে দ্বিতীয় ভাগটি সম্পূর্ণ; এতদ্ভিন্ন আত্মনিবেদন শীর্ষক পরমার্থ সঙ্গীতাদি, ভূমিকা, শুদ্ধি ও সংযোজন পত্র, পরিশিষ্ট, বিশেষ নির্ঘণ্ট, প্রথম ভাগের অভিমতাবলী এবং অন্যূন পনরটি প্রতিকৃতি বৃহৎ গ্রন্থের কলেবর পুষ্টি করিয়াছে। গ্রন্থকার প্রয়োজনমত যাহা-কিছু আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক বহু তথ্য অবগত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীশ্রীজগবন্ধু-হরি লীলামৃত—গদ্যভাগ—১ম খণ্ড। পদ্য ভাগ—২য় খণ্ড। ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস। প্রাপ্তিস্থান—২৯ নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা গদ্য ১০০, পদ্য ৭৪। মূল্য (প্রতিখণ্ড) স্থায়ী গ্রাহক পক্ষে ১৲ সাধারণ ১।০।

বর্তমান বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে ফরিদপুরের শ্রীশ্রীজগবন্ধুর নাম অবিস্মরণীয়। পুস্তক দু'খানিতে গদ্যে ও পদ্যে তাঁহার লীলা-

মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের গদ্যের ভাষা সংস্কৃতবহুল ও আড়ষ্ট, কিন্তু সাধক-কবির গভীর অনুভূতি কবিতাগুলিকে স্থানে স্থানে সার্থক রসসৃষ্টির পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কবি কিশোর—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। পোঃ কৃষ্ণনগর, ঘূর্ণি (নদীয়া) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

এই ছোট্ট বইখানিতে কবি তাঁর ছেলেবেলাকার অনেক স্মৃতি ছবির মতো ক'রে এঁকেছেন। জীবনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে না পারলে এমন করে ছবি আঁকা যায় না। 'নতুন মাষ্টার মশায়ে'র কাছে আমরা পড়িনি বটে, কিন্তু লেখার গুণে তাঁকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। রামায়ণ-শোনা, গঙ্গায় আর নমসার বিলে বেড়ানো, নিশির ডাক…পড়তে পড়তে কবির সঙ্গে আমরা বাল্যজীবনকে নূতন করে উপভোগ করি। বালক-কবির মনে সাহিত্যের প্রথম প্রভাব অতি মনোরম ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অসংলগ্ন—শ্রীরমেন চৌধুরী। বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কি ভাবে আদর্শবাদী নায়ক বিজন অভিজাত-সম্প্রদায় অধ্যুষিত ড্রয়িং-রুমের মোহ ত্যাগ করিয়া সহসা পল্লীসেবায় আত্মনিয়োগ করিল তাহা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ড্রয়িংরুমের চিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু আদর্শবাদের আওতায় ফেলিয়া সেগুলিকে—বিশেষ করিয়া মিনতিকে—শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার দায়িত্ব লেখক স্বীকার করেন নাই। ফলে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে কাহিনী শেষ হইয়াছে। তা সত্বেও আদর্শবাদের সুরটি মনকে স্পর্শ করে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০। গীতবিতান, ১৫৫ রসা রোড, কলিকাতা।

'গীতবিতানে'র পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ইহা সম্পাদন ও প্রকাশ করেছেন। গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদির ব্যাপারে এ দেশের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে এ পুস্তকে নানা তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান বহু প্রবন্ধ আছে। এর লেখকবর্গের মধ্যে অনেকেই বাংলা দেশের খ্যাত-নামা গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভা তথা আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতির ইতিহাস বুঝবার কাজে এ পুস্তকের সাহায্য অত্যাবশ্যক বিবেচিত হবে।

আলোচনা

"রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়"

শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত

গত পৌষের 'প্রবাসী'তে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিত ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে লেখাটি বাহির হইয়াছে তাহাতে এক জায়গায় আমার একটু খট্‌কা বোধ হইয়াছে। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর প্রতিকূল সমালোচনা 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল। উহা লিখিয়াছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রামানন্দবাবু উহা 'প্রবাসী'র পাতায় স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত প্রবন্ধের মতামতের দায়িত্বও তাঁহারই—এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যায়? যোগেশবাবু লিখিতেছেন, "রামানন্দবাবু সোনার তরীর সমালোচনায় দোষ দেখলে সেটা নিতেন না।" কেবলমাত্র মুদ্রণ ও প্রকাশের ভার লইলেই যদি প্রবন্ধের মতামতে সম্পাদকের সায় আছে ধরিয়া লওয়া হয়, তবে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহার উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পরেই 'প্রবাসী'তে সোনার তরীর অনুকূল সমালোচনা ও ব্যাখ্যাও বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত (এখন স্যর্) যদুনাথ সরকার এবং অপরটি লিখিয়াছিলেন ৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের উপর কিঞ্চিৎ পরোক্ষ কটাক্ষও ছিল। কিন্তু যোগেশবাবুর মতে সায় দিলে সোনার তরীর প্রতিকূল ও অনুকূল উভয়বিধ মতামতের জন্ত রামানন্দবাবুকেই দায়ী করিতে হয়।

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন, রামানন্দবাবু সোনার তরীর সমালোচনার প্রতিবাদ করেন নি, অন্তের দ্বারা সোনার তরীর ব্যাখ্যাও করান নি। কথাটা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য নয়, তাহা উপরে দেখান হইল। তবে যদি ব্যক্তিগত ভাবে যোগেশবাবু জানেন রামানন্দবাবু সোনার তরী কবিতাটি অস্পষ্ট মনে করিতেন, অবশ্য তাহাতে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু কেবল মাত্র প্রবন্ধ বিশেষ মুদ্রণ ও প্রকাশের উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদকের স্বকীয় মতামত প্রমাণ করিতে যাওয়া হঠকারিতার সামিল। অন্য প্রমাণ থাকিলে স্বতন্ত্র কথা।

"ব্যষ্টি ও সমষ্টি"

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

গত পৌষের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব "ব্যষ্টি ও সমষ্টি" নামধেয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার স্বামীর ভ্রাতা তাহাকে গ্রহণ করা, সপুত্রাণী হউক বা অপুত্রাণী হউক। 'গ্রহণ' অর্থে বিবাহ হইতে পারে, যথা—উড়িষ্যার ঘঁইতো।"………

পুনশ্চ আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"অবশ্য নিয়োগ প্রথা কলিতে বর্জ্জ্য বলিয়া আদিষ্ট, কিন্তু তাহারই অপর রূপ "অভর্ত্তৃক ভ্রাতৃভার্য্যা গ্রহণ" এখনও ভারতবর্ষে দেখা যায়, যথা পঞ্জাবে কয়েকটি জাতির মধ্যে এবং উড়িষ্যার পূর্ব্বকথিত ঘঁইতো।"

উৎকল-ভাষা অঞ্চলে শূদ্রাদি সমাজে অভর্ত্তৃক ভ্রাতৃভার্য্যা গ্রহণ বিধি প্রচলিত আছে; কিন্তু উচ্চবর্ণের মধ্যে যথা ব্রাহ্মণ ও করণ সমাজের মধ্যে এ প্রথা নাই। "অভর্ত্তৃক ভ্রাতৃভার্য্যা গ্রহণং চাতি দুষিতম্"—এ বাক্য লেখক উদ্ধার করিয়াছেন। ভ্রাতৃভার্য্যা গ্রহণ প্রথা ভারতে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। রামায়ণ পাঠ করিলে জানা যায় বালি রাজার মৃত্যুর পর সুগ্রীব বড় ভাইর স্ত্রী তারাকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণকে রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন।

লেখক মহাশয় উপরে উড়িয়া ভাষায় 'ঘঁইতো' শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়াছেন, উড়িয়া ভাষায় 'ঘঁইতো' শব্দ নাই। 'ঘইতা' শব্দ আছে। মনে হয় লেখক ঘইতা শব্দকে ভ্রমক্রমে 'ঘঁইতো' বলিয়াছেন। 'ঘইতা' শব্দের পরিচয় নিম্নে দিলাম।

মূলশব্দ	অপভ্রংশ
গ্রহীতা বা গৃহস্থ	ঘইতা
Accepting or seizing Husband	Husband

দেশ-বিদেশের কথা

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শিক্ষাব্রতী শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গত ফাল্গুন মাসে সেনহাটীতে (খুলনা) পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি কলিকাতায় সাংবাদিকের ব্রত গ্রহণ করেন। পরে পল্লীগ্রামে শিক্ষকতার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেনহাটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নানা প্রকার সংস্কৃতিমূলক ও সাধারণ হিত-কর্মের জন্ত তিনি সমগ্র জিলায় সুপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচারের জন্ত তাঁহার চেষ্টা তাঁহার স্বদেশবাসীরা বহু দিন স্মরণ করিবেন। সেনহাটী প্রতিভাময়ী বালিকাবিদ্যালয়ের এতাদৃশ উন্নতি তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় সম্ভবপর হইয়াছে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল শাখা-সমিতি, সৌদামিনী নারী-শিল্প বিদ্যামন্দির, ব্রতচারী সমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্র ও পরিবারকে গোপনে সাহায্য করিতেন, অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি সেনহাটী রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ-কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা প্রচার-শিল্পের প্রবর্ত্তক এবং ক্যালক্যাটা এডভারটাইজিং এজেন্সীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে গত ২৬শে মার্চ্চ তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। কলিকাতার প্রায় সকল সাময়িক পত্র এবং বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত অনাথবাবু তাঁহার প্রচার-ব্যবসায় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' নামে বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশের সমগ্র ব্যয় তিনি বহন করিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দেন। এদেশে 'হার্ডিং' এবং 'পিক্টোটাইন' বিজ্ঞাপনের ইনিই প্রবর্ত্তক।

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু-বিদ্যায়তন

এই শিশু-বিদ্যায়তনটি শ্রীযুক্তা মৃণ্ময়ী রায় তাঁহার পুত্রের স্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইউরোপ হইতে শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়া তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। গত আট বৎসরে ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি বিশেষ লক্ষণীয়। বর্ত্তমানে ইহার শিশু ছাত্রছাত্রীসংখ্যা প্রায় চারি শত। শিশু-মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বিদ্যায়তনটি ইতিমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার শিশু ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার জন্ত বর্ত্তমানে একটি স্বতন্ত্র আবাসস্থলের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এজন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এরূপ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত।

ঐতিহাসিকের সম্মান

গত ৫ই চৈত্র শনিবারের বৈঠকের উদ্যোগে কৃতী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমেই বৈঠকের পক্ষ হইতে একটি সুদৃশ্য চন্দনাধারে রক্ষিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ ও ব্রজেন্দ্রনাথকে অর্পণ করা হয়। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, জগদীশ ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ সভায় বক্তৃতা করেন। পরিশেষে একটি অনতিদীর্ঘ ভাষণে ব্রজেন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তর দেন।

কৃষিতত্ত্ব আলোচনায় শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ

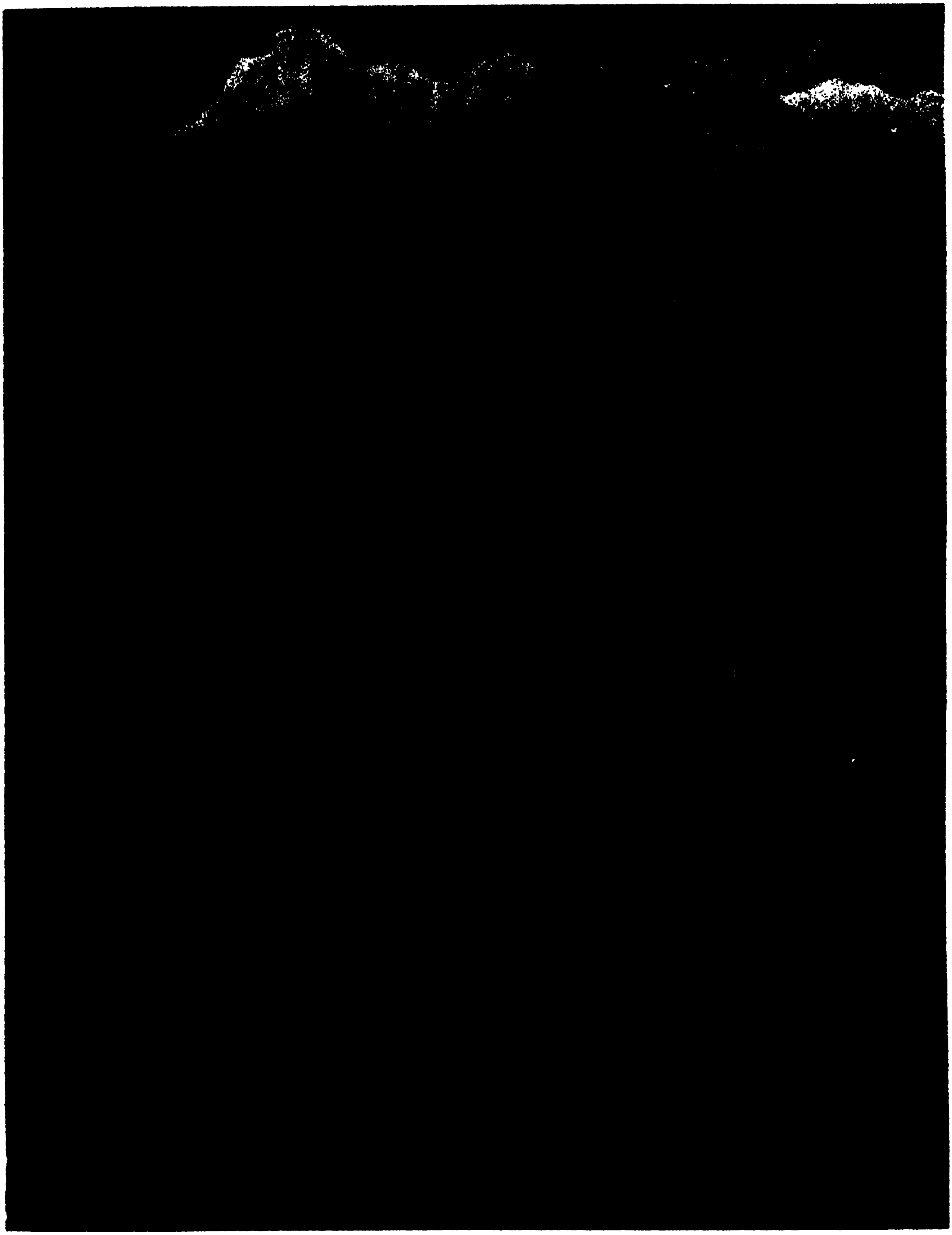
বিগত মহাসমর অন্তে বিলাতে 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' রব উঠিয়াছিল। ইদানীং এই রব আবার উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা চিরন্তন সত্য যে, দেশ-বিশেষের উন্নতির পক্ষে কৃষিই একান্ত সহায়। সুজলা দেশের তো কথাই নাই। কৃষির উন্নতি না



শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ

হইলে অন্ততঃ আমাদের দেশেরও যে উন্নতি হওয়া সুকঠিন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ মহাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল একাদিক্রমে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে অর্জ্জন করিয়াছেন। বিবিধ পুস্তক-পুস্তিকায় প্রবন্ধে তিনি এযাবৎ ইহা দেশবাসীকে পরিবেশনও করিয়া আসিয়াছেন। 'কৃষি-প্রবন্ধ' নামে তিনি তিন শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। কাগজের কৃচ্ছ্রতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দিনে এরূপ পুস্তক-প্রকাশে তাঁহার অদম্য কৃষি-প্রীতিই সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমানে দেশে খাদ্যসঙ্কট মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায়, শুধু কৃষক নহে, যাঁহার সামান্ত পরিমাণও ভূমি আছে এরূপ ব্যক্তিও তাহাতে কিছু কিছু করিয়া বিবিধ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন। এই পুস্তকখানিতে কৃষিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বিবিধ ফলশস্য উৎপাদন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানিতে পারা যাইবে। বাণেশ্বরবাবু যে-পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাহা বহুল ভাবে অনুসৃত হইলে স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর অশেষ কল্যাণ হইবে।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি

বন্দীদশায় মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক হইয়া উঠায় বিনাসর্তে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। দেশবাসী তাঁহাকে নিজেদের ভিতর ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত। প্রার্থনা করি মহাত্মা গান্ধী শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠুন এবং পুনরায় ভারতবর্ষের নেতৃত্ব-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করুন।

—

সাম্প্রদায়িকতায় বাঙালীর লাভলোকসানের খতিয়ান

সাম্প্রদায়িকতায় ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙালীর, লাভ-লোকসান কি হইয়াছে তাহা খতাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে, প্রয়োজনও ঘটিয়াছে। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা, মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে উহার ভিত্তি স্থাপন এবং বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনে উহার পূর্ণ পরিণতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা প্রবর্ত্তনের ফলে বাঙালীর সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান কি হইয়াছে ২৫ বৎসর পরে তাহা একবার বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা অসঙ্গত হইবে না।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে সাম্প্রদায়িকতার রন্ধ্রপথে মুসলমানের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অনেকখানি অর্পিয়াছিল। ১৯১৯ সালের পূর্ব্বে এবং পরে মুসলমান সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যায় এই প্রকার ক্ষমতা লাভে মুসলমান-সাধারণের কোন উন্নতি হয় নাই, বরং ক্ষতিই হইয়াছে। দরিদ্র মুসলমান কৃষকের দারিদ্র্য কমে নাই, বাড়িয়াছে। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক উন্নতি হয় নাই, যে পরিমাণ চাকুরী তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাহাও জোটে নাই। সাম্প্রদায়িক শিক্ষার ফলে তাঁহারা প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারিয়া আরও পিছাইয়া গিয়াছেন। হিন্দুর চাকুরী কাড়িয়া লইয়া কতক মুসলমানের সংস্থান হইলেও অধিকাংশেরই উহাতে লাভ হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে হিন্দু তবু আগাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু মুসলমান যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে। লাভ হইয়াছে এক শ্রেণীর নেতাদের। ইহারা অজ্ঞ ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের নেতা সাজিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ইহাদের মূলমন্ত্র। নিজের অথবা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি অতি-নিকট কয়েকজনের স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা অপর কাহারও উন্নতি করিতে পারেন নাই। হিন্দুর নিছক অনিষ্টসাধন ভিন্ন নিজের জেলা, নিজের নির্বাচন-কেন্দ্র, এমন কি নিজের পাড়াটারও কোনরূপ উন্নতি ইহাদের দ্বারা হয় নাই।

—

সাম্প্রদায়িকতায় লাভ কাহার?

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে সাম্প্রদায়িকতার জয়যাত্রার এই যে সহজ পথ খুলিয়া দেওয়া হইল তাহার কি কোন কারণ ছিল না? অবশ্যই ছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রবর্ত্তনে এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুর অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, সাম্প্রদায়িক আত্মকলহে জর্জরিত হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা বিস্মৃত হইবে, এই চিন্তা কি কাহারও মনে উদিত হয় নাই? ভারতবর্ষের অবনতিতে ও পরাধীনতায় যাহাদের লাভ, সেই সাম্রাজ্যবাদীর দল সাম্প্রদায়িকতার বিজয়ের পরিণাম, উহার পরম অনিষ্টকারিতা না ভাবিয়াই

এ দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি চালান করিয়াছিল একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সর্বাপেক্ষা সতর্কতা ও সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে বাংলায়। যে বাঙালী বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান গরিমা এবং কর্মশক্তিতে সারা ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল,—রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক এবং শিক্ষাগত শৃঙ্খল মোচনে যে বাঙালী ছিল সকলের অগ্রণী—সেই বাঙালীর প্রগতি রোধ করিবার সর্বপ্রধান প্রয়াস এই সাম্প্রদায়িকতার আমদানী। সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে প্রবিষ্ট এই বিষের প্রভাবে বাঙালীর সর্ববিধ প্রগতি রুদ্ধ হওয়ায় বিদেশীর প্রধান চেষ্টা সফল হইয়াছে। বিদেশীর উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়তা যাহারা করিয়াছে, ব্যক্তিগত আপাত লাভ তাহাদের হইয়াছে প্রচুর কিন্তু দেশের যে ক্ষতি ইহাতে হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। লাভ হইয়াছে প্রধানতঃ বিদেশীর এবং তাহার পর লাভ হইয়াছে অ-বাঙালীর। বাঙালীর অবনতিতে বিদেশীর স্বার্থ কি তাহা বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

বাঙালী বলিতে আমরা বুঝি তাহাকে বাংলার মাটিতে যাহার জন্ম, বাংলার মাটিতে যাহার দেহাবসান, বাংলার স্বার্থে যাহার স্বার্থ, বাংলার উন্নতি ও অবনতিতে যাহার ব্যক্তিগত উত্থান-পতন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গত দুর্ভিক্ষে এই বাংলার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইতে বহু বৎসর লাগিবে। দুর্ভিক্ষে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী মরিয়াছে বোধ হয় মুসলমান, লোকসংখ্যার অনুপাতে সর্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যু ঘটিয়াছে বোধ হয় তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। বাংলার ভূমিহীন কৃষকের অধিকাংশ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে ইহারাই বেশী। নৌকা অপসারণের ফলে উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া ধীবর মাঝি প্রভৃতি তপশীলীদেরই ক্ষতি হইয়াছে অধিক। পাকিস্থানী অথবা তপশীলী "নেতারা" ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর দুর্গতি সাধনের জন্য এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার সৃষ্টি বিগত দুর্ভিক্ষে আপেক্ষিক ক্ষতি কম হইয়াছে তাহাদেরই। গত দুর্ভিক্ষে সমগ্র দেশের অসহায়তা যেভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই।

প্রকৃত শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের প্রিয়পাত্র কখনও হইতে পারেন নাই। বিদেশীর অনুগ্রহ-লাভের কোন আশা ইহাদের ছিল না, আজও নাই। পরের অনিষ্ট ও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিতে ইহারা স্বভাবতই কুণ্ঠা বোধ করিবেন। বিদেশী ইহা জানে, তাই সে বাছিয়া বাছিয়া তাহার অনুগ্রহ অকাতরে ঢালিয়া দেয় তাহাদেরই উপর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকিলেও মন যাহাদের সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর, আত্মস্বার্থসিদ্ধি এবং পরের অনিষ্টসাধন যাহাদের মূলমন্ত্র, রাজনৈতিক জীবনে দূরদৃষ্টি বা কুণ্ঠার বালাই যাহাদের নাই।

বিদেশীর লাভের খাতিরে দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাঙালী পাটচাষীর সর্বনাশ সাধনের আয়োজন হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রিদল মূল বন্দোবস্তের সন্ধান রাখিতেন না ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। পাটচাষীর অধিকাংশই মুসলমান, ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের মধ্যে সস্তায় পাট ক্রয়ের বন্দোবস্তে মরিবে ইহারাই। বন্দোবস্তটা মোটামুটি এই—যুদ্ধের অর্ডার রূপে আমেরিকা কলিকাতার চটকলসমূহে বাজার দর অপেক্ষা কম দরে ১০ কোটি গজ চটের অর্ডার দেয়। এই বড় অর্ডারের ফলে বাজার যাহাতে চড়িতে না পারে সে জন্য ইংরেজ ও আমেরিকার মধ্যে এই চুক্তি হয় যে, আমেরিকা যখন অর্ডার দিবে ইংরেজ তখন বাজারে আসিবে না। অর্ডিনান্সের দ্বারা পাটের দর কলিকাতার বাজারে এমন ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইল যে, চাষীর উহাতে লাভ নাই। শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মুখপত্র ক্যাপিটাল স্বীকারই করিলেন যে, ১২ টাকার কম দরে পাট বেচিলে চাষীর লোকসান। কলিকাতার বাজারে ১৪ টাকা দর বাঁধা থাকিলে মফস্বলের দর ১২ টাকাও হইবে না, ওদিকে পাটচাষের জমির পরিমাণ জনমতের বিরুদ্ধে বাড়াইয়া দিয়া বেশী পাট জন্মাইতেও বলা হইল। আমেরিকার অর্ডার যুদ্ধের প্রয়োজনে দেওয়া হইয়াছে, ভারত-সরকারের এই উক্তির পর জানা গেল আমেরিকা কলিকাতায় সস্তায় চট কিনিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় উহা বিক্রয় করিতেছে। মুসলমান চাষী যুদ্ধের বাজারে ন্যায়সঙ্গত দরে পাট বেচিয়া যে লাভ করিতে পারিত, এই ভাবে তাহাকে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষায় ধ্বজাধারী মন্ত্রিদল প্রতিবাদটুকু পর্য্যন্ত করিলেন না। বাংলায় তাঁতের কাপড়ের উপর বিক্রয়-কর বসানোতেও ক্ষতি হইবে মুসলমান জোলা ও তপশীলী তাঁতিদেরই। শিক্ষিত স্বাধীনচিত্ত ও যোগ্য মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিলে বিদেশীর স্বার্থসিদ্ধির এত সুবিধা হইত না ইহা নিঃসন্দেহ।

শুধু মুসলমান নহে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত কতিপয় হিন্দুও দেশের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিবার জন্য বিদেশীর সহিত যোগ দিয়াছেন। নিজের সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ অনিষ্ট সাধনেও ইহাদের কুণ্ঠা নাই। স্বজাতিদ্রোহিতার যে দৃষ্টান্ত

উমিচাঁদ রাখিয়া গিয়াছে, বাংলার দুর্ভাগ্য এই যে আজও তাহা অনুসরণের লোকের অভাব হয় না। সাম্প্রদায়িকতার আমদানীতে হিন্দু সমাজের সাময়িক অনিষ্ট যথেষ্ট হইলেও উচ্চ বর্ণের হিন্দু ইহাতে মরিবে না। তাঁহাদের ইহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতেছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে ও হইবে মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর। ঐ দুই সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি বা পরিবারের লাভ ব্যতীত সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে মুসলমান বা তপশীলী হিন্দুর সমষ্টিগত কোন লাভ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছে, আরও ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রোষের কারণ

বর্ত্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষা-বিস্তার নহে, শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ। ইহা ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতবর্ষে রাজা সর্বদা শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করিয়াছেন, কখনও শিক্ষার নিয়ামক হইবার চেষ্টা করেন নাই। শুধু হিন্দু আমলে নহে, মুসলমান রাজত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির এই মূল নীতি ব্যাহত হয় নাই। শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের প্রথম চেষ্টা এ দেশে আরম্ভ হয় ইংরেজ আমলে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসমূহের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে ত্রুটিপূর্ণ ইংরেজী শিক্ষা-পদ্ধতির সূচনায়। আমাদের মধ্যে কথকতা, বাউল প্রভৃতির দ্বারা লোকশিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয়েই তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত। বাঙালী গ্রামবাসী বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না, আপনার মঙ্গল যেমন সে বুঝিত দেশের মঙ্গলও তেমনি তাহার কাম্য ছিল। বর্ত্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাহা চিন্তা করে, যে ভাবের দ্বারা উত্তেজিত ও পরিচালিত হয়, ইংরেজী অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে উভয়ের ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা কোন সময়েই জনশিক্ষায় পরিণত হয় নাই। বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালী যত বার গবর্ন্মেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন তত বারই শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের নামে সে চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে। ১৮৫৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমেরিকা ও বিকটোরিয়া ইত্যাদি স্থানের রাজপুরুষেরা আপনাপন অধীনস্থ প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকেন আমাদিগের রাজপুরুষেরা তদনুরূপ সাহায্য কিছুই করেন না, যাহা কিছু প্রদান করিয়া থাকেন তাহা কেবল ইংরাজী বিদ্যার প্রাচুর্য্য নিমিত্তই করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে এতদ্দেশে সাধারণতঃ বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত হইবার সদুপায় কিছুই হয় নাই…প্রজাদিগকে জাতীয় ভাষার দ্বারা উপদেশ প্রদান না করিলে উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই…।" স্কুলের সংখ্যা নির্দ্ধারণ, শিক্ষকগণকে স্বল্প বেতন প্রদান, দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজিতে শিক্ষাদান, ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে অনভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান দ্বারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সরকারী কড়াকড়িতে শিক্ষা-বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮১৮ সাল হইতে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের সরকারী বন্দোবস্তের ফল কি দাঁড়াইয়াছে ১৯০৬ সালে ডন সোসাইটিতে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিতেই তাহা বুঝা যাইবে :

"আমাদের শিক্ষার উপর জীবনের গতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যদি সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আদর্শ ভাসিতে থাকে তবে আমাদের চিন্তাস্রোতও সেই দিকে ধাবিত হইবে। মনের গতি স্বদেশ হইতে ফিরিবে। যদি সর্ব্বদাই পাশ্চাত্যজাতির বিলাস, ভোগ, যুদ্ধবিগ্রহের কথা আলোচনা করি তবে আমাদের হৃদয়ও সেই ভাবে নোয়াইয়া পড়িবে। অন্য ভাব ভাল লাগিবে না। যেরূপেই হউক ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িলেই আমাদের হৃদয় অজ্ঞাত ভাবে পাশ্চাত্য ভাবে পাশ্চাত্য আদর্শে পূর্ণ হইবে, পাশ্চাত্য মোহে জড়িত হইবে, ঋষিদিগের শান্তি ও সংযমের আদর্শের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রভৃতি আপাততঃ বিচ্ছেদকারী প্রথা ছিল বটে, কিন্তু ইহা সমুদয়ই আমাদের অসামান্য সংযমের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আজ ইংরাজ কত সৈন্য ক্ষয় করিয়া অবৈধ উপায়ে কত কলঙ্ক কিনিয়া যে তিব্বতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন শান্তির পুরোহিত ভারতবর্ষের কাছে সেই তিব্বতের দ্বার অবিরত উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার প্রবেশে কেহই বাধা দেয় নাই। সুদূর জাপান হইতে পৃথিবীর অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যের গতি সর্ব্বস্থানেই স্বাধীন ছিল, কেহই তাহার অন্তরায় হয় নাই। কিন্তু ইংরাজের ইতিহাসে আমরা ভারতবাসীর সংযম, নৈতিক সাহস, শান্তিপ্রিয়তা, ধর্ম্মপ্রভাব ইহার কোন কথাই শুনিতে পাই না। কেবল ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা তাঁহাদিগের নিন্দা, পরাজয় প্রভৃতির বর্ণনায় কলঙ্কিত। এইরূপ শিক্ষার ফলে দেশের প্রতি এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ঘৃণা বা ঔদাসীন্য ভিন্ন অন্য কোন ভাব

আসিতে পারে না। অতএব আমাদের অতীত গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইলে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালবাসা অনুপ্রাণিত করিতে হইলে স্বদেশী ভাবে শিক্ষার প্রচার করা আবশ্যক। ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।"

স্বদেশী যুগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুবোধচন্দ্র মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, আবদুল রসুল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, মতিলাল ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাদেরই দানে ও সেবায় জাতীয় আত্মাপন্ন হইয়া উঠে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে উচ্চতম আসন প্রদান করেন ও ব্যাপকতর শিক্ষাদানের আয়োজন করেন। স্বদেশী যুগে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল, "আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ?" রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "ভাণ্ডার" পত্রে প্রশ্নটি প্রকাশিত হয়। উত্তরে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "ইউনিভার্সিটি অল্পসংখ্যক মনীষীদিগকে শিক্ষার উচ্চতম সোপানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না, দেশের অধিকাংশ লোক যাহাতে মোটামুটি শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য।" হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় লেখেন, "এম-এ বা বি-এ অনার পরীক্ষা কঠিন হওয়া উচিত—কিন্তু বি-এ পাস ও নীচের দুইটি পরীক্ষা দুরূহতর করা কখনও উচিত নয়।" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লেখেন, "শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন হওয়া উচিত কিন্তু ব্যাপ্তজ্ঞানটা বর্জ্জন করা ঠিক নহে। যিনি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের পাতায় লম্বাচৌড়া সিলেবাস ছাপাইয়া দেশ উদ্ধার করিতে চাহেন তিনি নিতান্তই 'উৎপল পত্র ধরিয়া শমীলতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি।" আশুতোষ এই আদর্শগুলিকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সাফল্যও অনেকখানিই অর্জন করিয়াছিলেন। এদেশে শিক্ষার প্রসারে যাহাদের অসুবিধা ও ব্যক্তিগত ক্ষতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহারা বিষদৃষ্টিতে দেখিবে এবং উহাকে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

বার বার তিন বার ব্যর্থ চেষ্টার পর বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী মন্ত্রিমণ্ডলী বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস করাইয়া লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ১৯৪০-এ প্রথম বার বিলটি আনা হয়। উহার বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রবল প্রতিবাদ উঠে এবং বিল পাশ করিবার অসুবিধা সম্বন্ধে আইনগত বাধাও ধরিয়া দেওয়া হয়। প্রথম চেষ্টা এই ভাবে স্থগিত হয়। ১৯৪১-এ প্রগতিশীল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় এবং পর বৎসর তাঁহারা সকল দলের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন ভাবে বিলটি উত্থাপন করেন। প্রথম বিলে সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে বোর্ড গঠনের কথা ছিল, দ্বিতীয় বিলে যৌথনির্বাচনের দ্বারা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৩ এর এপ্রিল মাসে ছলে ও কৌশলে ইউরোপীয় দলের সহায়তায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধ মন্ত্রিদল ক্ষমতা লাভ করে। পরের মাসেই ইহারা একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করিয়া বিলটির আলোচনা আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে বৈধতার প্রশ্ন উঠিলে মন্ত্রীরা বলেন, তাঁহাদের আনীত বিল ১৯৪২-এর বিল ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান বিলে ১৯৪২-এর বিলের মূল নীতি ও প্রধান ধারাগুলি সমস্তই বর্জ্জিত হইয়াছে এবং সর্বপ্রধান আপত্তির বিষয় এই যে, ইহাতে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা এমন ভাবে প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইয়াছে যে কোন কোন দিক দিয়া ইহা রামজে ম্যাকডোনাল্ডের বাঁটোয়ারাকেও হার মানায়। বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য স্যাডলার কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার মূল নীতি অনুসরণ করিয়াই ১৯৪২-এর বিল রচিত হয়। বর্ত্তমান বিলে উহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে গত ত্রিশ বৎসরে দেশে শিক্ষা-বিস্তার অত্যন্ত দ্রুত হইয়াছে, কাজেই উহা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ম্যাকডোনাল্ডী মেজরিটি এবং শ্বেতাঙ্গ দল পিছনে আছে বলিয়াই হয়ত এই উক্তির সমর্থনে কোন যুক্তি দেখাইবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। ১৯৪১-এর সেন্সাসে দেখা যায় বাংলার লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছয় কোটির মধ্যে মাত্র ৭১ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ১১ জনেরও কম। পৃথিবীর সভ্য দেশে অক্ষর পরিচয় আছে এরূপ লোকের সংখ্যা শতকরা ৯০ জনেরও বেশী। বাংলায়, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য বলিলেই চলে। বাংলা দেশে ১৯৩৯-৪০-এ কলেজে পাঠরত ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪০৩২২, এবং ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ২৭০৪। অনুমোদিত স্কুলে পাঠরত ছাত্র ছিল ৫৭,৯৭,২৭৫ এবং ছাত্রী

৭৮৪,৭৭৩। অনুমোদিত স্কুলে ৪৮,৮৬২ জন ছাত্র এবং ১৪,৫৭৬ জন ছাত্রী। স্কুল ও কলেজ মিলাইয়া ঐ বৎসর মোট ৩৬,৮৮,৫৩২ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভ করিতেছে, অর্থাৎ ৬ কোটি লোকের দেশে শতকরা ছয় জন মাত্র ছাত্রছাত্রী যে কোনও রূপ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। শিক্ষা-বিস্তারের এই গতিকে বাঙালী 'দ্রুত' বলিয়া কল্পনা করিতেও অক্ষম, স্বীকার করা ত দূরের কথা।

বিলে মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, ম্যাট্রিকুলেশনের পরবর্তী শিক্ষা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না কিন্তু ডাক্তারী, কৃষি, শিল্প,* বাণিজ্য, টেকনিকাল প্রভৃতি শিক্ষা ইহার আমলে আসিবে। মাধ্যমিক শিক্ষার অধীনে মেডিক্যাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতিকে টানিয়া আনার দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কি না গবর্মেণ্টের তাহা জানান দরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড এবং একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হইবে। বোর্ডে ৫৩ জন সদস্য থাকিবেন। ২১ জন মুসলমান এবং ২১ জন হিন্দু, তন্মধ্যে ৬ জন তপশীলীভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক এবং অবশিষ্ট ১১টি আসন সরকারী কর্মচারী, ইউরোপীয় প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ হইবে। কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হইবে ২১,—৯ জন মুসলমান, ৯ জন হিন্দু,* তন্মধ্যে ২ জন তপশীলী। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

বোর্ডের অধীনে চারিটি কমিটি থাকিবে, যথা—ইসলামিক, হিন্দু, ছাত্রী এবং তপশীলী মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটি। ইহাদের অধীনে মুসলমান, হিন্দু, তপশীলী এবং ছাত্রীদের স্বতন্ত্র স্কুল থাকিতে পারিবে। এই কমিটিগুলিই স্ব স্ব এলাকাভুক্ত স্কুলকে মনোনয়ন দিবে, পাঠ্য-তালিকা নির্দ্ধারণ করিবে এবং পরীক্ষা লইবে। অর্থাৎ মূল বোর্ডে এবং কাউন্সিলে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আমদানী করিয়াও মন্ত্রীরা সন্তুষ্ট নহেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া পরস্পর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহশীল।

বোর্ড এবং কাউন্সিলের সমস্ত নির্বাচনে মূল ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারার নীতি অনুসৃত হইয়াছে। হিন্দু শিক্ষকেরা হিন্দু প্রতিনিধি, মুসলমানেরা মুসলমান এবং তপশীলীরা স্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পৃথকভাবে নির্বাচন করিবেন। পুণাচুক্তিতে হিন্দু ও তপশীলীদের যৌথ-নির্বাচনের অধিকার সম্বন্ধে ম্যাকডোনাল্ড মানিয়া লইয়াছিলেন, এই বিলে তাহা রহিত হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের ফল কি দাঁড়ায়, সম্প্রতি ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর রূপে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বিবৃত করিয়াছেন। বোর্ড অপেক্ষা কাউন্সিলকে ব্যাপকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা গণতন্ত্রবিরোধী এবং ইহার পরিণাম ভাল হইতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার যে কুফল হইয়াছে ডাঃ মজুমদার তাহা দেখাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল অর্থাৎ সিণ্ডিকেট সর্বতোভাবে বৃহত্তর সভা সিনেটের অধীন।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে শিক্ষা কখনও সার্থক হইতে পারে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। ঢাকা জেলার অথবা পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী জেলাসমূহের ছাত্রেরা স্কুল হইতে বাহির হইয়া সর্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজে ভর্তি হইবার চেষ্টা করে। এখানে স্থান না পাইলে অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ ছাত্রের বেলাতেই এই কথা প্রযোজ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেখান হইতে প্রতিভাশালী কয়টি ছাত্র আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। পাকিস্থানী-আন্দোলনবাদী নেতাদের টাকায় মুসলমানদের জন্য একটিও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইসলামিয়া কলেজ জনসাধারণের টাকায় স্থাপিত, জনসাধারণের টাকাতেই উহা পরিচালিত হয়। হাজী মহম্মদ মহসীনের দানে হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠা। শুধু মুসলমানের জন্য তিনি দান করেন নাই, ঈশ্বরের সেবায় তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ পন্নির টাকায় ময়মনসিংহে করোটিয়া সাদাৎ কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাকিস্থানী কর্মকর্তৃবর্গের বর্তমানে চূড়ামণি মৌলবী ফজলুল হকের টাকায় বরিশালে চাখার কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জে কৃষকদের চাঁদায় সিরাজগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য আজ যাঁহারা ব্যাকুল তাঁহাদের মধ্যে প্রচুর বিত্তশালী লোক কয়েকজন তো আছেন, তাঁহাদের কাহারও টাকায় কলেজ ত দূরের কথা কয়টি হাই স্কুলও এযাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা তাঁহারা জানাইবেন কি? বাংলার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে-সব মুসলমান দান করিয়াছেন তাঁহারা কেহই সাম্প্রদায়িকতাবাদী নহেন, সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থকে দেশের স্বার্থের ঊর্দ্ধে তাঁহারা স্থান দেন নাই।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে দেশের ক্ষতি

এই বিল পাস হইলে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি ছাড়া অন্যান্য দিক দিয়াও বাঙালীর ক্ষতি হইবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাড়া অন্যান্য কারণে শিক্ষক নিয়োগ আরম্ভ হইবার পর বাংলায় শিক্ষার মান অনেক নীচু হইয়া গিয়াছে। আই সি এস, অথবা নিখিল-ভারতীয় অন্যান্য প্রতিযোগিতায় যেখানে বাঙালী ছাত্রেরা শীর্ষস্থান অধিকার করিত এখন আর তেমন হয় না। বর্তমান বিলে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা যে ভাবে পাকা করিবার আয়োজন হইয়াছে তাহাতে শিক্ষার মান আরও কমিবে, বাঙালী ছাত্রের প্রতিযোগিতার ক্ষমতাও আরও সঙ্কুচিত হইবে। টেকনিক্যাল শিক্ষাকে উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া স্কুল পরিচালকদের হাতে উহা ছাড়িয়া দিলে উহারও উৎকর্ষ নষ্ট হইবে। কিছুদিন পূর্বেও শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বাঙালী ছাত্রেরা রুড়কীর সহিত প্রতিযোগিতা করিত, বর্তমান সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় উহারও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়ের ভার প্রস্তাবিত বোর্ডের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা গণতন্ত্র এবং ন্যায়নীতির বিরোধী। কোন দেশে শিক্ষার আদর্শ নির্ধারণের ভার কার্য-পরিচালকদের (Administrative Machinery) হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না; আদর্শ ঠিক করিয়া দেওয়া হয় জনসাধারণের নির্বাচিত পার্লামেণ্টে। বিলে মূল-নীতিগত আরও প্রশ্ন সমাধানের ভার বোর্ডকে দেওয়া হইয়াছে। বোর্ডের পরীক্ষা স্কুল ফাইনাল অথবা ম্যাট্রিকুলেশন হইবে, তাহা বোর্ড নির্ণয় করিবেন, বিলে তাহা নির্ধারিত হইবে না। অথচ এই দুই পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্তমান। প্রথমটির ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থা আরও বিচ্ছিন্ন হইবে, দ্বিতীয়টি অনুসৃত হইলে উহা কেন্দ্রীভূত হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আনয়নের উৎসাহের পিছনে হিন্দুর ক্ষতিসাধনের চেষ্টা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আমরা দেখিতে পাইতেছি না। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুর প্রগতি অব্যাহত রাখিয়া পাকিস্থানী নেতারা স্ব-সম্প্রদায়ের শিক্ষার স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে চাহিলেও আমরা তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিতাম না। স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার আগুনে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার খাদ পুড়িয়া খাঁটি সোনা বাহির হইবার সম্ভাবনা ইহাতে থাকিত। তাহা না করিয়া, নিজের অগ্রগতির অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য অপরের প্রগতি রোধের এই চেষ্টাকে আমরা কোনমতেই সমর্থন করিতে পারি না। এক এক সম্প্রদায়ের প্রগতির আলাদা পথ খুলিয়া দিলেও হিন্দু অগ্রসর হইবেই, মুসলমানেরই দীর্ঘ দিনের জন্য পিছাইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ উঠিয়াছে। এই প্রতিবাদকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলন বলিয়া গবর্মেণ্ট বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা ভুল। মন্ত্রীদল সমর্থক অর্ধ ডজন হিন্দু ব্যতীত সমগ্র হিন্দু সমাজ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-এবং শিক্ষকসঙ্ঘ ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ইহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দাঁড়াইয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুই একটি পত্রিকা ছাড়া সমস্ত সংবাদপত্র ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই বিলকে নির্বিবাদে পাস হইতে দেওয়া অন্যায় হইবে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিল পাসে বাধাদানের যত উপায় আছে, ব্যবস্থা-পরিষদে তাহার প্রত্যেকটি প্রযুক্ত হওয়া উচিত। যথাসাধ্য বাধা না দিয়া এই বিল পাশ হইয়াছে এ কলঙ্ক যেন ইতিহাসে লেখা না থাকে।

—

শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে নিজামরাজ্যের অভিমত

হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকারী মুখপত্র "হায়দরাবাদ ইনফরমেশনে"র এপ্রিল সংখ্যায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে :—"নিজাম-সরকার শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট করিবার যে-কোন চেষ্টার ঘোর বিরোধী। তাঁহারা দৃঢ়তা সহকারে এই নীতি পালন করিয়া আসিতেছেন। যেমন সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, তেমনই শিক্ষা বিষয়েও যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আসিতে না পারে, সে জন্য নিজাম-সরকার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে সমস্ত বিষয় জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জীবনে ক্রিয়া করে, সে সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া একটি প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। জাতির ভাগ্যবিধাতারূপে তরুণ-সমাজের সম্মুখে যে গুরু কর্তব্য রহিয়াছে, তাহার জন্য তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।"

মহামান্য নিজামের শাসন-পরিষদের সভাপতি ছত্রির নবাবসাহেব নাগপুর আঞ্জুমান-ই-হামি-ই-ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্র গ্রহণ করিবার কালে যে বক্তৃতা করেন তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহারা এমন শিক্ষা যেন না পায় যে তাহাতে তাহারা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া

উঠে। কারণ দুই সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার উপরই আমাদিগের সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে।" নিজাম কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়াও নবাবসাহেব ঐ প্রকার উপদেশই প্রদান করেন। তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলেন, ভাষার প্রশ্নকে যেন কখনই রাজনীতির অন্তর্গত বিষয় করিয়া তোলা না হয়। তিনি বলেন, হায়দরাবাদের ছেলেরা মাতৃভাষা ভিন্নও এই রাজ্যে প্রচলিত অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

নবাবসাহেবের উপদেশ যদি প্রতিপালিত হয়, তবে রাজ্যের বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সকলে একত্রে রাজ্যের সাধারণ মঙ্গলকর কার্যে যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে তাহা ধ্রুব নিশ্চিত।

—

ভারতীয় ফেডারেল কোর্ট

লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে প্রদত্ত এক অভিভাষণে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর জন বোমণ্ট ভারতীয় ফেডারেল কোর্টকে একটি "ব্যয়বহুল বিলাসিতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন:

"যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের তিন জন বিচারপতিকেই মাসে ১৮ হাজার টাকা বেতন দিতে হয়; ইহা ছাড়া কর্মচারী প্রভৃতির বেতন এবং অন্যান্য খরচা আছে। আমার মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের পিছনে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ হাজার পাউণ্ড খরচ হয় এবং ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রতি বৎসর গড়ে তিন চারি সপ্তাহের বেশী উহার কাজ হয় না।"

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা না দিবার পূর্বে ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠা মারাত্মক ভুল বলিয়া সর জন বোমণ্ট মনে করেন। তাঁহার মতে ফেডারেল কোর্টে আপীল করার জন্য যে সকল বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে তাহার শুনানি অতি সহজেই প্রিভি কাউন্সিলে হইতে পারিত। তিনি মনে করেন যে, ভারতরক্ষা আইন ও অর্ডিনান্সসমূহের বৈধতা সম্পর্কে সম্প্রতি হাইকোর্টগুলি যে রায় দিয়াছেন তাহার উপর ফেডারেল কোর্টের পরিবর্তে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল হইলেই ভাল হইত।

সর জন বোমণ্টের উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করা কঠিন। ফেডারেল কোর্টে আপীল প্রিভি কাউন্সিলে আপীল অপেক্ষা অল্প ব্যয়সাধ্য এবং ইহাতে সময়ও অনেক বাঁচে। জনসাধারণের তরফ হইতে ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট। ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ফেডারেল কোর্টের প্রয়োজন নাই ইহা ভ্রান্ত ধারণার পরিচয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফেডারেল কোর্ট স্থাপন অপরিহার্য্য। দুইটি প্রদেশের মধ্যে কোন বিষয়ে মামলার সৃষ্টি হইলে ভারতবর্ষে তাহার বিচারের কোন সুযোগ বা উপায় না থাকা ক্ষতিকর। কথায় কথায় প্রিভি কাউন্সিলে ছুটিবার পূর্বে এ দেশেই বিরোধের বা মতভেদের মীমাংসার আয়োজন থাকা আবশ্যক। ফেডারেল কোর্টের কতকগুলি মামলার রায়ে যে আইনজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ও বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই ইহা মনে করা অসম্ভব। মধ্য-প্রদেশের বিক্রয়কর সম্বন্ধে বিচারপতি সর শা সুলেমানের রায়ের উচ্চ প্রশংসা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর ল লেকচার প্রদানকালে বিখ্যাত পণ্ডিত কে. এইচ. মরগ্যান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন এই রায়ে বিক্রয়কর সম্বন্ধে যে প্রকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশের সর্বোচ্চ বিচারাদালতের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

—

বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক কংগ্রেসের উপর কটাক্ষপাত

ঐ বক্তৃতাতেই সর জন বোমণ্ট বলিয়াছেন: ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে প্রত্যক্ষভাবে শাসন-বিভাগের অধীনে রাখা অন্যায়। শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগকে আলাদা করা কংগ্রেসী দলের কার্য-তালিকার একটি প্রধান বিষয় ছিল, তবে কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্টসমূহ উহা কার্যকরী করার বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি মনে করেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশেই কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্টসমূহ উক্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন। সর জন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাযকলাপের নিন্দা করিয়া বলেন যে, উক্ত দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী কমিটি শাসনতন্ত্রের বাহিরে থাকিয়া নেপথ্যে ঐরূপ নির্দেশ দিয়াছে এবং তাহাদের কার্যের ফলেই কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়াছে।

শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগ পৃথক্ করিবার চেষ্টা কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টসমূহ করেন নাই ইহা সত্য নহে। যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের গবর্ন্মেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। সর্বপ্রথমে তাঁহারা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদের কার্যকলাপ, ক্ষমতা, দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সুগঠিত নিয়ম প্রণয়ন করিয়া এই বিভাগটিকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করেন। তাহার পরই তাঁহারা সাধারণ শাসন ও বিচার-বিভাগ পৃথক্ করণে প্রবৃত্ত

হন। ইহাতে ভারত-শাসন আইনটি তাহাদের সর্বপ্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এই আইনে বিচার-বিভাগের নিম্নতম কর্মচারীদের উপরেই শুধু হাইকোর্টকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, জেলা জজ প্রভৃতি সিভিলিয়ান কর্মচারীদের উপর হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। নিয়মতান্ত্রিক এই সব বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস গবর্মেণ্ট বিচার ও শাসন-বিভাগ যত দূর সম্ভব স্বতন্ত্র করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক উহা অনুমোদিতও হইয়াছিল। মন্ত্রীদের পদত্যাগে শেষ পর্য্যন্ত উহা কার্যকরী হইতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশ ছাড়া অন্যান্য কোন কোন প্রদেশেও এরূপ চেষ্টা হইয়াছিল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপর সর জন বোমণ্টের অভিযোগও অর্থহীন। বিচার ও শাসন-বিভাগ পৃথকীকরণ পরিকল্পনা হইতে বিরত থাকিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিমণ্ডলগুলিকে কোন নির্দেশ দিয়াছিলেন এরূপ কথা আমরা শুনি নাই। একটি প্রাদেশিক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পক্ষে এরূপ একটি গুরুতর মন্তব্য করিবার পূর্বে তৎসম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করা উচিত ছিল। তিনি তাহা করেন নাই। ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রীমণ্ডলগুলিকে যখন যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা নেপথ্য হইতে দেন নাই, প্রকাশ্যেই দিয়াছেন। নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত নির্দেশের আলোচনা করিয়াছে এবং উক্ত সমিতির সদস্য হিসাবে ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সদস্যবৃন্দ এবং মন্ত্রীরাও ঐ সব নির্দেশ সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। বিলাতের রক্ষণশীল দলের অথবা অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিক দলের 'পার্টি ককাস' পার্লামেণ্টের দলীয় সদস্যগণকে যে ভাবে নির্বিচারে ভোট দানে বাধ্য করেন, কংগ্রেসের ব্যবস্থা তার চেয়ে কম গণতন্ত্রমূলক নয়।

—

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব গত [illegible]ই বৈশাখ কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটী হলে অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বলেন যে, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত প্রথম বোম্বাইয়ে হয়, ইহাই অনেকে জানেন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাংলাদেশেই প্রথম শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চা-বাগানের কুলীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলিত তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের পত্তন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ছিলেন সাংবাদিক। তিনি 'সঞ্জীবনী'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনী, বেঙ্গলী ও অন্যান্য পত্রিকায় আসামের কুলীদের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছিলেন। কুলীদের অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য তিনি কুলী সাজিয়া আসামের চা-বাগানে কুলীদের সঙ্গে ছিলেন।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নির্ভীক, তেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কর্মকুশলতা ও কর্মনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নানাভাবে নানাদিকে দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। নারীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতি, সংবাদপত্র পরিচালনা, সমাজ ও ধর্মসংস্কার প্রভৃতি নানাদিকে তাঁহার দান অসাধারণ। নির্যাতিত ও অত্যাচরিতদের প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৮৭৬ হইতে ১৮৯৮ পর্য্যন্ত তিনি ভারত-সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। দেশের লোক তাঁহার কাছে নানাভাবে ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকার করার দিন আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন—শ্রমিক আন্দোলন দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া তিনিই প্রথম প্রকাশিত করেন। নারী-জাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কে একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া ডাক্তার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস বলেন—তিনি ছিলেন সত্যকারের মানুষ ইহাই তাঁহার সব চেয়ে বড় পরিচয়।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার মহান্ চরিত্র, তেজস্বিতা ও কর্মকুশলতার উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভানেত্রী লেডী অবলা বসু সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় যে বাণী প্রেরণ করেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যে কি রকম লোক ছিলেন তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অল্প লোকেরই দেখা যায়। সর্ব্বকর্ম্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কোথায় কোন নারী বিপদের সম্মুখে, তিনি প্রাণের ভয় ছাড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে গেলেন ; কোথায় জাতীয় সঙ্গীত বা কোন উৎসব সঙ্গীত দরকার, তিনি লিখিয়া দিলেন ; মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় নাই তিনি সকল শক্তি প্রয়োগ করিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় ; স্কুলপাঠ্য নাই তিনি বসিলেন লিখিতে। আমার যখন ৯ বৎসর বয়স তখন প্রথম স্বদেশী মেলা নবগোপাল মিত্র দ্বারা খোলা হয়, তখন তাঁহার উৎসাহ কত, আমাকে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত নিমাই সন্ন্যাস পদ্যটী মুখস্থ করাইয়া আবৃত্তি করাইবার জন্য সঙ্গে নিয়া গেলেন। সেই দিনের স্মৃতি এবং পরে যখন আমার পিতা ও মনোমোহন ঘোষ মিলিত হইয়া মিস এক্রয়েডের সহযোগিতায় হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, দ্বারকানাথের কর্ম্মপরায়ণতার স্মৃতি এখনও জাগ্রত আছে। পিতা ও মনোমোহন ঘোষ মহাশয় অর্থ যোগাইতেন ও পরামর্শ দিতেন, কিন্তু স্কুলের সমস্ত বন্দোবস্ত, এমন কি রুটিন পর্য্যন্ত দ্বারকানাথের। আমার পিতার গৃহে অনেক বয়স্কা মহিলা আশ্রিতা ছিলেন, তাঁহাদের সহিত আমাকেও আমার পিতা এই স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন। ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয় ইনি পড়াইতেন। ইণ্টালীতে স্কুল গৃহ ছিল, দ্বারকানাথ বোধ হয় মুসলমান-পাড়া লেনে থাকিতেন। প্রতিদিন ১০ টার সময় নিয়মিত সময়ে স্কুলে আমাদের পড়াইতে আসিতেন—এইরূপ পরিশ্রমী কর্ম্মী তিনি ছিলেন। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের পর বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়। এখানেও তিনি উৎসাহদাতা, সমস্ত শক্তি দিয়া স্কুল চালাইয়াছেন। এখানেও একটি ইংরেজী মহিলা ইংরেজী পড়াইতেন এবং বোর্ডিঙের তত্ত্বাবধান করিতেন। আমরা দ্বারকানাথের কাছেই পড়িয়াছি, স্কুলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মপ্রেরণা পাইয়াছি। এই মহাত্মার জীবনের আদর্শ ও কর্ম্ম দ্বারা আমাদের জীবন প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং প্রার্থনা করি ভবিষ্যৎ বংশও যেন তাঁর জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

—

বাংলায় ফসল-বৃদ্ধির চেষ্টা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কৃষিমন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মুয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন বাংলায় ফসল বৃদ্ধির জন্য গবর্ন্মেণ্ট যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করেন। বিবৃতির মূল বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"ফসল বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৪২-এর মার্চের শেষভাগে সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য লইয়া একটি খাদ্য-উৎপাদন কমিটি গঠিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে গত ২২শে জুনের পর এই কমিটির কোন বৈঠক আহ্বান করা নানা কারণে হইয়া উঠে নাই। কমিটি আড়াই লক্ষ মণ আমন ধান্যবীজ এবং ১৯,১২৫ মণ সরিষা, ছোলা ও ডাইল বীজ বিতরণের দুইটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই দুই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট যথাক্রমে ১৬,১২,০০০ টাকা এবং ১,৫৭,০০০ টাকা বরাদ্দ করেন। সোয়াই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ রোপণের সময় এক মণ লইয়া, ফসল উঠিলে সওয়া মণ ফিরাইয়া দিবার সর্ত্তে এই সব বীজ বিতরিত হয়। গত বৎসরের ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের সহায়তায় নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলিও মঞ্জুর হয় :—

(১) এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলাতী সব্জীর বীজ বিতরণের প্রস্তাব।

(২) পনেরো লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক লক্ষ মণ আলু-বীজ বিতরণের প্রস্তাব।

(৩) ৩,১৬,০০০ টাকা ব্যয়ে ২৬১ লক্ষ আখের কলম বিতরণের প্রস্তাব।

(৪) ৭,৬৮,০০০ টাকা ব্যয়ে ৪৮,০০০ মণ আউস ধান্য বীজ বিতরণের প্রস্তাব।

"নানা কারণে বিশেষতঃ ভাল বীজের অভাব, যান-বাহনের অসুবিধা প্রভৃতির জন্য উপরোক্ত পরিকল্পনা-সমূহ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই। যত দূর পর্য্যন্ত উহা কার্য্যকরী হইয়াছে তাহার বিবরণ :

১৯৪২-৪৩-এ বিতরণের পরিমাণ

আমনধান্য বীজ	২০৩,০০০ মণ
ছোলা "	৬৯৬২ "
ডাইল "	৭৮১১ "
সরিষা "	৪২১৭ "
বিলাতী সব্জী "	৮৬৬১ টাকার
আলু "	৩,২৮,০০০ "
আখের কলম	২৬০ লক্ষ।

আউসধান্য বীজ বিতরণের পরিমাণ জানা যায় নাই

"ফসল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য গত বৎসর বক্তৃতা, হ্যাণ্ডবিল, পোষ্টার, হোর্ডিং, কিওস্ক, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ প্রভৃতির সাহায্যে বিরাট প্রচারকার্য্য করা হইয়াছে। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক পরিষদের-সদস্য, জমিদার, জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, সভ্য এবং কৃষকদের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ফসল রোপণ, ফসল তুলিবার সময় প্রভৃতির বিজ্ঞাপন সম্বলিত ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ক্যালেণ্ডার প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছে।

"এতদ্ব্যতীত প্রধানতঃ বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য এক লক্ষ টাকা এবং ফসল বৃদ্ধির জন্য কৃষি ঋণ হিসাবে দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

"ফসল-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উপরেই কমিটি সর্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁক দিয়াছিলেন। ভাল বীজ, ভাল যন্ত্রপাতি এবং ভাল গবাদি পশু ব্যবহারে যে বেশী লাভ হয় কৃষকদিগকে ইহা বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। আবর্জনা পচানো সার তৈয়ারির উপায়ও তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয়। প্রচারকার্যের জন্য কাগজপত্র প্রভৃতি যথাসময়ে সরবরাহের সুবন্দোবস্তের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। বাংলা ভাষায় বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে এবং স্পেশাল অফিসারের প্রস্তাবে "খাদ্য-উৎপাদন" নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করিয়া উহা বিতরণের জন্য মহকুমা হাকিমদের নিকট প্রেরিত হইতেছে।"

বাঙালী কৃষক নিরক্ষর হইলেও তাহাকে ফসল বা সব্‌জী বুনিবার ও তুলিবার সময় প্রভৃতি জানাইয়া কাগজ ও অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা আছে কি না আমরা জানি না। কৃষককে সার সরবরাহ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল, অথচ উহা আদৌ করা হইয়াছে বলিয়া কৃষিমন্ত্রী বলেন নাই। কৃষি-ঋণ বা বীজ যাহা দেওয়া হইয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা পর্যাপ্ত হইয়াছিল কি না তাহাও উল্লেখ করা হয় নাই। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইম্পিরিয়াল কেমিকেলের বড় সাহেব মিঃ সি পি লসন্ বাংলার কৃষি সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উহাতে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা ছিল। বক্তৃতা শেষে আলোচনার সময় জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, "বিনা সারে বৎসরের পর বৎসর জমিচাষের ফলে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি কমিয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের দোহাই, ভারতীয় কৃষককে কৃষি শিখাইতে যাইও না, তোমার আমার চেয়ে অনেক ভাল কৃষিবিদ্যা তাহার জানা আছে। কৃষককে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার সরবরাহ করিতে হইবে। ভারতীয় কৃষককে রক্ষা করিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।"

১৯৪২ সালের ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলনের ফল

১৯৪২-এর মার্চ মাসে যে ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা এবং বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য কাগজ প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছে, সারা বৎসরে তাহার কি ফল হইয়াছে তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঐ দিনই অর্থাৎ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখেই, আন্দোলনের ফল জানিতে চাহিয়া মৌলবী নূর আমেদ প্রশ্ন করিলে কৃষিমন্ত্রী ১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ধানজমির পরিমাণ বিবৃত করেন :

বৎসর	একর জমি
১৯৩৮	২১,৯৮৮,০০০
১৯৩৯	২২,২৫৫,১০০
১৯৪০	২০,৭৭০,৩০০
১৯৪১	২৩,৮৪৩,০০০
১৯৪২	২৩,২৯৩,৯০০

১৯৪৩-এর হিসাব প্রস্তুত হয় নাই।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং হায়দরাবাদ রাজ্যে ঐ বৎসর ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলন কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ টাইসন তাহা বিবৃত করেন :

প্রদেশ	১৯৪১-৪২-এ যে জমিতে চাষ হইয়াছে তদপেক্ষা ১৯৪২-৪৩-এ কর্ষিত বেশী জমির পরিমাণ	
আসাম	১,১১,০০০	একর
বাংলা	—৬,৬০,০০০	
বিহার	৮,৩৫,০০০	
বোম্বাই	১৪,৫০,০০০	
মধ্য প্রদেশ	৭,৫০,০০০	
মাদ্রাজ	৭,৪৩,০০০	
উড়িষ্যা	২,১৯,০০০	
পঞ্জাব	৭,৫১,০০০	
সিন্ধু	৫৭,০০০	
যুক্ত প্রদেশ	১৬,৫২,০০০	
হায়দরাবাদ	২১,৯৪,০০০	
	৮১,০২,০০০	,,

মিঃ টাইসন বলেন, তুলার চাষ ৪০ লক্ষ একর জমিতে

কমাইয়া দেওয়ার জন্যই এই ৮১ লক্ষ একরে খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত তুলার চাষ কমাইয়া দিয়া খাদ্যশস্যের চাষ বাড়ানো হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কৃষিমন্ত্রী তাঁহার প্রথম বিবৃতি দাখিল করিলে জনৈক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, গত বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪২, অপেক্ষা এবার, অর্থাৎ ১৯৪৩-এ পাটের চাষ বাড়িয়াছে কি না। উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, "আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে সাধারণ অভিমত এই যে, এবার পাটচাষ কিছু বেশী হইয়াছে।" অতঃপর অপর এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী জানান, "এ বৎসর পাটের জমি গত বৎসর অপেক্ষা বেশী হইয়াছে, কারণ গত বারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাটের জমির পরিমাণ যেখানে ছিল আট আনা, এবার সেখানে দশ আনা হইয়াছে।" ১৯৪৩-এর ২৮শে জুলাই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব সর মহম্মদ আজিজুল হক স্বীকার করেন যে, জুট এডভাইসরী কমিটিতে পাটচাষীদের যে-সব প্রতিনিধি আছেন তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাটচাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো হইয়াছিল। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরে যখন অন্যান্য প্রদেশ অনাবশ্যক অর্থকরী ফসলের চাষ কমাইয়া খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়াছে, বাংলায় সেই সময় পাটের চাষ বাড়িয়াছে। পাটচাষ কমাইয়া দিলে পাটচাষীর আর্থিক লাভের যেমন সম্ভাবনা ছিল, উহাতে ফসল বৃদ্ধিরও তেমনি সহায়তা হইত।

—

খাদ্য-উৎপাদন কমিটির কর্মতৎপরতা

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক সদস্য খাদ্য-উৎপাদন কমিটির কার্য-কলাপ জানিতে চাহিলে বর্তমান কৃষিমন্ত্রী বলেন, "আমরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর কমিটির একটি বৈঠক হইয়াছে এবং কমিটি কোন কোন বিষয়ে আমাদিগকে পরামর্শও দিয়াছে। আগামী শনিবার উহার আর একটি অধিবেশন হইবে।" শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস জানিতে চাহেন, ব্যবস্থা-পরিষদের উভয় কক্ষের সদস্য লইয়া ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য একটি কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা গবর্মেণ্ট স্বীকার করেন কি না?- উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, খাদ্য-উৎপাদন কমিটি একটি তো আছেই। তবে গবর্মেণ্ট উহার পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা করিতেছেন" এবং কমিটি পুনর্গঠিত হইলে ব্যবস্থা-পরিষদের উভয় কক্ষ হইতেই উহার সদস্য সংগৃহীত হইবে।

এপ্রিল মাসে কার্যভার গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে খাদ্য-উৎপাদন কমিটির বৈঠক ডাকিবার সময় পান নাই। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠনের আবশ্যকতাও তাঁহারা অনুভব করেন নাই।

—

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ

বরিশাল, ২২শে এপ্রিল

জানা গিয়াছে যে, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের গবর্ণিং বডিকে এই মর্মে এক আদেশ জানাইয়াছেন যে, গবর্ণিং বডি যদি অধ্যাপিকা মিস্ শান্তিসুধা ঘোষ, অধ্যাপক প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী ও শ্রীযুত সুধীরকুমার আইচকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত না করেন, তবে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ, শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত সুধীরকুমার আইচ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতরক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে গ্রেপ্তার ও নিরাপত্তা বন্দীরূপে বিনাবিচারে আটক হন। শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত আইচ এখনও জেলে আছেন এবং কুমারী ঘোষকে বিনাসর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিনা বিচারে বন্দী থাকা কাল পর্য্যন্ত গবর্ণিং বডি তাঁহাদিগের ছুটি মঞ্জুর করেন।

বরিশালের স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত ১৮৮৪ সালে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটিকে একটি কলেজে পরিণত করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৮৮৯ সালে তাঁহার তিন পুত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত, কামিনীকুমার দত্ত এবং যামিনীকুমার দত্ত বর্তমান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ সালে বি-এ ক্লাস খোলা হয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত ওকালতিতে তখন বিস্তর অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। ১৯১২ সালে দত্ত-ভ্রাতারা একটি ট্রাষ্টডীড সম্পাদন করিয়া কলেজটিকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করেন। একটি কলেজ কাউন্সিলের হাতে কলেজ পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। গবর্মেণ্ট, কলেজের প্রাক্তন স্বত্বাধিকারী এবং জনসাধারণ সকলের প্রতিনিধি লইয়া কলেজ কাউন্সিল গঠিত হয়। স্বত্বাধিকারীদের মনোনীত তিন জন, গবর্মেণ্টের মনোনীত তিনজন, অভিভাবকগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিন জন,

শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন এবং কলেজের প্রিন্সিপাল—এই ১১ জন লইয়া বর্তমান গবর্ণিং বডি গঠিত। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উহার সভাপতি। এই গবর্ণিং বডি রাজবন্দীদের ছুটি মঞ্জুর করিয়া থাকিলে সেই প্রস্তাব আলোচনা কালে গবর্মেণ্ট তাঁহাদের মনোনীত সদস্যগণ মারফৎ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। যে গবর্ণিং বডিতে প্রভাবশালী সরকারী সদস্যগণ বর্তমান, তাহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া গণতন্ত্রসম্মত নীতি। গবর্মেণ্ট কলেজকে মাসিক ১২০০ টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন; গবর্ণিং বডির সিদ্ধান্ত পাণ্টাইয়া দিবার জন্য এই সাহায্য বন্ধ করিবার হুমকী দেওয়া ন্যায়, সুনীতি বা গণতান্ত্রিকতা কোনটিরই পরিচায়ক নহে।

—

ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ

দিল্লী প্রাদেশিক অহ্রর সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি শেখ হিসামুদ্দীন তাঁহার অভিভাষণে বলেন,

"পাকিস্তানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, কারণ উহা নেতিমূলক মনোভাব ও বিদ্বেষ হইতে সৃষ্ট। ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হইতেছে সংখ্যালঘিষ্ঠই হউক বা সংখ্যাগরিষ্ঠই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে ব্যাহত না হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায় অবহিত থাকে, তাহারই ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা। এই মহৎ আদর্শ শুধু ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিলে রক্ষা করা হইবে না। বরং উহা সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে আরও বিষাইয়া তুলিবে।"

ভারতবর্ষের মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক সর সৈয়দ আমেদ তাঁহার স্বধর্মীদের রাষ্ট্রীয় ধারণা ও কর্তব্যপথ স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানকে কখনও তিনি একটি বিচ্ছিন্ন পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে চাহেন নাই। ১৮৮৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে গুরুদাসপুরে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন ঐতিহাসিক পুস্তকে আপনারা পড়িয়াছেন এবং প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছেন যে, একটি দেশে যে জনসমষ্টি বসবাস করে তাহাদিগকে এক জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। আজও ইহাই আমরা দেখিতেছি।...পরস্পরের মধ্যে নিজস্ব কতকগুলি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই দেশের অধিবাসিবৃন্দকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এক জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ, আপনারা কি হিন্দুস্থান ভিন্ন আর কোন দেশে বাস করেন? একই মাটির উপর কি আপনাদের বাসভূমি গড়িয়া উঠে নাই? একই মাটিতে কি আপনাদের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত অথবা প্রোথিত হয় না? মনে রাখিবেন হিন্দু ও মুসলমান এই শব্দ দুটি কেবল ধর্মের পার্থক্য সূচিত করে—তাহা ছাড়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান যাঁহারাই এই দেশে বাস করেন তাঁহারা সকলেই উপরোক্ত অর্থে একই জাতির লোক। ধর্মমত আমাদের ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা এক; দেশের সাধারণ মঙ্গলের জন্য সকলেরই মিলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

কিছু দিন পর লাহোরে এক বক্তৃতায় আবার তিনি বলেন, "জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গেলে আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই তাহার অন্তর্ভুক্ত করিব, কারণ এই শব্দটির এই একটি মাত্র অর্থই আমি বুঝি। আমরা একই দেশে বাস করি, সকলেই আমরা একই শাসনকর্তার অধীন, কোন মঙ্গলজনক কাজ হইলে আমরা সকলেই যেমন তাহার অংশভাগী হই, তেমনি দুর্ভিক্ষের বেদনাও আমরা সমানভাবেই ভোগ করি। এই সব কারণে আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী এই দুই কুলের (race) লোককেই একটি মাত্র শব্দের, অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিসাবে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চাই।"

মিঃ জিন্না অথবা আধুনিক কালের যে-কোন মুসলমান-নেতা অপেক্ষা মুসলমান সমাজের জন্য সর সৈয়দ আমেদের দান অনেক বেশী ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। মুসলমান সমাজকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সঙ্কীর্ণচিত্ত, দুর্বল এবং অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে তিনি চাহেন নাই। ভারতীয় মুসলমানেরা যে সময়ে শুধু আরবী ফার্সী চর্চায় মত্ত, সর সৈয়দ সেই সময়ে আলিগড়ে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজী ভাষা এবং আধুনিক উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, আলিগড়কে কেন্দ্র করিয়া মুসলমান সমাজকে অপর সকলের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া লইবার কথা তিনি কল্পনা করেন নাই।

পঞ্জাবে লীগ প্রাধান্য স্থাপনে মিঃ জিন্নার আগ্রহ

সর সেকান্দর হায়াৎ খাঁর জীবিত কালে মিঃ জিন্না পঞ্জাবে নামতঃ মুসলিম লীগের প্রভাব প্রসারে সমর্থ হইলেও তাহার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার সর্বময় ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পঞ্জাবে তাঁহার

ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি তিনি প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাকার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর দৃঢ়তার জন্য এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

মিঃ জিন্না মালিক খিজির হায়াৎ খাঁকে যে সকল সর্তে সম্মত হইতে বলিয়াছিলেন তাহা এই :—

(১) পঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের সমস্ত লীগ সদস্যই ঘোষণা করিবেন যে, তাঁহারা সকলে কেবলমাত্র পরিষদের মুসলীম লীগ দলের আনুগত্য স্বীকার করিবেন এবং ইউনিয়নিষ্ট বা অপর কোন নামধেয় কোন দলে থাকিবেন না।

(২) সরকারী দলের বর্তমান "ইউনিয়নিষ্ট" নাম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৩) প্রস্তাবিত কোয়ালিশন দলের নাম হইবে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন দল।

মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ, সর্দার বলদেব সিংহ এবং সর ছোটু রাম কেহই মিঃ জিন্নার এই সব প্রস্তাবে রাজি হইতে পারেন নাই। প্রধান মন্ত্রী জিন্না সাহেবের প্রস্তাবে প্রবল অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"প্রস্তাবের প্রধান বিষয়বস্তু পঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট পার্টি অপেক্ষা মুস্লিম লীগকেই মুসলমানদের প্রধান ও একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে। আমার অ-মুসলমান সহকর্মিগণ পঞ্জাবের মুস্লিম সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতা করার একান্ত আগ্রহ লইয়াই এই প্রস্তাবে সম্মত হন। যাহাতে এই চুক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই একান্ত উচিত ছিল। কিন্তু তৎপরিবর্তে পঞ্জাবে মুস্লিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অস্ত্ররূপে আমাকে কাজে লাগাইবার যে চেষ্টা চলিয়াছিল তাহা অতীব দুঃখজনক।

"১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগত মিঞা সর ফজলী হোসেন ইউনিয়নিষ্ট পার্টি গঠন করেন। উক্ত পার্টি-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের উন্নতির জন্য এক কর্মপন্থা লইয়া পরিষদে কার্য করিবে ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ১৯৩৬ সালের বসন্তকালে মিঃ জিন্না কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি মুস্লিম লীগের টিকেটে প্রার্থী নির্বাচন করাইবার জন্য সর ফজলী হোসেনকে পীড়াপীড়ি করেন এবং নির্বাচনের ফল বাহির হইলে অপরাপর অ-মুসলমান দলের সহিত চুক্তি করিতে বলেন কিন্তু মিঞা সাহেব তাঁহাকে জানান যে, একই প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ থাকায় পঞ্জাবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এরূপ একটা চুক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে।

"১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর পঞ্জাবে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইল তাহা লীগ-মন্ত্রিসভা না হওয়ায় মুস্লিম লীগ ও ইহার নেতা মিঃ জিন্না সমস্ত সর্বভারতীয় আলাপ-আলোচনায় খুব একটা অসুবিধায় পড়িয়া যান। মিঃ জিন্না যাহাতে সমগ্র মুস্লিম সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে কথা বলিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে সেকান্দর-জিন্না চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে এই সর্ত থাকে যে, সর সেকান্দর হায়াৎ খাঁ তাঁহার দলের সকলকে মুস্লিম লীগ দলের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। ইহার পর হইতে সেকান্দর-জিন্না চুক্তি অনুসারে মন্ত্রিসভার কার্য চলিতে থাকে। সর সেকান্দরের মৃত্যুর পর মিঃ জিন্না দিল্লীতে নিঃ-ভাঃ মুস্লিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে সেকান্দর-জিন্না চুক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক দিক হইতে পঞ্জাবে মুস্লিম লীগ পার্টির অস্তিত্ব থাকিলেও ইহার তেমন কোন কার্যকলাপ নাই। আমি কাউন্সিলকে এই প্রতিশ্রুতি দিই যে, আমি পঞ্জাবের লীগ পার্টিকে সজীব করিয়া তুলিব। মিঃ জিন্না আমাকে ইহার প্রতিদানে এই আশ্বাস দেন যে, তিনি পঞ্জাবে সেকান্দর-জিন্না চুক্তি এবং ইউনিয়নিষ্ট পার্টির নাম ও কর্মতালিকা মানিয়া লইবেন। তিনি প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াও আমাকে কথা দেন। আমি একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে আমার কথা রাখিয়াছি। কিন্তু মিঃ জিন্না তাঁহার কথার খেলাপ করিয়া প্রাদেশিক এবং মন্ত্রিসভার সমর্থক দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই মনোভাবের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই এবং ডিক্টেটরী পন্থা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না"

মিঃ জিন্না এই ব্যর্থতায় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। পঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান মন্ত্রীদল-সমর্থক কয়েকজনকে তিনি বিরোধী দলে সরাইয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল তিনি ভাঙিতে পারেন নাই। মন্ত্রীদের মধ্যে মাত্র একজনকে জিন্না সাহেব দলে টানিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হয় নাই।

—

পঞ্জাবী মন্ত্রী সৌকৎ হায়াৎ খাঁর পদচ্যুতি

পঞ্জাবের গবর্ণর মন্ত্রী সৌকৎ হায়াৎ খাঁকে পদচ্যুত করিয়াছেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থনেই পদচ্যুতির আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন একটি ব্যাপারে গুরুতর অবিচার

তাঁহার দ্বারা ঘটিয়াছিল, পদচ্যুতি ঘোষণা করিয়া যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হয় তাহাতে শুধু এইটুকুরই উল্লেখ ছিল। পরে জানা গিয়াছে লাহোর কর্পোরেশনের স্কুলসমূহের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিসেস দুর্গাপ্রসাদের অন্যায় পদচ্যুতিই ইহার কারণ। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই: কর্পোরেশনের জনৈক মুসলমান শিক্ষয়িত্রীর আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য মিসেস দুর্গাপ্রসাদকে ভার দেওয়া হয়। তিনি তদন্ত আরম্ভ করিতে গেলে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা জানান যে তাঁহাকে সরকারী আদেশে পদচ্যুত করা হইয়াছে। তাঁহার নামে কয়েক দফা অভিযোগ আরোপিত হয়। বিভাগীয় তদন্তে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে মিসেস দুর্গাপ্রসাদ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পুনর্নিয়োগ প্রার্থনা করেন। কমিশনার তাঁহাকে গবর্ণরের নিকট আবেদন করিতে বলিলে তিনি তাহাই করেন। মন্ত্রী সৌকৎ হায়াৎ খাঁর আদেশে এই গুরুতর অবিচার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গবর্ণর তাঁহাকে মন্ত্রী পদের অনুপযুক্ত মনে করিয়া পদচ্যুত করেন।

ঘটনার দিক দিয়া সৌকৎ হায়াৎ খাঁর পদচ্যুতি সমর্থনযোগ্য হইলেও ইহাতে একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে। অন্যায় কার্য্যের জন্য গবর্ণর কর্তৃক মন্ত্রীর পদচ্যুতি নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির বিরোধী। এরূপ ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রী অপরাধী মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র দাবী করেন এবং তিনি পদত্যাগ না করিলে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং পদত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বাদ দিয়া মন্ত্রিমণ্ডল পুনর্গঠন করেন। ভারতবর্ষেও নিয়মতান্ত্রিক শাসনের এই মূল নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত।

—

কৃষি-আয়কর বিল

বাংলা দেশের কৃষির উপর আয়কর ধার্য্য হইতে চলিয়াছে। কৃষি-আয়কর বসাইবার জন্য ফ্লাউড কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এত সত্বর তাহা কার্যে পরিণত করিবার আবশ্যকতা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যই হইতে পারে। বর্তমান অবস্থায় এই বিল পাস হইলে অধিক ফসল উৎপাদন চেষ্টায় কোনরূপ বাধা পড়িবে কিনা তাহাও বিবেচ্য। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কয়লার খনিসমূহের প্রতিনিধি সর হেনরী রিচার্ডসনের বক্তৃতা হইতে এই ধারণা হয় যে, অতিরিক্ত আয়কর বসাইবার ফলে কয়লার খনিগুলি আশানুরূপ লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণ সময় অপেক্ষা অনেক কম কয়লা উত্তোলনের ইহা একটি বড় কারণ। সাধারণ আয়করের যেমন একটা মানদণ্ড আছে, কৃষি-আয় মাপিবার সেরূপ মানদণ্ড পাওয়া যায় না। বাংলার বিভিন্ন জেলার ফসল উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ উভয়ই ভিন্ন। একই জেলায়, এমন কি একই গ্রামের বিভিন্ন জমিতে সমান পরিমাণে অথবা সমান উৎকৃষ্ট ফসল ফলে না; কাজেই সমগ্র দেশে প্রযোজ্য একটি মাত্র মাপকাঠি দ্বারা সকলের কৃষি-আয় মাপা অসম্ভব। যাঁহাদের উপর আয়-নির্দ্ধারণের ভার পড়িবে তাঁহাদের দক্ষতা এবং সাধুতার উপর কর ধার্য্যের ন্যায়-অন্যায় নির্ভর করিবে। জমিতে সার দিয়া অথবা উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করিয়া যাহারা ভাল ফসল বেশী পরিমাণে উৎপাদন করিবে তাহাদের উপরেও করধার্য্য করিবার কোন সাধারণ মাপকাঠি বজায় রাখা অসম্ভব। এখানেও ব্যক্তিগত ভাবে আয় এবং কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বিনা বিরোধে কর ধার্য্য এবং আদায় উভয়ই সমান কঠিন, আয়কর আদায় হইতেই ইহা বুঝা যায়। এক্ষেত্রে সর্বত্র সমান ভাবে প্রযোজ্য মাপকাঠির অভাবে উহা আরও শক্ত এবং অধিকতর বিরোধের কারণ হইতে পারে।

বিলটি এখনও আইনে পরিণত হয় নাই। আয়কর আদায় করিতে গিয়া সম্পন্ন কৃষকদের সহিত কর-আদায়কারীদের বিরোধ ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক নহে, ইহা দ্বারা পরিণামে খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া স্বাভাবিক সময় না আসা পর্যন্ত বিলটি স্থগিত রাখা উচিত বলিয়া মনে করি। বর্তমান সময়ে ফসল-বৃদ্ধির চেষ্টা কোনক্রমেই মন্দীভূত হওয়া সমীচীন নহে।

—

কৃষি-আয়কর বিল হইতে বিলাতী কোম্পানীদের অব্যাহতি

করপ্রদান যে প্রীতিজনক কার্য নহে, কৃষি-আয়কর বিল হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বিলাতী কোম্পানীগুলি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। অপরের পরিশ্রমের ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা যাঁহারা উপার্জন করিতেছেন কর দিতে যদি তাঁহাদেরই আপত্তি হয় তাহা হইলে ঝড় বৃষ্টিতে ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া যাহারা মাটিতে নামিয়া স্বহস্তে ফসল ফলাইতেছে তাহারাই বা কর এড়াইতে চাহিবে না কেন? বিলাতী চা-ওয়ালারা রাগ করিয়া চা উৎপাদন কমাইয়া দিলে দেশের মারাত্মক অনিষ্ট কিছু হইবে না, কিন্তু কৃষক কর দানের অনিচ্ছায় অথবা কর-আদায়কারীর সহিত বিরোধের ফলে ফসল উৎপাদন কমাইয়া দিলে সকলেরই ক্ষতির সম্ভাবনা।

কৃষি-আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া যেভাবে

বণিকেরা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার উপযোগিতা দেশবাসী স্বীকার করিবে না। বিলাতের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীগণ বাংলা হইতে চা ও অন্যান্য ব্যবসায়ে যে উপার্জন করেন বিলাতে তাহার উপর কর লওয়া হয় এই অজুহাতে কৃষি-আয়কর বিলের আওতা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য মিঃ ওয়াকার যে সংশোধন প্রস্তাব আনেন বাংলা-সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল মিঃ ওয়াকারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"ইউরোপীয় দল নিজেদের ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া যতই জাহির করুন না কেন, এ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিলাতের স্বার্থই তাঁহাদের কাছে প্রধান। মিঃ দত্ত ইউরোপীয় দলকে বিদেশী বলিয়াছেন বলিয়া ইউরোপীয় দল বেজায় চটিয়াছেন। ইউরোপীয় দল কি এই দাবী করিতে পারেন যে, প্রধানতঃ এই দেশের কল্যাণের জন্যই তাঁহারা এখানে রহিয়াছেন? ইউরোপীয় দল পরিষদে ভারতের সন্তান হিসাবে আসেন নাই, তাঁহারা আসিয়াছেন হোয়াইট হলের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে। আমি এই কথা বলিতে চাই যে, এই ইউরোপীয় দলের জন্যই বাংলাদেশের গবর্মেণ্ট ভালভাবে চলিতে পারিতেছে না। এই ইউরোপীয় দলের জন্যই কৃষি-আয়কর বিল বিকৃত রূপ ধারণ করিতেছে। বিলের আলোচনার প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছে যে, ইউরোপীয় দলের অনেক সংশোধন প্রস্তাব মিঃ গোস্বামী মানিয়া লইয়াছেন। মিঃ গোস্বামী সেইগুলি সত্যকারের কাজের বলিয়া মানিয়া লন নাই, ইউরোপীয় দলের ফতোয়া হিসাবে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি ইউরোপীয় দলকে গালাগালি দিবার জন্য এই সমস্ত কথা বলিতেছি না, আমি শুধু গবর্মেণ্টকে দেখাইতে চাই যে, ইউরোপীয় দল বর্তমান গবর্মেণ্টকে কোন্ অতলে টানিয়া নামাইয়াছেন। ১৬ মাস আমরা গবর্ণমেণ্ট দলে ছিলাম এবং সেই জন্যই আমরা জানি যে, যত দিন পরিষদে কোন বিশেষ দলকে জিতাইয়া দিবার ক্ষমতা ইউরোপীয় দলের থাকিবে তত দিন পর্য্যন্ত কোন মন্ত্রিসভা বাংলায় সত্যকারের কাজ করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় মন্ত্রিসভাকে হয় বিবেক ও দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হইবে, না হয় মন্ত্রিত্ব ছাড়িতে হইবে। ভূতপূর্ব মন্ত্রিসভা ও তাঁহার সমর্থকগণ সেই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছেন এবং আমি সরকারপক্ষকে এই আশ্বাস দিতে পারি। কারণ ইউরোপীয় দলের মুসলিম লীগই এখন শেষ আশ্রয়। আমি চাই যে মুসলিম লীগও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন এবং ইউরোপীয় দলকে এক ইঞ্চি জমিও না ছাড়িয়া যতখানি সম্ভব আদায় করিয়া লউন। বেয়াড়া ছেলের মত ইউরোপীয় দল 'আবদার' ধরিলেন যে, যেহেতু তাঁহারা বিলাতে কর দেন সেই জন্য বাংলায় তাঁহারা কর দিবেন না। ইউরোপীয়গণ বাংলাদেশ হইতে চা ও অন্যান্য ব্যবসা হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিবে অথচ কর দিবে না—এ এক বিচিত্র আবদার। তাঁহারা দুই বার ট্যাক্সের দোহাই পাড়িয়াছেন। কিন্তু এখানকার লোকেরা কি দুই বার ট্যাক্স দেয় না? 'ইনকাম ট্যাক্সে'র উপরও কি 'উপার্জন-ট্যাক্স' লওয়া হয় না? দেওয়ার সামর্থ্য যাহাদের আছে তাহাদের অবশ্যই দিতে হইবে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চা-কর সাহেবেরা বাংলা দেশকে শোষণ করিতেছে—

মিঃ হেউড—ননসেন্স।

শ্রীযুক্ত সান্যাল—আপনাদের উক্তি নির্লজ্জ অর্বাচীনতারই পরিচায়ক। যুক্তির যেখানে অভাব অর্বাচীন উক্তিই সেখানে একমাত্র সম্বল। সুতরাং ইউরোপীয় দলকে আপাততঃ অগ্রাহ্য করিয়া আমি এই পরিষদে দেশের সত্যকারের প্রতিনিধিদের বলিতে চাই যে, তাঁহারা ইউরোপীয় দলকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিন যে, এই দেশে থাকিতে হইলে ইউরোপীয়দের 'প্রভু' হিসাবে থাকা চলিবে না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় বণিক ভারত হইতে যে অপর্য্যাপ্ত অর্থ শোষণ করিয়াছে তাহার খানিকটা ছাড়িতে হইবে।"

বিলাতী ব্যবসায়ীরা এই প্রকার আয়ের উপর কর হইতে রেহাই পাইবার জন্য বিলাতে দরবার করিতে পারিতেন। কিন্তু সেই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া এইখানেই তাঁহারা বশংবদ মন্ত্রীদের সাহায্যে কার্যসিদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। বিলাতী আয়কর আইনে এরূপ একটি ধারা আছে যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে আয়ের উপর একবার কর দেওয়া হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ দেখাইতে পারিলে ঐ আয়ের উপর বিলাতে কর লওয়া হইলে বিলাতের করের অর্দ্ধেক পরিমাণ পর্য্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হয়। শ্বেতাঙ্গেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা আয়ের সবটাই ভোগ করিতে চান।

প্রফুল্লকুমার সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড এবং সাপ্তাহিক 'দেশ' এই তিনটি পত্রিকারই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই তাঁহার সকল প্রতিভা সীমাবদ্ধ

হয় নাই। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলি সাহিত্যিক সমাজে আদৃত হইয়াছিল। অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘেরও প্রতিষ্ঠাতাদেরও অন্যতম। প্রফুল্লকুমারের পরিজন-বর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিছু দিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তাহার উপর সম্প্রতি তাঁহার একমাত্র যুবক পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়ে। সতীশচন্দ্রের সুপরিচালনায় বসুমতীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছে। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে স্বল্পমূল্যে বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থাবলী প্রকাশের দ্বারা তিনি জনশিক্ষা বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে 'বসুমতীই' রোটারী যন্ত্র ব্যবহারের পথ-প্রদর্শক। গত দুর্ভিক্ষে সতীশচন্দ্রের পরিচালনাধীনে 'বসুমতী' যে অসামান্য নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর অভাব ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙালী চিরকাল তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

বাংলা-সরকারের কয়েকটি কার্য

তাঁতের কাপড়ের উপর বিক্রয়-কর প্রথম স্থাপিত হইল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সর জেমস্ লায়ালের সভাপতিত্বে গঠিত দুর্ভিক্ষ-কমিশন তন্তুবায়দিগকে বিশেষ সাহায্য দিবার নির্দেশ দেন। বাংলা-সরকার যে মূল্যের তাঁতের ধুতি ও শাড়ী রেহাই পাইবে বলিয়াছেন তাহাতে শতকরা ৯০ ভাগ তাঁতের ধুতি ও শাড়ীকে বিক্রয়-কর বহন করিতে হইবে। এখন দেশবাসীর কর্তব্য, যে-মূল্যে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায় সে-মূল্যে কলের কাপড়ের পরিবর্তে বাংলার তাঁতের ধুতি-ও শাড়ী কিনিয়া দুর্ভিক্ষান্তে দারিদ্র্যজর্জরিত তন্তুবায়-দিগকে বাঁচান। এখনও বঙ্গদেশে প্রায় ২ লক্ষ লোক তাঁত চালায় এবং ইহাদের অর্দ্ধেকের অধিক মুসলমান।

বাৎসরিক ৩৫০০ টাকা আয়ের উপর কৃষি-আয়কর বসান হইতেছে। ইহাতে বঙ্গদেশে জমিদারীর আয়ের একটা মোটা অংশ রাজকোষে এরূপ ভাবে টানিয়া আনা হইতেছে যে ভবিষ্যতে জমিদাররা ফ্লাউড কমিশনের অন্যায় মূল্যেও জমিদারী বিক্রয় করিতে পথ পাইবেন না। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অর্থনীতিবিদেরা এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথাই অতীতে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে ইহার প্রচলন নাই সেখানেও ইহার প্রবর্ত্তনের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন জমিদারের সাহায্য ব্যতীত হইত না এবং এখনও শিক্ষার ব্যয়ের একটা মোটা অংশ তাঁহারা বহন করেন। বাংলার এই সকল স্কুল-কলেজে শিক্ষিত শিক্ষক, অধ্যাপক ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়াছেন। গত স্বদেশী আন্দোলন না আসিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত আজ অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া থাকিত ও যে শিল্পসংরক্ষণ-নীতির ফলে দেশে বৃহৎ কলকারখানার উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে তাহাও ভারত-সরকার অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন না। কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বাংলার জমিদাররা মুক্তহস্তে দান না করিলে প্রবল হইতে পারিত না। আজ বংশবিস্তারের ফলে ধনী জমিদারের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ও তাঁহাদের স্থলে গ্রামবাসী এক বিরাট সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। সাড়ে তিন হাজার টাকার আয়ের উপর কর বসাইলে ইহারা ছেলেকে শিক্ষিত করিবেন কিরূপে এবং ছোটখাট কারবার করিবার মূলধনই বা দিবেন কোথা হইতে? এইরূপ ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর সংখ্যা মুসলমানের মধ্যেও দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। গত ফসলের পাটের লাভের ৪০ কোটি টাকা মন্ত্রিমণ্ডল প্রধানতঃ ইংরেজ কলওয়ালাদের হাতে তুলিয়া দিলেন। ৩৫ সের পাটের গড় মূল্য ১৪ টাকা ও ৩৫ সের পাট হইতে উৎপন্ন ১০০ গজ চটের দাম ২৮ টাকা বাঁধিয়া দিয়া তাঁহারা এই কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। জমিদারীর আয় ১১ কোটি টাকার অধিক নহে। আর এই টাকাটা দেশের সহস্র সহস্র লোক ভাগ করিয়া খাইতেছে। প্রধানতঃ বিদেশীয়েরা অন্যায় ভাবে যে ৪০ কোটি লইয়া যাইতেছে সেই কার্য আইনের দ্বারা বলবৎ করিয়া দেশের লোকের ১১ কোটির দিকে ইহারা লোলুপ দৃষ্টি দিতেছেন।—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

—

সপ্তাহে দুই দিন মাংস ব্যবহার বন্ধ করার পর হইতে মাছের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ও বঙ্গোপসাগরের মেদিনীপুর জেলার নিকটবর্তী উপকূলে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। স্থানীয় মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কতকগুলি মোটর এঞ্জিন আদায় করিয়া বার্ণ এণ্ড কোং প্রভৃতির কারখানায় কতকগুলি লঞ্চ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে লাগাইয়া অনায়াসে মাছ চালানের বন্দোবস্ত সরকার করিতে পারেন। বাঙালী মৎস্যব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ননীলাল গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স সুন্দরবন অঞ্চলে মোটর-লঞ্চের সাহায্যে মাছ চালানের কার্য যে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা বৃহৎ আকারে করিতে পারিলে সরকার সিংহলের ন্যায় এখানেও সপ্তাহে চারিটি এমন কি ছয়টি মাংসহীন দিবস প্রবর্তন করিয়া কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে ঘোর অকল্যাণকর গোহত্যা হ্রাস করিতে পারেন।

—

রাজা মানসিংহ

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

বাংলার ইতিহাসে, বাঙালীর কবিতায় রাজা মানসিংহের মিথ্যা খ্যাতি কথায় কথায় বাড়িয়া উঠে নাই। রাজপুত-বীরের শাণিত তরবারি এবং ততোধিক তীক্ষ্ণ শতমুখী প্রতিভা কালের বুকে তাঁহার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছে; কবিপ্রশস্তি উহার প্রতিধ্বনি মাত্র। কবি-কঙ্কণ লিখিয়াছেন,

> ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যোলভৃঙ্গ
> গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধীপ।

সেকালে বাঙালী হিন্দুস্থানী এ দেশকে গৌড়-বাংলা বলিত। উড়িষ্যা প্রথমে স্বতন্ত্র 'সুবে' ছিল না; সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্তই ছিল। আকবর-শাহী আমলের সর্ব্বধর্ম্মে সমপ্রীতি এবং সর্ব্বমতসহিষ্ণুতানীতি মানসিংহ অকপটচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কচ্ছবাহ-পতি বীরভূম-উড়িষ্যায় বৈষ্ণব, পূর্ব্ববঙ্গে শাক্ত, হিন্দুস্থানে কবীরপন্থী এবং রাজপুতানায় "সীতারামজী"র উপাসক হিসাবে সমান প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবর ধর্ম্মে ভ্রামরীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এলাহী-মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদর্শ স্থূলভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন বিগ্রহ-পূজক পরমভক্তিপ্রবণ মানসিংহ। তিনি উড়িষ্যা হইতে বিষ্ণুমূর্ত্তি, বাংলা হইতে কেদার রায়ের "শিলাদেবী" স্বীয় রাজধানী আম্বের শহরে লইয়া গিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত সেখানে "সীতারামজী"র হালুয়া, "মদনমোহনজী"র লাড্ডু, "সল্লা মাইজী"র রুধির-ভোগ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন—মানসিংহ হয়ত ঐ মূর্ত্তি চোখেও দেখেন নাই। ৺নিখিলনাথ রায় এবং ৺সতীশ মিত্র মহাশয়ের গবেষণায় মানসিংহ সম্বন্ধে অনেক ভুলভ্রান্তির নিরসন হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন নাই একথা তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না। ৺রামরাম বসুর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাঁহারা ৺বসু মহাশয়কে কোন আমল দিতেই নারাজ। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণায় এই একটি মাত্র ছিদ্রই বহু অনর্থের কারণ হইয়াছে, বাঙালীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। রাজা মানসিংহের সময় হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা কার্য্যতঃ একই নাজিমের অধীনে রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতেও এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করিবে এই তিন প্রদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিশেষতঃ সামরিক পরিস্থিতির গুরুত্বের উপর। রাজমহলের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রীঃ) এবং বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হইয়া ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রাচ্য রণাঙ্গনের সেনাপতিত্ব গ্রহণ—এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী ১৪ বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেই পরবর্ত্তী নূতন ব্যবস্থার কারণ খুঁজিতে হইবে। এই প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ আয়তনে ইহার সমাবেশ হইবে না—ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক একাজ করিবেন। আমরা সংক্ষেপে শুধু সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতি অতঃপর আলোচনা করিব।

(১)

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আকবর-শাহী বেড়াজালে ধরা পড়িবার ভয়ে দুর্দ্দান্ত পাঠানগণ ক্রমশঃ যমুনাতীর হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে গোমতী অতিক্রম করিয়া কর্ম্মনাশার তীরে রুখিয়া দাঁড়াইল। সোলেমান কিররানী উড়িষ্যা জয় করিয়া পূর্ব্ব-ভারতে দ্বিতীয় 'তকৃত-ই-সোলেমান'* কায়েম করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; অন্য দিকে আগ্রায় বসিয়া আকবর গণিতেছিলেন মির্য়া সোলেমানের মৃত্যুর দিন। প্রথম গুজরাট অভিযানের পথে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই সুসংবাদ পাইয়াই মোগল-সম্রাট জৌনপুরে সেনাপতি মুনিম খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা জয়ের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। বিহারের রোহ্তাশ [রোহিতাশ্ব] দুর্গ অধিকার করিয়া মোগলবাহিনী পাটনা অভিমুখে ধাবিত হইল। নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া সোলেমান-পুত্র দায়ুদ আক্‌মহল বা রাজমহলের যুদ্ধে শেষ পরাজয় এবং শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ করিলেন—পাঠানের সৌভাগ্য-সূর্য্য মোগলরাহুগ্রাসে কবলিত হইল (১৫৭৬ খ্রীঃ)। রাজা মরিলেই রাজ্যজয় হয় না—এই ঐতিহাসিক সত্য আকবর সর্ব্বপ্রথম শিক্ষালাভ করিলেন বাংলা-বিহারে পরবর্ত্তী দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনির্ব্বাণ নরমেধ-যজ্ঞে। ঘাতকের অসিতে হতভাগ্য দায়ুদের মুণ্ড ভূমি চুম্বন

* এই স্থানে তকৃত-ই-সোলেমান রোহিলা পাঠানগণের জন্মভূমি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যাহা সোলেমান পর্ব্বতের নিভৃত ক্রোড়ে অবস্থিত ছিল।

করিতে না করিতেই বাঙালী কবন্ধের ঘাড়ে বারটি মাথা গজাইয়া উঠিল—ইহারাই বাংলার বিখ্যাত বারভুঁইয়া। বাংলা মুল্লুক গিলিতে বসিয়া বাদশাহী অজগর ফাঁপরে পড়িল—শিকার নেহাৎ ছোট নয়। পাঠানের প্রতিহিংসা; বাংলায় মশকবাহিনী, বাংলার জল—যে জলে রুটি-গোস্ত হজম হয় না, বাংলার আবহাওয়া—যেখানে তুর্কী ঘোড়া দুই-এক বৎসরে হয় মরিয়া যায়, না হয় গাধা হইয়া বাঁচিয়া থাকে,—বাঙালী জমিদারগণের নৌবহর—যাহা সুদিনে জলের নীচে লুকাইয়া থাকে, বর্ষায় ভাসিয়া উঠিয়া মোগল সেনাপতির নাকের ডগায় ছোঁ মারে;—এ হেন উৎপাত বাদশাহী ফৌজকে এ দেশে অকর্মণ্য এবং অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বাংলা-বিহারে সিপাহীরা যুদ্ধ করিতে নারাজ দেখিয়া বাদশাহ হুকুম দিলেন সিপাহী এবং মন্‌সবদারগণ বিহারে থাকিলে শতকরা পঞ্চাশ এবং বাংলায় গেলে ভবলভাতা পাইবে; তদুপরি লুঠ ও জায়গীর। ইহাতে কিঞ্চিৎ সুফল ফলিল। উত্তর এবং পশ্চিম বঙ্গে মোগল সেনানীরা প্রাণপাত যুদ্ধ করিয়া বড় বড় শহর অধিকার করিয়া বসিল এবং নানা স্থানে থানা কায়েম করিয়া বারভুঁইয়াদিগকে কোণঠাসা করিতে লাগিল। কিন্তু বাংলার মাটির গুণে এবং সম্রাটের গ্রহ-বৈগুণ্যে যে সমস্ত মোগল ও কাবুলী মন্‌সবদার বাংলা দেশে কয়েক বৎসর থাকিয়া অর্দ্ধাধীন জায়গীর ভোগ করিতেছিল তাহারাই ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি বাংলার রাজধানী তাণ্ডা বা টাঁড়া নগরে (গঙ্গার দক্ষিণপাড়ে, অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত মুর্শিদাবাদ জেলার একটি পরগণা)—একত্র হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

বাংলার এই বিদ্রোহ উত্তর-ভারতব্যাপী এক বিরাট্‌ ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র; সিন্ধুনদ হইতে পদ্মার তীর পর্য্যন্ত সম্রাটের "নব-বিধান"-বিক্ষুব্ধ সনাতন-পন্থী মুসলমান সমাজের ধর্ম্মদ্রোহ। মোগল সুবাদার মুজাফর খাঁকে বধ করিয়া মাসুমখাঁ কাবুলীর নেতৃত্বে বিদ্রোহীগণ সম্রাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের অধীশ্বর মির্জ্জা হাকিমের নামে খোৎবা পাঠ এবং নূতন হুকুমত জারী করিল। মাসুম খাঁ কাবুলী অনাগত দিল্লীশ্বরের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রতিনিধি বা উকীল নির্ব্বাচিত হইলেন; আকবরী দরবারের অনুকরণে খেতাব-মনসব বিদ্রোহীরা ইচ্ছামত ভাগ করিয়া লইল। বাবা খাঁ কাক্‌শাল বাংলার অস্থায়ী সুবাদারী এবং খান্‌খানান্ খেতাব, জব্বারী দশ-হাজারী মনসব সহ খাঁ জাহান উপাধি—এইভাবে বাংলা-বিহারে কালনেমির লঙ্কাভাগ আরম্ভ হইল। অন্য দিকে একই সময়ে কাবুলী ফৌজ পাঠান উপজাতীয় লস্কর সহ সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া লাহোরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বয়ং সম্রাট্‌ আকবর প্রমাদ গণিলেন, বাংলা দেশ জয় করিতে গিয়া সম্রাটের মস্তক ও মুকুট উভয়ই বিপন্ন—চারিদিকে অশান্তি এবং অবিশ্বাসের বিভীষিকা। এই সঙ্কটে আকবর তাঁহার শ্বশুরগোষ্ঠী, বিহারীমল-ভগবন্তদাস-মানসিংহকে পঞ্জাবের দিকে প্রেরণ করিলেন, বাংলা-বিহারের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন একান্ত বিশ্বস্ত সচিব ত্রিদল-মল্ল রাজা তোডড়মল। কিছু দিন পরে সুদক্ষ সেনাপতি খান-ই-আজম মির্জ্জা আজিজ এবং গর্ব্বিত উদ্ধতপ্রকৃতি বাদশাহী শাহবাজ স্বয়ং শাহবাজ খাঁ স্বসৈন্যে বিহারে উপস্থিত হইলেন।

আমাদের দেশে একটি কথা আছে—অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। মোগলবাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখী অভিযানও তদ্রূপ এ দেশে পণ্ড হইয়া গেল। পরস্পর যশস্পর্দ্ধী সেনানীগণ বিহারে আসিয়াই ঝগড়া আরম্ভ করিলেন; বাংলার সুবাদার মির্জ্জা আজিজ পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলে বিহারের সুবাদার শাহ্‌বাজ চলিতেন পশ্চিম দিকে। রাজা তোডড়মল কিছুকাল শক্তভাবে রাশ টানিয়া অতিকষ্টে বিহার শত্রুমুক্ত করিলেন বটে; কিন্তু ফল হইল বিপরীত। অধিকাংশ মুসলমান মন্‌সবদার, এই নিত্যস্নায়ী, লড়াইয়ের ময়দানেও শালগ্রাম পূজক; আচারনিষ্ঠ তোডড়মলকে পছন্দ করিত না; বাদশাহের বিশ্বাসভাজন বলিয়া ভয় করিত বটে। সম্রাট নিরুপায় হইয়া রাজা তোডড়মলকে হুজুরে তলব করিলেন। কিন্তু মির্জ্জা আজিজ এবং শাহ্‌বাজ খাঁ কাহারও মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ বাড়িয়াই চলিল। মির্জ্জা আজিজ হাজিপুর-পাটনায় কায়েমী মোকাম করিয়া বসিলেন। শাহ্‌বাজ পৃথক্‌ হইয়া জৌনপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। উভয়ের দুর্জ্জয় পণ—"নাহং যোৎস্যে ত্বয়ি যুদ্ধ্যমানে।"

(৬)

সম্রাট্‌ রাজত্বের অষ্টাবিংশ বৎসরে (১৫৮৩-৮৪ খ্রীঃ) ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে বঙ্গদেশ তৃতীয় বার বিজিত হইয়াছিল। মির্জ্জা আজিজ তেলিয়াগড়ী অধিকার করিয়া গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। কালীগঙ্গার [কালিন্দী মহানন্দার সঙ্গমস্থল?] নিকট এক যুদ্ধে কাক্‌শালগণের বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহী নেতা মাসুম খাঁ কাবুলী পরাজিত হইলেন। দণ্ড অপেক্ষা মোগলের দান [ঘুষ] এবং ভেদনীতিই অবশেষে জয়যুক্ত হইল। কাক্‌শালগণ মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়া মাসুম খাঁর

বিরুদ্ধে মহা উৎসাহে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। মুনিম খাঁর দশা আশঙ্কা করিয়া মির্জা আজিজ স্বাস্থ্যের অজুহাতে বাংলায় সুবাদারী ইস্তফা দিলেন। অগত্যা আকবর কারারুদ্ধ সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁকে কয়েদ হইতে মুক্তি দিয়া বাংলায় সুবেদার নিযুক্ত করিলেন এবং মীর্জা আজিজ বিহারে বদলী হইলেন। শাহ্‌বাজ খাঁ আত্রাই তীরে সন্তোষের নিকটবর্ত্তী স্থানে মাসুম খাঁ কাবুলীকে পুনরায় পরাজিত করিয়া বিদ্রোহীদিগকে কিঞ্চিৎ শায়েস্তা করিলেন। কিন্তু উদ্ধত কর্কশ-স্বভাব এবং সন্দিগ্ধচিত্ত শাহ্‌বাজের সহিত অপর সেনানী সাদিক খাঁর মনোমালিন্য হওয়ায় সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়া গেল। শাহবাজ খাঁ ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে পূর্ব্বাভিমুখী অভিযান আরম্ভ করিলেন এবং সাদিক খাঁ চলিলেন আগ্রার দিকে, শাহী-দরবারে জমি-বোস্ করিবার অজুহাতে। শাহ্‌বাজ খাঁ নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে খিজিরপুর * নামক স্থানে মোকাম করিলেন; সুবর্ণ গ্রাম (সোনার গাঁ) মোগল সৈন্য অধিকার করিয়া লইল। ঈশা খাঁ এসময় ছিলেন কুচবিহার রাজ্যে। ইতিমধ্যে শাহ্‌বাজ কাত্রাভূ এবং এগারসিন্ধু নামক ঈশা খাঁর দুইটি দুর্গ ও শহর অধিকার করিয়া লইলেন। কুচবিহার হইতে এক বৃহৎ সৈন্যদল সহ ঈশা খাঁ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। মোগল সৈন্য পিছু হটিয়া টোক্ (ঢাকার ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে) স্থানে শিবির স্থাপন করিল। ভাওয়ালের রাস্তায় তরসুন খাঁ নামক মোগল মনসবদার মাসুম কাবুলীর হস্তে বন্দী হইল। বর্ষাসমাগমে শাহ্‌বাজ রাজধানী টাঁড়ায় ফিরিবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ঈশা খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিলেন। শাহ্‌বাজ সর্ব্বস্ব হারাইয়া টাঁড়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

সম্রাট্ আকবর এই সময়ে এলাহাবাদে ছিলেন। ডাক-চৌকী বসাইয়া তিনি সেখান হইতে বাংলার মনসবদারী ফৌজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতেন; সপ্তাহের খবর তাঁহার কাছে পৌছিত। সাদিক খাঁর মতি-গতি শুনিয়া তিনি দরবারী সাজাবাল (Aid-de-Camp : দণ্ডপাল ?) পাঠাইয়া সাদিক খাঁকে হুকুম দিলেন শাহ্‌বাজের সহিত বনিবনাও না হইলে তিনি বর্দ্ধমান থানায় কতলু খাঁর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত উজীর খাঁর সহায়তা করিবেন, কোন অজুহাতে বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করা চলিবে না। বর্ষার পূর্ব্বেই সেনানায়কদ্বয় কতলু খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। উজীর খাঁ এবং সাদিক খাঁর উপর যথাক্রমে টাঁড়া এবং পাটনা যাওয়ার হুকুম হইল (জুন মাস, ১৫৮৪ খ্রীঃ)। উজীর খাঁ শাহবাজের পূর্ব্বেই টাঁড়া পৌছিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়ের শুভদৃষ্টি ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিল। বদমেজাজের জন্য একবার শাহ্‌বাজ খাঁর কয়েদ হইয়াছিল; স্বভাব সংশোধিত হয় নাই। বর্ষার পরে তিনি বিনা হুকুমে বাংলা ত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। পাটনা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই দরবারী সাজাবাল আসিয়া যাত্রা ভঙ্গ করিল। শাহ্‌বাজ নিতান্ত অনিচ্ছায় ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাংলার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ফলাফল, "যথা পূর্ব্বং তথা পরম্"। সম্রাট শুনিলেন তাঁহার সেনানীত্রয় শাহ্‌বাজ-উজীর-সাদিক খাঁ আত্মকলহে ব্যাপৃত; মাসুম-ইসা-কতলু বাদশাহী থানা একটির পর একটি অধিকার করিয়া চলিয়াছে। মোট কথা, ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালটা মোগল সৈন্যগণ প্রায় ছাউনিতেই রৌদ্র সেবন করিয়া কাটাইল।"

(ক্রমশঃ)

* বেভারিজ সাহেব বলেন, রেনেল সাহেবের মানচিত্রে চিহ্নিত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের তীরে টোক নামক স্থানের পূর্ব্বে চিহ্নিত খিজিরপুর। তাঁহার অনুমান ভুল। পাদটীকায় অন্যান্য স্থান সম্বন্ধেও তিনি ভুল করিয়াছেন (*Akbarnama* Vol. III, p 648)

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৭

কার্ত্তিকের শেষের দিকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রামচন্দ্রের সর্দ্দি-কাশি বাড়িয়া গেল। তিনি একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অত্যাচার যথেষ্টই হইয়াছিল।

এক দিন মাইলখানেক দূরে এক শিক্ষিতা ধাইয়ের সন্ধান লইলেন। আর এক দিন ক্রোশখানেক দূরে বুনো পাড়ায় গিয়া এক বর্ষীয়সী রমণীকে আঁতুড় ঘরে থাকিবার কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া আসিলেন। তা ছাড়া বাজার হাট নিজেই করিতেন, গঙ্গাস্নানের পাট ত ছিলই।

আঁতুড়ে থাকিবার লোক ঠিক করিয়া যেদিন ফিরিলেন—সেই

দিন পরিশ্রমটা অতিরিক্তই হইয়াছিল। ফিরিবার পথে মাথার উপর দিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বাড়ি আসিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িতে গিয়া দেখিলেন, গায়ের উত্তাপে কাপড় প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে—মাথার চুলগুলিও বিশেষ ভিজা ভিজা বোধ হইতেছে না।

যোগমায়া বলিলেন, একটু গরম চা খেয়ে ফেল।

—না, ও বদ্‌নেশা আর নয়।

—তবে এক বাটি গরম দুধ খাও।

—তাহ'লে রাত্রির খাওয়া আজ ইতি।

তা হোক। জিদ করিয়া আদার রস দিয়া এক বাটি গরম দুধ যোগমায়া তাঁহাকে পান করাইলেন। পরে বলিলেন, লোক ঠিক হ'ল? সেঁক তাপ ভাল রকম দিতে পারবে ত?

—হাঁ। অনেক আঁতুড়ে কাজ করেছে—ওই গোবরার মা গো।

—বটে, বুড়ি এখনও বেঁচে আছে? তা কত করে নেবে?

—এক পালি (আড়াই পোয়া) চাল আর দু'আনা পয়সা রোজ। যেদিন কাজ শেষ হবে একখানা কাপড়ও চাই।

—মাগীর খাঁই বড্ড। ছেলে হ'লে আবার বায়নাক্কা কত! ঘড়া দাও রে, শীতবস্ত্র দাও রে।

অক্ষুধার উপর রাত্রিতেও কিছু আহার করিলেন। আহার করিয়াই মনে হইল, মাথাটায় বড় যন্ত্রণা হইতেছে। মাঝরাত্রিতে তাঁহার কাতর স্বর শুনিয়া যোগমায়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন।

—বলিলেন, অমন করছ কেন?

—বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

—মাথার যন্ত্রণা? টিপে দেব একটু? তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—না না, সারা দিন খেটেখুটে এলে—একটু ঘুমোও।

যোগমায়া রামচন্দ্রের শিয়রে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার কপালে হাত দিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন, অ্যাঁ—গায়ে ধান দিলে খই হয়ে যায়। কি বলে খেলে রাত্তিরে?

—তখন ত তেমন কিছু বুঝলাম না।

—না—বুঝলে না। চিরদিন তোমার ওই রোগ। নিজেও ভুগবে—পাঁচজনকেও ভুগুবে। এখন আমি মাথামুণ্ডু কি করি বলত!

—যোগমায়ার দু'চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রামচন্দ্র যোগমায়ার হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া শুধু বলিলেন, আঃ।

খানিক চোখ বুজিয়া থাকিয়া চাহিলেন। ম্লান আলোকে দেখিলেন, যোগমায়ার দু'চোখের কোল তখনও চক্‌ চক্‌ করিতেছে। স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, কাঁদ কেন মায়া? জ্বর হয়েছে—ভাবনা কি।

—মেয়ের কখন কি হয়—ঠিক নেই, তোমার এই জ্বর! কি আতান্তরে পড়লাম বল ত!

—কিছু নয়, কাল ওষুধ খেলেই জ্বর আমার সেরে যাবে।

—সত্যি বলছ ত? যন্ত্রণাটা তোমার একটু কমেছে কি?

যন্ত্রণা-পাংশু মুখে হাসি টানিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, অনেক কমেছে।

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে যোগমায়া বলিলেন, একটা কথা ভাবছিলাম। কাল বরঞ্চ একখানা চিঠি লিখে দিই বউমাকে আসতে।

রামচন্দ্রের মুখ একবার উজ্জ্বল হইয়া পরক্ষণেই নিবিয়া গেল। ধীরস্বরে কহিলেন, না, থাক।

—কেন, এ কথা বললে কেন?

—বেয়াই নিজের ভুল বুঝে মেয়ে রেখে যাবেন এক দিন।

—যদি রেখে না যান?

—যদির কথা ধরলে সংসার চলে না। সংসারে পুরো অশান্তি ভোগ করতে হয়। একটু থামিয়া বলিলেন, যদি তিনি মেয়ে নিয়ে *আসেন—আমাদের তরফ থেকে সেদিন তাঁকে কোন রূঢ় কথা বলে যেন লজ্জা না দেওয়া হয়।*

—তুমি কি মনে কর—কুটুমের সাক্ষাতে সে কথা আমি বলতে পারি?

—তুমি তা পার না। পার না বলেই ত আজ বউমাকে আনবার মত আমি দিতে পারলাম না। তোমাকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হবার চেষ্টা ত কোন দিন করি নি। দু'টি কম্পিত হাত দিয়া তিনি যোগমায়াকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিলেন। কি জানি কেন, হয়ত বা অসহ—পুলকেই, যোগমায়া রুগ্ন রামচন্দ্রের বুকে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দমকা বাতাসে আধ-ভেজানো জানালাটি খানিকটা খুলিয়া গেল। পশ্চিম-আকাশের অন্ধকার সমুদ্রে ডুবু ডুবু আধখানি চাঁদের ম্লান আলো জানালার প্রান্ত দিয়া বিছানার উপর যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিহ্বল রামচন্দ্র ও যোগমায়া সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

ডাক্তার বলিলেন, অসুখটা খুব সোজা নয়, বুকে যেন একটা প্যাঁচ বসেছে। নিমোনিয়া বলে সন্দেহ হচ্ছে।

রামচন্দ্র চুপি চুপি বলিলেন, বাড়িতে এ কথা জানিও না।

—কিন্তু নার্সিং-এর দরকার। বিমলকে বরং আসতে লিখুন।

—না না, তিনদিন পরে শনিবারে সে আসবেই, তাকে মিছি-মিছি ব্যস্ত করিয়ে কি লাভ?

—যে কোন মুহূর্ত্তে সিরিয়াস হতে পারে। বয়স হচ্ছে ত।

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, আমি অনেক দিন থেকেই প্রস্তুত আছি—ডাক্তার।

অবগুণ্ঠন টানিয়া যোগমায়া এমন সময়ে ঘরে ঢুকিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, কেমন দেখলে বাবা!

—এখন ত বিশেষ ভয়ের কারণ কিছু দেখছি নে। তবে একটু সাবধান থাকবেন। ওষুধটা চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন। আর

বুকে মালিশের একটা ওষুধ রইল। আমি বরং পিসিমাকে পাঠিয়ে দিই গে।

—না, বাবা। বুড়োমানুষকে রাত্তিরে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। দরকার হয়ত কাল বরং বলব।

ডাক্তার চলিয়া গেলে রামচন্দ্রের শয্যা-শিয়রে বসিয়া যোগমায়া বলিলেন, বিমলকে একখানা চিঠি লিখে দিই—শনিবার কলকাতা থেকে কিছু ফলটল নিয়ে আসবে। আর ঠাকুরঝিকে একটা খবর দিই।

—দাও।

—অমন হাঁপাচ্ছ কেন? যোগমায়া উৎকণ্ঠাভরে প্রশ্ন করিলেন।

—না এমনি। তা তুমি এখন বসলে কেন, রান্নার উদ্যোগ কর গে।

গৌরী আমাকে হেঁসেলে ঢুকতে দিলে না।

কার্ত্তিকের শেষে সেদিন আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। কয়দিন ধরিয়াই পূবে হাওয়া বহিতেছিল—বৃষ্টিও পড়িতেছিল অল্প অল্প। আজ রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে বৃষ্টি ও হাওয়ার বেগ বাড়িয়া উঠিল। এলোমেলো হাওয়া। পাংশুবর্ণের আকাশ ঝড়ের দীর্ঘ স্থায়িত্বের আভাস দিতেছে। বৃষ্টি কখনও চাপিয়া আসে, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি পড়িতে থাকে। মঙ্গলবারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তিন দিন স্থায়ী হয়—এই প্রবাদ-বাক্যের উপর আস্থা বুঝি আর থাকে না। আজ রাত্রির সঙ্গে বৃহস্পতিবার শেষ হইবে—আকাশে ধূসর মেঘের আনাগোনার বিরাম নাই। জোর পূবে-হাওয়া যতক্ষণ না দক্ষিণমুখী হইতেছে—ততক্ষণ এ দুর্য্যোগ কাটিবার ভরসা নাই।

বাড়িতে লোকজন আসিয়াছে। জামাই সর্ব্বক্ষণ রামচন্দ্রের শিয়রে বসিয়া ঔষধপথ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যোগমায়াও রোগীর শিয়র ছাড়িয়া বেশিক্ষণ এদিক ওদিক যাইতেছেন না। সংবাদ পাইয়া কমলা আসিয়া রন্ধনশালার ভার লইয়াছেন। পাড়ার দুই এক জন অনুগত লোক বাহিরের বারান্দায় অষ্টপ্রহর বসিয়া আছে—কখন কি দরকার হয় সেই জন্য। তা ছাড়া ছাতা মাথায় দিয়া ও লণ্ঠন হাতে করিয়া কয়েকজন আনাগোনা করিতেছেন। সকলের মুখেই উদ্বেগ পরিস্ফুট। কথা কহিতে কষ্ট বোধ হইতেছে বলিয়া ডাক্তার রামচন্দ্রকে উত্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং রামচন্দ্রের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বিমলকে একখানি পত্রও কাল দেওয়া হইয়াছে। টেলিগ্রামে চিন্তার গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে।

অপরাহ্ণে গৌরীকে লইয়াও একটু ভাবনা দেখা দিয়াছে। পেটের বেদনাকে প্রসব-বেদনা বলিয়াই ধাত্রী ডাকা হইয়াছিল। সে আসিয়া জানাইয়াছে—রাত্রি দশটার সময় আর একবার যেন খবর দেওয়া হয়। একখানি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করা আছে। দুলোদের বুড়িটাকে বৈকাল হইতেই আনানো হইয়াছে। এক কাঁসি পান্তাভাত খাইয়া সে আঁতুড়ের এক কোণে দিব্য নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতেছে।

রন্ধনগৃহ হইতে কমলা বাহির হইয়া যোগমায়ার নিকটে আসিলেন। যন্ত্রণা-কাতর মেয়ের শিয়রে বসিয়া যোগমায়া তাহাকে প্রবোধবাক্য দিতেছিলেন।

কমলা বলিলেন, দশটা পর্য্যন্ত দেখে কাজ নেই, গাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তুই না হয় দাদার কাছে গিয়ে বোস—বউ। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে আমি এখানে বসছি।

যোগমায়া বলিলেন, আজ আমার মন খালি কু-গাইছে—ঠাকুরঝি। যেন কি একটা হবে।

—দূর—তোর যত ভাবনা। ডাক্তার ত এ বেলা বলে গেলেন দাদা ভাল আছেন।

—গৌরীর ভালাভালি দু'টো দু'ঠাঁই হয়!

কমলা বলিলেন, হবে—হবে—। কাঙালী দাওয়ানকে ডাকছি, পাঁচুঠাকুরকে ডাকছি—ভালই হবে। আমাদের কালে পাস-করা দাই ছিল না গাঁয়ে, এখন কত সুবিধে হয়েছে। ভাবনা কি।

যোগমায়া ঈষৎ আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন, চ্যাচারি ঠিক করা আছে তো?

—পাস-করা দাই তোমার চ্যাচারি দিয়ে নাড়ি কাটবে কিনা? গরম জল চাই, ওদের ভাল কাঁচি আছে, তাই দিয়ে—

একটু থামিয়া যোগমায়া বলিলেন, বিষ্যুদবার এলেই আমার ভয় করে।

—কেন, লক্ষ্মীবারে—অত ভয়টা কিসের?

—কেন, জান না ভাই—লক্ষ্মীবারেই তো এ বাড়ির গিন্নিরা স্বর্গে গেছেন। মা, পিসিমা—সবাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিলেন, তা বটে।

রাত্রি আরও গভীর হইল। বাহিরে ঝড়ের মাতনে আর গাছের শাখায় জলের ঝাপটায় অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া চলিয়াছে। গৌরী যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাইবার মত হইয়াছে, অস্ফুট গোঙানি ছাড়া তার মুখের স্পষ্ট কথা কিছু বুঝা যায় না। মেয়েকে লইয়া যোগমায়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তবু, উপর নীচে টানাপোড়েন তাঁর ঘুচে নাই। কমলা যোগমায়াকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে কত বার।

তিনি বলিয়াছেন, ক্ষিদে তেষ্টা আমার নেই ঠাকুরঝি। গৌরীর ভালাভালি কিছু না হ'লে কাল বিষ্যুদবারকে আমি বিশ্বাস করিনে—ভাই।

এমন সময়ে ঝড় ঠেলিয়া বিমলের আর্ত্তকণ্ঠ বারান্দার অন্য প্রান্তে শোনা গেল,—মা।

যোগমায়া আঁতুড় ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হ্যারিকেনটা লইতে তাঁহার মনেই হইল না।

—বিমল এলি ?

—বাবা কেমন আছেন—মা ?

কমলা আলো লইয়া যখন বারান্দায় আসিলেন—ততক্ষণে বিমলের প্রণাম শেষ হইয়া গিয়াছে। আর—এক দিন সে যেমন পরম নির্ভরতায় যোগমায়ার বক্ষোলগ্ন হইয়া সমস্ত ব্যথা ও অপমানকে নিঃশেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিল—আজও এই পরম উদ্বেগের মুখে সেই মাতৃবক্ষেই পরম নির্ভরতার সঙ্গে মুখখানি সে গুঁজিয়া দিয়াছে।

মেয়ের কাছে ফিরিয়া যোগমায়া বলিলেন, ঠাকুরঝি, ওকে দেখে আমার খুব সাহস হ'ল—ভাই। শাঁখটা বার করে রেখেছ তো ? দাও, আমার হাতেই দাও।

নির্ব্বিঘ্নে গৌরী সন্তান প্রসব করিল।

কমলা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ছেলে হ'ল গো—ধাইবউ ? খোকা—না খুকী ?

উপর হইতে বিমল আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, মা মা, শীগ্‌গির এক-বার ওপরে এসো।

কমলা ও যোগমায়া শাঁখ ফেলিয়া উপর পানে ছুটিলেন।

পুত্রসন্তানই হইয়াছে। শুভ শঙ্খধ্বনিতে তাহার শুভ আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল না। মৃত্যু-দেবতার মহান ঐশ্বর্য্য জন্মদেবতার ক্ষুদ্র উৎসবটুকু গ্রাস করিয়া ফেলিল বুঝি!

তখনও ঝড়ের মাতনে ও জলের ঝাপ্‌টায় বৃক্ষশাখায় অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া চলিয়াছে।

সেই সুরে সুর মিলাইয়া সদ্যোজাত—অবহেলিত, শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ—করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়

১

তারপর দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘরাত্রির সমষ্টিতে যে নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে সে প্রয়াগের এই বিস্তীর্ণ বালুচরের মতই আশা-আনন্দহীন। সে কালকে পরিমাপ করিবার উৎসাহ কাহারও হয় নাই। মূর্চ্ছাতুর চৈত্র দ্বিপ্রহরের মত অনুভূতি আলস্যে সেই কালের চোখে নিদ্রার অঞ্জন মাখানো ছিল। ঠিক নিদ্রা নহে—চোখের গোলকে বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, কোন পরিচয় বহন করে নাই—সেই দৃশ্য-গুলি। না নিদ্রা—না জাগরণের সেই অবস্থায় বাড়ি হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার একটি প্রবল ইচ্ছার দ্বারা যোগমায়া চালিত হইয়াছেন এবং ঘুমের ঘোর না কাটিতেই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কয়টি মাস, না—বৎসর ? কালাশৌচের বাধা কাটিয়া গিয়াছে কিনা হিসাব নাই। অন্তরের আগুন তাঁহাকে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে।

প্রাতঃকালের চর-সর্ব্বস্ব প্রয়াগের সঙ্গমস্থানে বসিয়া নিদ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থা কাটাইয়া—যোগমায়া সর্ব্বপ্রথম যেন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সর্ব্বপ্রথম কোমল প্রভাত-সূর্য্য জবা-কুসুমসঙ্কাশ রূপে তাঁহার ধ্বান্ত মনের কলুষ হরণ করিয়া সর্ব্বত্র আলোক-বন্যায় উজ্জ্বল করিয়া দিল। মুণ্ডিত মস্তক নত করিয়া বালুবেলায় বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পৃথিবীর করস্পর্শ তিনি পৃষ্ঠদেশে অনুভব করিলেন। কল কল স্রোতধ্বনি, গঙ্গা-মায়িকী জয়—স্রোতের মুখে তীর গতিতে ভাসিয়া যাওয়া নৌকা—সাদা ও কালো জলের স্পষ্ট দু'টি ধারা—এক হইয়া আবার স্রোতের বেগে বিপরীতমুখী হইয়া গিয়াছে; ওপারের ঈষৎ উচ্চ তীরভূমিতে বাজরি ক্ষেতের সুউচ্চ জঙ্গল-মধ্যে বাজরি আহরণরত মজুরের অস্পষ্ট কোলাহল—এ পারের যাত্রী সংগ্রহের উচ্চরবে ডুবিয়া গিয়াছে। খাতা খুলিয়া যাত্রী-স্বত্ব লইয়া পাণ্ডায় পাণ্ডায় বচসা বাধিয়াছে, ঘণ্টা বাজাইয়া গোদানের জন্য কয়েকটি লোক চীৎকার-রবে তীরভূমি প্রকম্পিত করিতেছে। নানা বর্ণের পতাকাশোভিত চালাগুলির মধ্যে পুণ্য সঞ্চয়ের দরদস্তুর চলিতেছে। ক্ষুর ভাঁড় বাগাইয়া নাপিত ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত তীরস্থ যাত্রীদলের পানে চাহিয়া আছে ও তাহার জিহ্বায় মাথাটি সমর্পণ করিবার জন্য—পীড়াপীড়ি করিতেছে। নৌকায় বসিয়া কেহ পুরী ও গরম জিলাপীর সদ্ব্যবহার করিতেছে, কেহ তুলসী-রামায়ণ বা গীতা পড়িতেছে, কেহ সরবে স্তোত্র আওড়াইতেছে, কেহ চক্ষু মুদিয়া নীরবে জপতপ করিতেছে। ফুল, মালা, চন্দন, চিরুণী, ছোট আরসী প্রভৃতি একটি ডালার মধ্যে ভরিয়া হাঁটুজল ঠেলিয়া কত লোক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, এই হাঁটুভোর জলের উপর ছুটাছুটি করিয়া ভিক্ষাও করিতেছে—অনেকে। তীর্থরাজ প্রয়াগের এইরূপ দৃশ্যে যোগমায়ার চেতনা অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে।

স্নান, তর্পণ সবই সারা হইয়া গেল। পুণ্য সঞ্চয়ের কলরব বেলা বাড়িবার সঙ্গে কিছু কম বলিয়াই বোধ হইল। দলস্থ লোকগুলি গরম পুরী ও জিলাপী সংযোগে রসনা ও উদরের তৃপ্তি সাধনের উদ্যোগ করিতেছে। যোগমায়ারও ডাক পড়িল।

ওগো বিমলের মা, কি আনতে দেবে দাও না। ফটিক যাচ্ছে দোকানে।

যোগমায়া পিছনে চাহিয়া উত্তর দিলেন, খিদে নেই দিদি।

বর্ষীয়সী স্নেহের অনুযোগ করিলেন, খিদে তোমার কোন-দিনই বা থাকে! গরম জিলিপীই আসুক চার পয়সার ?

—না। বাসায় গিয়ে এক পাকে যা হয় করা যাবে। তোমরা খেয়ে নাও দিদি।

—পৈরাগে গঙ্গাতীরে দোষ কি ছিল ? বামুন হালুইকর পুরী ভাজছে। সেবার শিরোমণি মশায়—ওঁর বিধবা বড় জা—সবাই এসে খেয়েছিলেন।

—সত্যি খিদে নেই দিদি। আর মনটাও ভাল নেই।

বর্ষীয়সীর নাম প্রমদা। হরি-ঠাকুরঝি গত হওয়ার পর ইনি

সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এ পদে উন্নীত হওয়ার জন্ত পার্থিব কোনরূপ উত্তোগ-আয়োজন করিতে হয় না। কোন্দলে পারদর্শিতা, পরোপকারে পটুতা, এক বাড়ির সংবাদ অন্ত বাড়িতে পৌছাইয়া দেওয়া, সকালে স্নানের ঘাটে, দুপুর হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত পাড়া-বেড়ানোর কালে এবং সন্ধ্যার পর হরিকথা বা রামায়ণ, ভাগবত শ্রবণ কালে এই সব তুচ্ছ অথচ মূল্যবান সংবাদগুলির আদান-প্রদান চলিয়া থাকে। সংসারে প্রায়ই ইঁহাদের কেহ থাকে না। দু'টি আতপ চাল ফুটাইয়া আহারের আয়োজনে কতটুকুই বা সময় যায়। আর সংসারে কেহ থাকিলেও সেদিকে দৃষ্টি দিবার মত সঙ্কীর্ণতা ইঁহাদের মধ্যে নাই; সারা গ্রামখানিই তো ইঁহাদের সংসার।

—মন ভাল নেই কেন গা? এমন পৈয়াগ তীর্থ, কথায় বলে:

পৈরাগে মুড়ায়ে মাথা
যাক্‌গে পাপী যেথা-সেথা।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রয়াগে মাথা মুড়োলে সত্যিই পাপ তাপ থাকে না—দিদি?

—শাস্তর কখনও মিথ্যে হয়? শাস্তরেই তো বলেছে।

—কিন্তু প্রয়াগে সাধু সন্ন্যাসী কই দিদি!

—আসল সাধুরা কি দেখা দেন বোন, না কারো কাছে হাত পাতেন। ওই যে কাদামাটি মেখে একটা নেংটি পরে ভিক্ষে মাঙ্‌ছেন যিনি—উনি কি সাধু? পোড়াকপাল!

—তবে আসল সাধু কি করে চেনা যায় দিদি?

—মনের টান থাকলে আপনিই সাধুসঙ্গ মেলে ভাই। কথায় বলে না:

যে খায় চিনি—
তার চিনি যোগান চিন্তামণি।

—চিনি খেতে তো ইচ্ছে করে দিদি, কিন্তু চিন্তামণি কি চিনি যোগাবেন?

—কেন যোগাবেন না! দুর্য্যোধনের রাজভোগ ফেলে বিদুরের খুদকুঁড়ো খাননি তিনি? প্রহ্লাদের ডাকে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে পৃথিবীতে আসেন নি?

—সে সব এই কলিযুগে কি হয়? আচ্ছা দিদি, ওই যে গঙ্গার ওপারে উঁচু টিবির ওপর বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওটা কি?

—ওটাকে ঝুঁসির মঠ বলে। ওখানে অনেক সাধুসন্ন্যাসী থাকেন শুনেছি।

যোগমায়া সাগ্রহে কহিলেন, একবার যাবে দিদি?

—ঠাকুরদেবতা কি ওখানে আছে? শুধু সাধু দেখতে কে যাবে বল।

—না দিদি—আমি যাব। তোমারা না যাও একলাই যাব আমি।

—এই দেখ দেখি—এত বেলায় ওখানে কখন মানুষ যায়! কাল সকাল সকাল না হয়—

যোগমায়া কাহারও কথা শুনিলেন না, জিদ ধরিয়া বসিলেন সাধু দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। দলপতি বেণী ঘোষাল বিপদে পড়িলেন। অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া পাণ্ডার পানে চাহিয়া কহিলেন, তাই ত ঠাকুর কি করা যায়?

যোগমায়া বলিলেন, তোমায় একটি টাকা বকশিস দেব ঠাকুর—আমায় ঝুঁসি দেখিয়ে আন।

পাণ্ডা বলিলেন, আপনারা বাসায় গিয়ে আরাম করুন, আমি মাইজিকে ঝুঁসি দর্শন করিয়ে আনি।

গঙ্গায় হাঁটুভোর জল, স্রোত কিন্তু প্রবল। সে স্রোতের মুখে নৌকা পড়িয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আর কি সে গর্জ্জন—কানে তালা লাগিয়া যায়। দুরন্ত স্রোতের বেগে কম্পিত নৌকায় বসিয়া যোগমায়ার মন প্রথম হর্ষ অনুভব করিল। জীবনের চলায় আনন্দ না পর মুহূর্ত্তের মৃত্যুর আকস্মিক আলিঙ্গনের আনন্দ—কোন্‌টা প্রবল হইয়া উঠিল, কে জানে? আকাশ তীক্ষ্ণ ময়ূখ-মালায় জর্জ্জরিত, চরের বালুকায় সেই রৌদ্র ধোঁয়ার সৃষ্টি করিতেছে। সুদীর্ঘ সাপের মত বাঁকিয়া আইজাক সেতু গঙ্গার গলায় লৌহ হার পরাইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জলিতেছে। সেতুর পার্শ্বে এই দুপুর রৌদ্রেও চিতার ধূমকুণ্ডলী উঠিতেছে। বি-এন-ডব্লিউয়ের একখানা গাড়ি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ঝুঁসি ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্মশানঘাটের কাছে একখানা টিনের ছোট চালা আছে; শববাহকেরা হয়ত ওইখানে বিশ্রাম করে। ধারে ধারে শকুনি ও কাকের মহোৎসব লাগিয়াছে। কুকুরের সঙ্গে তাহাদের দ্বন্দ্বটা খুব তীব্র বলিয়া বোধ হয় না। এখানে ওখানে পোড়া কাঠ ভাসিতেছে। নৌকা আসিয়া এপারে লাগিল।

পাহাড় নহে—মাটিরই সুউচ্চ ঢিপি। গঙ্গাবক্ষ হইতে এককালে সিঁড়ি ছিল উপরে উঠিবার; সে সিঁড়ি কোথাও বা হেলিয়া, কোথাও বা ফাটিয়া এখনও খাড়া আছে। তবে গঙ্গাগর্ভ হইতে আধ পোয়াটাক পথ হাঁটিয়া গেলে—তাহার পাদদেশে পৌছান যায়। যেমন সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি—তেমনই খাড়াই, উঠিতে গেলে বুক ঠেলিয়া কে যেন নামাইয়া দিতে চায়। বর্ষায় গঙ্গার জল বাড়িলে—ওই সিঁড়ির পাদদেশে গঙ্গা আসিয়া তরঙ্গ-প্রহার করেন। সেই তরঙ্গ-প্রহারের বেগে উপরের সৌধ কিছু কিছু তীরসাৎ হইয়াছে, তাহারই খোয়া ও ইট তীরভূমিতে বিছানো; চলিবার কালে অনাবৃত পা দু'খানি রক্তাক্ত করিয়া তুলে।

ঘরের মধ্যে মহাবীরজীর মূর্ত্তি। পূজার চিহ্ন দেখা যায় না, পয়সা আদায় করিবার জন্ত পূজারীও ছুটিয়া আসিল না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিলেন যোগমায়া। অর্দ্ধভগ্ন দেবদেউল, আতা, বাঁশ, আম, কদলী ও নানা জাতীয় গুল্ম ও লতার সমাবেশে জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে—অথচ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে নাটমন্দির সমন্বিত ধূপধুনা সৌরভিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক মন্দির। বেদীতে কোন দেবমূর্ত্তি নাই—মঠাধিপ

সন্ন্যাসীর কাষ্ঠ-পাদুকা শোভা পাইতেছে। পুষ্প ও বিল্বপত্র দেখিয়া অনুমিত হয়, সে পাদুকার প্রত্যহ পূজা-অর্চনা হয়। দুয়ার খোলা পড়িয়া আছে, পয়সা কুড়াইবার কেহ নাই—চুরির জন্য কাহার লালসাও বুঝি নাই।

পাণ্ডা জানাইল মোহান্তজী কিছুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। খুব ভাল সাধক ছিলেন বলিয়া শিষ্যেরা এইভাবে তাঁহার নিত্য পূজা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মঠের বাড়িগুলি ভাল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠান। নিমগাছের সুশীতল ছায়া—ইঁদারার জলও শীতল। কয়েকজন সংসার-বিরাগী সেই ছায়ায় বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন। দেবমূর্ত্তিও আছে—কিন্তু মুদ্রা সংগ্রহের রীতি নাই। শ্রান্ত যোগমায়া নিমগাছের ছায়ায় বসিলেন। এই নির্জ্জন মঠে সাধুসঙ্গে জীবন কাটাইয়া দেওয়া চলে না কি? এমনই শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা, নির্ভাবনায় দেবতার পূজা-আরত্রিক দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ—মুক্তিস্বাদ-বিহ্বল আকাশ অনন্ত বিস্তারের দিকে বুঝি পক্ষ মেলিয়াছে। সে আকাশের অবাধ বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া চলা··· যেমন ওই চিলটা ভাসিয়া যাইতেছে নির্ভাবনায়—যেমন রাত্রির অন্ধকারে তরতরে মেঘের মাথায় চাপিয়া ভাসিয়া যায় অযুত অযুত জল্‌জ্বলে নক্ষত্র—যেমন আলোর বন্যা বহাইয়া ভাসিয়া যায় কলাভিমুখী চাঁদ।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং—, কাল নিমেষে এসব হরণ করিতে পারে। সংসার মায়া ছাড়া আর কি? একবার সেই মায়াজাল কাটিয়া বাহির হইয়াছেন যোগমায়া—ভগবানকে পরম করুণাময় জানিয়া এই মুহূর্ত্তে মাথা তাঁহার বারংবার নত হইয়া আসিতেছে।

তৃতীয় মঠের সৌন্দর্য্য আরও মনোরম। এখানে অযত্নবর্দ্ধিত গাছ একটিও নাই—মন্দিরের স্বর্ণচূড়া রৌদ্রালোকে জ্বলিতেছে; দেবতার সংসারও যেন যত্নবতী কোন দেববালার সুচারু করস্পর্শে সুশৃঙ্খলিত ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। লৌহবেদীর উপর বসিলে ফলভারে অবনত আতাগাছের স্নিগ্ধস্পর্শ কাঁধে আসিয়া কৌতুকে ঘন হইয়া উঠে। রসাল-বৃক্ষ বেড়িয়া ব্রততীর পারিপাট্য—টবের সতেজ গাছগুলিতে ফুলের সমারোহ—জলসিক্ত সতেজ পত্রগুলি পথিককে যত্ন ও মমতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মঠের ও-পিঠে প্রকাণ্ড বটগাছতলায় ক্ষৌমবাস পরিহিত শ্বেতশ্মশ্রুসমন্বিত এক সাধু বসিয়া আছেন। সম্মুখে তাঁহার পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক ভজন গান গাহিতেছে। পুরাকালের আশ্রম-চিত্র মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে বুঝি শত শিকড়সমৃদ্ধ বটবৃক্ষতলে নামিয়া আসিয়াছে।

সেই বৃক্ষতলে একপাশে গিয়া যোগমায়া বসিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। গান থামিয়া গেল, গ্রন্থপাঠ আরম্ভ হইল। উপদেশ দিলেন সাধু। হিন্দী ভাষায় সে উপদেশ যোগমায়া বুঝিলেন না—তবু কান পাতিয়া শুনিলেন। অতঃপর আহারের আয়োজনে সন্ন্যাসীর অনুচরেরা এদিক ওদিক চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীও উঠিয়া পাশের একটি ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পাণ্ডা ডাকিলেন, মায়ি—উঠিয়ে। আভ্‌ভি খানাপিনা হোগা। সুপ্তোত্থিতের মত যোগমায়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাবিত্রী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বহু মিথ্যার অমোঘ চক্রবালে
বেড়িয়া যাহারে রেখেছে নিয়ত, ঘুচিবে না কোনোকালে
অনপনেয় যে অপ্রকৃতের বাধা,
জটিল গোলক-ধাঁধা
নিষ্ক্রমণের পথখানি যার সদা আগুলিয়া রাখে,
কেমনে সে আপনাকে
মুক্তির মাঝে ছাড়ি'
সত্যাভিসারী গন্তব্যের পথপানে দিবে পাড়ি?

খুঁড়ি' সুড়ঙ্গ কারার ভিত্তিতলে
মুক্তির পথ চায় সে লভিতে শাবল ঘাঁতির বলে।
গুপ্ত প্রয়াস, সে ও যে মিথ্যাময়,
মিথ্যা দিয়াই কপটী জগতে সত্যের হবে জয়?
শঠের সঙ্গে শাঠ্যই বিধি, গত্যন্তর নাই?
বিচার-বিমূঢ় ক্ষুব্ধচিত্তে কোন দিশা নাহি পাই।
সাধু মুখে শুনি বটে,
প্রেমের প্রভাবে ক্রুর সংসারে অঘটন যাহা ঘটে।

ভক্ষ্যের প্রতি ভক্ষক যদি হয় কভু প্রেমবান্,
তীক্ষ্ণ দন্তে দিবে না সে আর শাণ।
সমাজে রাষ্ট্রে গৃহে পরিবারে রুধির পানের রুচি
ত্যজি' সাত্ত্বিক অন্নপানে সে দেহমনে হবে শুচি।
বিধি ও নিষেধ নিয়মিত হবে প্রেমে,
সব গৃধ্‌নুতা হিংসাদ্বেষ দস্যুতা যাবে থেমে।
জীব-জন্মের মাতৃভূমি যে নারী,
শক্তিরূপিণী তারে পাশে রাখি শিব্‌ হবে সংসারী।

শৈব সাধনা ভস্মাবসিত শাশ্বতী করুণারে
অন্তরে যদি উদ্বোধিবারে পারে,
তাহ'লে সুনিশ্চয়
মিথ্যা কলুষ দ্বন্দ্বের হবে লয়।
জানি এ স্বপন, তবু এ স্বপ্নে সত্য বাষ্পীভূত,
অজাত ভাস্বর অনুবিজলিতে মৌনে মন্ত্রপূত
নীহারিকা সম ছায়াপথ দেয় আঁকি'
নিখিল মানব অন্তরীক্ষে; ধূমগুণ্ঠনে ঢাকি'
রেখেছে সে আপনারে,
পূর্বমুখিনী সে সাবিত্রীরে হেরি এ অন্ধকারে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

যোড়াসাঁকো-নিবাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার কয়েক জন অনুগত প্রিয়জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য আমার গোচরে আসিয়াছে। রাজনারায়ণ বসু বা অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা সকলেই অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। ইঁহারা ব্যতীত, আরও কেহ কেহ দেবেন্দ্রনাথের স্নেহপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, নবগোপাল মিত্র, মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কথা ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করিলাম না। কারণ বরাবর দেবেন্দ্রনাথের স্নেহপ্রীতির অধিকারী হইলেও কেশবচন্দ্র ছিলেন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় পুরুষ। মাত্র কয়েক বৎসর দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া পরে নিজেই একটি মণ্ডলীর নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মহর্ষির অনুগত প্রীতিপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার গভীর ঈশ্বর-প্রীতি, দেশহিতৈষণা ও সাহিত্যিক গুণপনা মহর্ষির নিকট বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইঁহারা বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়। সেকালে কলিকাতায় এই পরিবারের বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার প্রসিদ্ধ পরিবারগুলির যে একটি তালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহাতে এই পরিবারের নেতৃস্থানীয় 'রামহরি ঠাকুরের পৌত্র শিবচন্দ্র ঠাকুর'-এর উল্লেখ আছে। শিবচন্দ্র কলিকাতা হিন্দু কলেজের প্রথম দিকে এক জন কৃতী ছাত্র ছিলেন। শিবচন্দ্র ঠাকুর, রামকমল সেন এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী একযোগে পুরাণসমূহের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিয়া ডক্টর হোরেস হেমান উইলসনকে হিন্দু শাস্ত্রালোচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংরেজীনবীশ বলিয়া সে-যুগে শিবচন্দ্রের সুনাম ছিল। রক্ষণশীল 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন—"যে সকল ব্যক্তিরা ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্মত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎপ্রমাণ শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র [চন্দ্র] ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইঁহারা যে প্রকার ইংরেজী বিদ্যায় বিজ্ঞ ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার অগোচর আছে।"* তৎকালীন বিবিধ জনহিতকর ও



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা

---

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৭১। ঐ, প্রথম খণ্ডে (২য় সংস্করণ, পৃ. ২৪৭-৮) পাথুরিয়াঘাটার এই ঠাকুর পরিবারের রামহরি ঠাকুরের অন্যতর পুত্র রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের ১৩ই কার্ত্তিক, ১২৩৫ তারিখে পরলোকগমনের সংবাদ প্রসঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দানশীলতা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা আছে। রমানাথ কলিকাতায় বিদ্যার চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং হিন্দু সমাজের একজন গোষ্ঠীপতি ছিলেন। (সমাচার দর্পণ ২৫ কার্ত্তিক ১২৩৫।)

সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিবচন্দ্রের যোগ ছিল। ইঁহারই পুত্র পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্বন্ধে এত দিন আমাদের বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তাঁহার প্রপৌত্রগণের নিকট হইতে এসব বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার রোজনাম্‌চা এবং তাঁহাকে লিখিত বিভিন্ন সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির কয়েকখানি পত্র তাঁহারা আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। সমসময়ের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে পাথুরিয়াঘাটার এই দেবেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ তথ্য পাওয়া গিয়াছে। এই সকল হইতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কতকটা ধারণা করা যাইবে। এখানে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের রোজনাম্‌চা, ঠিক্ রোজনাম্‌চা নয়, দৈনিক প্রার্থনালিপি মাত্র। ইহা হইতে তাঁহার ঈশ্বর-প্রীতি যে কত গভীর ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৩৯ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ (১৮৩২, ৩০ এপ্রিল) কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁহার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। রোজনাম্‌চার নিম্নলিখিত উক্তিটি তাঁহার শৈশব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করে। ১৯শে বৈশাখ ১২৮৯ তারিখে তিনি লিখিয়াছেন,—

"অদ্যকার দিবসে ৫০ বৎসর অতীত হইল আমি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ৯।১০ বৎসর পার্থিব পিতার ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াছি। কত স্নেহ কত প্রেমাধিক্য ভোগ করিয়াছি তাহা এখন অনুভব করিতে পারিতেছি। বিশেষ পিতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দ অবস্থাতে রাখিতে তাঁহার কত বার চেষ্টা হইয়াছিল। আমার মাতা সহচরী—জ্যেঠাই ঠাকুরাণী ও আনন্দপিসী ছিলেন...তাঁহারা আজন্ম আমাকে স্নেহ করিতে না শিখিলে আমি পিতামাতাহীন যখন হইলাম তখন কে আর স্নেহ করিত?"

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে জুনিয়র স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি হন। এখানে ১৮৪৫-৪৯ অন্ততঃ এই পাঁচ বৎসর যে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রদের পাঠোন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষা-কমিটির বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে দেওয়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ জুনিয়র বিভাগের ছাত্র রূপে বরাবর বৃত্তি পাইয়াছিলেন।* ১৮৪৮-৪৯ সনের পরবর্ত্তী রিপোর্টে দেবেন্দ্রনাথের আর উল্লেখ পাই না। মনে হয়, তিনি ১৮৪৯ সনেই হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন সুরু হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি কি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন তাঁহাকে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর পত্র হইতে তাহা জানা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন তখন তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ এই দুই বৎসর তিনি হিন্দু কলেজের ঠিকানা হইতে এই সভায় চাঁদা দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে চাঁদা দাতাদের তালিকায় 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা' বা 'পাতুরেঘাটা' এইরূপ উল্লেখ আছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাওয়ার পূর্ব্বাবধি তিনি ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঐ বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া গেলে ইহার কার্য্যভার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ অতঃপর শেষোক্ত সমাজের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন। ১৮৬০-৬৪, এই পাঁচ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের একটি গৌরবময় যুগ। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইল। ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মিগণ স্বদেশবাসীদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার ব্যতিরেকে, শিক্ষা-বিস্তার, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি প্রচেষ্টায় অবহিত হইলেন। স্বদেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে ১৮ই আশ্বিন ১৭৮৩ শকে সুবিখ্যাত ব্যবস্থা-দর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকারের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে কর্ম্মীদল একটি প্রারম্ভিক সভার অনুষ্ঠান করেন। এজন্য ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়া পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রই ছিলেন এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোক্তা।

দেবেন্দ্রনাথের গভীর ঈশ্বর-প্রীতিই ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে তাঁহার মূল যোগসূত্র। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মূল সমাজ ত্যাগ করিয়া যান ও অল্প কাল পরে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে এই সমাজের সভ্য করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষির একান্ত অনুরক্ত; তিনি উক্ত সম্মান গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া উভয়ের মধ্যে

* প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫০। "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয় জন?" পৃ. ৪৩২-৩।

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের কখনও হ্রাস হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত কেশবচন্দ্রের পত্র তাহার প্রমাণ। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে যে-সব আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করেন তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ মতামত প্রকাশের জন্য আহূত হইতেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে 'সুলভ-সমাচার' প্রকাশ আরম্ভ হইলে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন।

কেশবচন্দ্র অনুবর্ত্তীদের লইয়া স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ অচিরে এই সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। সমাজের পরিচালন-ভার একটি অধ্যক্ষ-সভার উপর অর্পিত ছিল। ১৭৮৯ শকে, এবং ১৭৯২ শকের মাঘ মাস হইতে আমৃত্যু তিনি ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের, সুতরাং অধ্যক্ষ-সভারও সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দেওঘরে বসতি আরম্ভ করিলে অধ্যক্ষ-সভা কর্ত্তৃক তিনি কিছুকাল ইহার অন্যতর প্রতিনিধি-সভাপতি এবং হিসাব-পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শেষোক্ত পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন—রোজনাম্‌চায় তাহার উল্লেখ আছে। সমাজের সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি পত্রে অধ্যক্ষ-সভার উক্ত সিদ্ধান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। পত্রখানি এই,—

ওঁ

আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ২২শে বৈশাখ ৫৩
১৮০৪ শক।

মান্যবর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘাটা)
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

গত ১০ই বৈশাখ তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভা হইতে আপনাকে প্রতিনিধি সভাপতি এবং সমাজের হিসাব আদি পরীক্ষার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়রা মনোনীত করিয়াছেন। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভা হইতে যাহা অবধারিত হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই পত্রসহ প্রেরিত হইল। নিবেদন ইতি।

বশম্বদ
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

১০ বৈশাখ (১৮০৪ শক) ব্রাঃ সঃ ৫৩

আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অধিবেশনের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম রেজোলিউসন।

৬—অবধারিত হইল যে সমাজের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘাটা) অধ্যক্ষ মহাশয়কে পরীক্ষক মনোনীত করা যায় এবং অনুরোধ করা যায় যে গত ১৮০৩ শকের বার্ষিক হিসাব পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল অধ্যক্ষ সভায় প্রদর্শন করেন এবং যদি তাঁহার সুবিধা হয় তবে বর্ত্তমান ১৮০৪ শকের হিসাব প্রতিমাসে পরীক্ষা করিয়া তাহার ফল অধ্যক্ষ সভায় অর্পণ করেন।

৭—শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতি মহাশয় অনেকদিন হইতে স্থানান্তরে থাকা প্রযুক্ত কার্য্যের অসুবিধা হওয়ায় অধ্যক্ষ মহাশয়েরা গত ১৮০২ শকের ২৩ আষাঢ় তারিখে তাঁহার অনুপস্থিতকালে প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত করিবার জন্য পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ট্রষ্টি প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে যে আবেদন করিয়াছিলেন তদুত্তরে উক্ত মহাশয়ের গত ১৮০২ শকের ৯ শ্রাবণের পত্রের অভিপ্রায় মতে অবধারিত হইল যে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘাটা) ও শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত হয়েন। ইতি

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৯২ শকে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক ইহার একজন উপদেষ্টার পদে বরিত হইলেন। সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ নিম্নের পত্রে তাঁহাকে এই কথা জ্ঞাপন করেন,—

ওঁ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু—
সবিনয় নিবেদন

আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী ও প্রধান আচার্য্য মহাশয় আপনাকে এ সমাজের এক জন উপদেষ্টারূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, অতএব মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিমাসের দ্বিতীয় বুধবারে সমাজে আসিয়া বেদীতে উপবেশন পূর্ব্বক উপাসনা করিবেন ইতি।

২৭ মাঘ—১৭৯২ শক
আদি ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সহকারি সম্পাদকস্য।

ইহার পর প্রায় প্রতি বৎসরই দেবেন্দ্রনাথকে মাঘোৎসবের সময়েও ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্যাখ্যাদি করিতে দেখিতে পাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি নিজেকে বরাবর হিন্দু বলিয়া মনে করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সেবায়ও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও সুলভ সমাচারে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক যে ব্যাখ্যানমঞ্জরী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাহা মহর্ষির নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তিনি ১৩০৩, ৪ঠা কার্ত্তিক ইহা রচনা শেষ করেন (ঐ দিবসের রোজনাম্‌চা)। দেবেন্দ্রনাথ একজন সুকবি ছিলেন। ব্যাখ্যানমঞ্জরী ছাড়া তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক অন্য বহু কবিতাও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ মনুসংহিতার ও জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।* তিনি দুই খণ্ডে

---

* শেষোক্ত পুস্তকের একখণ্ড দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রগণের নিকট দেখিয়াছি। ইহার আখ্যাপত্রে নামোল্লেখ নাই, "কোন কাব্যানুরাগি-সহৃদয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত" এইরূপ লিখিত আছে। উঁহারা বলেন, স্পষ্ট

'বালক-বোধ'† শীর্ষক বর্ণপরিচয় লিখিয়াছিলেন। ইহাতে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম ভাগের ভূমিকায় লেখেন, "শিশুদিগের অসংযুক্ত বর্ণ পরিচয় ও জিহ্বার জড়তা দূর হইবে ইহার এই মাত্র উদ্দেশ্য নহে, যাহাতে শিশুদিগের মনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে এবং সৎপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় ইহাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"

দেবেন্দ্রনাথের রোজনাম্‌চাও বাংলা গদ্যের সুন্দর নিদর্শন। ইহার কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-বর্গের কৌতূহল নিবৃত্ত করিব,—

১২ বৈশাখ ১২৯৫

"অদ্য Barrister আনন্দমোহন বসুর বাটিতে যাইয়া তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার মিষ্ট বচন ও অমায়িকতায় কত প্রীত হইলাম। আনন্দবাবুর অন্তস্তল পর্য্যন্ত কেমন সরল ঈশ্বরপ্রেম ও মনুষ্যের প্রতি প্রেমে পূর্ণ। নাথ! তুমি তাঁহাকে বিদ্যাবুদ্ধি সম্পদ দিয়াছ, তিনি তোমার পথে একান্ত দাঁড়াইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে অধিকতর তোমার প্রেম আনন্দদানে কৃতার্থ কর।"

"আমি এ ব্রাহ্ম সম্মিলনে কেমনে যোগদান করিব? আমি জাতি ত্যাগ করিতে পারিব কি? আমার সংসারের তাহাতে বিশৃঙ্খলা হইবে? জাতি রাখায় আমি তোমার সত্যের পথে বিরোধী হইতেছি? জাতি যে মিথ্যা তাহা বুঝাইবার বড় বাকী নাই—অনেকেই জাতি মিথ্যা জানিয়াছেন, আমি জাতি ত্যাগ করিলে তাঁহারা আমার দেখাদেখি জাতি ত্যাগ করিবেন তাহা নয়। যাহাতে ঈশ্বরের নাম প্রচার হয়, তাঁর প্রেমে লোক মজে এমত যদি লিখিতে পারি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বেশী করিতে পারিব। আমার জাতিত্যাগ অপেক্ষা আরও গুরুতর কায আছে—তাঁহার দিকে আমার মনোচালনা করা কর্ত্তব্য। সে কায—ঈশ্বর স্মরণ, তাঁর নাম "বিশেষ দয়াময় নাম"টি সাধন—মধ্যে ২ তাহার চাপ, তাহার প্রত্যক্ষ অভ্যাস করা, লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময়ও তাঁহাকে সম্মুখে রাখা, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিব তাহার বিষয় চিন্তা করা, নিয়মিত রূপে পাঠ, পাঠের উদ্দেশ্য তিনি ও তাঁহার যশোগান, লোকের উপকার, সাবহিত চিত্তে জীবনের কার্য সম্পাদন, এ সকল করিলে আমি তোমাকে পাইব। তুমি এই সকল কার্য করিতে আমাকে উদ্যুক্ত ও উপযুক্ত কর।"

১৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৫

"অদ্য প্রিয় সুহৃদ্ আনন্দ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম,... আনন্দ বাবুর জ্ঞানগম্ভীর কথাতে অনেক তত্ত্বকথার উপদেশ পাইলাম, তাঁহার বিদ্যাবত্তা দর্শন দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি অনেক তত্ত্ব ভাল বুঝিয়াছেন, তাঁহার মুখের কথা কত জ্ঞান দেয়।"

৫ ভাদ্র, ১২৯৬

"মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় যত পড়িতেছি, ততই তাঁহাকে একজন অসাধারণ লোক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তিনি যথার্থ ঈশ্বর প্রেরিত, এদেশ—এদেশ কেন পৃথিবীতে ঈশ্বর প্রেম ভজন সাধন দিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি যেজন্য আসিয়াছিলেন, তাহা করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর কেন যে তাঁহাকে কিছুদিন জীবিত রাখিয়া সেই কার্য্য বাহুল্যরূপে করাইলেন না, কে বলিতে পারে?"

৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫

"অদ্য মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, তিনি বলিলেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে চক্ষুকর্ণ হইতে অনেক বঞ্চিত করিয়াছেন কিন্তু তিনি এই সুযোগে বহির্বিষয় না দেখিয়া এখন অন্তরের বিষয়ে মনঃ সমাধান করিতেছেন। এত দিনের পর তিনি গভীর চিন্তার অবকাশ পাইয়াছেন, সেই অবকাশে জানিতে পারিয়াছেন যে ঈশ্বর সত্য সত্যই সত্য অমৃত অভয় ইত্যাদি। তিনি আরো বলিলেন যে ঈশ্বর সকল দিন তাঁহার নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়েন না, যে দিন হন সে দিন তিনি কৃতার্থ হন।"

১৩ই ফাল্গুন ১২৯৬

"মহর্ষি মহাশয়কে সাধারণ সমাজের প্রচারক বিষয়ে এক পত্র লিখিয়া মনের অসুখ হইল। তিনি যাহা করেন তাহা পরে বাধা দিতে যাইলে তাঁহার অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে হইবে জানিয়াও তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। যা হউক, যা লিখিয়াছি তাহা সত্য কথা। সাধারণ সমাজের প্রতি লোকের—হিন্দু সমাজের বিজাতীয় বিদ্বেষ—আদি সমাজের প্রতি সেরূপ বিদ্বেষ নাই—ঐ সমাজের সহিত যোগ হওয়া উহার পক্ষে ভাল নহে।"

দেবেন্দ্রনাথ ১৩০৪ সালের ১৬ই পৌষ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (মাঘ ১৮১৯ শক) যে সংক্ষিপ্ত শোকসূচক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পত্রিকা লেখেন,—

"আমরা ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি পাথুরেঘাটানিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহু কাল হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ এবং *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ছিলেন।* ইঁহার প্রাচীন রীতিক্রমে লিখিত সরল পদ্য সহৃদয় মাত্রেরই প্রীতিকর হইত। শ্রীমন্মহর্ষিদেব নাম সাদৃশ্যে ইঁহাকে সখাবাবু বলিয়া আহ্বান করিতেন। ইনি একজন বিদ্বান ধার্ম্মিক মিষ্টভাষী ও অতিশিষ্ট স্বভাব ছিলেন। যিনি ইঁহার সহিত একবার মাত্র আলাপ করিয়াছেন তিনিই ইঁহার হৃদয়ের মধুরতায় মোহিত হইয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি এখন যথায় গিয়াছেন তথায় পরম সুখ ও শান্তিতে অবস্থান করুন।"

বিভিন্ন সময়ে দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যের কয়েকখানি পত্র অবিকল উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব।

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত]

ওঁ

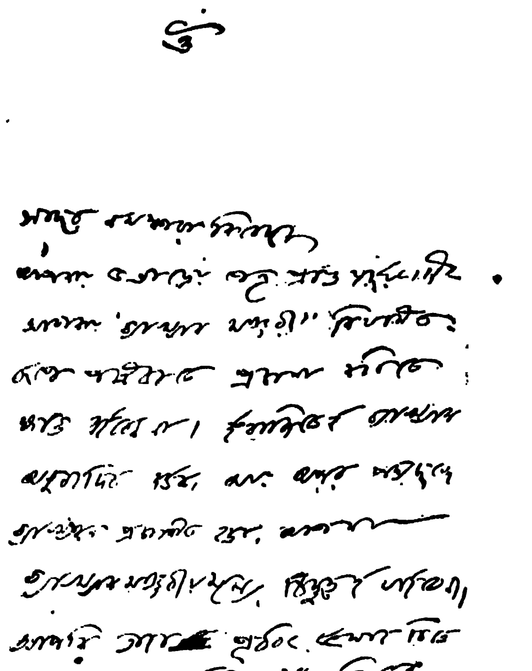
সাদর নমস্কারা নিবেদন,

আপনার ৫ ভাদ্রের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি—আপনার "ব্যাখ্যানমঞ্জরী" নিয়মিতরূপে পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। ইংরাজিতেই ব্যাখ্যান অনুবাদিত হউক, আর অপর পদ্যছন্দে ব্যাখ্যান প্রকাশিত হউক, আপনার ব্যাখ্যানমঞ্জরীর মূল্য কিছুতেই যাইবে না। আপনি

নামোল্লিখিত না হইলেও এ পুস্তকখানি দেবেন্দ্রনাথেরই। ইহা ১লা শ্রাবণ, ১৯১৮ সম্বতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার মনুসংহিতার অনুবাদ গ্রন্থখানির কথাও উঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। এখানি এখনও দেখি নাই।

† প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে তারিখ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কাল ১২ অগ্রহায়ণ, ১৯২৩ সম্বৎ।

তাহা পূর্ব্ববৎ উৎসাহচিত্তে সম্পন্ন করিতে থাকিবেন। "নাহি ভেব মনে আছি একা আমি। আছেন অন্তরে তব অন্তর্য্যামী। তিনিই তোমার



সুহৃৎ আশ্রয়। পিতা মাতা বন্ধু কারণ অভয়।" এইগুলিন একেবারে আমার হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছে। যাহার কিঞ্চিৎ হৃদয় আছে, তাহার এ স্তম্ভ হইবেই হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ। ইতি ১১ ভাদ্র ৫৪।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সখামহাশয় সমীপেষু
পাথুরিয়াঘাটা

চুঁচুড়া। ৫ মাঘ ৫৭

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

আপনি ১১ মাঘের রাত্রিকালের বেদী গ্রহণ করিতে যে সম্মত হইয়াছেন, ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনি বেদীর মধ্য-আসন গ্রহণ করিয়া তথা হইতে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিবেন। যদি সুবিধা হয়, তবে পূর্ব্বাহ্ণে আমার দৃষ্টির জন্য তাহা পাঠাইলে আমি বাধিত হই।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

[কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক লিখিত]

Colootola
11 October/67.

Dear Friend

You are probably aware that a meeting of the "Brahmo Somaj of India" will be held on Sunday, the 20th October, when some very important proposals will be brought forward for discussion. Two of these especially require careful attention, *viz.*,—the establishment of fellowship and union among the several Brahmo Somajes in India, and the legalization of Brahmo Marriages. As I have a desire to collect and digest the opinions of some of the leading members of the Brahmo community on these subjects, may I request the favour of your communicating your views to me in the course of the next week. You should clearly lay down any definite suggestions you have to make in the matter.

You wrote to me sometime ago requesting me to take away your name from the membership of the Brahmo Somaj of India. Will you kindly write an official letter to that effect, if you are still of that opinion, as the matter is to be referred to the meeting.

Hope you are doing well.

Believe me sin'ly
Yours K. C. Sen.

My daughter's Namkaran takes place to-morrow at my house. Will you do me the favor to attend worship at 8 o'clock in the morning. *You will oblige me* by asking your brother Baboo H. N. Thakoor to come.

K. C. Sen.

Are the Brahmoes Hindus in any respect.
Indian Succession Act or Act X of 1865.
To make this applicable as far as possible to Brahmoes or suggest a code for them.
Desparity of sentiments regarding অনুষ্ঠান among the different orders of the Brahmoes.

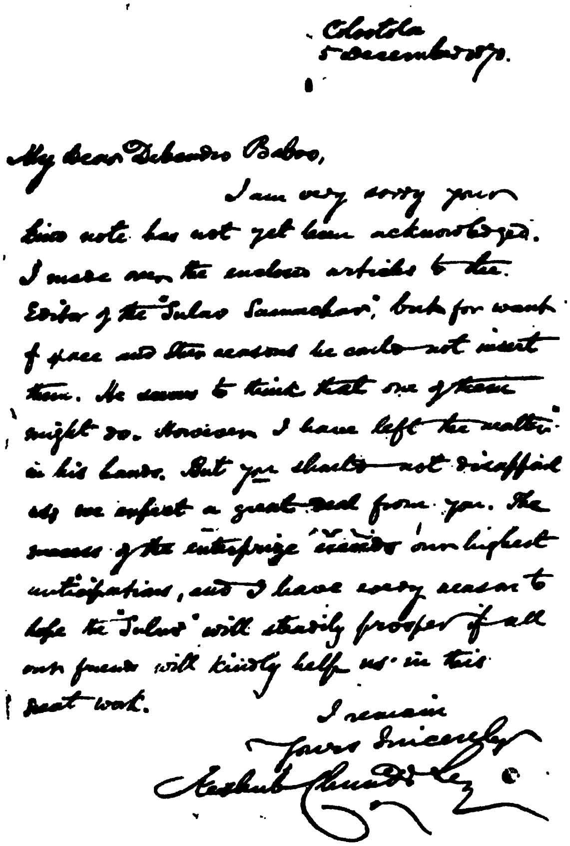
Baboo Debendra Nath Thakoor,
Pattriaghatta.

Coloototla.
5 December. 1870.

My dear Debendro Baboo,

I am very sorry your kind note has not yet been acknowledged. I made over the enclosed articles to the Editor of the "Sulav Samachar," but for want of space and other reasons he could not insert them. He seems to think that one of them might do. However I have

left the matter in his hands. But *you* should not disappoint us; we expect a great deal from you. The success of the enterprize exceeds our highest anticipa-


Colootola
5 December 1870.

My dear Debendro Baboo,
I am very sorry your kind note has not yet been acknowledged. I made over the enclosed articles to the Editor of the "Sulav Samachar," but for want of space and other reasons he could not insert them. He seems to think that one of them might do. However I have left the matter in his hands. But you should not disappoint us; we expect a great deal from you. The success of the enterprize exceeds our highest anticipations, and I have every reason to hope the "Sulav" will steadily prosper if all our friends will kindly help us in this great work.
I remain
Yours sincerely
Keshub Chunder Sen

tions,* and I have every reason to hope the "Sulav" will steadily prosper if all our friends will kindly help us in this great work.

I remain,
Yours sincerely,
Keshub Chunder Sen.

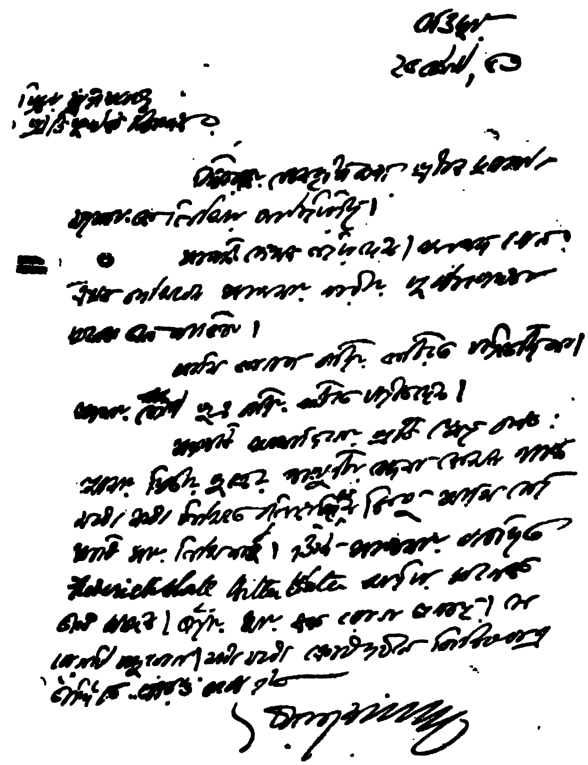
[রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক লিখিত]

ওঁ

দেওঘর
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৫৩

প্রিয় সুহৃদ্বরেষু
প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন

বিদ্যারত্নের বেতনবৃদ্ধির জন্য প্রধান আচার্য্যমহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। আপনি পেন্সন লইয়াছেন। আপদ গেল। এখন দেখিবেন আপনার শরীর অনেক ভাল থাকিবে।



আমি কাগজ বাহির করিতে যাইতেছি না। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বাহির করিতে যাইতেছেন।

আপনি আমাদিগের প্রতি স্নেহ বশতঃ আমার দ্বিতীয় পুত্রের পাথুরীর বেদনা কেমন থাকে মধ্যে মধ্যে লিখিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু আমি সেই অবধি আর লিখি নাই। তিনি আপনার ব্যবস্থিত Ferericks hall Bitter Wator খাইয়া অনেক ভালো আছেন। তাঁহার আর এক রোগ আছে। সে রোগটি বায়ুরোগ। মধ্যে মধ্যে ক্রোধ হইলে জিনিষপত্র ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। ইতি

শ্রীরাজনারায়ণ বসু

[চন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীশ্রীঈশ্বর—
শরণং—

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং।—

মহাশয়ের পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। মহাশয় যে কর্ম্মখালি থাকার কথা শুনিয়াছেন তাহা সত্য নহে। এসংবাদ আমরা তারতাজার

* বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্দ্র ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২২শে কার্ত্তিক কলিকাতায় ভারত সংস্কার সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পাঁচটি কর্ম্মবিভাগের মধ্যে 'সুলভ সাহিত্য বিভাগ' ছিল অন্যতম। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' হইতে জানা যায়—

"১লা অগ্রহায়ণ হইতে এই বিভাগ দ্বারা এক পয়সা মূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত একখানি পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বারে দুই হাজার কাগজ ছাপা হয়। এবং নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং দ্বিতীয় বারে পাঁচ হাজার কাগজ ছাপা হইয়াছে ও সমুদয় কাগজই নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।"

কেহ জানি না। মহারাজা সংপ্রতি অমাত্যবর্গের সহিত কলিকাতায় আছেন। তথা হইতে সংবাদ পাইলাম যে সেরূপ কোন প্রস্তাব হয় নাই। সংপ্রতি রেন্টবিল সম্বন্ধে সমস্ত রাজ্য ব্যস্ত। এখন নূতন পদ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ মহারাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র বৃহৎ ১০ জন এজেন্ট আছেন। তাঁহার অর্দ্ধাংশ অনাবশ্যকীয়। অধিকন্তু এক্ষণে কোন কর্ম্মখালির সম্ভাবনা থাকিলে মহাশয়ের জামাতার নিমিত্তে প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। মহাশয়ের ব্যাখ্যান দেখিতেছি। উপাদেয় হইতেছে। পূজ্যপাদ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা শারদা বাবুর মৃত্যু সংবাদে শোকপ্রাপ্ত হইলাম। ভরসা আছে ঐ শোক পূজ্যপাদকে বিদ্ধ করিবে না। কেননা তিনি স্বয়ং সংসারাতীত হইয়াছেন। আমি সংপ্রতি অতি ব্যস্ত বিধায় বেশী লিখিতে সাবকাশ পাই নাই। এখানকার মঙ্গল। মহাশয়ের মঙ্গলাদি লিখিতে আজ্ঞা হইবেক—শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ৩ জানুয়ারি ১৮০৪।

সেবক শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সাহিত্য-সেবক সমিতিতে পঠিত

বাংলার রূপ

শ্রীবীরেশ্বর পাল

ভাদ্রমাসের প্রথম দিকে জল অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু মাসের মাঝামাঝি আর সেই পরিমাণের অপেক্ষাও হ্রাস পাইয়া গেল। জলের সঙ্গে বর্দ্ধিত ধানগাছ জলের অভাবে ঢলিয়া পড়িল। অপেক্ষাকৃত উচ্চজমির ধানগুলি একেবারেই জল না পাইয়া রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। আকাশে এক টুকরা মেঘের চিহ্ন নাই; কৃষকের শিরে বজ্রপাত হইল, উচ্চজমির ধানের মায়া ত্যাগ করিয়া নিম্নজমির দিকে ফিরিয়া চাহিল। ভাদ্রের খরা আশ্বিনের ঝরায় পরিণত হইল। আশ্বিন পড়ার সঙ্গে জলের বেগ বৃদ্ধি পাইল আর অনবরত বৃষ্টির ফলে অকালে বর্ষার দরুন নিম্নজমির ধানগাছের গোড়াও আলগা হইয়া গেল, বাতাসের বেগ আর সামলাইতে পারিল না সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল ধানের দল প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে জলের স্রোত ও বাতাসের বেগে ভাসিয়া চলিল। ঝড়জলকে উপেক্ষা করিয়া বাঁশ ও দড়ি লইয়া মাঠে চলিয়া গেল। ভাসমান ধানের দলকে বাঁশের বেড়ার সাহায্যে আটক করিতে চেষ্টা করে—প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান, মানুষ সফলতা লাভে অনেক ক্ষেত্রেই বিফল হইল। সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইয়া ধানের দল বিদ্রোহী বীরের মত আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে নদীর বুকে গিয়া পড়িল।

ম্যালেরিয়া-কাতর দীননাথ ওরফে দীনু ধোপা প্রতিবেশীদের কাছে সংবাদ পাইল, তাহার পাঁচ পাখি জমির তিন পাখি ধান জলস্রোতে উঠিয়া গিয়াছে, বাকী দু'পাখিও ভাসিবে, তবে বেড়া দিলে হয়ত বা টিকিয়া যাইতে পারে। হতভাগ্য দীনু জীর্ণ শরীরটা নাড়িয়া-চাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, অবশেষে অক্ষমতার দরুন অর্দ্ধছিন্ন কাঁথার ভিতরে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রন্দনের বেগ একটু থামিতে পুনরায় ধান রক্ষার উত্তেজনায় বেচারী বিছানা ত্যাগের উপক্রম করিতেই ধোপা-বৌ মিলনী কাপড়ের আঁচলের সাহায্যে বাঁ হাতে গরম সাগুর বাটি ও ডানহাতে এক বাটি গরম জল লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বৌয়ের আগমনে দীনুর দুঃখ যেন সীমা ছাড়াইয়া বাড়িয়া যায়, সে অসহায় শিশুর মত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে—"গেছেরে বউ গেছে, সারা বছরের খাটুনি; না হইলেও চাইরডামাসের খোরাক।"

মনের দুঃখ দমন করিয়া জোর করিয়া মিলনী ম্লান হাসি হাসে, "ভগমানের লগে তো আরলড়াই করতে পারবা না—কি করবা কও। আমাগ একৃলার না, বেবাকেরই গেছে। সরকারগ চাইর পাচ খাদার চিহ্নৎও নাই।"

শেষের দিকে মিলনীর কণ্ঠে ফুটে একটা সান্ত্বনার বাণী—সে চাহে স্বামীর মুখের পানে বিস্ফারিত নেত্রে, যেন সরকারদের ক্ষতির কথায় দীনুর মনে খানিকটা শান্তি আনিয়া দিবে।

দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে দীনুর বুকের পাঁজরগুলি চূর্ণ হইয়া যায়। সাগুর বাটিটা হাতে নিয়া মুখের কাছে তুলিয়া পুনরায় সে বলে "হগলের লগে কি আমাগ তুলনা হাজে বউ। সরকারগ দুই সন না অইলেও তেনারা ভাতে মরব না। আমরা খাইমু কি?"

মিলনীও বোঝে, [illegible]রিদের সহিত তাহাদের তুলনা সাজে না। তথাপি সতী চাহে পতির মনে প্রবোধ দিতে, কাজেই যেন মনের দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে জবাব দেয় "খাও, অখন খাইবা নাকি, খাও। মুখ দিছেন যেনি, আহার দিবেন তেনি। এমুন চিন্তা কর ক্যান্? কাপড় কাচন তো জলে ভাসে নাই—গতর যদি বজায় থাকে, ধোপার মেয়ের অভাব কি? ঘুমাইতে নি পার দ্যাখ। অই বেলা যদি জরটা ছাড়ে, কুইনান খাও। পার যদি পরশু তরশু যাইয়া দেইখা আইও নে।"

এ ছাড়া আর গতি নাই। দীনুলাল নীরবে সাগুর বাটি উজাড় করিয়া কাঁথা টানিয়া লইল বটে, কিন্তু ক্ষতির ক্ষত মনের কোণে সজীব হইয়া দেখা দিল। জরের রাগ ও মনের কষ্টে সে কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় পড়িল।

মিলনী পতির পরিতৃপ্তি অন্তে কোলের মেয়েটাকে টানিয়া লইয়া ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল। চক্ষের দৃষ্টি ছুটিয়া গেল মাঠের বুকে, সেখানে তখন চলিয়াছিল প্রকৃতির নির্ম্মম পরিহাস। জলের

স্রোতে ধানের দল ভাসিয়া চলিয়াছে—জমির বুকে শুধু জল—জলময়। অশান্ত ছেলের মত ধানগাছের দল নাচিয়া খেলিয়া চলিতেছে নদীর দিকে—সেই দৃশ্যে মিলনীর চোখের পাতা ভিজিয়া গেল। বুকের দুধ টানিয়া মেয়েটা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ফিরিয়া আসিয়া মিলনী স্বামীর পাশে মেয়েকে শোয়াইয়া রন্ধনের আয়োজনে গেল। চাউলের হাঁড়িটার কাছে গিয়া তাহার চক্ষু চড়ক গাছ, যাহা অবশিষ্ট ছিল, গতকল্য ফুরাইয়া গিয়াছে। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে চিন্তা করে মিলনী। স্বামীর কাছে চাউল বাড়ন্ত বলিতে তাহার মন সরিল না। নিজের মনে তণ্ডুল-সমস্যার মীমাংসা করিয়াই যেন সে ধোয়া একটা কাপড়ের বোঁচকা কক্ষে টানিয়া লইয়া বাহিরে পদচালনা করিল।

ধনীর কন্যা, ধনীর পুত্রবধূ গাঙ্গুলী-গিন্নির অন্দরে আসিয়া মিলনী তাহার বোঁচকা নামাইয়া ডাকিল "কইগো মা-ঠাকুরাইন, কাপড় ন্যান্ গো।"

মিলনীর কণ্ঠধ্বনিতে গাঙ্গুলী-গিন্নি সন্তুষ্ট হইল না—হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অকুস্থলে দর্শন দিল "ধোপা-বউ এসেছিস, তবু ভাগ্যি,—তোর আক্কেল কি লো, মাস পেরিয়ে যায় কাপড় নিয়েছিস বাপু, আর দর্শনটিও নাই। তোর ছোট লোকের এমনি ধারা, আর পারি না বাপু।"

মিলনী কোমলস্বরে কৈফিয়ৎ দিয়া তাহার গরম মেজাজ নরম করিতে চেষ্টা করিল "কি করুম মা-ঠাকুরাইন? একজন ত ঘরে পড়া, দুই দিন ভাল যায় তো চাইর দিন জ্বরে বেহুঁশ। না পারে উঠতে বসতে—কাজ কম্যতো দূরের কথা। কোলের মাইয়াটা লইয়া আর পাইরা উঠি না। মইরা বাইচা করি কোন রকম। এবারের মতন ক্ষেমা করেন মা ঠাকুরাইন।"

মা-ঠাকুরাইন কিন্তু ক্ষমা করিল কিনা বাহ্যতঃ তাহা প্রকাশ পাইল না। কাপড় বুঝিয়া লইয়া গৃহ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মিলনী রোয়াকের উপর বসিয়া রহিল। গাঙ্গুলী-গিন্নির আর বাহির হইবার নামটি মাত্র নাই, অগত্যা মিলনীকে হাঁকিতে হইল "কই মা-ঠাকুরাইন, কাপড় চোপড় দিবেন না?" একগাল পান চিবাইয়া গাঙ্গুলী-গিন্নি বাহিরে আসিল, "ওমা, বলিস কিলো, আজ যে ভরা অমাবস্যা, কাপড় এসে কাল পরশুতক্ নিয়া যাইচ।"

পূর্ণিমা অমাবস্যায় কিছু দেওয়া যেমন নিষেধ, নেওয়াটাও ঠিক নয়—একথা গাঙ্গুলী-গিন্নির মনে উঠে না। ধোপা-বউ অমাবস্যায় কাপড় দিতে পারে, গাঙ্গুলী-গিন্নি পারে না, যেহেতু একজন ছোট, অপর পক্ষ বড়।

অমাবস্যার উল্লেখে মিলনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে পাওনা আদায়ের আশা অদ্য নাই। তবু সে ভয়ে ভয়ে একবার যেন ভিক্ষা মাগিল, "যদি পাওনা পয়সা কয় গণ্ডায় দিতেন—"

মিলনীর বাক্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গাঙ্গুলী-গিন্নি জবাব দেয় "তুই বলিস কি ধোপা-বউ, আজ অমাবস্যার দিনে তোর তাগাদার সময় হ'ল। জানিস নে আজ ঘরের লক্ষ্মী বের করতে নাই।"

অভাব নাকি আইন মানে না, কাজেই মিলনীর মনও অমাবস্যা মানিতে চাহিল না, পুনরায় মিনতি করিয়া যাচ্ঞা করিল, "ঘরে এক কণা চাউলও নাই মা-ঠাকুরাইন, পয়সা না দ্যান হের তিনেক চাউল আমাগ দ্যান?"

মিলনীর স্পর্দ্ধায় এবার গাঙ্গুলী-গিন্নি গরম হইয়া উঠিল, "বলি চাউলে আর কড়িতে কি তফাৎ আছে বউ? এমন তাগাদা বাপু বাপের বয়সেও দেখি নি, পয়সা না দেও চাউল দেও। বলি ঘর তুলে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি, না ন'শ পঞ্চাশ টাকা কারো মেরে বসেছি? এত অবিশ্বাস কিসের লো?"

মিলনী অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিল, "ছিঃ ছিঃ মা-ঠাকুরাইন, আমি তাই কইতে পারি। আমার ঘরে আজ সত্যই চাউল বাড়ন্ত, হেইর লাইগা—"

গাঙ্গুলী-গিন্নির ক্রোধ শান্তি হয় নাই, "হা-ভাতের ঘরে চির দিনই চাউল বাড়ন্ত। তা'বলে ভরাপুরা ঘর থেকে আজ অমাবস্যার দিনে লক্ষ্মী বার কেউ করে? হিন্দু হ'লে কি হবে ছোট জাত তো!"

এতটা অপমানের আঘাতে মিলনীর মুখে আর কথা সরিল না। হতাশ মনে সে ধীরে ধীরে বিনা প্রতিবাদে বাহিরে আসিল। ধনীর দুয়ারে গরীব চিরদিনই লাঞ্ছিত হইয়া থাকে; দেনা দিতে না পারাটা যেমন দরিদ্রের অপরাধ, ধনীর দুয়ারে পাওনাগণ্ডা আদায়ের চেষ্টাটাও দরিদ্রের পক্ষে অনুরূপ অপরাধ। গ্রামের বহু ভদ্রলোকের কাপড় কাচিয়া মিলনী তাহাদের পাওনাদার। কেবলমাত্র অনাদায়ের জন্যই তাহার এই অভাব-অনটন। গ্রামের এই ভদ্রলোক নামধেয় প্রাণীমাত্রের কাছেই মুদী, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি ছোটলোক বেটাদের পুরুষপরম্পরায় যাহা পাওনা আছে, হিসাব-নিকাশ ঠিকমত হইলে তাহার অঙ্কটা নেহাৎ অবহেলার হইবে না।

গাঙ্গুলী-গৃহ-প্রত্যাগতা মিলনী আসিয়া স্বামীর শয্যাপাশে দাঁড়াইল, দীননাথ কাঁথার তল হইতে মুখ বাহির করিয়া শুধাইল "কই গেছিলি বউ, বেলা যায় না? রান্‌বি কোন্ সুমে (সময়)?" মিলনী অতি কষ্টে স্বামীকে জানায় ঘরে আজ লক্ষ্মী বাড়ন্ত। রুগ্ন দীননাথের বক্ষপঞ্জর কয়খানি যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের ঝঞ্ঝায় চূর্ণ হইয়া গেল, "গাঙ্গুলী-বাড়ী গেছিলি বুঝি? দিল না কিছু, না রে?" মিলনী মাথা নাড়িয়া না দেওয়ার কথা জানায়।

অতি কষ্টেও দীননাথ হাসে, "বউ, গরীবের দুঃখ কেউ বোঝে না, মানুষও না, শালার ভগবানও না। বলছিলি না, ধান জলে ভাইসা গেল—কাপড় কাচা জলে ভাসে নাই। কাপড় কাইচা খাওয়া পরা চলব, কেমুন (কেমন)? কাপড় কাইচা বাবুদের ভদ্রলোক বানাবি—পয়সার বেলা গালাগাল খাবি। হায়রে ভদ্রলোক—ছোটলোককে সাহায্য করা তো দূরের কথা পাওনা পয়সা দিতেই পরাণ টন্ টন্ করে।" দীননাথ ব্যর্থ আক্রোশে গর্জ্জাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ বাদে দীননাথই বুদ্ধি দিল, "একবারটি পোষ্টমাষ্টার বাবুর বউয়ের কাছে যাইতে পারচ বউ—দ্যাখ্ যদি হাতে পায় ধইরা—"

বাকী অংশটুকু শোনার পূর্ব্বেই মিলনী বাহিরে আসিয়া পড়িল।

এক বাড়ীর অমাবস্যার অপমানের ব্যথা তখনও তার বুকে টন্ টন্ করিতেছিল তথাপি অভাবের তাড়না ও পেটের জ্বালায় অপর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে তাহার অপ্রবৃত্তি হইল না।

পোষ্টমাষ্টারবাবুর গিন্নির কাছে মিলনী দরবার করিলে উহা তিনি কর্ত্তার কাছে পেশ করিলেন বটে; কিন্তু কর্ত্তাটি উত্তর দিলেন, "আজ মাসের বিশ তারিখ পেরিয়ে যায়, এখন কি আর দেনা শোধ করার সময় আছে? ওমাসের পয়লা দোসরা তক্ এসে যেন নিয়ে যায়।" মিলনীর মন ব্যর্থতায় ভরিয়া উঠিল, সে নিজের দৈন্য প্রকাশ না করিয়া পারিল না। সংসারে যেমন মরুভূমি আছে, ওয়েসিসেরও অভাব নাই। দয়ামায়াবিহীনা নিষ্ঠুরা গাঙ্গুলী-গিন্নির পাশে আবার কোমলা করুণাবতী পোষ্টমাষ্টার-ঘরণীর স্থানও আছে। তিনি মিলনীর অঞ্চলে সের কয়েক চাউল আনিয়া ঢালিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কি করি বাছা, ছা-পোষা মানুষ ভরসা তো ওই চাকরিটুকু। ডানে আনতে বাঁয়ে কুলিয়ে ওঠে না। তোমরাও অভাবী মানুষ, বুঝি সব কিন্তু পারি না যে—কি করি বল?"

বলা বাহুল্য, পোষ্টমাষ্টার-গিন্নিও হিন্দু-কন্যা, ব্রাহ্মণ-ঘরণী। অমাবস্যায় ঘরের লক্ষ্মী বাহির করিতে তাঁহারও আপত্তি না ছিল নয়; কিন্তু অমাবস্যার অছিলায় নিজের ঘরের লক্ষ্মী অচলা রাখিতে হইলে অপরের ঘরের জ্যান্ত লক্ষ্মী অনাহারে মারা যায়। কাজেই রীতিনীতি অপেক্ষা তাঁহার প্রাণের দয়ারই জয় হইল।

মিলনী তাঁহার পায়ের কাছে সভক্তি প্রণাম করিয়া হাসিমুখে গৃহে ফিরিল। দীননাথ সকল কথা শুনিয়া বলিল, "বউ, স্বর্গ আর নরক সংসারেই আছে। এখানে অসুরের অভাব নাই আবার দেবতারও কৃপাদৃষ্টি আছে। নইলে রাতদিন অইত না।"

দীননাথের জ্বর ছাড়িয়াছে, ঘরের তণ্ডুলও ফুরাইয়াছে। দীননাথ একটা মোটা চাদরে দেহখানা আবৃত করিয়া পথে বাহির হইল তাগাদায়। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল—সর্ব্বত্র অভাব-অভিযোগের কীর্ত্তন শুনিয়া রিক্ত হস্তেই ফিরিল, বরং দু-এক জায়গায় যথাসময়ে কাপড় না নেওয়া-দেওয়ার জন্য উপরি পাওনা তিরস্কার লাভেও বঞ্চিত হইল না।

ফিরিবার পথে সাত-পাঁচ ভাবিয়া গদাই পালের দোকানে গিয়া হাজির, গদাই অভ্যর্থনা করিল "বয়রে দীনু, তামুক খা।"

অদূরে রক্ষিত তামাকের উপকরণ হুকা কলকি আগুনের মালসার কাছে নিঃশব্দে দীনু বসিয়া গেল। গদাই খরিদ্দারের সহিত আদান-প্রদানে মনোযোগ দিল। কাজের ফাঁকে সে দেখিল দূরের পথে ছত্রের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া কে যেন হন্ হন্ করিয়া পথ অতিক্রম করিতেছে। গদাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভুল করিল না। উচ্চকণ্ঠে সে হাঁকিল—"আরে গাঙ্গুলী মশয়, কৈ চলছেন? হোনেন, হোনেন—তামুক সেবা কইরা যান।"

গাঙ্গুলী মহাশয় ওরফে ভবনাথ গাঙ্গুলী সে ডাকে সন্তুষ্ট হইল না বটে, কিন্তু উপেক্ষাও করিতে সাহসী হইল না। অনিচ্ছায় মোড় ঘুরিয়া দোকানের কাছে আসিয়া বলিল, "দেরে দীনু কল্‌কেটা।"

গদাই উঠিয়া ময়লা গামছার সাহায্যে জলচৌকীটা মুছিয়া গাঙ্গুলীকে বসিতে দিল। দীননাথ কল্‌কেটা আনিয়া তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া দিল। গদাই ডাকিল, "ভোলা গেলি কইরে বাবা, দে তো বামুনের হোকাটা।" ভোলা ওরফে নগেন্দ্রনাথ আনিয়া তিন-কড়ি-বাঁধা হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিল।

গাঙ্গুলী ধূমপানে আত্মনিয়োগ করিলে গদাই বলিল "তারপর গাঙ্গুলী মশয়, আইজ কাইল বেসাতি খান কোন্‌খান থনে? আমাগ দিকে ত পা বাড়ান না দেখি।"

গাঙ্গুলী গদাই পালের বহুদিনের খরিদ্দার। কাজ-কারবারে লেনাদেনার ফলে এখনও প্রায় শতাবধি টাকা দোকানে বাকী পড়িয়া আছে। তাগাদার ভয়ে গাঙ্গুলী এদিকে পারতপক্ষে আগমন করে না। অধিকন্তু কিছুদিন হয় তাহাদের পাড়ায় এক জয়পুরী মহাজন আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। দেশীয় দোকানদারগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে দর নামাইয়া দেয়, বাকীতেও সওদা ছাড়ে। কাজেই অনেক ভদ্রলোকই তাহার দোকানে ভিড় জমাইয়াছেন। সস্তা ও বাকীর লোভে গাঙ্গুলীও সেখানে যায়। গদাইর জবাবে গাঙ্গুলী বলিল "কি করি বল, পাড়ার পাঁচজন সেখানে যায়, আর দরও তোমাদের চাইতে কম। কাজেই—"

গদাই পাল তাহার কথা টানিয়া লইয়া বলিল "বেশ তো পয়সা দিয়া সদায় খাবেন, যেখানে খুসী যান। আর সস্তার কথা বলেন তো, বলি ও ব্যাটা কি দেশের থনে ধন দৌলত লইয়া আপনাগ দান খয়রাৎ করতে বসেছে নাকি? কয়দিন পরে সস্তার কস্তাতে হবে। আমাগ গাহেক ভাগাইবার লেইগাই না সস্তা দেওন। তা দেগ গিয়া। তা আমাগ টাকাটা ত আপনার দিয়া ফালান উচিত।"

ধূমপান গাঙ্গুলীর বিষপানের মত মনে হইল। ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "দিন কতক সবুর কর্ পালের পো, দেনার কথা আমার মনে আছে।"

গদাই বলিল "কয়দিন হৈলা তো বছর ধইরা ভাড়াইলেন। আমাগও ত এই ব্যবসা, আনি নেই খাই। কেমনে চলে কন দেখি?"

গাঙ্গুলী হুঁকা ত্যাগ করিল, গদাই নিজের হুঁকায় কল্‌কে বসাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে দীননাথ জোড়হস্তে কথাটা পাড়িল, "আমিও কর্‌তা, আপনার কাছে চলছিলাম।

আমারে যা অউক আইজগা কিছু দেন গিয়া। না অইলে না খাইয়া মরুম।"

পথে ধরিয়া তাগাদা করায় গাঙ্গুলী গদাইয়ের উপর ভীষণ চটিয়াছিল; কিন্তু গদাই পয়সাওয়ালা লোক—রাগ করিলে সেও ছাড়িয়া কথা বলিবে না। কাজেই মনের ক্রোধ মনে চাপিয়া ছিল। দীননাথের তাগাদা আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিল না। অগ্নি-অবতার হইয়া সে বলিল, "দ্যাখ দীনু, গাঙ্গুলী কি ভিটামাটি ত্যাগ কইরা উইড়া চলছে নাকি যে তোরা পথে ঘাটে ধইরা টাকার তাগাদায় নামবি? পাওনা দেওনা কার না আছে? তা বইলা পথে ঘাটে তোরা ভদ্রলোকের মান মারবি, এতখানি আস্পর্দ্ধা তোদের হ'ল কি বলে শুনি?"

দীননাথের পথে ধরিয়া তাগাদা করার ইচ্ছা ছিল না। গদাইয়ের দেখাদেখি অভাবের তাড়নায় সে অতটা সাহস করিয়াছিল। গদাইয়ের উপর গাঙ্গুলী রাগ করিল না, তাহার উপর যে রাগ করিতে পারে এ বিবেচনা তাহার ছিল না। যখন সে উহা বুঝিতে পারিল, তখন আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হইল না, এমন গাঙ্গুলী মহাশয়ের পানে আর চক্ষু তুলিতে অক্ষম হইল।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হইত—কিন্তু গোল বাধাইল ভোলা। সে বিংশ শতাব্দীর সাম্যযুগের আবহাওয়ার মানুষ। লেখাপড়া শিখিয়া সে দোকানদারীতেই ঢুকিয়াছে, মেজাজটি তাহার সাধারণ দোকানদারের মত নয়। সে অগ্রসর হইয়া জবাব দিল "পাওনা টাকা চাওয়ার মানে অপমান নয় ঠাকুর-জ্যেঠা। আপনার যদি তাতে অপমান বোধ হয়—দয়া করে দেনাগুলো শোধ করেই না হয় পথে বেরোবেন, কেউ কথাটিও বলবে না।"

ক্রুদ্ধ গাঙ্গুলী এবার তাল সামলাইতে পারিল না, "কি বললি বেটা, দু'পাতা ইংরেজী শিখেছিস বলে তুই সেদিনের গদাই মুদীর পো আমার আসিস্ মান-অপমান শেখাতে?"

ভোলা চটিল, "গালাগাল দিবেন না মশায়, ভদ্রভাবে কথা বলুন।" গাঙ্গুলী ঠাট্টা করিয়া বলিল, "ইঃ কি আমার ভদ্রলোক রে, ওর সাথে ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে।"

ভোলার মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, "দেখুন, ভদ্রলোক ছোটলোক কারও গায় লেখা থাকে না। মুদীর ছেলে আমি অস্বীকার করি না, কত ভদ্রলোকের লেখাপড়া-জানা ছেলে এখন মুদীর দোকানে গোমস্তাগিরি করে। বামুনের ছেলে জুতা বেচে খায়, পানের দোকান করে—তা বলে তাদের কেউ অভদ্র বলে না। আর আপনি কুলীন বামুন ভদ্রলোক—করেন তো টিন্নিমোক্তারী—জোচ্চুরি।"

গাঙ্গুলী জলিয়া উঠিল, "তবে রে হারামজাদা—আমি জোচ্চোর—আর বাপদাদা সাধুপুরুষ?"

ভোলা লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, "মুখ সামলে কথা বল ঠাকুর, নইলে—"

গদাই শশব্যস্ত হইয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল, "আ-রে হতভাগা কি করচ—কি করচ?"

সোরগোল শুনিয়া দু'দশ জন লোক আসিয়া জমা হইল এবং দু'তরফ হইতে তখন যথারীতি কটূক্তি বর্ষিত হইতে লাগিল। আগত জনতা উভয়কেই শান্ত করার জন্ত চেষ্টা করিতে ছাড়িল না।

গাঙ্গুলী ক্রোধে ফুলিয়া চলিতে চলিতে শাসাইয়া গেল, 'পালের পো'কে সে শিখাইয়া দিবে। পালের পোও বামুনের ভিটায় ঘুঘু চরাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে ভুলিল না।

এ বিভ্রাটে হতজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল একমাত্র দীননাথ—যেন সে-ই এই অনর্থের জন্ত একমাত্র দায়ী। গোলমাল কমিয়া গেলে তাহার মুখে কথা ফুটিল, "অদেষ্ট, কার মুখ দেইখা জানি উঠ ছিলাম।"

ভোলা তাহাকে সান্ত্বনা দিল, "ঘাবড়াও কেন দীনুকাকা, পাওনা টাকা চেয়েছ তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে যে উনি এত তম্বি করে উঠবেন। উনি কি কম শয়তান, গোয়াল কও, মুদী কও, ধোপা কও, নাপিত কও—কার কাছে না ধারে? আমাদের পাওনা হবে শ'য়ের উপরে—অথচ অকৃতজ্ঞ তিনি গেছেন দালালী করতে রায় বাড়ীর পূজার সওদাটা যাতে জয়পুরীর দোকান থেকে আনা হয়। কেন মশায়, আপনার কে সে বাপ ঠাকুর্দা—তার জন্ত এত মাথাব্যথা কেন?"

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল—"কমিশন আছে যে।"

দীননাথ মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল, "তোমরা বাবা যা খুশী কও, তাতে দোষ অইবে না। আমি গরীব, আমার ভালতেও দোষ, মন্দতেও দোষ।"

ক্রমশঃ জনতা কমিয়া আসিল। দীননাথ গদাইয়ের কাছে মিনতি করিয়া বলিল, "আগের পাওনাই দিতে পারি না দাদা, আর চাই-ই বা কোন্ মুখে? ঘরে একটি দানাও নাই যে মাইয়াটার মুখে দিমু।"

গদাই বলিল, "কি করি বল দীনু, তোরা দিতে পারচ না—যারা দিতে পারে তারাও চিৎ হাত উপুড় করবে না। দে ভোলা, সের পাঁচ চাউল অর আঁচলে।"

দীননাথ হাতে স্বর্গ পাইল, "বাঁচাইলা দাদা, কি করি কও। পাওনাটা চাইলেই বেবাকে গাঙ্গুলী মশয়ের মত মারতে আসেন। ছিল করপালি ধান। তাও শালায় গেল উইড়া।"

সন্ধ্যার পর গাঙ্গুলী-বাড়ীতে দীননাথের ডাক পড়িল, পাওনা-দাওনা মীমাংসার জন্ত নয়। গাঙ্গুলী মহাশয় গদাই ও তাহার ছেলের নামে এক নম্বর ফৌজদারী-মামলা দায়ের করিবে—দরখাস্তের মুসাবিদা ইস্তক প্রস্তুত। গাঙ্গুলী, চাটুয্যে, ঘোষের পো প্রভৃতি গ্রাম্য শনিমণ্ডল বৈঠক করিয়া বসিয়াছে।

দীননাথ উপস্থিত হইলে গাঙ্গুলী বলিল, "দীনু এসেছিস্—শোন্ বাবা।"

মুসাবিদার অংশবিশেষ তাহাকে পড়িয়া শোনানো হইল, "আমি শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় পিতা মৃত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, সাকিন বীরগাঁ, থানা লৌহজং, জিলা ঢাকা, বেলা অনুমান ১০ ঘটিকার সময় ভিন্ন গ্রাম হইতে তাই তাগাদা করিয়া মদীয় গ্রাম-নিবাসী গদাই পালের দোকানের সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় উক্ত গদাই পাল ও তস্য পুত্র ভোলা ওরফে নগেন্দ্রনাথ পাল জোরজবরদস্তি করিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া আমাকে প্রহার করে এবং তাইতাগাদার আদায়ীকৃত মং ৪১৷৵১৫ গণ্ডা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া রাখে। ইত্যবসরে সাক্ষীগণ আসিয়া পড়ায় কোন্ প্রকারে প্রাণগতিকে রক্ষা পাইয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, পাড়ার জয়পুরীর দোকানে আমি বেসাতি খাই, আক্রোশের ইহাই কারণ।" এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঘোষের পো একটা সাফল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "কেমন হ'লরে দীনু, ব্যাটা তেলির পো, এবার বুঝুক ঠেলাখান্। ভবনাথ গাঙ্গুলীর অপমান না আমাগ সারা গিরামের অপমান। কি বলিস্ তুই দীনু?"

উপস্থিত শনিমণ্ডলীর মুখের পানে চাহিয়া দীননাথের জ্ঞান যেন লোপ পাইতে বসিল। ইহারা মানুষ না পিশাচ! ইহারা না পারে কি? দিনে ডাকাতি করিতে ইহাদের বাধে না।

ইহাদের সকলেই গদাই পালের কাছে ঋণী। আপদে বিপদে গদাই ইহাদের টাকা কর্জ্জ দেয়, ধান চাউল দিয়া প্রাণ বাঁচায়, ধার দিয়া ইজ্জৎ রক্ষা করে। তুচ্ছ একটু কথা কাটাকাটির জন্য তাহার বিরুদ্ধে এতটা ষড়যন্ত্র করিতে কাহারও চক্ষুলজ্জা নাই।

দীননাথকে নীরব দেখিয়া চাটুয্যে ধমক দিল, "বড় হাঁ কইরা চাইয়া রলি যে। কথা কি ভুইলা গেলি নাকি?"

দীননাথের চমক ভাঙ্গিল, "আগ্যে করতা, আমি মুখ্যু মানুষ, কি কমু ক'ন? আপনারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা রইছেন।"

ঘোষ দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "আরে বেটা, তুই-ই যে প্রধান সাক্ষী। তুই রাস্তার থনে সাত তাড়াতাড়ি গিয়া গাঙ্গুলী মশয়রে ছাড়াইয়া দিছস্।"

দীননাথ আকাশ হইতে পড়িল। সারাটা সকাল ইহাদের দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়াও একটা পয়সা মিলে নাই। গদাই পালের দয়াতেই আজ বরাতে এক মুঠো ভাত জুটিয়াছে, আর এখন এই সকল গ্রাম্য ভদ্রলোকের পক্ষভুক্ত হইয়া কিনা সেই গদাই পালের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হইবে!

দীননাথ জোড় হস্তে কহিল, "আমায় ক্ষেমা দেন করতা, এমুন ধম্মনাইশা ডাহা মিত্যা কতা আমার মুখ থনে বাইর অইব না।"

গাঙ্গুলী রাগিয়া উঠিল, "তবে তুই সাক্ষী দিবি না, বল্।"

দীননাথ পূর্ব্ববৎ বলিল, "আগ্যা না, দীনু ধোপা বাপের ছাওয়াল, মরলেও মিছা কইবার পারবে না।"

গাঙ্গুলী শাসাইয়া কহিল, "তবে তোর মরতেই হবে।"

দীননাথ দমিল না, "হেই যদি ভগমানের ইচ্ছা অয়, মরুম। পরাণ দিমু ত ধম্ম খামু না।" দীননাথ আর সেখানে দাঁড়াইতেও সাহস করিল না।

এবার চাটুয্যে মহাশয় মুখ খুলিলেন, "কলি, ঘোর কলি, শালার ছোটলোকের বাড় বেড়েছে। এর বিহিত কর গাঙ্গুলী, তিলির পোলায় মান মারবে, ধোপার পোলায় মুখের সামনে দাঁড়ায়ে কথা বলবে, বলি আমাদের আর রইল কি! দীনা ধোপা সেও আমাগরে চ'খ রাঙায়।"

ঘোষের পো সান্ত্বনা দিল, "থামেন চাটুয্যা মশয়, ঘাবরাবেন না গাঙ্গুলী মশয়—পেসন্ন ঘোষ এখনও মরে নাই। সব শালারে সিদা না করি তো আমার নামই মিথ্যা। সাক্ষীর লেইগা চিন্তা করেন ক্যান্।"

অতঃপর গদাই পালের মোকদ্দমা পরিচালন, সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ ও সঙ্গে সঙ্গে দীনু ধোপার সর্ব্বনাশের শলাপরামর্শ আরম্ভ হইল।

কয়েক মাস পরের কথা। গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাহির-বাড়ীতে দেখা গেল একটা চালাঘর করিয়া কয়েকজন পশ্চিমা ধোপা আস্তানা গাড়িল। গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের দুয়ার-দুয়ার স্বয়ং গাঙ্গুলী মহাশয় গিয়া ধোপাদের জন্য ক্যানভাস করিতে আরম্ভ করিল। অল্প কয়েক মাসেই পশ্চিমাদের ব্যবসা জাঁকিয়া উঠিল। দীননাথের ধরাবাঁধা খরিদ্দারও খসিতে লাগিল। বিদেশীর আমদানীতে দেশীর প্রতি লোকের মন আর বসিল না। বলা বাহুল্য, গাঙ্গুলী-মহাশয়ের শ্যালকটি আসিয়া পশ্চিমা ধোপার লণ্ড্রীর ম্যানেজারের পদ অলঙ্কৃত করিয়া বসিল।

মিলনী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও কাজ পায় না, দীননাথ একেবারে কর্ম্মহীন। স্বামীর কাছে নালিশ জানায় মিলনী, "কি হবে গো, ওরা যে বেবাক্ বাড়ীই দখল কইরা বসল।"

দীননাথ অতি দুঃখে হাসে, "মন্দ কি বউ, কাজ কইরা পয়সা পাইনা, আর কাজও নাই, পয়সাও নাই। না খাইয়া গতর খাটান তো বাঁচল।

মিলনী বলে, "আমাগ দিয়া কাপড় কাচাইয়া পয়সা দেয় না, অগ ত দেয়।"

দীননাথ গম্ভীর হইয়া উঠে, "বউ, বন্দেমাতরমের দিন কিনা। দেশীর থাইকা বিদেশীর আদর বেশী। আমি দুই পয়সার কাপড় ধুইয়া কর্ত্তাগ কাছে পয়সার জন্য খোসামোদ করি—তারাই নগদ আড়াই পয়সায় অগ কাছে কাপড় ধোয়ায়। আমার পাওনা চাইলে বলে যখন পারি, দিমু।"

ধীরে ধীরে দীননাথের কাজ বন্ধ হইল, সংসার অচল, হাঁড়িতে জল চড়ে না। মিলনী পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিয়া কয়েক দিন চালাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু একার কাজের বিনিময়ে তিন পেটের খোরাক জোটাইতে কেহই রাজী হইল না।

গাঙ্গুলী মহাশয় দয়া করিয়া এক দিন শুনাইয়া গেল, "বাঙালীর

মাইর, দুনিয়ায় বাইর। হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারায় কাজ হয় বেশী—কেমন চলছে দীনু?"

দীননাথ ঘৃণায় মুখ ফিরাইল, মিলনী মাথার কাপড় টানিয়া দিল। গাঙ্গুলী উচ্চহাসি হাসিয়া চলিয়া যায়। গাঙ্গুলী-বাড়ীর লণ্ডীতে আরও লোক আসিল, গ্রাম ছাড়িয়া ধোপারা গ্রামান্তরে গিয়া কাপড় যোগাড় করিয়া আনিতে লাগিল—কথামত কাজ দেয়, পয়সাও আদায় করিয়া লয়।

নিরপেক্ষ ভদ্রলোকরাও পশ্চিমাদের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে—যুক্তি দেখায়—"পশ্চিমা ও বাঙালীতে রাতদিন তফাৎ। বাঙালী ঠকায়—পশ্চিমারা লোক বিশ্বাসী। ওরা কাজ দেয় কথামত—দীননাথ একবার কাপড় নিলে, দশ দিনেও তার টিকি দেখা যায় না।"

অভিযোগের শেষের অংশটায় কিছু সত্য আছে বটে। দীননাথ একা মানুষ—অভাবী লোক। অসুখ-বিসুখ লাগিয়াই আছে। ঠিক সময়ে কাজ নেওয়া-দেওয়া তাহার একার পক্ষে অনেক সময় অসুবিধা হয় বটে; কিন্তু পশ্চিমাদের মত রীতিমত পয়সা দিলে সেও ভিন্ন গ্রাম হইতে নিজের লোক আনাইয়া যথা-সময়ে কাজ নির্ব্বাহ করিতে পারে—একথা বোধ হয় ভদ্রলোকদের মগজে প্রবেশ করে না।

কর্ম্মহীন দীননাথ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও বাকী পয়সা আদায় করিতে না পারিয়া পাগলের দশা প্রাপ্ত হইল। নিজের চক্ষের উপর স্ত্রী-কন্যার অনাহারক্লিষ্ট মুখ অবিরত তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে বলিল, "বউ, চল্ এবার শহরে যাই।"

মিলনী অনুসন্ধান করে, "শহরে গিয়া কি কর্‌বা, কও।"

দীননাথ জবাব দেয়, "দিনমজুরী খাটুম, না হয় একটা কল-কারখানায় মাগ্-সোয়ামী ভর্ত্তি অইয়া যামু।"

মিলনী উত্তর দিল না—গণ্ড বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু পড়িল মাত্র। দীননাথ শেষ সম্বল ঘরের পিতলের কলস ও ছোট গামলাটি বিক্রী করিয়া রাহা-খরচ সংগ্রহ করিতে গেল।

তুলসীমূলে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইয়া মিলনী গৃহে প্রবেশ করিতেই দীননাথ বোঁচকাটি কাঁধে লইয়া মিলনীকে ঘুমন্ত কন্যার ভার বহনের আদেশ দিল। দীননাথ সন্তর্পণে কুটীরের দরজাটি বন্ধ করিয়া পথে পা বাড়াইয়া দিল। মিলনী চাহিয়া দেখিল তুলসীতলার প্রদীপটি বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া তখনও জ্বলিতেছে। দীননাথ পশ্চাতে আসিয়া ডাকিল—"বউ, আর দেরি করিস্ না, গাড়ী ধরতে অইব যে।"

লণ্ডনে সমরকালীন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডিগ্রীধারীদের অধিকতর শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান পূর্ব্বক একটি কার্য্য-পদ্ধতি উপস্থাপিত করিবার জন্য ডাঃ এডিসন (অধুনা লর্ড এডিসন) কর্ত্তৃক একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। রাইট অনারেবল দি আর্ল অব এথলোন্ ইঁহার সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং সেই সময় হইতেই ইহা 'এথলোন কমিটি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে।

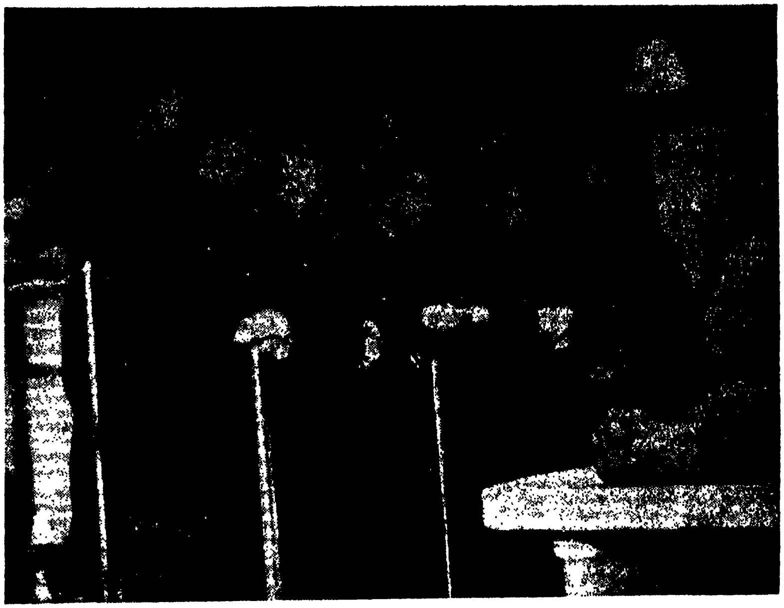
লণ্ডনস্থ 'স্কুল অব হাইজীন এণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন' এবং 'ব্রিটিশ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্কুল' এই কমিটির অনুমোদনের ফল। রক্‌ফেলার ট্রাস্ট হইতে ২৫০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য-প্রাপ্তির ফলে প্রথমোক্তটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্য্যন্ত পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলের জন্য সরকার হইতে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় নাই। প্রয়োজন-অনুযায়ী একটি হাসপাতাল না পাওয়াতে স্কুল-প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট বিলম্ব হইতে থাকে। অবশেষে লণ্ডন জেলা-পরিষদের সহিত চুক্তির ফলে কমিটি তাহাদের একটি হাসপাতালে পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্কুল খুলিবার অধিকার লাভ করেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মে তারিখে ভূতপূর্ব সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ব্রিটিশ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্কুলের উদ্বোধন করেন। বর্ত্তমানে ইহাতে চিকিৎসা-শাস্ত্র, শল্য-বিদ্যা (surgery), ধাত্রী-বিদ্যা, স্ত্রী-রোগ-চিকিৎসাবিদ্যা, রোগ বিদ্যা (pathology) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। কোনো 'আণ্ডার-গ্রাজুয়েট'কে এই স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় না। কেবলমাত্র 'পোস্টগ্রাজুয়েট'রাই ইহার কোনো-না কোনো বিভাগে যোগদান করিয়া সেই বিভাগের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করিতে পারেন।

স্কুলে শিক্ষকতার জন্য স্থায়ী ভাবে একদল শিক্ষক ত নিযুক্ত আছেনই, উপরন্তু অন্যান্য খ্যাতিমান শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারাও প্রায়ই বক্তৃতার ব্যবস্থা করানো হয়।

স্কুলটি হেমারস্মিথ হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট। লণ্ডন জেলা-পরিষদের এই প্রকাণ্ড হাসপাতালটিতে শয্যার (Bed) সংখ্যা ৭৫০টি। এগুলির তত্ত্বাবধান করিবার ভার স্কুলের কর্মীদের উপর অর্পণ করা হয়। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রায় সাড়ে চার বৎসরের মধ্যেই বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা ইহার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। ১৯৩৬-৩৭ ইংরাজীতে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৪৭৯, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব বৎসরে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১১২৪এ দাঁড়ায়।



'পোষ্ট-মরটেম' কক্ষে রোগ-তত্ত্ব-বিৎ মৃত ব্যক্তির ব্যাধির বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন

যুদ্ধকালীন পরিবর্ত্তন

যুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন, ছাত্রেরা প্রায় সকলেই স্কুল পরিত্যাগ করিল। ফলে বহু যত্নে-গড়া এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল। সৌভাগ্যক্রমে হাসপাতালটি আপৎকালীন চিকিৎসা-বিভাগের পরিচালনাধীনে আসায় শিক্ষকবর্গের মধ্যে কয়েক জনকে হাসপাতালের কার্য্য-নির্বাহের জন্য রাখা হইল।

বিমান-আক্রমণে আহতদের আশ্রয়-দান এবং চিকিৎসাদির নিমিত্ত স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত রোগীকে স্থানান্তরিত করিয়া হাসপাতাল খালি করা হইল। কর্মীর সংখ্যা পুনরায় বাড়ানো হইল এবং আহতদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল। সাধারণ কাজের জন্য 'সেণ্ট মেরিজ হস্‌পিটাল স্কুল' হইতে একদল আণ্ডার-গ্রাজুয়েটকে লওয়া হইল। অবসর সময়ে শিক্ষকগণ এই সকল ছাত্রকে উপদেশ দানে এবং যুদ্ধ-কালীন ব্যাধি-সমূহ সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, ফলে তাঁহাদের শক্তি এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইল।

কার্য্যের ক্রমবিস্তৃতি

ব্রিটিশ পোষ্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্কুল সাধারণ মেডিক্যাল স্কুলেরই কার্য্যক্রম অনুসরণ করিয়া চলিবে কিনা, প্রায় মাস তিনেক সে-সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের মনে সংশয় জাগিয়া রহিল। ইতিমধ্যে চিকিৎসকমণ্ডলীর ভিতরে পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গেল। নব নব জ্ঞান আহরণ করিয়া আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার ইচ্ছা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। বিজিত দেশসমূহের যে সমস্ত অধিবাসী ব্রিটিশ অধিকারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকের মনে ব্রিটিশ ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা লাভ করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মিল।

এদিকে, মেডিক্যাল স্কুলসমূহ লণ্ডনের বাহিরে স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় হাসপাতালসমূহ আংশিকভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। সুতরাং কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, যদি আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের স্ব-স্ব স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলে ভর্তি করা হইবে। ব্যাপকভাবে শিক্ষা দান করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হইল এবং সেই সময় হইতে স্কুলের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা দ্রুত প্রসার লাভ করিতে লাগিল।

বিমান-আক্রমণে আহতদের চিকিৎসার জন্যই বিশেষভাবে সংগঠিত সমিতিটির নাম ই. এম. এস.। ইহার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ চিকিৎসকেরই যুদ্ধক্ষেত্রে

হইলেন। স্কুলটি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে হস্তপদাদির সমরকালীন চিকিৎসা, ভেষজবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছাত্রদিগকে শব-ব্যবচ্ছেদ এবং যুদ্ধে আহতদের দেহে অস্ত্রোপচার-প্রণালী হাতে-কলমে শিখাইয়া দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুল সমাজের এক মহদুপকার সাধন করিতেছে। যুদ্ধজনিত নানা জটিল ব্যাধির চিকিৎসা-বিষয়ক আধুনিক গবেষণার প্রতি সামরিক বিভাগে নিযুক্ত চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার মূলে রহিয়াছে এই প্রতিষ্ঠানটির সমর-কালীন শিক্ষা-প্রণালী। এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি তাঁহাদের ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অস্ত্র-চিকিৎসা-বিভাগের ডিরেক্টর অধ্যাপক গ্রে টার্ণার আধুনিক প্রগতি-মূলক গবেষণায় কৃতী এবং বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সার্জন-দিগকেই লেক্‌চারার রূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

বোমা এবং গোলাগুলি ইত্যাদির আঘাত সম্বন্ধে স্কুলের কর্মীরা যে-সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ



চিকিৎসকগণ কর্তৃক একটি অস্ত্রোপচার অবলোকন

আহতদের ক্ষত-চিকিৎসা-বিষয়ে কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে এই বিষয়ে ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্কুল কিংস কলেজ হাসপাতালের কর্ণেল বাক্সটন কর্তৃক প্রদত্ত প্লাষ্টার অব প্যারিসের করণ-কৌশল প্রদর্শনাদি দ্বারা অনাড়ম্বরভাবে কাজ সুরু করিল। ইহা এত দূর সাফল্য লাভ করে যে, দর্শকদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য স্বল্পকালের ব্যবধানেই দুই-দুই বার ইহা পুনঃপ্রদর্শন ও ব্যাখা করিতে হয়। এ ছাড়া লিভারপুলের মিঃ ওয়াটসন জোন্সের নিকট ছাত্র-দিগকে অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা-প্রণালীও শিখিতে হইত। সকাল দশটা হইতে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া মিঃ ওয়াটসন ছায়া-চিত্র, মডেল ইত্যাদির সাহায্যে বক্তৃতা করিতেন। সকালে ভগ্ন বা স্থানভ্রষ্ট অস্থি পাটায় রাখিবার পদ্ধতি প্রদর্শন করা হইত; অপরাহ্ণে ছাত্রেরা সেগুলা যথাস্থানে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিতেন। তারপর চা-পানান্তে তাঁহারা পুনরালোচনার জন্য তাঁহারা সমবেত হইতেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও উল্লেখযোগ্য গবেষণা

এই সকল শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া স্কুলকর্তৃপক্ষ শিক্ষণীয় আরো নানা বিষয় প্রবর্তনে তৎপর



দুই জন চিকিৎসক অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটি নব উদ্ভাবিত যন্ত্রের গঠন-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন

আঘাতাদি ছাড়া এক দেহ হইতে অন্য দেহে রক্ত এবং রক্তমস্ত (serum) সঞ্চারিত করা সম্বন্ধেও স্কুলে গবেষণা-কার্য্য চালান হয় এবং এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টাও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি-নিবন্ধন কর্মীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়ায়

সাধারণ গবেষণা-কার্য্য অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু চিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণা-পরিষদের অনুরোধে সিলিওকসিস (Silicosis) সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান এখনো চলিতেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

চিকিৎসা-বিদ্যা এবং শল্য-বিদ্যা শিক্ষার্থী বহু ছাত্রই আসিয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইংলণ্ডস্থ সৈন্যবাহিনী হইতে। বৈদেশিক ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই বিজিত দেশসমূহের আশ্রয়প্রার্থিগণ। তা ছাড়া চীন আমেরিকা এবং পেরুদেশ এমন কি সুদূরস্থিত শ্যামদেশ হইতেও ছাত্রদল আসিয়া ভর্তি হইয়াছে।

লণ্ডনের মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এই স্কুলের মাতৃমঙ্গল-বিভাগের কাজ পূরাদমে চলিতেছে। এই বিভাগে বৎসরে প্রায় দুই হাজার জাতকের জন্ম হয়। যদি আরও অধিকসংখ্যক শয্যার ব্যবস্থা করা যাইত তাহা হইলে বর্তমান যুদ্ধের সময় এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইত। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় সুরু করিবার পূর্বে নিজেদের অর্জিত বিদ্যাকে ঝালাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে দলে দলে এই স্কুলে ভর্তি হইতেছেন বলিয়া, তরুণ চিকিৎসক-সম্প্রদায় সৈন্যদলে যোগদান করিবার সুযোগ লাভ করিতেছেন। এই স্কুলে যোগদানকারীদের মধ্যে আবার এমন অনেক বিবাহিতা মহিলাও আছেন বহুকাল যাবৎ নিজেদের ব্যবসায়ের সহিত যাঁহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

স্কুল-কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন যে, যুদ্ধাবসানের পর ইহার কর্মক্ষেত্রকে সম্যকরূপে সম্প্রসারিত করা



অভিনিবেশ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণরত চিকিৎসকগণ

হইবে এবং কর্মীসংখ্যাও বাড়ানো যাইবে। ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে পোস্টগ্রাজুয়েট শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করা হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশের আরও বহুসংখ্যক ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান কিভাবে করা যায় স্কুল-কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন।*

* কর্ণেল এ, এইচ প্রক্টরের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

চা-দর্শন

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (ক্যান্টাব), বার-এট-ল

হালিদি ইদিব হালুম তাঁর *Inside India* নামক মূল্যবান গ্রন্থে লিখেছেন, বোম্বের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে বসে তিনটি জিনিস তিনি দেখেছিলেন যা ভারতীয় সমস্যার যাবতীয় রহস্য তাঁর কাছে সুপ্রকট করে দিয়েছিল। একটি হচ্ছে, এক হিন্দু চা-ওয়ালা চীৎকার করে যাচ্ছিল "হিন্দু চা", "হিন্দু চা"; আর একটি হচ্ছে, এক মুসলমান চা-ওয়ালা চীৎকার করে যাচ্ছিল "মুসলমান চা", "মুসলমান চা"; আর তৃতীয় দৃশ্য হচ্ছে, এক ইংরেজ সার্জেন্ট কয়েক জন হিন্দু-মুসলমানকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

এ দৃশ্য রোজই আমরা প্রত্যেক স্টেশনে দেখতে পাই, তবে অভ্যস্ত বলে এ সব দেখে আমাদের মনে চিন্তা জাগে না। শ্যেন-দৃষ্টি বিদেশিনীর মনে কিন্তু জেগেছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ গড়তে হ'লে বিদেশীদের কথাও শোনা দরকার। যারা বনের বাইরে থাকে, তারাই তার আকার-প্রকারের বিষয় সঠিক খবর রাখে।

ভারতবর্ষের জাতীয়তা আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রধান কারণ এই হিন্দু চা ওয়ালা আর মুসলমান চা-ওয়ালা। এদের কি দেশ থেকে তাড়ান যায় না?

জীর্ণ কাপড় পরে, অপরিচ্ছন্ন একটা 'ট্রে'তে অতি পুরাতন দু-তিনটি চায়ের পেয়ালা আর অতি সস্তা একটি চা পুঁজি নিয়ে, দীনহীন বেশে চা-ওয়ালা আমাদের তার বিষাক্ত রাসায়নিক দিতে আসে বটে, তাকে তাড়ান কিন্তু

প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ রাজকে তাড়ানর চেয়ে কঠিন ব্যাপার। আকবর সে চেষ্টা একবার করেছিলেন, তাঁর যুগের চা-ওয়ালার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে, ঐকান্তিক ভাবে। সদ্য প্রকাশিত একটি ইংরেজী পুস্তকে দেখলুম, তাঁর বিষয় লিখেছে :

This Muslim walked the streets bearing Hindu religious marks on his forehead. He wore the sacred girdle of the Zoroastrians from Persia, the ancestors of the present day Parsees.

কিন্তু কোথায় সে আকবর, আর কোথায় তাঁর সে প্রচেষ্টা? ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এখনও নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আছে। হিন্দু চা-ওয়ালা আর মুসলমান চা-ওয়ালা হচ্ছে তাদের একটি প্রতীক।

সে যাই হোক, আকবর যা বুঝেছিলেন আর যা করেছিলেন সেই হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির চূড়ান্ত কথা। ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক করতে না পারলে, ভারতীয় রাষ্ট্রসমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হবে না। আর তার জন্য চাই আকবরের মানসিকতা—তাঁর উদারতা, তাঁর গুণগ্রাহিতা, তাঁর সার্ব্বজনীনতা। আবার এই দেশে আকবরের মতই মুসলমানকে হিন্দু সাজতে হবে আর হিন্দুকে মুসলমান সাজতে হবে। হিন্দু চা-ওয়ালার চা মুসলমানকে পান করতে হবে, আর মুসলমান চা-ওয়ালার চা হিন্দুকে পান করতে হবে; আর এ কাজ করতে হবে পর্দ্দার অন্তরালে নয়, লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্য ভাবে, সকলের সামনে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে। ব্যাপক ভাবে যদি এ কাজ কিছু দিন ধরে করা যায়, তা হ'লে হয়ত হিন্দু চা-ওয়ালা আর মুসলমান চা-ওয়ালা দেখতে পাওয়া যাবে না, কেবল চা-ওয়ালাই দেখতে পাওয়া যাবে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীও দেখতে পাওয়া যাবে না, মুসলমান জাতীয়তাবাদীও দেখতে পাওয়া যাবে না, কেবল জাতীয়তাবাদীই দেখতে পাওয়া যাবে। হিন্দু-মুসলমানের জনতাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন সার্জ্জেণ্ট সাহেব তাহলে আর অনুভব করবেন না।

এই চা-দর্শনের একটা Pragmatic (মঙ্গলময়) সমাধান করতে পারলে ভারতীয় জাতীয়তার জটিল সমস্যার সমাধানও হয়ে যাবে। দুঃখের বিষয়, ইউরোপ এবং আমেরিকায় গিয়ে দার্শনিক কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত, অথচ দেশের সর্ব্বত্র বিরাজমান এই সমস্যার গুরুত্ব এখনও আমরা উপলব্ধি করলুম না। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—The eyes of a fool are at the ends of the Earth. বাক্যটি নিজেদের বিষয়ে প্রয়োগ করতে অনেক সময় আমার প্রলোভন হয়।

হিন্দুর আসরে যদি মুসলমানেরা দলে দলে যেতে আরম্ভ করেন, আর মুসলমান-আসরে যদি হিন্দুরা দলে দলে যেতে আরম্ভ করেন, হিন্দুর গান যদি মুসলমানেরা আগ্রহের সঙ্গে শুনতে আসেন, আর মুসলমানের গান যদি হিন্দুরা আগ্রহের সঙ্গে শুনতে আসেন, মুসলমানের বই পড়া যদি হিন্দুরা তাঁদের কর্ত্তব্য বলে স্থির করে নেন, আর হিন্দুর বই পড়া যদি মুসলমানেরা তাঁদের কর্ত্তব্য বলে স্থির করে নেন, হিন্দুর সভায় যদি মুসলমানেরা নিয়মিত ভাবে গিয়ে বক্তৃতা দেন, আর মুসলমানের সভায় যদি হিন্দুরা নিয়মিত ভাবে গিয়ে বক্তৃতা দেন, হিন্দুর তারিফ যদি মুসলমানেরা প্রাণ খুলে করে বেড়ান, আর মুসলমানের তারিফ যদি হিন্দুরা প্রাণ খুলে করে বেড়ান, আর জনসাধারণের মঙ্গলের কাজে যদি হিন্দু-মুসলমান আগ্রহের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তাহলে হিন্দু চা-ওয়ালার এবং মুসলমান চা-ওয়ালার সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকবে, আর তাদের জায়গায় নূতন এক চা-ওয়ালার দল দেখা দেবে যারা চায়ের পারমার্থিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করবে না।

ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন, আর ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের জন্য প্রয়োজন সার্জ্জেণ্ট সাহেবের। ডাক্তারের ফি দিতে যদি কষ্ট বোধ হয়, তাহলে শরীরকে সুস্থ করে তোলা দরকার, আর সার্জ্জেণ্ট সাহেবের হুমকি যদি অসম্মানজনক বলে মনে হয়, তাহ'লে সমাজ-দেহকে সুস্থ করে তোলা দরকার। দেহের বিকার আসে যখন পঞ্চভূতের যথোচিত সংমিশ্রণ হয় না; সমাজের বিকার আসে যখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যথোচিত সংমিশ্রণ হয় না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যথোচিত সংমিশ্রণ, তাদের মধ্যে প্রেম এবং প্রীতির অটুট বন্ধন স্থাপন—সেই হ'ল চা-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

দর্শনের ক্ষুদ্র একটা সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্ত বিশ্ব-দর্শনের সমাধানের প্রয়োজন হয়। নূতন একটা Cosmology তৈয়ের করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। চা-দর্শনের বেলাতেও তাই। চা-দর্শনের উচিত সমাধানের জন্য নূতন এক সমাজ-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করা দরকার, নূতন এক Social Ideology বা সামাজিক আদর্শের সৃষ্টি করা দরকার। সে আদর্শ ব্যাপক সামাজিক আকারে যথাসময় আসবে। সে শুভদিনের জন্য বসে থাকলে কিন্তু চলবে না। এ যুগের সব সমস্যার মত আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমষ্টিগত সমাধান নির্ভর করবে বিভিন্ন ব্যষ্টিগত সমাধানের উপর, খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টার উপর। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সুযোগ, সুবিধা এবং ক্ষমতামত এ

কাজে আত্মনিয়োগ করা দরকার। সমষ্টিগত সমাধান যথা-সময় তাহ'লে নিশ্চয় আসবে।

সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য জীবনকে উচ্চতর ভূমি থেকে দেখা দরকার। সব রোগেরই ঔষধ আছে, তবে চিকিৎসকের দৃষ্টি থাকা চাই। সব সমস্যারই সমাধান আছে, তবে মনের ক্ষমতা, দৃষ্টির প্রসারতা, চিত্তের উদারতা দরকার মত বাড়ান চাই। জীবন-সমস্যাকে সাধারণ আমরা দেখি হিন্দু হিসাবে, মুসলমান হিসাবে, শিখ হিসাবে, খ্রীষ্টান হিসাবে, কোন-না-কোন গণ্ডির মানুষ হিসাবে। সম্প্রদায়মুক্ত মন দিয়ে, বিচারকের মন দিয়ে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি দরদী মন দিয়ে সমস্যাকে আমরা দেখি না। দলের মানুষ হিসাবে দেখি, শুধু মানুষ হিসাবে দেখি না; হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখি, মুসলমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখি, বিশ্বসভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখি না। আর তাই আমাদের রচিত সমাধান একদেশদর্শিতা দোষদুষ্ট হয়।

যে মানুষ, যে জাতি তাদের মনকে জীবন-সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে তুলতে পারে নি, তাদের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। বেষ্টনীর সঙ্গে অবিরত সামঞ্জস্য রাখার দাবীই প্রকৃতি মানুষ এবং জাতির কাছ থেকে করে। মাথা উঁচু করে বাঁচবার জন্য এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দরকার।

গোড়া পত্তন করা চাই দেশব্যাপী নূতন এক atmosphere বা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। সে কাজ ঠিক মত হয়ে গেলে, বাকী সবই সহজ হয়ে যাবে। বসন্তের মলয় বাতাস বইতে সুরু করলে কোকিল আপনিই ডেকে উঠবে।

আজকালকার সব কাজেরই মত এই আবহাওয়া, atmosphere, সৃষ্টি হতে পারে বিরাট্ এবং ধারাবাহিক এক সামবায়িক প্রচেষ্টার ফলে। Mass productionই হচ্ছে এ যুগের মূল মন্ত্র। ব্যক্তিগত সৃষ্টির মূল্য সামবায়িক সৃষ্টির তুলনায় এখন অনেক কমে গেছে। জীবনশিল্পে আমরা সেই আদিম স্থাপত্য-শিল্পের যুগে ফিরে যাচ্ছি—সকলে মিলে কাজ করলে তবে একটা বিরাট্ সৌধ রচিত হবে। সিনেমা, রেডিও সবেরই লক্ষ্য এখন mass production।

ভবিষ্যতের ভারত যে কেবল হিন্দুর কিম্বা কেবল মুসলমানের কিম্বা কেবল কারও হবে না তা সুনিশ্চিত। এ বিষয় বড়লাট লর্ড ওয়েভেল সেদিন আমাদের দেশবাসীদের স্মরণীয় কিছু শুনিয়ে দিয়েছেন। ভূগোল ভুললে চলবে না, ইতিহাস ভুললে চলবে না, সেন্সাস্ রিপোর্ট ভুললে চলবে না। এদের কোন একটাকে মাত্র নিয়ে কাজ করলেও চলবে না। সকলে মিলে যখন একসঙ্গে থাকতে হবে, তখন বন্ধুভাবে, আত্মীয়ের মত থাকাই ভাল। আর স্বার্থের নির্দ্দেশও তাই। সুতরাং বন্ধুত্ব আর আত্মীয়তা সৃষ্টির পথ বার করা দরকার, আর মনে প্রাণে ধারাবাহিকভাবে সে পথে চলা দরকার।

আমার মনে হয়, প্রত্যেক প্রদেশের লোক যদি তাঁদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যান, তাহলে সহজে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সুফল পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। বাংলা দেশ অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেকাংশে ভাগ্যবান। এদেশে সাধারণ একটা ভাষা আছে, সাধারণ একটা সাহিত্য আছে। খাওয়া-দাওয়ার বিষয় এদেশের লোকের অতটা বাচবিচার নাই। Ethnology বা জাতির কৌলিক ইতিহাসের দিক থেকেও বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। এদেশের হিন্দু-মুসলমান একই খাদ্য খায়, একই ভাষা বলে, একই ভাষায় লেখে, এদের অন্ততঃ হাজার বৎসরের ইতিহাস এক, এদের স্বার্থও এক। সুতরাং জাতীয়তা-বোধ, আত্মীয়তা-বোধ, সম্প্রীতির বন্ধন, বাঙ্গালীত্বের আদর্শ প্রভৃতি নিয়ে প্রচার-কার্য্য চালালে সহজেই আমাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশেও এ আদর্শ সংক্রামিত হবে। মহামতি গোখলের বাণী—What Bengal thinks today, the rest of India will think tomorrow—তখন নূতন ভাবে সার্থক হবে।

আমার এক বন্ধু বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা করবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখান। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাতে করে বাংলা ভাষার সম্যক্ প্রচার হয়, তার জন্য তিনি চেষ্টাও করে থাকেন। কথাচ্ছলে তাঁকে এক দিন আমি বলেছিলাম, এই কলকাতার মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে যাতে চালিয়ে দিতে পারেন, তার জন্য চেষ্টা করুন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর পরে যথেষ্ট পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে বাঙালী মানসিকতার সৃষ্টি, ভারতের জাতীয়তা-সমস্যার সমাধানের এই হচ্ছে সহজ, সরল পথ; চা-সমস্যা সমাধানের পথও এই একই।

প্রবাসী বাঙালী বাংলার ব্লাডব্যাঙ্ক

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

প্রবাসী বাঙালীর দুঃখ অনেক। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সৌভাগ্যও আছে। আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে থাকিতে হয় বটে, কিন্তু প্রবাসে দেশবিদেশের বহু আত্মীয় জুটিয়া যায়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর থাকে না। দুধ ঘিতে শরীর চাঙ্গা হইয়া উঠে। বাংলা দেশের দুর্দ্দশা দূর হইতে দেখিয়া নিজের দুঃখ ভুলিতে শিখে ও দেশবাসীর দুঃখে সমবেদনা ও সাহায্য করিতে পারে। দেহের বলবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও বাড়ে। দেশবিদেশের বহু ভাষাভাষী বিভিন্ন রুচির নরনারীর সঙ্গে মিলনের ফলে মনের কূপমণ্ডুকতা কাটিয়া যায় ও একটা সার্ব্বভৌমিকতার ভাব আসে। রুচি মার্জ্জিত হয়। জীবনযাত্রার পরিমাপ উচ্চ হয়। এই সব কারণে প্রবাসী বাঙালীর ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশী বাঙালীর ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে বেশী মজবুত হয়—অনেক সময়ে জীবনেও বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয়। এই কথাটি স্মরণ করিয়া বাংলার এই চরম দুর্দ্দশার দিনে প্রবাসী বাঙালী মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার কতটুকু সেবা করিতে পারে তাহা আলোচনা করিব।

বাংলাদেশের একটা গৌরবময় যুগের অবসান হইয়াছে। এক দুর্ভিক্ষে এই যুগের সূচনা হইয়াছিল, আর এক দুর্ভিক্ষের কঙ্কালমালা ইহার ছেদরেখা টানিয়া দিয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দুই বৎসর পর রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুই বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যাঁহার মধ্যে রামমোহনের সাধনা ও বাণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাঁহার তিরোধান হইয়াছে। আমরা একটি নূতন বাংলার প্রবেশ-দ্বারে দণ্ডায়মান। সম্মুখের দিকে চাহিতে আশঙ্কায় ও নিরাশায় আমাদের প্রাণ অবসন্ন হয়। বাংলাদেশের চেহারা এখন সেই বনভূমির মত যেখান হইতে বিশাল বিশাল মহীরুহ উৎপাটিত হইয়াছে, পড়িয়া রহিয়াছে শুধু একটা বিশ্রী নগ্নতা স্পর্দ্ধাস্ফীত ঘেঁটু ও কচুবনের কদর্য্যতা বাড়াইয়া। দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোক শোচনীয়ভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় যে, আমাদের মাতৃভূমি প্রাণহীন নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন বীর নেতার জন্ম আর হইতেছে না। অস্তসাগরের পরপারে বাংলার শেষ রবি চলিয়া গিয়াছেন—সৈকত-ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে কয়েকটি রবিকরে তপ্ত বালুকণা মাত্র।

বিগত শতাব্দীতে যাঁহারা বাংলা দেশকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একটা ভাবধারার বাহনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হয়ত জীবনে কোন স্থায়ী বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অনেকের জীবন আজিকার দিনে হয়ত ব্যর্থই মনে হইবে। কিন্তু তাঁহারা এক একটা জলন্ত আইডিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন এই পৃথিবীতে ও তাহার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়াছিলেন ও সকল প্রকার দুঃখবরণ করিয়াছিলেন। কার্লাইল বলিয়াছেন, আইডিয়া অমর, আইডিয়ার হাত পা আছে। সে কখনও নীরব থাকে না। তাঁহাদের জীবনে আজ যাহা ক্ষতি মনে হইতেছে, তাহা এক দিন পরম সম্পদে পূর্ণ হইবে। আজ যাহা অপূর্ণ রহিয়াছে, কালে তাহা পূর্ণতা লাভ করিবে। বাংলাদেশে আজও কর্ম্মী আছে, লেখক আছে। কিন্তু যে উত্তপ্ত-ভাবপ্রবাহ বিগত যুগে সমস্ত বাংলাকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহা আর নাই। সে কি দিনই ছিল!

> 'ব্লিস্ ওয়াজ ইট ইন দ্যাট ডন টু বি এ্যালাইভ
> টু বি ইয়াং ওয়াজ ভেরি হেভন্।'
> সে প্রভাতে বেঁচে থাকা ছিল আশীর্ব্বাদ
> যৌবন সে ছিল যেন স্বরগ সমান।

এই ভাবাবর্ত্তের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রের বাণী বাংলা অতিক্রম করিয়া বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় বাংলাদেশ চিরকালই একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। দিল্লী কনোজ হইতে বহু দূরে, ভারতের এক কোণায় অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় ইহা কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ফলে উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ইহার মিল কম হইয়া পড়িয়াছে। ভাষায়, পরিচ্ছদে, আচরণে, রুচিতে ও দৈনন্দিন অভ্যাসে বাংলা তাহার নিজের একটা ধারা রচনা করিয়াছে। ইহা এক বিষয়ে ভাল, কিন্তু ইহার ফলে বাংলার সহিত ভারতের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। যখন যখন বাংলা শুধু বাংলা হইয়াছে তখন তাহার বাণী ভারতের বা বিশ্বের বাণী হইয়া উঠিতে পারে নাই। যখন নদীয়ার গোরাচাঁদ বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীচৈতন্য হইলেন, তখনই তাঁহার বাণী সকল ভারত শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইল। বিগত শতাব্দীতে রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ,

রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, বিপিনচন্দ্র, ও রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে নিখিল ভারতের সহিত যুক্ত করিয়াছেন; বিশ্বকে লইয়া আসিয়া বাংলার অঙ্গন-প্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন, তাই বাংলার সাধনা ভারতের ও ভারতকে অতিক্রম করিয়া সকল বিশ্বের সাধনা হইয়াছে। বাংলার পুকুরের মজিয়া পচিবার একটা অভ্যাস আছে। তাই যখনই বাহিরের বেনোজল আসিয়া ইহাকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছে তখনই বাংলাদেশে যৌবন-প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে। বাংলাদেশ আবার বিশ্ব-চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি এড়াইয়া তার বাঁশবনের ঝোপের আঁধারে আত্মগোপন করিবার চেষ্টায় আছে। রাজনীতিতে বাংলাদেশ হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাহার যতটুকু সাহিত্য এখনও আছে তাহা আবার তাহার গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে। বীরভূমের ধাঙড়পাড়া নয়, যশোর খুলনার বামুনডাঙ্গার মাঠে তাহা বুনো ফুল কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। বড় জোর কলিকাতার কোন এঁদো গলির পচা গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া আছে। এক কালে প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দকে লইয়া আসিয়া আমরা বাংলার বীর করিয়া তুলিয়াছিলাম, এখন রায়-বেঁশে লইয়া মাতামাতি করিতেছি। গঙ্গা খুব গভীর খাতে বহিতেছে বটে, কিন্তু আর মোহানা ছাপাইয়া উত্তরবাহিনী হয় না। কাব্যদেবতা এখন টেলিস্কোপ ছাড়িয়া দিয়া মাইক্রোস্কোপ লইয়া বসিয়াছেন। দিক-চক্রবালে সত্যের নূতন তারকা ডুবিয়া যাইতেছে। বৃহত্তর জগতের আহ্বানধ্বনি আর আমাদের কানে আসিতেছে না। বাংলা দেশের চারিপাশে আবার প্রাচীর উঠিয়াছে।

প্রবাসী বাঙালী এত দিন বাংলার আউটপোষ্ট ছিল। বাংলার বাণী বিশ্বে প্রচার করার দায়িত্ব এত দিন তার ছিল। কিন্তু এখন হইতে তাহার কাজ হইবে অন্যরূপ। সে ঐ প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিয়া বাংলাকে টানিয়া আনিয়া আবার নিখিল-ভারতের মাঝখানে ছাড়িয়া দিক। ভারতের অপর প্রদেশে, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে, নবজীবনের জোয়ার আসিয়াছে। আবার তাহাকে বঙ্গোপসাগরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। বাংলার মাঠ ঘাট আবার ভাসাইতে হইবে। প্রবাসী বাঙালী এবার হইতে দেশে ফিরিবার সময় শুধু শাল সাড়ী, আখ্‌রোট খুবানি, মাল্টা মোসাম্বী সঙ্গে লইবেন না কিন্তু লইবেন একটা জলন্ত জাগ্রত আইডিয়া। মৃতপ্রায় বাংলার প্রাণসঞ্চার করিতে সমস্ত বিশ্ব হইতে খাদ্য আসিতেছে। কেহ পাঠাইতেছে চাউল আটা, কেহ ভিটামিন ইভ্যাপোরেটেড মিল্ক। পশ্চিমের জল হাওয়ায় পরিপুষ্ট প্রবাসী বাঙালীর গায়ে রক্তের জোর বাড়িয়াছে। নির্জীব বাংলার শিরায় শিরায় ভরিয়া দিবার জন্য তাঁহারা রচনা করুন ব্লাডব্যাঙ্ক।

প্রবাসী বাঙালী যদি এত বড় কাজ না করিতে সমর্থ হয়, তবুও দুয়েকটি সাধারণ রকমের কাজে হাত দিতে পারে। প্রত্যেক প্রদেশে নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠি-তেছে—হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু। ভারতের বাহিরের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। এই সকল সাহিত্যে যদি কিছু নূতন অবদান থাকে তবে প্রবাসী বাঙালী তাহা সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত করিতে পারেন। অবাঙালী গানের সুরে ও নাচের ছন্দে বাঙালীর গৃহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। অবাঙালী কবিতার ছন্দও বাংলার কবিতার নূতনত্ব দিক। আমি জানি বাঙালী যেখানেই থাক, বাঙালীই থাকে। পঞ্জাবে সারাজীবন কাটাইয়া বহু বাঙালী এমন আছেন যাঁহারা এখনও মুদির দোকানে এক সের চাউল কিনিতে হইলে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন। না জানেন উর্দ্দু—না বোঝেন পঞ্জাবী। কূপমণ্ডুকতা বাঙালীকে সব দেশে ছোট করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁহারা শিখেন বা শিখিতে চেষ্টা করেন। নিজ নিজ প্রবাসের সাহিত্যের মধ্যে নূতনত্ব নিশ্চয়ই কিছু দেখেন বা নিজ ভাষার সহিত প্রবাসের ভাষার যোগ বা সাদৃশ্য নিশ্চয়ই দেখিতে পান। তাঁহারা যদি দুই ভাষার যোগাযোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তবে বাঙালী পাঠকের অপর ভাষা শিখিবার অনেক সহায়তা হয়, অন্ততঃপক্ষে দুই ভাষার মধ্যে যে অনতিক্রম্য ব্যবধান মনে হইয়া থাকে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হয়।

গত এক শতাব্দীতে বাংলা ভাষা খুব উন্নতিলাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা সম্ভব হইয়াছে সংস্কৃতের সাহায্যে। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশ করা সহজ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন ব্যব-হারিক ভাষা তেমন পুষ্ট হইতে পারে নাই। বরঞ্চ সংস্কৃতের চাপে তাহা যেন কতকটা পঙ্গু ও শ্লথগতি হইয়া পড়িয়াছে। দৈনিক বাংলা খবরের কাগজ পড়িলেই আমার বক্তব্য বিষয় বেশ বুঝা যাইবে। মনে হয় ইহা বাংলা না অপর কোন কিম্ভূতকিমাকার বস্তু? মনে হয় আমাদের সাধারণ চল্‌তি ভাষা যেন এখনও চলিতে শিখে নাই। চল্‌তি ভাষায় শব্দসম্পদও খুব কম। ইংরেজী ভাষার অতি সাধারণ কথা সংস্কৃতবহুল বাংলায় অনুবাদ করিলে তাহার রূপান্তর হইয়া যায়। যদি Dairy কথাটার বাংলা

প্রতিশব্দ দুগ্ধশালা, kitchen gradenএর রন্ধন-উদ্যান, restaurant ভোজনশালা, Pub জন-পানাগার, Rest House বিরাম-নিকেতন করা যায় তবে মনে হয় কোথায় যেন একটা বৃহৎ তফাৎ থাকিয়া গেল। লঘুর প্রতিশব্দ লঘুই হওয়া উচিত। হিন্দী ভাষা এখন বাংলার মত সংস্কৃতবহুল হইয়া উঠিতেছে বটে; কিন্তু এতদিন তাহা ছিল না বলিয়া হিন্দীর নিজের কতকগুলি বিশেষ ইডিয়ম বা শব্দরচনা করিবার ক্ষমতা আছে। অতি চল্‌তি কথার ব্যবহার করিলেও হিন্দীর জাতি যায় না। Readymade 'বনিবনাই', Rest House 'আরামগাহ্', Dairy 'দুধখানা' করিলেও তাহার জাতপাত কিছুই মারা যাইবে না। হিন্দী ও উর্দ্দুতে বহু চলতি শব্দ আছে যাহা প্রয়োগ করিলে বাংলার শব্দসম্পদ বাড়িয়া যাইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন সিলেবাস বদলের ফলে সংস্কৃত আর অবশ্যপাঠ্য নাই। ইহার ফলে বাংলা ভাষার কতখানি পরিবর্ত্তন হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিয়াছি কি? এতদিন বাংলাদেশের সব সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অভাব মিটাইতেন। ফলে বাংলার নিজস্ব প্রতিভা বাড়িতে পারে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকিউলাম বদলের ফলে আগামী যুগে বাংলার চেহারা বদলাইবে নিশ্চয়ই। আজিকার দিনে আমরা যে-সব শব্দ প্রয়োগ করিতেছি তাহার অনেকেই ক্রমে অচল হইয়া পড়িবে। বাংলার মুসলমানেরা উর্দ্দু, পারসিক ও আরবী শব্দের যোগে বাংলা ভাষার রূপ বদলাইতে চেষ্টা করিতেছে বটে; কিন্তু মুশকিল হইতেছে যে, ইহারা এই সব শব্দের সঙ্গে সুপরিচিত নয়—দৈনন্দিন জীবনে তাহার ব্যবহার করে না। কাজেই তার ধ্বনি তাদের কানে ভাল বা মন্দ কিছুই লাগে না। তাহাদের প্রয়োগে তাহাদের মনে হর্ষ বা বিষাদ কোন ভাবই বহন করিয়া আনে না। মুসলমানী বাংলার আসল দোষ হইতেছে যে, তা ভাষার প্রকৃতিগত ধ্বনির দিকে দৃষ্টিপাত করে না। অভিধান হইতে প্রাপ্ত নূতন শব্দের কোন সিম্বলিক্যাল ভ্যালু নাই অর্থাৎ ইহা কোন পরিচিত ভাব বা স্মৃতির প্রতীক নহে। জোর করিয়া একটা বিসদৃশ জাতির শব্দ বাংলার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। কিন্তু হিন্দী ও উর্দ্দুর মধ্যে এমন শব্দ আছে যাহা বাংলা ভাষার সমানধর্ম্মী বাংলার ধ্বনির সঙ্গে ঘরের লোকের মত মিলিয়া যাইতে পারে। ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার এইরূপ উপযুক্ত শব্দ প্রবাসী বাঙালী চালাইতে পারেন। ইহাতে আমাদের মাতৃভাষার শব্দসংখ্যা বাড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের শক্তিও বাড়িবে। সাধারণ কথার জন্য সাধারণ ভাষা চাই। সংস্কৃত-প্রধান ভাষা বলা যেন উচ্চগ্রামে সঙ্গীত করা। উপযুক্ত হিন্দী উর্দ্দু শব্দের প্রয়োগে ইহার পর্দ্দা একটু নীচে নামিতে পারে। এই রকম ভাষায় রচনা হইলে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদ আর যাত্রার নায়কের হুঙ্কারের মত শোনাইবে না। খবরের কাগজের কটুমটু একটু ঘরোয়া হইয়া আমাদের ঘরের খবর হইয়া উঠিবে। এখন তো বাংলার যুদ্ধের খবর পড়িলে মনে হয় রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ পড়িতেছি।

কিছুদিন আগে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা দুইজন বাঙালী কথা বলিতে বলিতে লাহোরের একটা রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের সামনে আসিয়া পড়িল ও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি বাঙালী?" আমরা একটু ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে সে একজন ঢাকাবাসী মুসলমান দপ্তরী, কোন একজন পঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে আসিয়াছে ও তাহার বাড়ীতে আছে। সে আমাদের কাছে কোন কিছুই চায় নাই। আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়াই তৃপ্ত। পাকিস্তানই হউক আর যাই হউক সে কিন্তু অপর একজন বাঙালীর কথা মাত্র শুনিতে আসিয়াছিল। পঞ্জাবে ও ইউরোপে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। এইখানেই বাংলা ভাষার জোর। যতই ঝগড়া কেন না করি, এক দিন না এক দিন আমরা এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর মিলিতে পারিব। কিন্তু এখনও বাংলা-সাহিত্য সকল বাঙালীর হইয়া উঠে নাই। ইহা এখনও হিন্দুর উচ্চ তিন বর্ণের সাহিত্যই রহিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রাণের গভীর আবেগের সহিত এক নূতন ভারতের আবাহন করিয়াছিলেন। তিনি ঐকান্তিকতার সহিত বলিয়াছিলেন, "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে।" এই চুয়াল্লিশ বৎসরে এখনও সেই ভারত বাহির হয় নাই। এখনও বাংলা সেই বাংলাই আছে। বাংলার পতিত জাতিরা এখনও উচ্চ হয় নাই; তাহাদের কণ্ঠ এখনও নীরব; তাহাদের হাত মাতৃভূমির সেবায় এখনও লাগে নাই।

বাংলার সাহিত্য এখনও তাহাদের প্রাণের ভাষা হইয়া উঠে নাই। যত দিন তা না হয় তত দিন বাংলা-সাহিত্যকে বাংলার জাতীয় সাহিত্য বলা যাইবে কি না জানি না। সকল উচ্চ সাহিত্যই অবশ্য মানুষের সাধারণ চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের জাতিভেদ নাই সত্য; কিন্তু তবুও যখন বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও অনগ্রসর জাতিরা সকলেই আমাদের সাহিত্যের সাধনায় লাগিয়া যাইবে, তখন ইহার রূপ যে বদলাইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই শুভদিন যত শীঘ্র আসে ততই ভাল। দেশে যাহাই করি না কেন প্রবাসে আমাদের কোন ভেদাভেদ নাই। এখানেই প্রবাসী বাঙালীর সুবিধা। তাই বলি নিখিল-বঙ্গের সাহিত্যের বনিয়াদ প্রবাসেই গাঁথা সুরু হউক। দিল্লী ভারতের রাজধানী। এইখানেই ভাবী বাংলার ও নূতন বাংলার সাহিত্যের জন্ম হউক।*

* *প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের নিউ দিল্লী অধিবেশনে পঠিত।*

নারীর গোত্রান্তর সম্বন্ধে আরও কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১৩৫০ সনের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত ডক্টর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের "নারীর গোত্রান্তর" শীর্ষক তথ্যবহুল প্রবন্ধটি নানা কারণেই চিত্তাকর্ষক। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে শাস্ত্রীয় আলোচনা এদেশে বিরল। এইরূপ আলোচনা যত বেশী হয় ততই ভাল ইহা মনে করিয়াই উক্ত প্রবন্ধের supplement বা পরিপূরক হিসাবে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

রঘুনন্দন-শাসিত বঙ্গদেশে তাঁহার বাক্যের যৌক্তিকতার বিচার করা দূরে থাকুক ঐ বাক্য আদৌ রঘুনন্দন কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল কিনা তাহার অনুসন্ধান করাও অনেকে ধৃষ্টতা মনে করেন। এমতাবস্থায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের রঘুনন্দন সম্পর্কে নির্ভীক সমালোচনা দেখিলে স্বতঃই বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রথিতযশা পণ্ডিত হইতেছেন স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়। হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে রঘুনন্দন-কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার 'উদ্বাহ-চন্দ্রালোক' প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে রঘুনন্দনের মতবাদ সর্বথা শিরোধার্য না করিয়া বিচারের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সর্ববাদিসম্মত না হইলেও তাঁহার এইরূপ প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গোভিল-গৃহ্যসূত্রের টীকায়ও (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) এইরূপ নিরপেক্ষ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

দীনেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে রঘুনন্দন লঘু-হারীতের একটি বচনের সাহায্যে বিবাহে সপ্তপদী গমনের পরই স্ত্রীর গোত্রান্তর স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে শূলপাণি কর্তৃক তাঁহার শ্রাদ্ধবিবেক ধৃত বৃহস্পতির একটি বচনে পাণিগ্রহণের পরই স্ত্রীলোকের পিতৃগোত্রনিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বিবাহিতা নারীর মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোত্রান্তরই হয় না অর্থাৎ তাহার জীবদ্দশাতে পিতৃগোত্রই থাকিয়া যায়। এই বিরুদ্ধ মত সূচক কয়েকটি বচনও উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন কোন বচনে আবার চতুর্থী হোমের পরও গোত্রান্তর উক্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বক্তব্যও বিবেচ্য;

গোভিলকৃত গৃহ্যসূত্রে নক্ষত্র দর্শনাদির পর নিম্নলিখিত সূত্রটি আছে:—

অনুমন্ত্রিতা গুরুং গোত্রেণাভিবাদয়েৎ (২।৩।১৩)। ভট্টনারায়ণাদির মত অনুসরণ করতঃ স্বীয় মতের পরিপোষক হিসাবে রঘুনন্দন উক্ত সূত্রে "গোত্র" পদের 'পতিগোত্র' ব্যাখ্যাই স্বীকার করিয়াছেন এবং ভবদেবভট্ট প্রভৃতি যে 'পিতৃগোত্র' অর্থ করিয়াছেন তাহা "হেয়" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত পিতৃগোত্রের নিবৃত্তি হয় না, এই মত নিরস্ত করিয়া তিনি বলিয়াছেন:—

যত্তু সপিণ্ডনস্য গোত্রাপহারিত্বপ্রতিপাদকবচনং, তচ্ছাখান্তরীয়ং, শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হারীতের বচন অবলম্বন করিয়া রঘুনন্দন সপ্তপদী গমনের পর স্ত্রীর পিতৃগোত্র নিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন। উল্লিখিত শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতির বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি যেন পাণিগ্রহণের পর গোত্রান্তরও বৈকল্পিক নিয়ম হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন।

বিবাহিতা স্ত্রীর গোত্রান্তর সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্পূর্ণ আলোচনার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যে অংশে তিনি রঘুনন্দনের যুক্তি খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন শুধু তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যত্তু সপিণ্ডনস্য গোত্রাপহারিত্বপ্রতিপাদকবচনং তচ্ছাখান্তরীয়ং শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ। রঘুনন্দনের এই কথার আক্ষরিক অর্থ এইরূপ দাঁড়াইবে,—শিষ্টব্যবহার নাই বলিয়া সপিণ্ডীকরণের পর

পিতৃগোত্রনিবৃত্তিসূচক বচনটি অন্য শাখাবলম্বিগণের প্রতি প্রযোজ্য। স্মার্তের এই উক্তিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় চটিয়া গিয়াছেন। তিনি এই ধরণের যুক্তিদ্বারা রঘুনন্দনের উপর দোষারোপ করিয়াছেন,—

অন্য শাখার ব্যবস্থা হইলেই তাহাতে শিষ্টব্যবহারের অভাব প্রতিপাদিত হইবে এবম্বিধ কথা বলিলে "মহাবিপ্লবে"র সূচনা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রাদেশিক বা স্থানবিশেষের রীতিকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যায় না। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় বলিতে চাহেন যে "গোত্র" পদে "পতিগোত্র" বুঝিবার রীতি স্মার্ত-ভট্টাচার্যের ঘরোয়া ব্যাপার। স্থানীয় রীতি বা local customকে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়া স্থানান্তরের রীতিকে অশিষ্ট প্রতিপন্ন করা শিষ্ট লোকের পরিচয় নহে, এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পণ্ডিত মহাশয় করিয়াছেন। রঘুনন্দন নানা প্রকার বিরুদ্ধবচনসমূহের সামঞ্জস্য করিতে অসমর্থ হইয়া অতি সহজে শাখান্তরীয়ত্ব কল্পনা করিয়া গোঁজামিল (cutting the Gordian knot) দিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তর্কালঙ্কার মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় স্মার্তের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে কেবল শিষ্টব্যবহারেই কোন রীতির প্রামাণ্য প্রতিপন্ন হয় না। উহা শাস্ত্রসঙ্গত হওয়া দরকার। রঘুনন্দন যাহাকে শিষ্টব্যবহার বলিয়াছেন তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, ইহাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বক্তব্য।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মন্তব্যের সারবত্তা অস্বীকার না করিয়াও সম্ভবতঃ রঘুনন্দনের উক্তির এইরূপ অর্থ অনুমান করা যাইতে পারে যে রঘুনন্দন যে শাখা সম্বন্ধে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন সেই শাখাবলম্বী শিষ্টব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকের সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত পিতৃগোত্রের ব্যবহার স্বীকার করেন না; অতএব এই বিধি শাখান্তর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইহাতে অন্য শাখাবলম্বিগণের প্রতি রঘুনন্দনের কোন প্রকার কটাক্ষ আছে বলিয়া মনে হয় না এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে অশিষ্ট বলিয়া তিনি নিজে শিষ্টতার অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন এই অভিযোগও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

গোত্রান্তর সম্বন্ধে রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় যে সমস্ত শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই :—

"স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে"—হারীতের এই বচনে সকল স্থলেই যে সপ্তপদীগমনের পর গোত্রান্তরের কথা বলা হইয়াছে এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এই বচনোক্ত ব্যবস্থা সপ্তপদীগমনের পর বলপূর্বক অপহৃতা পুনর্ভূকৃতা কন্যার পক্ষেই প্রযোজ্য। কারণ, হারীতই আবার বলিয়াছেন—

পদেতু সপ্তমে যা তু বলাৎ কাচিৎ হৃতা ভবেৎ।
স্বামিগোত্রং ভবেত্তস্যাস্ত ভূয়ো বিশিষ্যতে।
পৈতৃকত্বপ্রসূতায়াস্ততঃ পৌর্বিকভর্তৃকম্।

অর্থাৎ, উক্তরূপে অপহৃতা কন্যার সন্তান-প্রসব হওয়া পর্যন্ত পিতৃগোত্র থাকিবে। তৎপর পূর্বপতির গোত্রই তাহার গোত্র হইবে।

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ—

বৃহস্পতির এই বচনে যে শুধু পাণিগ্রহণ মন্ত্রই পিতৃগোত্রনিবৃত্তির কারণ উক্ত হইয়াছে তাহা নহে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, পাণিগ্রহণ মন্ত্র এবং চতুর্থীহোমমন্ত্র এই দুইটিই কন্যার পিতৃগোত্রনিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ শুধু পাণিগ্রহণ হইলেই চলিবে না, চতুর্থী হোম না হওয়া পর্যন্ত গোত্রান্তর হইবে না। কারণ, বৃহস্পতি নিজেই বলিয়াছেন—

চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্‌মাংসহৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্রা সংযুজ্যতে পত্নী তদ্গোত্রা তেন সা ভবেৎ।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ...হারকাঃ"—বৃহস্পতির এই বচনও "স্বগোত্রাৎ...পদে", হারীতের এই বচনের পরিপোষক; যেহেতু মনু বলিয়াছেন :—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।

অর্থাৎ, পাণিগ্রহণবিষয়ক মন্ত্রগুলির নিষ্ঠা বা সমাপ্তি সপ্তপদীগমনের পর হইয়া থাকে, বিজ্ঞগণ ইহাই বলিয়া থাকেন। অতএব পূর্বোক্ত হারীত ও বৃহস্পতির বচনদ্বয়ের একবাক্যতা সিদ্ধ হইল।

স্ত্রীলোকের সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত পিতৃগোত্রের ব্যবহার আসুরাদি নিন্দিতবিবাহ পক্ষেই বুঝিতে হইবে—স্মৃতিমঞ্জরীকারাদির এই মত। বৃদ্ধ শাতাতপ বলিয়াছেন—

আসুরাদিবিবাহেষু পিতৃগোত্রেণ ধর্মবিৎ।

উক্ত বচনে আসুরাদিবিবাহে স্ত্রীলোকের পিতৃগোত্রের ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি কোন অবধির কথা উক্ত হয় নাই, এবং এই সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণও নাই।

সংস্থিতায়াং তু ভার্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধং তু পতিপৈতৃকম্।
একমূর্ত্তিত্বমায়াতি সপিণ্ডীকরণে কৃতে।
পত্নী পতিপিতৄণাং তু তস্মাত্তদ্গোত্রভাগিনী।

শাতাতপের এই বচনে বলা হইয়াছে যে, সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত স্ত্রীর পিতৃগোত্রই থাকে এবং তৎপর তিনি পতিগোত্রভাগিনী হইয়া থাকেন, যেহেতু সপিণ্ডীকরণের পর তিনি পতির পূর্বপুরুষগণের সহিত "একমূর্ত্তিত্ব" প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু "চতুর্থীহোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্‌মাংস হৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ" ইত্যাদি পূর্বোক্ত বৃহস্পতিবচনে চতুর্থীহোমের পরই পতি-পত্নীর একত্বপ্রাপ্তির এবং স্ত্রীর গোত্রান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছে। এমতাবস্থায় সপিণ্ডীকরণের পর স্ত্রীর গোত্রান্তরের যে বিধান শাতাতপ করিয়াছেন ইহা চতুর্থীহোমের পূর্বে মৃতা স্ত্রীর পক্ষে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে।

পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ফল তাহা হইলে এই দাঁড়াইল :—

১। আসুরাদি নিন্দিতবিবাহপদ্ধতিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পিতৃগোত্রই থাকিবে

২। বিবাহে সপ্তপদীগমনের পর বলপূর্বক অপহৃতা কন্যার

(ক) সন্তান-প্রসব পর্যন্ত পিতৃগোত্র

(খ) তৎপর পূর্বপতির গোত্র

৩। সাধারণতঃ বিবাহিতা স্ত্রীর চতুর্থীহোম পর্যন্ত পিতৃগোত্র এবং তৎপর পতিগোত্র

৪। চতুর্থীহোমের পূর্বে মৃতা স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত পিতৃগোত্র তৎপর পতিগোত্র।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আলোচনার যাথার্থ্য বিচার করা বা তিনি যে সমস্ত যুক্তি ও বচনের অবতারণা করিয়াছেন তাহা যাচাই করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। স্ত্রীর গোত্রান্তর সম্বন্ধে রঘুনন্দনের বিরুদ্ধ মত তিনি কিরূপে শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাই অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল মাত্র।

তবে পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশকালভেদে আমাদের শাস্ত্রের নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এই কথাটি স্বীকার করিয়া লইলে অনেক স্থলে বিরুদ্ধ শাস্ত্রীয় বচনগুলির স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করার সুবিধা হইতে পারে। কারণ, সমাজ যতই রক্ষণশীল হউক না কেন ইহা যদি প্রাণবন্ত হয় তাহা হইলে বিভিন্ন সময়ে লোকের রুচিভেদে সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনশীলতা অপরিহার্য। সুতরাং সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রের নিয়মাবলী দেশভেদে ও কালভেদে পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। সকল ধর্মশাস্ত্রকার একই দেশে বা একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহা মনে রাখিলে আমরা সকল স্থলেই শাস্ত্রের বিরুদ্ধবচনাবলীর একবাক্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা না করিয়া ঐ বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলিকে গতিশীল সমাজের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের পরিচায়ক হিসাবে ধরিয়া লইতে পারি। যে বচনদ্বয়কে রঘুনন্দন গোত্রান্তর বিধায়ক হিসাবে ধরিয়াছেন হয়ত তাহা দেশভেদে অথবা কালভেদে লিখিত হওয়ায় অথবা উভয়বিধ কারণেই অন্যান্য নিয়মাবলী হইতে স্বতন্ত্র এবং কোন কোন বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেছে।

নারী অপরাধী

চন্দ্রগুপ্ত

অপরাধ-তত্ত্বের সূচনাতেই এ কথা বলা দরকার যে, এদেশে অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তেমন ঔৎসুক্য নাই। পাশ্চাত্য দেশে বহু পণ্ডিত অনেক দিন ধরিয়া অপরাধ-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের গবেষণা করিয়াছেন। এ দেশে এই বিষয়টি প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে অবহেলিত হইয়াছে।

অপরাধ-তত্ত্ব বলিতেই শুধু খুনী, দস্যু তস্করদের ইতিবৃত্তই বুঝায় না, অপরাধ-তত্ত্ব আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক প্রধান সমস্যা। আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরাধ-তত্ত্ব অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তা পাশ্চাত্ত্য দেশের দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়। অপরাধ এবং অপরাধীর শাস্তি ও সংশোধন লইয়া বহুবিধ গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। ফলে অপরাধের বিভিন্ন সমস্যা ক্রমেই সহজ হইয়া আসিতেছে।

অপরাধ-তত্ত্বের সমস্যাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় প্রধান—

প্রথম—লোকে অপরাধ করে কেন? অথবা অপরাধের কারণ কি বা কয়টি?

দ্বিতীয়—অপরাধ নিবারণের উপায় কি?

তৃতীয়—সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক।

চতুর্থ—শাস্তি ও সংশোধন।

পঞ্চম—আইন।

ষষ্ঠ—শিশু ও কিশোর অপরাধী।

সপ্তম—নারী অপরাধী।

অষ্টম—অপরাধের শ্রেণী বিভাগ।

নবম—অপরাধী নির্ণয়ে বিজ্ঞানের সহায়তা।

এই প্রবন্ধে নারী অপরাধী বা অপরাধে নারীর স্থান সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব। অপরাধ-বিশেষজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে, নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণ কম অপরাধপ্রবণ। এমনকি পাশ্চাত্ত্য দেশে, যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণই বলা যায় সেখানেও পুরুষের অপেক্ষা নারী অপরাধীর সংখ্যা অনেক কম—এ দেশের পর্দা এবং অবরোধ সঙ্কুল রীতিনীতিতে অভ্যস্ত নারীর ত কথাই নাই।

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাবিবরণী পাওয়া শক্ত। পাশ্চাত্য দেশেও এই সমস্যা বর্তমান তবে এ দেশ হইতে কতকটা অগ্রসর। এ ছাড়া যে সকল

বিবরণী পাওয়া যায়, যথা—জেল রিপোর্ট, পুলিস রিপোর্ট অথবা কোন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বিবরণী তদ্দ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত শক্ত। তবুও এ কথা অবিসংবাদী সত্য যে, পৃথিবীর সর্ব্ব দেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী অনেক কম অপরাধপ্রবণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য দেশে একটা ধারণা ছিল যে, ও দেশের মধ্যে ইংলণ্ডেই নারী-অপরাধীর সংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় খুব বেশী। কিন্তু ক্রমশঃ এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়। অধ্যাপক হেকারের মতে ইউরোপীয় দেশ-সমূহের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী অপরাধী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বেলজিয়মে এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম ফিনল্যাণ্ডে। নিম্নে তাঁর দেওয়া বিভিন্ন দেশের প্রত্যেক ১০০ নারী অপরাধীর তুলনায় পুরুষ অপরাধীর সংখ্যা দেওয়া গেল :

	নারী অপরাধী—	পুরুষ অপরাধী
বেলজিয়ম	১০০	৩৪৪
ফিনল্যাণ্ড—	১০০	১৮৭১
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স—	১০০	৬৮৬
ফ্রান্স—	১০০	৫৪৬
জার্ম্মানী—	১০০	৭০৯

১৯৩২-৩৬ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অপরাধীর বিবরণে দেখা যায় যে নারী অপরাধী অপেক্ষা পুরুষ অপরাধী ৭·১৭ গুণ বেশী।

উপরোক্ত সমস্ত সংখ্যাগুলিই দণ্ডিত অপরাধীর সংখ্যা। ইহা দ্বারা এটা ভাবা উচিত নয় যে এ ছাড়া অন্য কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেননা সব অপরাধীই যে শাস্তি পাইয়াছে তাহা নয়।

ইংলণ্ডের অপরাধী ষ্ট্যাটিষ্টিকস হইতে নিম্নলিখিত তালিকাটি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ১৯৩২-৩৬ এই পাঁচ বৎসরের অপরাধীর বার্ষিক গড়পড়তা বয়স অনুসারে প্রতি লক্ষ জনে কত হয় তাহা দেখানো হইয়াছে।

	১০-৪০	১৪-১৬	১৬-২১	২১-৩০	৩০-৪০	৪০-৫০	৫০-৬০	৬০ ও তদূর্দ্ধ
পুরুষ	৮০৬	৮৯৭	৭০২	৪৫৩ ৬	৩৩৩	১৮৩·৫	১০১	৫৫
নারী	৪৪·৪	৬৯	৮৮	৬০	৫৬	৪৩·৭	২৬	১০·২

এই হিসাব হইতে আরও একটি তথ্য জানা যায়। বয়স অনুসারে নারী ও পুরুষের অপরাধপ্রবণতার তারতম্য নারীর অধোগতির জন্য হইতেছে ইহাই বুঝায় না, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পুরুষের অপরাধপ্রবণতা কমিয়া আসাতেই তুলনায় নারীর দোষটা একটু বেশী করিয়াই চোখে ঠেকিতেছে। বয়সের সঙ্গে পুরুষের অপরাধপ্রবণতা যত দ্রুত কমে, নারীর ততটা নয়। উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায়, পুরুষের বেলায় সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা অপেক্ষা ১৮গুণ বেশী, কিন্তু নারীর বেলায় উহা মাত্র ৯ গুণ।

ডাঃ ম্যানহাইমের মতে নারীজাতি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অপরাধপ্রবণ হয় কিন্তু পুরুষ অপরাধীর বেলায় তা নয়। পুরুষ যেখানে ১৩ বছর বয়সে অপরাধপ্রবণ হয় নারী সেখানে ১৮-১৯ বছরে অপরাধ করে। এটা অবশ্য অপরাধী পুরুষ ও নারী সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা দ্বারা এরূপ স্থির করা উচিত নহে যে, সব নারী অপরাধীই ধরা পড়িয়াছে। অন্তরালের বহু অপরাধের কাহিনীই আমাদের অজানা। এটা যদিও পুরুষ অপরাধীর বেলায়ও প্রযোজ্য কিন্তু সেই তুলনায় নারীর স্বাভাবিক গোপনীয়তার সুযোগ বহু অপরাধই অপ্রকাশ্য রাখে। তারপর সাধারণত দেখা যায় যে, নারী অপরাধী সম্বন্ধে পুরুষ জাতি এবং বিচারকেরা সর্ব্বদেশেই দয়াপরবশ। ইহাতে বহু নারী অপরাধী হয় বিচারের কবলে আসেই না—অথবা যারা আসে তাদের মধ্যে অনেকেই নিষ্কৃতি পায়। অপরাধ অনুষ্ঠানে নারী প্রধান ভূমিকা প্রায়ই গ্রহণ করে না এবং সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে। এতেও তারা দণ্ডের হাত হইতে অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহতি পায়। অপরাধ-অনুষ্ঠানেও নারী জাতির সুযোগ পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম। স্বাভাবিক আবেষ্টনী প্রায়ই অপরাধের অনুকূল নয়। বহির্জ্জগতের সঙ্গে নারী জাতির সংস্পর্শের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা এবং তাহার পর নির্ভরশীলতাও নারীজাতির অপরাধপ্রবণতা কম হওয়ার একটি বড় কারণ।

ভারতবর্ষে পর্দ্দা-প্রথা এবং নানা রকম অবরোধ-প্রথায় নারী জাতির অপরাধ করার সুযোগ বা প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই কম। এ ছাড়া বিভিন্ন ধর্ম্মের এবং সমাজের অনুশাসন নারীজাতিকে বল প্রকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। ভারতীয় নারী সর্ব্বাপেক্ষা কম অপরাধপ্রবণ, বিশেষ করিয়া এই কারণেই বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন যে পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতির মানসিক শক্তির উৎকর্ষ বেশী এবং এই কারণেও তারা কম অপরাধ করে। ইহা লইয়া মতভেদ আছে এবং এখানে ইহার বিশদ আলোচনা করা সম্ভবও নয়।

গৃহাভ্যন্তরে নারীর স্বাভাবিক স্থান, মাতৃত্ব, মদ্যপানে অনাসক্তি, এসবও নারীজাতির কম অপরাধপ্রবণতার কারণ বলিয়া ধরা হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, অবিবাহিতা নারী অপেক্ষা

বিবাহিতা নারী বেশী অপরাধপ্রবণ হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ আরও বলেন যে নারীজাতি সাধারণ অপরাধ কম করে যেহেতু পতিতাবৃত্তি দ্বারা অপরাধের প্রবৃত্তি পূর্ণ হয়। পতিতা বৃত্তি অপরাধ (crime) কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অপরাধ শুধু এই অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা আইনানুসারে দণ্ডনীয়। তবে দণ্ডিত নারী অপরাধীর ভিতর পতিতার সংখ্যা খুবই বেশী। পুরুষ অপরাধীদের বহু কারণে পতিতার সংস্পর্শে আসিতে হয়। মদ্যপান, আশ্রয়স্থান, পরামর্শের জন্য মিলিত হওয়া, অপরাধের জন্য সমাজ-জীবন হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি নানা-কারণে পুরুষ অপরাধী পতিতালয়ে জীবন যাপন করে। পতিতা সংসর্গে বহু সৎলোক অপরাধপ্রবণ হয় এমন দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। নারী অপরাধীর সংখ্যা কম হইবার একটা কারণ, বিশেষ করিয়া এদেশে, এই যে কলকারখানা বা বহির্জগতের কাজে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। দেখা গিয়াছে কারখানা-অঞ্চলের শ্রমিক নারীর মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা অন্যান্য নারীর তুলনায় বেশী। অবশ্য অপরাধের বিভিন্নতা আছে।

যে সমাজে নারীর স্থান নীচে এবং যেখানে আইনসঙ্গত উপায়ে তাহাদের নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাইবার উপায় নাই, সেখানেই সাধারণতঃ নারী অপরাধীর সংখ্যা বেশী হয়। বলকান দেশগুলিতে আজিও নারী অপরাধীর সংখ্যা দেখিলে অবাক হইতে হয়। দণ্ডিত কয়েদীদের একটা বড় অংশ নারী এবং তাহাদের মধ্যে প্রেমপাত্র অথবা স্বামীঘাতিনীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

এখন দেখা যাক্, নারীজাতি সাধারণতঃ কোন্ প্রকারের অপরাধ করে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই মোটামুটিভাবে সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপ অপরাধ (crime) বলিয়া গণ্য হয়। বিভিন্ন দেশের আইন-প্রণেতা কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রথায় অপরাধের শ্রেণী বিভাগ বর্ত্তমান। এর মধ্যে কোন্ প্রথা ভাল বা মন্দ সে প্রশ্নের বিচার এখানে করা নিরর্থক। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ফৌজদারী আইন "ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন" (Indian Penal Code)। অপরাধের শ্রেণী বিভাগ এই আইনে প্রায় সম্পূর্ণই বলা চলে। যদিও ইহার অন্তর্গত কতকগুলি অপরাধ সত্যই অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ কিনা অনেকে সন্দেহ করেন। ইহার শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত প্রকারের—

১। অপরাধের সহায়তা।
২। অপরাধযুক্ত ষড়যন্ত্র।
৩। রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ।
৪। পল্টন, নৌ ও বিমান-বাহিনী সম্পর্কীয় অপরাধ।
৫। সাধারণের শান্তিভঙ্গের অপরাধ।
৬। সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তাঁহাদের সম্পর্কীয় অপরাধ।
৭। নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় অপরাধ।
৮। সরকারী কর্ম্মচারীর আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞা।
৯। মিথ্যা সাক্ষ্য ও বিচার সম্পর্কীয় অপরাধ।
১০। মুদ্রা ও ষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় অপরাধ।
১১। ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধ।
১২। জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা, ভদ্রতা ও সুনীতির ব্যাঘাতজনিত অপরাধ।
১৩। ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অপরাধ।
১৪। মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধ।
১৫। সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ।
১৬। দলিল সম্পর্কীয় এবং ব্যবসায়ের বা সম্পত্তির চিহ্ন সম্পর্কীয় অপরাধ।
১৭। বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধ।
১৮। অপবাদ।
১৯। ভয়প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্তি উৎপাদন।
২০। অপরাধ করিবার চেষ্টা।

দেখা গিয়াছে যে, নারীজাতি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার অপরাধেই অপরাধী হয়। যথেষ্ট শারীরিক শক্তির অভাবপ্রযুক্ত—যে সকল অপরাধে বলপ্রয়োগ আবশ্যক, নারীজাতি সে সকল অপরাধ অনুষ্ঠানে অক্ষম। কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে কিন্তু স্বভাবতঃ ইহাই দেখা যায় যে নারীর অপরাধ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ—

১। শিশু সম্বন্ধীয় অপরাধ—যথা, শিশুকে পরিত্যাগ করা, শিশু চুরি, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা।
২ গর্ভপাত করা।
৩। অসদুদ্দেশ্যে বালিকা সংগ্রহ।
৪ চোরাই মাল রাখা।
৫ বিষপ্রয়োগে হত্যা।
৬ মিথ্যা অপবাদ প্রচার
৭ ভ্রূণ হত্যা।
৮ গৃহস্থ বাড়ীতে চুরি।
৯। প্রবঞ্চনা।
১০। আত্মহত্যার চেষ্টা।

কখনও এমন দেখা গিয়াছে যে, প্রিয়জনকে তুষ্ট করার জন্য নারী কোন প্রকার অপরাধ করিতেই কুণ্ঠিত নয়—তবে

সেরূপ বিরল। মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা খুন, জখম, দাঙ্গাহাঙ্গামা, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ নারীজাতির মধ্যে খুবই কম যেহেতু এই সকল অপরাধে বলপ্রয়োগ প্রধানতঃ দরকারী।

আমার বহু দিনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক সঙ্কীর্ণতা অপসারণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে অপরাধের মাত্রা কমিবেই। ভারতবর্ষে নারীজাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে কম, ভবিষ্যতে শিক্ষাবিস্তার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এই সংখ্যা যে আরও কম হইবে ইহাই আশা করা যায়।

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অশান্ত,

বন্ধুবর বললেন—"আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু গুরুবাদ মানি নে।"

আমি। তবে তুমি মানব-সভ্যতার প্রাথমিক একটা তত্ত্বই মানো না।

বন্ধু। কি তোমার সে প্রাথমিক তত্ত্বটা?

আমি। সেটা হচ্ছে, মানুষ মানুষের কাছে সাহায্য চায় ও পায়ও। এই সাহায্য চাওয়া ও পাওয়া যদি স্বীকার করো (তুমি তা অস্বীকার করো ব'লে আমি জানি নে) তবে ঐ সূত্রেরই মধ্যে এসে পড়ে যে গুরুবাদ তা স্বীকার না করবার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকে না।

এই রকমের একটা তর্ক যে সত্যিই ঘটেছিল তা নয়। তবে আজকালকার দিনে এ-রকমের তর্ক যে-কোনো সময়ে ঘটতে পারে। সুতরাং গুরুবাদ সম্বন্ধে কিছু বলছি।

পশু-সমাজ ও মানব-সমাজের মধ্যে একটা অতি সহজ পার্থক্য এই যে পশু-সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় নেই কিন্তু মানব-সমাজে আছে। মানুষের বিশ্বের তুলনায় পশুর বিশ্ব একটা অতি সংকীর্ণ ব্যাপার। এই সংকীর্ণ বিশ্বে পশুকে যেটুকু জ্ঞান কর্ম আয়ত্ত করতে হয়, তা সে করে একটা সহজ-বোধের সাহায্যে—ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্ (instinct)এর সহায়তায়। এর জন্যে তার বিদ্যালয় দরকার করে না। সুতরাং তার বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই। ছেলেবেলার পদ্যপাঠ মনে আছে তো—

> রামেদের বুধী গাই প্রসব হইল
> রাম শ্যাম দুই ভাই দেখিতে আইল।

তার পর বাছুরের উঠে দাঁড়াবার পালা—

> পারিল না পারিল না পেরেছে পেরেছে
> দু' বার আছাড় খেয়ে এবার উঠেছে।

অর্থাৎ গো-বৎস পাঁচ মিনিটেই খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মানব-শিশুকে দু'পায়ে দাঁড় করাতে কত দিনের কত যত্ন কত কায়দা কত মা ভাই বোনদের হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে হয়। শিশু কিন্তু হামাগুড়ি অর্থাৎ চতুষ্পদ-বৃত্তিটা নিজেই শেখে—সেই পশু-জগতের সহজ-বোধ বা ইন্‌স্‌টিংক্‌টের স্মৃতি বোধ হয়। অবশ্য কিছু মাত্র শিক্ষা বা সাহায্য না পেলেও শিশু কোনো দিন হয় তো নিজে নিজেই হাঁটতে শিখবে, কিন্তু সেটা সময়ের অপব্যয় মাত্র। সুতরাং শিশুর প্রতি মহা অবিচার।

এখন, পশুর বিশ্বের আর একটা বিশেষ কথা হচ্ছে এই যে, সে বিশ্ব এমন একটা গণ্ডি-ঘেরা যা অনড় অচল, যার সঙ্কোচনও নেই প্রসারণও নেই। তাই যুগ-যুগান্তরেও পশুদের কোনো পরিবর্তন নেই। যে গাধাটা যিশুকে বহন করেছিল আর আজ যে-গাধাটা ধোপার কাপড় বহন করে এ দুই গাধার মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। আবার মহৎ সঙ্গ বা অমহৎ সঙ্গেও পশুর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তাই ধোপার গাধার চাইতে যিশুর গাধাটা কিছুমাত্র দিব্যতর গাধা নয়।

কিন্তু মানুষের জগতে এসে ঐ অবস্থা বদলে যায়। কেবলমাত্র মানুষ সহজ-বোধের দ্বারা চালিত হ'য়ে পশুর মতো জীবন যাপন ক'রে আসছে না। তাই তার মধ্যে একটা গতি একটা সচলতা আছে। আর তাই আদিম কালের গুহার মানুষ আর আজকালের গৃহের মানুষ হুবহু এক নয়। এই দুই মানুষের মধ্যেকার যে সুদীর্ঘ ইতিহাস সেটা হচ্ছে মানুষের গতির ইতিহাস, তার সচলতার বিচিত্র কথা—এমন কি তাকে রূপকথাও বলতে পারো, এমনি সরস এমনি মনোহর সে কাহিনী! এই যে গতি—কি সে গতি? কেমন সে গতি? এই গতি হচ্ছে মানুষের সহজ-বোধ থেকে বোধির দিকে—অর্থাৎ ইন্‌স্‌টিংক্‌টের জগৎ থেকে ইন্‌টুইশানের (intuition) জগতের দিকে, অন্ধ জ্ঞান থেকে দিব্য জ্ঞানে, খণ্ড জ্ঞান থেকে সম্যক্ জ্ঞানে—

এক কথায় মানুষের এই গতি হচ্ছে, ভূমির জগৎ থেকে ভূমার জগতে।

এখন, মানুষের এই যে গতি ভূমি থেকে ভূমাতে, শারীর জগৎ থেকে আত্মার জগতে, স্বল্প প্রয়োজনের জগৎ থেকে বৃহৎ আনন্দের জগতে, এই দুই জগতের মাঝে যে সুদীর্ঘ ব্যবধান, এই ব্যবধান ভ'রে উঠেছে মানুষের বহু কর্ম বহু কল্পনা বহু চিন্তা বহু জ্ঞান বহু সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। ভূমি থেকে ভূমার দিকে বিশ্বমানবের গতি একটা বিদ্যুদ্‌বেগ সরলরৈখিক গতি নয়। বিশ্ব-মানব চলেছে ঐ পথে যেন থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে নানা কর্মের নানা কল্পনার নানা সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে প্রসূনপল্লব বিকশিত ক'রে। মানুষ একক-দৃষ্টি মায়াবাদী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নয়। সে অশেষ-কৌতুকী, অবিরাম কৌতূহলী, অক্লান্ত পরিশ্রমী। তাই সে তার সুদীর্ঘ জীবনে বহু-বিলাসী। ভূমার প্রতি যে তার আকর্ষণ, সেটা এ জন্যে নয় যে এই জগৎটা মায়া বা দুঃখের আকর (কেননা এটা সুখের আসরও বটে), মরীচিকা বা ক্লেশ তৈরির কারখানা (কেননা এটা বহুবিধ আরামের বালাখানাও বটে), সেটা এই জন্যে যে ঐখানে সে পায় বৃহত্তম সমন্বয়, সকল রহস্যের সমাধান—ঐখানেই সে পায় জগতের পূর্ণ অর্থ, জীবনের পরিপূর্ণ তাৎপর্য। সুতরাং ওটা তার অদৃষ্ট-লিপি, তার ইনটুইশান বা বোধি-দৃষ্ট লক্ষ্য-স্থান। ভূমা থেকে মানুষ ভূমিরও দিব্যরূপ দেখতে পায়।

মানব-জাতির এই যে গতি এই গতির ইতিহাসকে যুগ থেকে যুগান্তরে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে মানুষের আয়ত্ত করতে হয় মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, ঐ গতিকে সহজভাবে গতিশীল রাখবার জন্যে। একটি মানুষ বা একটি পরিবার, একটি গোষ্ঠী বা একটি সমাজ যা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করল কিম্বা যা জানল, অন্য মানুষ পরিবার গোষ্ঠী বা সমাজ যদি পূর্বোক্ত মানুষদের কাছ থেকে না শিখে নিয়ে সে সবের পৃথক্ ভাবে স্বাধীন ভাবে আবিষ্কারের জন্য আকাশে মুখ তুলে চোখ বুঁজে বসে থাকত তবে বিশ্বমানবের সভ্যতা যে আজ কোন্ পর্যায়ে থাকত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ-যুগে ইউরোপ রেল মোটর রেডিও এরোপ্লেন ট্যাঙ্ক ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। আমরা যদি এই প্রতিজ্ঞা করতাম যে ও-সব আমরা স্পর্শ করব না যত দিন না স্বাধীনভাবে ও-সব আমরা আবিষ্কার করি, তবে তা হ'ত মহাভারতীয় বোকামির একটা বিরাট পর্ব। তবে মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য অর্থাৎ আত্মরক্ষা করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'ত।

সুতরাং এ-থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, পরের কাছ থেকে শিক্ষা মানব-সভ্যতার একটা প্রাথমিক তত্ত্ব। এরই ভিতর দিয়ে মানুষের সভ্যতার দ্রুত উন্নতি এবং দ্রুততর বিস্তৃতি ঘটছে এবং পৃথক্ পৃথক্ জাতি তাদের আত্মরক্ষায় অবহিত থাকছে এবং মানুষ এক দারুণ সময়ের ও শক্তির অপব্যয় থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

এখন, মানব-জাতিকে যে পুরুষানুক্রমে তার অতীতের সকল জ্ঞান কর্ম চিন্তা ইত্যাদি আয়ত্ত করতে হয়, আয়ত্তে রাখতে হয়—এ করবার জন্য মানুষ একটা সহজ কৌশল আবিষ্কার করেছে। এই কৌশলটা হচ্ছে এই যে, মানুষের যে মুখের বাণী, সেই বাণী যে শব্দগুলির দ্বারা রচিত, সেই শব্দগুলি যে ধ্বনিসমূহের দ্বারা গঠিত, কানে-শোনা সেই ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটির রেখার সাহায্যে সে পৃথক্ পৃথক্ চোখে-দেখা এক একটা রূপ দিয়েছে। কানে-শোনা ধ্বনির রেখাঙ্কিত এই চোখে-দেখা রূপের নামই হচ্ছে অক্ষর। এই অক্ষরমালার সাহায্যে এক যুগের মানুষ তার বাণীকে প্রস্তরে বা বল্কলে, পর্ণে বা পার্চমেণ্টে, মৃত্তিকা বা তাম্রফলকে, চামড়ায় বা কাগজে অন্য যুগের মানুষের জন্যে স্থায়ী ক'রে মূর্ত ক'রে রেখে যায়। রেখাঙ্কিত এই বাণী চোখের ভিতর দিয়ে অন্য যুগের মানুষের কণ্ঠগত হয়ে আত্মগত হয় এবং সে সভ্যতার পথে অবহিত থাকে। তাই প্রতি যুগের মানুষকে আবার সেই প্রারম্ভ থেকে আরম্ভ করতে হয় না। সুতরাং আজকার সভ্য জগতে সভ্য হবার ও সুসভ্য থাকবার প্রথম সোপান হচ্ছে ঐ অক্ষর-পরিচয়।

শিশুরা যদি এই অক্ষর-পরিচয়ের জন্য বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ সামনে রেখে ইনটুইটিভ (intuitive) অর্থাৎ বোধি-দত্ত জ্ঞানের জন্য ব'সে থাকত তবে বোধিসত্ত্ব হবার পূর্বে তাদের এ জ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা দাঁড়াত না—এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ফলে মানব সভ্যতার মৃত্যু ঘটত।

এখন, অক্ষর-পরিচয়ের পর যা ঘটে থাকে সেটাকেই আমরা বলি বিদ্যালাভ। এই বিদ্যালাভ সুষ্টুভাবে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করবার জন্যে মানুষ গ'ড়ে তুলেছে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। আজকার সভ্য মানুষের একটা প্রধান কথা হচ্ছে এই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। এর ভিতর দিয়ে মানুষ অতীতকে বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে দিচ্ছে না এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত রাখছে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের এই যোগসূত্র যে মানব-সভ্যতাকে কেবল বাঁচিয়ে রেখেছে তাই নয়, অতীত বর্তমান ও

ভবিষ্যতের এই অখণ্ড জীবনই মানুষকে গতিপথে সচল রেখেছে, তাকে প্রতিপদে এগিয়ে যাবার জন্যে ঠেলছে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগ যদি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় তবে মানুষের সভ্যতাও ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এই যে বিদ্যালাভ—পাঠশালা থেকে আরম্ভ ক'রে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত—এ হ'য়ে থাকে অপরের সাহায্যে এবং এর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো তর্ক ওঠে নি। পাঠশালার গুরুমহাশয় থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপক পর্যন্ত কাউকেই সমাজ আজ পর্যন্ত বাতিল করে নি।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ যে শিক্ষা—এ-শিক্ষা মুখ্যতঃ তথ্যমূলক অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে informative. "কলিকাতা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত", "চারের বর্গমূল দুই", "জলের উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন", "সূর্য থেকে গ্রহগণের উৎপত্তি", "নেপোলিয়ান ওয়াটারলুতে পরাজিত হয়েছিলেন"—এ-সমস্তই হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের তথ্য বা সংবাদ। এই সকল তথ্যই আমরা বিদ্যালয়ে মন দিয়ে প'ড়ে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করি এবং স্মৃতির মধ্যে সঞ্চিত রেখে রক্ষা করি। এমন কি "ঈশ্বর চৈতন্য-স্বরূপ" এই তত্ত্বও এখানে আমরা তথ্য হিসেবে মাত্র শিক্ষা করি—সত্যস্বরূপে লাভ করি নে—ঈশ্বরকেও লাভ করি নে, চৈতন্যেরও সাক্ষাৎ পাই নে—ঈশ্বরের উপলব্ধিতে যে রস চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভে যে আনন্দ তা প্রাপ্ত হই নে।

সুতরাং যতই খারাপ শোনাক না কেন, এ কথা বললে নিতান্ত মিথ্যা বলা হবে না যে, আজ সভ্য-মানুষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে-কার্য করছে সেটা কতকটা সংবাদপত্রের কার্য মাত্র—সংবাদপত্র, কিছু উচ্চস্তরের ও সার্বকালিক; আর সেখানকার শিক্ষকরা যে-কর্তব্য করছেন সেটা কতকটা সাংবাদিকের কর্তব্য মাত্র—সাংবাদিক, কিছু উঁচুদরের এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

বলা বাহুল্য, সভ্য মানুষের পক্ষে এ বিদ্যারও অনিবার্য ভাবে প্রয়োজন আছে। এ-বিদ্যা মানুষের মনকে দেশে ও কালে সম্প্রসারিত করে, তার বুদ্ধিকে নানাভাবে কৌশলী ও নানাদিকে কুশলী ক'রে তোলে। তার সভ্যতা সংরক্ষণের জন্যও এ-বিদ্যা দরকার। এ-বিদ্যার নাম দেওয়া যেতে পারে তন্ময়ী বিদ্যা—এটাই হচ্ছে অপরা বিদ্যা।

কিন্তু এই তথ্যমূলক informative—বিদ্যা ছাড়া আর একটি বিদ্যা আছে যা গঠনমূলক formative—যা আমাদের চেতনার রাজ্যে নির্মাণকার্য করে, আমাদের অধ্যাত্মলোকের সম্পদ ও সামর্থ্য সকল ধীরে ধীরে বিকশিত ক'রে তোলে এবং আমাদের স্বরূপ আমাদের কাছে উন্মুক্ত ক'রে দেয়। এ বিদ্যার নাম দেওয়া যেতে পারে মন্ময়ী বিদ্যা—এটাই হচ্ছে পরাবিদ্যা।

তন্ময়ী বিদ্যার দ্বারা আমরা জানি বহির্বস্তুকে বহির্বিষয়কে আর মন্ময়ী বিদ্যার দ্বারা আমরা পাই অন্তর জগৎকে, অধ্যাত্ম রস ও আনন্দকে। এই বিদ্যা ছাড়া আত্মানং বিদ্ধি—এই বাণী সফল হ'তে পারে না।

এই মন্ময়ী বা অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম সোপানে আমরা আরোহণ করি—অর্থাৎ সংবাদের রাজ্য থেকে সুন্দরের রাজ্যে, সুখ-দুঃখের রাজ্য থেকে আনন্দ-লোকে প্রথম পদক্ষেপ করি, যখন আমরা শিল্পের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করি। শিল্প—অর্থাৎ সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলা।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি যে আজকার বিশ্ববিদ্যালয় যে কাজ ক'রে থাকে সেটা মুখ্যতঃ সাংবাদিকের কাজ। সুতরাং শিল্পকলার জন্য তার বিশেষ মাথাব্যথা বা ব্যস্ততা নেই। এমন কি সভ্য সমাজের কারো কারো মতে ও-সব নিষ্প্রয়োজনের, বড়জোর অলস লোকের বিলাসমাত্র। সে যা হোক, আজকার বিশ্ববিদ্যালয় মানুষের বিশ্বের বৃহত্তর ও গভীরতর আনন্দময় অংশের সজ্ঞানতঃ কোনো ধার ধারে না—সেখানে আজ সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রবিদ্যার কোনো স্থান নেই; তবে সেখানে সাহিত্যের চর্চা কিছু হয় বটে। কিন্তু সেটা তথ্যচর্চার তুলনায় এত কম যে, তথ্যচর্চার বিপুল হিমাদ্রির চাপে সাহিত্যচর্চার সে বল্মীক চ্যাপ্টা হ'য়ে যায়। ওর আসল উপকার আমরা বড় বিশেষ পাই নে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাত্ত্বিক করে তার্কিক করে কিন্তু রসিক গড়ে না। সে শিক্ষা আমাদের বহির্জগৎকে জানায় কিন্তু অন্তর্জগৎকে চেনায় না। অথচ মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করলে তার যে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছি, যে সার বস্তুতে উপনীত হই সেটা হচ্ছে রসানুভূতি। এটাই জাগ্রত হওয়া হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ বরলাভ। ভগবান ব'ল ঈশ্বর ব'ল ব্রহ্ম ব'ল এঁদের চরম সংজ্ঞা হচ্ছে যে এঁরা রস-স্বরূপ। রসো বৈ সঃ—এর পর আর কোনো বক্তৃতার স্থান থাকে না। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ, দুঃস্থের জন্য আত্মনিয়োগ, দশের জন্য জীবন উৎসর্গ—এ-সবেরও পিছনে থাকে একটা আনন্দ-রস—বৃহত্তর আনন্দ-রস। এ-সব কর্ম যখন কর্তব্য বোধে মাত্র করি তখন,—হতভাগ্য আমি!—ওর দিব্যরূপ পরম লাভ থেকে বঞ্চিত হই। অন্তশ্চেতনার একটা বিশেষ স্তর বিকশিত না হ'লে ও লাভ করা যায় না। কিন্তু আজকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সম্বন্ধে সজ্ঞান কোনো কৌতূহলই নেই।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে—এটা তথ্য। তিনি "সোনার তরী" কাব্য লিখেছিলেন—এটাও তথ্য। সেই কাব্যগ্রন্থে "নিরুদ্দেশ যাত্রী" বলে একটি কবিতা আছে—এও তথ্য। এবং সেই কবিতা প'ড়ে যখন জানি যে তাতে

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস' শুধু মধুর হাসিনী
বুঝিতে না পারি কি জানি কি আছে
তোমার মনে।"

এই ছত্রগুলি আছে—তখন সেটাও তাথ্যিক সমাচারের মধ্যে গিয়েই পড়ে। কিন্তু যদি ঐ ছত্রগুলি প'ড়ে আমরা, মানুষের অন্তরে যে-একটা চিরন্তনের রহস্য আছে, একটা রহস্যময় সন্ধানী গোপন আকুলতা আছে, সেই আকুলতাকে জড়িয়ে আছে একটা রসলোক আধহাসি আধঅশ্রু আধসুখ আধদুঃখ, আর সেই যুগপৎ হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখের রসলোককে ঘিরে আছে একটা পরম আনন্দবোধ, এ-সবের অনুভূতি পাই, তখন আর তা তথ্য মাত্র থাকে না, তা হ'য়ে ওঠে মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্রগুণে তখন কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে আমরা এমন একটা জগতে উঠে যাই যেখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে খাওয়া-পরা সিনেমা-দেখা এমন কি ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতা বা শেয়ার মার্কেটে দাঁও মারা আমাদের সব নয়। এমন কি ও-সব আমাদের শ্রেষ্ঠাংশও নয়। ঐ আনন্দ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা এমন একটা অদ্ভুত জগতে নীত হয়েছি যেখানে বস্তুসম্ভারের লেশমাত্র নেই অথচ পরমাশ্চর্য উপভোগ আছে এক পরম —যে-উপভোগ বস্তু আমাদের দিতেই পারে না—সাত রাজার একত্রীকৃত ধনৈশ্বর্যও নয়। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর," "ছুঁচের ছিদ্রে বরং উট প্রবেশ করতে পারে কিন্তু ধনীর স্বর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়"—এ-সব উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষের অন্তর-লোকের যে দিব্য উপভোগ-রহস্য সেটা বাক্য-সম্ভার বা বস্তু-সম্ভারের বিনিময়ে কদাপি পাওয়া যায় না। অন্তর-লোকের একটা বিশেষ জাগ্রতি না হ'লে, একটা বিশেষ বিকাশ না ঘটলে আমরা বস্তুর জগৎ থেকে বোধির জগতে, স্থূলের জগৎ থেকে সূক্ষ্মের জগতে, মৃত্যুর জগৎ থেকে অমৃতের জগতে প্রবেশ করতে পারি নে। অমৃত-লোকে প্রবেশের যে ছাড়-পত্র ধনী-লোকের তোশাখানায় তা কদাপি মেলে না; ধ্যানী-লোকের বালাখানায় তা মিলতে পারে।

সুতরাং ধ্যানলোকেরই এক অধিবাসী যে কবি, সেই কবি-আত্মার এক গভীর আনন্দানুভূতি কবি-অন্তরের সুর ও সঙ্গীতে, বাণী ও ছন্দে সেই লোক আমাদের চেতনার রাজ্যে খুলে দেয় এবং আমরা এক আনন্দ-সরে বিনা আয়াসে অবগাহন করতে পাই।

ধরো—আদিকাল থেকে প্রণয়ীরা প্রিয়াদের কত কথাই ব'লে এসেছে। কিন্তু যখন একদিন শুনি কবি প্রিয়াকে সম্বোধন ক'রে বলছেন—"তুমি মোরে করেছ সম্রাট" তখন চমক লাগে। ভাবি—আবহমান কাল বিশ্বের অগণিত প্রণয়ীরা যেন কি একটা চরম কথা ধরি-ধরি-ক'রেও ধরতে পারছিল না, বলি-বলি-করেও বলতে পারছিল না, কবি-আত্মার গভীর অনুভূতি মনের স্বচ্ছতা ও বাকসিদ্ধি চক্ষের পলকে তাই স্পষ্ট করে ধরল। "তুমি মোরে করেছ সম্রাট"—মণি কাঞ্চন দিয়ে নয়, রাজ্য দিয়ে নয়, সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে নয়—করেছ তোমার প্রেমের স্পর্শ দিয়ে, তোমার আত্মার শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য দিয়ে—যে-ঐশ্বর্যের কাছে সকল ভৌতিক ঐশ্বর্য বিনা বাক্যব্যয়ে বিনা তর্কে পরাজয় মানে। আমাকে সম্রাট্ করেছ এমন একটা জগতে যেখানে বস্তু-সম্ভারের কণামাত্রও নেই কিন্তু আছে এক পরমাশ্চর্য পরম উপভোগ; এক পরম আনন্দোৎসব! যে আনন্দোৎসব পর্ণকুটীরে বা প্রাসাদে, মহানগরীতে বা পল্লীতে, মরুপ্রান্তে বা নদীতীরে, বিজনে বা লোকালয়ে একই আলো বিকীরণ করে, একই অমৃত পরিবেশন করে!

কিম্বা ধরো—আদিমকাল থেকে পৃথিবীর বুকে বর্ষা নেমে এসেছে নদ নদী পল্বল প্লাবিত ক'রে ধরণী-বক্ষ শীতল ক'রে শ্যামল ক'রে। কিন্তু কবির লেখনী-মুখে যখন শুনি—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল-সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা-বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

তখন সুর সঙ্গীত ও ছন্দে চিত্ততল ময়ূরের মতোই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মন প্রাণ এক অপূর্ব চমৎকারিত্বের বন্যায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, প্লাবিত হ'য়ে যায়। তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি যে বর্ষা কেবল ভৌতিক বারিধারামাত্র নয়, মেঘের সমারোহ বিদ্যুৎ চমক বজ্রের গমক মাত্র নয়, একটা প্রাপঞ্চিক (phenomenal) ঘটনামাত্র নয়। ওর

মধ্যে এমন একটা রসলোকের আনন্দলোকের সংবাদ আছে যার পরিমাপ ক্ষেত্রের ফসল দিয়ে হয় না, মরাইয়ের সযত্ন ও নিরাপদ-সঞ্চিত ধান্যের পরিমাণ দিয়ে করা যায় না। এই সব রসলোক ও আনন্দ-লোকের সংবাদ ও সংস্পর্শই আমরা কবির কাছ থেকে পাই। সুতরাং কেউ যদি বলেন যে তিনি কাব্যরস মানেন কিন্তু কবিকে মানেন না তবে সেটা যে কেবল যুক্তিসঙ্গত শোনাবে না, তাই নয়, অকৃতজ্ঞের কথার মতোও শোনাবে।

এখন, এই যে মানুষের শিল্প-জগতের রসানুভূতি এই রসানুভূতির আনন্দ-লোকই মানুষের অন্তর-চেতনার চরমতম গভীরতম আনন্দ-লোক নয়। ওর চাইতেও পরম ও গভীর একটা রসলোক মানুষের অন্তর-চেতনার রাজ্যে আছে, যার বিশিষ্ট বর্ণনা হচ্ছে যে তা অনির্বচনীয়। অর্থাৎ সে-রস শিল্প-জগতের কোন মাধ্যমের দ্বারাই অধিগত হয় না—না কাব্যের বাণীর দ্বারা, না সঙ্গীতের সুরের দ্বারা, না নৃত্যের গতিছন্দ বা চিত্রের রঙ ও রেখার দ্বারা। এই যে অনির্বচনীয় আনন্দ সত্তা এরই নাম আমাদের ভাষায় দেওয়া হয়েছে ঈশ্বর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি। মানুষের অন্তর-চেতনার এইটেই হচ্ছে চরমতম সত্তা পরমতম তত্ত্ব। সুখবোধ আনন্দলাভ যদি মানুষের জীবনের লক্ষ্য হয় তবে তার সর্বশেষ লক্ষ্য ঐ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। কেননা ওর চাইতে বড় শান্তিময় মঙ্গলময় সুখবোধ অথবা বৃহৎ বা গভীর আনন্দ আর কিছু নেই।

এই অন্তর-চেতনার জগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ নিয়ে ভারতবর্ষ বিশেষ চর্চা ক'রে এসেছে সেই একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, যেমন বিশেষ চর্চা করছে আজকার ইউরোপ আমেরিকা জড় বিজ্ঞানের। জড় বিজ্ঞান নিক্তি দিয়ে ওজন করা যায়, সুতরাং তা সত্য, আর আধ্যাত্ম বিজ্ঞান তেমন ভাবে ওজন করা যায় না, সুতরাং তা মিথ্যা; এ কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মহাজ্ঞানী ব'লে মনে করবার কোন কারণ নেই। ও-কথা বলার অর্থ এই রকমের কথা বলা যে, রসগোল্লার রস জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ করা যায়, সুতরাং তা সত্য, কিন্তু কাব্যের রস জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ করা যায় না, সুতরাং তা মিথ্যা। বলা বাহুল্য, ও কথা সত্য নয়।

ভারতবর্ষের এই অন্তর-লোকের চর্চায় যাঁরা কিছুমাত্র খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, সে একটা কি অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার। এমন অলিতে-গলিতে তন্ন তন্ন ক'রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান ও সত্যিকারের আলোক সম্পাত আর কোনো ক্ষেত্রে হয়েছে কি না সন্দেহ! এর তুলনায় আজকার ইউরোপীয় মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণা জ্ঞানের সমুদ্র-সৈকতে দু-একখানি উপল সংগ্রহ মাত্র। বস্তুবারের জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হ'তে পারি কিন্তু মানুষের চিত্তের দৈন্য দূর করবার মন্ত্র আমাদের কাছে আছে।

সে যাই হোক্, মানুষের অন্তর-চেতনার লোকে পরদায় পরদায় একটা ক্রম-উন্মোচন ব্যাপার আছে ব'লে সে যেমন আহার নিদ্রা বংশরক্ষাতেই স্থির থাকতে পারে না, এক দিন সে শিল্পরস-সম্ভোগের জন্য উৎসুক হ'য়ে ওঠে, তেমনি সে আর একদিন আরও গভীর রসানুভূতি, ব্রহ্মানন্দ বা ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। শিল্পলোকের রসানুভূতি যেমন মায়া নয়, ব্রহ্মলোকের আনন্দও তেমনি মরীচিকা নয়। শিল্পলোকের রসানুভূতিতে মানুষ তার গভীরতর সত্তাকেই খুঁজে পায়, ব্রহ্মলোকের আনন্দের উপলব্ধিতে সে তার পরমতম সত্য ও চরমতম সত্তাতে স্থিতি লাভ করে। এই পরম স্থিতি আমাদের আছে বলে—যদিও আমাদের অধিকাংশেরই পক্ষে তা অগোচর—অসংখ্য গতিকে আমরা সত্য ক'রে পাই। এই পরম স্থিতি না থাকলে গতি হ'ত আমাদের পক্ষে এক প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার। কেন না তবে গতিকে আমরা পেতাম না, গতিই আমাদের পেয়ে বসত—এবং আমাদের নির্বিবাদে ভাসিয়ে নিয়ে যেত উড়িয়ে নিয়ে যেত স্রোতের মুখে কুটোটার মতো, ঝড়ের মুখে পাতাটার মতো এবং পরিশেষে আমাদের ধ্বংস ক'রে ফেলত সোফারহীন চলন্ত মোটরকারটার মতো।

এখন, সত্যি সত্যিই যদি কেউ ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তবে তিনি স্বভাবতঃই সেই ব্যক্তির খোঁজ করেন যাঁর কাছ থেকে তিনি ঐ পথের নির্দেশ পেতে পারেন, যাঁর সাহায্যে তিনি ঐ পথে সম্যক্ ভাবে অবহিত থাকতে পারেন। এ থেকেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে গুরুর উদ্ভব ও গুরুবাদের জন্ম। এবং এটা একটা অত্যন্ত সহজ সরল ব্যাপার। সুতরাং যদি কেউ বিজ্ঞবৎ বলেন—ঈশ্বর মানি কিন্তু গুরুবাদ মানি নে—তবে তার সরল অর্থ হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর মানতে পারেন কিন্তু সে-ঈশ্বরের জন্য তিনি আপাততঃ বিশেষ ব্যস্ত নন। দুর্বার দেহের ক্ষুধায় মানুষ খাদ্যের সন্ধান করে, দুর্নিবার আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় পীড়িত হ'লে লোকে অধ্যাত্ম-ভাঁড়ারের ভাণ্ডারীর কাছেই ছুটে যায়। তবে অবশ্য মনুষ্যকুলেও এক আধ জন প্রহ্লাদের মত ব্যক্তির জন্ম হতে পারে যিনি জন্ম থেকেই ঈশ্বরসিদ্ধ। এমন ব্যক্তির গুরুর কোন প্রয়োজন হয় না।

এ-পর্যন্ত বুঝতে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু আজকার আধুনিক মনের মানুষের কাছে এই প্রশ্নটা উদয় হয় যে, ভারতীয় অধ্যাত্ম-জগতের ব্যাপারে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে-ধরণের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে—সেটা কেন? গুরুর কাছে শিষ্যের এমন নতি, গুরু যেন একজন দিব্যধামবাসী আর শিষ্য যেন একটা কীটাণুকীট—এই শিষ্যের পক্ষে আপন মর্যাদাহানিকর মনোভাবের আমদানী কেন হ'ল? কিন্তু এরও একটা তাৎপর্য আছে। অবশ্য স্নেহ প্রেমের মতো শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা ইত্যাদির মধ্যেও একটা আনন্দ-রসের উপভোগ আছে। শিষ্য গুরুর সম্পর্কে ও-রসও উপভোগ করেন। কিন্তু ও-ব্যাপারে ঐটেই আসল কথা নয়। শিষ্যের সিদ্ধ গুরুর কাছে পরম নতি স্বীকারের একটা ওর চাইতে নিগূঢ় তাৎপর্য আছে—একটা বিশেষ কার্যকরী অর্থ—একটা practical side—আছে। সেটা তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে ব্রহ্ম সত্তাতেই আমাদের পরম স্থিতি। এই স্থিতিই নিত্য অপরিণামী। সুতরাং একমাত্র এইখানে পৌছেই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি। আবার এই স্থিতিই হচ্ছে পরিণামহীন দিব্য আনন্দস্বরূপ, সুতরাং এইখানে পৌছেই আমরা লাভ করি অমৃতত্ব অমরত্ব। আমরা যে মানুষকে অমর বলি তার কারণ তার এই ব্রাহ্মীস্থিতি। মানুষ তার আত্মায় না পৌছিলে এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করতে পারে না। কেননা এই আত্মাই হচ্ছে ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপতঃ এক। তাই আত্মা হচ্ছে অমর। এবং যেহেতু এই আত্মাতেই মানুষের আসল স্থিতি সেই হেতু মানুষ হচ্ছে অমর অমৃতের পুত্র।

কিন্তু আমরা সবাই আর কিছু হুট বলতেই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করি নে। এবং আমরা অধিকাংশেই ওটা লাভ করবার কথাই চিন্তা করি নে। অথচ জীবনে একটা স্থিতি না হ'লেও চলে না। স্থিতি ছাড়া আমরা কোনো কিছুকেই লাভ করতে পারি নে, উপভোগ করতে পারি নে—এমন কি গতিকেও নয়। সুতরাং জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক একটা কৌশল ঘটে। আমাদের কামনা ও কর্ম আমাদের ক্ষুদ্র অহংবোধের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা একটা কঠিন আবরণ আমাদের চারপাশে গ'ড়ে তুলি এবং সেই কঠিন আবরণের মধ্যে একটা সাময়িক স্থিতি লাভ করি। এই স্থিতি পর্ণকুটীর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত, জুয়োখেলার আড্ডা থেকে নৈয়ায়িকের তর্কসভা পর্যন্ত সর্বত্র সর্বাবস্থায় ছড়িয়ে আছে। এই স্থিতিসমূহ পরিণামী, সুতরাং মৃত্যুর। মৃত্যুময় এই স্থিতিসমূহের দিকে দৃষ্টি রেখেই অর্ধজ্ঞানীরা প্রচার ক'রে থাকেন যে, এই জগতটা মায়া। কিন্তু ব্রাহ্মীস্থিতির সম্যক্ জ্ঞানের আগে সমগ্র দৃষ্টির আগে মৃত্যু অপসারিত হ'য়ে যায় এবং সৃষ্টির পূর্ণ আনন্দ রূপটি ধরা পড়ে। মায়াই তখন মিথ্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। পূর্ণ সত্য ও জ্ঞানের পূর্ণতা এইখানেই।

সে যা হোক্ এখন যে মানুষটি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা দিব্য জীবনের জন্য ব্যাকুল বা উৎসাহী হ'য়ে উঠেছে তার প্রথম দরকার হবে তার ঐ সাময়িক স্থিতির থেকে বেরিয়ে আসা, তার চার পাশের কঠিন আবরণটি ভেঙে ফেলা। গুরুর কাছে গিয়ে যদি শিষ্যের মন তার সংকীর্ণ আমি স্বল্প জীবনের কর্ম ও কামনার কঠিন আবরণটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে সঙ্গীন কাঁধে পল্টনের মত শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর ভাবতে থাকে যে সে আসল মনুষ্যত্বের একটা উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাচ্ছে, তবে তার মধ্যে উচ্চতর চেতনার আলো প্রবেশ করবার কোন পথই থাকবে না। সিদ্ধ গুরুর কাছে সত্যিকার আন্তরিক নতি হচ্ছে শিষ্যের পক্ষে ঐ কঠিন আবরণ নির্মম ভাবে ভেঙে ফেলার স্বীকৃতি প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার। এই প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার না থাকলে গুরুর স্পর্শ ও শক্তি কার্যকরী হওয়া সহজ হয় না। এবং যদি কার্যকরী হয় তবে অনেক সময় শিষ্যের পক্ষে বিপর্যয় ঘটে যাবার সম্ভাবনাও থাকে। সুতরাং গুরুর কাছে নিঃশেষে অবনত হওয়া শিষ্যের আপনার সাফল্য লাভের জন্যই অনিবার্য ভাবে প্রয়োজন। এই হচ্ছে ও ব্যাপারের ভিতরকার আসল কার্যকরী নিগূঢ় ব্যাপারটা—practical দিকটা।

তুমি অবশ্য বলতে পারো যে, গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধকে তো দুষ্ট লোকেরা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মারাত্মক অস্ত্র-রূপে ব্যবহার করতে পারে। তা নিশ্চয়ই পারে—যেমন পারে দুরাত্মা লোকেরা জড় বিজ্ঞানের রহস্যকে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মারণাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে।

অর্থাৎ মানব-সমাজের যত কিছু অমঙ্গল তা বস্তু বা বিষয়ের মধ্যেই আছে ব'লে ধার্য করলে ভুল হবে ও ঠকতে হবে। সকল অমঙ্গলের আসল উর্বর নার্সারি (nursery) হচ্ছে মানুষেরই মন ও মস্তিষ্ক। ইতি

হসন্ত

রামানন্দ-প্রসঙ্গ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে যে-কয়জন মনীষীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, বিখ্যাত সাংবাদিক 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম।

রামানন্দবাবুর সহিত কলিকাতায় এবং অন্যত্র কয়েক বার আমার দেখা হইয়াছে, পত্রবিনিময়ও হইয়াছে। আমার মত নগণ্য লেখককে যে তিনি অবহেলা করেন নাই, ইহা তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। তাঁহার সহৃদয়তা, স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য ও মহত্ত্বের কথা আমার স্মৃতিপট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না।

রামানন্দবাবুকে প্রথম আমি দেখি বোধ করি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, সুরমা-উপত্যকা সাহিত্য-সম্মেলনের শিলচর অধিবেশনে। উক্ত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আশৈশব যাঁহার খ্যাতি শুনিয়া আসিতেছি সেই বিখ্যাত মনীষীর সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার কি আকুল আগ্রহই না তখন হইয়াছিল!

আমার সেই আবাল্যপোষিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় ইংরাজী ১৯৩৬এ; তখন বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে আমি শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় আসি। ইতিমধ্যে 'প্রবাসী'তে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতায় গিয়া রামানন্দবাবুর দর্শনপ্রার্থী হইয়া ১৪ই আষাঢ় সকাল সাড়ে আটটার সময় তাঁহার ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের বাস-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একখানা কার্ডে নিজের নাম এবং 'প্রবাসী'র লেখক এই দুইটি কথা লিখিয়া দারোয়ানের মারফৎ উপরে পাঠাইয়া দিলাম। দুই-তিন মিনিট পরেই রামানন্দবাবু সেই কার্ডখানা হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন—"আপনার কি বক্তব্য বলুন।"

তাঁহাকে আমার বেশ একটু সময়ের জন্য প্রয়োজন একথা জানাইলে তিনি সন্ধ্যার পর যাইতে বলিলেন। তখনকার মত বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর তাঁহাকে নীচের তলায়ই পাওয়া গেল। রামানন্দবাবু আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। তাঁর পরনে শাদা পায়জামা ও গায়ে একটা লম্বা জামা। দেখিয়া যেন অসুস্থ বলিয়াই মনে হইল।

আমরা উভয়ে মুখোমুখি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। প্রথমেই আমি তাঁহাকে 'জার্ণালিজ্‌ম্‌' সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্ন করিলাম। এ বিষয়ে বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের মতের মূল্য যে খুবই বেশী তা বলাই বাহুল্য। রামানন্দবাবু কথাগুলি খুব আস্তে ধীরে বলেন। কণ্ঠস্বর চিত্তের দৃঢ়তার পরিচায়ক। কথাগুলি অত্যন্ত measured; আবেগ-উচ্ছ্বাসের বালাই তাহাতে নাই।

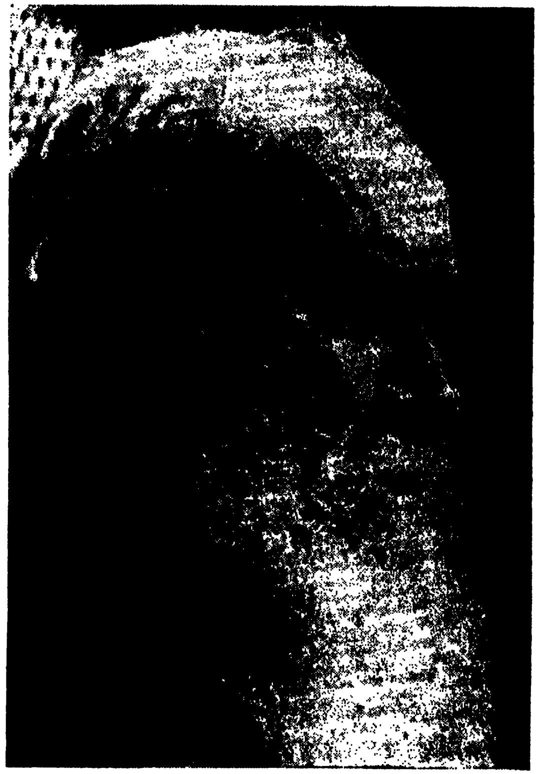
আমাদের দেশের লেখকরা প্রবন্ধাদি লিখিয়া তার উপযুক্ত দক্ষিণা কেন যে পান না তাহার কারণ সম্বন্ধে বলিলেন,—"দেশের পত্রিকাগুলোর আর্থিক অবস্থা এখনও এরূপ হয় নি যে আমরা লেখকদের নিয়মিতভাবে অর্থ-সাহায্য করতে পারি। আগেকার আমলের বঙ্গদর্শন খুবই ভালো পত্রিকা ছিল, কিন্তু তার আয়তন ছিল ছোট এবং এত বেশী ছবি দেবার রীতিও ছিল না। পত্রিকার আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের ওপর। আমরা প্রতি মাসে যে-পরিমাণ বিজ্ঞাপন পাই পাশ্চাত্য দেশের পত্রিকাগুলোর তুলনায় তা ধর্ত্তব্যই নয়। বিজ্ঞাপনের জন্য আমাদের যে-হার নির্দ্ধারিত তাও নগণ্য। আমার *Modern Review* ত দুনিয়ার বহু জায়গাতেই যায়, কিন্তু সে-সব দেশের লোকেরা আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে চায় না। কারণ, তারা মনে করে যে-পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ৪০৲ টাকা মাত্র, সে-পত্রিকার কাটতি বোধ হয় খুব বেশী হবে না।" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—"কিন্তু, আমরা যদি গোড়া থেকেই বাংলা দেশের পাঠকদের গড়ে নিতে পারতাম তা হ'লে আমাদের পত্রিকাগুলোর আর্থিক অবস্থা ঢের ভালো হ'ত। বাংলা-দেশের পাঠকদের 'সীরিয়াস' জিনিস পড়বার অভ্যাস খুব কম। আমার *Modern Review* বাংলা ছাড়া অন্য প্রদেশের লোকেরা যে বেশী পড়ে তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলতে পারি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজের লোকদের পড়বার অভ্যাস সকলের চেয়ে বেশী এবং তারা যে শুধু নাটক নভেল পড়ে তা নয়।"

বিদেশের পত্রিকাগুলি কি ভাবে লেখকদের অর্থ-সাহায্য

করে সে-কথা বলিতে গিয়া নিজের সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেন। কিছুদিন আগে নাকি আমেরিকার 'নিউ রিপাব্লিক-এ মাত্র সোয়া পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁহার একখানা প্রতিবাদ-পত্র বাহির হয়। চিঠিখানা বাহির হইবার দিন-কতক পরে অযাচিত ভাবে তাঁহার হাতে পত্রিকার তরফ হইতে যে-পরিমাণ ডলার আসিয়া পৌঁছে তাহার মূল্য ৯২৲ টাকা।

'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রসঙ্গে ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবের কথা উঠিল। রামানন্দবাবু বলিলেন—"দুইবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর বয়স নব্বই পার হয়েছে, অথচ এ বয়সেও তাঁর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা কি অসাধারণ!" এই সময় আমি প্রশ্ন করিলাম—"আপনার বোধ করি আপাতত সত্তর চলছে?" বলিলেন—"না, এখন চলছে একাত্তর।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বয়সেও কি রাত্রে খাটেন?" বলিলেন—"হ্যা! বাংলা এবং ইংরেজী মাসের শেষ কটা দিন রাত-দিন সব সময়েই খাটতে হয়। কেননা, সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধেই আমাকে লিখতে হয়, সুতরাং কোনো ঘটনা মাসের শেষে কোনো পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হয় কিনা তা না দেখে মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই জন্যেই কাগজগুলো মাসের শেষ ভাগের জন্যে জমে থাকে।" একটু থামিয়া আবার সুরু করিলেন—"বাংলা মাসিক পত্রিকায় এই রকম সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ আমিই প্রথম সুরু করি। যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন এ কাজটা, বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন যতই কষ্টকর হোক্ না কেন, আমাকে করতেই হবে।"

'প্রবাসী'র আলোচনা বিভাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বলিলেন—"এ জিনিসটাও বাংলা মাসিকে বোধ হয় আমিই প্রথম প্রবর্ত্তন করি। কোনো লেখার প্রতিবাদ হ'লে পর মূল প্রবন্ধ-লেখকের এ সম্বন্ধে কি বক্তব্য তাও জানা দরকার। সেই জন্য সাধারণতঃ তিন সংখ্যা ধরে প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ চলে। কিন্তু তারপরও আবার অনেকে সমালোচনার 'সমালোচনা' লিখে পাঠান; এবং আমি ছাপি না ব'লে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে তীব্র আক্রমণ করে পত্র লিখেন। কিন্তু, তাঁরা এ সহজ কথাটা কেন ভুলে যান যে, কোনো বিষয় সম্বন্ধেই শেষ কথা বলা চলে না। এ কথা কি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, আজ পর্য্যন্ত কোনো বিষয় সম্বন্ধে চরম কথা বলা হয়ে গেছে। তার পর, যাঁরা প্রবন্ধাদি লিখে পাঠান, তাঁরাও তাঁদের যা বক্তব্য সমস্ত একেবারে নিঃশেষে বলে ফেলতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে, সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লেখার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে খানিকটা information দেওয়া আর প্রধানতঃ বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্রেক করা। যাঁরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখে পাঠান তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বই লিখলেই ভাল হয়। তবে বই না লেখার



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অন্যতম প্রধান হেতু হচ্ছে এই যে, বই আমাদের দেশে লোকে বড়-একটা কেনে না।"

নানা প্রসঙ্গ বহুক্ষণ চলার পর আমি তাঁহাকে রবীন্দ্র-নাথের নিকট একখানা পরিচয়পত্র লিখিয়া দিবার অনুরোধ জানাইলে বলিলেন—"কবিকে দেখবেন? তা পরিচয়পত্র নিশ্চয়ই আপনাকে আমি দেব। কিন্তু, 'মডার্ণ রিভিয়ু'র লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন আজ আমি এত ক্লান্ত যে, উঠে আবার কলম ধরব এ কথা ভাবতেই যেন আতঙ্ক হচ্ছে। আপনি যদি কাল সন্ধ্যায় সময় একবার আসেন তাহ'লে ভাল হয়।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় পুনরায় রামানন্দ-ভবনে গিয়া হাজির হইলাম। নীচের তলায় একটি ঘরে উপাসনা

আরম্ভ হইয়াছে। খবর পাইলাম রামানন্দবাবু পরিবারস্থ সকলকে লইয়া উপাসনায় রত। বেয়ারা সুইচ টিপিয়া বসিবার ঘরে আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। উপাসনা অন্তে রামানন্দবাবু বসিবার ঘরে আসিলেন। পরনে শুভ্র খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী। শ্বেতশ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখমণ্ডল তাঁহার আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর শুভ্রবসন-পরিহিত, সৌম্য-শান্ত, শুচিশুভ্র মূর্ত্তিখানি অপরূপ লাগিয়াছিল।

দু-একটা কথাবার্ত্তার পর আমি পরিচয়-পত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম হয়ত বেয়ারাকে দিয়া পরিচয়-পত্রখানা পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নিজেই একখানা খাম হাতে নীচে নামিয়া আসিলেন। খামখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন —"এই আপনার পরিচয়-পত্র, এর জন্যে যে আবার আপনাকে এতদূর কষ্ট করে আসতে হ'ল সেজন্য বাস্তবিকই আমি লজ্জিত!" সামান্য কয়েকটি কথা,—কিন্তু কি গভীর আন্তরিকতা এবং সৌজন্যপূর্ণ! তাঁর সেদিনকার আচরণ এবং উক্তি আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় সঞ্চয়।

বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে ট্রামে বসিয়া বার বার মনে হইতে লাগিল ইনি কত বড় জ্ঞানী, কিন্তু কেমন নিরহঙ্কার। বাস্তবিকই যেন সৌজন্য, অমায়িকতা এবং পবিত্রতার প্রতীক। সাংবাদিক ও মনীষী হিসাবে রামানন্দবাবু যত বড়, মানুষ হিসাবে যে তার চেয়ে ঢের বড় সে-পরিচয় যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ ভাবে পাইয়াছেন। নিজে প্রকৃত 'বড়-মানুষ' হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট ছোট-বড়র ভেদ ছিল না। আমাদের মত সাধারণ মানুষকেও তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করিতেন, আমাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করিতেন না। রামানন্দবাবুর সান্নিধ্যে গেলে আমার মনকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করিত তাঁহার দেহ মন ও আত্মা হইতে বিকীর্ণ পবিত্রতার দীপ্তি।

রামানন্দবাবুর সহিত আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয় ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রীহট্ট শহরে অনুষ্ঠিত সুরমা উপত্যকা প্রগতি-সাহিত্য সম্মেলনে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি শ্রীহট্ট আসিয়াছিলেন। তথাকথিত 'প্রগতি-সাহিত্য'র স্রোত তখন পূর্ণবেগেই কলিকাতা হইতে মফস্বলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সাহিত্য-সম্মেলনে প্রবন্ধ-পাঠক এবং বক্তাগণ 'প্রগতি'র এই বিকৃত আদর্শকেই উচ্চরোলে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। প্রগতি-সাহিত্যের সহিত পরিচিত না থাকায় সাহিত্যের এই আদর্শ-বিকৃতি রামানন্দবাবুকে বিস্মিত ও ব্যথিত করিয়াছিল।* সভার দ্বিতীয় দিনে তিনি 'সাহিত্যে প্রগতি' সম্বন্ধে এক যুক্তিপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক এবং দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। আমাকে ঐ বক্তৃতার অনুলেখন করিতে হয়। তিনি অনুলেখনটি তাঁহার কলিকাতার ঠিকানায় ডাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। অনুলেখনটি কয়েকদিন পরেই আমি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিই। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার পত্রব্যবহার সুরু হয়। দু-একখানা চিঠির কোন কোন অংশ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

20 Mullen Street, Elgin Road P.O
কলিকাতা
১৭-৯-১৯৩৭

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনার চিঠি ও রিপোর্টটি কাল বিকালে ২টার সময় পাই। সংশোধন ও কিছু পরিবর্দ্ধন করে আজ সেটি রেজিষ্টারী করে পাঠাচ্ছি। আপনি ইহা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকা এবং অন্য যে-কোন পত্রিকায় দিতে পারেন।

দয়া করে কিছু বাদ দেবেন না বা বদলাবেন না।

..................আমার সংশোধিত হস্তলিপিটি কি আমাকে দিতে পারবেন? এতে আমার অনেক সময় গেছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় আরোগ্যলাভ করেছেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা
২৫-৯-১৯৩৭

প্রীতিভাজনেষু

......মডার্ণ রিভিয়ু নিয়ে ব্যস্ত ও ক্লান্ত থাকায় কাল আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই। আমার কথাগুলো আপনার ভাল লেগেছে জেনে প্রীত হয়েছি। এগুলোর জন্যে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করেছেন ও করবেন জেনে কিন্তু সঙ্কোচও বোধ করছি।............

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৭ বাংলার পৌষ মাসে জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের জন্য এই অনুলেখনটিকে ভিত্তি করিয়া তিনি "সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

---

* প্রগতি-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে পত্রিকা-মারফৎ রবীন্দ্রনাথের গুরুতর পীড়ার খবর পাওয়া যায়। অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত থাকে। রামানন্দবাবু কবিগুরুর রোগমুক্তি-কামনায় প্রার্থনা করেন।—লেখক।

"প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টে একটি সাহিত্য-সম্মেলনে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাতে নূতন কিছু জিনিস যোগ করিয়া ঐ প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছিলাম।" (প্রবাসী-বিবিধ প্রসঙ্গ, আষাঢ়, ১৩৪৮)। উক্ত প্রবন্ধে রামানন্দবাবু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'প্রগতি'তে তাঁহার আপত্তি নাই, শুধু তার বিকৃতিতেই আপত্তি। প্রবন্ধটির উপসংহারে তিনি বলেন—"সংযম, নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি, কোনটাই হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে নি। প্রবৃত্তি যেখান থেকে এসেছে, নিয়ন্ত্রণও সেখান থেকে এসেছে। সমস্তর মধ্যেই একটা স্বাভাবিকতা আছে। এই স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে প্রগতি, অগ্রগতি ইত্যাদি নামের মোহে মেতে উঠলে সুফল ফলে না। নামে একটা বড় জিনিস কিছু হয় না। স্রোতে ভেসে যাওয়াটা ঠিক নয়।"

রামানন্দবাবুর সহিত আমার তৃতীয় বার দেখা হয় কলিকাতায় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮ই এপ্রিল সকালে এক নম্বর উড্ স্ট্রীটের বাসায় তাঁহার সহিত গিয়া দেখা করি। এবার দেখা হয় তাঁহার অধ্যয়নাগারে। প্রকাণ্ড টেবিলের প্রায় সবটা জুড়িয়া কাগজপত্র, পত্রিকা, পুস্তক ইত্যাদির বিরাট্ স্তূপ। এই স্তূপীকৃত কাগজপত্রের এক পাশ থেকে ছোট একটি পিত্তল-নির্ম্মিত ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে। বাঁদিকে শেল্‌ফের উপর অসংখ্য পুস্তক। চেয়ারে উপবিষ্ট, পাঠরত রামানন্দবাবুকে দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি কাগজের স্তূপের মধ্যে ডুবিয়া আছেন। টেবিলের উপরে স্থাপিত ধ্যানী-বুদ্ধের মূর্ত্তিটির মতই একাগ্রচিত্ত, তন্ময়। রামানন্দবাবুকে 'প্রবাসী'র 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' বাংলাদেশে এবং 'মডার্ণ রিভিয়ু'র Notes তাহার বাহিরেও একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত করিয়াছে। কিন্তু এই পরিচিতি লাভ করিবার জন্য যে তাঁহাকে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হইয়াছে, তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলা যে কি অক্লান্ত অধ্যয়ন ও একাগ্র সাধনার ফল তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত হইলাম এবং শিখিলাম যে, সংসারে বড় জিনিস লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়, ফাঁকি দিয়া কেহ বড় হইতে পারে না।

এই জ্ঞান-সাধকের গৃহে আমি প্রবেশ করিলাম মূর্ত্তিমান বিঘ্নের মত। যাই হোক্, আমাকে তিনি পরম সমাদরেই অভ্যর্থনা করিলেন। শুনিলাম যে, গতকল্য রাত্রে তিনি হাজারিবাগ হইতে আসিয়াছেন। তখন শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদপটে মরালের ছবির বিরুদ্ধে মুসলমান ছাত্রগণ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই মাসের 'প্রবাসী'তে রামানন্দবাবু এবিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করায় প্রথমে সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলাম।

অনেক কথার পর তিনি বলিলেন, "এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গে আরো কিছু লিখবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু জায়গা হবে কিনা বলতে পারি না। জায়গার অভাবে অনেক কিছুই আমাকে প্রতি মাসে বাদ দিতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে কিছু পরে 'প্রগতি-সাহিত্যে'র কথা উঠিল। রামানন্দবাবু বলিলেন, "প্রগতি সাহিত্যিকেরা যা করছেন, নিশ্চয়ই তার মধ্যে ভালো জিনিস আছে। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন সকলের ওপরে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার করেন। আর অন্য পক্ষের যাঁরা তাঁদের কথায়ও যেন একটু-আধটু কান দেন।"

হঠাৎ 'বুক-শেল্‌ফে' অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস-চরিতে'র প্রতি আমার নজর পড়িল। এ সম্বন্ধে দিন কতক আগে পঠিত একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ায় আমি বলিলাম, "...মশায়ের লেখা পড়ে দেখলাম যে, তিনি 'চণ্ডীদাস-চরিত'কে জাল বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, 'অন্ধ নয়ন আলোক আইস, আইস অন্তরযামী' ইত্যাদি লাইন নাকি রবীন্দ্র-যুগের লেখা না হয়েই যায় না।" রামানন্দবাবু বলিলেন, "এ বিষয়ে বিরুদ্ধ-পক্ষের প্রথম আপত্তি এই পুঁথির স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নিয়ে। তা' বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অজস্র। সেগুলো আধুনিক কালের কবিরা যেমন ব্যবহার করে থাকেন, প্রাচীন কালের কবিও তেমনি করেছিলেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?" একটু থামিয়া বলিলেন, "আসল কথা কি জানেন? প্রত্যেক বিষয়েই জনকতক ব্যক্তির কোনো-না-কোনো রকমের vested interest থাকে। চণ্ডীদাস আসলে হচ্ছেন বাঁকুড়ার লোক। ছাতনায় বাশুলী দেবীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির এখনো আছে, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষও আছে। কিন্তু কেউ কেউ প্রমাণ করতে চান যে, চণ্ডীদাস বাঁকুড়ার অধিবাসী নন সেজন্যেই তাঁদের এ প্রয়াস।......"

চণ্ডীদাস-চরিত প্রসঙ্গ কিছু কথার পর সমাপ্ত হইল। মনে পড়িল কয়েক দিন আগে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোনো জ্যোতির্ব্বিদ নাকি অল্প বয়সে রামানন্দবাবুর হাত দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি কবি হইবেন। শান্তা দেবী নাকি তাঁহার পিতৃদেবের শ্রীমুখাৎই এ কথা শুনিয়াছিলেন। এ কথা উল্লেখ করিলে রামানন্দবাবু বলিলেন, "শান্তাকে হয় ত বলে থাকব, আমার কিছুই মনে নেই। কিন্তু আমি ত কবিতা

লিখি না।" আমি বলিলাম, "এর একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, কবি মানে পণ্ডিত। কিন্তু, আপনার হাত থেকে আপনার কল্পনা-প্রবণতারও পরিচয় পাওয়া যায়।" একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তা মনে পড়ছে বটে ছোট বেলায় কবিতা লিখতাম। একজন জ্যোতির্বিদ আমায় বলেছিলেন যে, আমি একাশি বছর বাঁচবো।"

সাহিত্য-সাধনায় জীবন কাটাইবার বাসনা আমার তরুণ বয়স হইতেই ছিল। কিন্তু সংসারের নানা জটিল আবর্তে পড়িয়া সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না। কল্পনা এবং আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের কেন এই নিষ্ঠুর সঙ্ঘাত এই প্রশ্ন আমার মনকে বিচলিত করিয়াছিল। এই অন্তর্গূঢ় বেদনায় সান্ত্বনা চাহিয়া তাঁহার নিকট আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি অবিলম্বে চিঠির জবাব দিয়া আমার প্রতি অপরিসীম প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। চিঠিখানার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Wood Street
কলিকাতা
২২-৭-৩৯

প্রীতিভাজনেষু!

আপনার চিঠি পাইয়াছি। ... ...

যাঁহারা নিজের কল্পনা ও ইচ্ছার অনুরূপভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারা ভাগ্যবান্। কিন্তু সকলের সেরূপ সৌভাগ্য হয় না। তাহার জন্য দুঃখ করা নিষ্ফল।

আপনাকে যে আপনার কাজ উপলক্ষ্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহাতে অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে। তাহাকে সাহিত্যিক রূপ দিতে পারেন। যাঁহারা কল্পনার দ্বারা নূতন কিছু সৃষ্টি করেন, তাঁহাদেরও অনেকের সৃষ্টির উপকরণ বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ। এ বিষয়ে আমি বেশী কিছু বলিতে অসমর্থ, কারণ সাহিত্য-সৃষ্টির কাজ আমি করি না। সে ক্ষমতা আমার নাই। যদি কখনও কিছু ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। সাহিত্যে আমি কিছু করিয়া যাইতে পারিব না, ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু অন্য কাজ যাহা পারি তাহা করাই আমার পক্ষে ভাল। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সাহিত্যিক নহে। তাহাদের দলভুক্ত থাকা দুর্ভাগ্য মনে না করিতে চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী ১৯৩৯এর শেষভাগে আমি কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় শ্রীহট্টে 'বাণীচক্র'-সাহিত্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত করি। ১৯৪১এর এপ্রিল মাসে 'বাণীচক্রে'র উদ্যোগে শ্রীহট্ট শহরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্ম-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কবির সঙ্গে আমার আলাপের অংশবিশেষ ছাপাইয়া সভায় বিতরণ করা হয়। ইহার এক খণ্ড আমি রামানন্দবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিই। তিনি ১৩৪৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে কবিগুরু সম্পর্কে আমার রচনাংশটি পুনর্মুদ্রিত করেন এবং 'বাণীচক্র' এবং আমার সম্বন্ধে কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশিত করেন।

কবিগুরুর লোকান্তরগমনের পর আমি তাঁহাকে আমার 'কবি-প্রণাম' প্রকাশের সঙ্কল্পের কথা জানাই। তিনি আমাকে ইহাতে শুধু উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখা তাঁহার সুদীর্ঘ এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধটি 'কবি-প্রণামে' ছাপিবার অনুমতি দিয়াও আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।

'কবি-প্রণাম' প্রকাশিত হইবার পর ১৩৪৮ সনের মাঘের 'প্রবাসী'র বিবিধ-প্রসঙ্গে 'বাণী-মাল্যের বন্ধন' এবং 'কবি-প্রণাম' নামক দুইটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে পুস্তকখানা সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়।

"বাণীচক্র" এবং "কবি-প্রণাম" সম্পর্কে রামানন্দবাবুর সহিত বহু চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হওয়ায় তাঁহার সহিত মানসিক আত্মীয়তার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাই গত আষাঢ় মাসে কলিকাতায় আসিয়া ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয়ের প্রমুখাৎ যখন জানিতে পারিলাম যে, অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি শয্যাশায়ী, তখন বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম।

একদিন ক্ষান্ত-বর্ষণ আষাঢ়ের অপরাহ্নে ডাক্তার নাগের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলাম। রামানন্দবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, রোগ-যন্ত্রণায় আচ্ছন্নের মত তিনি বিছানায় পড়িয়া আছেন; চক্ষু দুইটি মুদ্রিত, মুখে একটা পাণ্ডুর আভা, সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা। দেখিয়া একেবারে চমকাইয়া উঠিলাম; কি চেহারা কি হইয়া গিয়াছে। প্রণাম করিলে প্রশ্ন করিলেন—"কে?" আমি আমার নাম বলিলাম, শুনিতে পাইলেন না। আবার জোরে চেঁচাইয়া বলিলাম। এবার বলিলেন—"নলিনীকুমার ভদ্র,—সিলেটের?" এই অপরিসীম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও যে, আমার কথা তাঁহার মনে আছে তাহাতে বিস্মিত হইলাম।

সামান্য দুইচারিটা কথাবার্তা হইল। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি কথা হইতেই আমি বুঝিলাম যে, দেহ তাঁহার রোগ-ক্লিষ্ট জরা-জীর্ণ হইলেও ধীশক্তি আগেকার মতই অটুট রহিয়াছে। সর্বোপরি পরমাত্মার প্রতি একান্ত নির্ভরপরায়ণতা তাঁহাকে এমন এক অনমনীয় মানসিক দৃঢ়তা দান করিয়াছে যে, রোগ-যন্ত্রণা যেন তাঁহার

কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ব্যাধি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন,—"এ হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ, একে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করাই সমীচীন।" এই কথাগুলি শুনিয়া গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সেই শ্লোকগুলি আমার মনে পড়িল। তাঁর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অবনীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, "নির্ভীক এই পুরুষকে দর্শনেই পুণ্য।"

বিদায় লইবার উপক্রম করিবামাত্র বলিলেন, "এবার আপনার সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারলাম না ব'লে আমি দুঃখিত। নমস্কার জানিয়ে আপনাকে বিদায় দিচ্ছি।" কথাগুলি শুনিয়া বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। কেন জানি না মনে হইতে লাগিল যে, এই বিদায়ই হয় ত শেষ বিদায়।*

* রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জীবন-চরিত শীঘ্রই প্রকাশিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য এখনো সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার জীবনের অপ্রকাশিত তথ্যাদি যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা লিখিয়া প্রবাসী আপিসের ঠিকানায় আমার নিকট অথবা শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীর নিকট অবিলম্বে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।—লেখক।

পাতা-মাছের অপূর্ব্ব কাহিনী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

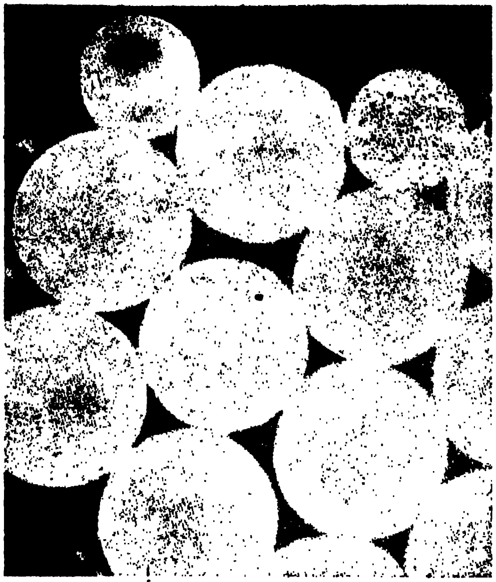
আমাদের চতুর্দ্দিকে নিত্যপরিচিত কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী এবং তৃণ-গুল্মের মধ্যেই কত যে বিস্ময়ের বস্তু রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতি পরিচিত বলিয়া, বিশেষতঃ সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে, সেগুলি সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এরূপ একটা অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা বলি। কলিকাতার বাজারে এক দিন বড় পায়রা-চাঁদার মত একটা চেপ্টা মাছের চোখ দুইটির নমুনা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। চোখ দুইটি প্রায় পরস্পর-সংলগ্ন অথচ এক সমরেখায় অবস্থিত নহে। তা' ছাড়া একটি চোখ অপেক্ষাকৃত বড়, অপরটি ছোট। এই মাছ পূর্ব্বে আরও কয়েকবার নজরে পড়িয়াছে। তখন সাধারণ একজাতীয় চেপ্টা মাছ বলিয়াই মনে হইয়াছে। ইহার কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করি নাই। সেদিন হঠাৎ কেন জানি, মাছটার চোখের উপরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কোন জীব বা উদ্ভিদে সাধারণ অবস্থা হইতে কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে আমরা তাহাকে 'প্রকৃতির বিকৃতি' বা 'প্রকৃতির খেয়াল' বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকি। এক্ষেত্রেও চক্ষু সংস্থানের অসামঞ্জস্যকে প্রথমতঃ প্রকৃতির খেয়াল বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু মাছটাকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেই আরও কতকগুলি অভিনবত্ব নজরে পড়িল। মাছটা পাতার মত চেপ্টা। সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, ডিম্বাকৃতি। লম্বার দিকে প্রায় সাত ইঞ্চি হইবে। চওড়া প্রায় সাড়ে-চার ইঞ্চি। উপর বা পিঠের দিকের রং গাঢ় ধূসর; কিন্তু তলার দিকের রং সম্পূর্ণ সাদা। উপরের দিকে দুইটি চোখ এক পাশে অবস্থিত। মস্তকের এক পাশে প্রান্ত ভাগে ধারালো দাঁতওয়ালা মুখ রহিয়াছে। সাধারণ মাছের মতই কান্‌কোর নীচে পাখনাও আছে; কিন্তু একটা পাখনা উপরের দিকে, অপরটি তলার দিকে। ইহা কি এই জাতীয় মাছের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য,—না, ক্ষেত্র-বিশেষে একটা 'প্রকৃতির খেয়াল' মাত্র—একটামাত্র ব্যাপার দেখিয়া তাহা নির্ণয় করা চলে না। অনুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট এই জাতীয় আরও কয়েকটি রকমারি মাছের সন্ধান পাওয়া গেল। ইহাদের কাহারও মুখ পাশের দিকে, কাহারও মুখ তলার দিকে; কিন্তু চোখ দুইটি প্রত্যেকেরই উপরের দিকে মস্তকের এক পাশে অ-সমরেখায় স্থাপিত।



প্লেইস্ নামক পূর্ণবয়স্ক পাতা-মাছ। চোখ ও কান্‌কোর পাখনা লক্ষ্য করিবার বিষয়

প্রাণীজগতে জাতিগত পার্থক্য হিসাবে হাত, পা, চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, সর্ব্বত্রই অঙ্গ-সংস্থানের একটা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। চোখ, কান, হাত, পা প্রভৃতি শরীরের মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থান করে। কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষীই হউক কি মানুষই হউক প্রায় কোন ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। যদি এমন কোন মানুষ দেখা যায় যাহার শরীরের উভয় পার্শ্বের দুইখানি হাতের পরিবর্ত্তে এক পার্শ্বেই দুইখানি হাত গজাইয়াছে অথবা নাকের উভয় পার্শ্বের

চক্ষু দুইটির পরিবর্ত্তে এক পার্শ্বেই দুইটি চোখ রহিয়াছে তবে তাহাকে সাধারণ মানুষ না বলিয়া 'প্রকৃতির বিকৃতি' হিসাবে গণ্য করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংস্থানে এরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকিলে



পাতা-মাছের ডিমের প্রথম অবস্থা

তাহাকেই স্বাভাবিক না বলিয়া উপায় ছিল না। তথাপি যেহেতু প্রাণী-জগতের প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই অঙ্গ-সংস্থানের একটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় সেহেতু কদাচিৎ দুই-এক ক্ষেত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। উল্লিখিত চেপ্টা মাছ এইরূপ ব্যতিক্রমের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশে এগুলিকে সাধারণভাবে 'পাতা-মাছ' বা 'বাঁশপাতি-মাছ' বলে।

আমাদের দেশে চার-পাঁচ ইঞ্চি হইতে এক ফুট, দেড় ফুট লম্বা বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট কয়েক জাতীয় পাতা-মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই জাতীয় মাছ খুব উপাদেয় খাদ্য হিসাবে অতি চড়া দামে বিক্রীত হইয়া থাকে; কিন্তু আমাদের দেশে এই মাছগুলি কদাচিৎ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এ পর্য্যন্ত পাঁচ শতেরও অধিক বিভিন্ন রকমের পাতা-মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই মাছগুলি 'হেটারোসোমাটা' বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে 'হ্যালিবাট', 'প্লেইস', 'টারবট', 'সোল', 'ফ্লাউণ্ডার', 'ড্যাব', 'ব্রিল', 'মেগ্রিম', 'লিমন সোল' প্রভৃতি মাছগুলি বিশেষ রূপে পরিচিত। চেপ্টা মাছের মধ্যে হ্যালিবাটই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। এক-একটা হ্যালিবাটকে ওজনে প্রায় পাঁচ মণ এবং আট-দশ ফুট লম্বা হইতে দেখা যায়। ইহাদের সকলেরই উপরের দিকের রং ধূসর এবং তলার দিকের রং সাদা। কিন্তু 'য়্যাম্বিকলারেটস্' নামক এই জাতীয় কতকগুলি প্রাণীর তলার দিকের রং উপরের দিকের মতই ধূসর। আমাদের দেশে এক জাতীয় চেপ্টা মাছ দেখিতে পাওয়া যায় যাহার শরীর আগাগোড়া জেব্রার মত সাদা ও কালো ডোরায় চিত্রিত। প্রায় সর্ব্বত্রই পাতা-মাছগুলিকে দেখিতে পাওয়া গেলেও কেমন করিয়া ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চক্ষু সংস্থানের এই অপূর্ব্ব পরিণতি আত্মপ্রকাশ করে তাহা হয়ত অনেকেই অবগত নহেন।

আমাদের অতি পরিচিত রুই, মৃগেল প্রভৃতি মাছের কথাই ধরা যাউক। এই মাছগুলি বেশ লম্বা; পাশের দিকে শরীরটা প্রায় গোলাকার। শরীরের সম্মুখ এবং পশ্চাদ্ভাগ মাকুর মত ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর শরীরটা জল কাটিয়া চলিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। চক্ষু দুইটি মস্তকের দক্ষিণে এবং বামে অবস্থিত বলিয়া উভয় দিকেই সমভাবে দেখিতে পায়। উভয় দিকে পাখনা থাকিবার ফলে ইচ্ছামত সাঁতার কাটিবার কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু পাতা-মাছের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি একটা পাতা-মাছ দেখাইয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে উহার পেটের দিক এবং পিঠের দিক চিনিতে পারে কিনা, তবে অতি সঙ্গত কারণেই তাহার নিকট প্রশ্নটি নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে। কারণ চোখ, মুখ এবং শরীরের গঠন দেখিয়া অতি সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। পাতা-মাছ দেখিলেই তাহার শরীরের ধূসর রঙের দিকটাকে পিঠ এবং সাদা দিকটাকে পেট বলিয়া মনে হইবে। কেন এরূপ মনে হইবে? ইহার উত্তরে সে বলিতে পারে যে, পাতা-মাছ জলের মধ্যে সাঁতারই কাটুক, কি জলের তলায় বিশ্রামই করুক শরীরের ধূসর বর্ণের দিকটা সর্ব্বদাই উপরের দিকে থাকে। তা ছাড়া চেপ্টা মাছের চোখ দুইটি

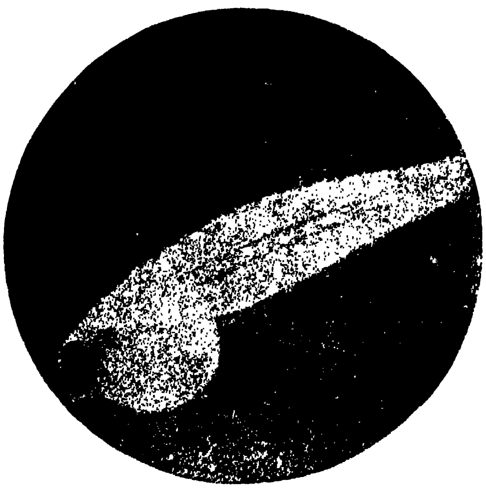


পাতা-মাছের ডিমের মধ্যে ভ্রূণের আবছায়া আকৃতি দেখা যাইতেছে

স্বভাবতঃ যেদিকে থাকা উচিত এই মাছেরও সেরূপ উপরের দিকেই রহিয়াছে। কাজেই পাতা-মাছের ধূসরবর্ণের দিকটাই যে পিঠ ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কোন বিষয় সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইলেই যে তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপে পরিগণিত হইবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একথা মানিয়া লওয়া যায় না। পৃথিবী গোলাকার—একথা যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে না পারা পর্য্যন্ত ইহার উপরিভাগকে চেপ্টা বলিয়াই সুস্পষ্টরূপে

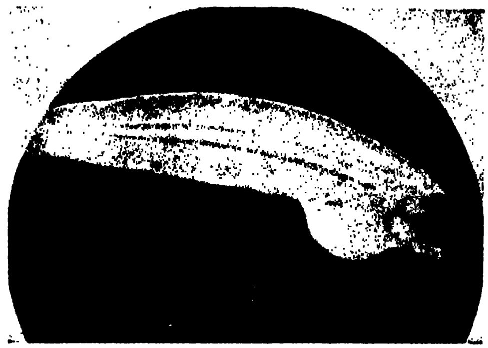
প্রতীয়মান হয়। কাজেই পাতা-মাছের ধূসর বর্ণের দিকটাকে পিঠের দিক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা পিঠ নহে, শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বমাত্র। শরীরের যেদিকটা আলোর দিকে থাকে সেদিকটাই সাধারণতঃ কোন গাঢ়তর বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। পাতা-মাছের জীবনযাত্রা-প্রণালীর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের দরুন ইহার শরীরের ডান দিক থাকে উপরের দিকে এবং বাম দিকটা ঘুরিয়া যায় নীচের দিকে। কাজেই ডান দিকটা আলোর দিকে থাকে বলিয়া ইহার বর্ণ হয় ধূসর বা বাদামী। বাম দিকটা জলের তলায় মাটির সহিত লেপ্‌টিয়া থাকে, সুতরাং আলোর প্রভাব সেদিকে খুবই কম। এই কারণেই তলার দিকটা সম্পূর্ণ সাদা দেখায়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে 'ষ্যাম্বিকলারেট্‌স্‌' নামক এই জাতীয় কয়েক প্রকার মাছের কথা বলিয়াছি। ইহাদের শরীরের উপর এবং নীচের দিকের রং প্রায় একই রকমের। কয়েকটি মাছের মধ্যে কেন যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তাহা সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত।

যাহা হউক, এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি পাতা-মাছের উপরের দিকটা শরীরের দক্ষিণ-পার্শ্ব এবং নীচের দিকটা বাম-পার্শ্ব হইয়া থাকে তবে দুইটি চোখই উপরের দিকে অর্থাৎ ডান-পার্শ্বে কেন? সাধারণ প্রাণীদের মতই একটা চোখ উপরে এবং আর একটা চোখ নীচের দিকে থাকাই উচিত ছিল। পাতা-মাছের চোখ



পাতা-মাছের বাচ্চার প্রথম অবস্থা

দুইটি প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বেই অবস্থিত এবং সাধারণ প্রাণী হইতে চক্ষু-সংস্থানের এরূপ অসামঞ্জস্য আশ্চর্য্যের বিষয়ও বটে; কিন্তু কেমন করিয়া দুইটি চোখ শরীরের একপার্শ্বে সন্নিবিষ্ট হয় তাহা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক। আমরা সাধারণতঃ পরিণতবয়স্ক পাতা-মাছই দেখিয়া থাকি। পরিণত বয়সের আকৃতি-প্রকৃতি হইতে ইহাদের শৈশবাবস্থার বিষয় অনুমান করিতে গেলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সাধারণ মৎস্য জাতীয় প্রাণী হইলেও হয়তো কোন বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে ইহারা কোন অভিনব ধারায় বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় সাধারণ মৎস্য জাতীয় প্রাণী হইতে ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতির এত অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ,



পাতা-মাছের বাচ্চার দ্বিতীয় অবস্থা

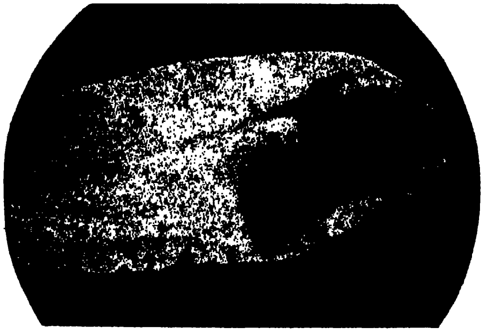
পশ্চিম-আফ্রিকা এবং চীনদেশের পকূলবর্ত্তী অগভীর সমুদ্রজলে 'সেটোড্‌স্‌' (psettodes) নামে এক প্রকার পাতা-মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা চেপ্টা হইলেও শরীরের আকৃতি সাধারণ মাছের মত। চক্ষু সংস্থানে কেবল অন্যান্য মাছ হইতে পার্থক্য দেখা যায়। চোখ দুইটি দেহের একপার্শ্বে অবস্থিত; কিন্তু পাখনা বা মুখের অবস্থানে কোন অসামঞ্জস্য নাই। সামুদ্রিক 'পার্চ' নামক এক জাতীয় মাছের সহিত ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাধারণ পাতা-মাছের চোখ দুইটি শরীরের ডান দিকেই থাকে; কিন্তু 'সেটোড' জাতীয় মাছের চোখ দুইটি শরীরের এক দিকে থাকিলেও কখনও বা ডান দিকে, কখনও বা বামদিকে অবস্থান করিতে দেখা যায়। কোন কোন জাতীয় সামুদ্রিক 'পার্চ' শরীরের একপার্শ্বে কাৎ হইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। কাজেই ইহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিশ্রামের সময় দীর্ঘতর হইতে হইতে এই জাতীয় 'পার্চ'ই পাতা-মাছে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই হিসাবে 'সেটোড্‌স্‌'ই 'পার্চে'র নিকটতম জ্ঞাতি। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে



পাতা-মাছের বাচ্চার তৃতীয় অবস্থা। খাড়-পাখি অদৃশ্য হইয়াছে

এই 'সেটোডস্' হইতেই অবশেষে বিভিন্ন জাতীয় পাতা-মাছের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

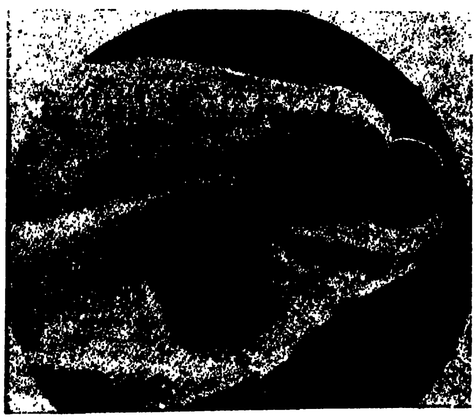
পাতা-মাছ একসঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষার বীজের মত অনেকগুলি গোলাকার ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া যে বাচ্চা নির্গত হয় তাহা



পাতা-মাছের বাচ্চার চতুর্থ অবস্থা

দেখিতে মোটেই পাতা-মাছের মত নহে। পাতা-মাছের বাচ্চা দেখিতে ঠিক অন্যান্য সাধারণ মাছের মত। কেবল তফাৎ এই যে, বাচ্চা একটা সঞ্চিত-খাদ্যের থলি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কারণে পেটের দিকটা অসম্ভবরূপে ঝুলিয়া পড়ে। ঝুলানো থলির জন্য বাচ্চাটাকে কতকটা অদ্ভুত দেখাইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। পরিণতবয়স্ক পাতা-মাছের চোখ দুইটি যেমন দেহের একপার্শ্বে স্থাপিত শৈশব অবস্থায় কিন্তু সেরূপ থাকে না। বাচ্চার চোখ দুইটি থাকে মস্তকের উভয় পার্শ্বে—ঠিক সাধারণ মাছেরই মত। পরিণত অবস্থায় এই মাছের দুই দিকের গাত্রবর্ণে যেরূপ একটা গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয় (এক দিক সাদা, অপর দিক ধূসর) বাচ্চার শরীরের উভয় পার্শ্বে কিন্তু সেরূপ কোনই বর্ণ-বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয় না। বাচ্চার শরীর সাধারণতঃ অর্দ্ধ-স্বচ্ছ। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বর্ণের আভাস থাকিলেও তাহা সর্ব্বত্র একই রকমের। বাচ্চাটা কিন্তু চেপ্টা নহে; সাধারণ মাছের মতই জলের মধ্যে বিচরণ করে। অর্থাৎ পিঠের পাখনা-গুলি থাকে উপরের দিকে এবং পেটের পাখ্‌নাগুলি থাকে নীচের দিকে। পরিণত বয়সে মাছটার শরীর এক পাশে শয়ানভাবে থাকিবার ফলে পিঠের উপরের দিকের পাখ্‌নাগুলি থাকে শরীরের বাম পার্শ্বে এবং নীচের দিকের পাখ্‌নাগুলি থাকে দক্ষিণ পার্শ্বে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা ক্রমশঃ চেপ্টা হইতে থাকে এবং এক পার্শ্বে কাৎ হইতে সুরু করে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাচ্চা শরীরের বাম পার্শ্বে সম্পূর্ণরূপে কাৎ হইয়া পড়ে। কদাচিৎ দুই এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও অধিকাংশ পাতা-মাছই শরীরের বাম দিকে শয়ানভাবে অবস্থান করে কেন—ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। মাছটা কাৎ হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইবার অভ্যাসও কমিতে থাকে। সম্পূর্ণ কাৎ হইবার পর অধিকাংশ সময়ই জলের তলায় মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কাজেই বামদিকের চোখটি সম্পূর্ণ-রূপে ঢাকা পড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় থাকিলে চোখটির কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। কাজেই দেহের অবস্থান্তর পরিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চোখটিও ঘুরিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে আসিতে থাকে। চোখটা বাম পার্শ্ব হইতে ডান-পার্শ্বে ঘুরিয়া আসে—এই কথাটা নিশ্চয়ই একটা হেঁয়ালির মত মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধন ছিঁড়িয়া শুধু চোখটাই কেবল ঘুরিয়া আসে না। চোখের চতুর্দ্দিকের অস্থির কাঠামোটিই বাম-চক্ষু সহ মোচড় খাইয়া ডান দিকে সরিয়া যায়। ডান চক্ষুটির এরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। কাজেই বাম-চোখটি ডান চোখের পাশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই কারণেই দুইটি চোখকে অনেকক্ষেত্রেই এক সমরেখায় থাকিতে দেখা যায় না।

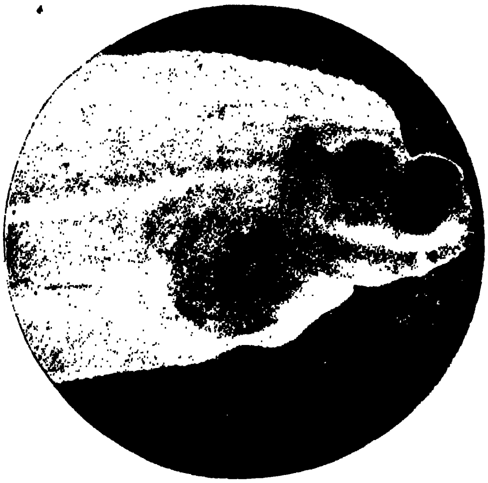
চক্ষুঃ অস্থি-কাঠামোর স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে মস্তকের অস্থি-সংস্থানের গোলযোগ ঘটিবার কথা। পাতা-মাছের মস্তকের অস্থি-সংস্থানের বিষয় অনুসন্ধান করিলে প্রথমতঃ একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলাই লক্ষিত হয়। মস্তক এবং মুখাস্থির অবস্থান-স্থলের কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করাই দুষ্কর। কিন্তু লেজের দিক হইতে মেরুদণ্ড ধরিয়া অগ্রসর হইলে অতি সহজেই সাধারণ মাছের সহিত ইহার অস্থি-সংস্থানের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন বয়সের পাতা-মাছ পরীক্ষা করিলে চক্ষুর অবস্থান-স্থলের ক্রম-পরিবর্ত্তন সহজেই দেখা যাইতে পারে। তা'ছাড়া সময় সময় পরিণত বয়স্ক এমন দুই-একটি পাতা-মাছ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের একটি চোখ স্থান পরিবর্ত্তন করিবার মুখে হঠাৎ কোন কারণে মধ্যপথে বা তাহারও কিছু আগে থামিয়া গিয়াছে। আবার পূর্ণবয়স্ক এমন পাতা-মাছও কদাচিৎ নজরে পড়ে যাহাদের চোখ মোটেই স্থান ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই, সাধারণ মাছের মত দুই দিকেই দুইটি চোখ রহিয়া গিয়াছে।



পাতা-মাছের বাচ্চার পঞ্চম অবস্থা

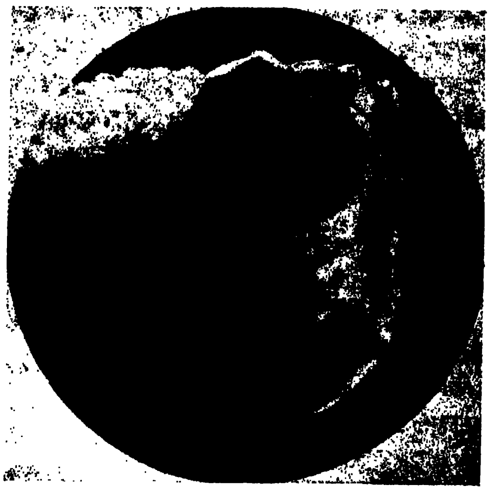
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাচ্চা অবস্থায় পাতা-মাছের শরীরের উভয় পার্শ্বের রঙের কোনই তারতম্য দেখা যায় না। এক পাশে কাৎ হইয়া পড়িবার পর ধীরে ধীরে উপরের দিকে ধূসর বর্ণ আত্মপ্রকাশ করে এবং তলার দিক সাদা হইয়া যায়। এই সময় প্রায়ই ইহারা জলের তলায় লেপ্‌টিয়া পড়িয়া থাকে। গায়ের রং আশেপাশের

বালি বা মাটির সহিত এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে, অতি পরিষ্কার জলের মধ্যেও সহজে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায়



পাতা-মাছের বাচ্চার ষষ্ঠ অবস্থা। বাম দিকের চোখ ক্রমশঃ ডানদিকে ঘুরিয়া আসিতেছে

থাকে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে প্রায় ৩০।৪০ মিনিট সময়ের মধ্যেই শরীরের রং পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লয়। এমন কি, জলের তলায় সাদা, কালো পাথরের টুক্‌রা বিছাইয়া তাহাতে এই মাছ ছাড়িয়া দেখা গিয়াছে—প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার শরীরে সাদা, কালো ডোরার বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে। ইহারা শত্রু এবং শিকারকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া জল ঘোলা করিয়াও অনেক সময় ইহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে দেখা যায়। ছোট ছোট জলজ কৃমি, কীট, গুগলি চিংড়ি জাতীয় প্রাণীই ইহাদের খাদ্য। শৈশবাবস্থায় জলে সাঁতার কাটিয়া কিছু কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু বড় হইবার পর শিকারের সন্ধানে মোটেই ঘোরাফেরা করে না। এক স্থানে চুপ করিয়া



পাতা-মাছের বাচ্চার শেষ অবস্থা। দুইটি চোখই একদিকে রহিয়াছে

বসিয়া চোখ দুটিকে 'পেরিস্কোপে'র মত উপরে তুলিয়া দেয়। ইহার ফলে কিছু দূর হইতেই শিকারের আগমন লক্ষ্য করিতে পারে এবং সুযোগ উপস্থিত হইবা মাত্রই তাহাকে মুখে পুরিয়া লয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় জলে সাঁতার কাটিয়াই অগ্রসর হয় বটে; কিন্তু সাধারণ মাছের মত সাঁতার কাটিতে পারে না। জলের নীচে যেভাবে অবস্থান করে, শরীরটাকে সেভাবে রাখিয়াই ঢেউয়ের মত সমস্ত শরীরটাকে আন্দোলন করিতে করিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। লেজ ও পাখনা অগ্রগতিতে কিছু সাহায্য করিলেও তাহা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নহে।

আয়র্লণ্ড সমস্যা

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় সংস্কৃতি ও রাজনীতির অপূর্ব্ব মধুমিলন আয়র্লণ্ডে যতখানি আছে এমন বোধ হয় আর কোথাও নেই। আইরিশ সংস্কৃতি কেল্‌টিক্ ও ইঙ্গ-স্যাক্সন সংস্কৃতির সংমিশ্রণের সাহায্যে গড়ে উঠেছে। সংমিশ্রণ বলতে কিন্তু খিচুড়ি বোঝাচ্ছে না। একটি সংস্কৃতির প্রভাবে আর একটির বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি। দুজনে বেড়ে উঠেছে পাশাপাশি। যাঁরা কেল্‌টিক্ তাঁদের স্বদেশপ্রিয়তা খুব বেশী এবং তাঁরা দক্ষিণ অংশের বাসিন্দা। ইঙ্গ-স্যাক্সনরা বাস করেন উত্তরাংশে (Northern Ireland) অর্থাৎ আল্‌ষ্টার প্রদেশে; তাঁরা ব্রিটিশভক্ত এই রকম জনমত শোনা যায়।

আল্‌ষ্টারের উত্তর-পূর্ব্ব অংশটিকে আলাদা করে দেন ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই ওজুহাতে যে দুটি সংস্কৃতির না হলে ঝগড়া বাধবে। এই উত্তর-আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু দক্ষিণের স্বাধীন আয়র্লণ্ড বা 'এয়ার্' (Eire) এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ

ভাগাভাগি ব্যবস্থার বিপক্ষে। তা ছাড়া ভৌগোলিক-প্রকৃতিও ভাগ করার স্বপক্ষে বলে মনে হয় না। এয়ার-বাসীরা আশা করেন যে শীঘ্রই এক দিন আবার সমগ্র আয়র্লণ্ড একটি মাত্র জাতীয় পতাকার নীচে একত্র হবে এবং আয়র্লণ্ডের নিজস্ব কেল্‌টিক্ সংস্কৃতিকে মেনে নেবে। এই প্রসঙ্গে লর্ড কার্জ্জনের বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ড করার অপচেষ্টার কথা মনে পড়ে। ব্রিটিশের সেই মনোবৃত্তি যে আজও বদলায় নি তা নীচের বাদানুবাদ থেকেই বোঝা যাবে। বাদানুবাদটি বর্ত্তমান আইরিশ সমস্যা নিয়ে পার্লামেণ্টে হয়েছে :—

Mr. Gallacher (Communist)—"Is it not possible in any further approaches to Ireland to suggest, that if normal relations are to be operated, the question of partition of N. Ireland and S. Ireland would be a subject of discussion, when peace comes?

Mr. Churchill—"I can hardly think of more ill-conceived approach to unity of Ireland."

মহারাণী এলিজাবেথ ও রাজা প্রথম জেমস্ ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড থেকে আয়র্লণ্ডে যে-সব ঔপনিবেশিক পাঠান আল্‌ষ্টারবাসীরা হচ্ছে তাদেরই বংশধর। আল্‌ষ্টার-বাসীদের কথাবার্ত্তা রূঢ়, স্বভাবতঃ তারা কম কথা বলে এবং একটু কুণো। রসিকতা তারা বোঝে না। এয়ারবাসীদের কথাবার্ত্তা বেশ মিষ্টি এবং রসিকের মত; তাদের বন্ধুত্ব-প্রিয়তা এবং আতিথেয়তা একটি লক্ষ্য করার বিষয়। সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের এই যে সারা আয়র্লণ্ডের সনাতন সবকিছুর প্রতি তারা অত্যন্ত অনুরক্ত। তাই সেখানকার প্রাচীন গিলিক্ (Gaelic) ভাষাটিকে তারা পুনর্জ্জন্ম দানের চেষ্টা করছে। তাদের ইচ্ছা আয়র্লণ্ড হয় একটি দোভাষী (Bilingual) দেশ।

আজ থেকে প্রায় ষোল বছর আগে ডি ভ্যালেরা এয়ারের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৬ সালের গণ-আন্দোলনের পর প্রায় ২০ বছর ধরে অন্তর্যুদ্ধ ও নানা দুরবস্থা পার হয়ে এয়ার শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন হ'ল।

এয়ার স্বাধীন হওয়ার পর ডি ভ্যালেরার প্রধান লক্ষ্য হ'ল পার্টিশন তুলে সমগ্র আয়র্লণ্ডকে এক করা, যদিও আজও তা হয়ে ওঠেনি ব্রিটিশের 'Divide and Rule' নীতির জন্য। ডি ভ্যালেরা বলেন, "স্বাধীনভাবে ভোট দিতে দিলে উত্তর-আয়র্লণ্ডের ছয়টি জেলার মধ্যে চারিটি জেলা এয়ারের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে না বটে, কিন্তু সেই চারিটি জেলার জন্য আলাদা শাসনতন্ত্র গড়া সম্ভব নয়। যা হোক, আমরা দেখছি যে উত্তর-আয়র্লণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ সেখানকার ক্যাথলিকদের (সংখ্যালঘিষ্ঠ) সঙ্গে আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত সরকারের মত ব্যবহার করেন না। সমগ্র আল্‌ষ্টার জেলার মাত্র একজন ক্যাথলিক জেলা বিচারক (Judge) আজ বাইশ বছরের মধ্যে নিযুক্ত হয়েছেন। এয়ারে প্রটেষ্ট্যাণ্টরা সংখ্যায় আরো কম কিন্তু বর্ত্তমানে প্রধান বিচারালয়ের তিন জন বিচারপতি প্রোটেষ্টাণ্ট এবং গত বছর দুজন পেন্সন পেয়েছেন। এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটির অন্তরালে কর্ত্তৃপক্ষের যে মনোবৃত্তি কাজ করে যাচ্ছে ব্যাপারটি তারই প্রতিবিম্ব।

Strongbow থেকে Black and Tans পর্য্যন্ত এই সাতশ বছর ব্রিটেন আয়র্লণ্ডের সঙ্গে যে অন্যায়, ব্যবহার করেছে তার তুলনা মেলা ভার। Co-erection Actএর অপকীর্ত্তির পর যদি আজ এয়ার ব্রিটেনের সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস না করতে পারে তাহলে তার দোষ দেওয়া চলে না। তা ছাড়া বন্দরগুলোকে ছেড়ে দিতে বলার কথা তো সে ভোলে নি; সে ভাবে যে একবার ছাড়লে আর ফিরে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ; তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে হয় তো যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়তে হবে এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ভাল বন্দোবস্ত না থাকায় অবস্থা হবে শোচনীয়।

আয়র্লণ্ডের কারুর সঙ্গে ভৌগোলিক সংস্রব না থাকায় জন্য সে ঘোরতর জাতীয়তাবাদী। এখনো বোধ হয় তার জাতীয় গরিমাকে সে অর্থনীতির চেয়ে ওপরে স্থান দেয়। তার প্রমাণ রয়েছে গেলিক্ সভ্যতা ও শিক্ষার পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বে। কিন্তু অর্থনীতির ব্যাপারে ডি ভ্যালেরা আধুনিক হতে চেষ্টা করেছেন সরকারী সাহায্যের দ্বারা শিল্পোন্নতি করতে গিয়ে। এই খানেই ডি ভ্যালেরার উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটি প্রতিকূল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া আয়র্লণ্ড হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ এবং ইউরোপের দুধের ব্যবসায়ের এবং ঘোটকচারণ ক্ষেত্রের (Horse pastures) কেন্দ্র। সেখানে যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালে সোভিয়েট চীন ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত শক্তির ব্যবসাবাণিজ্যগত ও রাজনীতিগত সহযোগিতা না পেলে, শিল্পোন্নতি সম্ভব হবে কি করে? Isolation নীতি তখন কোন কাজে আসবে কি? কিন্তু বাইরের শক্তিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করলে, ইঙ্গ-মার্কিন বিমান-পথের মধ্যে অবস্থানের অনেকখানি সুবিধাই সে পাবে। ডি ভ্যালেরাকে যদি আয়র্লণ্ডের শিল্পোন্নতি করতে হয় তাহলে আগে করতে হবে বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রতিষ্ঠা, কারণ আয়র্লণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক কৃষির কৃতকার্য্যতা আবার নির্ভর করবে সমবায় ব্যবস্থা (Co-operative) ও যৌথ কৃষি ব্যবস্থার (Collective Farming-এর) ওপর, কারণ খণ্ডবিভক্ত জমি দিয়ে কৃষক-দের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা যাবে না।

এয়ারের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ডি ভ্যালেরার প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন মিঃ কসগ্রেভ্। তিনিও ব্রিটেনের ওপর সন্তুষ্ট নন। ডি ভ্যালেরার আগে তিনিই ছিলেন নেতা। কিন্তু তিনি আপোষনীতিতে আস্থা রাখেন বলে ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি

করেছিলেন। ডি ভ্যালেরা এই চুক্তি করাকে পছন্দ করেন নি এবং সহযোগিতার শপথ (oath of allegiance) করতে রাজী হন নি। মিঃ কস্‌গ্রেভ্‌ প্রতি বছর ব্রিটিশ সরকারকে বাৎসরিক ভূমিক্রয় মূল্য (Land purchase annuities) দিয়ে আসছিলেন। ডি ভ্যালেরা এই ব্যাপারটি বন্ধ করেন। বন্দরগুলোও তিনি চেম্বারলেনের কাছ থেকে আদায় করেন ১৯৩৮ সালের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সুবিধা নিয়ে।

ডি ভ্যালেরার হাতে নেতৃত্ব চলে যাবার পর মিঃ কস্‌গ্রেভ্‌ ম্যাক্‌ডারমণ্ট ও ডিলনের কেন্দ্রীয় দলে (Centre Party of Macdermont and Dillon) যোগদান করে সেই দলের নেতৃত্ব পান। ম্যাক্‌ডারমণ্ট দল ত্যাগ করলে কস্‌গ্রেভ্‌ ও ডিলন মিলে দলটিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। এই ডিলনই আইরিশ নেতাদের মধ্যে একমাত্র লোক যিনি আয়র্লণ্ডের নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে। তাঁর দলের মতে কমনওয়েলথ অবস্থাই আয়র্লণ্ডের পক্ষে ভাল। ডি ভ্যালেরা আয়র্লণ্ডকে চান রিপাবলিক্‌ হিসাবে। শুধু তিনি নয় দেশভক্ত আইরিশ মাত্রই চায় রিপাব্‌লিক। ডি ভ্যালেরাকে শেষ পর্য্যন্ত সহযোগিতার শপথ করতে হয়েছে (যা তিনি প্রথমে করতে চান নি) যার ফলে রিপাব্‌লিকের পক্ষপাতীরা অনেকে চটে গিয়েছেন এবং তিনি 'ইংলণ্ডে প্রস্তুত' ('Made in England') লেবেলকে মেনে নিয়েছেন বলে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ডি ভ্যালেরা তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন শপথটা আসলে ফাঁকা কিন্তু কোন ফল হয় নি। বাধ্য হয়ে এই রিপাবলিক্‌ দলকে ডি ভ্যালেরা বে-আইনী ঘোষণা করেছেন। দলের অনেকেই আজ কারাবদ্ধ। শোনা যায় এই দল জার্ম্মানীর সাহায্য নিতে চায়।

আইরিশ জনগণের এই কমনওয়েল্‌থ ভীতিকে ন্যায্য ভাবে বিচার করলে কিন্তু দোষ দেওয়া যায় না। ব্রিটেনের শতাব্দী-সঞ্চিত অত্যাচারের ফলে আয়র্লণ্ড এখনো ব্রিটেনের উদ্দেশ্যকে সাধু বলে বিশ্বাস করতে পারে নি। তাই আয়র্লণ্ডের স্বার্থকে ব্রিটেন যে সাধারণ (Common) স্বার্থ হিসাবে দেখবে এটা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। যাঁরা আজ দেশের নেতা সেই ডি ভ্যালেরা মীন্‌-ম্যাকেন্টি, ক্র্যাঙ্ক গ্যালাঘার, ওয়াল্‌শ প্রভৃতিকে এক দিন মাউণ্টজয় কারা-প্রাঙ্গণের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার জন্য গহন বনে ও পর্ব্বতকন্দরে কুকুরের মত যারা তাড়া করেছিল তাদের বিশ্বাস করা কি সোজা? তাই বার্ণার্ড শ বলেছেন :—

"..........we have century old grievances against them (English).........."

১৯৪১ সালের অক্টোবরে ডি ভ্যালেরা বলেছিলেন—

"Through no fault of ours, our nation is in a position of the greatest danger. Numerically small we are placed geographically in a position, obviously tempting to the combatants........The Irish people wants neither an old master, nor a new one........the only basis on which peace can be built—justice for all, and fair play for the little as for the great."

স্বাধীন এয়ারের জন্ম দিয়েছেন ডি ভ্যালেরা কিন্তু সমগ্র আয়র্লণ্ডকে তিনি আয়ত্তে আনতে পারেন নি। লর্ড ওয়েভেলের উক্তিটি লক্ষ্য করার বিষয় :—

"The Irish Free State was born, but Britain, *altered Geography* '(!)' by creating an Ulster in N. Ireland as her watch dog."

কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের সাধারণ সীমানা আজকে চার্চ্চিল সরকার বন্ধ করতে চাইছেন, এয়ারকে একঘরে করার জন্য। এ সম্বন্ধেও বার্ণার্ড শর মত কি দেখা যাক :—

"You might as well as try to close border between Surrey and Sussex......they are just as much entitled to remain neutral as England was to declare war."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আয়র্লণ্ডের সামনে সমস্যা জটিল। কূটনীতিক চাল ছাড়া মুক্তি পাবার উপায় নেই তার। ডি ভ্যালেরার দূরদৃষ্টি আছে, দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁকে প্রবীণ কূটনৈতিক না বলে ধর্ম্মপরায়ণ দার্শনিক বলাটাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায় ও ব্যক্তিত্বের এবং স্বদেশপ্রেমের জন্য জনসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা যদি ক্রমেই ঘোরতর হয়ে ওঠে তাহলে সে শ্রদ্ধা কত দিন থাকবে? আজ যদি এয়ারকে Blockade করা হয় তাহলে ব্যবহারিক পরিস্থিতি সঙ্কটজনক না হয়ে পারবে না। তার পর যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন বিজেতা মিত্রশক্তির আক্রোশের ঝালও এয়ারকে সইতে হবে। তা ছাড়া গত মহাযুদ্ধের পরে বিশ্বের পরিস্থিতি এয়ারের স্বাধীনতা লাভকে সাহায্য করেছিল অনেকখানি। সেই পরিস্থিতিতে Isolation নীতি সম্ভব ছিল। কিন্তু আজকের যুদ্ধের পরে বিশ্বের পরিস্থিতি হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন উগ্র-জাতীয়তা পন্থী Isolation সম্ভব হবে কিনা সেটা ভাববার বিষয়। তা ছাড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট বেশী হ'লে আয়র্লণ্ড বামপন্থী না হয়ে দক্ষিণ দিকে পেছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়; আর তা যদি হয় তাহলেই বিশ্ব-ফ্যাশিজম পরাজিত হওয়ার আগে আয়র্লণ্ডে ফ্যাশিজমের বীজ উপ্ত হ'তে পারে। আয়র্লণ্ড বামপন্থা গ্রহণ না করাই সম্ভব এই জন্য যে এখানকার অধিবাসীরা খুব বেশী রকম ধর্ম্মান্ধ এবং পুরাতন পন্থী।

বার্ণার্ড শ ডি ভ্যালেরার বর্ত্তমান কড়া মনোভাবকে সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে এটা কূটবুদ্ধির পরিচয় নয়। ডি ভ্যালেরা মিত্রশক্তির প্রস্তাবে সোজাসুজি বেঁকে বসার ফলে হয়তো আয়র্লণ্ডে বহু অঘটন ঘটতে পারে।

বুর্জোয়া রাজনৈতিকদের মতে Politics is politics! সুতরাং তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে তাঁদেরই রাজনীতির সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় কি? তা ছাড়া ফ্যাশিজমকে উচ্ছেদ করায় যদি তিনি সাহায্য না করে উল্টো বিরুদ্ধাচরণ করেন, তার ফল শেষ পর্য্যন্ত এমারকেও ভোগ করতে হবে। বরং ফ্যাশিজমের উচ্ছেদে সাহায্য করলে শান্তি সম্মেলনে তাঁর দাবী জানাবার সুবিধা বেশী হবে।

একটি পয়সা

শ্রীতারাপদ রাহা

নিয়ামদ্দির কুটুম মমিন প্রায় তিন বৎসর হইল শ্রীকোলে আসিয়া বাস করিতেছে। মেজাজ তাহার খারাপ—অর্থাৎ সে যে বিনা কারণে যখন তখন লোকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া বসে—এ কথা কেহই বলিতে পারে না। ভগিনীপতি নিয়ামদ্দি স্থানীয় কাছারির পেয়াদা। সে-ই খোঁজখবর, চেষ্টা করিয়া তাহার সাড়ে তিন বিঘা জমি খামার করিয়া দিয়াছে। ঐ জমি এবং তার সঙ্গে আর কয়েক বিঘা বরগা চাষ করিয়া—এতদিন মমিনের দিন এক প্রকার স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া গিয়াছে।

বাড়ির আশে পাশে লাউ কুমড়া কচু নটের আবাদ করে সে, তা' ছাড়া বাড়িতে ছাগল আছে, মুরগী আছে। তাই সময় মত বিক্রী করিয়া হাট-খরচ চালায়। মাঠের ধানে প্রায় সম্বৎসর চলে। পাটের টাকায় বৎসরের কাপড় জামা কেনে সে। সব টাকাই খরচ হইয়া যায়; পোষ্য ত কম নয়।

গত কয়েক মাস ধরিয়া মমিনের মেজাজ ক্রমেই রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। আয় তাহার বাড়ে নাই—অথচ খরচের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। কেরোসিন তেল—আগে দুই আনায় এক বোতল পাওয়া যাইত, এখন চায় এক টাকা। যাক কেরোসিনের সে তত তোয়াক্কা করে না—ছেলে-পিলে ও নিজেদের খাওয়া সন্ধ্যার আগে সারিয়া লইলেই হইল—তার পর রাত-বিরাতের প্রয়োজনে এক কুপীতে কিছু তেল থাকিলেই চলিল। কিন্তু তেল থাকিলেই ত আর আলো জ্বালা যায় না—দিয়াশলাই চাই। পাঁচ পয়সার কমে উহা একটা কিনিবার উপায় নাই। মমিনের মা একদিন বলিয়াছিল, অত পয়সা দিয়ে দিংশলুই কিনে কাজ কি—দুপয়সার গন্ধক কিনে আনিস—পাকাটির আগায় গন্ধক দিয়ে আমি কাঠি করে দেব, আগুনির মালসায় দিলিই জ্বলে উঠপি।

মমিন আশেপাশের সব বাজারে—এমন কি মাগুরা ও শিলকুপার বাজারেও খোঁজ করিয়াছে—কোথাও এক টুক্‌রা গন্ধক পাইবার উপায় নাই।

ইহাতেও মমিনের মাথা খারাপ হইত না, বড় সমস্যা বাধিয়াছে খাওয়া ও পরা লইয়া। সরষের তেল দেড় টাকা সের, লবণ তিন আনা। বউ পান খাইতে না পারিয়া বক বক করে—সুপারি এক পয়সার মাত্র একটা—দুই-তিন পয়সার কম একখানা খয়ের হয় না। এমন হইলে গেরস্থ ঘরে কে ক'টা পান খাইতে পারে—বল।

আবার দেখ—খাওয়ার কষ্ট না হয় কোনরূপে সহ্য করা গেল—পরার? আগে এক টাকা হইলে একখানা কাপড় হইত, এখন চার টাকার কমে একখানা ধুতি হয় না—শাড়ীর দাম আরও বেশি। গ্রামের জোলারা তবনের দামও বাড়াইয়া দিয়াছে।

খরচ চারি দিকেই বেশি অথচ আয়ের মাত্রা সেই এক। মমিন গায়ের জ্বালা যে কি করিয়া মিটাইবে—বুঝিতে না পারিয়া সবারই উপর খামকা তেরিয়া হইয়া উঠে। এ দিকে উপরওয়ালা পোষ্য দিয়াছেন নিতান্ত কম নয়; চারিটি ছেলে মেয়ে, বউ, মা।

তাহাদের অসুখ-বিসুখ আছে। দুইটি সবে জ্বর হইতে উঠিল, আবার দুইটি পড়িয়াছে। ওষুধের দামই বা কত যোগান যায়—বল। ডাক্তার বলে—ওষুধের দাম না কি পাঁচ গুণ হইয়া গিয়াছে। দেড় বছরের একটা খাসি বিক্রয় করিয়া মমিন সেদিন ওষুধের দাম ও ডাক্তারের ভিজিট দিয়াছে, এক বছরের আর একটা বিক্রয় করিয়া বউয়ের একখানা তবন ও নিজের একখানা কাপড় কিনিয়াছে। ছাগল আর নাই।

ছোট ছেলেটার জ্বর হইলে বউ যখন ডাক্তার ডাকিতে বলিল—মমিন উত্তর দিল, পারব না আমি আর ডাক্তার ডাকতি, লাল পানির অত দাম?…টাকা পাব ক'নে শুনি?…আল্লা রাখে—থাকপি, নয় যাবি। শালার ডাক্তারের আর টাকা দেব না।

ডাক্তার আর সেবারের মত টাকা পাইল না বটে, কিন্তু এ দিকে মমিনের সংসারও যে অচল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি হাটে সব্‌জী, কখনও বা একটা মুরগী বিক্রয় করিয়া সওদা করিয়া আনে—আর প্রতি হাটের দিনই মেজাজ তার অসম্ভব খারাপ হইয়া যায়।

যে কুমড়ার দাম চার পয়সার কম তা বিক্রয় করিবার উপায় নাই—লোকে পয়সা দিতে পারে না। ছয়-সাত পয়সার কচু চার পয়সায় ছাড়িয়া দিতে হয়—নইলে ফেরত আন। খরিদ্দার দু-আনি দিলে মমিন বাকি পয়সা ফেরত দিতে পারে না। প্রতি হাটেই অনেক তরকারী ফেরত আনিতে হয়। শুধু মমিন নয়, সকল সব্‌জীওয়ালারই ঐ এক দশা। কোনও রূপে কেহ একটি দুইটি পয়সা পাইলে তাহা হাতছাড়া করিতে চাহে না। তামার দাম নাকি অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে—এক পয়সার দাম নাকি—এক পয়সার অনেক বেশি।

শহরে নাকি নূতন ধরণের ডবল পয়সা বাহির হইয়াছে, কিন্তু

—পোড়া দেশে তাহাও মিলে না, কেহ যদি দৈবাৎ একটা পায়—দুর্লভ জিনিষ হিসাবে উহা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলিয়া রাখে। তা রাখুক—কিন্তু পয়সা কোথায় গেল?

সকল দুঃখের চেয়ে এই এক পয়সার অভাবই মমিনের মাথা বেশি খারাপ করিয়া দিয়াছে। লোকে এক পয়সার লঙ্কা কিনিয়া একটা আনি দিয়া বলে—তিনটে পয়সা দাও?

পয়সা?—পয়সা মমিন নিজে পয়দা করিবে নাকি!—ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে মমিন।

পয়সা দাও—জিনিস নাও।

পয়সা নেই যে!

তা'লি চার পয়সার লঙ্কা নেও।

চার পয়সার লঙ্কা নিয়ে ঘরে পচাব নাকি?

তা'লি আমি রা'খে যাও—চার হাটে চার পয়সার নিলি শোধ যাবি।

আমার আর সওদা নেই?…এক কাজ কর মমিন, পয়সা আজ বাকি থাক, চার পয়সা পুরলে—একেবারে এক আনি নিও।

মমিন একটু কি ভাবে, তার পর রাজি হইয়া যায়। নইলে ঝাঁকা ভরতি লঙ্কা ফেরত লইয়া যাইতে হয়।

কোন সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ত এক আনার লঙ্কা একসঙ্গে কিনে। ঐ যা' মমিনের নগদ লাভ। অনেক লঙ্কা আবার ফেরত লইয়া যাইতে হয়—যে চায় তাহাকেই ত আর এক পয়সার জিনিস বাকি দেওয়া যায় না।

কিনিবার সময় আরও মুশ্‌কিল। বউ এক পয়সার চুণ কিনিতে বলিয়াছিল। মমিন সে হাটে সব্‌জী না আনিয়া—একটা মুরগী আনিয়াছিল। অনেক দর কষাকষি করিয়া মুরগীর দাম ঠিক হইল—সাড়ে আট আনা। ক্রেতা হারান সেখ এক টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া মমিনের হাতে দিল। ভাঙানি পাওয়া যে মুশ্‌কিল মমিন তাহা জানে—তবুও নোট লইয়া দোকানে দোকানে সে ঘুরিয়া বেড়াইল—কেহই ভাঙানি দিতে চায় না, অবশেষে নিয়ামদ্দি ভয় দেখাইয়া এক দোকান হইতে—একটা আধুলি, একটা সিকি, একটা দুআনি ও দুইটা আনি বাহির করিল।

হারান সেখকে বাধ্য হইয়া আট আনা ফেরত দিতে হইল, সাত আনা দিয়া দুই পয়সা বাকি রাখা চলিত, কিন্তু হারান তাহাতে রাজি নয়।

সাড়ে আট আনা দাম করিয়াও মুরগী আট আনায় বিক্রী করিতে হইল…মমিনের মেজাজ ইহাতে খারাপ হইবে না কেন? …তার পর চুণ কিনিবার পালা। গত হাটে চুণ লইতে ভুল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সে বউয়ের মুখ বাঁকা দেখিয়াছে। সুতরাং প্রথমেই গেল সে চুণ কিনিতে…

দাও, এক পয়সার চুণ দাও।

পয়সা আছে?

না, আনি আছে।

তা'লি চার পয়সার চুণ নেও।

চার পয়সার চুণ তোমার শ্রাদ্ধে লাগবে নাকি?

চুণ-ওয়ালা তেরিয়া হইয়া উঠিল। কি, কি বুললে—মুখ সামাল করে কথা বুলো।

অ্যাঁ…মুখ সামাল ক'রে কথা বুলবি!…পয়সা দিতি পার না ত…চুণ বিক্রী করতি আস ক্যান?

পয়সা দিতি পারি নে, সে কি আমার দোষ নাকি…তুমি পয়সা দিতি পারতিছ না ক্যান?

মমিন চুণওয়ালার দিকে চোক পাকাইয়া কিছুক্ষণ তাকাইল, তাহার পর রাগে গড়গড় করিতে করিতে বলিল…দাও, এক আনারই চুণ দাও।

একটা আনি খরচ হইয়া গেল।

ইহার পর বার্লি কিনিবার পালা। ছোট মেয়েটা খিদেয় টা টা করিতেছে। এক পয়সা অথবা দুই পয়সার বার্লি কিনিবার দরকার।

হীরে কুণ্ডুর দোকানে ভাল বিলাতি বার্লি পাওয়া যায়। মমিন দোকানে গিয়া বলিল, কুণ্ডু মশায়, এক পয়সার বার্লি দ্যান ত।

পয়সা আছে?

না, আনি।

তালে কেমন ক'রে হয়?…তা এক কাজ কর,—একেবারে এক আনার বার্লি নিয়ে যাও, অনেক দিন যাবে।

চুণওয়ালার সঙ্গে বচসা করিয়া ঐ যে মমিনের মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। মমিন বলিয়া উঠিল, দাও,—তাই দাও,—শালা বার্লি খায়েই থাকপো—আর কিছু খায়ে আর কাজ নেই।

রাগিয়া গেলে মমিন লোকের মান রাখিবার তোয়াক্কা করে না। সম্বোধন—'আপনি' হইতে কখন যে 'তুমি'-তে নামিয়া যায় সে টেরও পায় না।

মমিনকে রাগিতে দেখিয়া কুণ্ডু মহাশয় একটু চুপ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তালে কি করব, মমিন,—কয় পয়সার দেব?

ভ্রূ কোঁচকাইয়া মমিন বলিল, দাও, চার পয়সারই দাও।

বার্লি কিনিবার পর মমিন কিন্তু চিন্তিত হইয়া পড়িল; জিনিস কিনিতে তাহার এখনও অনেক বাকি, সরষের তেল না কিনিলে আজ রাত্রেই রান্না হইবার উপায় নাই।

মিনিট দশেক পরে মাছের বাজারে হঠাৎ সোরগোল পড়িয়া গেল। কাহার চাপা কান্না, গালাগালি, হৈচৈ,—দেখিতে দেখিতে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া উঠিল। যাহারা হাট করিতে আসিয়াছে তাহারা গিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভীতু লোকেরা ছেলেপিলে সঙ্গে থাকিলে তাহাদের হাত ধরিয়া সরিয়া গেল। দোকান-ঘরের মালিকেরা দোকান-ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিল; কে জানে এখনই হয়ত দাঙ্গা বাধিয়া উঠিবে, দোকান লুট হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হাট করিতে আসিয়া দাঙ্গা ত এখানে আজ নূতন নয়!

শ্রীকোল পল্লী উন্নয়ন সমিতির সেক্রেটারী ভুজঙ্গ রায় সরোজ, ধীরেন, চেতন প্রভৃতি তরুণ যুবকদের সঙ্গে করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। ভিড় ঠেলিয়া তাহারা কি যাইতে পারে,—অনেক কষ্টেসৃষ্টে, বলিয়া কহিয়া, একটু-আধটু ঠেলা মারিয়া ভিড়ের মধ্য ভাগে গিয়াও ব্যাপার তাহারা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না।

সকলেই নিজের নিজের মত চীৎকার করিতেছে ; আস্ফালন করিতেছে। একজন মাথা নীচু করিয়া চোখের উপর হাতের আড়াল দিয়া কাঁদিতেছে। পাশ হইতেই কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—তুই যমদেরী কর, তেল ভাণ্ডে যাবি।

আর একজন বলিতেছে, এ হাটই ভাণ্ডে যাবি, এত অত্যাচার সয়ে কেডা এ হাটে আসপি ?

জেলেরা মাছের ডালার সমুখে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতেছে, আসপো না আমরা এ হাটে—

কি ব্যাপার কি ?—ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল।

একজন বলিয়া উঠিল, ঐ যে, ঐ যে সে লোকটা, আস্তে আস্তে সরে পড়তিছে।

যে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল সে ফিরিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল, কি,—কেডা পলালো,—আমি ?—আমি পলাবো ঐ জ'ালেসারে দেখে ?

সরোজ তাহার অঙ্গে মৃদু স্পর্শ করিয়া বলিল, না,—তুমি পালাচ্ছ—কে বললে—আর তাল বাধিও না, ভাই,—দাঁড়াও,—শুনি, দেখি—কি ব্যাপার হয়েছে ?

ভুজঙ্গ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার নাম মমিন—না ?

হয়,—আপনি আর চেনলেন না ?—মমিনের এখন কেউ চেনে না।

নিয়ামদ্দির শালা না তুমি ?

হয়, অত হিসেব দিয়ে কাজ কি আপনার ?—আপনার বিচের মানে কেডা ? ও জ'ালে যা করতি পারে করুক গে।

ভুজঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলিল, তোমার বিচার আমি করতে যাচ্ছি না,—এখানে মুসলমান মাতব্বর যাঁরা আছেন, বিচার তাঁরাই করবেন। ব্যাপারটা শুধু আমি শুনতে চাচ্ছি। যেমন করে হোক মিটমাট করে দিতে চাই,—এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা ক'রে পয়সা নষ্ট করা কি ভাল ?

এইবার মমিন চুপ করিল।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন নিরপেক্ষ লোকের বিবরণ শুনিয়া জানা গেল—মমিন দুই পয়সার এক ভাগ পুঁটি নিজের খালুইতে তুলিয়া লইয়া জেলেকে দুয়ানি দিয়া বলে, দে পয়সা দে।

পয়সা ক'হানে পাব ? চার পয়সার কেনো,—এটটা আনি দিচ্ছি।

চার পয়সার কেনব,—তোর হুকুমি নাকি, এই তিত-পুঁটি কেউ চার পয়সার কেনে ?

তয়—দুয়ানি ভাঙায়ে আনে পয়সা দিয়ে যাও।

মমিন খালুই হাতে দুয়ানি ভাঙাইতে যাইতেছিল, জেলে বলিল, খালুই রাখে দুয়ানি ভাঙাতে যাও।

মমিন দুই চোখ পাকাইয়া বলিল, খালুই রাখতি হবি ? নবাব হইছ—অ্যা !

তয় মাছ ঢালে রাখে যাও—পয়সা দিয়ে আবার মাছ নিয়ে যায়ো।

বটে !

বলিয়া তেজ করিয়াই মমিন খালুই লইয়াই চলিয়া যাইতে চায়। জেলে তাহার খালুই চাপিয়া ধরিয়া বলে, খালুই রাখে পয়সা আনো, না হয় আমার মাছ ঢালে দিয়ে যাও।

শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে মমিন রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া জেলেকে কীল চড় লাথি মারিতে থাকে, পয়সা দিতি পারে না, আবার খালুই কাড়ে রাখে !

ভুজঙ্গ যখন এই পর্য্যন্ত শুনিল তখন জেলেটি আবার হাউ হাউ করিয়া বলিল, বাবু, আমি কি অন্যায় করিছি কন ? উনারে চিনি নে আমি, দুই পয়সার মাছ কেনবেন, দুয়ানি দিয়ে বলে, পয়সা দে। পয়সা আমি ক'নে পাব, বাবু ?

জেলেটা আরও কি বলিতে যাইতেছিল—ভুজঙ্গ বলিল, বুঝেছি আমি সব, তোমার আর কিছু বলতে হবে না।

ভুজঙ্গ কয়েক জন মুসলমান মাতব্বরকে ডাকিয়া মমিনকে লইয়া বিপ্রদাসের ডিস্‌পেনসারিতে ঢুকিল, মমিনের বিচার হিন্দুতে করিতে পারিবে না।

ডাক্তারখানায় নেপাল মুহুরীর আর আজগার মৌলভীর জেরায় মমিন গরজাইতে লাগিল, কাছারির পেয়াদা নিয়ামদ্দির কুটুম মমিনের আবার জেরা।

...এ দিকে মাছের হাট ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে জেলেটা মার খাইয়াছিল, সেই কেবল ডাক্তারখানায় দাঁড়াইয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। অন্যান্য জেলেরা মাছের চুপড়ি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

এ হাটে আর মাছ বিক্রী করবো না আমরা।

যাহাদের মাছ কেনা হয় নাই তাহারা মাছের ঝাঁকা লইয়া টানাটানি করিতেছে। ওরা বলে, না, মশায়, হবি নে, যে হাটে শাসন নেই, বিচের নেই···

আজগার মৌলভী বুঝিয়াছিলেন বেশি কড়াকড় করিলে মমিন কসকাইয়া যাইবে। নিয়ামদ্দির শালা বলিয়া উহার বড়ই তেল হইয়াছে, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতে চাহে না। অন্যায় ত সত্যই সে করিয়াছে, তাহা ছাড়া গ্রামের এতগুলি ভদ্রসন্তান তাহার উপর বিচারের ভার দিয়াছেন। মমিনকে মিষ্ট কথায় কোণ-ঠাসা করিয়া শেষে তাহার নিজের মুখেই অপরাধ স্বীকার করাইয়া লইতে হইবে। অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া মৌলভী জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তুমি নিজের মুখেই বল ত,—কি ব্যাপার ঘটেছিল ?

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাওয়া গেল না।

মমিন সবে ভাবিয়া লইতেছিল—ইহার উত্তরে সব কথা বলিতে গেলে নিয়ামদ্দির শালার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিবে কি না—ইহার মাঝে হাটে আবার তুমুল সোরগোল উপস্থিত হইল। সকল লোক মেছো হাটার দিকে বিদ্যুদ্গতিতে ছুটিয়া যাইতেছে।

মমিনের জেরা করা ছাড়িয়া আজগার মৌলভী, নেপাল মুহুরী, ভুজঙ্গ রায় প্রভৃতি সকলেই কৌতূহলী হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মমিন সেই ফাঁকে ছুটিয়া পলাইল।

মাছের হাটে তখন বিপুল বিক্রমে লুট চলিতেছে। আজগার দেখিলেন জেলেদের কেহ কেহ মাছের ঝাঁকা উপরে তুলিতেছে, কাহাদের কড়াকড়িতে আবার তখনই তাহা মানুষের মাথার নীচে নামিয়া যাইতেছে, জেলেরা চেঁচাইতেছে, কাঁদিতেছে, তাহার সহিত

হাটুরের চেঁচামেচি মিশিয়া ব্যাপার দুর্বোধ্য ও অবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভুজঙ্গ তখনই মাছের হাটের দিকে ছুটিয়া গেল, মৌলভী ও মুন্সী ধীরে ধীরে আগাইতে লাগিলেন। মমিন জনতার মাঝে কোথায় হারাইয়া গেল। বিচার-সভা ভাঙিয়া গেল।

দোকানীরা নিজের নিজের দোকানপাট তুলিয়া জিনিসপত্র মাথায় করিয়া পলাইতে সুরু করিল, কে জানে তাহাদের বেসাতিই লুট হইবে কিনা!

ভুজঙ্গ যখন মাছের হাটে পৌঁছিল তখন আর একটি চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নাই, মাছের হাটে শুধু ভাঙা ঝাঁকা আর জেলেদের কান্না।

ভুজঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া জানিল—কতকগুলি লোক আসিয়া ভাল কথায় জেলেদের মাছগুলি বিক্রয় করিয়া যাইতে বলে, কিন্তু,—না,—তাহারা এ হাটে আর মাছ বিক্রী করিবে না।

পয়সা দিয়ে মাছ কেনব,—মাছ দিবি নে!—আচ্ছা দাঁড়া!

তখনই মাছ কাড়া সুরু হইয়া গেল।

ভুজঙ্গের সওদা করা সেদিন আর হইল না; জেলেদের সাধ্যমত প্রবোধ দিয়া যখন তার একটু ফুরসৎ হইল—তার আগেই লুটের ভয়ে হাট ভাঙিয়া গিয়াছে।

মমিনের মা কয় দিন মেয়েবাড়ি যাইয়া আছে। মমিন বাড়ি আসিতেই বউ বলিল, ও মা—সওদা কই,—মাছ আনো নেই!

মমিন আগুন হইয়াই ছিল—বউ মাছের নাম করাতে তাহাতে ঘৃতাহুতি পড়িল। তেরিয়া হইয়া সে বলিল, দ্যাখ, ভ্যাজর ভ্যাজর করবি নে,—বলে দিচ্ছি,—ফের যদি—

ওমা, মেজাজ দেখ, কি বুলিছি আমি, মাছ আন নি, তেল আন নি, আমি রাঁধবো কি দে'!

অ্যা—রাঁধবো কি দিয়ে, এত নবাবি কিসির সেদিন তেল আনে দিলাম না—কি করলি সে তেল!

মমিন একটা কটু বাক্য উচ্চারণ করিয়া বসিল।

ওমা, এর হ'ল কি,—হাটের নাম করে শ্রীপুর যায়ে কিছু টানে টুনে আ'লো নাকি।

তারপর হঠাৎ কি হইল, মমিনের গালির তীব্রতা স্মরণ করিয়া সফি কাঁদিতে বসিল। সে বাপের আদরের বেটি,—এমন কড়া কথা সে বাপের বাড়িতে কাহাকেও উচ্চারণ করিতে শোনে নাই।

মমিন বারান্দার উপর তামাক সাজিতে বসিল,—কিন্তু দিয়াশলাই কই,—নানা গোলযোগে সে দিয়াশলাই আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে। নেশা জাগিয়া উঠিয়াছে, আয়োজনও করিয়াছে, মমিনের আর তর সহিতেছিল না,—তাহাতে মাথাটাও গরম হইয়া আছে।

রাগের মাথায় বউকে আর কিছু সে বলিবে না ঠিক করিয়াছিল কিন্তু নেশা করিতে বাধা পাইয়া মাথাটা আবার তাহার চড়িয়া উঠিল,—বউটা আবার ওদিকে নাকে কান্না সুরু করিয়াছে।

নাকে কাঁদতিছিস যে বড়—আমার আগুন তুলিস নেই ক্যান?…বুল বল বুলতি হবি তোর।—বলিতে বলিতে দাঁত কড়মড় করিয়া মমিন এক লাফে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল; আমার আগুন তুলিস নেই ক্যান হারামজাদি!

হারাম কথাটা নাকি মুসলমানদের বড়ই বেশি গালাগালি—বাপের নামে এমন কথাটা বলায় সফি মুহূর্ত্তে তাহার কান্না ভুলিয়া গিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, যা তা বুলে না কিন্তু—বুলে দিচ্ছি।

ক্যান – বুললি কি হয়?

দুই চোখ জ্বলিতেছে সফির, আমার বাপ কিছু হারাম নয়, জানে সব্বাই যারা ও সব কথা মুখি আনতি পারে তারাই এ সব, তাদের বাপ-ঠাকুরদা—

কি—কি বুললি!

রাগে জ্ঞান হারাইয়া মমিন এক লাফে গোয়ালঘর হইতে লাঙলা লাঠিখানি আনিয়া বউকে প্রথম বাড়ি মারিল—ঠিক মুখের উপর। সফি বসিয়া ছিল,—বাবারে—বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু মমিনের তখন মাথায় খুন চাপিয়াছে। বুকে, মাথায়, পিঠে, পায়ে—দিগ্বিদিক শূন্য হইয়া সে ঠেঙাইয়া চলিল। ছেলে-পিলে তখন—মাকে মা'রে ফেললো রে—বলিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে।

সোরগোলে পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল। প্রতিবেশী আবদুল আসিয়া মমিনের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইল। সফি তখন কান্না চাপিতে গিয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। আবদুলের বউ তাড়াতাড়ি জল ও পাখা আনিতে গেল।

লাঠি কাড়িয়া লইবার পর কিন্তু মমিন একটুও দাঁড়াইল না, গামছাখানা কাঁধে লইয়া সে ভগিনীপতি নিয়ামদ্দির বাড়ি চলিল। যাইবার সময় সমবেত প্রতিবেশীদের সম্মুখে বউয়ের সম্বন্ধে বলিয়া গেল, মরুক—শালী মরুক, তোমরা আইছ ক্যান—মুখ ওর সিধে করে দেব না আমি?—মারের ওর হইছে কি?

কুটুম্ব নিয়ামদ্দির বাড়িতে পেট ভরিয়া খাইয়াও—রাত্রে মমিনের ভাল ঘুম হইল না। মাঝে মাঝে অবশ্য তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, কিন্তু কাটিলেই তাহার মনে হইয়াছে বউকে অমন করিয়া মারাটা তাহার ঠিক হয় নাই: এমন কি অপরাধ সে করিয়াছে? নিজে সওদা লইতে পারে নাই—সে কি তাহার দোষ? …ছেলেপিলেগুলি হয়ত রাত্রে খাইতে পায় নাই: বউ কি অমন মার খাইবার পরও রাঁধিয়াছে?…সে ত কুটুম্ব বাড়ি দিব্বি পেট ভরিয়া খাইল।

পরদিন যখন সে বাড়ি রওয়ানা হইল তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। সারাপথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিল—কি করিয়া সে বৌয়ের মান ভাঙিবে। লাঠির ঘাগুলি না জানি কতখানি লাগিয়াছে: গায়ে বোধ হয় দাগ বসিয়া গিয়াছে।

অবশেষে বাড়ি পৌঁছিল মমিন। কিন্তু এ কি—বাড়িতে যে কাহারও সাড়াশব্দ নাই। গোয়ালঘরে গরুগুলি খালি গামলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মমিন কাছে আসিলে তাহারা একবার তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল—যেন বলিতে চায়, কি ব্যাপার কি?

মমিনও মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিল।

মমিন বাড়ি আসিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে দেখিয়া প্রতিবেশী আবদুলের মা আসিয়া বলিল, কি দেখতিছ অমন ক'রে, জোব্বার মা ছাওয়াল পাল নিয়ে নাত ভোরে বাপের বাড়ি চলে গেছে—কাল নাত্তিরেই খবর পাঠাইছিল রহমানের দে'। নাত্তির থাকতিই তার ভাই আসে গরুর গাড়ি করে তাগারে নিয়ে গেছে।

শুনিয়া বারান্দার উপর বসিয়া পড়িল মমিন।

শ্রীকোলের হাটে এদিকে মহা হুলস্থূল: তিন হাট মাছ আসে না। জেলেরা সব ধর্ম্মঘট করিয়াছে। শ্রীকোল ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা মহা বিপদে পড়িল। খামারপাড়ার হাট এক ক্রোশ, কাজিলপুর দুই ক্রোশ, লাঙ্গলবাঁধ—দুই ক্রোশ, আবার নদী পার। এত দূর হইতে কে কবে মাছ আনিয়া খাইতে পারে?

সকলেই বুঝিল একটা বিচার হওয়া প্রয়োজন। মমিনের কিছু শাস্তি হওয়া দরকার, নইলে হাট টিকিবে না। বিচারের দিন জেলেদেরও উপস্থিত থাকা দরকার, তাহারা দেখিবে যে মমিনের শাস্তি হইল।

গ্রামের লোক পল্লী-উন্নয়ন সমিতিকে ধরিল—তাহারা আবার স্থানীয় মুসলমান সমিতিকে ধরিল। কাছারি হইতে জমিদারকে খবর দেওয়া হইল। খামারপাড়া ও অন্যান্য গ্রামের জেলেদের ডাকা হইল; আসামী মমিনকে কড়া তলব দেওয়া হইল।

সভা রবিবার—স্থান শ্রীকোল মাইনর স্কুলের প্রাঙ্গণ।

লোকে লোকারণ্য। সবাই মমিনের বিচার দেখিতে আসিয়াছে: লোকটা হাট ভাঙিতে বসিয়াছে।

প্রথমে ভুজঙ্গ তাহার বিবৃতি দিল, অন্যান্য সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল, যে জেলে মার খাইয়াছিল সে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া তাহার নালিশ জানাইল। অন্যান্য জেলেরাও তাহাদের জবানবন্দি বলিল।

সকলেই মনে করিতেছে—মমিনেরই দোষ, এবার উহার কি ভীষণ শাস্তি পাইতে হইবে।

সভাপতির আসনে আজগার মৌলভী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, একটু হাঁ-না করিতেছেন না। প্রশ্ন করিতেছেন অন্যান্য মাতব্বরেরা।

এবার মমিনের পালা। সবাই উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল, দেখা যাক উহার কি বলিবার আছে।

নেপাল মুহুরী মমিনকে প্রশ্ন করিলেন, তুই ওরে মারলি ক্যান?

ও পয়সা দিল না ক্যান?

পয়সা যদি ওর না থাকে ত ক'ন থে' দেবে?

ভারি ত দুয়ানির ভাঙানি!

তাই যদি ওর না থাকে ত ক'ন থে দেবে?

আমিও ত বুললাম—আমিই ভাঙায়ে আনে দিছি—তা খালুই আটকাতি চায় ক্যান?—ও বলে, হয় খালুই রাখে যাও, নয় মাছ ঢা'লে রাখে যাও, পয়সা দিয়ে নিয়ে যায়ো।

ও ত ঠিক কথাই বুলিছে।

তেরিয়া হইয়া উঠিল মমিন, ক্যান, আমার মান নেই, ওর পয়সা না দিয়ে প্লায়ে যাচ্ছি না কি আমি?

যে জেলে মার খাইয়াছিল সে হাত জোর করিয়া কহিল, আজ্ঞে আমি ত উনারে চিনি নে, হাটের সব লোককে কি চেনা যায়? আমাগারে বাড়ি ত এ গাঁয় নয়।

জনতার মধ্য হইতে কেহ কেহ মন্তব্য করিতে লাগিল, মমিনের সত্যি অন্যায়, হাটের লোক কে কেমন—জেলেরা চিনবে কেমন করে?

যাঁহারা বিচারকের আসনে বসিয়াছিলেন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি আলোচনা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর কানে আসিল একজন বিচারক বলিলেন, মমিনের নাকে খত দিইয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক, আর একজন যেন কি বলিলেন, আর একজনের কথাও ঠিক বুঝা গেল না।

জনতা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল: মমিনের যেরূপ শাস্তি তাহারা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, শাস্তিটা যেন সেরূপ কিছু হইবে না।

সকল বিচারকের মন্তব্য শুনিয়া অবশেষে সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে স্তব্ধ: এইবার তাহারা বিচার শুনিবে। সভাপতি—যে জেলেটি মার খাইয়াছিল তাহার সহিত অন্যান্য জেলেদেরও আগাইয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে বিচারপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, সবার কথাই শুনলাম তোমাদের, মমিনের এবং বিচারকদেরও···

নির্যাতিত জেলেটির দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—সব কিছু শুনে আমার মনে হয়—দোষ মমিনেরও নয়, তোমারও নয়—দোষ হচ্ছে···আচ্ছা তোমাদের মুখেই শোনা যাক···আচ্ছা, ও যখন দুয়ানি দিয়ে বাকী পয়সা চাইল, তখন তুমি দিলে না কেন?

আজ্ঞে, পয়সা পাব' কনে?—পয়সা কি এ মুল্লুকে আছে?

মমিনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওকে দুই পয়সা না দিয়ে দুয়ানি দিতে গেলে কেন?

পয়সা কনে পাব—পয়সা করব না কি?—এ শালার মুল্লুকে কি আর পয়সা আছে?

বিচারপতি জেলেটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বক্তৃতার সুরে বলিলেন—দেখলে ত—দোষ তোমারও নয়, মমিনেরও নয়, দোষ হচ্ছে পয়সা নেই। পয়সা থাকলে মমিন তোমাকে দুয়ানি না দিয়ে পয়সাই দিত; পয়সা থাকলে তুমি মমিনের মাছের দাম কেটে নিয়ে বাকী পয়সা ফেরত দিতে, সোজা কথা পয়সা নেই—পয়সা থাকলে এ বিবাদ বাধতই না।

শুনিয়া জেলের দল যেন তেমন খুশী হইতে পারিতেছিল না।

বিচারপতি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া চলিলেন: ভেবে দেখ



মার্কিন বোমারু বিমানসমূহ কর্ত্তৃক নিউগিনিতে জাপানী 'এ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট' ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ



মিত্রপক্ষীয় চতুর্দ্দশ বাহিনীর টহলদারী স্কাউটগণ কর্ত্তৃক উত্তর-ব্রহ্মের জঙ্গলে নৈশ আশ্রয়-স্থল নির্ম্মাণ



আনজিও অঞ্চলে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ মার্কিন সৈন্যগণ সমুদ্র তটাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে



মার্কিন-বাহিনীর উভচর ট্রাকসমূহ আন্‌জিওর নিকটস্থ সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া মিত্রপক্ষীয় সৈন্য এবং মাল-বোঝাই জাহাজের দিকে রওনা হইয়াছে



ইংলণ্ডের একটি অন্ধ-বিদ্যালয়ে এক দল:অন্ধ বালিকার সন্তরণ-ক্রীড়া



অন্ধ-বিদ্যালয়ে নানা দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ শিশুদের খেলাঘর



ওরচেষ্টারস্থ অন্ধ-কলেজের সুসমৃদ্ধ 'ব্রেইল' লাইব্রেরী



বিশেষ এক ধরণের মানচিত্রের সাহায্যে অন্ধ বালকদের ভূগোল শিক্ষা দান

খোদা যখন আমাদের পরদা করেছেন তখন আমাদের মান সম্মানের কথা থাকবেই, রাগ থাকবেই, তোমারও থাকবে, আমারও থাকবে। পয়সা থাকলে রাগারাগি বাধতেই পারত না। মমিন পয়সা দিল তুমি মাছ দিলে কিম্বা মমিন দুয়ানি দিল তুমি বাকী পয়সা ফেরত দিলে, চুকে গেল বাস—কিন্তু তা ত নয়, যত অনর্থ বাধিয়েছে এই পয়সা : না দিতে পারলেও রাগ,—না পেলেও রাগ। আসল কথা মহারাণীর রাজত্ব থেকেই যে পয়সা সব কোথায় উধাও হয়ে গেল!…তাই বলছিলাম, মনে তোমরা কোন গোলমাল রেখ না। আমাদের পয়সা যত দিন আমাদের কাছে আবার ফিরে না আসবে তত দিন মাথা গরম হবেই…

জনতা দেখিল জেলেদের মন নরম হইয়া আসিয়াছে। একজন বলিল, লোকে কথায়ই বলে—জেলে না ইয়ে—

আর একজন বলিল, না রে বড়ই ভালমানুষ এরা মেরে ধরে একটু মিষ্টি কথা বলো—অমনি গলে যাবে।…

এ কয়দিন বড়ই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইয়াছিল মমিন, আজকার বিচারে মন তাহার হাল্‌কা হইয়া গেল : অপরাধী সে নয়, সত্যিই পয়সাই যত গোল বাধাইয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে সে ভাবিতে লাগিল—এই পয়সার জন্যই ত সে বউকে মারিয়াছিল—পয়সা থাকিলে সে হাট হইতে অমন মেজাজ খারাপ করিয়া বাড়ি ফিরিত না—এমন অকাণ্ডও ঘটিত না।

সেই দিন রাত্রেই মমিন শ্বশুরবাড়ি গেল। বউ তাহার সহিত কথা বলিতে চায় না, কেবল সরিয়া সরিয়া বেড়ায়।

রাত্রে কাছে পাইলে মমিন বউয়ের গায়ে মুখেহাত বুলাইয়া বুলাইয়া দেখিতে লাগিল—কোন জায়গা এখনও উঁচু হইয়া আছে না কি?

স্বামীর আদরে বউ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি পাগল, আমি তোরে ইচ্ছে করে মারিছি নাকি?—দোষ তোরও না, আমারও না, দোষ পয়সার—পয়সা থাকলি কি আমার মাথা খারাপ হ'ত না কি?—যে জা'লেরে মারিছিলাম আমি আজকার মৌলভী তারে যে আজ বুঝোয়ে দিল—এত লোক বুঝে গেল—আর তুই বুঝিছ না?

তামসী

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এ কোন্ আয়ুধ জ্যোতিঃপাতে
জ্বলিছে তামসী এই রাতে!
দিকে দিকে জাগে ভয় কি যে হয়, কি যে হয়,
কানাকানি কত ইসারাতে,
আকাশ-বাতাস ভরি' কে কাঁপিছে থরথরি,'
প্রাণধারা বহে নব-খাতে,
ভেঙে পড়ে দুই তীর, আজ কিছু নহে স্থির,
প্রলয় জমিছে ঝঞ্ঝাবাতে!

সুদূর গোপন গুহাতলে
আঁধারে কার এ অসি জ্বলে!
নীলাকাশে ধ্রুবতারা আজিকে কোথায় হারা,
তত দূরে আঁখি নাহি চলে,
থেকে থেকে রণরণি' শুনি এ কি মন্ত্রধ্বনি,
কি আবেশ লাগে কোলাহলে,
কে এল, কে এল বুঝি এ আঁধারে পথ খুঁজি'
আপনারই দাহন-অনলে।

এসেছে সে, যার পথ ভরি'
হাহাকারে ভরেছে শর্ব্বরী।
ছিল দেবতার মনে, এসেছে সে শুভক্ষণে
তাঁর সৃষ্টি রাখিতে সম্বরি'।
যুগে যুগে এই মত এসেছে সে কত শত
নূতন ভয়াল রূপ ধরি'।
তুলে তারে লও হাতে আজি এ তামসী রাতে,
ফিরায়ো না অবহেলা করি'।

যদি এ তামসী রজনীতে
ভয় করো তারে হাতে নিতে,
বিরূপ এ পৃথিবী যে হাতে তারে লবে নিজে
প্রভঞ্জনে, প্লাবনে, বহ্নিতে।
অনশন মহামারী ঘোষিবে বিজয় তারই
দেশে দেশে ক্রন্দন-ধ্বনিতে,
অসুরের অভিশাপে আজি যারা নিশি যাপে,
অবগাহি' তাদেরই শোণিতে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারত ব্রহ্ম সীমান্তে বর্ষাকাল আগতপ্রায়। আরাকান অঞ্চলে বৃষ্টিবাদল আর কয়েক দিন পরেই দেখা যাইবে। গত বৎসরের ব্রহ্ম-অভিযান এই বর্ষারই কারণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্থগিত করা হয়। এ বৎসরের অভিযান স্থগিত করা সম্ভব হইবে না, কেননা এবার জাপানী সেনা কয়েক স্থলে, যথা কালাদান অঞ্চলে পালেটওয়ার নিকট, কিছু অগ্রসর হইয়া আছে। আরও উত্তরে টিডিম, টানজুম, টামু ইত্যাদি স্থলের দুর্গও তাহাদের হস্তগত এবং সর্ব্বোপরি মণিপুরে ও নাগা পার্ব্বত্য অঞ্চলে শত্রুসেনা এখনও আক্রমণে তৎপর রহিয়াছে এবং তাহাদের ব্যূহভেদী সৈন্যের ছোট বড় অনেক দল জালের মত ঐ দুই পার্ব্বত্য প্রদেশে ছাইয়া বসিয়াছে। ঐ সকল প্রদেশ শত্রু সংস্পর্শ হইতে বিমুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নহিলে আগামী হেমন্ত কালের ব্রহ্ম-অভিযানও দুঃসাধ্য হইয়া যাইতে পারে। সীমান্তের বর্ত্তমান পরিস্থিতির যেটুকু পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহাতে মনে হয় যে, জাপানী সৈন্যের নাগা পার্ব্বত্য অঞ্চলে হানা দেওয়ার ব্যাপারে এখন এক নূতন পর্য্যায় আসিয়াছে। সেখানে জাপানী সেনার চেষ্টা তাহাদের অধিকৃত স্থলগুলির সংরক্ষণের উপরই চলিতেছে। মণিপুরে জাপানী দল তাহাদের অধিকার বিস্তৃতির যে চেষ্টা করিতেছে তাহাও এই সংরক্ষণের চেষ্টারই অংশ মনে হয়। আসাম বা বাংলার অভিমুখে অভিযান চালনার কোনও ইঙ্গিত ঐরূপ কার্য্যতৎপরতার মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে হয় জাপানী যুদ্ধ-পরিচালকবর্গের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মিত্রপক্ষের ব্রহ্ম-অভিযান ব্যর্থ করা এবং সেই উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে সফল হওয়ায় তাহারা এখন সীমান্তের উপরে নিজেদের পরিস্থিতির উন্নতি করিতেই ব্যস্ত।

ভারত আক্রমণার্থে অভিযানের কোনও চিহ্ন এতাবৎকাল প্রকাশ পায় নাই। জাপানী সেনা যদি বর্ষাকালের মধ্যে মণিপুর ও নাগা পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তবে ক্রমে আসামে স্থিত মিত্রপক্ষের সেনাদলগুলির সরবরাহের পথঘাটসমূহ বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে পারে এবং সেই কারণে ঐ অঞ্চলগুলি হইতে শত্রু বিতাড়ন নিতান্তই প্রয়োজন। জাপানী সেনা যেভাবে ঐ অঞ্চলগুলির দুর্গম পথঘাটের ভিতর দিয়া পর্ব্বতমালায় ছাইয়া বসিয়াছে তাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ করা সময়সাধ্য ব্যাপার হইবে মনে হয় এবং বর্ষা আগমের পূর্ব্বে সে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর না হইলে তাহা আরও কঠিন হইবে। পূর্ব্ব সীমান্তের পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রবল বারিপাতের মধ্যে যন্ত্র-চালিত যুদ্ধ দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং বিমানপথ মেঘাচ্ছন্ন ও পর্ব্বতগাত্র কুয়াশায় আবৃত হইলে আকাশ-যুদ্ধেরও বিশেষ সুবিধা থাকিবে না। সুতরাং মিত্রপক্ষের কার্য্যক্রমের গতিবৃদ্ধি হইবার অবসর আর অল্প দিনই আছে, তাহার পর আগামী শরৎকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের গতি উভয় পক্ষেই মন্দ হইয়া আসা সম্ভব। তবে এখন প্রশ্ন ভারতরক্ষার নহে, প্রশ্ন শত্রু বিতাড়নের। অন্য দিকে ১৯৪৩-৪৪ সালের ব্রহ্ম-অভিযানও বোধ হয় স্থাণু হইয়া গেল।

আমরা বরাবরই লিখিয়া আসিতেছি যে, জাপান নিশ্চেষ্ট হইয়া মার খাওয়ার জন্য বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে চালিত ঝটিকা অভিযানে জাপান ছয় মাসের মধ্যে যে সকল ভূমিখণ্ড নিজের অধিকারে আনিতে সমর্থ হয় তাহাতে পৃথিবীর যে-কোনও জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রায় সকল উপকরণই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। জাপান যদি ঐ সকল দেশ নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারে তবে সে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই জগতের শক্তিশালী জাতিবর্গের মধ্যে অগ্রণী হইতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহ। এমত অবস্থায় জাপানের মত দুর্দ্ধর্ষ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুকে ছাড়িয়া রাখা কি প্রকারে সমীচীন হইতে পারে তাহা লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের উচ্চতম অধিকারীবর্গই বলিতে পারেন। বর্ত্তমান ব্রহ্ম-অভিযানের পরিণতি যে দিকে যাইতেছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এবারও এই অঞ্চলের মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-পরিচালকগণ যথেষ্ট সৈন্য ও যুদ্ধ-সম্ভার পান নাই। মনে হয় "এশিয়া অপেক্ষা করিতে পারে" এই নীতি এখনও সচল রহিয়াছে। ফলে এবারও জাপানী সেনানায়কগণ মিত্রপক্ষের ব্রহ্ম পুনরধিকারের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল। ক্ষতি তাহাদের হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা আবার যদি বৎসর কাল অবসর পাইয়া যায় তবে হিসাব-নিকাশে তাহাদের লাভই দাঁড়াইবে।

চীনদেশেও জাপান নিশ্চেষ্ট নাই। জলপথে ও আকাশ-পথে মিত্রপক্ষের শক্তি ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে দেখিয়া জাপান স্থলপথে ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় ও ব্রহ্মের সহিত সংযোগ-পথ দৃঢ় করিবার জন্য দক্ষিণ-চীনের রেলপথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নূতন যুদ্ধ চালনা করিতেছে। যদি এই চেষ্টায় সে সফল হয় তবে আগামী বৎসরে তাহার চলাচল ও সরবরাহের ব্যবস্থা দৃঢ়তর হইবে।

এমন কি ঐ পথে তাহার ওলন্দাজ দ্বীপময় ভারতের সহিত এক নূতন যোগসূত্র রচিত হইতে পারে যাহা ছেদ করা মিত্রপক্ষের নিকট দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইবে। জাপান ইতিমধ্যেই দুই বৎসর অবসর পাইয়া গিয়াছে। জলপথে ও আকাশপথে তাহার উপর যে আক্রমণ চলিতেছে তাহাতে তাহার কোনও শক্তিকেন্দ্র বা রাষ্ট্রীয় মর্ম্মস্থল আহত হয় নাই। তাহার ক্ষতিরও যে হিসাব মিত্রপক্ষ হইতে দেওয়া হয় তাহাতে তাহার শক্তিক্ষয়ের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্প্রতি রয়টার ওয়াশিংটন হইতে সংবাদ দিয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রথম ২৭ মাসের যুদ্ধে জাপানের ৪০৬৪ এরোপ্লেন ধ্বংস করা হইয়াছে। এই অনুমান মার্কিন সমর-সচিব দিয়াছেন, সুতরাং জাপানের ক্ষতি ইহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই বোধ হয়। চীন দেশে এবং ব্রহ্মদেশে জাপানীদিগের ক্ষতি, উক্ত ২৭ মাসের মধ্যে, জড়াইয়া ১০০০ হইয়াছে কি না সন্দেহ। যদি ধরা যায় যে সকল ক্ষেত্রের ক্ষতি একুনে ৫৫০০ হইয়াছে এবং অন্যান্য কারণে আরও ২০০০ জাপানী প্লেন নষ্ট হইয়াছে তাহা হইলেও ৭৫০০ প্লেনের হিসাব পাওয়া যায়। যুদ্ধের আরম্ভে যে সকল অনুমান পাওয়া যায় তাহাতে জাপানের প্লেন নির্ম্মাণের ক্ষমতা মাসিক ৫০০।৬০০ এইরূপ বলা হইত। যদি সে ক্ষমতার বৃদ্ধি নাও হইয়া থাকে তাহা হইলেও এই ২৭ মাসে জাপান অন্ততঃ ১৫০০০ প্লেন নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছে। জাপানের কাঁচা মালের বা শ্রমিকের অভাব নাই। অভাব ছিল কাঁচা মাল বহনের জাহাজের এবং অত্যাধুনিক কলকব্জার, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মান যন্ত্রবিশারদ ও জার্ম্মান নক্সা ইত্যাদির সাহায্য জাপান পাইতেছে যাহার ফলে তাহার যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টার উন্নতি হওয়াই সম্ভব। জাপান দাঁড়াইয়া মার খাইবে বা তাহার দফা শেষ হইয়া গিয়াছে এরূপ ভাবাও বিপজ্জনক একথা মার্কিন দেশে বারংবার বলা হইয়াছে।

রুশ রণপ্রান্তে সোভিয়েট সেনা অক্লান্ত চেষ্টার পর সিবাস্টোপোল অধিকার করিয়া ক্রিমিয়া অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সিবাস্টোপোলের পুনরধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ বিরতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গ্রীষ্মকাল আগতপ্রায়, সুতরাং সোভিয়েটের যুদ্ধ-নেতাগণ গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন অভিযানের নূতন ব্যবস্থায় ব্যস্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইবারে ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তের সমরাঙ্গনগুলিতে সোভিয়েট সেনাকে কঠিনতর বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে সন্দেহ নাই। সোভিয়েট সেনা এখন নিজ দেশের পরিচিত ভূমি ছাড়িয়া বিদেশে অভিযান চালনা করিতে চলিয়াছে। সেখানে বিপক্ষদল তাহার শক্তি-কেন্দ্র এবং যুদ্ধসম্ভারের উৎসগুলি নিকটে আছে এবং তাহাদের চলাচলের ও মাল সরবরাহের ব্যবস্থা অটুট। সোভিয়েট সেনার সম্মুখে নদী-পর্ব্বতময় সমরাঙ্গন যাহার ভিতর শত্রু সুদৃঢ় দুর্গমালা রচনা করিয়াছে। সোভিয়েট যুদ্ধব্যূহের পশ্চাতে দিগন্তব্যাপী ধ্বংসস্তূপ যাহার উপর দিয়া চলাচল আয়াসসাধ্য। এই কারণেই সম্প্রতি স্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, অতঃপর সোভিয়েটের পক্ষে যুদ্ধচালনা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে যদি না পশ্চিমে দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত গঠনের ফলে বিপক্ষ উদ্ব্যস্ত হইয়া শক্তি বিক্ষেপে বাধ্য হয়। সোভিয়েট গণসেনা অপরিসীম শৌর্য্য ও স্থৈর্য্যের সহিত অতি ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়া শত্রু বিতাড়নের কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছে। তাহার দেশ বিধ্বস্ত, মহানগরীর অধিকাংশই খণ্ডস্তূপে পরিণত, বিশাল কল-কারখানা ও খনি খাদানের শতকরা ৬০ ভাগ অকর্ম্মণ্য, অগণিত নরনারী গৃহহীন। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধচালনাতে যে অটল সংকল্পের পরিচয় সোভিয়েট দিয়াছে তাহা জগতে অতুলনীয়। কিন্তু সকল চেষ্টা, সকল প্রয়াসেরই সীমা আছে এবং যদিও রুশজাতি এই যুদ্ধে অসাধ্যসাধনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে এখন যুদ্ধের যে পরিস্থিতি তাহাতে ইউরোপে অক্ষশক্তির ধ্বংসসাধন একেলা সোভিয়েট সেনার ক্ষমতার বাহিরে।

ইটালীতে অনেক দিনের পর আবার যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মিত্রপক্ষের পঞ্চম ও অষ্টম সেনাবাহিনী যুগপৎ আক্রমণে 'গুস্টাভ রক্ষাব্যূহ' ছেদনে উদ্যত হইয়াছে। এখন ঝড়বৃষ্টি তুষারপাতের মরসুম কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং মিত্রপক্ষ ঐ সকল প্রাকৃতিক বাধা হইতে রেহাই পাইয়াছে। এ পক্ষের সেনাবল অস্ত্রবল দুই-ই বিপক্ষের তুলনায় অনেক গরীষ্ঠ। আকাশে ও জলপথে মিত্রপক্ষের একাধিপত্যের কথা বহু দিন হইতে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পঞ্চম বৎসরের দুই তৃতীয়াংশ অতীত হইয়াছে। এই প্রচণ্ড জাতি-সংঘর্ষের ফলে জগতের জনসাধারণের জীবন যাত্রার পথ দুঃসহ কষ্টে পরিপূর্ণ হইতেছে। মানব জাতির সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রগতি ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে সুতরাং শেষ নিষ্পত্তির দিন যত শীঘ্র আসে ততই মঙ্গল। "যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা" কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত সহজ ব্যাপার কিন্তু এই মহাযুদ্ধ আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সমস্ত জগতের জাতিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক পরিস্থিতির এত প্রকার বিষম বিপর্য্যয় ঘটিবে যে তাহাতে ঐরূপ পরিকল্পনার অধিকাংশই আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই মিলাইয়া যাইবে।

আলোচনা

"প্রথম ভারতীয় এফ-আর-এস"

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত

গত চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুশোভন দত্ত মহাশয় লিখিত "বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ভারতীয় প্রতিভা" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পড়িলাম। ইহার একটি বাক্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রামানুজনের কথা বলিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন—"১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তিনি লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন।" (পৃঃ ৫১১)।

এত দিন আমাদের ইহাই ধারণা ছিল যে, রামানুজনই প্রথম ভারতীয় এফ-আর-এস। কিন্তু গত ৩রা জানুয়ারী দিল্লী নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উদ্বোধন-বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল আমাদের সে ভুল ভাঙিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে আর্দেশির কুর্শেদজী নামক এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রথম রয়াল সোসাইটির ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচিত হন। রয়াল সোসাইটির সেক্রেটরী অধ্যাপক হিল —যিনি বর্ত্তমানে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন—পুরাতন নথিপত্র ঘাঁটিয়া এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম ভারতীয় এফ-আর-এস-এর সম্মান কুর্শেদজীর প্রাপ্য, রামানুজনের নহে।

কুর্শেদজী রামানুজনের ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে এফ-আর-এস হন। কুর্শেদজীর নাম কিম্বা কৃতিত্ব এত দিন আমাদের অজানা ছিল। অধ্যাপক হিলের অনুরোধে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর সর আর. পি. ম্যাসানি আর্দেশির কুর্শেদজীর নিম্নলিখিত জীবনী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। ইহা অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি সম্পাদিত *Science and Culture* নামক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে (ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৮)।

আর্দেশির কুর্শেদজী একজন পার্শী ভদ্রলোক। ইনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতার অধীনে বোম্বাইয়ের সরকারী জাহাজ-নির্ম্মাণ কারখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি *Indus* নামক একখানি ছোট জাহাজ নির্ম্মাণ করেন এবং নিজেই ইহার সমস্ত যন্ত্রপাতি, কলকজা বসান। গ্যাসের আলো সম্বন্ধে ইনি নানারূপ গবেষণা করেন এবং নিজ বাসগৃহে যন্ত্রপাতি বসাইয়া ইহাকে গ্যাসালোকিত করেন। তদানীন্তন বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং কুর্শেদজীকে খিলাৎ প্রদান করেন (১০ই মার্চ্চ, ১৮৩৪)। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বৈদেশিক সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যন্ত্রবিজ্ঞানে (mechanical engineering) উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন; সেখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা তাঁহাকে এক বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ারিং কার্য্যে কাজ করিবার সুযোগ দেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ বৎসরই ইনি ইহার ইংলণ্ড ভ্রমণ-বিষয়ক একখানি পুস্তক লেখেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসেন এবং একটি কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিনীয়র হন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে যান এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার একজন জাষ্টিস অব দি পিস হন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি তৃতীয় বার ইংলণ্ডে যান। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি করাচীর ইণ্ডাস ফ্লোটিলা কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিনীয়র হন। ইনি সিন্ধুনদে চলিবার উপযোগী তিন-চারিখানি ষ্টীমার নির্ম্মাণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চতুর্থ বার ইংলণ্ডে যান এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর সত্তর বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, কুর্শেদজী মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন এবং তিনিই রয়াল সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভ্য।

মাতা ও শিশু

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি একত্র করিলে দেখা যাইবে তাহাদের অধিকাংশকে একটি বিষয় অনুপ্রাণিত করিয়াছে—সে বিষয় মাতা ও শিশু। ইহার ভিতর এত মাধুর্য্য সঞ্চিত যে যুগে যুগে নানাভাবে আঁকিয়াও শিল্পীরা তাহা নিঃশেষ করিতে পারে নাই। চিত্রজগতের বাহিরেও এই পবিত্র রূপের মহিমা মানুষের কল্পনাকে চিরকাল অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ খৃষ্টান-ইউরোপ মেরী ভিন্ন যীশুকে পৃথক্ ভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে যশোদা ও কৃষ্ণের কাহিনী চিরন্তন অপরূপ রসধারা সৃষ্টি করিয়াছে। মাতা ও শিশুর মিলিত রূপের প্রতি মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কারণ সৃষ্টির গভীরতম অর্থ ও মহিমা এই সম্মিলিত রূপের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার জগতেই মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া থাকিবে না? সুস্থ প্রফুল্ল শিশু, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি এই অপরূপ সমাবেশ দেখিবার জন্য কি আমাদের চিত্র-শালায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। বাংলা দেশের চারিদিকে চাহিয়া ত সেই সন্দেহই জাগে। শিল্পীকে আজ তাহার আদর্শ খুঁজিতে যে বহুদূর ব্যর্থ পর্য্যটন করিতে হইবে। চারিধারে রুগ্ন, বিবর্ণ মাতৃমূর্ত্তি—নয়নে মাতৃত্বের মমতা আছে কিন্তু নাই জ্যোতিঃ, নাই স্বাস্থ্য। দেশব্যাপী এই দৃশ্যের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া শুধু কল্পনায় কেমন করিয়া আমরা সান্ত্বনা পাইতে পারি। সেই কল্পনা দাঁড়াইবেই বা কিসের আশ্রয়ে?

শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু মাতা ও শিশুর কল্যাণ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে নষ্ট হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জগতের দিকে চাহিয়া আর কিছু না হউক এ বিষয়ে আমরা অনেক শিখিতে পারি, তাহারা শুধু শিল্পে নয়, ব্যবহারিক জগতেও মাতৃত্বের মর্য্যাদা দিতে জানে। আমাদের দেশের জনমত যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহা নহে। বালিকার মাতৃত্ব, অস্বাস্থ্যকর আঁতুরঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বদলাইতেছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থায় দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া যতটুকু পারা যায় আমাদের করিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে প্রসূতি-কল্যাণের তথ্য প্রচার করিতে হইবে। দেশে শিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা যাহাতে বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। শিল্পকলা হইতে ঔষধের প্রথা অনেক দূর হইলেও সে কথাও না পাড়িয়া উপায় নাই। বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষিত ঔষধের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত, যেমন সন্তান-সম্ভবা জননীর জন্য এবং প্রসবের পর প্রসূতির নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেঙ্গল ইমিউনিটির **"ভাইনো মল্ট"**—এই ঔষধের কথাও সকলের জানা কর্ত্তব্য।

গোধূলি স্বপন

ওরা বসেছিল এসে লেকের একটা কোণ ঘেঁষে। তখন ঐ দূরের সুপুরী গাছটার মাথা বেয়ে সূর্য্য ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাবার পূর্ব্বে তার লাল আভা এসে পড়েছে এদের মুখে।

'এই যে' শব্দে ওরা চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখে সুবোধ। ওরা দুজনেই হৈ হৈ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুবোধ বল্লে—'উঠে পড়্লি কেন, এলুম বসতে আর তোরা—ব'লে তারা তিনটিতেই বসে পড়লো আবার।

দীপক বল্ল, 'কি হে ডাক্তার, এতদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিলে কোথায়? তোমার বাসায় গেলুম সেদিন, উড়ে চাকরটা কি বল্লে তার ভাষায় সে-ই জানে তবে এটুকু বুঝলুম তোমরা কেউ নেই এবং অনেক দিন থেকেই। সেই কথাই সুহৃদকে বলছিলুম, কবে এলে? তোমার শরীর ত সেরকম ভাল হয় নি কিছু'—কথাটার পিঠেই সুবোধ বল্লে—'চেঞ্জে গিয়েছিলুম কি যে শরীর ভাল হবে?' সুহৃদ ওধার থেকে বলে উঠল—'তবে কোন্ রাজকুমারী কল দিয়েছিল তার অসুখে?' সুবোধ হেসে উত্তর দিল—'রাজকুমারীই কল দিয়েছিল তবে তার অসুখে নয়।' দীপক হাতজোড় ক'রে বল্ল—'হেঁয়ালী রেখে একটু সোজা ভাষায়ই বল্ না কি ব্যাপারটা।' সুবোধ বল্ল—এক কথায় বললে বলতে হয় পঞ্চাঙ্ক শেষে ড্রপ পড়েছে।

দীপক তাকে একটা জোড়ে ধাক্কা মেরে বল্লে—'যাক, চুপ কর্ ভাই শুনতে চাই না।' সুবোধ হেসে আরম্ভ করল :—

'সেদিন মঙ্গলবার কি বুধবার বিকেলে' একটু চিন্তা করে বল্লে, 'কোথা থেকে যেন এলুম মনে নেই—যাক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি মা বল্লেন—আবার বের হব কি না। আমি 'না' ব'লে সটান আমার ঘরে ঢুকে পড়লুম, ভিতরের পর্দ্দাটা ফাঁক ক'রে তটি এসে বল্ল, জ্যাঠামশাই-এর খুব অসুখ টেলিগ্রাম করেছেন যেতে, কিছুক্ষণ বাদে মা এসে ঐ কথা আরম্ভ করতেই বল্লুম, 'শুনিছি।' মা বল্লেন—'তোর কি যাবে দিয়ে দে আমার বাক্সেই।' আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম—'তোমরাও যাবে নাকি? সেই গাড়ো পাহাড়ের কাছে আর যে রাস্তা—বাপ্ স।' মা বল্লেন—'ও কথা বলিস নে সুবো! তিনি বুড়ো মানুষ, একলা অসুখে পড়ে কত না জানি কষ্ট পাচ্ছেন। এখন আমাদের না গেলে কি চলে? তা'লে আপন আর পরে প্রভেদ কি রে?' যাক, রওনা হলুম রাত ১০টার গাড়ীতে। বার ছয়েক রেল আর ষ্টীমার বদলে পৌছলুম সেখানে তার পর আর রেলগাড়ী নেই। এর পরেই ছোট একটি নদী পার হয়ে যেতে হয় প্রায় বার মাইল। এ আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও পৌরাণিকত্ব বেঁচে আছে সগর্ব্বে তার মাথা উচিয়ে অর্থাৎ যেতে হয় হেঁটে কিংবা গরুর গাড়ীতে, অন্য কোন যানবাহন নেই। জ্যাঠামশাই ওখানে জমিদারী এষ্টেটে কাজ করছেন বহুকাল, তাঁর কাছেই শুনেছি ঐটুকু রক্ষা করে নাকি তাঁদের কৌলিন্য বজায় রেখেছেন।

আমরা গো-যানে যখন গিয়ে পৌছলুম তখন সবে সন্ধ্যা, ঘরে ঘরে শাঁকের ধ্বনি ভেসে আসছে কানে। গাড়ী থেকে নামতেই দেখি গেটে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, একটু আশ্চর্য্য হলুম আমরা সবাই, কারণ আমার জ্যাঠামশাই অকৃতদার। মেয়েটি সলজ্জ নম্রভাবে এগিয়ে এসে মাকে প্রণাম ক'রে আমার বোন তটিনীর হাত ধরে বল্ল—আসুন ভিতরে, উনি একটু ভাল, ঘুমুচ্ছেন। মেয়েটির এই সলজ্জ অথচ সপ্রতিভ ভাব আমার বেশ ভাল লাগল।

"অমনি ভালবেসে ফেললে ত?" বলে উঠল মাঝখানে সুহৃদ।' দীপক সুহৃদকে চুপ চুপ বলে সুবোধকে বল্ল—তারপর?

সুবোধ বল্ল—'যাক, ওরা সবাই ঢুকে পড়লো জ্যাঠামশাইর ঘরে। একটি বিধবা মহিলাকেও দেখলুম সে ঘরে। আমি পাশের ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারটার মধ্যে গা এলিয়ে দিলুম।' সুহৃদ বল্ল—'ভাই যে ভাবে আরম্ভ করেছ তাতে শেষ হ'তে রাত হয়ে যাবে দেখছি।' সুবোধ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্ল—'কবে এত লক্ষ্মী ছেলে হয়েছ যে সন্ধ্যা হতেই বাড়ী যাও?' দীপক বল্ল—'যাক বল এখন।' 'কিছুক্ষণ বাদেই ওখানকার ডাক্তারবাবু এলেন। আমি উঠে তাঁর পিছনে পিছনে—গেলুম তিনি যা যা বল্লেন তার সারমর্ম্ম হচ্ছে যে, রোগটা হয়েছে বেরী বেরী এবং অবহেলার ফলেই নাকি খারাপ দিকে গিয়েছিল। অনেক রকম ঔষধ পড়েছে কিন্তু কোন উপকার লক্ষিত না হওয়ায় **'বাই-ভিটা-বি'** দিন সাতেক হ'ল দিচ্ছেন এবং তাতে কিছু কিছু উপকার দেখতে পাচ্ছেন। আমি কলকাতা নিয়ে আসবার প্রস্তাব করলুম কিন্তু রাস্তাঘাটের অসুবিধার জন্য ডাক্তারবাবু অমত করলেন। উপকার বেশ হয়েছে ঐ ওষুধে এবং এখনও চলছে। সবশুদ্ধ নিয়ে এসে পৌছেছি গেল শনিবার।

দীপক বল্ল—"সবাই মানে—রাজকুমারীকেও?"

সুবোধ—'হাঁ ভাই, মার কাছে শুনলুম ওদের দেখবার নাকি তিকুলে কেউ নেই।' মেয়েটির বাবা ঐ এষ্টেটেই কাজ করতেন। মারা গিয়েছেন অল্পদিন। সেই থেকে জ্যাঠামশাই ওর মাকে নিজের মেয়ের মত বাসায় নিয়ে এসেছিলেন।

সুহৃদ—'মেয়েটির নাম কি ভাই—'

'শুভ্রা' ব'লে সুবোধ থামল।

দীপক—'তা হ'লে'—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুবোধ নিজেই বল্ল—'হাঁ তটির কাছে শুনলুম তাকে নাকি চিরদিন যাতে রাখা যায় সেই রকমই বন্দোবস্ত হচ্ছে।'

পুস্তক-পরিচয়

পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। ২৪৩৷১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

এক একজন লেখক আসেন যাঁহাদের কাছে পাইবার সম্ভাবনা থাকে অনেক কিন্তু যাঁহারা দিয়া যান অল্প। বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র এমনি লেখক। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "পালামৌ"য়ের খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বইখানির মধ্যে এমনি একটি সাহিত্যরস আছে, রচনার সঙ্গে লেখক এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছেন যে "পালামৌ" চিরকাল পাঠককে আকর্ষণ করিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) হৃদয়ের অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোল রমণীই হৌক, বনসমাকীর্ণ পর্ব্বতভূমিই হৌক, জড় হৌক, চেতন হৌক, ছোট হৌক, বড় হৌক সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।" বঙ্কিম-সঙ্কলিত 'সঞ্জীবনী-সুধা'য়, যে কোন কারণেই হউক, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "পালামৌ"য়ের সর্ব্বশেষ অংশ স্থান পায় নাই। এই সংস্করণে সে অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সে হিসাবে, বলিতে গেলে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণেই "পালামৌ" সর্ব্বপ্রথম সুসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমানকালের পাঠক সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইয়া লাভবান হইবেন। পুস্তকে সঞ্জীবচন্দ্রের একখানি সুন্দর ছবি আছে।

অতঃ কিম্ ?—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ৩৫, বাদুড় বাগান রো হইতে রমেশ ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিনয়কৃষ্ণ বসু-চিত্রিত। মূল্য আড়াই টাকা।

এগারটি ছোট গল্পে বইখানি সম্পূর্ণ। শেষ গল্পটির নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে 'অতঃ কিম্'। কৌতুকে স্নিগ্ধ এবং হাস্যে সরস বলিয়াই বিভূতিভূষণের গল্পগুলি সর্ব্বজনপ্রিয়। এ পুস্তকেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 'খাদ্যবিজ্ঞানে' একটু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লেখক অদ্ভুত রস ফুটাইয়াছেন। 'ভূতনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা'র ভূতনাথ ও তাহার অনুচর রঙ্গীকে এবং 'মিসেস্ মুখার্জ্জি'র হনুমান তেওয়ারীকে পাঠক সহজে বিস্মৃত হইবে না। 'সখের বিপদে'র টেমী কুকুরকেও পাঠক ভুলিবে না। গল্পের গৌণ চরিত্র হইয়াও, 'ডান হাতে কোমরের কাপড় আর কোঁচার উপরের ভাগটা মুঠা করিয়া ধরা', বামহাতে ওভার-কোট, ছাতা, মোটা লাঠি, পাট-করা র‍্যাগ আর দীর্ঘ টর্চ লইয়া ট্রেন ধরিতে ধাবমান, স্থূলকায় গৌরকান্তি অতুলবাবু আমাদের স্মৃতিতে একটি পরিস্ফুট রেখাপাত করিয়া যায়। কিন্তু যে ছেলেটি 'মনুষ্য' সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাষ্টারের কাছে একটি বিশেষ আখ্যা পাইয়াছিল, যে লিখিয়াছিল, "মানুষ দুই পদের জন্তু। তাহার সামনের দুটিকে হাত বলা হয়, নতুবা সে চতুষ্পদ হইতে পারিত।...ইহাদের মাথায় শিং নাই, তবে রাজপুতানার দিকে একজাতীয় মানুষ পাওয়া যায় তাহাদের সিং বলে,"—তাহার খ্যাতি পাঠকের নিকট অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বইখানির ছবি আঁকিয়াছেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু। লেখার সহিত ছবিগুলি মানাইয়াছে ভাল।

ফরাসী গল্পগুচ্ছ—শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম-এ। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম. লাইব্রেরী। মূল্য এক টাকা বার আনা।

বইখানিতে উনিশটি ফরাসী গল্প আছে। প্রথম পাঁচটি দদের, বাকি-গুলি মোপাশাঁর। গল্প-সাহিত্যে; ফরাসীর স্থান অতি উচ্চে এবং ফরাসী গল্পে মোপাশাঁ এবং দদে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম গল্প দদের 'নক্ষত্ররাজি' একটি সুন্দর গীতিকবিতার মত। গ্রন্থকার মূল

ফরাসী হইতে গল্পগুলির অনুবাদ করিয়াছেন এবং মূলের সৌন্দর্য্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সব গল্পগুলির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রন্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয়। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। বইখানির বাঁধাই ভাল। অনূদিত গল্পগুলি পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম। প্রাপ্তিস্থান—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৫৭, মূল্য এক টাকা চারি আনা।

পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণে বইখানির বিষয়বস্তু ও উপাদেয়তা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'ছেলেদের' জন্য লিখিত হইলেও সকল বয়সের সাহিত্য-রসিক পাঠকই ইহা কৌতূহলের সহিত পড়িবেন এবং কবির কাব্যজীবনের অভিব্যক্তি ও কর্ম্মজীবনের পরিণতির সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিবেন। রবীন্দ্র-কাব্য হইতে প্রচুর উদ্ধৃতাংশ থাকায় বইখানি কবিবরকে বিশেষরূপে জানিতে ও চিনিতে ছেলেদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবে, ইহাই এই পুস্তকের বিশেষত্ব।

ছন্দশ্রী—শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য। ১৩বি লক্ষ্মী দত্তের লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৭০, মূল্য দেড় টাকা।

কবিতার বই। স্থানে স্থানে কবিতাগুলি পড়িতে ভাল লাগে। 'ভোরের আলো, ভোরের আলো, বনের যত পাখীর সুরে তোমার বাণী ফুটিয়ে তোলো,' 'নীল আকাশে ওই যে ভাসে মেঘের শতদল, কোন্ বিরহীর হবে বুঝি জমাট্-অশ্রুজল,' 'মেঘলোক হ'তে এসো ছায়াপথে মানসী-প্রতিমা যেও না ফিরে', এইরূপ লাইনগুলিতে কাব্যমাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

মানুষ আর প্রেম—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। পি, ৩৭৮ সাদার্ণ এভিন্যু, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

গল্পের বই। লেখক কবিধর্ম্মী। ইংরেজী এবং বাংলার মিশ্রিত এক তীক্ষ্ণ ভাষায় চারটি গল্প লিখিয়া প্রথম গল্পের নামে তিনি পুস্তকের নামকরণ করিয়াছেন এবং শেষ গল্পের শেষে নামের ভাষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ কবিধর্ম্মী মন যে অবাস্তব কল্পনার আশ্রয়ে লালিত হয় এই বইখানিতে তাহার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান।

চিন্তাশীলতা এবং প্রকাশ-শক্তির প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও পল্লবগ্রাহিতা এবং পরানুকরণস্পৃহা লেখকের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তথাপি আশা করিতেছি—উত্তরকালে লেখকের এই শক্তি উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবে।

হিরণ্ময়ী—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় লইয়া গ্রন্থকার নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। বাংলার তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র তাঁহার তুলিকায় ভালই ফুটিয়াছে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংলাপের মধ্যেও নাট্যকারের শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি আদৃত হইবে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়


এক মত...
"আমরা চাই এমন একটি কোল্ড ক্রীম যা লোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে, ত্বকের ভিতর ও বাহির সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে, সারা রাত মেখে থাকলে ত্বক পরিপুষ্ট হয়, যার গন্ধ সুমিষ্ট এবং ব্যবহার করলে খরচ অল্প হয়।"
"আমরা চাই এমন একটি ভ্যানিশিং ক্রীম যা লোমকূপ বুজিয়ে দেয় না, ত্বক নরম রাখে আর মাখতে আরাম আর মুখের তৈলাক্তভাব দূর করে এবং যাতে পাউডার ধরে ভাল।"
"আমরা সবাই একমত যে আমরা কেবল ষ্ট্যানিষ্ট্রীটেরই কোল্ড ও ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহার করবো; যা বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য তৈরী হয়েছে।"
ষ্ট্যানিষ্ট্রীট
কোল্ড ক্রীম
ভ্যানিশিং ক্রীম
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উপাদান থেকেই আমাদের প্রসাধন সামগ্রীগুলি সর্বদা প্রস্তুত করা হয়।
মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি লক্ষ্ণৌ অমৃতসর
SSK 85

শতাব্দীর অভিশাপ—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২া০।

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শৈলবিহারীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, এবং তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট তাঁর স্বাদেশিকতা। পূজা অর্চ্চনায়, খাওয়া-ছোঁওয়ার আচার-বিচারে তিনি রঘুনন্দনের কালের। পত্নী সুরুচিপ্রভা, পুত্র রমেন্দু ও কন্যা কনকলতাকে লইয়া পশ্চিমের কোন শহরে তিনি শান্তিতেই বাস করিতেছিলেন। বহুকাল পরে নেপাল-প্রবাসী পিতা নিকুঞ্জবিহারী ওরফে হালদার সাহেব এই সংসারে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের অন্ধসংস্কারকে আঘাত করিবার নেশা উনবিংশ শতাব্দীর যে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে অনাচারী করিয়া তুলিয়াছিল—হালদার সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। সাধারণতঃ বাবা মায়ের আচার-ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শৈলবিহারীর ছেলে ও মেয়ে দাদুর সংস্কারমুক্ত মনের অনুরাগী হইয়া পড়িল এবং তিনটি পুরুষের আচার-বিচার প্রভৃতির বৈষম্যে এই সংসারে রীতিমত সংঘাতের সৃষ্টি হইল।

কাহিনীর মোটামুটি এই সাহিত্যিক রূপটির অন্তরালে রহিয়াছে গভীর দেশাত্মবোধ। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশাত্মবোধের এই অগ্নি আহৃত হইলা যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে—বিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বমানবীয় মুক্তির ভিত্তিতে তাহা রূপ পরিগ্রহ করিলেও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি, লাঞ্ছনা বা দুঃখের অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে নাই। এই অভিশাপ বহনের পিছনে রহিয়াছে ভবিষ্যতের শান্তিময়ী ও হাস্যময়ী পৃথিবীর নবজন্মের পরিকল্পনা।

বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রীযুক্ত সরোজকুমারের নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বলিষ্ঠ কল্পনা ও অদ্ভুত লিপিসংযমের দ্বারা অভিশপ্ত যুগের মর্ম্ম-কথাটিকে তিনি নিপুণ ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কাহিনী কোথাও প্রচার-সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করে নাই, রসসৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।

চিন্তাশীল সুধী সমাজে যে বইখানি সমাদৃত হইয়াছে—দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইন্‌ডাস্‌ট্রি কোং—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—এক টাকা।

গল্প-সমষ্টি। নূতন লেখকের লেখা বলিয়া সাধারণতঃ গল্প পাঠের তেমন উৎসাহ বোধ করি নাই, কিন্তু প্রথম গল্পটি শেষ করিবার সঙ্গে বেশ একটু আগ্রহের সঞ্চার হইল। পর পর কয়েকটি গল্প পড়িলাম। অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার প্রণালী হইতে প্লটগুলিকে বাছিয়া লওয়ার দরুণ একটির সঙ্গে আর একটি গল্পের সাদৃশ্য হয়ত কিছু কিছু চোখে পড়ে, কিন্তু তরুণ লেখকের ক্ষমতা তাহাতে বিপন্ন হয় নাই। হাল্কা-তুলিতে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বেশ কৌতুকের সঙ্গেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কাহিনীতে রস-সঞ্চার হইয়াছে। সাধনা করিলে রস-রচনা ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান তিনি দখল করিতে পারিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ—শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৫২ ; মূল্য আট আনা।

জ্ঞান বা তত্ত্বের দিকটাই হইতেছে বিজ্ঞানের আসল লক্ষ্য। কিন্তু সাধারণ লোকেরা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটার সহিত যেরূপ পরিচিত জ্ঞানের দিকটার সহিত ততটা পরিচিত নহেন। এই পুস্তকখানিতে পদার্থ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিকটার বিষয় সাধারণের বোধগম্য করিয়া আলোচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে বিশ্ব-রহস্যের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানের ফলে জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং বিস্তৃতি সাধিত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের এই অনুসন্ধানের ফলাফল—বিশ্বজগতের উপাদান, জড় ও শক্তি, তেজ ও শক্তি, জড় ও শক্তির পরস্পর রূপান্তর, দেশ ও কাল, হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদ প্রভৃতি কয়েকটি বিভিন্ন অধ্যায়ে অতি সহজ এবং সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

পুস্তকের প্রারম্ভে 'বিজ্ঞানের পন্থা ও লক্ষ্য' শীর্ষক ক্ষুদ্র অধ্যায়টি অতি চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চলচ্চিত্র—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—'তরুণ সম্মিলনী', আলম বাজার। পৃঃ ৭২ ; মূল্য ছুই টাকা।

এক ধনী জমিদারের একমাত্র কন্যা সুলেখা তাঁহার বন্ধুপুত্র বিনয়ের পাল্লায় পড়িয়া কলিকাতায় গেল। বিনয় নৃত্যের পোষাকে সজ্জিত তাহার ছবিখানা দিল কাগজে ছাপিয়া। ছবিখানা নজরে পড়িবামাত্রই সুলেখা রাগে দুঃখে 'কুলহারা' (?) হইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রী। নাটকের শেষের দিকটা আরো চমকপ্রদ। ইহাতে গভীর অরণ্য আছে, কাপালিক ধরণের দস্যু আছে, যার 'প্রভু গিরিধারীলাল' পর্য্যন্ত আছেন। নাট্যকার এক জায়গায় নায়কের জবানিতে জানাইয়াছেন, "আর বেশী লিখে মূর্খের মত আর আত্মপ্রকাশ করবো না।"

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

চারুচন্দ্র গুহ

গত ১০ই বৈশাখ বর্দ্ধমান জিলার রায়না থানার সাঁকটায় গ্রামনিবাসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জন-হিতৈষী চারুচন্দ্র গুহ মহাশয় তাঁহার বর্দ্ধমানস্থ বাসভবনে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একটি আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি অক্লান্তকর্ম্মী ও মধুরভাষী ছিলেন। দুর্ভিক্ষ-নিবারণী, দামোদর বন্যা-প্রতিকার প্রভৃতি



চারুচন্দ্র গুহ

বিশিষ্ট জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ঐ জিলায় বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। গুহ মহাশয় জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয় এবং স্বামী ভোলানন্দ গিরিমহারাজের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৩০শে চৈত্র শ্রীযুক্ত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম এটর্ণী ছিলেন এবং গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিও তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৫



শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্ণী হইয়া প্রবেশ করেন ও ৪৯ বৎসর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষ যশ ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শশিশেখরবাবুর সাধুতা ও সদ্বিবেচনার উপর মক্কেলদের বিশেষ নির্ভর ছিল। আইনের ফাঁক লইয়া শশিশেখরবাবু কখনও কাহাকেও মকদ্দমা করিতে উৎসাহ দিতেন না বরং মিটাইয়া লইয়া বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পরামর্শ দিতেন। পল্লী উন্নয়নের কার্য্যেও তিনি তৎপর ছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর যাবৎ একাদিক্রমে কমলা হাইস্কুলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন, সিমলা সেবা-সমিতিরও সভাপতি ছিলেন।

কর্ম্মবীর আলামোহন জয়ন্তী

শিল্পনেতা শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের পঞ্চাশৎ বর্ষ প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সহকর্ম্মীরা হাওড়া দাশনগরে গত ১৬ই বৈশাখ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। উত্তরে দাশ মহাশয় যাহা বলেন তাহার প্রায় সমগ্র অংশ বিগত দুর্ভিক্ষ ও বাঙালীর বর্ত্তমান কষ্ট ও দারিদ্র্যের আলোচনায় পূর্ণ ছিল। কয়েকটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমি সর্ব্বপ্রথমে আমার তর্পণ জ্ঞাপন করিতেছি আমার সেই লক্ষ লক্ষ অশরীরী ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে যাহারা এই সেদিন মাত্র দুর্ভিক্ষে নিঃশব্দে প্রাণ বলি দিয়া বাংলার চিরন্তন দুঃখ ও দারিদ্র্যকে অমর স্মৃতির রূপ দিয়া গেল।

এইবার আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি একটি জীবন্ত বাঙালীকে যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মজীবনে সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। এই তীর্থপ্রতিম অমর

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যিনি ভক্তের সকল সাধনায় প্রীত ভগবানের মত স্বয়ং আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পদরেণু স্পর্শে এই দাশনগরকে পবিত্র করিয়া আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন।

আজ আমার এই জন্মতিথি উৎসবে আমার এই কথাই মনে হইতেছে যে, যে বাঙালী জাতির কল্যাণে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার জীবন সংরক্ষণের জন্য আমরা কি করিয়াছি এবং কি করিতেছি। আমার এই প্রশ্ন মোটেই অবাস্তর নহে, কারণ এই ভাবের ভাবুক আর এক জন বিরাট বাঙালী আপনাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত, সেই সার্থকনামা শ্যামাপ্রসাদ যিনি জন্মগ্রহণ না করিলে হয়ত বিগত দুর্দ্দিনে লক্ষ লক্ষের পরিবর্ত্তে কোটি কোটি বাঙালী মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত। তিনিও যুবক বাংলার নিকট এই প্রশ্নেরই উত্তরের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে শুধু এক কাপড়ের জন্যই বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকা বাংলার বাহিরে চালান দিয়াও লজ্জা অনুভব করিতেছি না। এক চিনির জন্য বৎসরে সাড়ে ছয় কোটি টাকা অ-বাঙালীর দেশে পাঠাইয়াও আমরা জীবনকে তিক্তবোধ করিতেছি না। এদেশের পাটকলগুলি বৎসরে বহু কোটি টাকার মাল বেচিতেছে। ইহার মধ্যে বাঙালীর পাটকলের স্থান টাকায় এক আনাও নহে। হতভাগ্য বাঙালী কৃষকের যৎসামান্য মজুরি বাদ দিলে বাকী মোটা অংশ অ-বাঙালীর পকেটে চলিয়া যাইতেছে।"

আমরা যতদূর জানি গত দুর্ভিক্ষে শ্রীযুক্ত আলামোহনের দান এক লক্ষ টাকার কম হইবে না। তাঁহার ৫০০০ কর্ম্মচারীর মধ্যে ৪৭০০ জন বাঙালী। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্য পাটকলগুলিতে বাঙালী নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে এখনই তিন লক্ষ বাঙালীর কাজ হয়। পঁয়ত্রিশ জন বাগ্দী, হাড়ী দরওয়ানকে তিনি শুর্খার সঙ্গে রাখিয়া সুশিক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। কলিকাতায় ও অন্যত্র সকলে যদি বাঙালী বাগ্দী, হাড়ী দরওয়ান রাখেন তাহা হইলে এই সকল দুঃস্থ সম্প্রদায় এখনই বাঁচিয়া যায়। তাঁহার পাটকল তিনি আগাগোড়া একশ জন বাঙালী রাজমিস্ত্রীর দ্বারা তৈয়ারী করিয়াছেন। ইহাদের নব্বই জন বাঙালী মুসলমান ছিল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

বিদেশ

ব্রিটেনে অন্ধদের শিক্ষা

ভেলেনটিন হয় নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোকই অন্ধদের শিক্ষার অগ্রদূত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে অন্ধ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য দেশের অন্ধ-হিতৈষীরাও অনুপ্রাণিত হন এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্গত লিভারপুলে অন্ধ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে সে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চারিটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আরও যোলটি বিদ্যালয় খোলা হয়। পাঁচ হইতে যোল বৎসর পর্য্যন্ত সকল অন্ধ বালকই যাহাতে উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ বালকদের শিক্ষার উন্নতিকামী শিক্ষকদের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহাতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে ৫ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অন্ধদের সংখ্যা ছিল ১৪০০, এবং ১৬ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত অন্ধ যুবকদের সংখ্যা ছিল ১১০০। বর্ত্তমান কালে অন্ধদের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত তিন প্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। (১) পাঁচ বৎসরের নিম্ন-বয়স্কদের জন্য শিশু-বিদ্যালয়, (২) পাঁচ হইতে যোল বৎসরের ছাত্রদের জন্য সাধারণ শিক্ষার স্কুল, (৩) যোল হইতে কুড়ি বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী শিক্ষা দান করিবার প্রতিষ্ঠান। তা ছাড়া অন্ধ ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা বিদ্যালয়ও আছে যেখানে তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভের উপযোগী শিক্ষাদান করা হয়। সম্পূর্ণ ভাবে ব্রেইল (Braille) পদ্ধতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শিখানো হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকারই অনুরূপ। ছাত্রছাত্রীদের শারীর-চর্চ্চা শিখাইবার জন্যও বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

বৃত্তি-শিক্ষা তালিকার মধ্যে, সঙ্গীত, শর্টহাণ্ড ও টাইপ-রাইটিং, জুতা মেরামত, বাস্কেট, মাদুর ইত্যাদি নির্ম্মাণ, এই কয়টিই প্রধান।

বিদ্যালয়গুলির কার্য্য শুধু শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। অন্ধরাও যাহাতে জীবনের আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে স্কুলের বাহিরে তাহাদের জন্য সাহিত্য-সমিতি স্থাপন, লোক-নৃত্য শিক্ষা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অন্ধদের সেবায় অবহিত হইবার প্রয়োজনীয়তা গ্রেট ব্রিটেনে আজ বিশেষ ভাবেই উপলব্ধ হইয়েছে।

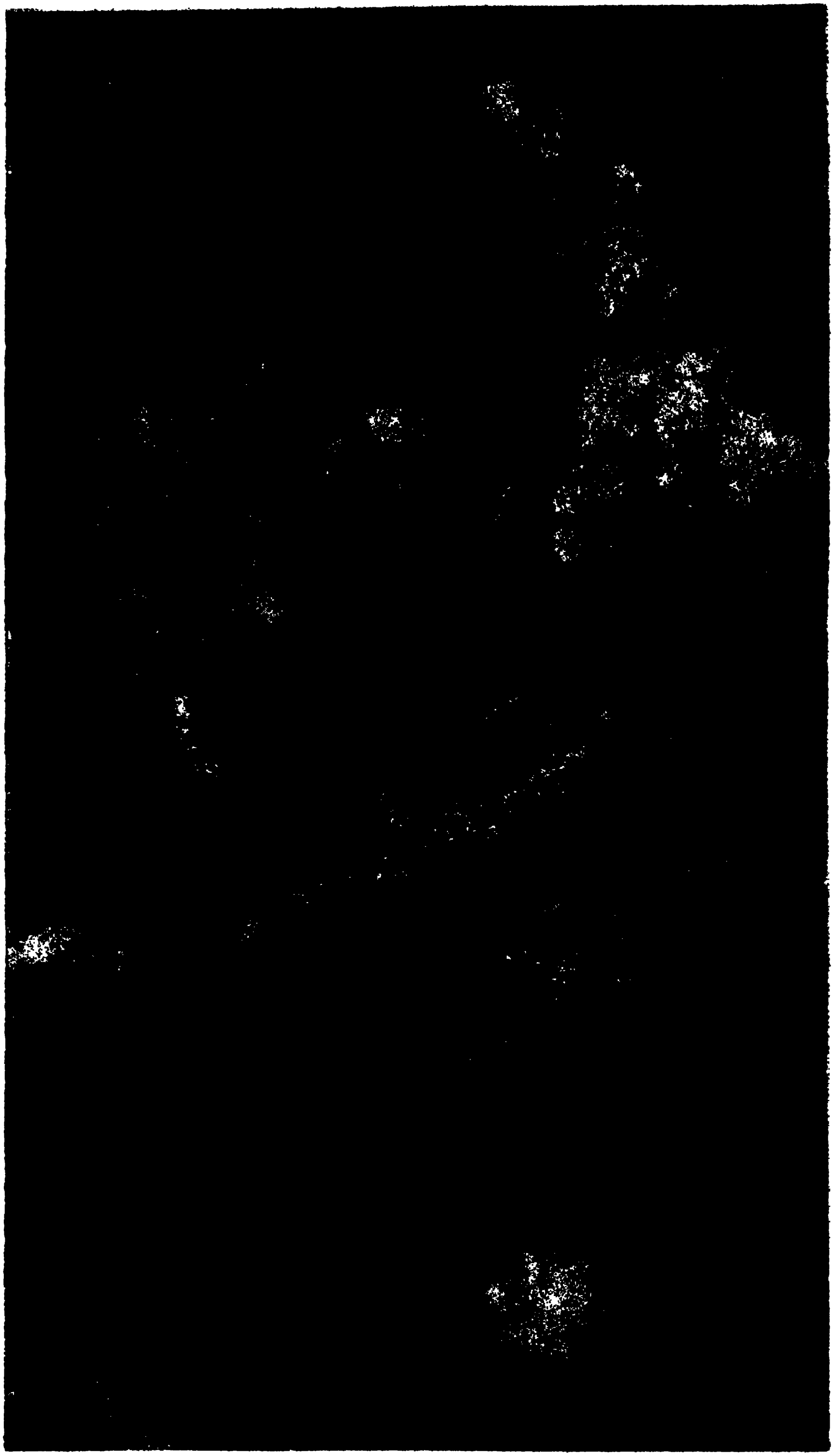
ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৫১ :

পৃষ্ঠা	পাটি	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১	৫	আবশ্যক	অনাবশ্যক
৩	১	৯	সুপ্ত অবস্থা	লুপ্ত আস্থা
১০	২	৩৫	আবশ্যক	অনাবশ্যক
১৪-৫	...	...	হাসেম আলি	হাতেম আলি

গত বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'বারাণসীর লোক-শিল্প' নামক প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি শ্রীযুক্ত শৈলজ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিব

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা । শ্রীবিশ্বমোহন সেন

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৫১ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ণবৈষম্যের বিষময় ফল

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মাদ্রাজে এক জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন:—ভবিষ্যৎ কোনও শান্তি বৈঠকে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের যাঁহাদের উপর আস্থা আছে এরূপ নেতাদের অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরুকে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিত্ব করিতে না দেওয়া হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে কোনও সুযোগ প্রদান করিতে আদৌ স্বীকৃত নহে। তাহারা নানারূপ অজুহাতে ভারতবর্ষের প্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়াই রাখিতে চাহে।

সভ্য পৃথিবী হইতে বর্ণবৈষম্য দূর করার প্রয়োজন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বলেন, উহাই শান্তি বৈঠকের সর্বপ্রধান সমস্যা, কারণ জাতিবিদ্বেষ হইতে ভবিষ্যতে যে সংগ্রাম সুরু হইতে পারে তাহাতে যুদ্ধের ভয়াবহতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। ভারতবর্ষ বর্তমানে এমন একটি রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে চলিতেছে, যাহাতে মুষ্টিমেয় এক শ্বেত জাতি বহুসংখ্যক কৃষ্ণকায় ভারতীয়ের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। এই অবস্থার অন্তর্নিহিত উত্তাপ ভারতের রাজনীতি ও প্রগতিকে সর্বদাই একটি বিপ্লব ও বিস্ফোরণের সম্মুখীন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শ্বেতকায় ব্রিটিশ জাতি ইহার গুরুত্ব যে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং ব্রিটেনকে উদ্দেশ্য করিয়া এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, "তাঁহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের এই আত্মবিস্মৃতি ভাঙিবে এবং তখনও যদি তাহাকে বর্ণবৈষম্যের এই অপমানকর বেড়াজাল দিয়া ঘেরিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।"

শুধু ভারতবর্ষের নয়, ভারতের বাহিরেরও অনেক মনীষী এবং রাজনীতিবিদ্ প্রাচ্যের সহিত যথার্থ বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বর্ণবৈষম্য দূর করিতে ইউরোপ এবং আমেরিকাকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বেই মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকী পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া লিখিয়াছিলেন: "প্রাচ্যের ঘটনাবলী, প্রাচ্যদেশবাসীর মনোভাব, তাহাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্বেতকায় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বে তাহাদের আস্থাহীনতা, স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের আকাঙ্ক্ষা—এ সকলই আমাদিগকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।"

—

ঢাকার দাঙ্গা

বৎসর তিনেকের নীরবতার পর ঢাকা শহরে পুনরায় দাঙ্গা সুরু হইয়াছিল। বর্তমানে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে এবং শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দীন পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা দাঙ্গা বন্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদকেও এই অভিপ্রায় তিনি জানাইয়াছেন। পাইকারী জরিমানা ধার্য্য সম্বন্ধে ঢাকা পিপ্‌লস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাস ও ঢাকা শহর হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাস যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। বিবৃতিটি এই:

ব্যবস্থা-পরিষদে বিবৃতি দিবার কালে সর্ নাজিমুদ্দীন এইরূপ উক্তি করিয়াছেন যে, তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় শান্তি

কমিটির সদস্যগণকে বলিয়া দিয়াছেন যে, ঢাকায় পাইকারী জরিমানা ধার্য হইবে। তিনি যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু আমরা ঐরূপ পন্থা অবলম্বনের বিরোধিতা খুব দৃঢ়ভাবে করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, পাইকারী জরিমানা ধার্য দ্বারা নিরপরাধ ব্যক্তিদিগেরই শাস্তি বিধান করা হয়। এইরূপ নীতি নির্বিচারে গ্রেপ্তার করার নীতির মতই নিস্ফল হইবে এবং যে সময় চাউল অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, সেই সময় এইরূপ নীতির অনুসরণ করিলে লোকের উপর জুলুম করা হইবে ও ইহার ফলে জনসাধারণের সহানুভূতি নষ্ট হইবে।

ডাঃ হৃষীকেশ ধর, ডাঃ এস, কে, সেন ও মিঃ সূর্যকুমার বসু এ বিষয়ে আমাদিগের সহিত একমত ছিলেন। শুধু ঢাকা জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস. এ. সলিম, এম-এল-এ ও পাব্লিক প্রসিকিউটর মিঃ সুলতানউদ্দীন আমেদ, এম-এল-সি, পাইকারী জরিমানা ধার্য করার নীতি সমর্থন করিয়াছেন।

পাইকারী জরিমানা আদায় করিয়া দাঙ্গা বন্ধের চেষ্টা আমরা অতিশয় অবিচারমূলক বলিয়া মনে করি। ইহাতে আসল অপরাধীর অথবা তাহার উৎসাহদাতার শাস্তির অতি সামান্য সম্ভাবনা মাত্র থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং দাঙ্গাবিরোধী বহু ব্যক্তি ইহাতে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হন। বহু নিরপরাধের দণ্ড বিধান করিয়া একজন অপরাধীর শাস্তি-দানের চেষ্টা ন্যায়নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা দ্বারা প্রচলিত গবর্ন্মেণ্টের উপর নাগরিকদের আস্থা কমিয়া যায়। ঢাকা এমন কিছু বিরাট্ শহর নহে। সেখানে পরস্পরের দৃষ্টিগোচর স্থানে এক এক দল করিয়া পুলিস মোতায়েন করিয়া এবং লরীবাহী সশস্ত্র ভ্রাম্যমাণ পুলিস নিযুক্ত করিয়া দাঙ্গা বন্ধ করা যায় না ইহা অবিশ্বাস্য। বিচারাদালতে এমন কি ঘটনাস্থলেও দাঙ্গাকারীদের উপর কঠোরতম দণ্ড প্রযুক্ত হইলেও আমরা আপত্তি করিতাম না। কিন্তু পাইকারী জরিমানা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। জরিমানা ধার্য এবং আদায় উভয়ই সরকারী কর্মচারীদের অভিরুচির উপর নির্ভর করে এবং ইহাতে হিন্দু-মুসলমানে তারতম্য ঘটিবার সম্ভাবনাও থাকিতে পারে। পাইকারী জরিমানায় দাঙ্গা বন্ধ হইলে গত দাঙ্গার পর এবার আর উহা ঘটিত না। গবর্ন্মেণ্টের ন্যায়বিচারের উপর জনসাধারণের বিরূপ ধারণা জন্মিতে পারে এরূপ কোন কাজ কোন সময়েই হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; বর্তমান সঙ্কটকালে উহা সর্বথা বর্জনীয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে মুসলমান দৈনিকের মন্তব্য

বাংলার সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী উদারমতাবলম্বী মুসলমানদের দৈনিক মুখপত্র 'নবযুগ' মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের মূলে দুইটি শক্তির কঠোর সাধনা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম—খ্রীষ্টান মিশনরী; দ্বিতীয়—বাঙালী হিন্দু। সুতরাং শিক্ষার সংস্কার করিবার বেলায় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষাবিদ্, তাঁহাদের সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিয়া কাজ করায় ক্ষতি ত নাই-ই, বরং যথেষ্ট লাভ রহিয়াছে। রোগে হিন্দু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের এবং মামলায় হিন্দু আইনজ্ঞের আশ্রয় লইলে যদি দোষ না হয়, তবে মানব-জীবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা-সংস্কারের বেলায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় অথবা সেইরূপ আরও যে সকল হিন্দু শিক্ষাবিদ্ রহিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মোটেই না শুনিবার প্রবৃত্তি আসে কোথা হইতে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য হইয়া রহিয়াছে। আমাদের এই যুক্তি যে সত্য বৃহস্পতি-বারের সিনেট সভার রিপোর্ট হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সিণ্ডিকেট যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার নিকট উপস্থিত করিলে সেখানে ৩৪—৬ ভোটে উহা গৃহীত হইয়াছে। স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ক্যামেরণ এবং বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সি. এফ. বল—সিনেটের দুই জন খ্রীষ্টান সদস্যও উহার পক্ষে ভোট দিয়াছেন। তা ছাড়া বাংলা-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব সহকারী ডিরেক্টর খান বাহাদুর তছাদ্দুক আহমদ ও মেজর দবীরুদ্দীন আহমদ সাহেবদ্বয়ও উহার পক্ষে ভোট দিয়াছেন।"

শিক্ষাকল্পে মুসলমানদের দান সম্বন্ধে 'নবযুগ' লিখিয়াছেন :

"হায়দ্রাবাদের ডাঃ হামেদ আলী সাহেব দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তের লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি একজন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন এবং সামান্য বেতনে চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে বেতন বৃদ্ধি হইয়া পনর শত টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। এইরূপ একজন লোক শিক্ষার জন্য তের লক্ষ টাকা দান করায় বুঝা যাইতেছে গোড়া হইতেই তিনি মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া অতিকষ্টে এই তের লক্ষ টাকা জমাইয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহা সমাজের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন।

হিন্দু সমাজে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু মুসলমান সমাজে উঁহাকে একমাত্র দৃষ্টান্ত বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যে সমস্ত লোক মুসলমানের নাম ভাঙাইয়া মন্ত্রিত্ব করিয়া দুই হাতে টাকা লুটিতেছেন, অনেকে মাসিক পাঁচ-ছয় হাজার টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া ব্যাঙ্ক-ব্যালান্‌স্‌ বাড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু সমাজের নামে এক কড়াও দিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের তুলনায় ডাঃ হামেদ আলীর স্থান যে কত উচ্চে, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। অথচ এই নীরব দাতা কখনও সমাজের নেতৃত্বের দাবী করেন নাই, অথবা সমাজ-কল্যাণের ঢোল পিটাইয়া বেড়ান নাই। আমাদের মনে হয়, হাজী মোহসিনের পর ভারতীয় মুসলমান সমাজে তাঁহার ন্যায় আর কোন দাতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

—

লীগের স্বরূপ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মুসলমানদের ধারণা

সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মুসলমানেরা লীগ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন, 'নবযুগে'র নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'হেলাল' নামক আর একটি মুসলমান পরিচালিত পত্রিকার মন্তব্যও উহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানেরা বিচারবুদ্ধির দ্বারা লীগ নেতাদের কার্যকলাপের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা আশার কথা। 'নবযুগ' লিখিয়াছেন :

'বিখ্যাত লীগ-নায়ক ডক্টর কাজী আবদুল হামিদ সাহেব এবং আলীগড়ের অপর অনেক লীগ-নেতা বলিতেছেন যে, '১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের পর হইতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট একবার হিন্দুর পক্ষ লইয়া মুসলমানকে জব্দ আর একবার মুসলমানের পক্ষ লইয়া হিন্দুকে জব্দ করার ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহারা বলিতেছেন যে, 'পঞ্জাবের ঘটনার পর লীগ যে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাতে চাকুরী ও পদলোভী ব্যক্তিদিগকে লীগ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।' লীগনায়কদিগের ঐ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সহযোগী 'হেলাল' মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'চাকুরী ও পদলোভী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদিগকে লীগ হইতে বহিষ্কারের কথা শুনিয়া আমাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে 'আলহাম্‌দ লিল্লাহে' ধ্বনি ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সেই মহৎ কার্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে লীগের যে লোম বাছিতে কম্বল উজাড় এবং ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়ের দশা হইয়া পড়িবে, কাজী সাহেবরা তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ধন, মান ও যশ-খ্যাতির আশায় যে সমস্ত মুসলমান পুরুষানুক্রমিক ভাবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের তল্পিদারী করিয়া আসিতেছেন, তাদেরকে লইয়াই ত লীগের যত কিছু পশার-প্রতিপত্তি। সুতরাং তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে লীগের অস্তিত্বই যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। চাকুরী, খেতাব ও পদলোভীদিগকে লীগ হইতে তাড়াইতে চাহিলে সর্বাগ্রে সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার লীগমার্কা মন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের সমর্থক অনেক সদস্যকেও লীগ হইতে তাড়াইতে হইবে। কারণ তাঁহারা যে লীগের কলমা পড়িতেছেন, সে কেবল মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য সুযোগ লাভের সুবিধা বুঝিয়া। সুতরাং ত্যাগের প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে তাড়াইবারও প্রয়োজন হইবে না—তাঁহারা আপনাআপনি লীগ হইতে খসিয়া পড়িবেন।"

—

দুর্ভিক্ষের পর বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুর্ভিক্ষের পর বাংলার বিভিন্ন জেলায় রোগের প্রকোপ কি ভাবে বাড়িয়াছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের মূল বক্তব্য এই :

দুর্ভিক্ষের পর বাংলাদেশে সংক্রামক ব্যাধির ভীষণ প্রকোপ সুরু হইয়াছে। এমন একটি জেলাও নাই, যেখানে ইহা ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই। গবর্মেণ্টও বাংলাদেশের অন্যূন পক্ষে ১৮টি জেলায় কলেরা ও বসন্ত সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে যাঁহারা সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হিসাবে বাংলার অন্ততঃ দুই কোটী লোক আজ রোগগ্রস্ত। বসন্তের আক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কলেরার প্রকোপ মধ্যে একটু ভাটা পড়িয়াছিল, কিন্তু আবার তাহা রুদ্র আকার ধারণ করিয়াছে। কোনও অঞ্চলে ম্যালেরিয়া উপশমের কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ততঃ কতকগুলি জেলায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা নিশ্চিত ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের বেশী এবং নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর ও মেদিনীপুরে শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ লোক আজ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

সেবা-নিয়ন্ত্রণ সমিতির প্রচেষ্টায় আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেবাব্রতীদের মধ্যে অধিকতর যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রায় ৭০টি সুনিয়ন্ত্রিত ভাগে বিভক্ত হইয়া তাহারা গত তিন মাসের মধ্যে অন্ততঃ ১০ লক্ষ পীড়িত দুঃস্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বাংলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূরীকরণের পক্ষে ইহাদের চেষ্টা পর্য্যাপ্ত নহে।

প্রথমতঃ কুইনিনের কথাই উল্লেখযোগ্য। গবর্মেণ্ট বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য এ পর্য্যন্ত ১,২৪,০০০ পাউণ্ড কুইনিন মাত্র বরাদ্দ দিয়াছেন এবং খুব কম করিয়া ধরিলেও বাংলার বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে ২৩০,০০০ পাউণ্ড কুইনিনের প্রয়োজন। জেলা কর্ত্তৃপক্ষের হাতে বহু কুইনিন মজুদ থাকিলেও বিতরণ সম্পর্কে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় বলিয়া সেবাদলগুলির পক্ষে কুইনিন জোগাড় করা সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গন্ধকের অভাবে সংক্রামক খোস পাঁচড়া চিকিৎসা অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বসন্তের টীকা সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে লীম্ফগুলি এতই নিয়ন্তরের সরবরাহ করা হইতেছে যে, তাহার ফলে বসন্ত বাধা মানিতেছে না।

এই সব সমস্তা সমাধান করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন এবং গবর্মেণ্ট ও জাতির সমবেত চেষ্টায় যদি বাংলার পীড়িত দুঃস্থদের এই সব সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করা না যায়, তাহা হইলে 'অধিক খাদ্যশস্য ফলাও' আন্দোলন জোরে চলিতে থাকিলেও বাংলার শস্যক্ষেত্রগুলি শ্মশানে পরিণত হইবেই।

ঔষধের, বিশেষতঃ কুইনাইনের অভাব সম্বন্ধে বহুবার গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য ফল যে উহাতে হয় নাই, ডাঃ রায়ের বিবৃতি তাহার সর্বশেষ নিদর্শন। ডাঃ রায় সম্প্রতি বোম্বাই, সিন্ধু, পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বাংলার বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনে বহু সাহায্য আসিয়াছে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, খোস-পাঁচড়া প্রভৃতির জন্য যে-সব সাধারণ ঔষধ আবশ্যক, বাংলাদেশে অনায়াসেই তাহা প্রস্তুত হইতে পারিত ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তবে সরকার নিষ্ক্রিয় থাকিলে অথবা প্রয়োজনীয় সাহায্য না দিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা মাত্র করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সম্ভব নহে।

—

চাউলের মূল্য

ধান ও চাউলের মূল্য হ্রাস ঘোষণা করিয়া গত ৬ই জুন নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :

ধান ও চাউলের মূল্য আরও সাধ্যায়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য সরকারের বিঘোষিত নীতি অনুসারে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হইতে ধান্য ও চাউলের উর্দ্ধতম পাইকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য আরও হ্রাস করা হইবে। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিতভাবে ধান্য ও চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে : বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়া ও মালদহে চাউল কলগুলি ব্যতীত পাইকারী ব্যবসায়িগণ ১৩ টাকা ১২ আনা ও কৃষকগণ ১৩ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারে। পাইকারী ব্যবসায়িগণ ৭ টাকা ১২ আনা ও কৃষকগণ ৭।০ মণ দরে ধান্য বিক্রয় করিতে পারে। অবশিষ্ট জিলাগুলিতে চাউল কল ব্যতীত পাইকারী ব্যবসায়িগণ মণপ্রতি ১৪ টাকা ১২ আনা ও কৃষকগণ ১৪ টাকা দরে চাউল এবং পাইকারী ব্যবসায়িগণ ও কৃষকগণ যথাক্রমে ৮।০ আনা ও ৮ টাকা মণ দরে ধান্য বিক্রয় করিতে পারে।

সরকার ১৯৪৪ খ্রীব্দের ১৫ই জুন হইতে ধান্য ও চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিম্নলিখিতরূপে হ্রাস করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন :— উপরোক্ত জেলাগুলিতে চাউল কলগুলি ব্যতীত ব্যবসায়িগণ সাড়ে ১৩ এবং কৃষকগণ কর্ত্তৃক ১২ টাকা ১২ আনা মণ দরে চাউল বিক্রয় ; ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক সাড়ে ৭ এবং কৃষকগণ কর্ত্তৃক ৭ টাকা ৪ আনা মণ দরে ধান্য বিক্রয়। অবশিষ্ট জেলাগুলিতে ধান্য ও চাউলের মূল্য অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

এই নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য গ্রহণ করিলে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।—এ. পি.

এই ইস্তাহার প্রকাশের সাত দিন পূর্বে ৩০শে মে দৈনিক বসুমতী ইউনাইটেড প্রেস প্রদত্ত সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেখান যে, (১) সিরাজগঞ্জে চাউলের দাম ১৯।২০ টাকা মণ, (২) চাঁদপুরে ২১ হইতে ২৩ টাকা মণ এবং (৩) নারায়ণগঞ্জে বালাম চাউল অপ্রাপ্য, আতপ চাউল ৩০ টাকা ও সাধারণ চাউল ১৮ টাকা মণ।

—

চট্টগ্রামে চাউলের মূল্য

ইস্তাহার প্রকাশের পর দিন ৭ই জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে চট্টগ্রামে চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি মূলতুবী প্রস্তাব আনীত হয়। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা প্রস্তাবটি আনেন কিন্তু স্পীকার উহা উত্থাপনের অনুমতি দেন নাই। কয়েক দিন পূর্বে চট্টগ্রামের খাঁ বাহাদুর বদী আমেদ চৌধুরীও অনুরূপ প্রস্তাব আনিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনিও উহা উত্থাপনের অনুমতি পান নাই। ৭ই জুন ব্যাপারটি চরমে উঠে এবং খাঁ বাহাদুর বদী আমেদ চৌধুরী স্পীকারের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। তিনি পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করিতে অসম্মত হন এবং প্রথমে তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য দশ মিনিট, পরে করজোড়ে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় প্রার্থনা করেন। স্পীকার সময় দিতে অস্বীকার করিলেও তিনি বক্তব্য বলিতে থাকেন, অতঃপর স্পীকারকে অমান্যের অভিযোগে তাঁহাকে পরিষদকক্ষ ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হয়। চৌধুরী সাহেব বলেন :

"এই পরিষদে গত দেড় মাস হইতে দুই মাস বাজে কথায় দিন কাটান হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সদস্যদিগের জন্য এক ভাতা বাবদই দৈনিক ৩২৫০ টাকা ব্যয়িত হইতেছে। এক মাসে ১০০৭৫০ টাকা ব্যয় হয়। ইহার পর সদস্যদিগের বেতন, সচিবদিগের ও স্পীকারের বেতন, ভাতা প্রভৃতি ত আছেই। এই অবস্থায় বাজে কথার জন্য সময় দেওয়া হইতেছে অথচ আমরা কাজের কথা বলিতে পারিব না। দেশের লোক মারা যাইতেছে, অথচ আমার দেহে রক্তমাংস থাকিতেও আমি দেশের কথা বলিতে পারিব না। চট্টগ্রামে চাউলের দর অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে ; বাংলার কোন স্থানে এরূপ অবস্থা নাই। আমাকে বহিষ্কৃত করার আদেশ হইতেছে ; কিন্তু এই পরিষদের সদস্যদিগের অধিকার কতটুকু তাহা জানিবার জন্য সেক্রেটারীকে আমি পত্র দেই। তিনি আমাকে জানান নাই। আমাকে বাহির করিয়া দেওয়া হউক, আইন থাকিলে স্পীকার আমাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমি দেশের দুঃখের কথা বলিবই বলিব।

"যদি আমাকে পরিষদ-গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হয়, তথাপি আমি আমার নির্বাচন কেন্দ্রে লোকের দুর্দশা বিবৃত করিতে বিরত হইব না—আমার শিরায় এক বিন্দু রক্ত থাকিতে তাহা হইবে না। আপনারা যে মাস কোন কাজ না করিয়া কাটাইয়াছেন এবং পরিষদের সদস্য-দিগের বেতন বাবদেই দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন; অথচ আপনারা চট্টগ্রামের লোকের দুর্দশার বিষয় বলিবার জন্য আমাকে পাঁচ মিনিট সময়ও দিবেন না। আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারেন—আমার রক্ত মোক্ষণ করাইতে পারেন, কিন্তু আমি আমার নির্বাচন-কেন্দ্রের লোকের দুর্দশা বর্ণনা করিতে বিরত হইব না।"

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ আলোচনার উপর নানাবিধ বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে। অথচ বর্ত্তমান মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, জনমতের তাড়ায় বাধ্য না হইয়া আজ পর্য্যন্ত কোন বড় কাজ তাঁহারা স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংবাদপত্রে এবং ব্যবস্থা-পরিষদে তীব্র আন্দোলন না হওয়া পর্য্যন্ত—(১) দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতার রাজপথে মৃতপ্রায় বুভুক্ষু ব্যক্তিদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় নাই এবং (২) রাজপথ হইতে মৃতদেহ অপসারণের আয়োজন হয় নাই। (৩) রেশনিং আরম্ভ হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার রেশনিং প্রবর্ত্তনের তারিখ স্থির করিয়া বাংলা-সরকারকে ভারত-শাসন আইন অনুসারে আদেশ দিবার পর তবে তাঁহারা উহা করিতে পারিয়াছেন। এবং জনমতের চাপের ফলেই (৪) রেশনের দোকানের অতি নিকৃষ্ট চাউলের কতকটা উন্নতি হইয়াছে। (৫) নির্ব্বিচারে যে দুগ্ধবতী গাভী ও হালের বলদ হত্যা চলিয়াছিল তাহা কতকটা কমিয়াছে। (৬) রোগে চিকিৎসার জন্য অপর্য্যাপ্ত হইলেও কিছু কুইনাইন সরকারী গুদাম হইতে বাহির হইয়াছে। (৭) দুর্ভিক্ষোত্তর চিকিৎসার যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন হইয়াছে। জনমতের এবং জনসাধারণের প্রয়োজনের সহিত মন্ত্রীরা যে তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই, উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনাই তাহার পরিচয় দানের পক্ষে যথেষ্ট।

হুকুমের জোরে ব্যবস্থা-পরিষদ এবং সংবাদপত্রকে দেশের সমস্যা আলোচনায় বঞ্চিত রাখিলে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে মন্ত্রীদল আজ পর্য্যন্ত সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে সর্বদা জনমতের চাপে জাগ্রত না রাখিলে কাজ পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। মিথ্যা বা আতঙ্কজনক সংবাদ প্রচার গর্হিত ও দণ্ডনীয় বটে, উহার প্রতিবিধানের পর্য্যন্ত উপায়ও গবর্ন্মেণ্টের হাতে রহিয়াছে। কিন্তু সত্য সংবাদ প্রচারে বাধাদান করিলে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সঙ্কটজনক সময়ে যখন প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামের সঠিক সংবাদ গবর্ন্মেণ্ট এবং দেশবাসী উভয়েরই জানা আবশ্যক, সেই সময়ে সংবাদ প্রচারে অনাবশ্যক কঠোরতা অবলম্বিত হইলে দেশের ক্ষতি অনিবার্য্য।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আলোচনায় বাধা

মাদ্রাজের 'হিন্দু' লিখিতেছেন :—

"মাদ্রাজের কংগ্রেসকর্মিগণ ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে—বিশেষতঃ গান্ধীজীর মুক্তি সম্বন্ধে—সভা আহ্বান করিতে মাদ্রাজের পুলিস কমিশনরের সম্মতি পান নাই। এইরূপ সভা এই প্রদেশে ও অন্যান্য স্থানেও অনুষ্ঠিত হইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। অতএব এই ক্ষেত্রে অনুমতি না দেওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। মুক্ত কংগ্রেস-কর্মীদিগের পক্ষে এই সভা অনুষ্ঠানের কোনই বাধা থাকিতে পারে না এবং মাদ্রাজে যদি কোন রাজনীতিক সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ থাকে, বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী সে নিয়ম প্রত্যাহার করা উচিত। মিষ্টার আমেরী ও অন্য রাজকর্ম-চারীদিগের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণ কংগ্রেস-নেতৃবর্গের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু তাঁহারা কারারুদ্ধ কংগ্রেসকর্মীদিগের সহিত রাজনীতিক নেতৃবর্গের সাক্ষাৎ-কারের অনুমতি পর্য্যন্ত দেন নাই। মিষ্টার আমেরী ভারতবর্ষের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের উপর বরাত দিয়াছেন; বড়লাট ব্রিটিশ সরকারের পন্থা অনুসরণ করিয়া নানা অজুহাত দেখাইয়া কিছুই করিতেছেন না। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীন না হওয়ার অপরাধ তাহার নিজের। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন পর্য্যায়ে প্রবেশ করিলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে তাহার একটা বিশেষ অংশ থাকিবে। ইঁহারা মনে করেন, ভারতের রাজনীতিক কর্মতৎপরতার জন্য সরকার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য রাজনীতিক কর্ম-তৎপরতা তাঁহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই কারণের জন্যই, গান্ধীজীর মুক্তিতে দেশের মন যেরূপ অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা তাহার সুযোগও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গান্ধীজীর সেক্রেটরী বলিয়াছেন, গান্ধীজীর মুক্তির পশ্চাতে কোন রাজনীতিক কারণ নাই। সরকারের এই-রূপ কার্যপ্রণালী ধন্যবাদের যোগ্য নহে। যাহাতে নির্দিষ্ট গঠনমূলক কার্য্যের মধ্য দিয়া অচল অবস্থা দূর করা যায়,

তাহার চেষ্টা করা সর্বাগ্রে সরকারের কর্তব্য। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়া গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিতে দেওয়া হউক। জনমত বোধ না করিয়া দেশবাসীকে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া কর্তব্য।"

এ দেশে যে-সব রাজনৈতিক আলোচনা সরকারের পক্ষে প্রীতিজনক নহে, সভা-সমিতি আহ্বানের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহা বন্ধ করিবার উপায় আছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে কংগ্রেসদল আটটি প্রদেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিয়াছেন, যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সমগ্র দেশের শাসনযন্ত্র যাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের সভা-সমিতি বন্ধ করিবার চেষ্টা প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলির পক্ষে সংক্রামক ব্যধিতে পরিণত হইয়াছে। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার কার্য্যের বেলায় সভা-সমিতি সম্পর্কিত নিয়মকানুন উৎসাহের সহিত প্রযুক্ত হয় না ; ভারতবর্ষে ভেদনীতির আবশ্যকতা এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তৃতীয় দলের অবস্থিতি যত দিন থাকিবে, তত দিন এই তারতম্য দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রয়োজন যেখানে যুক্তির স্থান দখল করে, ভ্রান্তি প্রদর্শনের চেষ্টা সেখানে বৃথা।

—

মহারাজা শশিকান্ত আচার্য

কিছু দিন রোগভোগের পর মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য গত ২৭শে মে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্তের পোষ্যপুত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। মহারাজা সূর্য্যকান্ত স্বদেশী আন্দোলনকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে তাঁহার দান স্মরণীয়। তিনি লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—তিনি স্বাক্ষরের নিম্নে লিখিবেন "বড়লাটের আদেশে।" গৌড় দর্শন করিবার সময় লর্ড কার্জন তথায় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না বলায় মহারাজা সূর্যকান্ত তাঁহার তাঁবু, হাতী, লোক সব সরাইয়া লইবার আদেশ করায় লর্ড কার্জন বাধ্য হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হন এবং তখন মহারাজা স্বয়ং তথায় যাইতে না পারায় অতিথি-সৎকার করিতে পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজা শশিকান্ত কলিকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের পরে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে গমন করিয়া ডাউনিং কলেজে পাঠ করেন ও ব্যারিষ্টার হইবার জন্য গ্রে'স ইনে ভর্তি হন। ব্যারিষ্টারী পাঠ শেষ করিবার পূর্বেই পিতৃবিয়োগহেতু তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি 'গজায়ুর্বেদ সংহিতা'র অনুবাদ ও তাহাতে টীকা যোগ করিয়াছিলেন। মহারাজা জমিদার সভার সহিত সম্পর্কিত ছিলেন এবং হিন্দু মহাসভার উদ্যোগী সদস্য ও অন্যতম নেতা ছিলেন।

—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ গত ২২শে মে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। সংস্কৃতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কাশীতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। পরে এই পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশী ফিরিয়া যান, এবং কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য সাহিত্য গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পূর্বে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। পণ্ডিত প্রমথনাথ একাধিক বার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত চর্চার গুরুতর ক্ষতি হইল।

—

সরকারী হাসপাতালের গৃহ নির্ম্মাণের নমুনা

দৈনিক বসুমতীর সংবাদে প্রকাশ, "ঢাকা জেলার মাধবদী গ্রামে দুর্গতদিগের জন্য এক সরকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেদিন ঝড়ে হাসপাতালের ঘরগুলি পড়িয়া যাওয়ায় ৮ জন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আরও ১৬ জন আহত হইয়াছে। এই ঘরগুলি যে অল্প দিন পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। যে ঝড়ে এইগুলি পড়িয়া লোকের প্রাণহানি ঘটাইয়াছে, তাহাতে গ্রামের লোকের ঘরগুলির ক্ষতি হয় নাই। ইহার রহস্য ভেদ করিবার জন্য একটি সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, সরকারী ঘরগুলি 'সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল।' সেই জন্যই কি সেগুলি ঝড়ের স্পর্শেই পতিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ঝড় কি অল্প ব্যয়ে নির্মিত বে-সরকারী পুরাতন ঘরগুলি ঘৃণায় তুচ্ছ করিয়া বহু অর্থ-ব্যয়ে সম্প্রতি নির্মিত সরকারী ঘরগুলিকেই ফেলিয়া গেল ? এই বহু অর্থব্যয় সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়ে—প্রদীপের নিম্নেই অন্ধকার ঘনীভূত থাকে। এই সব ঘর নির্মাণের

ব্যাপার কোন্ সচিবের বিভাগের—বরদাপ্রসন্নের ? না—তারকনাথের ? তদন্ত কমিটিতে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইতেছে ?

—

আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়গণকে পৌর অধিকার দানের প্রস্তাব

ভারত-প্রবাসী এক শত পঞ্চাশ জন আমেরিকান মিশনরী সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ন্মেণ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন ভারতীয়গণকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৌর অধিকার দিবার জন্য আইনতঃ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। চীনা অধিবাসিগণকে পৌর অধিকার প্রদানের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ভারতীয়গণের সম্পর্কেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক তাহা বিধিবদ্ধ হউক, ইহাই মিশনরীদের প্রস্তাব। আমেরিকাতেও কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু মার্কিন গবর্ন্মেণ্ট এখনও এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চীনকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা নামমাত্র হইলেও অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা যে তাহাদের অধিকার মূলতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবাসী বর্ত্তমান যুদ্ধে ধনপ্রাণ দিয়া প্রভূত সাহায্য করিলেও উহাতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

—

বস্ত্রোৎপাদনে কুটীর শিল্পের স্থান

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বস্ত্র-শিল্পের উন্নয়নকল্পে বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতের সাহায্যে কুটীর শিল্পেরও উন্নতি আবশ্যক বলিয়া সর্ ভিক্টর সাস্থন যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে ল্যাঙ্কাশায়ারের বণিক মহলে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে বলিয়া ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ান জানাইয়াছেন। ঐ পত্রিকার অভিমতে, "তাঁতিদের স্বার্থ রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা না হইলে ঐরূপ পরিকল্পনার দ্বারা সুফল লাভ হইবে না। শহর ও গ্রামাঞ্চলের বস্ত্র-শিল্পের উপর সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও কড়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ঐরূপ রক্ষাকবচও কার্যকরী হইতে পারিবে না। অন্যথা বিদ্যুৎ-চালিত কুটীর শিল্প সমগ্র দেশের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সহায়ক না হইয়া বরং উহার অন্তরায় হইবে। অপর পক্ষে ছোট ছোট শিল্পের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-নীতি অনুসৃত হওয়াও ততই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। ভারত-সরকার এই বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।"

গ্রামে গ্রামে তাঁত বসাইয়া বস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কে কাপড়ের কলওয়ালা, বিশেষতঃ মাঞ্চেষ্টার, ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল-মালিকদের একটা প্রবল ভীতি আছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভারত-সরকারও তাঁত শিল্পের যথার্থ উন্নতি সাধন করিয়া ইহাদের বিরাগ অর্জনে সাহসী হন নাই। তাঁতশিল্পকে সাহায্যদানের জন্য দেশে আন্দোলন উপস্থিত হইলেই একটি করিয়া কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটির রিপোর্ট আর দশটা জনকল্যাণমূলক রিপোর্টের ন্যায় যথারীতি ধামাচাপা থাকে। কুটীরে কুটীরে তাঁত বসানোতেই যেখানে প্রবল আপত্তি সেখানে বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত বসাইবার কথা উঠিলে ভারতীয় তাঁতীর জন্য দরদে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ওয়ালারা আকুল হইয়া উঠিবেন ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। ভারতবর্ষের এক একটি প্রদেশের আয়তন এমন ভয়ানক বড় কিছু নয় যে গ্রামাঞ্চলের তাঁতশিল্পকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালন করা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি মূল পরিকল্পনা স্থির করিয়া প্রদেশগুলিকে উহা প্রয়োগের ভার দিলে, গ্রামে গ্রামে সুশৃঙ্খল ভাবে তাঁত চালাইলে সস্তায় বস্ত্র উৎপাদন এবং অন্ন সমস্যার সমাধান উভয়ই হইতে পারে। কংগ্রেসের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি ইহাই চাহিয়াছিলেন।

—

ভারতের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে লণ্ডন টাইমসের মন্তব্য

লণ্ডন টাইমস 'ভারতের ভবিষ্যৎ আশা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার ফলে গত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ একটি প্রধান অস্ত্রাগারে ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার এক প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষ এই ভাবে এক নূতন বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য অর্জন করিল এবং তাহা স্থায়ী হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কোনও পরিকল্পনা প্রস্তুত হইবে তাহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কার্য্যকরী করিতে ভারতবর্ষের যে বিশেষভাবে ডাক পড়িবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। প্রধান মন্ত্রীর ঐ পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত যে আকারই ধারণ করুক, ভারত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে উহা প্রয়োগ করিবার সময় সিংহল, ব্রহ্ম ও মালয়ে ক্রমবর্দ্ধমান স্বায়ত্ত-শাসন সম্ভোগ হিসাবের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। এই দেশগুলিকে কোন স্থানীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া যদি ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, শ্যাম ও ইন্দো-চীনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তথাপি এইগুলি একত্রে কোন পরাক্রান্ত শত্রুকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ কার্য্যকুশল অপর্য্যাপ্ত লোকবল ও ধনসম্পদ লইয়া যে অংশ গ্রহণ করিবে, তাহার ফলে ভাল ভাবেই সমগ্র অঞ্চল শান্তিতে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালন দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের যে সম্পদরাশি দৃষ্টির অগোচরে অব্যবহার্য্য হইয়া আছে, তাহার সন্ধান করিয়া তাহা যদি

সার্থক ভাবে কার্য্যে নিয়োগ করা যায়; দ্বিতীয়তঃ, এই সম্পদরাশির সার্থকতার জন্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ও সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত অংশীদারত্ব আবশ্যক। প্রথমটি সময়সাপেক্ষ এবং দ্বিতীয়টি ভিন্ন এই সম্পদ হয়ত কার্য্যক্ষেত্রে কখনও প্রযুক্তই হইতে পারিবে না।

বর্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তি ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছেন, মাঝে মাঝে ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধিকার লাভের কোন কথা উঠিলে এ দেশের দানের ও ত্যাগের কথা ভুলিয়া যাইতে তাঁহাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না। সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ কর্ডেল হাল, দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটস্ এবং মিঃ চার্চ্চিল যে-সব বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উল্লেখমাত্র নাই। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্য যে কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব মার্কিণ সিনেটে হইয়াছে তাহাতে চীনের নাম আছে কিন্তু ভারতবর্ষের নাই। অথচ এশিয়ার শান্তি রক্ষায় চীন অপেক্ষা ভারতের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নহে। চীন ও ভারতের জনসংখ্যা প্রায় সমান, ভারতীয় সৈন্য পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যুদ্ধে চীনা সৈন্য অপেক্ষা কম শৌর্য্যের পরিচয় দেয় নাই, অর্থ নৈতিক ও শিল্পোন্নতির দিক দিয়া ভারতবর্ষ চীন অপেক্ষা অধিক অগ্রসর। ভারতের অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক সম্পদও চীনের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। তথাপি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার চেষ্টায় ভারতবর্ষের স্থান থাকিবে না। কারণ সে পরাধীন এবং এই পরাধীনতা মোচনে ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ অনিচ্ছুক।

—

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

ঐ প্রবন্ধেই টাইমস লিখিয়াছেন :—

গত কয়েক মাসের রাজনীতিক অবস্থা হইতে দেখা গিয়াছে, ভারতবাসীরা ক্রমেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, কেবলমাত্র যদি তাহারা পরস্পরের মধ্যে কোনও একটা মীমাংসায় পৌঁছিতে পারে, তবে তাহারা নিজেদের চেষ্টায়ই স্বায়ত্ত-শাসন অর্জন করিতে পারিবে। অবশ্য ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিতে তাহাদিগের নিজেদের চেষ্টাই যথেষ্ট নহে, অপরের চেষ্টার নিশ্চয়ই আবশ্যক হইবে।

দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল নাই, সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে এরূপ কোন দেশ নাই। আমেরিকার এই যুদ্ধের মধ্যেও সভাপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। আমেরিকায় কেহ ইহাকে নিন্দনীয় মনে করে না। ফরাসীদের মধ্যে আজও জিরো দ্যগল দুই দলে প্রবল বিরোধ চলিতেছে—এই দ্বন্দ্ব না মিটিলে ফ্রান্স স্বাধীনতা পাইবে না কেহ এ কথা বলেন নাই। অথচ ভারতবর্ষে দুই বা ততোধিক দলের অবস্থিতিকে তাহার স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় বলিয়া জাহির করা হইতেছে এবং চীনে দুই দলের অস্তিত্বও সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে প্রচারিত হইতে সুরু হইয়াছে।

—

চোরাবাজারে ইউরোপীয়ান

কলিকাতার একটি বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত দোকান ওয়াল্টার বুশনেল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এফ ডব্লিউ ফিস্ক এবং সেলসম্যান এফ এম ওয়াগষ্টাফ জনৈক মিলিটারী অফিসারের নিকট ২১ টাকা মূল্যে দুই রোল ফিল্ম বিক্রয়ের অভিযোগে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দেবেন্দ্র সিং কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রতি রোল ফিল্মের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ৪৷৵০। ফিস্ককে ১০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস কারাদণ্ড এবং ওয়াগষ্টাফকে ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাস কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটই তাঁহার রায়ে মন্তব্য করেন—ফিস্ক স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক চোরাবাজার সৃষ্টি এবং অতিলাভে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

চোরাবাজার সৃষ্টি করিয়া ক্রেতা সাধারণকে লুঠ করিবার ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান মারোয়াড়ী ভাটিয়া প্রভৃতি আর দশজনের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গেরাও যে সমান ভাবেই জড়িত আছেন উপরোক্ত ঘটনা তাহারই একটি নিদর্শন। সততার জন্য ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের এত দিন যে সুনাম ছিল সাধারণ ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাহা আজকাল কমিয়া আসিতেছে।

—

নোয়াখালীতে চাউলের দর

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর একটি বিবৃতি ৭ই জুন তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেন্সরের প্রচলিত নিয়মানুসারে উহা প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিবৃতিটি এই :—

"গত একমাস যাবৎ নোয়াখালীতে ২২ টাকা হইতে ২৫ টাকা মণ দরে, সন্দীপে ২৮ টাকা হইতে ৩০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। আমি এদিকে গবর্ন্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি কিন্তু এখনও দর কমে নাই। চট্টগ্রামে চাউলের দর আরও অনেক বেশী। আমি আশা করি গবর্ন্মেণ্ট চট্টগ্রাম, সন্দীপ ও নোয়াখালীতে চাউলের দর কমানোর জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"

চট্টগ্রামের চাউলের দর লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে দিন মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় মিঃ ফজলুল হক সে দিন মন্তব্য করেন যে চট্টগ্রামে ৬০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এই সংবাদ সত্য কিনা তিনি তাহা জানিতে চাহেন। কিন্তু সরকার-

পক্ষ ইহার কোন উত্তর দেন নাই। ৮ই জুন তারিখে ষ্টেটসম্যান পত্রে প্রকাশিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিবরণীতে আমরা ইহা দেখিয়াছি এবং ইহার পর আজ (১৩ই জুন) পর্যন্ত তাহার কোন প্রতিবাদ গবর্মেণ্ট করিয়াছেন বলিয়াও দেখি নাই।

মফঃস্বল হইতে চাউলের দর বৃদ্ধির যে-সব সংবাদ আসিতেছে তাহা সত্য হইলে উদ্বেগজনক। এই দরে চাউল ক্রয় দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত উভয়ের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। কাগজে পত্রে মূল্য হ্রাস ঘোষণা করিলে কোন ফল হইবে না। এবার ফসল এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি কেন ঘটিতেছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিথ্যা হইলে এরূপ সংবাদের প্রতিবাদ প্রয়োজন।

—

বরিশালে হিন্দু সম্মেলন বন্ধ

বরিশালে গত ৩রা জুন যে হিন্দু সম্মেলন হইবার কথা ছিল, মন্ত্রীমণ্ডল তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজের সমস্যাসমূহের আলোচনা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ। স্থানীয় তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সম্মেলনের সর্ব প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রায় পাঁচ শত কর্মী এক মাস কাল দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া উন্মুক্ত ধান্যক্ষেত্রে সম্মেলন স্থান রচনা করিয়াছিল। প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক উৎসাহের সহিত সকল কার্যে যোগ দিয়াছিল। অর্থও বিস্তর ব্যয় হইয়াছিল। সম্মেলনের আয়োজন দেখিয়া মন্ত্রীপক্ষীয়েরা আনন্দিত হইতে পারেন নাই। মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সম্মেলন আরম্ভের নির্দ্ধারিত দিবসের এক সপ্তাহ পূর্বে ঐ অঞ্চলে গিয়া সম্মেলনে যোগদান করিতে সকলকে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাতও করে নাই।

এমনি সময়ে সম্মেলন ক্ষেত্র হইতে ৬।৭ মাইল দূরে খুলনা জেলার এক গ্রামে কৃষকদের মধ্যে এক হাঙ্গামা হয়। উহার কোন সাম্প্রদায়িক কারণ ছিল না। ৫ই জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এ সম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমউদ্দীন যে বক্তৃতা দেন তাহাতেও তিনি খুলনার হাঙ্গামাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া স্পষ্টভাবে অভিহিত করেন নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি সম্মেলন আহ্বানের অনুমতি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা কোন সময়েই প্রত্যাহার করেন নাই। পুলিসের ইনসপেক্টর-জেনারেল, প্রেসিডেন্সি ও বাখরগঞ্জ রেঞ্জের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর জেনারেলদ্বয়, প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনর স্বরাষ্ট্র বিভাগের এডিশনাল সেক্রেটারী এবং চীফ সেক্রেটারী—এই কয়জনের সহিত কলিকাতায় বসিয়া পরামর্শ করিয়া প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন বন্ধ করিবার আদেশ দেন। এই আদেশ প্রচারিত হইবার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দেন তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

তপশীল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গই প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া হিন্দুদের সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান কল্পে এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন ; এবং কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্টহীন বর্দ্ধমানের মহারাজাকে ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লীগ মন্ত্রী-সভা এই সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন ; কারণ তাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল ছলে বলে কৌশলে বর্ত্তমান পরিষদে পাস করাইতে চাহেন, এবং এই সম্মেলনের ফলে পাছে সমগ্র হিন্দু সমাজের তীব্র বিরোধিতা প্রকট হইয়া উঠে এই ভয়ে তাঁহারা সম্মেলনের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়াছেন।

সম্মেলনের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইতে পারে লীগ মন্ত্রী-সভার এই অজুহাত অচল ; সম্মেলনের নির্ব্বাচিত স্থান হইতে বহু দূরে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় যে কৃষি বিক্ষোভের সংবাদ সম্মেলন বন্ধ করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত। কারণ পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এজন্য সম্মেলন বন্ধ করার কোনও প্রকার সুপারিশ করিয়াছেন, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তাহারও কোন উল্লেখ নাই। গত কয়েক দিন যাবৎ নানা ছলে সম্মেলন বন্ধ করার চেষ্টা হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হওয়ায় লীগ মন্ত্রী-সভা শেষমুহূর্তে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের শেষ রাষ্ট্রীয় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন।

ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে লীগ-মন্ত্রীসভার এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বর্ণ হিন্দু ও তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতিকে বিচ্ছিন্ন করা। কিন্তু ইহাও ঠিক—বর্ণহিন্দু ও তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে যে প্রাচীর তোলা হইয়াছে তাহা একান্তই ক্ষণভঙ্গুর। এবং এই কৃত্রিম বিভেদ দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হইবে না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাব আনিয়া এই ব্যাপারটি আলোচিত হয়। বিরোধী দলের নেতা মৌলবী ফজলুল হক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলেন। তিনি বলেন, "কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় হুকুমনামা প্রচার করিয়া চারিটি জেলায় সভাসমিতি বন্ধ

করা সঙ্গত হইয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করা দরকার। ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্মচারীদের নিকট হইতে কোন অনুরোধ না পাইয়াই কলিকাতায় বসিয়া মন্ত্রীমণ্ডল এই আদেশ দিয়াছেন। স্থানীয় কর্মচারীদের অনুরোধে এই কাজ করা হইয়া থাকিলে তবু না হয় বলিবার কিছু থাকিত। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মচারীদের নিকট হইতে কোন অনুরোধ তো আসেই নাই, বরং ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে তাহাদের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই সরকারী আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।" খুলনার দাঙ্গার পরও বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্মেলন আহ্বানের অনুমতি নাকচ করেন নাই, একাধিক বক্তা তাহা উল্লেখ করেন।

মৌলবী ফজলুল হকের অভিযোগের উত্তরে সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন যে স্থানীয় কর্মচারীদের রিপোর্টই এমন ছিল যে সম্মেলন বন্ধ করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। বরিশালের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্ট হইতে পাঠ করিয়া তিনি দেখান যে পুলিস সাহেবের মতে সম্মেলন বসিতে দিলে "মারাত্মক লোক ও সম্পত্তি ক্ষয়ে"র (terrible loss of life and property) আশঙ্কা ছিল। এই পুলিস সাহেবের রিপোর্ট ছাড়া আর কাহারও রিপোর্ট হইতে পড়িবার মত বস্তু প্রধান মন্ত্রী পান নাই। যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব উক্ত জেলায় সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই সর্ নাজিমুদ্দীন বলিতে পারেন নাই। পাকিস্থানী প্রচারকার্য্যের কল্যাণে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য বাংলার কোন্ স্থানে নাই আমরা জানি না। এরূপ ভাসা ভাসা অভিযোগের উপর কাজ করা কঠিন বলিয়াই হয়ত বরিশালের পুলিস সাহেবের রিপোর্টটি অতিশয় মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বরিশাল, খুলনা, যশোহর ও ফরিদপুরের সন্ধিস্থলে সম্মেলন স্থান রচিত হইয়াছিল, সর্ নাজিমুদ্দীনের মতে সম্মেলন হইতে দিলে এই চারিটি জেলাতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িত। অথচ একমাত্র বরিশালের পুলিস সাহেব ভিন্ন চারি জন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অপর তিন জন পুলিশ সাহেব সম্মেলন বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন এমন কথা সর্ নাজিমুদ্দীন বলিতে পারেন নাই। বরিশালের এই পুলিস সাহেবটি কি মুসলমান ?

সম্মেলন বন্ধের হুকুমনামা প্রচারের অব্যবহিত পরেই সর্ নাজিমুদ্দীন দিনাজপুরে পাকিস্থান সম্মেলন করিতে যাইবার সময় পাইয়াছিলেন, কিন্তু খুলনার দাঙ্গাস্থল অথবা বরিশালের সম্মেলন ক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় তিনি পান নাই।

—

দিনাজপুরে পাকিস্থান সম্মেলন

বরিশালের হিন্দু সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিয়া সর্ নাজিমুদ্দীন সদলবলে দিনাজপুর গমন করেন এবং সেখানে পাকিস্থান সম্মেলন করেন। সরকারী জমিতে সম্মেলনের মণ্ডপ এবং পাকিস্থান-তোরণ নির্মিত হয়। সরকারী জমির উপরেই পাকিস্থান পতাকা উড্ডীন হয় এবং পাকিস্থানের মানচিত্র প্রদর্শিত হয়। সরকারী জমির উপর নিছক সাম্প্রদায়িক সম্মেলনের এরূপ অনুষ্ঠান পূর্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সরকারী জমির উপর কোন সাম্প্রদায়িক সম্মেলন হইতে দেওয়া দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই উহার চূড়ান্ত অপব্যবহার বলিয়া মনে করিবেন। স্থানীয় হিন্দু নেতাদের শান্তিপ্রচার এবং হিন্দু অধিবাসীদের ধৈর্যের ফলেই কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে নাই এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

অনুন্নত হিন্দুদের উন্নতি

তপশীলভুক্ত হিন্দু বলিয়া বর্ণিত অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক নেতা আজকাল পাকিস্থানী মুসলমানদের সহিত তাঁহাদের সর্বকার্যে সায় দিয়া চলিতেছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের সমাজের উন্নতির জন্য যেটুকু কাজ আজ পর্যন্ত হইয়াছে, প্রধানতঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ তাহার মূলে আছেন, যদিও অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে খ্রীষ্টানদের দানও আছে।

১৯০৬ সালে প্রার্থনা সমাজের সভ্য ভি আর সিন্ধে বোম্বাইয়ে অনুন্নত হিন্দুদের জন্য একটি মিশন খোলেন। দাক্ষিণাত্যের আদি হিন্দু সোশ্যাল ক্লাব, আদি হিন্দু সংবাদপত্র এবং ছুঁৎমার্গবিরোধী সম্মেলনের সূত্রপাত হয় এই মিশন হইতে। ১৯২৪ সালের মধ্যে এই মিশনের অনেকগুলি শাখা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে পুনায় মহারাষ্ট্র শাখা, নাগপুরে মধ্যপ্রদেশ শাখা, হুবলিতে কর্ণাটক শাখা, এবং বাঙ্গালোরে তামিল শাখা উল্লেখযোগ্য।

মিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত সিন্ধে নিখিল-ভারত ছুঁৎমার্গবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি বৎসর তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতেন এবং সাধারণতঃ কংগ্রেসের সঙ্গে ঐ সম্মেলন হইত। প্রথম সম্মেলন আহূত হয় ১৯০৭ সালে সুরাটে এবং উহার প্রথম সভাপতি হন একজন বাঙালী—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্মেলনের অন্যান্য কয়েকটি অধিবেশনের তালিকা :—

বৎসর	স্থান	সভাপতি
১৯০৮	বাঁকিপুর	রাও বাহাদুর মুধোলকার
১৯১০	মাদ্রাজ	গোপালকৃষ্ণ গোখলে
১৯১২	করাচী	লালা লাজপত রায়
১৯১৮	বোম্বাই	বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গাইকোয়াড়
১৯২০	নাগপুর	মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি হইবার বহু পূর্বে এই ছুঁৎমার্গবিরোধী সম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে সিন্ধে মহাশয়ের চেষ্টায় একটি স্থায়ী নিখিল-ভারত ছুঁৎমার্গবিরোধী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঙ্গালোরের স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কুদুমল রঙ্গরাও ছিলেন সিন্ধে মহাশয়ের সর্বপ্রধান উৎসাহ-দাতা। ইঁহারই নিকট সিন্ধে অনুন্নত সমাজের সেবাব্রতে দীক্ষালাভ করেন। মাদ্রাজে পীঠাপুরমের মহারাজার দানও এবিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। পঞ্চমদের জন্য একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দুই লক্ষ টাকা দান করেন।

বাংলাও পিছাইয়া থাকে নাই। ১৯০৯ সালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন প্রচারক "অনুন্নত সম্প্রদায় মিশন" (Depressed Classes Mission) নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯১৩ সালে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া "সোসাইটি ফর দি ইমপ্রুভ-মেণ্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস" রাখা হয়। এই নামে আজও এই সমিতি কাজ করিতেছে। ঢাকা জেলার নমঃ-শূদ্রপ্রধান বেরস গ্রামে জনৈক নমঃশূদ্রের নিকট হইতে ধারকরা ৩।৯ পাই লইয়া সমিতির কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরে কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক স্থাপিত হয়। বর্তমানে ঐ বেরস গ্রামে শিবনাথ হাই স্কুল নামে সমিতি-পরিচালিত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় রহিয়াছে এবং স্থানীয় নমঃ-শূদ্রেরা উহাকে একটি কলেজে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহশীল। ৩০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ নিজেরা পরিশ্রম করিয়া কলেজের জন্য ঘরবাড়ী তৈরি করিতে প্রস্তুত, আর কিছু অর্থ হইলেই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সমিতির কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

বৎসর	স্কুল	ছাত্রছাত্রী
১৯১৬	৬২	২১৭৯
১৯১৭	১০৪	৩৮০৬
১৯১৮-১৯	২৩১	৮১২০
১৯২২-২৩	৪০৪	১৪,৯৮৯
১৯৩১-৩২	৪৪১	১৭,৮০৯

বাংলা ও আসামের ২০টি জেলার ৩৮৪টি গ্রামে এই ৪৪১টি স্কুল অবস্থিত। ইহা হইতেই সমিতির কার্য্যের গুরুত্ব ও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ২৩ বৎসরে এই মিশন ৪৫ হাজার বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে। বেরসের ন্যায় ফরিদপুর জেলার তালতলি গ্রামেও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সমিতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শুধু শিক্ষা-বিস্তার নয়, রোগে সেবা ও চিকিৎসা, বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে ঔষধ দান, মদ্যপান নিবারণ, দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান প্রভৃতি সমিতির নিয়মিত কাজের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে বরিশালে অশ্বিনী-কুমার দত্তের কার্য্যও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁহার অনুচর ভেগাই হালদারের কাজের কথা আজও লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। নীলমণি চক্রবর্ত্তীর খাসিয়া মিশন, শ্রীযুক্ত অবিনাশ-চন্দ্র লাহিড়ীর রাভা ও গারো মিশন, এবং হাজারীবাগের মেথরদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্তের কাজও উল্লেখ-যোগ্য।

১৯৩৭-এ রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে আসিবার পরও কোন মুসলমান নেতা অনুন্নত হিন্দুদের উন্নতির জন্য এক কপর্দ্দকও দান করিয়াছেন কি না তাহা আজ তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। —

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও অনুন্নত হিন্দু

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে প্রবল আন্দোলন উঠিয়াছে, তপশীলভুক্ত হিন্দুরাও তাহাতে প্রথম হইতেই যোগ দিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের তিনজন তপশীলভুক্ত হিন্দু সদস্য, শ্রীযুক্ত মনো-মোহন দাস, শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মন মন্ত্রীদল পরিত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান করিয়া-ছেন। ইঁহারা তিন জনে একযোগে প্রধান মন্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের যে বন্দোবস্ত বিলে করা হইয়াছে, অন্যান্য ত্রুটির কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র এই কারণেই উহাকে বুদ্ধি দিয়া গ্রহণ করা যায় না।

"প্রাথমিক শিক্ষা আইনে যে ভাবে কাজ হইয়াছে, তাহাতে 'তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়' অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। যে-সকল স্থানে বহু 'তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের' লোকের বাস, সেই সকল অঞ্চলে বহু ও পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। ফলে তাঁহাদিগের পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

"এ কথা বলা বাহুল্য নহে যে, ঐরূপ বিদ্যালয়ের অধিকাংশই মুসলমানপ্রধান গ্রামে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং সে সকলের অনেকগুলিকে মক্তবে পরিণত করা হইয়াছে—ফলে 'তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের' শিক্ষার্থীরা তাহা-দিগের সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন শিক্ষালাভ করিতে

অসুবিধা বোধ করে। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারেও আমরা ঐরূপ ব্যবহার লাভের ভয় করি।"

গবর্মেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মন দিবার পর হইতেই বহু বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিয়া মুসলমানপ্রধান গ্রামে বা গ্রামের মুসলমান পল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তবে পরিণত হইয়াছে। যে-সব হিন্দু ছাত্রকে বাধ্য হইয়া ঐ সব স্কুলে বা মক্তবে ভর্তি হইতে হয় তাহাদিগকে জলের পরিবর্তে 'পানি', 'গোমাংস অতিশয় সুস্বাদু' প্রভৃতি শিখিতে হয়! বর্ত্তমান স্কুলগুলিকে অব্যাহত রাখিয়া মুসলমান গ্রামে বা মুসলমান পল্লীতে নূতন স্কুল স্থাপিত হইলে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু হিন্দুর তৈরি এবং পরিচালিত স্কুলগুলিকে নষ্ট করিয়া হিন্দু ছাত্রগণকে শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিবার জন্য ঐগুলিকে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত নিন্দনীয়।

বর্ণ হিন্দুদের চেষ্টায়, যত্নে ও অর্থব্যয়ে যে সহস্র সহস্র প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে, সে সকলে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষালাভে কোন বাধা হয় নাই। ১৮১৮ সালে রেভারেণ্ড রবার্ট সন বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন:

"ছাত্রেরা একমাত্র গুণানুসারে ভিন্ন পথে কোন কারণে উপর নীচ হইতে শেখে না। ব্রাহ্মণ ছাত্র তাহার অতি দীন প্রতিবেশীর পার্শ্বে উপবেশন করে, অনেক সময় ক্লাসে তাহার নীচে আসিয়া দাঁড়াইতেও বাধ্য হয়। নিম্নজাতির ছাত্র ক্লাসে ব্রাহ্মণ ছাত্র অপেক্ষা অধিক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিলে তাহার উপরে উঠে এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন জন্মগত অধিকার দিয়া কাহারও সৃষ্টি করেন নাই, পৃথিবীর বুকে সমান অধিকার লইয়া বাঁচিবার অধিকার সকলেরই আছে—এই যে সত্য সে পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার সুযোগও সে ক্লাসেই পায়।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

সাহেব দলের সহায়তায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্ত্তমান মন্ত্রীদলের মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাশ করাইয়া লওয়া সহজসাধ্য হইবে না, সম্ভবতঃ এত দিনে মন্ত্রীরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বিরোধী দল যেরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে বিল পাসে বাধা দিতেছেন, সাহেব দল ও পাকিস্থানী দল তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেও দেশবাসী তাহাতে সন্তুষ্টই হইয়াছে। বিরোধী দলের মুসলমানদের মধ্যে মৌলবী আবু হোসেন সরকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন: হিন্দুদিগের সহিত মীমাংসা না হইলে কেবল ক্ষমতা লাভ করিলে মুসলমানগণ উপকৃত হইবেন না; প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হইলে এবং মোসলেম লীগ পরিচালিত সচিবসঙ্ঘ বহাল থাকিলে কিছুই হইবে না। তাহাতে মুসলমানদিগের অনিষ্টই ঘটিবে। তিনি সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—কেবল মুসলমান শিক্ষক, কেবল মুসলমানের অর্থ ও কেবল মুসলমান ছাত্র লইয়া তিনি মাধ্যমিক স্কুল চালাইতে পারিবেন—এমন কথা কি বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের কোন সমর্থক বলিতে পারেন?

ব্যবস্থা-পরিষদের বাহিরে বিলের বিরুদ্ধে জনমত এত প্রবল, শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিবাদ এত বেশী এবং স্পষ্ট, নামমাত্র দুই-একটি পাকিস্থানী পত্রিকা ব্যতীত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিক্ষোভের প্রকাশ এত গভীর যে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান অনাবশ্যক। বাহিরের এই আন্দোলন মন্ত্রীদলকেও নাড়া দিয়াছে—তিন জন তপশীলী সদস্য ব্যতীত দুইজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটরীও পদত্যাগ করিয়াছেন। বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীব্রতা ও ব্যাপকতা শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করা মন্ত্রী দলের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই, এই দলের চীফ হুইপ প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারাও প্রতিবাদের পাল্টা প্রতিবাদে বাধ্য হইবেন। ইহার পর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বিলের প্রতিবাদ সভার নামে যে প্রহসন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৫শে মে ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বিলের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিতে উঠিলে বিরোধী দল উহাতে বাধা দেন। ইহাদের উচ্চ প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত গোস্বামী কোন কথা বলিতে পারেন নাই। গবর্ণর মিঃ কেসী সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে বিরোধী দলের বিক্ষোভ দেখিয়া গিয়াছেন। উত্তেজনা সেদিন শুধু বিরোধী দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সাহেব দলও অত্যধিক উত্তেজিত হইয়া শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। গোলমালের জন্য কিছুক্ষণ অধিবেশন মুলতুবি হইলে তাহাদের চীপ হুইপ মিঃ ষ্টার্ক স্পীকারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। পরিষদের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে মিঃ ষ্টার্কের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন, তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অধিবেশন হইতে দিবেন না। তখন বাধ্য হইয়া

মিঃ ষ্টার্ক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখনও বিরোধীদলের বহু নেতার বক্তৃতা বাকি ছিল। সেদিন দলের নেতাদের বক্তৃতা করিবার কথা। শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী কোন দলের নেতা নহেন, অতএব ঐ দিন তিনি বক্তৃতা করিতে পারেন না, ইহাই ছিল তাঁহার বক্তৃতায় বাধা দানের কারণ। হট্টগোলের মধ্যে সাহেব দল পার্লামেণ্টারী শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া বিতর্ক শেষ হইবার আগেই বিতর্ক বন্ধের প্রস্তাব (Closure motion) সমর্থন করেন। স্পীকার উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কংগ্রেস-দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং জাতীয় দলের নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলের অপর সকলেই স্পীকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঠিক অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তখনকার মন্ত্রী-দলের সৈয়দ বদরুদ্দোজার বক্তৃতায় বাধা দানের জন্য বিরোধী দল তুমুল হট্টগোল করিতে থাকেন। সর্ নাজিমুদ্দীন আল্লার নাম লইয়া উহা সমর্থন করেন। মিঃ সুরাবর্দীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া স্পীকার তাঁহাকে বহিষ্কারের আদেশ দিলে তিনি বাহির হইয়া যাইতে অস্বীকার করেন। অবশেষে পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। এক্ষেত্রেও অধিবেশন মুলতুবী রাখাই সমীচীন ছিল।

ইহার কয়েক দিন পর পরিষদের অধিবেশনকালে দেখা যায় প্রাঙ্গণ পুলিসে ছাইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন পুলিসের আগমন সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। পরে জানানো হয় কলিকাতার পুলিস কমিশনার অতিরিক্ত পুলিশ পাঠাইয়াছিলেন। বিরোধী দলের প্রতিবাদে অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত পুলিস দলকে প্রাঙ্গণ হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়।

২৫শে মে স্পীকার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার পুনর্বিবেচনার জন্য বিরোধী দল অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা লইয়া বিতর্ক চলিতেছে। আজ পর্য্যন্ত (২৯শে জ্যৈষ্ঠ) কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। এ সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম প্রদত্ত হইল:

বিরোধপাদন পন্থা অবলম্বন সম্পর্কে তিনি এই কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না যে, যখনই উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখনই বিরোধী পক্ষের বিরোধপাদন পন্থা অবলম্বন করিবার অধিকার আছে। গণতন্ত্রের শাসনাধীন প্রত্যেক পার্লামেন্টেরই এইরূপ প্রভূত নজির আছে। যেখানেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আছে, সেখানেই বিরোধী দলের এই একান্ত নিজস্ব অধিকারের প্রতিবাদ করা হয় না। তাঁহারা যে বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাঁহাদের তাহা করিবার অধিকার ছিল। যেভাবে বিলটিকে আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি খুব তীব্র। সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের নিকট তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছে, প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছে; প্রত্যেক স্থানেই তাঁহাদের আবেদন নিষ্ফল হইয়াছে। এই অবস্থাতে এখনও যদি তাঁহাদিগের নিকট এইরূপ কোন সত্যকারের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে প্রদেশের কল্যাণকামী বাঙালী ও হিন্দু-মুসলমান হিসাবে প্রশান্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটি টেবিলের চতুর্দিকে সকলে সমবেত হইয়া বর্তমানে দুরতিক্রম্য বলিয়া বিবেচিত এই বিপত্তির একটি মীমাংসা করা আবশ্যক, তাহা হইলে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে তিনি বলিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে সহযোগিতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু মীমাংসার প্রকৃত মনোভাব থাকা চাই।

অতঃপর তিনি স্পীকারের নিকট এই আবেদন জানান যে, বিরোধী পক্ষ ও গবর্মেণ্টের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে স্পীকার তাহার অন্তর্গত নহেন। সুতরাং যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাধীনতা ও অধিকার পদদলিত হইতে পারে এমন কোন পন্থা গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইবার গুরু দায়িত্বভার তিনি যেন গ্রহণ না করেন।

—

দুর্ভিক্ষোত্তর সমস্যা ও বাংলা-সরকার

দুর্ভিক্ষে যাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাংলা-সরকার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা সমগ্র প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের তীব্রতা যেসব স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং এখনও যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে সেই সব স্থানকে প্রথম ভাগের মধ্যে আনা হইয়াছে। ২৬৯৪টি ইউনিয়ন বোর্ড এবং ৩,৩৪,৩১,৩৪১ জন লোক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সরকারের হিসাবে এই জনসংখ্যার শতকরা ১০ জনের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এবং আরও শতকরা ১০ জনের জন্য কোন না কোনরূপ সাহায্য দরকার। অর্থাৎ এখনও ৬৫ লক্ষ লোক বাহিরের সাহায্য ভিন্ন স্বাভাবিক জীবন পুনরায় আরম্ভ করিতে পারিবে না। গবর্মেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইহার মধ্যে শতকরা মাত্র এক জনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং শতকরা আর এক জনের সাহায্যের ভার মাত্র তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

সমগ্র অঞ্চলটিকে ৪০০ কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে কয়েকটি করিয়া ওয়ার্ক হাউস গঠিত হইবে। গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য ৬০টি এবং শিশু ও নারীদের জন্য ৬০টি আশ্রয়স্থান নির্মিত হইবে।

সরকারী রাজস্ব বিভাগ কার্য্য পরিচালনা করিবেন, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটরী ডিরেক্টর হইবেন এবং একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের উপর প্রকৃত পক্ষে পরিকল্পনা কার্য্যে

পরিণত করিবার ভার থাকিবে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া ইনস্পেক্টর সুপারভাইজার প্রভৃতি নিযুক্ত করা হইবে। কেরাণী প্রভৃতির জন্য একমাত্র কলিকাতা আপিসেই মাসে হাজার টাকা ব্যয় হইবে। ওয়ার্ক হাউসে জিনিষ বিক্রয়ের জন্য দুই জন মার্কেটিং অফিসার ২০০ হইতে ২৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইবেন। মোটের উপর পেন্সনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহাই গবর্মেণ্টের আশা।

দুর্গত সাহায্যে বহুদর্শী সমাজসেবী শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এই পরিকল্পনা অবাস্তব ও ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। পরিকল্পনাটি দেখিবার পর আমরাও তাঁহার অভিমতই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর মতে উহার মধ্যে কার্য্য পরিচালনার বন্দোবস্ত বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু আসল কাজের কথা উহাতে সামান্যই আছে।

দুর্ভিক্ষোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে, দুর্ভিক্ষের মধ্যেই আমরা ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি, কিন্তু সরকারের কর্ণে উহা প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ। ৬০।৭০টি, এমন ৬০০০।৭০০০ ওয়ার্ক হাউস প্রতিষ্ঠা করিয়াও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। দয়া ভিক্ষা দিয়া অথবা দুই দশ টাকা দান করিয়া সমাধান করিবার সমস্যা ইহা নহে। বহুকালাবধি বাংলার অর্থনৈতিক বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে, কৃষি ভিন্ন কৃষকদের উপার্জনের অপর সমস্ত পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে।

—

উড়িষ্যার শিক্ষায়তন হইতে বঙ্গভাষা বহিষ্কার

উড়িষ্যার শিক্ষায়তন হইতে বঙ্গভাষার পঠন-পাঠন বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল কটক র‍্যাভেনশ কলেজে বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেশীয় ভাষার মধ্যে কেবল উর্দু ও উড়িয়া কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অথচ উড়িষ্যায় উর্দু যাহারা মাতৃভাষা বলে তাহাদের সংখ্যা বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগে বহরমপুর ও পার্লাকিমেডিতে কলেজে তেলেগু পড়ানো হয় কিন্তু প্রদেশের যে অংশে বহু বাঙালীর বাস সেই অঞ্চলে বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা বন্ধ করা হইতেছে। দৈনিক বসুমতী জানাইয়াছেন:

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন উড়িষ্যার বাঙালীদিগের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বাঙালীদিগের অসুবিধা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়, তখন ২২শে অক্টোবর তারিখে সরকারের সেক্রেটরী মিষ্টার স্যামুয়েল দাশ উত্তরে লিখিয়াছিলেন:—

(১) ভাষা ব্যতীত অন্য বিষয়ে উড়িয়াই শিক্ষার বাহন হইলেও ঐ সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বাংলাতেও থাকিবে। কাজেই বাঙালীদিগের এমন ভয় করিবার কারণ নাই যে, তাঁহাদিগের সামাজিক বা সংস্কৃতিমূলক প্রয়োজন ক্ষুণ্ণ হইবে।

(2) "The head-masters are being instructed that in case a Bengalee student finds it difficult to understand the teachers when instruction is given in Oriya, they should see that such difficulties are removed by the teachers explaining the matter either in Bengali or in English."

অর্থাৎ, হেড মাষ্টারদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, যদি কোন ক্ষেত্রে উড়িয়ায় বুঝাইলে কোন বিষয় বাঙালী ছাত্রের বুঝিবার অসুবিধা হয়, তবে তাহাকে বাংলায় বা ইংরেজীতে বিষয়টি বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, আর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই প্রতিশ্রুতি পদদলিত করা হইতেছে।

বঙ্গের বাহিরে ভিন্ন প্রদেশগুলিতে যেসব বাঙালী আছেন, সেই সব স্থানের বহু স্কুল কলেজ হইতে বঙ্গভাষা বিতাড়নে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাদান এক মহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। উড়িষ্যাতেও এই সঙ্কীর্ণতার অনুসরণ গভীরতর দুঃখের বিষয় এই জন্য যে, বাংলার সহিত উড়িষ্যার যোগ বহু দিনের এবং বর্তমান উড়িষ্যার জীবন সাহিত্য ও সংস্কৃতি গঠনে বাঙালীর দান সামান্য নহে।

—

দিনাজপুর জেলে নারী রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরে খানাতল্লাসী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে গবর্মেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় ২টার সময় প্রায় ৬ জন সাধারণ বস্ত্র পরিহিত গোয়েন্দা পুলিস কর্মচারী রাইফেল ও বেয়নেটে সজ্জিত সাত জন পুলিস কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দিনাজপুর জেলে মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসী করে। জেল কর্তৃপক্ষ এইরূপ খানাতল্লাসীর বিষয় পূর্বে অবগত ছিলেন না অথবা তাঁহাদিগকে এ জন্য আহ্বান করাও হয় নাই। ইহার পূর্বে জানুয়ারীর প্রায় মধ্যভাগ

হইতে জেলের চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরী স্থাপন করা হয়। তাহারা ২৪ ঘণ্টা বাহিরে তাঁবুতে অবস্থান করিত এবং ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আট মাস তাহাদিগকে তথায় রাখা হয়।

ডেপুটি ইনস্পেক্টর-জেনারেল আগষ্ট মাসে জেল পরিদর্শন করেন এবং এই প্রকার ব্যাপারে তাঁহার অসম্মতির কথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানান—এই সংবাদ সত্য কি না এবং ঠিক কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে সশস্ত্র কনেষ্টবলগণ এবং গোয়েন্দাবিভাগের কর্মচারিগণ জেলে এবং মহিলা বন্দীদের থাকিবার স্থানে প্রবেশ করে এই প্রশ্ন করা হইলে সরকারপক্ষ উত্তরে বলেন যে জনস্বার্থের ক্ষতি না করিয়া এই বিবরণ প্রকাশ করা যায় না; সাধারণের নিরাপত্তার জন্যই উহা করা হইয়াছে।

তের জন সশস্ত্র পুলিসের এই হানা যখন হয়, জেলে তখন মাত্র তিন জন নারী বন্দী ছিলেন।

গবর্ন্মেণ্ট এই সংবাদ প্রকাশিত হইতে দিয়াছেন। তিন জন মাত্র নারীর দ্বারা সাধারণের নিরাপত্তার ঠিক কি ক্ষতি তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন ঐ সঙ্গে তাহা জানাইয়া দিলে দেশবাসী তাঁহাদের কার্য্যের অর্থ বুঝিত, সতর্ক হইবারও সুযোগ পাইত।

—

বোম্বাইয়ে দুগ্ধ নিয়ন্ত্রণ

খাদ্য রেশনে বড় শহরের মধ্যে বোম্বাই পথপ্রদর্শক। প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য রেশনে সাফল্য অর্জনের পর বোম্বাইবাসিগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক খাদ্য রেশনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পিপ্‌লস প্রভিন্সিয়াল ফুড কাউন্সিল, বম্বে প্রেসিডেন্সী উইমেন্স কাউন্সিল, চিকিৎসক সঙ্ঘসমূহ এবং খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎসাহী আরও ৩০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ একত্রিত হইয়া একটি প্রটেকটিভ ফুড্‌স কনফারেন্স আহ্বান করেন। সর্ হোমি মোদী এই আন্দোলনের নেতা। শহরগুলিতে সাধারণ ও সামরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি দুগ্ধ প্রভৃতির দুর্মূল্যতার একটি প্রধান কারণ ইহা স্বীকার করিলেও সর্ হোমি মোদী অতিলোভী সমাজদ্রোহীদেরও ইহার জন্য কতকটা দায়ী করেন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য দুগ্ধ প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত অত্যাবশ্যক খাদ্য অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন দেশের গবর্ন্মেণ্ট ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে শিশুদের দুগ্ধ সরবরাহের জন্য রেড ক্রস প্রভৃতি দুই-একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া ব্যাপক কোন চেষ্টাই হয় নাই। গবর্ন্মেণ্ট তো কিছুই করেন নাই। ইংলণ্ডের চার কোটি লোকের খাদ্য সরবরাহের জন্য বার্ষিক ২০ কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ ৩০০ কোটি টাকা সাহায্য (subsidy) স্বরূপ ব্যয়িত হয়; ইহার মধ্যে একটা মোটা অংশ সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহে ব্যয় হয়।

বোম্বাই সম্মেলনের বিবরণীতে জানা যায় বোম্বাই সরকার ইতিমধ্যেই দুগ্ধ রেশন পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। প্রতি শিশুকে দৈনিক অত্যন্ত অল্প মূল্যে এক পোয়া হিসাবে ৬০ হাজার শিশুর দুগ্ধের ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় সম্প্রতি দুগ্ধ বৃদ্ধি আন্দোলন লইয়া সভাসমিতি হইয়াছে। এখানেও বোম্বাইয়ের ন্যায় স্থায়ী ভাবে কি কিছু করা যায় না?

—

বণ্টনের নমুনা

গত ৮ই মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাংলার জেলা-সমূহে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য জনসাধারণের পক্ষে লবণ, কয়লা, চিনি, সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি প্রাপ্তিতে যে অসুবিধা ঘটিতেছে তৎপ্রতি গবর্ন্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতায় অভিযোগ করা হয়—

"সরকারের নিয়মানুসারে যে সকল মাল লোকের ব্যবহারের জন্য পাঠান হয়, তাহা প্রথমে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মহকুমা হাকিম প্রভৃতি সরকারী চাকুরীয়াদিগকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই লোকের ভাগ্যে ও ভাগে পড়ে।

রাজসাহীর স্থানীয় পত্রে প্রকাশ, কিছু দিনের পর রাজসাহীতে এক মালগাড়ী জ্বালানী কয়লা যায়। জেলার রাজকর্মচারীরা আদেশ করেন—ছাড় ব্যতীত কাহারও নিকট কয়লা বিক্রয় করা হইবে না। যদি প্রত্যেক গৃহস্থকে কয়লা দেওয়া হইত, তবে প্রত্যেকের ভাগে ১০ সের কয়লা পড়িত। কিন্তু যে হিসাবে ছাড় দেওয়া হয়, তাহাতে—

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট		২৫ মণ
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট	১৫ হইতে	২৫ মণ
মহকুমা হাকিম		১০ মণ
বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের খাস মুন্সী		১০ মণ

পাইবেন, নির্দেশ দেওয়া হয়। কয়লা-ব্যবসায়ী আর এক জন রাজকর্মচারীর ১০ মণের ছাড় অনুসারে কয়লা সরবরাহ

না করায় তাঁহাকে—কেন তাঁহার লাইসেন্স বাতিল করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে বলা হয়।"

ইহার পর মাসাধিককাল গত হইয়াছে। বাংলা-সরকার এ সম্বন্ধে কোন তদন্ত করিয়াছেন অথবা ভবিষ্যতে কোন জেলায় এই ধরণের অন্যায় সুযোগ আদায় করিবার চেষ্টা সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে না করিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, এরূপ কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

—

কলিকাতায় সব্জী সরবরাহ

দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় দৈনিক ১৫০ মণ সব্জী চালানের বন্দোবস্ত বাংলার মন্ত্রীরা করিয়াছেন। সব্জী বলিতে প্রধানতঃ মটরশুঁটি, বীন, বাঁধাকপি এবং বীট, অর্থাৎ সাহেবী খাদ্য বুঝাইবে। আপাততঃ নিউ মার্কেটে আটটি অনুমোদিত দোকানে নির্দিষ্ট দরে এই সব সব্জী বিক্রয় হইবে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় সব্জীর দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা আন্দোলন করিয়াছিলেন, বাংলা-সরকার এই অসুবিধা দূর করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন এই সংবাদ দিয়াছিলেন এবং সরকারের উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদেও ইউরোপীয় দলের তরফ হইতে কলিকাতায় সব্জীর অভাব সম্বন্ধে আন্দোলন হইয়াছিল।

এই ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর যাবৎ মাছ তরকারী দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই। শহরতলী অঞ্চল হইতে সব্জী আনিবার জন্য কিছু লরীর বন্দোবস্ত অথবা মাছ আনিবার জন্য বরফের ব্যবস্থা বাংলা-সরকার আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ষ্টেটসম্যান ও ইউরোপীয় দলের আন্দোলনে দার্জিলিং হইতে দৈনিক ১৫০ মণ করিয়া সব্জী আনিবার ব্যবস্থা মাসখানেকের মধ্যেই হইয়া গেল। এক পোয়া হিসাবে এই ১৫০ মণ বোল হাজার লোকে পাইবে, অর্থাৎ সাহেবদের পক্ষে সব্জীর অভাব কতকটা মিটিবে, বিক্রয়কেন্দ্রও সাহেবদের হাতের কাছে নিউ মার্কেটেই করা হইয়াছে। দেশবাসীর সকল অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া সাহেব তোষণের এরূপ নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত বিরল।

ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের বাধাদান

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে গত ২৫শে মে অর্থসচিবের বক্তৃতায় বিরোধী দলের বাধা দানের জন্য যে গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছিল, কেহ কেহ তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়াছেন। ৮ই জুন পরিষদে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে আজ যাঁহারা বিরোধী দলের আচরণ সম্বন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন, বিরোধী দল হিসাবে দুই বৎসর পূর্বে তাঁহারাই অনুরূপ কাজ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"মোসলেম লীগ দল যখন বিরোধী দলে ছিলেন সেই সময় ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার পক্ষের মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে বাধা দিবার জন্য সর্ নাজিমুদ্দীন, মিঃ সুরাবর্দ্দী, খান বাহাদুর মহম্মদ আলি, খাজা সাহাবুদ্দীন ও ইউরোপীয় দল যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া মিঃ বদরুদ্দোজাকে বলিতে দেন নাই, সেই ঘটনার বিবরণ পাঠ করিয়া ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে ডেপুটিস্পীকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য মিঃ সুরাবর্দ্দীকে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু মিঃ সুরাবর্দ্দী পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ডেপুটিস্পীকার বিরোধী দলের নেতা সর্ নাজিমুদ্দীনকে এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে সর্ নাজিমুদ্দীন অস্বীকার করেন। সর্ নাজিমুদ্দীনের দল ডেপুটিস্পীকারের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার লাঠি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লন। ডেপুটিস্পীকার বাধ্য হইয়া অধিবেশন মুলতুবী করিয়া দেন।"

বিরোধী দলের এইরূপ কার্য্যকলাপ সর্বদেশেই পার্লামেণ্টরি ট্যাক্‌টিক্‌স হিসাবে প্রচলিত। ব্রিটিশ এবং ফরাসী পার্লামেণ্টের কার্য-বিবরণীতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। ঘুষাঘুষি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি, স্পীকারের দণ্ড অপসারণ প্রভৃতিরও দৃষ্টান্ত আছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা এমন একটা ভাব দেখাইয়াছিলেন যেন এরূপ একটা ব্যাপার পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে নাই। ব্রিটিশ বা ফরাসী পার্লামেণ্টের কাহিনী ষ্টেটসম্যান অবগত নহেন ইহা অবিশ্বাস্য। বর্তমান মন্ত্রীদলের কার্যকলাপের সমালোচনা যাঁহাদের মতে নিম্নস্তরের রাজনীতি (low level politics), যাঁহাদের সহিত ইউরোপীয় দলের আঁতের যোগ বর্তমান, তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া ষ্টেটসম্যান প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন ইহাই স্বাভাবিক।

রাজা মানসিংহ

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

৭

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালার সুবাদার উজীর খাঁ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধলোকে গমন করিলেন। পূর্ব্বাপর প্রথা অনুসারে বিহারের সুবাদার সৈদ খাঁ বাঙ্গালায় এবং কুমার মানসিংহ পেশাওয়ার হইতে বিহারে বদলি হওয়ার হুকুম পাইলেন। কুমার মানসিংহ জামরুদের থানা হইতে লাহোরে আসিয়া ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে বিহার যাত্রা করিলেন। সৈদ খাঁ চাঘ্‌তাই শাহজাদা সেলিমের অন্যতম শ্বশুর, খান্‌দানী আমীর—তাঁহার বাপ-দাদা বাবর-হুমায়ুনের সময় হিন্দুস্থান জয় করিয়াছে। মানসিংহ শাহজাদার শ্যালক, আকবরশাহী তূণের শব্দভেদী বাণ। পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা-বিহারের সুবাদার যুগলের রেষারেষির ফলে কার্য্য পণ্ড হওয়াতে আকবর তাঁহার নিকট-আত্মীয়দ্বয়কে পূর্ব্ব-ভারতে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সৈদ খাঁ রাজধানী টাণ্ডায় পদার্পণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন বিহারের সুবাদারীই তাঁহার পক্ষে ছিল ভাল—নূতন উপাধির আনুষঙ্গিক ব্যাধি ম্যালেরিয়া, উদরাময়, দাদ-বিখাউজ এবং অষ্টপ্রহর ভয় ও দুশ্চিন্তা। ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) এবং কুচবিহারকে কেন্দ্র করিয়া হতাবশিষ্ট বিদ্রোহী মোগল মন্‌সবদারগণ তখনও বরেন্দ্রভূমিতে অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছিল; ইসা খাঁর হস্তে শাহবাজ খাঁর বিষম পরাজয়ের ফলে পূর্ব্ববঙ্গে মোগলের বিজয়লক্ষ্মী ছায়ায় পরিণত; উড়িষ্যার কতলু খাঁর প্রতাপে সুবে বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমা সুবর্ণরেখার তীর হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সৈদ খাঁ কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া বিহারে টিকিয়া ছিলেন মাত্র। মানসিংহ আসিয়া দেখিলেন বিহারেও বহ্নি ধূমায়মান। গিধৌরের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের জমিদার পূরণমল, পাটনা হাজিপুর অঞ্চলের পরাক্রান্ত রাজা সংগ্রাম এবং সাহাবাদ জেলার দুর্দ্ধর্ষ চেরো জাতির নেতা অনন্ত চেরো—সকলেই বিদ্রোহী। দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রয়োজন মত দণ্ড এবং সাম-নীতি প্রয়োগ করিয়া কুমার মানসিংহ দক্ষিণ-বিহারে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। আকবর-শাহী নীতি অবলম্বন করিয়া মানসিংহ পূরণমলের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রভাণের বিবাহ দিলেন এবং গিধৌর প্রভৃতি বিজিত দুর্গ পূরণমলকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বিদ্রোহীগণের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে স্ব-স্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় করাই ছিল মানসিংহের শাসন-নীতি। মানসিংহ যখন অনন্ত চেরোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন সুলতান কুলী প্রভৃতি বাঙ্গালার বিদ্রোহীগণ সরকার তাজপুর এবং পূর্ণিয়া লুটপাট করিয়া উত্তর-বিহারের প্রধান মোগল থানা দ্বারবঙ্গের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিল। মোগল থানাদার ফারুখ খাঁ বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বিদ্রোহীরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হাজিপুরে হানা দিল। এই সময়ে মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎসিংহ ছিলেন বিহার-শরীফের ফৌজদার। কিশোর বালক জায়গীরদারী ফৌজ সংগ্রহ করিয়া অসীম সাহসে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এবং লুটের মাল কাড়িয়া লইয়া কুমার বিজয়গৌরবে বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রেরিত ৫৪টি হস্তী এবং লুটের মূল্যবান সামগ্রীসমূহ শাহী দরবারে সম্রাটের দৃষ্টিপ্রসাদ লাভ করিল।

৮

আকবর-রাজত্বের পঞ্চত্রিংশ বৎসরে, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মানসিংহ সুবে বিহারের ফৌজ লইয়া ঝাড়খণ্ড বা বর্ত্তমান ছোটনাগপুরের পথে উড়িষ্যার অধিপতি অদম্য কতলু খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে সাঁওতাল পরগণা এবং বীরভূমের মধ্য দিয়া এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তিনি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। বর্ষা আসন্নপ্রায় এই অজুহাতে বাঙ্গালার সুবাদার সৈদ খাঁ এই অভিযান স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন, তবে কয়েক জন বাদশাহী মন্‌সবদার—পাহাড় খাঁ, বাবুই মানকালী, রায় পিতরদাস—সুবে বাঙ্গালা হইতে তোপখানা লইয়া মানসিংহের সহিত জাহানাবাদে যোগদান করিলেন। জাহানাবাদ বা বর্ত্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ বর্দ্ধমানের দক্ষিণ ও হুগলীর পশ্চিম সীমান্তে ধলকিশোর নদীর পূর্ব্ব তীরে সেকালে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মেদিনী-পুরের রাস্তা ধরিয়া মোগলবাহিনীর দক্ষিণমুখী অভিযান

বিফল করিবার উদ্দেশ্যে কতলু খাঁ জাহানাবাদের ২৫ ক্রোশ দক্ষিণে ধারপুর* নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং বাহাদুর কুরোহ্† (গোড়িয়া ?) নামক একজন ধূর্ত্ত সেনানায়কের অধীনে একদল পাঠান সৈন্য রায়পুরের দিকে প্রেরণ করিলেন। সেকালে কস্‌বা রায়পুর সরকার জলেশ্বরের একটি প্রধান স্থান ছিল ; এখানে একটি মজবুত কেল্লাও ছিল। মেদিনীপুর পশ্চাতে রাখিয়া কতলু খাঁ বোধ হয় রূপনারায়ণের তীর হইতে শালবনী-রায়পুর পর্য্যন্ত সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা হামীর এই সময় কতলু খাঁর পক্ষ ত্যাগ করিয়া মানসিংহের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। পাঠান ব্যূহের বামপার্শ্ব আক্রমণ এবং বিষ্ণুপুর রক্ষা করিবার জন্য মানসিংহ কুমার জগৎসিংহকে জাহানাবাদ হইতে সিলাই নদীর উত্তর তীর ধরিয়া পশ্চিমমুখী অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। ফাঁকা ময়দানের লড়াইয়ে বাহাদুর হইলেও অপরিচিত বনজঙ্গলে পাঠান সৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে গিয়া জগৎসিংহ বেকায়দায় পড়িলেন। এই ঘটনার আবুলফজল-বর্ণিত অস্পষ্ট বর্ণনার মধ্যে মনোরম ঐতিহাসিক উপন্যাসের গুঞ্জাইস ছিল ; বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী এই উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

কতলু খাঁর সেনাপতি বাহাদুর (গোড়িয়া ?) মায়ামৃগের মত জগৎ সিংহকে অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত করিয়া অবশেষে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খেঁকশিয়াল জালে পড়িয়াছে ভাবিয়া জগৎসিংহ আরাম-আয়াসে গা ঢালিয়া দিলেন। সাহসী এবং সুচতুর যোদ্ধা হইলেও কুমার অমিতাচারী এবং অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন,—পৈত্রিক আফিমের নেশাটা ছিল শরাবের উপরই ফাউ। রাজপুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া বাহাদুর কতলু খাঁকে লিখিলেন—শিকার বেহুঁসিয়ার হইয়াছে, আরও কিছু সাহায্য আবশ্যক। কতলু তাঁহার বিশ্বস্ত এবং স্থিরবুদ্ধি উজীর মিঞা ঈসা এবং পাঠান শার্দ্দূল উমর খাঁর অধীনে অপর একটি সৈন্যদল বাহাদুরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন—মানসিংহ বা জগৎসিংহ কেহই দুষমনের নূতন চাল কিছুমাত্র টের পাইলেন না। বিষ্ণুপুরের রাজা হামীর জগৎসিংহকে সাবধান করিয়াছিলেন। কুমার ধীরেসুস্থে* টহলদার সিপাহী পাঠাইয়া খবর লইলেন পাঠানেরা তখনও বহু দূরে ডেরা গাড়িয়া বসিয়া আছে ; তিনি খোশ্‌মেজাজে শরাবের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। এদিকে নবাগত পাঠানসেনা তাহাদের তাঁবু ইত্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া জঙ্গলের রাস্তায় অতি সংগোপনে কুচ করিয়া খুব সম্ভব শেষ রাত্রে নিঃশব্দে সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে যুগপৎ রাজপুত শিবিরে হানা দিল। জগৎসিংহ তখন নেশাজনিত গভীর নিদ্রায় অচেতন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বীকা রাঠোর, মহেশদাস, নারু চারণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। বাদশাহী ফৌজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং ধ্বংসপ্রায় হইল (২১ মে, ১৫৯০)†। জাহানাবাদে খবর পৌঁছিল কুমার জগৎসিংহ মারা গিয়াছেন। মানসিংহ তাঁহার সহকারী সেনানীগণকে মন্ত্রণাকক্ষে আহ্বান করিয়া এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মে মাস প্রায় শেষ হইয়াছে ; বর্ষার বিলম্ব নাই ; তদুপরি এই শোচনীয় পরাজয়। অধিকাংশ সেনানায়কেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সোজা রায় দিলেন, সিপাহীদের পরিবার আছে সেলিমাবাদে—সেখানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করাই নিরাপদ ! সেলিমাবাদ জাহানাবাদ হইতে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং বর্দ্ধমান হইতে পনর-কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে সরকার সাতগাঁর মধ্যে অবস্থিত ও দামোদর নদী দ্বারা সুরক্ষিত। মানসিংহ পাঠানের চরিত্র ভালরকম জানিতেন ; বর্ষার দুর্য্যোগই পাঠানের পক্ষে সুযোগ ; নেকড়ে বাঘের পাল হইতে পলাইয়া যেমন কেহ কখনও বাঁচে না, তেমনি পাঠানের হাত হইতে পলাইয়া সেলিমাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বাদশাহী ফৌজ হয়ত রক্ষা পাইবে না। তিনি মন্‌সবদারগণকে আশ্বস্ত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। আকবর বাদশাহ ছিলেন অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ ;

* *Akbarnama* ii, p. 879. রেনেলের ম্যাপে কিংবা আইন-ই-আকবরীতে ধারপুর নামক কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না। জাহানাবাদের দক্ষিণে যেখানে ধলকিশোর অন্য একটি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ নদ সৃষ্টি করিয়াছে, ঐখানে ধামগিরি (?) নামক একটি স্থান রেনেলের ম্যাপে দেখা যায়। আবুলফজল বর্ণিত ধারপুর বোধ হয় উহার কাছাকাছি কোন স্থান।

† "কুরোহ্‌" শব্দের কোন মানে হয় না। মূল ফার্সিতেও অনেক সময় গাফ্‌ অক্ষরের স্থানে কাফ্‌-ই-আরবী পাঠ করা হয়। শব্দটি Guroh বা গোড়িয়া বলিয়া অনুমান হয়। বাহাদুর নামজাদা পাঠান সর্দ্দার ; সম্ভবতঃ গৌড়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন। লোহানীরা বিহারের পাঠান।

* বাঙ্গালায় চলিত "ধীরে সুস্থে" পদ শুদ্ধ নয়। কারণ, "সুস্থ" (healthy) "ধীরে"র সঙ্গে জুড়িয়া দিলে কোন মানে হয় না। আসলে মূল ফার্সি *Sust* (Lazy) *Susti* (Laziness) হইতে "সুস্থ" বাংলা ভাষার অশুদ্ধ আকারে গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান শুদ্ধির যুগে "ধীরে সুস্তে" সংস্কার আবশ্যক।

† V. S. Bendry-কৃত *Tarikh-I-Ilahi*, published by G. B. Nara, Poona, পুস্তক অবলম্বনে ১০ই খুরদাদ, ইলাহী সন ৩৫ = ২১শে মে, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

জয়পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে তাঁহার একাধিক শত্রু অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ কতলু খাঁ জগৎসিংহের পরাজয়ের দশ দিন পরেই রোগে ভুগিয়া পরলোকগমন করিলেন—বঙ্কিম-কল্পিত বিমলার বেণীমধ্যে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকাঘাতে নহে। ইতিমধ্যে আরও সুসংবাদ পৌঁছিল কুমার জগৎসিংহ রাজা হামীরের চেষ্টায় রক্ষা পাইয়া বিষ্ণুপুরে নিরাপদে আছেন। ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও জগৎসিংহের মত বীরের পক্ষে ঐখানে একটি "তিলোত্তমা" লাভ কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। অবশেষে মানসিংহের অসামান্য সাহস এবং দৃঢ়তাই জয়ী হইল। আগষ্ট মাসে (১৫৯০ খ্রীঃ) কতলু খাঁর পুত্র উড়িষ্যার মসনদের মালিক নাসির খাঁকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ উজীর মিঞা ইসা মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং বাদশাহী পেশকশ-স্বরূপ ১৫০টি হস্তী এবং বহু মূল্যবান সামগ্রী ভেট দিলেন। উভয় পক্ষই সন্ধির জন্য সমান উদ্‌গ্রীব, কারণ পাঠান শিবিরে আত্মকলহ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, এবং অপর পক্ষে মানসিংহের মাথার উপর মুষলধার বাঙ্গালার বর্ষা; উপরন্তু সুবাদার সৈদ খাঁর এই অভিযানে অনিচ্ছা এবং উদাসীনতার জন্য ক্ষোভ। সন্ধির সর্ত্তানুসারে উড়িষ্যায় আকবরশাহী সিক্কা এবং খোত্‌বা পাঠ জারী হইল এবং পুরী জেলা জগন্নাথের মন্দির সমেত দেওয়ান-ই-খালসার অধীন, অর্থাৎ বাদশার খাসদখলী স্বত্বে পাঠানেরা ছাড়িয়া দিল। যে সমস্ত জমিদার সম্রাটের প্রতি নিমক-হালালী করিয়াছে,—যথা বিষ্ণুপুরের রাজা হামীর—পাঠানেরা তাহাদিগকে উত্যক্ত করিবে না—ইহাও ছিল সন্ধির অন্যতম সর্ত্ত।

৯

জাহানাবাদের সন্ধির পর মানসিংহ বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। এই সন্ধি সম্রাটের মনঃপূত হয় নাই। পাঠানেরা মনে করিল যুদ্ধে জিতিয়াও তাহারা মানসিংহের ধাপ্পাবাজীতে বেকুব বনিয়াছে। মোগল-পাঠানের সন্ধি পদ্মপত্রে জল—কেবল গড়াইয়া পড়িবার ফিকিরেই থাকে। কতলু খাঁর উজীর মিঞা ইসা এক বৎসরের মধ্যেই প্রভুর অনুগমন করিলেন; উড়িষ্যার পাঠানদিগের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য এবং ঘরোয়া বিবাদ দেখা দিল। শান্তির সময়ে পাঠানেরা প্রায়ই আত্মকলহপরায়ণ; ভাই-ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া চরমে উপস্থিত হইলে তাহারা পিতৃব্যপুত্রের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটাইয়া থাকে। কতলু খাঁর পুত্রদের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান এবং অন্যান্যদের সদ্ভাব ছিল না। যোগ্যতা অনুসারে উড়িষ্যার মসনদ প্রাপ্য ছিল ওসমানের। যাহা হউক পাঠানেরা স্থির করিল, নিজেদের মধ্যে গলা কাটাকাটি অপেক্ষা মোগল রাজ্য আক্রমণ করাই লাভজনক। বিষ্ণুপুরের রাজা হামীর কুমার জগৎসিংহকে আশ্রয় দান করিয়া তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল—পাঠান সে কথা ভুলিতে পারে নাই। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাবসানে পাঠানেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিল।

আকবরের মন্ত্রশিষ্য, অনাগতবিধাতা মানসিংহ এইরূপ পরিস্থিতির জন্য আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহারের মনসব্‌দারী ফৌজ পূর্ব্ব হইতেই তৈনাৎ ছিল; অধিকন্তু পূরণমল গিধোরিয়া* রাজা সংগ্রাম, অক্কর (অক্রূর?) পঞ্চানন প্রভৃতি হিন্দু সামন্ত রাজগণ এবং উত্তর-বিহারের বাদশাহী মনসবদারগণ মানসিংহের আমন্ত্রণে সসৈন্যে উপস্থিত হইল। বিগত অভিযানে বাঙ্গালার সুবাদার সৈদ খাঁর আচরণ দিল্লীশ্বরের অজ্ঞাত ছিল না।

দিল্লীর বাদলগড় দুর্গে মহাসমারোহে তাঁহার সৌর জন্মদিবস (১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর—*Akbarnama* iii 916) উপলক্ষে দ্বাদশ তুলাপুরুষ মহাদান সমাপ্ত করিয়া সম্রাট্ মীর শরিফ† আমুলী নামক তাঁহার খাসা মুরীদকে সুবে বাঙ্গালা-বিহারে যাইবার হুকুম দিলেন। আসন্ন

* Puran Mal Kaidhuriā (*Akbarnama* iii 934)—বেভারিজ সাহেব গিধোরিয়াকে কৈধুরী পাঠ করিয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছেন, নাম সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ অনবধানতার উদাহরণ 'আকবরনামা'র অনুবাদে পাওয়া যায়।

† মীর শরীফ আমুলী পারস্যের অন্তর্গত আমুল নামক শহরের অধিবাসী। তিনি পূর্ব্বে "শিয়া" ছিলেন, পরে সম্রাটের নিকট দীন-ই-ইলাহী ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন। ফতেপুর সিক্রির এবাদৎ-খানার ধর্ম্ম-বিষয়ক বিতর্ক-সভায় দাশনিকের ভূমিকায় দাবিস্তান-উল-মুজাহেব গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অতি বিদ্বান্, সুনিপুণ তার্কিক, এবং সেই জন্যই মোল্লা সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল ছিলেন। তাঁহার প্রতি বদায়নীর তীব্র শ্লেষ Mr. Lowe সুন্দর ভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন:

There is a heretic Sharif by name,
Who talks big though of doubtful fame."

মীর শরীফ আমুলীকে "জগদ্‌গুরু" আকবরের চেলা না বলিয়া মুরীদ বলাই সঙ্গত; কেননা বাদশাহ গোলাম বাঁদী ইত্যাদি হীনতাসূচক শব্দের ব্যবহার সর্ব্বত্র বাতিল করিয়া ক্রীতদাসদাসীগণকে চেলা-চেলী বলিবার রেওয়াজ চালু করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান পর্য্যন্ত এই অর্থে চেলা শব্দ প্রচলিত ছিল। মানবতার প্রতি এই দরদ ও ইজ্জত আকবরকে ইতিহাসে আকবরত্ব প্রদান করিয়াছে। কথ্য বাংলায় "চেলা" "চেলী" (ছোট ছেলে-মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য) বোধ হয় উক্ত শব্দ-দ্বয়ের বিকৃতি।

উড়িষ্যা অভিযানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হিসাবে তাঁহাকে প্রেরণ করার প্রয়োজন সম্রাট্ পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাদশাহী কৌমকী (auxiliary) ফৌজ মানসিংহের সাহায্যার্থে কাশ্মীরের সামন্তরাজ ইউসুফ খাঁর অধীনে পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছিল। সাহায্যকারী মনসব্দারগণের অধীন সৈন্যদিগের তদারক করিবার জন্য সম্মিলিত বিহার-বঙ্গবাহিনীর বক্শীপদে (Paymaster General) উক্ত তারিখে নিযুক্ত হইলেন মীর শরীফ সরমদী। সম্রাট্ তাঁহার প্রিয় শিষ্য আমুলীকে একেবারে চতুর্ম্মুখ বানাইয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন। শরীফ আমুলীকে একসঙ্গে চারিটি পদাধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল।* যথা (১) খলিফা, (২) আমিন, (৩) সদর, (৪) কাজী। আকবর বাদশাহ নিজেকে পয়গম্বর মনে না করিলেও দীন-ই-ইলাহী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু হিসাবে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার অধিকার তাঁহার ছিল (এখনও এদেশের নামজাদা পীরসমূহ এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু এক এক প্রদেশের জন্য খলিফা নিযুক্ত করিয়া থাকেন)। বাঙ্গালা-বিহারে আমীরদের মধ্যে যাঁহারা বাদশাহের মুরীদ ছিলেন তাঁহাদের ধর্ম্ম-উপদেষ্টা হিসাবে বোধ হয় শরীফ আমুলী এই সম্মান লাভ করেন। আমিন (arbitrator) পদ প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন শের শাহ—যাঁহার আমলে বাঙ্গালা দেশে কাজী ফজিলৎ আমীন নিযুক্ত হইয়াছিল। একাধিক সমপদস্থ কর্ম্মচারীর মধ্যে কোন বিবাদ কিংবা বিতর্কমূলক বিষয় উপস্থিত হইলে মধ্যস্থতা করিয়া সরেজমীনে মীমাংসা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন আমীন। ইয়ুসুফ খাঁ (কাশ্মীরের রাজা), মানসিংহ, এবং সৈদ খাঁ প্রায় সমপদস্থ; সুতরাং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হম্বড়া মনসবদারের মধ্যে অভিযান পরিচালনা সম্পর্কে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এই আশঙ্কায় সম্রাট্ শরীফ আমুলীকে আমিনের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সদর এবং কাজী ব্যতীত মুসলমানের আইনগত অধিকার রক্ষা এবং ফৌজদারী বিচার চলিত না। চারিটি বিভিন্ন পদে চারিজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে কার্য্য পণ্ড হইতে পারে—এই জন্য এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পদ সৃষ্টি করিয়া সম্রাট্ এক গুরুতর সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

১০

মীর শরিফ আমুলী বাঙ্গালায় পৌছিবার পূর্ব্বেই মানসিংহের দ্বিতীয় উড়িষ্যা অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। বিহারের ফৌজ ইয়ুসুফ খাঁর অধীনে ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুর—বীরভূমের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল। রাজা মানসিংহ নৌকাযোগে (বোধ হয় ভাগলপুর হইতে) বাঙ্গালার রাজধানী টাণ্ডার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন (শুক্রবার ৫ই নভেম্বর ১৫৯১ খ্রী:)*। বাঙ্গালার সুবাদার সৈদ খাঁ অসুস্থতার দরুন মানসিংহের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিলেন না; কিছুদিন পরে তিনি বাবুই মানকালী প্রভৃতি জায়গীরদারগণ এবং ছয় হাজার পদাতিক ও পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদারগণ এবং যশোরের রাজা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমার প্রতাপাদিত্যও বোধ হয় মানসিংহের আমন্ত্রণে এই অভিযানে জমিদারী ফৌজ লইয়া বাদশাহী শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার পাঠানগণ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়াছিল। এই বার মোগলবাহিনী বর্দ্ধমান-জাহানাবাদ-মেদিনীপুরের পথে অগ্রসর হইয়া সুবর্ণরেখার উত্তর-তীরে শিবির স্থাপন করিল। পাঠানেরা তাহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্যবল একত্র করিয়া সুবর্ণরেখার দক্ষিণ তীরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড় এবং দাঁতন হইয়া দক্ষিণমুখী যে রাস্তা জলেশ্বর গিয়াছে রাজা মানসিংহ সেই রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই রাস্তায় ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল-মুনিম খাঁর বাহিনী দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দাঁতনের অল্প কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তুকোরায় নামক স্থানে পাঠান সেনাকে পরাজিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধকেই পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ মোগলমারীর যুদ্ধ বলিয়া থাকেন। সর্ যদুনাথ (Bengal Past and Present) প্রমাণ করিয়াছেন তুকোরায়ের যুদ্ধকে মোগলমারীর যুদ্ধ বলিবার কোন হেতু নাই, কারণ মোগলমারী একটি স্বতন্ত্র স্থান, দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে, তুকোরায় হইতে ব্যবধান অন্যূন বার-চৌদ্দ মাইল। তবে মোগলমারী নাম এবং ঐ স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল ইহা কি নিতান্ত বাজে কথা? কোন ঐতিহাসিক এই জনশ্রুতির সত্যতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন কিনা

* *Akbarnama* iii, p. 916 and footnote 3. মূল অশুদ্ধ জানিতে পারিয়াও বেভারিজ সাহেব উহা এ স্থলে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। *Khalifagi* শব্দ ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপিতে আছে। আকবরনামার আর একটি উন্নততর এবং প্রামাণিক মূল সংস্করণ সম্পাদনার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ডক্টর বেণীর ন্যায় কোন পণ্ডিত একটা *Studies* in *Akbarnama* লিখিলে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহমুক্ত হইতে পারিতেন।

* "On 28 Aban of the *previous* (*i.e.*, 36th) year"; Akbarnama, iii, 934.

জানা নাই।* মানসিংহের দ্বিতীয় উড়িষ্যা অভিযানের সময় মোগল এবং পাঠান সৈন্যেরা কোথায় পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘকাল টহলদারী তৎপরতা এবং আপোষের কথাবার্ত্তায় কালহরণ করিতেছিল—উহা নির্ণয় করিতে পারিলে মোগলমারী যুদ্ধ-বিষয়ক জনশ্রুতির উপর আলোকপাত হইতে পারে। মানসিংহের শিবির ছিল একটি নদীর (সুবর্ণরেখার) উত্তর তীরে। পাঠানেরা নদী পার হইয়া মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং যুদ্ধের পর দিনই বাদশাহী সেনা জলেশ্বর অধিকার করে—এই মাত্র উল্লেখ আকবরনামাতে আছে। মোগলমারী গ্রাম হইতে জলেশ্বরের দূরত্ব প্রায় ষোল-সতের মাইল। মোগল অশ্বারোহী সৈন্যদল পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মোগলমারী হইতে এক দিনে জলেশ্বরে উপস্থিত হওয়া কিছু অসাধারণ ব্যাপার নহে। মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য পাঠানেরা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দুর্গম জঙ্গলে জমায়েত হইয়াছিল—স্থানটির নাম মালনাপুর পাঠান্তরে বিনাপুর। রেনেলের ম্যাপে কিংবা আইন-ই-আকবরীতে মোগলমারীর কাছাকাছি সুবর্ণরেখার দক্ষিণ তীরে মালনাপুর কিংবা বিনাপুর নামক কোন স্থান নাই। কিন্তু আকবরনামার বিবরণ পড়িয়া মনে হয় রায়বানিয়াগড় অঞ্চলেই পাঠানেরা শিবির স্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানের পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণরেখার বাঁক; দক্ষিণে দুই মাইল ব্যবধানে একটি ছোট উপনদী; দশ-বার মাইল দক্ষিণে অন্য একটি নদীও জলেশ্বরের নিকট সুবর্ণরেখার সহিত মিলিত হইয়াছে; উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গল। জলেশ্বরের দিকে কুচ করিলে সুবর্ণরেখা পার হইয়া মোগলবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিবে কিংবা মেদিনীপুরের রাস্তায় শত্রুর সরবরাহ এবং পলায়নের পথ বন্ধ করিতে পারিবে—এই মতলবেই পাঠানেরা রায়বানিয়াগড়ের জঙ্গলে আত্ম-রক্ষামূলক সমরকৌশল অবলম্বন করিয়াছিল।

তুকোরায় যুদ্ধের প্রাক্কালে তোডরমল-মুনিম খাঁর মতভেদ অপেক্ষাও এই অভিযানে তীব্রতর ঈর্ষা এবং অসহযোগিতা দেখা দিল। বাঙ্গালার সুবাদার অনিচ্ছায়, সম্রাটের ভয়ে এই অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার ফৌজ লইয়া তিনি একমঞ্জিল (আট-দশ মাইল) পিছনেই আলাদা তাঁবু ফেলিলেন। পাঠানেরা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মোগল শিবিরে কপট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিল—ইহাতে মান-সিংহ-সৈদ খাঁর মতবিরোধ আরও বাড়িয়া গেল। যুদ্ধে অনুৎসাহী বাঙ্গালার মনসবদারগণ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য জিদ করিলেন; কিন্তু মানসিংহ কিছুতেই রাজী হইলেন না। এই অজুহাতে তাঁহারা আরও পিছনে হটিয়া দূরে ডেরা কায়েম করিয়া তামাশা দেখিতে লাগিলেন। সৈদ খাঁ বিরক্ত হইয়া সোজা রাজধানী টাণ্ডায় ফিরিয়া চলিলেন; কেবল বাবুই মানকালী প্রমুখ কয়েক জন সর্দ্দার সৈদ খাঁকে ত্যাগ করিয়া মানসিংহের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মানসিংহ যুদ্ধার্থ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বিহারের ফৌজকে অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। সুবর্ণরেখার উত্তর পারে পাঠান পর্য্যবেক্ষণকারী সৈন্যদের সহিত বাদশাহী ফৌজের ছোটখাট হাতাহাতি কিছু দিন চলিল। মানসিংহ অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার হরাবল বা অগ্রগামী সেনাকে শত্রুর অবস্থানের নিকটবর্ত্তী একটি টিলা অধিকার করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন; কথা ছিল পাঠানেরা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে তিনি স্বয়ং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। এই টিলা সম্ভবতঃ রায়বানিয়াগড়ের মুখোমুখি কোন স্থান। মানসিংহের কৌশল সফল হইল। পাঠানেরা বোধ হয় মনে করিয়াছিল সমস্ত বাদশাহী সেনা নদী পার হইয়া ফাঁদে পড়িয়াছে। তাহারা আরও ভাটিতে সুবর্ণরেখা পার হইয়া ব্যূহবদ্ধভাবে মানসিংহের পশ্চাদ্-ভাগ রক্ষী সৈন্যদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল,—কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে মানসিংহের অধিকাংশ সৈন্য মূল শিবিরেই ছিল। নদী পার হইয়া বরং পাঠানেরাই ফাঁদে পড়িল, পশ্চাতে নদী,—যুদ্ধ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই।

১১

আমাদের মনে হয় উড়িষ্যার মোগল-পাঠানের এই শেষ যুদ্ধ দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে মোগলমারী গ্রামেই ঘটিয়াছিল। আবুল ফজলের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়—উভয় পক্ষে অন্ততঃ পনর-ষোল হাজার সৈন্য ছিল এবং যুদ্ধটাও ঘোরতর হইয়াছিল। কিন্তু এত গোলাগুলি ব্যয়, এত হানাহানির পর পাঠান পক্ষে ৩০০ এবং মোগল পক্ষে মাত্র ৪০ জন সৈন্য মরিল,—আবুল ফজলের এই উক্তি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। পাঠানের মাথাগুলি শিউলি ফুল নহে যে, বাদশাহী ফৌজের ফুৎকারেই মাটিতে গড়াগড়ি দিবে। পাঠান সৈন্য পরাজিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই। উহাদের একদল হিজলীর পাঠান সর্দ্দার ফতে খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, অন্য দল কটকের দিকে পলাইয়া উড়িষ্যার হিন্দু ভূস্বামী রাজা মদু, পুরুষোত্তম ইত্যাদির

* মানসিংহের সহিত পাঠান সেনার এই যুদ্ধ সুবর্ণরেখার উত্তর তীরে ঘটিয়াছিল এ কথা Mr. Beams নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করিয়াছেন (J.A.S.B. 183 p. 236.)

সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। খুরদার রাজা রামচন্দ্র শরণাগত সকলকেই শরণগড় দুর্গে (কটক শহরের তিন মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমানে বড়বাটির কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ) আশ্রয় দিলেন। মানসিংহের সহিত এই যুদ্ধকে "মোগলমারী" আখ্যা দিয়া পরাজিত পক্ষ আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। পাঠানেরা যুদ্ধে হারিলেও বিজিত হয় না। পরাজয়ের মনোভাব পাঠানের নাই; হটিলেও মনে করে জিতিয়াছে। যাহা হউক, মোগলমারীর যুদ্ধ উড়িষ্যায় পাঠান-স্বাতন্ত্র্যের অবসান ঘটাইল।

ক্রমশঃ

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২

গঙ্গার তীরভূমি আজ শত বাহু মেলিয়া যোগমায়াকে আকর্ষণ করিতেছে। ধূ-ধূ-বালু বিস্তার—আলিঙ্গনাবদ্ধ গঙ্গাযমুনার প্রীতি-পূর্ণ প্রবাহ ও পারের বাজরি ক্ষেতের ঘন বন—অদূরে কেল্লার সুউচ্চ প্রাচীর শহরকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সংসারকে দূরে ঠেলিয়া বৈরাগ্য-বাঞ্ছিত এই সুবিস্তীর্ণ চর—অনন্তকাল ধরিয়া শুধু পুণ্য সঞ্চয়ের শুভ্রতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। পুরাণের কাহিনী—মহাভারতের কাহিনী—যাহা যোগমায়া জানেন—হিন্দুযুগ, মোগল-যুগ—বৃটিশ-যুগের ইতিহাস—যাহা যোগমায়া জানেন না—সমস্তই বিস্তীর্ণ চরভূমিতে ও দুর্গের পাদদেশে স্তূপীভূত হইয়াছে, যমুনার বেগপ্রবাহে ভাসিয়া চিরন্তনী কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, গঙ্গার কুলুধ্বনির মধ্যে মিশিয়া গানে ও ফেনার ফুলে সেই অনন্ত কালের চরণেই নিত্য বন্দনার পূজা-উপচার পৌছাইয়া দিতেছে। দারা-গঞ্জের সুউচ্চ পাড়—মাইলখানেক অসমতল চর ভাঙিয়া যেখানে আলো জ্বালিয়া দোকানী পণ্যসম্ভারে ক্রেতাকে আহ্বান করিতেছে, সংসারী সংসার সাজাইয়া সংসারীকে প্রলুব্ধ করিতে চাহিতেছে—সেই উচ্চ পথের আলোক-সমারোহ, কোলাহল ও হাসির জগতে ফিরিবার ইচ্ছা আজ যোগমায়ার নাই। মাঘ মাস নহে যে কল্পবাস করিবেন—তবু বৈশাখের তিনটি পুণ্যময় রাত্রি এই তীর-ভূমিতে যাপন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল। ওপারে ঝুঁসির মঠগুলির গাছপালাঘেরা প্রাসাদগুলি (দূর হইতে সেগুলি প্রাসাদ বলিয়াই ভ্রম হয়) যোগমায়াকে আজ বড় শান্তি দিয়াছে।

অপরাহ্নে দলস্থ দুই একজনকে সঙ্গী করিয়া প্রমদা ঠাকুরাণী আসিলেন।

—হাঁগো বিমলের মা, একলাটি থাকবে এই চরায়। একটা কিছু হ'লে বিমলকে কি বলব ভাই।

—একটা কিছু যদি হয়ই সে তো আমার ভাগ্যি দিদি। এ দেব-স্থানে সে ভয় কিছু ক'র না।

—যোক্কম-দাদা বলছে—তেরাত্তির এখানে কাটালে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

—এখানে যে তিন রাত্রি বাস করতে হয় দিদি।

—তা আমরা কেউ না হয় এসে থাকি?

—না। মনটা বড্ড হু-হু করে, একলাই থাকব আমি।

চরের মধ্যে রাত্রি নামিল। প্রশান্ত স্নিগ্ধ রাত্রি। এ রাত্রির বুক ভরিয়া আছে অগাধ আশ্বাস ও পরিপূর্ণ শান্তি। ঈষৎ উচ্চ পাড়ের নীচেয় নৌকার সারি পাতলা হইয়া গিয়াছে—সঙ্গমের মুখে বসিয়া একটিও পাণ্ডা বা যাত্রী পুণ্যের মাশুল লইয়া আর দর-দস্তুর করিতেছে না। ওপারের বাজরি ক্ষেতটা সপ্তমীর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে কয়খানি নৌকা আছে—তাহার অভ্যন্তরে মাঝিরা কেরোসিনের কুপি জ্বালাইয়া রুটি তৈয়ারী করিতেছে ও দুর্ব্বোধ্য উচ্চ স্বরে গান গাহিতেছে। দূরে দারাগঞ্জের বাজার তখন অজস্র দীপমালায় সাজিয়া দীপান্বিতার রাত্রিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেল্লার মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে, আইজ্যাক সেতুর দু-পারে লালচক্ষু সিগনালের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। সেতুর এক পাশ তরল আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ধোঁয়াও উঠিতেছে প্রচুর। প্রয়াগের শ্মশানে অনির্ব্বাণ চিতার ইতিহাস।

রাত্রি গভীর হইতেছে। আকাশে তারার অজস্র ফুল চরের বালুরাশির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে। সপ্তমীর চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়াছে; সেই অস্ত-নিকেতনের ওপার হইতে একটি ম্লান আলো—তরল অস্বচ্ছ-বেদনাময় আলো যমুনার পরপারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতি দূরের শব্দপ্রবাহও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে ক্রমশঃ। ঝুঁসির দিকে গঙ্গার তীর ভাঙিবার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ প্রায়ই শুনা যায়। গঙ্গার গর্জ্জন একটানা ও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দারাগঞ্জের ঘাটের বাদবিতণ্ডার কোলাহল বাংলা ভাষা হইলে যোগমায়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন হয়ত। এ সব ছাপাইয়া এই নিশীথ রাত্রির বুকে—যমুনার কূলে কূলে ও তরঙ্গে তরঙ্গে যে বাঁশীর সুর কখনও মৃদু, কখনও উচ্চ হইয়া প্রার্থনা বা স্তব মন্ত্রের মত ধ্বনিত হইতেছে—তাহা তৃষিত শ্রবণকে অমৃত রসে অভিষিক্ত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। দুপুর বেলায় সেই অর্দ্ধ-উলঙ্গ

সন্ন্যাসী—পাগুা বলিয়াছেন বন্শী বাবা—যমুনার মাটি লইয়া কখনও তীরভূমিতে মাটির ঘর গড়েন—ভাঙেন—আবার মাটি বহিয়া আনেন—এই নিশীথ রাত্রিতে তিনিই একটি উঁচু ঢিবির উপর বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। দুপুরের রৌদ্র হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য কোন ভক্ত হয়ত একটি ছত্রের ব্যবস্থা ক'রয়াছেন সেইখানটায়—রাত্রিতেও সেটি খোলা আছে। সহাস্য-বদন সন্ন্যাসী রৌদ্র-বৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। পাগল বলিয়া কেহ তাঁহাকে উপেক্ষা করে—সাধু বলিয়া কেহ বা চানা, ছাতু বা পয়সা সেই ঢিবির গোড়ায় রাখিয়া যায়। ভিখারীরা আসিয়া সেই পয়সা ও প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্ন্যাসী হাসিমুখেই বংশীতে ফুংকারধ্বনি তোলেন।

কি তীব্র অথচ করুণ সুর। যোগমায়ার বুকের ভিতরটা বাঁশীর স্বরলহরীতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বালুর উপর কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়াছেন যোগমায়া; চোখে এখনও নিদ্রা আসে নাই। যে সংসার পিছনে পড়িয়া রহিল তাহার স্মৃতি রোমন্থন বা যে জীবনের পটক্ষেপণ হইয়াছে তাহার দীপাবলীর শোভা নিরীক্ষণ দুইটাই চলিতেছে একসঙ্গে। বাঁশী সান্ত্বনা দিতেছে—হৃদয়ের উত্তাপ গলাইয়া ঐ ত্রিবেণীসঙ্গমেই মিশাইয়া দিতেছে। তবু সেদিনের কথা:

উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন যোগমায়া, পায়ের কাছে বসিয়াছে বধূ। বিয়োগের দুঃখে যোগমায়ার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে, সংসারের সুখ-দুঃখ মান-অপমান লইয়া সমস্ত অভিযোগ তাঁহার শেষ হইয়াছে বুঝি।

বধূ পায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে, মা, ওঠ মা। মাগো—

কি করুণ আর্ত্ত কণ্ঠস্বর! নিজের দুঃখের অতল সমুদ্রে প্রকাণ্ড একটি ঢেউয়ের মত সেই ধ্বনি। সে ধ্বনি সমুদ্রকে ফুলাইয়া বিক্ষোভিত করিতেছে। উঠিয়া বসিলেন যোগমায়া। নিজের বুকের মধ্যে বধূর মাথাটি একটু জোরেই চাপিয়া ধরিয়া অন্যায় বিচারের প্রতিবিধান করিলেন। কিন্তু সেও ঘটিল এক অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝা-প্রবাহের মধ্যে। চেতনার ঊর্দ্ধলোকে ক্ষণিকের তরে ভাসিয়া আবার অতলস্পর্শ অন্ধকারে তিনি ডুবিয়া গেলেন।

বেয়াই আসিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। ঘোমটা টানিয়া মাথা নাড়িয়া কি যে বলিলেন ভাল মনে নাই। হয়ত ক্ষমার কথাই বলিয়াছেন। বৈবাহিকের মুখ প্রসন্ন হাস্যদীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। অস্ফুট কণ্ঠের 'দেবী' এই ধ্বনিটুকু মাত্র শোনা গেল। তারপর আবার সেই অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝা-প্রবাহে চৈতন্যের জগৎ মগ্ন হইয়া গেল।

বিমল আসিয়া শুষ্কমুখে ডাকিল, মা।

অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, তৈলাভাবে গায়ে খড়ি উড়িতেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, আধময়লা উত্তরীয় ও সাদাপাড় ধুতি এবং খালি পায়ে সে যেন সর্ব্বহারা ছেলেটি। ঝড় থামিয়া গেল—বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটি আঘাত জাগাইয়া।

—বাবা।

—একটা কন্দ তো করতে হয় মা। বৃষ-উৎসর্গ শ্রাদ্ধ না করলে—

—তাই কর বাবা, যা তোমরা ভাল বোঝ। আমায় জিজ্ঞেস কর কেন?

—তুমি না বললে—

—একটা কাজ করিস খোকা। গাঁয়ের যত কাঙালী আছে তাদের পেট ভরে খাইয়ে দিস বাবা। ওদের এক সরা চিঁড়ে মুড়কি আর দুটো চিনির ডেলা দিয়ে বিদেয় করিস নে।

—বেশ, তাই হবে।

অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝা—আবার বহিতে থাকে। আবার যোগমায়া ডুবিয়া যান সেই অন্ধকারে। নয় বৎসরের বধূ—ষোল বৎসরের বর। প্রায় চল্লিশটি বৎসরের দৃঢ় বন্ধন—কালের ভ্রূকুটিতে শিথিল হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। ছিঁড়িয়া মিলাইয়া গেল কোথায়? এক এক দিনের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে। অনেকগুলি স্মৃতির ফুল কুড়াইলে সুদীর্ঘ একটি মালা তৈয়ারী হয়। কিন্তু এখানে-ওখানে সে ফুল ছড়াইয়া আছে। একটি সুতায় গুছাইয়া মালা গাঁথিবার মালাকর মন আজ শোকের বাতাসে মুহ্যমান।

—পাঁচ শো কাঙালী হবে মা!

—টাকা চাই? আমার ক্যাশ বাক্সটা নিয়ে আয় খোকা।

হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে।

ওগো কাপড়চোপড়গুলো ধুয়ে রেখেছ তো? কলসী সাজানোর ভার কে কে নিলেন? অগ্রদানীর বাসন, গাড়ু, ঘড়া, শয্যা, ছাতি, থালা, গেলাস সব ঠিক ক'রে রাখ। সজ্জের জিনিস-গুলো। খাটখানায় মশারি টাঙিয়ে দাও, গদিটার ওপর ভাল ক'রে চাদরখানা পাত, বিরাট পাঠের ব্যবস্থা যেন ভাল হয়।

ঝড় থামিয়া গিয়াছে। বহু—বহুক্ষণ ধরিয়া আকাশ আজ শান্ত—নির্ম্মেঘ।

—গুরুর দান আলাদা করে তুলে রাখ—ওটা যেন পুরুতমশাই না নেন।

আকাশস্থ নিরালম্ব—বায়ুভূত নিরাশ্রয়—

আবার ঝড় বহিতে সুরু করে। প্রেত—প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় মানুষ, আকাশে অবলম্বনহীন—নিরাশ্রয় মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়।

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা—

ভাঁড়ার ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া যোগমায়া চোখের ধারা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

প্রেতযোনি প্রাপ্ত রামচন্দ্র তাঁহার মাথার উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই অন্নপিণ্ডের জন্য লালায়িত শুধু রামচন্দ্র নহেন—তাঁহার দুই কুলের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত—দগ্ধ কাঁচা কলা তিল মধুসিক্ত গলিত আতপ তণ্ডুলের পিণ্ডের জন্য প্রেতলোকের বুভুক্ষার এই দণ্ডে জাগিয়া উঠিয়াছেন। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে হাতের উল্টা পিঠের দ্বারা কুশের উপর সেই পিণ্ড দান করিয়া বিমল তাঁহাদের পরিতৃপ্ত করিতেছে। তারপর—

মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক···আঃ, কি সান্ত্বনার সুর—কি শান্তির স্বস্তিবাচন।

উঠিয়া বসিয়া দু'কান ভরিয়া সেই মন্ত্র-ওষধি পান করিলেন যোগমায়া। প্রাণে নববল সঞ্চার হইল। কর্ত্তব্যে অটল হইয়া কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

শ্রান্তি এ দিনের জন্য নহে, ক্ষুধা কর্ম্মের সুধা পান করিয়া ঘুচিয়া গিয়াছে। অসংখ্য বার সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতে করিতে সর্ব্বকার্য্যের নির্দ্দেশ দিয়া সুসম্পন্ন করিলেন তিনি। গভীর রাত্রিতে কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল। জয় জয় রবে কাঙালীরা দু'কান ভরিয়া দিয়া গিয়াছে; নিমন্ত্রিতেরা শত মুখে আয়োজন-পারিপাট্যের সুখ্যাতিতে মন ভরিয়া দিয়াছে, রবাহুতরা পর্য্যন্ত বিমুখ হয় নাই।

খান নাই শুধু কমলা আর যোগমায়া। যোগমায়া একবার তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কমলা বলিয়াছেন, এত খেলাম —আবারও আমায় খেতে বলচো—বউ।

বাঁধভাঙ্গা বন্যায় কমলা ভাসিয়াছেন, যোগমায়াকে ভাসাইয়াছেন।

থমথমে রাত্রি। দ্বিতলের ছাদ হইতে নামিবার সময় সিঁড়ির মুখে যোগমায়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশে চাঁদ নাই, অনেকগুলি নক্ষত্র জ্বলিতেছে। তার মধ্যে পূর্ব্ব আকাশের তারাটারই জ্যোতি প্রখর বলিয়া বোধ হয়। সেটি আসন্ন প্রভাতের সূচনা করিতেছে। পশ্চিমের অন্ধকারকে শাসন করিবার উদ্ধত ভঙ্গী তার মধ্যে নাই; সান্ত্বনা দিবার প্রয়াসে একটু যেন ছলছলে হইয়াছে। পশ্চিমের দুর্ভেদ্য অন্ধকার গাঢ়তর হইতেছে—সেই সান্ত্বনায়। একটা গ্যাস বাতি দপ্ দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। ভাঙা খুরি মুচির উপর দিয়া শৃগাল কিংবা কুকুরের ছুটাছুটি চলিতে লাগিল। বুকের গাঢ়তর নিশ্বাস মুক্ত করিয়া যোগমায়া পশ্চিম আকাশের পানে চাহিয়াই অবতরণ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গার স্রোত যেমন শব্দ করিয়া এক মুখেই ছুটিয়াছে—টুকরা টুকরা ঘটনাগুলিও তেমনই একমুখীন। তাহাদের অন্তর্নিহিত শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। একটি বৎসর ধরিয়া সেই শব্দ সমষ্টির সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যোগমায়া।

কালাপেড়ে পা বাড়াইতে নাই, কিন্তু শৃঙ্খলের জ্বালা সেই বন্ধনের মধ্যে। হাজার দিনের হাজারটা স্মৃতি চিতার মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে বুকের মধ্যে। রাবণের অনির্ব্বাণ চুল্লী। কাণে আঙুল দিলে রাবণের সেই অনির্ব্বাণ চুল্লী আজও শোঁ-শোঁ ধ্বনিতে রামায়ণ-কাহিনীতে শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়। কিন্তু চিরসধবা মন্দোদরীর কি সান্ত্বনা ছিল সেই অনির্ব্বাণ চিতার আগুনে। কি সান্ত্বনা ছিল? যে যায়—সে তো চিতাই জ্বালিয়া দিয়া যায়—যে পড়িয়া থাকে তার বুকে জ্বলে সেই কালজয়ী অনির্ব্বাণ চিতা।

—মা, আমায় ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? সংসারের কি-ইবা জানি আমি।

—তুমি লক্ষ্মী—তুমিই চালিয়ে নিও।

—না মা, আপনি না থাকলে—আমি এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠুতে পারব না।

—স্বামীর ভিটেয় সন্ধ্যে দেখানো যে তোমার ধর্ম্ম মা। দেবতারা তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।

—আপনি কবে ফিরবেন?

—পাপ মুখে ও কথা আর বলব না, মা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন তীর্থে দেহ রাখতে পারি।

—না মা, ওকথা বলবেন না।

বধূকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন কাজ। মায়ের বেদনা ছেলে বোঝে, তাই নীরবে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকে।

—খোকা, তুই তো আমায় আসতে বললি নে।

—তোমায় যে আসতেই হবে—মা।

—যদি না ফিরি?

—না মা, ফিরতে তোমায় হবেই।

—ঠিক বলেছে খোকা, যত তীর্থই কর দিদি—এর বাড়া তীর্থ তোমার নেই।

সে কথা মনে মনে স্বীকার করেন যোগমায়া। তুলসীতলায় প্রণাম রাখিবার কালে, মহাদেবের মন্দিরে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করিবার কালে—সহস্র বার সে কথা মনে মনে স্বীকার করেন তিনি। যাহাদের রাখিয়া গেলেন এই ভিটায়—তাহাদের দুঃখ-অশান্তি দূর করিবার জন্য—কল্যাণের কত অনুষ্ঠানই না অনুষ্ঠিত হইল; দেব-দেবীর উদ্দেশে মানত ও প্রার্থনার বাণী মন্দির ভরিয়া সাজাইয়া রাখিলেন নৈবেদ্যের মত।···চিরজীবনের জন্য সংসার ছাড়িলেন যোগমায়া।

হু-হু করিয়া অবিশ্রান্ত ঝড় বহিতেছে। ঝড়ের বেগে তৃণের মত তিনি উড়িয়া চলিয়াছেন—ভাসিয়া চলিয়াছেন—নিশ্চিহ্ন হইবার তীব্র কামনা পোষণ করিতেছেন মনে মনে।

আশ্চর্য্য বাঁশী! বিদায়দিনের সবটুকু ব্যথা উজাড় করিয়া গঙ্গা-যমুনার তরঙ্গে ঢালিয়া দিতেছে—নক্ষত্রকণ্টকিত আকাশে ছড়াইয়া দিতেছে—ওপারের ম্লান তীরভূমিতে আলগা বালুর মধ্যে ঝড়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিতেছে। বংশী বাবা কি সারারাত এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বাঁশী বাজাইয়া চলিবেন? একটি মাত্র সুরের ব্যাপক মূর্চ্ছনায় একটি মাত্র গীতই তাঁর বাঁশীতে বাজিবে?

একই ঠাঁই চলেছি ভাই—ভিন্ন পথে যদি।
জীবন জলবিম্ব সম মরণভয়—হৃদি।

৩

প্রমদা ঠাকুরাণী যোগমায়াকে বলিলেন, আজ বিকেলে আমরা যাত্রা করব—বিমলের মা। সেথো বলছেন—অনেক দেরী হয়ে গেল।

যোগমায়া তাঁহার পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন, তুমি কি রাত্তিরে ঘুমোও না, বিমলের মা? চোখ মুখের এ কি ছিরি তোমার!

ঘুমুই তো। মৃদু হাসিয়া যোগমায়া উত্তর দিলেন।

—তা নাও, তোমার পোঁটলা-পুঁটুলি বেঁধেছেঁদে নাও। চল, সঙ্গমে একটা ডুব দিয়ে আসি।

—আমি মনে করছি দিন কতক এখানেই থাকব।

—সে কি—তীর্থ দর্শন করবে না? মথুরা—বৃন্দাবন—সাবিত্রী—

—না দিদি, এইখানটায় বড় শান্তি পেয়েছি।

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া প্রমদা ঠাকুরাণী বলিলেন, তা কি হয়! আমাদের হাতেই তো বিমল তোমাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি রয়েছে। তোমাকে একলা ফেলে, না না, পুঁটুলি বেঁধে নাও।

—না দিদি, মনের শান্তি যেখানে পেলাম—সেই আমার সবার চেয়ে বড় তীর্থ। কপালে থাকে এর পর মথুরা বৃন্দাবন দেখব। তোমরা বরঞ্চ ফেরবার মুখে একবার—

—আ আমার কপাল! সেথো বলছিলেন, আমরা হরিদ্বার অযুধ্যে হয়ে কাশী দিয়ে ফিরব। সে নাকি আলাদা রাস্তা।

—তবে বিমলকে আমার ঠিকানা জানিয়ে একখানা পত্র দিও। দায়-অদায়ে তার ভরসাই তো করি। একটু থামিয়া হাসিবার ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, ভরসা কারও রাখতে নেই—দিদি। ওতেই তো যত কষ্ট। ভগবান ভরসা করেই এখানে রইলাম।

ঝড়ের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছেন যোগমায়া; সেই বেগ মন্দীভূত হইয়া মাটিতে পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির স্পর্শ প্রিয়তর হইতেছে। এই যমুনা, ঐ গঙ্গা ওপারে সু-উচ্চ ঝুঁসির মঠ, ওধারের বিশাল দুর্গ, মাইল ব্যাপী চর ঠেলিয়া দারাগঞ্জের চক—আর অজগর-বেষ্টনীর মত বি-এন-ডব্লিউয়ের লৌহসেতু আইজাক। গঙ্গার দিকে মুখ করিলে ফাপামউয়ের বড় সেতু অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, কেল্লার আড়াল ঘুচিলে যমুনার বুকে গো-ঘাটের সুদৃশ্য সেতুও চোখে পড়ে। চারিদিকে বন্ধনের রজ্জু, তবু এই বিস্তীর্ণ চরে মুক্তির ক্ষেত্র প্রসারিত। বাহিরের সংসারকে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই সেতুর শৃঙ্খলে গঙ্গা ও যমুনা বন্দিনী হইয়াছেন; কেল্লার প্রাচীর, দারাগঞ্জের প্রাচীর, ঝুঁসির মঠ, ওপারের বাজরি ক্ষেত্র···সমস্তই এই পুণ্যভূমির মাহাত্ম্যকে এই বিস্তীর্ণ চরের মধ্যে কত যুগযুগান্তরের সঞ্চিত পবিত্র হোমশিখার মতই জ্বালাইয়া রক্ষা করিতেছে, কে জানে।

সঙ্গম হইতে ফিরিবার মুখে প্রত্যহ বনশীবাবার বেদী ঘুরিয়া তবে যোগমায়া কুটিরে গিয়া উঠেন। প্রত্যুষের স্বর্ণকিরণে—বনশীবাবা যমুনার তীরভূমিতে কাদা ও বালি কুড়াইয়া ঘর বাঁধিতে থাকেন। সারি সারি অনেকগুলি ঘর। ঘর বাঁধা শেষ হইলে—উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া বাঁশী বাজান। কে আসিয়া প্রণাম করিল, কে বা ফলমূল ও আহার্য্য সেই বেদীতলে ভক্তিভরে রাখিয়া দিল—ওসব দেখিবার অবসর তাঁর নাই। পায়ের উপর পা রাখিয়া পদ্মাসন করিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে সামান্য মাথা দুলাইয়া তাঁর সেই একাগ্র ফুৎকারের মধ্যে বাঁশী যেন সান্ত্বনার প্রস্রবণ বহাইতে থাকে। সারা দুপুর—এবং সারা রাত্রি বাঁশী বাজে।

স্নান সারিয়া তীরের উপর দাঁড়াইয়া যোগমায়া একাগ্র মনে বনশীবাবার বালু সংগ্রহ ও ঘর গড়া দেখিতেছিলেন।

সন্ন্যাসীর সে গৌরবর্ণ দেহজ্যোতি কোথায়? কোথায় বা আজানুলম্বিত বাহু—দীর্ঘ জটাজাল—মাল্যভারগ্রস্ত গলদেশ ও বাহুমূল? কপালে ত্রিপুণ্ড্রক নাই—দেহে ভস্ম-প্রলেপ নাই। লোকে বলে সাধু নন ইনি। জপ তপ, উর্দ্ধাসন, হোম, মন্ত্রপাঠ এসব কিছুই নাই, শুধু দিনরাত আপন খেয়ালে বাঁশী বাজাইয়া যান। কাহাকেও ঔষধ বিতরণ করেন না, শাস্ত্রকথা লইয়া কাহারও সঙ্গে তর্ক করেন না বা উপদেশ দেন না। বলিতে গেলে কথাই তিনি বলেন না। কেবল সকলের পানে চাহিয়া শীর্ণকায় মলিনজ্যোতি অতি সাধারণ সন্ন্যাসী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে থাকেন। লোকের মন তাহাতে ভরে না, বলে—পাগল।

হয়তো পাগলই তিনি। পাগল না হইলে বাঁশী বাজাইয়া আর যমুনার তীরে কাদা-বালির ঢিবি রচনা করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করেন কি করিয়া। যোগমায়ার পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী হাসিলেন। কুৎসিত দেহের মধ্যে যদি কোথাও সৌন্দর্য্য থাকে—সে ঐ হাসিটুকুতে। সমস্ত অন্তরের প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা সেই হাসিতে উচ্ছ্বলিত হইতেছে। পাগল এমন অর্থপূর্ণ হাসি হাসিতে পারে কখনও? পরম রত্ন পাওয়ার আনন্দে—এমন ঝলমলে হাসি—গঙ্গার ও-পিঠে ফাপামউ-সেতুর উপর প্রথম প্রভাত-সূর্য্যের আরক্ত কিরণপাতের মত সুস্নিগ্ধ হাসি কয়জন শোক-দগ্ধ মানুষের মুখে ফুটিয়া থাকে। মুগ্ধ হইয়া গেলেন যোগমায়া।

মনোযোগী দর্শক পাইয়া সন্ন্যাসীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল। ক্ষিপ্রকরে কাদার তাল সংগ্রহ করিয়া ঘর গাঁথিতে লাগিলেন—আর যোগমায়ার পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

যোগমায়া ভূমিলগ্না হইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিলেন, বাবা।

সন্ন্যাসী ফিক্ করিয়া হাসিয়া মাটির ডেলা চাপাইয়া বালু-বেলার ঘর উঁচু করিতে লাগিলেন। অনেকখানি উঁচু হইলে—সেটি ধসিয়া পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী যোগমায়ার পানে চাহিয়া হাসিলেন। আবার কাদার তাল লইয়া সেই ভগ্ন গৃহ সংস্কার করিতে লাগিলেন। কত বার ঘর ভাঙিল—কত বার তিনি গড়িলেন। ক্লান্তি নাই—বিরক্তি নাই। যমুনার তীরে সারি

সাধি মাটির ঢিবি তৈয়ারী করিয়া চলিয়াছেন। সে ইঙ্গিত কেহই বোঝেন না, যোগমায়াও বুঝিলেন না। কাল-সমুদ্রের তীরে মানব-গোষ্ঠীর ঘর-বাঁধার এই চিরন্তন লীলার আদি-রহস্য কয়জনই বা বুঝিয়া থাকেন।

আর এক আকর্ষণ হইল ঝুঁসি। গঙ্গার তীরে সুউচ্চ নির্জ্জন মঠগুলি প্রায়ই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে। ইচ্ছা হয়—সেই নির্জ্জনে বসিয়া খানিক জপ করেন, খানিক বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। গঙ্গার দিক হইতে যেমন হু-হু করিয়া বায়ু বহিতে থাকে—মনের মধ্যেও সেই বায়ুর বিরাম নাই। নির্জ্জন গৃহের চবুতরায় বসিয়া কলাগাছের পানে চাহিয়া এক দিন মনে হইল, কোন্ বাল্যকালের পৌষমাসের একটি দিনে যেমন সঙ্গিনী-দের সঙ্গে খিচুড়ি রাঁধিয়া বন-ভোজন করিতেন—এই নির্জ্জনে ঐ কলার পাতা পাতিয়া তেমনই একবার আনন্দ-উৎসব জমাইলে মন্দ হয় না। মন্দিরের আশে-পাশে অনেক জঙ্গল। একখানা কাটারি পাইলে তিনি অনায়াসে সেগুলি কাটিয়া জঙ্গল সাফ করিতে পারিতেন। একগাছি সম্মার্জ্জনী থাকিলে ঘরগুলির ঝুল ঝাড়িয়া ও মেঝের ধূলি-জঞ্জাল সাফ করিয়া দেবস্থানটিকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারিতেন। আঁচল দিয়া আর কতটুকু পরিষ্কৃত হয় ধূলার রাশি।

দ্বিতীয় মঠে নিম্ব বৃক্ষমূলে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা বুঝিতে পারেন না যোগমায়া, তবু সুরটি তাঁর ভাল লাগে। পারমার্থিক তত্ত্বের সবটুকু স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস, এবং সেই তত্ত্বকথা অন্তরে ভরিয়া রাখিবার আনন্দ-পাত্র খুব কম সংসারীরই আছে। তত্ত্বকথা আসে পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানের মত—আকাশে শরৎ বা বসন্ত কালের পরিপূর্ণ চাঁদকে হঠাৎ দেখার মত—কোন সম্মানীয় ব্যক্তির সহসা আতিথ্য গ্রহণের মত। সাধারণ লোকে সংসারের তৌলদণ্ডটির দিকে মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিই নিক্ষেপ করেন। বৈষয়িক কর্ম্মের অবসর-মুহূর্ত্তে পুণ্য সঞ্চয়ের আকুল আগ্রহ—তৌলদণ্ড একদিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে তাহারই প্রচেষ্টা তাই তাঁহাদের মধ্যে প্রবল। সংসারের পরিবেশ আর ত্রিবেণী তীরের এই পরিবেশে অনেক তফাৎ। সেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষী-ভূত জিনিস ধোঁয়ার মত নিত্যই গাঢ় হইয়া উঠে—এখানে অস্পষ্ট জিনিসও অনুভূতিতে প্রখর হইয়া উঠে। সেখানে কাহিনী ঘরে মনকে আকর্ষণ, এখানে কাহিনীর অভ্যন্তরস্থিত শাশ্বত সত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিরাট শূন্যতার মাঝে বিশ্ব-সৃষ্টির পরিপূর্ণ আভাস বিদ্যমান। ঘটে, পটে, মূর্ত্তিতে প্রতিনিয়ত যে ঈশ্বরের কল্পনা করিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়াছেন যোগমায়া—এই বিরাট্ শূন্য প্রান্তর ও আকাশের মধ্যে নিরন্ত প্রবহমানা গঙ্গা-যমুনার কুলুধ্বনিতে সর্ব্বব্যাপী মহিমার মূর্ত্তিতে সেই ঈশ্বরকে অনুভব করিয়া তেমনই প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে মন।

তুমি আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে—
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।

তৃতীয় মঠের স্তোত্রগানও স্বস্তি বচনের মত শান্তি দেয়। একটি প্রণাম সেই বটবৃক্ষমূলে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন।

আইজাক সেতুর পাদদেশে প্রায় শ্মশানঘাটেই নৌকার আসিয়া চাপেন। শ্মশান অতিক্রম করিবার কালে মনে কোন বিকার জন্মায় না। নিত্য জীবনের মত নিত্য কালের মৃত্যু অত্যন্ত সহজ বলিয়াই বোধ হয়। কোনটিই কোনটিকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস করে না। পরস্পরের সম্পূরক হইয়া সৃষ্টিলীলার শতদলটিকে চির বিকশিত রাখিয়াছে বুঝি।

ঘর-বাঁধা ও ঘর-ভাঙ্গার কাজে বনশীবাবার তাই ক্লান্তি নাই।

দিনের কোলাহলমুখর ঘাটে নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই আছে। সংসার যেন ভীমরোলে আবর্ত্তিত হইতেছে। উপরের দারাগঞ্জের গৃহ-উদ্গীরিত জনরাশি—কেল্লার পাশ দিয়া শত শত নৌকা বোঝাই জনরাশিতে প্রয়াগ-ঘাট আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। যেমন বাদবিতণ্ডা—তেমনই কোলাহল। ক্ষণিকের সংগ্রহের পথে রতি পরিমাণ পুণ্য হয়তো তাঁহারা লইয়া যান—তীরভূমিতে ফেলিয়া যান পর্ব্বতপ্রমাণ কলুষ। এত অচিন্তিতপূর্ব্ব কলুষও আছে সংসারে? আবার এত মধুও সঞ্চিত হইতেছে সংসার-কুলায়চক্রে।

আশ্চর্য্য রাত্রি এবং বৈরাগ্য-মণ্ডিত অদ্ভুত নিস্তব্ধতা প্রয়াগের চরভূমিতে নামিয়া থাকে। যুগযুগান্তর হইতে এমনই রাত্রি ও এমনই প্রশান্তি বুঝি নামিতেছে এখানে। শোকতপ্ত মনের সঙ্গে কতকালের আত্মীয়তা যেন সেই রাত্রির—সেই নিস্তব্ধতায়। বনশীবাবার বংশীধ্বনিও কি অনাদিকাল হইতে লক্ষ সাধুপদধূলি পূত এই বৈরাগী চরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মন্ত্রিত হইয়া উঠে? তীরের গৃহ রচনার অনলস উদ্যম?

বাঁশীর সুর উঠিলেই—যমুনার তীরে বালুগৃহ রচনার কথা মনে জাগে। তার পিছনে যে বৃহত্তর গৃহ ফেলিয়া আসিয়াছেন যোগমায়া—সেই গৃহের ছবিও স্পষ্টতর হয় প্রতিরাত্রিতে। শান্তি লাভের অক্ষয় তীর্থের ভাণ্ডারে সেই গৃহের দানও অমূল্য। প্রভাতের যাত্রীরা পুণ্যমণ্ডিত হইয়া সেই ঘরের বাতাসকেই তো নির্ম্মল করিয়া তুলিবেন প্রত্যহ। সেই ঘরের কল্যাণে দেবতা হন আমন্ত্রিত; দেবতার ষোড়শ উপচার পূজার ঘটা—দেবতাকে বরদানের কাকুতি মিনতি।

অনেকগুলি বিনিদ্র রজনী যাপন করেন যোগমায়া। কঠোর আত্ম-নিগ্রহে যে আনন্দ—শোককে আচ্ছন্ন করিবার শক্তি তার যথেষ্ট। তবু অনন্তের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার কালে গৃহের খণ্ডিত শ্রীটুকুও এক একদিন যোগমায়ার নিদ্রাহরণ করিয়া লয়।

খুব ঘটা করিয়া এক দিন বিস্তীর্ণ চরে একটা সভা আহূত হইল। চরের ওদিক হইতে প্রায় অপরাহ্ণ সময়ে যোগমায়া ফিরিতেছিলেন। প্রচুর জনসমাগম দেখিয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য জন্মিল। সাধু-সন্ন্যাসীকে লইয়া এমন সভার কথাও তো জানা আছে। পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া জনতার প্রান্ত ভাগ তিনি স্পর্শ করিয়াছেন—এমন সময়ে

অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। সঙ্ঘবদ্ধ জনতা সহসা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কিসের আশঙ্কায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া মরি-বাঁচি করিয়া তাহারা পরস্পরকে দলিত মথিত করিয়া পালাইতে লাগিল—যোগমায়া বুঝিতে পারিলেন না। জনতার চাপের মধ্যে পড়িয়া তিনি আপনার সঙ্কট বুঝিতে পারিলেন—কিন্তু সে কতটুকুর জন্ম ? বাহির হইবার পথ খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন —চারিদিকের চাপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠিতেছে। শ্বাস রোধকারী সেই চাপের মধ্যে—অদূরে দণ্ডায়মানা এক নির্ভীক নারীমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। শুভ্র কেশজাল বেড়িয়া গলদেশে তাঁর পুষ্পমাল্য বিলম্বিত। ডাগর দু'টি চক্ষুর দৃষ্টি বিশৃঙ্খল জনতার পানে নিবদ্ধ। হস্তেঙ্গিতে জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াসও তিনি কয়েক বার করিলেন। তাঁহার বামহস্তধৃত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড়িতে লাগিল। আর সেই আন্দোলনের মধ্যেই পায়ের তলার মাটি ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে মনে হইল। দাগগঞ্জের ঢালু রাজপথ হইতে লাল পিপীলিকার সারি যেন নামিয়া আসিতেছে। কয়েক জনের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল, তীরভূমিতে সহসা সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইল।

প্রভাতের আলো এমন মিষ্ট ইতিপূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই। ঘুম ভাঙিবার পর কিছু অবসাদ দেহে লাগিয়া থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু মাথা তুলিতে না-পারার দুর্ব্বলতা প্রচণ্ড অসুখেই সম্ভব। পরিচিত চরভূমিই বা কোথায়। কুঁড়ে ঘরে কম্বলের উপর কাপড় বিছানো শয্যা নহে—তাহার চেয়েও সুকোমল। চারিদিকে প্রভাতের আলোকবন্যা। স্বপ্ন দেখিতেছেন কি না যোগমায়া সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন।

একজন প্রৌঢ়া প্রবেশ করিলেন। যোগমায়ার উন্মীলিত চক্ষু দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া মৃদু নিষেধের স্বরে কহিলেন, উঠবেন না, আপনি বড় দুর্ব্বল।

যোগমায়ার ওষ্ঠ নড়িতে লাগিল। কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলেন।

যখন চক্ষু চাহিলেন—চারিদিকের দুয়ার জানালা বন্ধ। হয়ত প্রভাত কাল নহে। পশ্চিমের নিদাঘ-মধ্যাহ্নের খরতাপে দুয়ার জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক করিয়া দিতেছে। দৃষ্টি ফিরাইতেই পাশের টুলে উপবিষ্টা সেই প্রৌঢ়া মহিলাটিকে তিনি দেখিলেন। একখানি ছোট টিপয়ের উপর রেকাবীতে কিছু ফলমূল কাটা—খরমুজার সুগন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে—আর কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল। তাহারই সামনে প্রৌঢ়া বসিয়া রহিয়াছেন। একটু যেন অন্যমনস্ক। কোন বিষয় লইয়া গভীর ভাবেই হয়ত বা চিন্তা করিতেছেন।

অস্ফুট শব্দ করিয়া যোগমায়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শশব্যস্তে তিনি উঠিয়া আসিলেন।

—উঠবেন না—উঠবেন না। মুখ ধোয়ার জল আমি এনে দিচ্ছি—পিক্‌দানিতে মুখ ধুয়ে নিন।

—আমার কি হয়েছে ? ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন যোগমায়া।

—যমুনার চড়ায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, কেউ নেই দেখে টাঙ্গা করে বাড়ি নিয়ে এলাম।

—সঙ্গম এখান থেকে কতদূর ?

—তা মাইল চারেক হবে। এটার নাম লুকার গঞ্জ। আপনি ব্যস্ত হবেন না, ডাক্তার বলেছেন শীঘ্রই সেরে উঠবেন।

—আমার কি ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন ? ব্যগ্র স্বরে যোগমায়া প্রশ্ন করিলেন।

—না। ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল—পারেন নি ডাক্তার। আর খানিকক্ষণ জ্ঞান না হ'লে হয়ত—

মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিলেন যোগমায়া। প্রশ্ন করিলেন, আমায় পৌছে দেবেন চরে ?

—এমন অবস্থায় কি একলা ছেড়ে দিতে পারি। দুটি দিন আপনার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

—না না, আমি যেতে পারব। শয্যা-ত্যাগের চেষ্টায় আকুল হইয়া উঠিলেন যোগমায়া।

প্রৌঢ়া নিকটে আসিয়া তাঁহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সুস্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, না ভাই, সম্পূর্ণ না সেরে যাওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে আমরা ছাড়ব না। মনে ক'রো না যে—আমি তোমার বোন।

যোগমায়ার মন অপূর্ব্ব পুলকরসে ভরিয়া গেল। এমন স্নেহপূর্ণ কথা—এমন দরদমাখা ব্যবহার রামচন্দ্র চলিয়া যাওয়ার পর এই যেন প্রথম শুনিলেন। শুধু শুনিলেন না, সারা অন্তর দিয়া সেই স্নেহ ও ব্যাকুলতা গ্রহণ করিলেন। প্রৌঢ়ার হাত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া কি যেন বলিতে চাহিলেন, কথা বাহির হইল না। দু' চোখ বাহিয়া দু'টি ধারা শুধু গণ্ড অতিক্রম করিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কেমন করে—আমায় দেখতে পেলেন ?

—আমি যে সেই মিটিঙে বক্তৃতা দেবার জন্যে গিয়েছিলাম। পুলিসে মিটিং করতে দিলে না।

জ্ঞানের প্রান্তসীমায় দেখা—সেই শুভ্র কেশদাম—গলায় মালা নাই। হাতেও ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা দুলিতেছে না। চোখের প্রসন্নতার পরিচয়ের গাঢ়তাকে তিনি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন।

—হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।

—এখন ত খেতে পারব না।

—কেন ? ওঃ, কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা করে দিই।

—না না, শুধু কাপড় ছাড়লে হবে না, নাইতে হবে। আরও—কি বলিতে গিয়া যোগমায়া থামিয়া গেলেন।

—বলুন আর কি চাই ? জপ আহ্নিক করবেন ? গঙ্গাজল চাই ?

যোগমায়া মাথা নাড়িলেন।

—আচ্ছা, আমি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (ক্রমশঃ)

ভারতের অন্ন বস্ত্র ও শিল্প

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

ভারতের পূর্ব সীমায় এবং পশ্চিম সীমান্ত হইতে কিছু দূরে যুদ্ধ হইতেছে। ইহার জন্য এদেশ হইতে খাদ্য, যুদ্ধাস্ত্র, পোষাক ও অন্য উপকরণ এই সকল স্থানে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল বস্তুর অধিকাংশের মূল্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট দিতেছেন। কিন্তু এত টাকা ভারত-গবর্ণমেণ্টের ছিল না। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; ঋণ, নূতন ও বর্দ্ধিত ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত নোট ছাপান। ইহার ফলে ভারতবাসীর হাতে অধিক পরিমাণে নোটের টাকা আসিয়া পড়িয়াছে এবং পূর্বের কারণসকলের সমবায়ে অন্নবস্ত্রের দাম হইয়াছে চতুর্গুণ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কল্পনার ছবি যে অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা দেখাইতে পারিত না তাহা এই গত চারি বৎসরের যুদ্ধে ভারতবাসীর মর্মে বাসা বাঁধিয়াছে। ভারতবাসী পরাধীন, ভারতবর্ষ পরহস্তগত, ভারতবাসীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার নাই—এ সকল পুরাতন কথা। স্বায়ত্ত-শাসন, রিফরম, হোমরুল, তারপর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন—আশায়, আগ্রহে দ্বিধায় শিক্ষিত জনের মন সমাচ্ছন্ন। কিন্তু আজ সব ভাসিয়া গিয়াছে। প্রশ্নে আর জটিলতা নাই। আমরা বুঝিয়াছি, দেশের অন্নবস্ত্র ও অন্য সকল প্রয়োজনীয় বস্তু দেশেই সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহা স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করার রাষ্ট্রবিধিও আমাদের হাতেই চাই।

এই যুদ্ধের ইহাই বড় শিক্ষা। এই জ্ঞান বহু বৎসরের শিক্ষাপ্রচারেও অধিগত হয় নাই। কিন্তু আজ এই জ্ঞান রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই জ্ঞান কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু দেশের দরকারী অন্নবস্ত্র পণ্য এদেশেই সৃষ্টি করার এই ইচ্ছা সফল হইবার উপায় কি? এই প্রশ্নটিকে সকল দিক হইতে বিচার করিয়া দেখার জন্যই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে অন্নের কথাই ধরিব। ব্রহ্মদেশীয় চাউল বঙ্গ-দেশে আসিয়া অন্নের অনটন ঘুচাইত বলিয়া যে কথা সরকার প্রচার করিয়াছেন তাহা অনেকে অঙ্কপাত দ্বারা অসত্য প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা জানি যে বঙ্গদেশ হইতে উৎকৃষ্ট চাউল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান যাইত; তাহারই কিয়দংশ মাত্র ব্রহ্মদেশ হইতে মোটা চাউল আসিয়া পূর্ণ করিত। সুতরাং বঙ্গদেশে আবশ্যক ধান প্রচুর পরিমাণে হয় না বলা অন্যায়। বস্তুত আসাম ও বঙ্গদেশের চাউল অনেক বিদেশীর ও ভিন্ন প্রদেশবাসীর অন্ন যোগাইতেছে বলিয়াই বর্তমানে এই অবস্থা। অষ্ট্রেলিয়া ও পঞ্জাব হইতে এদেশে অন্নাভাব ঘুচাইতে গম আসি-তেছে। ইহার সম্যক্ তাৎপর্য এই যে, ইংরেজ, আমে-রিকান, পঞ্জাবী ও অন্য যে-সকল ভিন্ন প্রদেশ ও দেশবাসী এখন বঙ্গদেশে আছে তাহাদের খাদ্যের পরিমাণ বিচার করিলে ঐ সকল আমদানিকে আর বঙ্গদেশের প্রতি কাহারও বদান্যতা বলা যায় না। সুতরাং বঙ্গদেশে আরও 'খাদ্যশস্য জন্মাও' বলিয়া যে আন্দোলন গবর্ণমেণ্ট তুলিয়াছেন তাহা নিছক বঙ্গদেশের প্রতি করুণায় নহে, বঙ্গদেশে বাহির হইতে খাদ্য পাঠাইবার যে দায় গবর্ণমেণ্টের আছে তাহা কমাইবার জন্য।

এ কথা বলিবার কারণ কি? বলিবার কারণ এই যে, সেই লোকজন, সেই দেশ; আজ এ আন্দোলন কেন? আজ ইহার প্রচারের জন্য, জলসেচের জন্য, তত্ত্বাবধানের জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের স্কীম গবর্ণমেণ্ট করিয়া-ছেন তাহা পূর্বে হয় নাই কেন? তখন পতিত জমি পড়িয়াছিল, কৃষিকার্য যে অর্থকর নয় সে আলোচনা নিষ্ফল ছিল এবং দেশের বেকারদিগকে কোন বৃত্তি দেওয়ার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন কর্তব্য স্বীকৃত হইত না।

আমাদের উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য ইহাই নহে যে, আমরা খাদ্যশস্য জন্মাইতে অধিকতর যত্ন করিব না, বরং এই অবসরে জলসেচ ও গবর্ণমেণ্ট-দত্ত অন্যান্য সুযোগ লইয়া পতিত জমিকে ফসলী জমিতে অবশ্যই পরিণত করিয়া লইব, এবং অর্জিত শস্যের সর্বনিম্নমূল্য এমন করিয়া রাখিব যাহাতে কৃষিকার্য দ্বারা একজন কর্মঠ লোক সত্যই পরিবার প্রতিপালন করিয়া সুস্থ সবল জীবন ধারণ করিতে পারিবে। ইহা কেমন করিয়া হইবে? অন্য দেশে যেমন করিয়া হইয়াছে আইন দ্বারা। বস্তুত রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য না পাইলে যখন কোন শিল্পই সভ্যজগতে বাঁচিতে পারে না তখন কৃষিশিল্পই বা কেমন করিয়া অর্থকর হইবে? যদি রাষ্ট্রের যত্ন থাকে তবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কম দামে চাষীরা সার পাইতে পারে, শস্য বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা বা না করার ব্যবস্থা রাষ্ট্র হাতে লইয়া কৃষক তথা দেশবাসীর পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক তাহা করিতে

পারেন—সর্বোপরি সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিয়া কৃষকের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এ দেশের শতকরা ৭০ জন লোকের জীবিকা কৃষিকর্ম। সুতরাং কৃষকের জীবিকার ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবিকার সংস্থান হয়।

অন্নের কথা বলিতে বলিতে আমরা কৃষিকার্যের কথায় চলিয়া আসিয়াছি। কৃষিকার্য কেবল অন্নই দান করে না, নানারূপ মনুষ্যব্যবহৃত দ্রব্যের কাঁচামাল কৃষিকার্য দ্বারা অর্জিত হয়। চট, আসন, গালিচা প্রভৃতির জন্য পাট, বস্ত্রের জন্য তুলা, তৈলের জন্য তিসি, সরিষা প্রভৃতি বীজ, ঔষধের জন্য গাছড়া ইত্যাদিও কৃষিকার্যের ফল। শেষোক্ত বস্তুগুলি এদেশে বহু শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। আর শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে ভারতের খনিজ।

দাঁতমাজার বুরুশ ও দন্তমঞ্জন, লিখিবার কালি ও নিব, ছাপান বই ও সংবাদপত্র, চায়ের কাপ ও কেট্‌লী, কাপড় কলের যন্ত্র ও সরুমোটা সুতা, পাড়ের রং, দেশলাইয়ের রাসায়নিক দ্রব্য, সিনেমার কাঁচা ফিল্ম, ছাপাখানার যন্ত্র ও কালি এবং কাগজ, চামড়ার জুতা ও ব্যাগ, মোটর ও রেল—আধুনিক জীবনযাত্রায় সবই প্রয়োজন।

সুতরাং অন্ন ছাড়াও আর যাহা প্রয়োজন তাহার জন্যও এ দেশে প্রচুর এবং যথেষ্ট আয়োজন চাই। এই সকলের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের বড় পীড়া দিয়াছে ও দিতেছে। কিন্তু আশার কথা আছে। উল্লিখিত দরকারী দ্রব্যসমূহের অধিকাংশের কারখানাই এ দেশে ছিল; যুদ্ধহেতু প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং বিদেশীদের প্রতিযোগিতা কমিয়া যাওয়াতে এদেশে আরও বহুসংখ্যক কারখানার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে এই বেকারের দেশে আরও বহুলোক কর্ম পাইয়াছে; ফলত দেশে আর কোন বেকার লোক নাই বলিলেই চলে।

এই সকল প্রতিষ্ঠান যুদ্ধোত্তর কালেও টিকিয়া থাকিবে, বেকার আর এদেশে কেহ থাকিবে না, ইহা আমরা সকলেই চাই। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইবে এবং তাহার বিঘ্নই বা কি সেই বিষয়ের আলোচনাই এখন করিব।

বিঘ্নের কথাই আগে বলি। যদি বলা যায় যে "এদেশী তৈরি জিনিষ খারাপ, বিদেশী জিনিষ ভাল—যুদ্ধান্তে বিদেশী পাইলে স্বদেশী বস্তু কে কিনিবে?" ইহার উত্তর এই যে সকল দেশেরই কোন-না-কোন শিল্প দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। কিন্তু টাটার লোহার কারখানা চালাইয়া ভারতবাসীরা কি প্রমাণ করে নাই যে, উপযুক্ত অভিজ্ঞ বিদেশী আনিয়া তদ্দ্বারা প্রথমত কারখানা চালাইয়া পরে কেমন করিয়া নিজেরাই তাহা চালান যায়? এমনি করিয়াই ত রাশিয়া ফোর্ড কোম্পানীকে তাহাদের নিজেদের দেশে আনিয়া মোটর গাড়ীর কারখানা গড়িয়া লইয়াছে। সেখানে ফোর্ডের এঞ্জিনীয়ারগণই ত রুশীয় এঞ্জিনীয়ারদিগকে সকল কার্য শিখাইয়া দক্ষ করিয়া দিয়া গিয়াছে। শুধু মোটরে নয়, অন্যান্য বহু শিল্পেও এমন দ্রুত বিদেশীর নিকট হইতে রাশিয়া শিখিয়া লইয়াছে যে, জাতীয় অনুপ্রেরণায় তাহার কর্মশক্তি দ্বিগুণিত হইয়াছে। এবং তাহারই ফলে সে আজ জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইতে পারিতেছে। জাপানের উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে। জাপানও এখন হইতে চল্লিশ বৎসর আগে শিল্প-বাণিজ্যে নগণ্য ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বহস্তে ছিল। তাই জাপান রাষ্ট্রের ছায়ায় শিল্পে এত অল্প দিনে অত উন্নতি করিয়াছে। এ জন্যই জাপান এই মসলিনের দেশ হইতে তুলা লইয়া গিয়া সরু সুতার কাপড় এদেশে আনিয়া বেচিয়া যাইতেছিল।

আরও বিঘ্ন আছে। সে বিঘ্ন কি আমাদের হাতেই গড়া? শুনা যায় এদেশে স্বায়ত্তশাসন হইতেছে। তাহার এক উদাহরণ দিতেছি। ছাপাখানার কালির কতক উপকরণ বিদেশ হইতে আসে। তাহার উপর কর চাপে শতকরা ৩৬ টাকা। অর্থাৎ ১০০৲ স্থলে ১৩৬৲ খরচ করিয়া তাহা এদেশে কালির কারখানা কিনিতে পারিবে। অপর পক্ষে বিদেশী তৈরি কালির উপর কর চাপে মাত্র শতকরা ১২ টাকা। এই নিয়ম বাণিজ্য-বিভাগের সৃষ্টি। বাণিজ্য বিভাগ স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্গতই সম্ভবত কিন্তু বাণিজ্য শুল্ক নির্দ্ধারণ করা তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত।

বস্তুত যেখানেই ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা সেখানেই দেখিতে পাই রাষ্ট্রের অকৃপা। গালা, কৃষি, পাট, কুইনিন, চিনি—এমনি নানা বস্তুর জন্য রিসার্চ বা গবেষণার জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান, কমিটি ও রিপোর্টের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উহার জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা কোন শিল্প সৃষ্টি করিয়া এদেশে বাণিজ্যের প্রসার করিয়াছে, এমন উদাহরণ তো আমরা দেখিলাম না। পরীক্ষাগারের সীমার মধ্যেই উহা রহিয়া যায়; এদেশের শিক্ষিত জনের বুদ্ধি বিদ্যা ও চিন্তাকে মথিত করিয়াই উহা লয় পায়। কতকগুলি বড় চাকুরী সৃষ্টি হয়, সেই চাকুরী অবলম্বন করিয়া থাকিয়াই তাঁহারা জীবিকানির্বাহ করেন। তত দিনে বিদেশীর

শিল্পদ্রব্যে ভারতের বাজার ছাইয়া যায়। গালা হইতে বাটি, কৌটা, ছিপি আজও এদেশে হইল না।

দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, গবেষণা থাকুক। যদি গবেষণা করিতেই হয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সে গবেষণা হউক। যেন নবলব্ধ জ্ঞান একেবারে তখনই প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপকার হয়। অন্যথা দেশী বিদেশীর বিজ্ঞানের খাতায় ছাপা হইয়া বুঝিবা সেখানেই উহা সমাধিলাভ করে।

এদেশে শিল্পের বিঘ্নের কথাই এতক্ষণ বলিলাম। সুবিধার কথাই এখন বলিব। ইউরোপ শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিপত্তিশালী মহাদেশ। তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধীন। এই বিভিন্ন দেশের পণ্য অপর দেশে যাইবার বাধা আছে জাতীয়তার দিক হইতে। কিন্তু ভারতবর্ষ মহাদেশের তুল্য এক দেশ। নবসৃষ্ট প্রাদেশিক আবগারী আইন ছাড়া ইহার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের আর কোন বাধা নাই। সুতরাং এই বিপুল দেশে, এই বিরাট্ ক্রেতা সমাজে কোথায় মাল বেচিব বলিয়া যুদ্ধাস্ত্র লইয়া অপর দেশে যাইবার আমাদের প্রয়োজন নাই।

কাঁচামালও এদেশে প্রচুর। বস্তুত বর্তমান যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে জার্মানী ব্যবসায় এদেশে এরূপ ভাবে পরিচালন করিতেছিল যে, পণ্যের বিনিময়ে তাহারা আদৌ টাকা দেশে লইয়া যাইত না, ভারতীয় কাঁচামাল—কৃষিজাত, খনিজ ও কতক ভারতীয় পণ্য স্বদেশে লইয়া যাইত। এই কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন দ্রব্য জার্মানী আবার চতুর্গুণ দরে এদেশে আনিয়া বেচিত। কেবল জার্মানী নয়—জাপান, ইটালী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতিও।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে আশা হয়, আমরা পারিব। আমরা রাষ্ট্রের স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইয়া দেশীয় পুরাতন ও নবসৃষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিব। দেশের বেকার সমস্যা বিদূরিত হইবে, বাহিরে দেশের ঐশ্বর্য্য চলিয়া যাইবে না; স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় ও কর্মে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারিব।

কিন্তু রাষ্ট্রের স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইব কি প্রকারে? তাহার স্নেহ যে বিদেশীর প্রতি—কার্যে, নিয়মবন্ধনে ও শাসনে তাহা প্রতিভাত হয় পদে পদে। বস্তুত মনে হয় বিদেশী যে আমাদের শাসন-রশ্মি ধরিয়া আছে তাহা কেবল বাণিজ্য-প্রসার লক্ষ্য করিয়া। সুতরাং স্নেহ পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা বলিব, স্বেচ্ছায় এই স্নেহ কেহ দিবে না। এই সৎমায়ের বুকের দুধ কাড়িয়া খাইতে হইবে। দেশময় আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে, সমস্ত জনগণ যেন এদেশের অবস্থা বুঝিয়া রাষ্ট্রের উপর সুবিধা পাইলেই চাপ দেয়, যেন এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের অসুবিধার কথা সর্বদা সকলের মনে জাগে এবং সকলের কর্ম ও নিষ্ঠার সহযোগে এমন শক্তির সৃষ্টি হয় যাহাতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট-সৃষ্ট সকল বিধি ভারত শিল্পের সহায়ক হয়,—দ্ব্যর্থক আইন দ্বারা এদেশের শিল্পের অবনতি না ঘটে।

যুদ্ধান্তে কি ভাবে ভারতের শিল্প রক্ষা করা যায় সে বিষয় আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন, কমিটি গঠিত হইয়াছে, প্রশ্নপত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং রিপোর্ট বাহির হইবে। কিন্তু দেশবাসীর মনে এই বিষয়টির সম্যক্ ছবি সদাজাগ্রত যেন থাকে। তবেই আমাদের সকলের মঙ্গল।

স্বর্গ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যা কিছু দুর্লভ শুধু তারই মাঝখানে
খুঁজিয়া ফিরেছি স্বর্গ এখানে-সেখানে।'
আগ্রার তাজে গেনু, গেনু অজন্তায়,
ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গেনু; গিরির মাথায়
চড়িনু খুঁজিতে স্বর্গ। অন্ধ ছিল চোখ—
তাই দেখি নাই কত নিকটে দ্যুলোক।
আজ দেখি স্বর্গ মোর হাতেরই নাগালে।

স্বর্গ জ্বলে ঊর্দ্ধে নীল আকাশের ভালে।
পল্লব-কাঁপানো মৃদু দখিনা-সমীরে
স্বর্গ এসে গায়ে হাত বুলাইছে ধীরে।
দোয়েলের শীষে স্বর্গ। শ্যাম দূর্ব্বাঘাসে
নয়ন-জুড়ানো স্নিগ্ধ স্বর্গ মোর হাসে।
একান্ত কাছের যারা তাহাদের মুখ
আমার অন্তরে বহি আনে স্বর্গসুখ।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া বিশখা ঘরের ও বাহিরের চারিদিকে ভাল করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া চুপ করিয়া দাওয়ার উপরে বসিয়া রহিল। নাঃ—বলাই তাহা হইলে গত রাত্রেও ফিরিয়া আসে নাই। গতকল্য সারা দিনরাত্রের ভিতরে যে একটা দানা অন্নও পেটে যায় নাই—সারারাত্রি ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া অবশেষে শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তবু এখন কিন্তু পেটের জ্বালার চেয়েও বলাইয়ের কথাই বিশখাকে বেশী করিয়া পাইয়া বসিল। কোথায় গেল লোকটা? গত এক মাস ধরিয়া কোন দিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। মেটে আলু, কচু সিদ্ধ আর বজরা খাইয়া পেটের অসুখ করিয়াছে। এমন জোয়ান চেহারা তাহার শুকাইয়া একেবারে কিই না হইয়া গিয়াছে—বুকের হাড়গুলি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—দুই চোখ গর্ত্তে বসিয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া না খাইতে পাইয়াই অবশেষে বলাই তাহাদের ফেলিয়া পলাইয়া গেল। চারিটি বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। এই চারিটি বৎসরের ভিতরে একটি দিনের জন্যও তাহাদের ছাড়াছাড়ি হয় নাই। বিবাহের পরের দিনগুলির কথা স্মরণ করিলে সে আজ স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। বলাই তাহাকে কি ভালই না বাসিত! আর কি দিনই না গিয়াছে তখন। তাহার পিতা বৃদ্ধ হলধর—শ্বাসের রোগী—কোন কাজ করিতে পারে না—বিশেষতঃ জলে গেলেই তাহার অসুখ করে। বলাই একাই সারাদিন ধরিয়া মাছ ধরিত। কখনও পাড়ার "গাঁতার" মিশিয়া গড়াইতে বেড়জালে যাইত। জল কমিলে পৌষ মাসের দিকে বিলে বাঁধ দিত। খালে বিলে সে কি মাছ ছিল তখন—দৈনিক দেড় টাকা দুই টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিত সে। কোথায় গেল জলের সেই মাছ! আর কোথায় গেল সেই দিন—যখন চালের সের ছিল দুই আনা! এক টাকা সের চাল কিনিয়া কেমন করিয়া বাঁচিবে মানুষ—কেমন করিয়া সংসারের আর সকলকে খাওয়াইবে? আজকাল সারাটা দিন পরিশ্রম করিয়াও বলাই সাত আট আনার বেশী মাছ পাইত না। এমনি করিয়াই তো পেটের দায়ে জাল দড়ি-দড়া পর্য্যন্ত বেচিয়া খাইয়াছে। বলাইয়ের জন্য যত তাহার রাগ হয়—দুঃখ হয় তার চাইতেও বেশী—আহা কি করিবে বেচারী—এমনি করিয়া না খাইয়া কয় দিন পরিশ্রম করিবে—কেমন করিয়া এই সংসারের সকল ভার বহিয়া বেড়াইবে? না জানি কোথায় কেমন আছে? বাঁচিয়া আছে তো? ঝর ঝর করিয়া দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইতে লাগিল তাহার।

উঠানের এক পাশে আগুন জ্বালাইয়া খানকয়েক রাঙা আলু পোড়াইতেছিল হলধর। বিশখার দিকে নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিল—বলাই সত্যি করেই তা হ'লে আর আসবে না বিশখা? এমন জোয়ান মানুষ—তুই গেলি এমন করে পলায়ে? হা ধর্ম্ম তুমি এর বিচের করো—হা হরিঠাকুর তুমি দেখো। বিশখার ভাল লাগিতেছিল না—অন্য সময় হইলে হয় তো পিতাকে দুই-এক কথা শুনাইয়া দিত কিন্তু মাথা তাহার ঘুরিতেছিল—অনাহারে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। আবার সেখান হইতে ঘরের দাওয়ায় গিয়া চুপ করিয়া খানিক বসিয়া রহিল।

এত সকালে রাঙা আলু তাহার পিতা কোথায় পাইল তাহা জানিতে বিশখার বাকী নাই—দাসেদের ক্ষেত হইতে নিশ্চয় ভোর রাত্রে গিয়া চুরি করিয়া আনিয়াছে। কই এই যে তিন-চারখানা বড় বড় আলু পোড়াইল হলধর—একখানাও তো তাহাকে দিল না। যন্ত্রচালিতের মত পুনরায় বিশখা উঠিয়া দাঁড়াইল—পুনরায় হলধরের সম্মুখে গিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেই পোড়া রাঙা আলুর দিকে তাকাইয়া রহিল। হলধর একখানা আলু তৎক্ষণে চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোট দেখিয়া বাছিয়া একটা রাঙা আলু বিশখার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল—খা বিশখা। বিশখা ছাই ও ধুলাসমেত আলুটা তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ মুখে পুরিয়া দিল। সেদিন সারাটা দিনের ভিতরে আর কিছুই আহার জুটিল না। ঘরে একখানা কাঁসার থালা ছিল, সেইখানা বিক্রয় করিয়া একটি টাকা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামের হাটে এক ছটাক চাউলও পাওয়া গেল না। সেই দুপুরবেলা হলধর ট্যাকটি পুনরায় ট্যাঁকে গুঁজিয়া মাইল তিনেক দূরে একটি হাটে গিয়াছে চাউলের খোঁজে, পাইবে কি না কে জানে? বিকালবেলা বাড়ীর পাশের রাস্তাটির ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল বিশখা। এমন সময় দল বাঁধিয়া তরঙ্গিণী, রাধিকা, আহ্লাদী, বিন্দিপিসি আরও তিন-চারি জন কোথায় যেন যাইতেছিল। বিশখা ডাকিয়া বলিল, "কোথায় যাস্ আহ্লাদী?"

আহ্লাদী বলিল, "গোঁসাইগঞ্জে যাব।"

বিন্দিপিসি বলিল, "যাস্ তো আয় বিশখা, সেখানকার জমিদার-বাবুরা না কি চাল দিতিছে—এক একজনের আধ সের করে চাল।"

—"তাই না কি?"

বিশখা আর কথাটি না কহিয়া চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে দলে গিয়া মিশিল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন তাহারা গোঁসাইগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল—জমিদার বাড়ীর দরওয়ানেরা তখন ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে—আজ আর চাউল দেওয়া হইবে না। ফটকের পাশে ভিড় তখনও জমিয়া রহিয়াছে—দলে দলে নর-নারী ঘাসের উপরে কেহ বসিয়া—কেহ শুইয়া পড়িয়াছে—হয় তো আগামী কল্য পর্য্যন্ত তাহারা এমনি করিয়াই এখানে চাউলের

আশায় পড়িয়া থাকিবে। বিশখাদের দলটি এক পাশে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দিপিসি বলিল, "আমাদের অদেষ্টই মন্দ—কি হবি আর দাঁড়ায়ে থাকে—চল যাই।"

ফিরিয়া চলিল বিশখাদের দল আবার। সেই মেঠো পথ—বৈশাখের রৌদ্রে সারা মাঠ পোড়া মাটির মতো হইয়া আছে। বৈশাখের আজ পনর দিন হইয়া গেল—তবু এক ফোঁটা বৃষ্টি এ অঞ্চলে হয় নাই—রাত্রিবেলাও একেবারে আগুনে-হাওয়া বহিতেছে। পা আর কাহারও চলিতেছে না—অর্দ্ধেক পথ আসিতেই রাত্রি অনেকখানি হইয়া গেল। হঠাৎ পথের মাঝে আহ্লাদী একেবারে অসহায়ের মত বসিয়া পড়িল—নাঃ আর এক পাও সে নড়িতে পারিবে না। বিন্দিপিসি তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া বলিল—কি হলো রে আহ্লাদী—অমন করতিছিস্ কেন্?

আহ্লাদী একেবারে ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—মাতা যে ঘুরতি নেগেছে পিসি—আজ দুটো দিন যে কিছু খাতি পাই নেই।

আহ্লাদীকে লইয়া দলসুদ্ধ সকলে চষা জমির উপরে বসিয়া পড়িল। আজ পূর্ণিমা—সারা আকাশ ও মাটিতে রূপের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে—দূরের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর হইতে একটা কোকিল বারে বারে ডাকিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এ রূপ দেখিবার মতো আর আজ অবসর কাহারও নাই। এমনি রূপের তরঙ্গের মধ্যে পাঁচ-সাতটি অভুক্ত নারী অসহায় ভাবে মাঠের ভিতরে পড়িয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে বিন্দিপিসি বলিয়া উঠিল—আমার সাথে আয় তো তরঙ্গিণী—আর তোরা সব্বাই চুপ করে বসে থাকিস্ যতক্ষণে না আমরা ফিরি।

বিশখা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাচ্ছ পিসি?

—সে পরে শুনবি।

কতক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল—বিন্দিপিসি আর তরঙ্গিণী—হাতে তাহাদের দুইটি করিয়া চারিটি বড় বড় তরমুজ। তরমুজ দেখিয়া সকলে একেবারে অস্ফুট হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

—তরমুজ?—চারটে?

—কোথায় প্যালে পিসি?

—খালের ধারের মণ্ডলদের জমিতি হইছিল।

শক্ত মাটিতে আছড়াইয়া তরমুজ চারিটি ভাঙ্গিয়া বিন্দিপিসিই সকলকে ভাগ করিয়া দিল। আহ্লাদী এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়া ভাঙা তরমুজের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে। তরমুজ খাইয়া বাকী পথটুকু চলিয়া যখন তাহারা গ্রামে পৌঁছিল—তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়া গিয়াছে।

দিন দুই পরে একদিন সকালবেলা বিন্দিপিসি চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক জড় করিয়া ফেলিল। সনকাবুড়ী তাহার নিজের ঘরে মরিয়া আছে। বুড়ী পর পর কয়েক দিন কিছুই খাইতে পায় নাই—সংসারে তাহার একমাত্র পৌত্র—আজ কয়েক দিন হইল তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। উঠানে দাঁড়াইয়া পাড়ার সকলে জটলা করিতেছিল—এমন সময় হঠাৎ বিন্দিপিসি একেবারে চীৎকার করিতে সুরু করিয়া দিল—হা ভগোমান—তুমি দেখ্‌তি পাও না—শুন্‌তি পাও না? যারা এমন করে দ্যাশের সব্বনাশ করলো—না খাতি দিয়ে মারলো—তাগেরে বিচের তুমি করো—করো, বলিতে বলিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। আরও দশ-পনরটা দিন চলিয়া গেল। না খাইতে পাইয়া—নিজের ঘরে পথে, ঘাটে শুকাইয়া মরা আর এখন নূতন নয়—প্রতিদিন দুই একটি করিয়া এমনই ঘটনা ঘটিতে লাগিল।

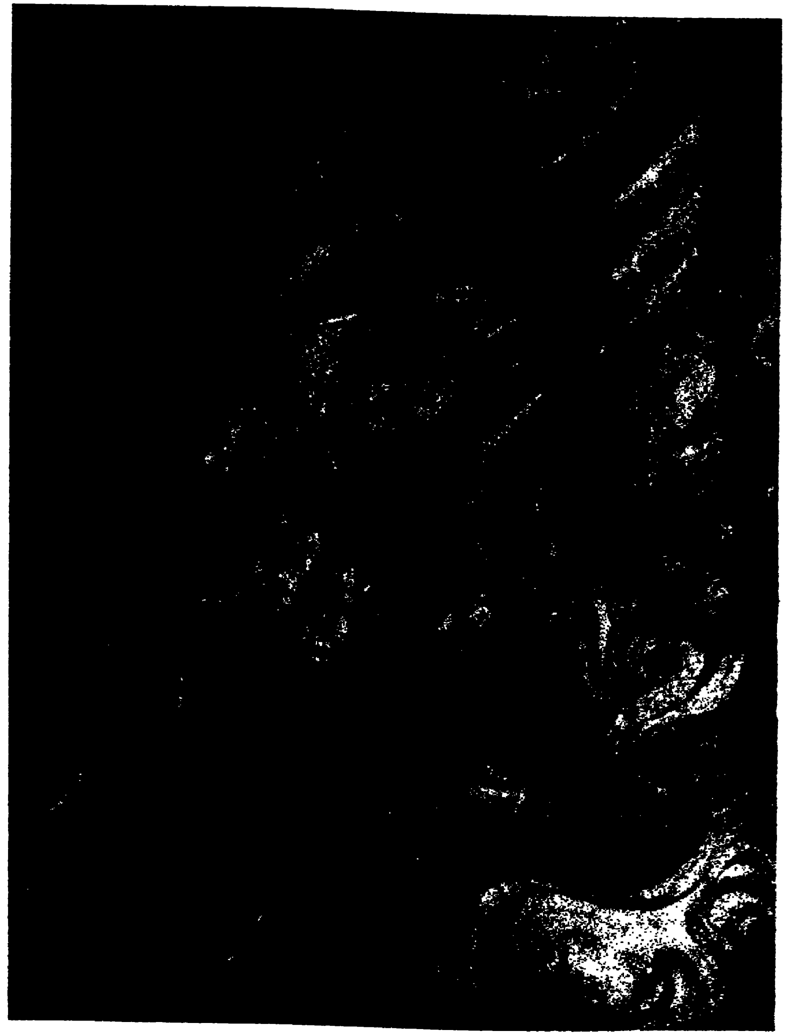
২

মাসখানেক পরে রতনপুর ছাড়িয়া চলিয়াছে একটি দল। মাইল তিনেক দূরে যে রেল-ষ্টেশন সেখান হইতে রেলগাড়ীতে চাপিয়া যাইবে কলিকাতায়। দলে হলধর হালদার, তারিণী মণ্ডল, নিতাই দাস এই তিন জন পুরুষ আর বিন্দিপিসি, বিশখা আহ্লাদী, তরঙ্গিণী প্রভৃতি চৌদ্দজন স্ত্রীলোক—ছেলে মেয়ে দশটি, শিশু পাঁচটি। সর্ব্বসুদ্ধ বত্রিশটি প্রাণী ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিয়াছে পথ দিয়া। এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে পা আসিতেছে ভাঙ্গিয়া—ছেলেমেয়েরা কাঁদিতেছে আর মায়ের পাছে পাছে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতেছে—শিশু কয়েকটি একেবারে বাদুড়ের মতো মায়ের বুকে লাগিয়া আছে—সেগুলির একটিও যে বাঁচিবে এমন ভরসা নাই। নিতাই এককালে কলিকাতায় ফেরি করিত—সে-ই বলিয়াছে কলিকাতায় গেলে বাঁচিবার কোন পথ হইবেই—ভিক্ষা ত মিলিবেই তাহা ছাড়া মাড়োয়ারী বাবুরা, বড় বড় বাঙালী বাবুরা অন্নসত্র খুলিয়া খাওয়াইতেছে—এ খবর সে জানে। কয়েক বার ট্রেনে উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সারাটা দিন তাহারা ষ্টেশনে রহিল বসিয়া। অবশেষে শেষরাত্রে একটা গাড়ীতে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই বোঝাই হইয়াছিল, তারপর এই বত্রিশটি প্রাণী এবং ইহার পরও প্রত্যেক ষ্টেশন হইতেই দশ-বিশ জন করিয়া ইহারই ভিতরে দরজা জানালা দিয়া মাথা গলাইতে লাগিল। বাক্সে-পেটরায়, পোঁটলা-পুঁটলী আর মানুষে স্তূপাকার হইয়া গেল। সকালবেলা শিয়ালদা আসিয়া গাড়ী থামিল। গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া বাসিনী একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার তিন মাসের ছেলেটিকে সে গাড়ীর এক কোণায় বেঞ্চের নীচে শোয়াইয়া রাখিয়া নিজের শ্রান্ত দেহটি গাড়ীর দেয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুঁজিয়াছিল। কাহার পায়ের তলায় পড়িয়া ছেলেটি যে কখন মরিয়া আছে সে জানিতেও পারে নাই। বাসিনীর বুকভাঙা ক্রন্দনে সারা শিয়ালদা ষ্টেশন ভরিয়া গেল। বিন্দিপিসি মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—নাঃ—পেরথমেই দেখছি অযাত্তারা—এ আবার কোন্ অলুক্ষুণে জায়গায় আলাম কে জানে।



অবসরের সঙ্গী

শিল্পী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর



সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

শিল্পী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর



বিষ্ণুর বিশ্বরূপ। দক্ষিণ-ভারতে সুচিন্দ্রম মন্দিরের ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন



সুচিন্দ্রম মন্দিরে ত্রিশিরবিশিষ্ট দেব-মূর্ত্তি

কলিকাতার এত মানুষ গাড়ী ঘোড়া দালান কোঠা কয়েকদিন তাহাদের একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিল। শিয়ালদা ষ্টেশনের কিছু দূরেই হ্যারিসন রোডের পাশে একটা চওড়া ফুটপাতের উপরে তাহারা আস্তানা গাড়িয়া বসিল। দুই-একটি মাটির হাঁড়ি, শান্‌কী, ছেঁড়া কাঁথা, কাপড় এই শেষ সম্বল সঙ্গে করিয়া তাহারা গ্রাম হইতে আসিয়াছিল—তাহাই রাস্তার ধারে ধারে বিছাইয়া লইয়া ইহারা সংসার পাতিয়া বসিল। কিন্তু কোথায় অন্ন? কোথায় ভিক্ষা? আর কতজনকে ভিক্ষা দিবে লোকে—ভিখারীতে ভিখারীতে যে সারা কলিকাতা শহর একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। আবর্জ্জনার স্তূপের ভিতর হইতে হ্যাংলা কুকুরের মতো কি সব খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহারা আহার করে—ভুক্তাবশিষ্ট ডাবের খোল পথের উপরে আছড়াইয়া আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া তাহাই চাটিয়া খায়—কচি কচি ডাবের ছোবড়া চিবাইতে থাকে—ফলের দোকানের পাশ হইতে পচা ফল কুড়াইয়া লয়। আর বৃথাই বাড়ী বাড়ী দরজায়—মা—মাগো একটু ফ্যান্ দেও মা—কিছু খাতি পাই নাই মা—বলিয়া চীৎকার করিয়া মরে। সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আবার সন্ধ্যাবেলা সকলে সেই স্থানটিতে আসিয়া হাজির হয়। এম্‌নি করিয়া দিন পনর কাটিল। এই পনর দিনের ভিতরে অনেকগুলা ঘটনা গেল ঘটিয়া। তরঙ্গিণী, পদ্মর মা, আর নিস্তারিণী একটা বড় মিষ্টির দোকানের সামনে সারাটা দিন হা করিয়া বসিয়াছিল এঁটো শালপাতার ভিতরে ভুক্তাবশিষ্ট কিছু পড়িয়া আছে কি না তাহাই খুঁজিতেছিল। বিকালের দিকে রাস্তার গঙ্গার জলের পাইপে মুখ লাগাইয়া জল খাইতে গিয়া পদ্মর মা বুড়ী মুখ থুবড়াইয়া পড়িল আর উঠিল না। তরঙ্গিণী আর নিস্তারিণী বৃথাই তাহাকে খানিকক্ষণ টানাটানি করিয়া অবশেষে পলাইয়া আসিল।

সুখদা আর ক্ষেন্তি একদিন একটা বড় রাস্তা পার হইতেছিল। ক্ষেন্তির কোলে ছিল তাহার ছোট ছেলেটি—হঠাৎ একখানা হলদে রঙের মস্ত বড় লরি আসিয়া মা ও ছেলেকে এক নিমিষে তালগোল পাকাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। শিশু কয়টির একটিও আর এখন বাঁচিয়া নাই। মায়ের রক্ত চুয়াইয়া আসিবে মাতৃস্তন্যে—মায়ের সেই রক্তই যে গিয়াছে দিনে দিনে একেবারে শুকাইয়া—দুগ্ধ আসিবে কোথা হইতে? তাই স্তন হইতে যখন এক ফোঁটা রসও বাহির হয় নাই—তখন স্তন্যপায়ীদের খাওয়ান হইয়াছে ফেন—খাওয়ান হইয়াছে পচা ভাত জলে গুলিয়া। ফলে পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে, ভেদবমি হইয়া মরিয়াছে একে একে।

বিশখা আর আহ্লাদী ঘুরিত একসঙ্গে। সেদিন রাস্তার মোড়ে একটা বিড়ির দোকানের কাছে যাইতেই একটা ছোক্‌রা ইসারা করিয়া তাহাদের ডাকিল।

বিশখা বলিল—ফিরে চল আহ্লাদী ওরা লোক ভাল না।

আহ্লাদী বলিল—ফিরে যাবি কি রে ভাত দেবে যে।

—দিক্‌গে ভাত—যাব না আমি।

ইহারই কয়দিন পরে আহ্লাদী আর আস্তানায় ফিরিল না। কোথায় গেল আহ্লাদী, সকলে জল্পনাকল্পনা করিতে লাগিল। বিশখা কাহারও কোন কথায় যোগ দেয় নাই, সে একা একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল; আহ্লাদী যে কোথায় গিয়াছে, তাহা ত তাহার অজানা নাই, সে বারে বারে ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। বিড়ির দোকানটার দিকে আর সে ভয়ে যাইত না—তাহার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিত। কিন্তু আরও কয়েক দিন পরে বিশখা বুঝিতে পারিল—না, এবার নিশ্চিত মৃত্যু। পথে আর সে চলিতে পারে না, মাথা ঘুরিতে থাকে—মনে হয় এখনই রাস্তার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া তাহার সকল জ্বালার শেষ হইয়া যাইবে। সেদিন এক হোটেলের নিকটে ঘোরাঘুরি করিতেই—হঠাৎ হোটেলের একটি চাকর ও ঠাকুর তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গোপনে চাট্টি ভাত দিল। এমনি করিয়া কয়েক দিন আসা-যাওয়ার পর বিশখাও একদিন আর ফিরিল না। পেটের আগুনে তাহার সমস্ত ঘৃণা লজ্জা ভয় পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল।

ছেলেমেয়েরা দল বাঁধিয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিক্ষা করিত। এক দিন হঠাৎ একখানা মোটর গাড়ী হইতে কয়েক জন সাহেবী পোষাক পরা লোক তাহাদের জন দুইকে ধরিয়া গাড়ীতে করিয়া কোথায় যেন লইয়া গেল। বাকী কয়টি ছুটিয়া পলাইল। যাহাদের ছেলে তাহারা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিল। এম্‌নি করিয়া এত দিনে কলিকাতার মোহ তাহাদের একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। বিন্দিপিসি সেদিন অকারণে নিতাইকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল।

—তুই শয়তানই তো ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আলি কলকাতায়। আহা কি আমার শহর রে। কারু বাড়ীর দরজায় মাথা খুঁড়ে মলেও কেউ কথা কয় না। রাস্তায় পড়ে পড়ে মানুষ মরতি নেগেছে—কেউ এক বার ফিরে তাকায় না—এখেনে মানুষ থাহে? ভাগে ভিক্কে মিলতো না—তাই বলে বন জঙ্গলের ম্যাটে আলু কচুপাতা ফল পাকড় এ সব তো ছিল! আর কি আমার শহরের ছিরি রে—পথে পথে নোংরার ছড়াছড়ি, বৃষ্টির জলে সব একাকার হয়ে যায়। কোন জায়গা কি এট্টু মাটি মিলবার যো আছে—ক্যাবল ইট আর পাথর—রোদের সময় হাটতি গেলি পা জ্বলে যায়। মান গেল, ইজ্জৎ গেল, মানুষির জেবন গ্যালো—ছোট ছোট ছাওয়াল-পানগুলোর ধরে নিয়ে গ্যালো কোন্ ছাশে! ঝাঁটা মারি এমন শহরের মুখি! বলিতে বলিতে রাগে ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল বিন্দিপিসি। নিতাই কোন কথার জবাব না দিয়া একপাশে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল। বিন্দিপিসি পুনরায় বলিতে লাগিল—হে মা জন্মমাটি—ক্যামা করো মা—তোমারে ছাড়ে আইচি—তোমার শাপেই বুঝি এমনি দশা হলো মা! বলিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল।

৩

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একজন ভদ্রলোক আসিয়া এই দলের ভিতরে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে একেবারে কলরব করিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

—দাদাবাবু যে—ছোটবাবু যে—কবে আলেন—এমনি নানা প্রশ্ন হইতে লাগিল।

ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন—এই তো এলাম হলধর—কেমন আছ তারিণী—রসিকের মা ভাল তো? এ কি রে তোর এমন দশা হয়েছে কেন? বিন্দিপিসি কাঁদিয়া ছোটবাবুর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তুমি বাঁচাও ছোটবাবু—আমরা যে সব একেবারে মলাম এবার! পদ্মর মা পথে পড়ে মরিছে—ক্ষেন্তি ছাওয়াল কোলে করে গাড়ীর তলে পড়ে মরিছে—কোলের ছাওয়াল মেয়াগুলো এট্টাও বাঁচে নাই—নন্দ আর ফটকেরে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে—আহ্লাদী আর বিশখা ভাতের জন্যে শ্যাষকালে জাত দেছে ছোটবাবু!

ছোটবাবু বিন্দিপিসিকে টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—সেই জন্যেই তো এসেছি। জেল থেকে বাড়ী ফিরে দেখলাম—গ্রাম একেবারে ফাঁকা। শুনতে পেলাম সব কলকাতায় এসেছে, তাই তো আজ দু'দিন ধরে কলকাতায় এসে খুঁজছি। তোমরা আসার পর আরও দু'দলে প্রায় চল্লিশ জন গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছে। এবার আবার সব ফিরে চলো গ্রামে।

বিন্দিপিসি পুনরায় কাঁদিয়া বলিল—কিন্তু হাতে যে এট্টা পয়সা নাই ছোটবাবু—রেলের টিকিস কেন্‌বো কি দিয়ে?

ছোটবাবু বলিলেন—সে ব্যবস্থা আমি করেছি—তোমাদের ভাবতে হবে না। নানা জায়গা থেকে কিছু চাল, গম দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। গ্রামে ফিরে গিয়ে আবার চাষবাসে মন দাও, যে যার কাজ কর, কষ্টেসৃষ্টে এক রকম করে চলে যাবে। কাল দশটায় সব তৈরী থেকো দুপুরের ট্রেনেই যেতে হবে। তোমাদের গ্রামে রেখে অন্য সবাইকে আবার খুঁজতে বেরুবো।

পরের দিন বিকালবেলা রেলষ্টেশন হইতে তাহারা হাঁটিয়া পুনরায় রতনপুরের দিকে চলিল। একদিন এই ষ্টেশন হইতেই তাহারা ট্রেনে চাপিয়া কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু সেদিন দলে ছিল বত্রিশ জন আর আজ চলিয়াছে মাত্র কুড়িটি প্রাণী। যে মায়েরা শিশু বুকে করিয়া সেদিন যাত্রা করিয়াছিল, আজ আর একটিও তাহাদের বুকে নাই, ক্ষেন্তি আর তার ছেলে গাড়ীর তলায় পিষিয়া গিয়াছে, পদ্মর মাও শেষনিশ্বাস ফেলিয়াছে কলিকাতায়। নন্দ আর ফট কে, বিশখা আর আহ্লাদী ইহারাই বা আজ কোথায়?

সম্মুখের ছোট নদীটা পার হইলে, একটা মাঠ পরেই রতনপুর। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা আসিয়া খেয়াঘাটে পৌঁছিল। নদীর ধারে আসিতেই গ্রামের ছবি তাহাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বিন্দিপিসি ছিল সকলের আগে, তাহার দেখাদেখি সকলে মিলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নিজেদের গ্রামকে প্রণাম জানাইল। কিন্তু পাঁচ-সাতটি সন্তানহারা জননীর চোখ দিয়া তখন জল ঝরিতেছিল আর বৃদ্ধ হলধর কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—ওরে বিশখারে ফিরে আয় মা!

বিন্দিপিসি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিল—কপালে যা ছিল, তা তো হলো, এখন শান্ত হও সব। মা'রে ছাড়ে গিছিলাম আমরা সৎমায়ের কোলে, মার কাছে সব মনে মনে ক্ষেমা চাও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারি বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই রাষ্ট্রপতি জর্জ্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন্ এবং জেমস্ মেডিসন্ তিন জনেই পুনরায় নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তৃতীয় বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইতে অস্বীকার করিয়া সে-দেশের ইতিহাসে এরূপ এক দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন যে, আইনতঃ কোন বাধা না থাকিলেও পরবর্ত্তী কালে কেহই দুই বারের অধিক রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। ১৯৪০ সনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তৃতীয় বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমেরিকার আইনে রুজভেল্টের চতুর্থ বার বা আরও কয়েক বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইতে কোন বাধা নাই।

দেশে যুদ্ধবিগ্রহ থাকিলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের নির্ব্বাচন সাধারণতঃ স্থগিত থাকে যদি দেশের রাষ্ট্রীয় আইনের বাঁধাবাঁধি কড়া না হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নূতন নির্ব্বাচন স্থগিত আছে, ভারতবর্ষেও পুরাতন ব্যবস্থাপক সভাগুলি কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক, প্রত্যেক বৎসর, এক এক বৎসরের নূতন মিয়াদ পাইতেছে, নির্ব্বাচন বা পুনর্গঠনের নাম নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নড়চড় নাই, এই পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধেও মার্কিনেরা তাহাদের নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে বিরত হইবে না। ১৮৬৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে যখন ভীষণ গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল, যখন এই তরুণজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিঙ্কন্ দ্বিতীয় বার

প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এ বৎসর সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের স্মরণীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে আবার মার্কিন তাহার দেশনায়ক নির্ব্বাচন করিবে।

চিলি, কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা প্রভৃতি দেশে সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের নির্ব্বাচন হয় পরোক্ষ ভোট দ্বারা। ১৯৪৪ সনের ৭ই নভেম্বর ৪৮টা ষ্টেট বা রাষ্ট্রের জনসাধারণ 'নির্ব্বাচক' নির্ব্বাচন করিবে। সেদিন কেহ হয়ত রুজভেল্টকে বা অপর ডিমোক্রাট প্রার্থীকে ভোট দিবে, আবার কেহ গণতন্ত্রী বা রিপাব্লিকান্ প্রার্থীকে সমর্থন করিবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের জন্য ভোট দিবে না, 'নির্ব্বাচক' নির্ব্বাচন করিবে মাত্র। এই নির্ব্বাচকগণই (electors) পরে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে ভোট দিবেন।

'নির্ব্বাচক'গণের সংখ্যা নির্ভর করে ষ্টেটের জনসংখ্যার উপর। তাহাদের মোট সংখ্যা সেনেট এবং প্রতিনিধি-পরিষদের (House of Representatives) সভ্য অর্থাৎ মোট কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার সমান। এই জন্য বড় বড় ষ্টেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব জোর চলে, কারণ কয়েকটা বড় ষ্টেটে জয়লাভ হইলে সফলতা সহজে হয়। নির্ব্বাচকগণের মোট সংখ্যা ৫৩১ ; নিউইয়র্ক, পেন্‌সিলভেনিয়া, ইলিনোয়া, ওহিও, টেক্সাস্ ও ক্যালিফোর্নিয়া যথাক্রমে ৪৭, ৩৬, ২৯, ২৬, ২৩ এবং ২২ জন নির্ব্বাচন করে।

নিউইয়র্ক ষ্টেটে দুই জন প্রার্থী যথাক্রমে ২০,০১,০০০ এবং ২০,০০,০০০ ভোট পাইলে প্রথম জন জয়ী হইয়া ৪৭ জন নির্ব্বাচক স্বপক্ষে পাইবে অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তি বিশ লক্ষ গণ-ভোট দ্বারা সমর্থিত হইলেও তাহার স্বপক্ষে এক জন নির্ব্বাচক নির্ব্বাচিত হইবে না। এই জন্যই সংখ্যা-লঘু দলের প্রার্থীও যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে এবং প্রকৃতই এরূপ কখনো কখনো ঘটিয়াছে। ১৮৮৮ সনে গ্রোভার ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড ৫৫,৪৪,০৫০ গণ-ভোট পাইয়াছিলেন, কিন্তু বেঞ্জামিন হ্যারিসন ৫৪,৪৪৩৩৭ গণ-ভোট পাইয়াও তাহাকে পরাজিত করিয়া প্রেসিডেন্ট হইলেন, কারণ এই ভোটেই তাঁহার স্বপক্ষে ২২৩ জন নির্ব্বাচক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডের পক্ষে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল মাত্র ১৬৮ জন নির্ব্বাচক। অবশ্য চারি বৎসর পরে গণ-ভোট ও নির্ব্বাচক-ভোট উভয় ভোটেই জয়ী হইয়া ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ সনে উড্রো উইলসন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জন মিলিয়া যে পরিমাণ গণ-ভোট পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াও প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হইতে পারিয়াছিলেন। উইলসন্ (ডিমোক্রাট) পাইয়াছিলেন ৬২,৪৬,২১৪ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হাওয়ার্ড ট্যাফ্‌ট্ (রিপাব্লিক্যান্) এবং থিওডোর রুজভেল্ট (প্রোগ্রেসিভ্) যথাক্রমে ৩৪,৮৩,৯২২ এবং ৪১,২৬,০২০ গণ-ভোট পাইয়াছিলেন। অথচ তিন জনের 'নির্ব্বাচক' ভোটের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩৫, ৮ এবং ৮৮ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ভোটাভোটি জটিল হইলেও নির্ব্বাচনের কয়েক ঘণ্টা পরেই ফলাফল জানা যায়। প্রত্যেক ষ্টেটেই পৃথক্‌ভাবে ভোট লওয়া হয়। ভোট দান সম্পর্কে প্রত্যেক ষ্টেটেরই পৃথক্ পৃথক্ আইনকানুন আছে। ১৯৪৪ সনের ৭ই নভেম্বর নির্ব্বাচক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ৪৮টা ষ্টেটের নির্ব্বাচকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ ষ্টেটের রাজধানীতে সমবেত হইয়া ১৯৪৪ সনের ১৮ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ও সহকারী রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের জন্য ভোট দিবেন। ১৯৪৫ সনের ৬ই জানুয়ারী ওয়াসিংটনের প্রতিনিধি-পরিষদে (House of Representatives) ভোট গণনা হইবে। নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি ১৯৪৫ সনের ২০শে জানুয়ারী কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ নির্ব্বাচনের ফলাফল পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইবে। কারণ মার্কিন জাতি এত বড় একটা ব্যাপারের খবর না জানিয়া রাত্রিতে কিছুতেই নিদ্রা যায় না। সাংবাদিকগণ নানা উপায়ে খবর সংগ্রহ ও সংবাদ প্রকাশ করিয়া তবে ছাড়ে। ১৯১৬ সাল হইতে সংবাদপত্রের আনুমানিক খবর প্রায়ই ঠিক হইয়াছে এবং এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই পরাজিতপ্রার্থী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। ১৯১৬ সনে কিন্তু সংবাদে ভুল ছিল, কারণ সংবাদপত্র নিউইয়র্কের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর চার্লস ইভান্স হিউজেসকে পরবর্ত্তী প্রেসিডেন্ট বলিয়া ঘোষণা করিলেও পরে দেখা যায় উড্রো উইলসন্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে যে খুব আন্দোলন চলে তাহা বলাই বাহুল্য। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকের নয়টি ষ্টেট যথা, ভার্জিনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, টেনেসি, জর্জিয়া, এলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি এবং লুসিয়ানিয়া—'নিরেট দক্ষিণ' (solid south) নামে পরিচিত। ইহারা ১৮৬১ সনে দল বাঁধিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক্ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তবে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহারা চিরদিনই 'ডিমোক্র্যাট' দলের। ধর্ম্মে এই ষ্টেটগুলি গোঁড়া প্রোটেষ্ট্যান্ট, এবং মদ্যপান-বিরোধী (Prohibitionist)। এই জন্য ১৯২৮ সনে

ডিমোক্রাটপ্রার্থী এলক্রেড স্মিথ মদ্য প্রচলনের স্বপক্ষে এবং ধর্ম্মে ক্যাথলিক বলিয়া ইহারা তাহাকে ভোট না দিয়া রিপাব্লিকান্ প্রার্থী হারবার্ট হুভারকে সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা ডিমোক্রাট্ এবং এই জন্য আবার প্রার্থী হইলে এবারেও রুজভেল্টের পক্ষে ইহাদের ভোট পাইবার সম্ভাবনা। এই সকল ষ্টেট হইতে মোট ৯২ জন নির্ব্বাচক নির্ব্বাচিত হন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াসিংটন ষ্টেটের নিজের কোন ভোট নাই যদিও বাকী ৪৮টা ষ্টেটের ভোট রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ষ্টেটও নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কলম্বিয়া জেলার শহর মাত্র। এই বিরাট দশ লাখ নাগরিকের শহরের ভোট দিবার অধিকার নাই। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে ইহাদের প্রতিনিধি কেহ নাই, নিজেদের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন ইহারা করে না। আলাস্কা, হাওয়াই এবং পোর্টোরিকোর লোকেরাও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তাহারা নিজেদের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের অধিকারী কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের অধিকারী নহে। ইহারা প্রত্যেকে ওয়াসিংটনের প্রতিনিধি পরিষদে (House of Representatives) নিজেদের লোক বা কমিশনার পাঠাইতে পারে কিন্তু এই সকল ব্যক্তির পরিষদে কথা বলিবার এমন কি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করিবার এবং কমিটিতে কার্য্য করিবার অধিকার থাকিলেও ভোট দিবার অধিকার নাই। কিন্তু কলম্বিয়া জেলার অধিবাসিগণের ঐটুকু অধিকারও নাই। তাহারা কাহারও নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারে না। এখানকার শহরের কর্ম্মচারী (ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার) নিয়োগ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। শহরের কোন মেয়র বা গভর্ণর নাই। প্রতিনিধির মত ছাড়া কর সংগ্রহ হইত বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, কিন্তু সেইরূপ অযৌক্তিক ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীতে কলম্বিয়ায় এখনও চলিতেছে। এই জেলার লোককে ভোটের অধিকার দিবার জন্য কয়েক বার চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু প্রত্যেক চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছে। ভোটের অধিকার না দিবার প্রধান কারণ দেখান হয় এই যে, এখানকার অধিবাসিগণের বাহিরের কোন ষ্টেটে ভোটাধিকার আছে; আবার অনেকেই অপর ষ্টেটের ভোটার কেবল কার্য্য উপলক্ষে এখানে বাস করেন মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী সেদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ যে-কোন বালক এক দিন রাষ্ট্রপতি হইতে পারে। অবশ্য নারী সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম। ভিন্ন দেশে জন্মিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইলে সে রাষ্ট্রপতি হইবার অধিকারী নহে যদিও এরূপ ব্যক্তির পুত্র রাষ্ট্রপতি হইবার অধিকারী। যদি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার পুত্র ইংলণ্ডেও জন্মগ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইংলণ্ডীয় দূতের দপ্তরে তাহার জন্ম রেজিষ্ট্রী হয় তাহা হইলে সেই পুত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরূপে জন্মিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং এই সন্তান এক দিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্ব্বাচনের যোগ্য হইতে পারিবে। যিনি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহার অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স এবং যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ ১৪ বৎসরের বাসিন্দা হওয়া প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর হইতেই রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে দুই জনের উপর ভোট লওয়া হইত; যিনি বেশী ভোট পাইতেন তিনি হইতেন প্রেসিডেন্ট ও অপর ব্যক্তি হইতেন সহকারী প্রেসিডেন্ট এরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। ১৮০০ সনে টমাস্ জেফারসন্ এবং আরন্ বার্ এই দুই জন প্রার্থী সমসংখ্যক অর্থাৎ ৭৩টি ভোট পান। উভয়েই ছিলেন একই দলের। সুতরাং প্রতিনিধি পরিষদের ভোটে জেফারসনকে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছিল। এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৮০৪ সনে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আইন পরিবর্ত্তন করিয়া প্রেসিডেন্ট ও সহকারী-প্রেসিডেন্টের পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

সকল সময় প্রেসিডেন্ট ও সহকারী-প্রেসিডেন্ট একই রাজনৈতিক দল হইতে নির্ব্বাচিত হন না। পূর্ব্বে নবনির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের কার্য্যকাল ৪ঠা মার্চ্চ হইতে সুরু হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে আইনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এজন্য রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার সহকারীর কার্য্যকাল ২০শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে।

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীমমতা ঘোষ

আষাঢ় মাস হ'ল। কবি সত্যেন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যায় বৃষ্টির আওয়াজে। মৃত্যু মাস বলে স্মরণ করি সত্যি, তাছাড়াও কথা আছে। বর্ষার মধ্যে যে বিষাদ দেখা যায় তার অন্ধকার-করা রূপে তার অজস্র বারি বর্ষণে তা আমাদের আড়ালে পড়ে যাওয়া দুঃখকে, বিস্মৃতপ্রায় প্রিয়-জনকে মনের সামনে এনে দেয়। পুরোনো দুঃখ বা শোকে তীব্রতার কাঁটা থাকে না, অসহ্য শোকে অচেতন হয়ে যাই না; দু পাঁচ জন আপনার লোকের কাছে বসে শান্ত ভাবে চলে যাওয়া মানুষটিকে স্মরণ করতে আমাদের ভালই লাগে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ শুধু তাঁর প্রিয়জনের সীমার মধ্যে নেই, সারা বাংলার লোকের মনের মানুষ। তাই তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীতে যদি নেহাত ঘরোয়া দু-চার কথা বলি তা একেবারে অরুচিকর না ঠেকতেও পারে।

পৃথিবী চলছে, মানুষ চলছে, সবই সচল; এ কারণে চলা থেকে সুরু করছি। ১৩২৭ সালে পুজোর পর আমরাও পা বাড়ালুম বিদেশের পথে। জৌনপুরে তখন আমার বড় দিদি ও ভগ্নিপতি বাস করতেন। আমরা সদলবলে গেলুম সেখানে সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে।

জীবনের artistic দিক দেখলুম প্রথম সেইখানেই। এর আগে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করেছি, কিন্তু এই সময়ই তাঁকে জানবার সুযোগ পেলুম। কবি ও কবিতা দুটোই সমান অর্থশূন্য ছিল। তখন আমার বয়স কম। বাবার আদেশ ছিল তাঁর ওপর আমাদের পড়াশুনো দেখবার। বাবা নিজে আমাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছেন কলকাতায়। ভাল মনে নেই, সম্ভবত আমরা ছিলুম অঙ্কে কাঁচা, সত্যেন্দ্রনাথ দুপুরে আমাদের অঙ্ক দেখতেন। পরে বড় বয়সে জেনেছিলুম অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল। যা হোক, আমাদের জ্ঞান দান করতে গিয়ে নিশ্চয়ই তাঁর ভাণ্ডারে টান পড়ে নি।

সে দেশে চামেলি গাছের বন ছিল। চামেলির ক্ষেত বলত সবাই। ঐ ক্ষেত আবিষ্কার করার পর আমরা ছোটরা রোজ সেখানে অভিযান করতুম। অনেক ফুল সংগ্রহ করে ফিরতুম বাড়ীতে। গোড়ে মালা গাঁথতে শিখলুম মেজদির কাছে। রোজ একটি করে গোড়ে মালা গেঁথে তাঁকে দিয়েছি। পাঠকেরা হয়তো মনে করবেন এটা অঙ্ক শেখানোর পারিশ্রমিক। তা নয় কিন্তু। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্যে পরিবারের সকলের তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দিদিরা তো তাঁকে পুজো করতেন বললেই হয়। বড়দিদি তাঁর প্রত্যেকটি কথা বেদবাক্য ব'লে মেনে নিতেন। যা কিছু ভালো তা তাঁকেই দিতে হবে এটা আমরাও শিখলুম।

আমাদের চাকরবাকরের জিম্মায় রেখে এলাহাবাদ, ফয়জাবাদ ও অযোধ্যা দেখতে গেলেন সকলে। দিন কয়েকের মধ্যে ফিরে এলেন। 'সরযূ', 'যুক্তবেণী', 'ঘুমতী নদী', 'চামেলির প্রতি' ইত্যাদি শেষের দিকের কবিতার জন্ম হয় এই সময়। জৌনপুরে পৌঁছে কবি-সুরকার ৺অতুলপ্রসাদ সেন মশায়কে তাঁর লক্ষ্ণৌর ঠিকানায় কবিতায় এক চিঠি লেখেন :—

কলিকাতা ফেলি দূরে এসেছি জোয়ানপুরে
গোমতীর তীরে গেছি থামি।

*　*　*　*

তবে ডেরাডাণ্ডা তুলি' লক্ষ্ণৌয়ের বুলবুলি
ডাকাত পড়িবে তব ঘরে।

ইত্যাদি সে চিঠিতে ছিল। অবিলম্বে উত্তর এল লক্ষ্ণৌ থেকে "দ্বার খোলা পাইবেন, সুতরাং ডাকাতি করিতে কোনো কষ্ট হইবে না। আশা করি অনুরোধ রক্ষা করিবেন।"[১] কিন্তু তাঁর লক্ষ্ণৌয়ের বুলবুলির কাছে যাওয়া শেষ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে নি।

ঐ সময়ে দেখতুম বসবার ঘরে প্রায়ই সান্ধ্য আসরে নতুন লেখা কবিতা পড়তেন তিনি। সবাই শুনতেন মুগ্ধ হয়ে। কবিতা ও কবিকে বোঝার বালাই তখন আমাদের ছিল না আগেই জানিয়েছি। না বুঝলে যা ঘটে, আমরা কিছুতেই স্থির হয়ে শুনতে পারতুম না, চঞ্চলতা ফুটে উঠত আমাদের ব্যবহারে। ফলে বড়দিদি ঘর থেকে আমাদের বিদায়ের ব্যবস্থা করতেন।

মাঝে মাঝে গান হত। গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ। সুকণ্ঠ ছিলেন তিনি। তাঁর মুখে মীরার ভজন শুনতে আমার মা ভালবাসতেন। গানের আসর খুব জমত। গোমতী নদীতে নৌকো ভ্রমণের সময় চাঁদের আলোয় তাঁর গান উপভোগের জিনিস ছিল। সেটা আমরাও বুঝতুম। চাঁদিনী রাত ছাড়া নদীতে যাওয়া হত না।

---

(১) মূল চিঠিখানি লেখিকার হাতে আছে।

তাস খেলাতে তাঁর সখ ছিল। তাসের আড্ডাও মাঝে মাঝে বসেছে মনে পড়ে।

হাসিগল্পও তাঁকে নিয়ে বেশ জমাট বাঁধত দেখেছি। বড় ভগ্নীপতি রসিক মানুষ। কাজেই গল্প জমে ওঠার সুবিধে ছিল। প্রত্যেককে এক একটি নতুন নাম দেওয়া ছিল সে-সব গল্পের অঙ্গ। হাসি-তামাশায় সময় কেটে যেত হাল্‌কা ভাবে। এর স্বাদ আমরাও পেয়েছি।

সত্যেন্দ্রনাথ কবি নন কেবল, পাণ্ডিত্য তাঁর প্রগাঢ় ছিল। নানা ভাষা এবং ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি বহু বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণের কথা কবির অনুরাগীরা জানেন। তিনি যে জ্যোতিষ চর্চ্চা করেছিলেন এ খবর বেশী লোক পান নি। এ বিষয়ে অনেক বই তাঁর পড়া ছিল। বহু রাশি-চক্র সংগ্রহ করেছিলেন, কয়েকটি "কোষ্ঠী" বিচারও করেছেন দেখেছি। যাক, সেই প্রবাসে কখনো কখনো 'কোষ্ঠী' আলোচনাও হয়েছে। এই বিষয়টিতে কৌতূহল অল্পবিস্তর সকলেরই ছিল, কাজে কাজেই সময় কাটাবার উপায় এটা নয়, সময় তখন পাখা মেলে উড়ে যেত।

যাঁরা নেহাত কাছের লোক, যেমন তাঁর মা, মাসী, মামা, এঁরা ছিলেন সেকালের মানুষ। একালের খবর তাঁরা রাখতেন না, কিম্বা এ ধরণের সংবাদ তাঁদের গোচরে এলে অনুমোদন করতেন কি না সেটা গবেষণার বিষয়। যা হোক, সেকালপন্থী বাড়ী বলে এক জায়গায় একটানা ষোল বছর বাস করেও নিজের মামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নি। বিদেশে যাওয়া-আসার সময় বা বিজয়া দশমীর দিন কেবল প্রণাম করতে কাছে এসেছেন। বয়সের পার্থক্য কম থাকায় মা মাসীর এই ব্যবস্থা তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। একমাত্র সন্তান বলে মায়ের সমস্ত ভালবাসা তাঁকে ঘিরে বেড়ে উঠেছিল। জৌনপুর যাবার সময় তাঁর বিচ্ছেদকাতরা মা ভাজের হাত ধরে বলেন, "ওকে দেখাশুনো করো, ওর সঙ্গে কথা বলো।" তারপর বিদেশে মেয়েরা ঠাট্টা ও অন্যান্য উপায়ে দুজনের বাক্যালাপ করিয়ে তবে ছাড়েন। সেই থেকে মৃত্যুর কিছু আগে পর্য্যন্ত মামীর সঙ্গে তাঁর আলাপ চলেছিল।

প্রতি পুজোয় তাঁর কাছ থেকে আমরা নতুন কাপড় পেয়েছি—বেশ সৌখীন রুচিসম্মত। শেষ কালে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন, তখন দু-এক ক্ষেপ খদ্দর মিলেছে। সে সময় তাঁর বাড়ীতে মস্ত বড় বড় দুটি চরকার আবির্ভাব হয়েছিল, একটিতে নিজে সুতো কাটতেন, অপরটি দিয়েছিলেন তাঁর মাকে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, কাজে দেখিয়েছিলেন।

কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভক্তির ফুলে পুজো করতেন এ কথা সবাই জানেন। বহু কবিতায় নানা রূপে নানা ভাবে তাঁর অর্চ্চনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি-আঁকা গোল আকারের 'সেফটিপিন' যখন বাজারে দেখা দেয় তখন তাঁর কাছ থেকে আমরা তা পেয়েছিলুম। রাত নয়টায় বেড়িয়ে ফেরার সময় আমাদের তিন বোনকে তিনটি দিয়ে গিয়েছিলেন।

যখনই তাঁর বাড়ী গিয়েছি—দুপুরের দিকেই বেশী যেতুম—দেখেছি তাঁর লাইব্রেরী ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি কখনও আমাদের ভয় দেখান নি। কাজেই নির্ভয়ে তাঁর দোরে ঘা মারতুম। খিল খোলা মাত্র ঘরে ঢুকতে দেরি করতুম না। বড় লম্বা ঘর, পর পর তিনটে দরজা; আলমারীতে বইয়ের রাশি, সামুদ্রিক জিনিসে ভরা কাঁচের বাক্স, একটি অর্গ্যান, কৌচ, লেখবার টেবিলের পাশে ঘোরানো শেল্‌ফ। এই টেবিলের টানায় থাকত বৈকালিক চা খাওয়ার বিস্কুট আর লজেঞ্জের শিশি ও চকোলেটের বাক্স। আগের দুটির ওপর আমার লোভ যথেষ্ট ছিল। চারদিক ঘুরে, হাত পা দিয়ে বাজনাটা স্পর্শ করে "মধুরেণ সমাপয়েৎ"—বিস্কুট লজেঞ্জ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করতুম। কখনও কখনও লোকও দেখেছি। মাঝের দরজায় ধূমপান-রত ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে বসে থাকতে দেখতুম। শুনেছি সত্যেন্দ্রনাথের বিরাগের ভয়ে মণিবাবু দূরে বসে সিগারেট সেবা করতেন।

পরের ওপর নির্ভর করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পরা কাপড় খোয়া এমন কি জুতো সাফ করা ব্যাপারেও চাকরদের ভরসায় সব সময় থাকতেন না। বিকেলে নিজের শোবার ঘরে বসে ইলেকট্রিকে 'কোকো' তৈরি করে খেতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। অসুখ হলে নীরবে সহ্য করেছেন রোগযন্ত্রণা।

সৌখীন মানুষ ছিলেন তিনি। কোঁচানো ধুতি উড়ুনি ব্যবহার করতেন। দামী দামী শালও তাঁর ছিল দেখেছি। জীবনের শেষভাগে জাপানীদের পোষাকের অনুকরণে 'কিমোনো' তৈরি করিয়েছিলেন। 'কিমোনো' পরা ছবি তাঁর আছে। গাছ ছবি বই সামুদ্রিক দ্রব্যে তাঁর বাড়ী সুন্দর ভাবে সাজানো ছিল। ঐ বাড়ী দেখে আমাদের মনে সৌন্দর্য্যবোধ জন্মেছে। পেন্‌সিল দিয়ে ছবি আঁকাও তাঁর আসত। কত সময় তাঁর হাতে খাতা

পেন্‌সিল দিয়েছি, মানুষ, হরিণ, ফুল ইত্যাদিতে খাতার পাতা ভরে উঠেছে।

তাঁর নিজের ভাই বোন ছিল না। আমাদের দিয়েই তাঁর সে সাধ মেটাতে হয়েছে। আমাদের এক বোনের অকালে মৃত্যু হয়। তাতে তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। সেই দুঃখ কবিতায় রূপ নেয়—'ছায়াচ্ছন্না', 'সৎকারান্তে' ও 'ছিন্নমুকুল' নামে। 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থে কবিতাগুলি বাঁধা পড়েছে। 'সম্প্রদান', 'উপদেশ' ও 'বিদায় ক্ষণে' (কালিদাসের অনুবাদ) এ তিনটি কবিতা আমার বড়দিদির বিয়ের সময় বিয়ের পদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পরে 'মণি-মঞ্জুষা'য় ছাপা হয়েছিল।

বাবার সংসার অনেক দিন তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই বাড়ীর প্রথম শিশু আমার বড়দিদি[১] সকলের আদরের হন স্বাভাবিক নিয়মে, শিশুকাল থেকে অপর্য্যাপ্ত সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ তিনি পেয়েছেন। দাদার কাছে তাই তাঁর আবদারের অন্ত ছিল না। তাঁর স্বামীও[২] সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রীতিভাজন ছিলেন। ইনি জৌনপুরে চিনির কলে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে কবিতায় একখানা (তাঁর জৌনপুর ভ্রমণের পর) চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর সৌজন্যে সেটি এখানে তুলে দিয়ে উপসংহার করছি কবির কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন হিসেবে।

প্রিয়বরেষু—

নবীবাবু!
নবাবী-নগরীতে
চাকুরীতে
হ'য়ে পাকা,—
কেমনে কাটে দিবা?
গদি' কিবা
শুধু টাকা!
সেথা কি 'বাবু' বুলি
বলে ভুলি'
কোনো কুলি?
দোকানী মূঢ় মতি
টাঙা-রথী(১)
খেয়ে গুলি?
অমৃতী তাজা তাজা
কড়া ভাজা
ঘিয়ে ছাঁকা,—
মেলে কি?—লিখো মোরে
সে সহরে
ঝাঁকা ঝাঁকা।
বনেছে যে চেহারা
তে-তেহারা(২)
দিনে দিনে
হোসেনী(৩) বিনে, মিতা,
হ'ল কি তা
রোগা ছিনে!
সেথা কি হাঁকে জুড়ি
ঘাড়ে-ভুঁড়ি
কুপো ধাঁচা(৪)?
চামেলি থরে থরে
পথ 'পরে
তাজা কাঁচা!
শুধু কি বলদ,…হে,…
চিনি বহে
আঁখি ঢাকা?
লিখো হে লিখো, কবে
সুরু হবে
চিনি চাখা(৫)। ইতি
ভবদীয়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
কলিকাতা। ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৮

১ শ্রীমতী অমিয়া দত্ত ২ শ্রীযুত নবীলাল দত্ত

(১) টাঙাওয়ালা (২) তিনগুণ তেহারা, তুলনীয়—দোহারা (৩) বাবুর্চির নাম (৪) অনেক ডাক্তার, (৫) এ কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'একদা তুমি প্রিয়ে…' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গানটির ব্যঙ্গানুকরণ।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীনলিনী দেবী

প্রথম আলোর সাথে, পদপ্রান্তে এনে রাখিলাম,
আমার পূজার থালা, হে দেবতা, লহ এ প্রণাম
পরিপূর্ণ হৃদয়ের। জীবনের দুঃখ সুখ মিলা
আনন্দ বেদন ফুলে, দিনে দিনে গাঁথিনু যে মালা
পরাইনু কণ্ঠে তব। পরাইনু চন্দনতিলক,
প্রদীপ্ত সুন্দর ভালে; চিত্তে জাগে পরম পুলক।
জ্যোতি-বিভাসিত তব শুচিস্মিত সুন্দর আনন,
আত্মহারা সেথা মোর অশ্রুসিক্ত বিমুগ্ধ নয়ন,
প্রাণের প্রদীপ জ্বালি' করিলাম আরতি তোমার—
হে দেবতা, শান্ত হাস্যে পূজা লও চির সেবিকার।

সুদূর-দক্ষিণ ভারতের অম্বষ্ঠ জাতি

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি

ভারতীয় আর্য্যগণের সুপ্রাচীন সাহিত্যে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত প্রভেদ বুঝাইতে বর্ণশব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মূলতঃ এই শব্দটি আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় লোকদিগের গাত্রবর্ণভেদের দ্যোতক ছিল। কালক্রমে ভারতীয় সমাজের চারিটি স্তর বুঝাইতে বর্ণ শব্দের এবং বর্ণান্তর্গত বিভিন্ন সামাজিক অঙ্গ বুঝাইতে জাতি শব্দের ব্যবহার সুপ্রচলিত হয়। জাতি শব্দটির মৌলিক অর্থ জন্ম; কিন্তু প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ জন্মগত পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরবর্ত্তী অনেক আর্য্যেতর জাতি (tribe) ক্রমে ক্রমে অল্পাধিক পরিমাণে আর্য্যদিগের সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া এবং রক্তসংমিশ্রণ লাভ করিয়া আর্য্য সমাজের অঙ্গীভূত হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু এইগুলির নিজস্ব নাম এবং অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জিত হয় নাই। ফলে ইহাদের দ্বারা ভারতীয় আর্য্য সমাজের অঙ্গে নানা প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হইতেছিল। এই সকল সামাজিক প্রত্যঙ্গের নামাদি বহু বৈশিষ্ট্য জন্মগত। সম্ভবতঃ এই কারণেই পরে জন্মগত সামাজিক প্রভেদ বুঝাইতে জাতিশব্দের ব্যবহার সুপ্রচলিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে tribe হইতে কিরূপে casteএর (অর্থাৎ tribal casteএর) উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা রিজলি প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসেও এই একই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ যে কিরূপে আর্য্য-অনার্য্য, সভ্য-অসভ্য সমুদয় ভারতীয় জাতি (tribe) এবং সম্প্রদায়কে (class) একটি বাচনিক চতুর্ব্বর্ণের কাঠামোতে পুরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। একটি tribeএর তৎকালীন সামাজিক মর্য্যাদা ও বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা উহাকে চারিবর্ণের অন্তর্গত যে-কোন দুইটির সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; কারণ উহাকে চতুর্ব্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে যেরূপেই হউক দাঁড় করাইতেই হইবে। যাহা হউক, অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়ে প্রাচীন লেখকদিগের রচনায় কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা পার্থক্য লক্ষিত হয়। মহিষদেশবাসী মাহিষ্য নামক একটি জাতির সামাজিক স্থান নিরূপণ করিতে মনু মহারাজ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অন্যেরা সে ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। ভারতে আগত বিদেশীয় যবন (Greek) এবং শক (Scythian) জাতিকে পতঞ্জলি অনিরবসিত শূদ্র (অর্থাৎ, সৎ শূদ্র) বলিয়াছেন; কিন্তু মনুর মতে ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। অবশ্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সৎ শূদ্র ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সামাজিক মর্য্যাদা সমপর্য্যায়ের বলিয়াই মনে হইবে।

প্রাচীন ভারতে অম্বষ্ঠ নামে একটি পরাক্রান্ত জাতি ছিল। অম্বষ্ঠেরা মূলতঃ আর্য্য কি অনার্য্য (অর্থাৎ, আর্য্যেতর) ছিল, তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। ইহাদের জাতীয় সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে আর্য্যেতর মনে করা অসম্ভব নহে। তাহাদের 'আনব ক্ষত্রিয়' আখ্যাটিও সন্দেহজনক। কিন্তু যে সকল আর্য্যজাতি (tribe) নিজস্ব সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করে নাই, তাহাদের দ্বারাও যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অঙ্গে বহু প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আর্য্য জাতিগুলির উপর প্রাচীন ভারতের অনার্য্য জাতিসমূহের সামাজিক বৈশিষ্ট্য কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সহজে নির্ণীত হইবার নহে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে অম্বষ্ঠ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রীক বীর আলেকজান্দারের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অম্বষ্ঠগণ পঞ্জাব প্রদেশে চিনাব নদীতীরে বাস করিত। গ্রীক লেখকগণ ইহাদিগকে Abastanoi (কিংবা Sabarkae বা Sabargae) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে অম্বষ্ঠ দেশে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল এবং এই রাষ্ট্রের সৈন্যদলে ষাট হাজার পদাতিক, ছয় হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত রথ ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জনৈক অম্বষ্ঠ জাতীয় নরপতি এবং তদীয় পুরোহিত নারদের উল্লেখ আছে। মহাভারতে শিবি, ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় জাতিসমূহের সহিত অম্বষ্ঠ জাতির নাম পাওয়া যায়। পুরাণে ইহাদিগকে আনব (অর্থাৎ, যযাতিপুত্র অনুর বংশীয়) ক্ষত্রিয় এবং শিবিদিগের জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রেও কাশ্মীর, হূণদেশ ও সিন্ধুদেশের সহিত অম্বষ্ঠ জাতির নামোল্লেখ দেখা যায়। অম্বট্ঠসুত্ত নামক পালি গ্রন্থে জনৈক অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলা

হইয়াছে। আবার স্নাতকে উহাদিগকে কৃষকরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যা নারীর সংযোগের ফলে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং চিকিৎসকের ব্যবসায় উহাদের বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল কারণে অনুমান করা হইয়াছে যে, অম্বষ্ঠেরা মূলতঃ যুদ্ধজীবী ছিল; কিন্তু পরে পুরোহিত, কৃষক, চিকিৎসক প্রভৃতির বৃত্তি অবলম্বন করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোন জাতির তৎকালীন বৃত্তি ও সামাজিক মর্য্যাদার উপরেই প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের সেই জাতিবিষয়ক মতবাদ অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং মনুসংহিতার "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" কথাটি হইতে মনে হয় যে প্রাচীন অম্বষ্ঠ জাতির—অন্ততঃ পক্ষে উহার কোন শাখার—মধ্যে কোন সময়ে চিকিৎসকবৃত্তি কিঞ্চিৎ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনুর উল্লিখিত অম্বষ্ঠেরা যে পঞ্জাববাসী ছিল, তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভব নহে। কারণ প্রাচীন ভারতের অন্যত্রও অম্বষ্ঠের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা, গ্রীক ভৌগোলিক টলেমীর গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্ব-ভারতের মেকল দেশের, অর্থাৎ আধুনিক মৈকল পর্ব্বতাঞ্চলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অপর একটি প্রাচীন অম্বষ্ঠ উপনিবেশ ছিল। বিহারের বর্ত্তমান অম্বষ্ঠ কায়স্থগকে এই পূর্ব্ব-ভারতীয় অম্বষ্ঠ জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করা অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের বৈদ্যগণের কথাও আসিয়া পড়ে; কারণ বৈদ্যকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা নামক বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় এবং আরও কতিপয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে বাংলার বৈদ্যদিগকে প্রাচীন অম্বষ্ঠগণের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। আবার সূত সংহিতা নামক একখানি গ্রন্থের মতে মাহিষ্যেরাও অম্বষ্ঠ।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি যে, কায়স্থ এবং বৈদ্য ব্যবসায়মূলক জাতি (professional caste); অর্থাৎ, মূলে ইহারা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাত্র ছিল, পরে জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়েই ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বাঙালী বৈদ্যদিগের প্রাচীন অম্বষ্ঠ জাতির সহিত অভিন্নত্ববিষয়ক আধুনিক মতবাদ ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে (আনুমানিক ১৩শ শতাব্দী) বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ হইতে স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; এই অম্বষ্ঠেরা সম্ভবতঃ বিহারের অম্বষ্ঠ কায়স্থ। ইহা হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব কল্পনার অভাব সূচিত হয়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পুরাণের রচনাকাল পণ্ডিতেরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রত্নপ্রভা-রচয়িতা ভরত মল্লিক স্বীয় উক্তির সমর্থনে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করেন নাই দেখিয়া এই পুরাণের জাতিবিষয়ক অংশের রচনাকাল অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয়। আবার ভরত নিজে শঙ্খ, হারীত এবং বিষ্ণুর নাম করিয়া যে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলির প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চন্দ্রপ্রভার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা গ্রন্থে বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠত্ব-বিষয়ক কোন উক্তি দেখা যায় না। ভরত নিজেও এই সম্পর্কে দুর্জ্জয় দাস, সঞ্জয়, চিরঞ্জীব দাস এবং অম্বরজ খান (সঞ্জয়?) নামক পূর্ব্ববর্ত্তী কুলপঞ্জীকারদিগের সমর্থক উক্তি উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং বাঙালী বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বাচস্পতি মিশ্র, রঘুনন্দন এবং কুলপঞ্জীকারগণ বৈদ্যদিগকে শূদ্র বলিয়াছিলেন; ইহার বিরুদ্ধে স্বজাতির সামাজিক মর্য্যাদা-প্রয়াসী কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বৈদ্যকুলের উৎপত্তি বিষয়ে উপন্যাস রচনা করা অসম্ভব ছিল না। বৈদ্যগণের প্রধান বৃত্তি চিকিৎসা; মনুর উল্লিখিত অম্বষ্ঠগণও এই বৃত্তিসম্পন্ন। সুতরাং বৈদ্যাম্বষ্ঠ সমীকরণ সহজেই মনে আসিতে পারে। কিন্তু এই আধুনিক কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে করা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি অবান্তর কথা বলিতে চাই। বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ও বৈদ্য সমাজে কৌলীন্যের সৃষ্টির সহিত সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের সম্পর্কের কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। আমার বিবেচনায় এই কাহিনীটিও আধুনিক এবং সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক মূল্যবর্জ্জিত। এই কৌলীন্য প্রধানতঃ ঘটক এবং কুলপঞ্জীকারগণের সৃষ্ট, বল্লালের নহে। অন্ততঃ বৈদ্য সমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত রত্নপ্রভা ও সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। বৈদ্যদিগের কুলীনতা সম্বন্ধে ভরত বল্লালের নাম করেন নাই। তাঁহার মতে কৌলীন্যের সৃষ্টি হয় মুখ্যতঃ সদাচার হইতে। কিন্তু "ধন হইতেই কৌলীন্যের উদ্ভব" এইরূপ উক্তিকেও তিনি উড়াইয়া দেন নাই; তবে বলিয়াছেন যে ধনের সহিত সদাচারও থাকা চাই। এদিকে সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে "প্রাচীন মতে" সদাচার হইতেই কৌলীন্যের উৎপত্তি; "তবে আধুনিকেরা বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লালকে বৈদ্য সমাজে কৌলীন্যের ব্যবস্থাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।" যাহা হউক, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের অন্ত্যজ বৈদ্য জাতি অর্থাৎ "বেদে" জাতির সহিত বাঙালী বৈদ্যের সম্পর্ক কল্পনা করা অযৌক্তিক।

বিহারের অম্বষ্ঠগণ কায়স্থ সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, বাংলা দেশে উহারা বৈদ্য সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্যত্র অম্বষ্ঠগণ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিরূপ সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা সামাজিক ইতিহাসে অনুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। এ স্থলে আমরা তামিল ও মলয়ালম্ ভাষাভাষী অম্বষ্ঠদিগের সামাজিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

তামিল দেশের অম্বষ্ঠগণ প্রধানতঃ ক্ষৌরকার্য্য এবং শল্যচিকিৎসকের কার্য্য করিয়া থাকে। তামিল ভাষায় অম্বট্টন্ অর্থাৎ অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ ই নাপিত। তামিলভাষী অম্বষ্ঠেরা মনে করে সমীপার্থক সংস্কৃত "অম্ব" শব্দের সহিত "স্থা" ধাতুর যোগে অম্বষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ, যে ব্যক্তি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে; অর্থাৎ যাহাকে ক্ষৌরকার্য্য কিংবা চিকিৎসার জন্য লোকের সন্নিকটে অবস্থান করিতে হয়, সে-ই অম্বষ্ঠ। সমীপার্থে সংস্কৃত ভাষায় অম্ব শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু মলয়ালম্ ভাষাতে এক শ্রেণীর ক্ষৌরকারকে অদুত্তোন্ (অর্থাৎ, সমীপস্থ দণ্ডায়মান ব্যক্তি) বলা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সহিত পরে অম্বষ্ঠেরা নাপিত এবং বাদকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। তামিল দেশে অম্বষ্ঠ স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকে।

তামিল অম্বষ্ঠগণের সামাজিক জীবন আর্য্যাচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহাদের বিবাহ ব্যাপারে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করেন। অবশ্য দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া যাইবার সময় তাঁহাদিগকে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। অম্বষ্ঠকন্যারা শিশুকাল হইতে গান গাহিতে শেখে; কারণ বিবাহের চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠানের সময় বধূকে গান গাহিতে হয়। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় অম্বষ্ঠসমাজেও বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত। অম্বষ্ঠদিগের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। মৃত ব্যক্তির শব দাহ করা হয়; কিন্তু শিশুদের শব মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত গ্রামের অন্যান্য জাতির নিঃস্ব ব্যক্তিগণের শব অম্বষ্ঠেরা দাহ করে।

সালেম জেলার কোজ-বেল্লালদিগের বিবাহকার্য্যে অম্বষ্ঠেরা পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। এ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। উহা হইতে মনে হয়, কোজ-বেল্লালদিগের পৌরোহিত্য কার্য্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে অম্বষ্ঠের অধিকারে আসিয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণব ভেদে অম্বষ্ঠগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বৈষ্ণবেরা ব্রাহ্মণ গুরু কর্ত্তৃক শঙ্খচক্রে চিহ্নিত হয় এবং মাছ, মাংস বা মদ্য স্পর্শ করে না। শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহসম্পর্ক স্থাপনে কোনই বাধা নাই।

চিঙ্গ্লেপুত জেলায় অনেক অম্বষ্ঠের বাস। ইহারা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক-এক জন পেরিতনক্কারন্ বা মণ্ডল আছেন। সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি কার্য্যবশে স্থানান্তরবাসী হইলেও মণ্ডলের অধীনতা অস্বীকার করে না। বিভিন্ন মণ্ডলের অধীনে প্রায় সহস্র গৃহপতি আছেন। মণ্ডলের পদ বংশগত। সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারগুলির বিবাহসম্বন্ধ মণ্ডলের নায়কতায় স্থির হইয়া থাকে। বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে মণ্ডল বৃদ্ধ গৃহপতিদিগের দ্বারা গঠিত পঞ্চায়েতের সাহায্য গ্রহণ করেন। বয়সে বালক হইলেও মণ্ডলের সম্মান সর্ব্বাধিক। প্রত্যেক পরিবার হইতে বৎসরে ৵১০ চাঁদা তোলা হয়। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান হইতেও কিছু কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। এই অর্থ সত্ররক্ষা, মন্দিরসংস্কার প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়। চিঙ্গ্লেপুত জেলার তিরুপ্পোরুর এবং তিরুকলিকুন্দ্রম্ নামক স্থানদ্বয়ের অম্বষ্ঠসত্র সুপ্রসিদ্ধ। এখানে ব্রাহ্মণদিগকে বিনামূল্যে অন্নদান করা হয় এবং অন্য জাতীয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে খাদ্যদ্রব্যের সিধা দেওয়া হইয়া থাকে।

অম্বষ্ঠেরা পরৈয়ন্, মাল প্রভৃতি নিম্ন জাতির ক্ষৌরকার্য্য করে না। এই সকল জাতির নিজস্ব ধোপা ও নাপিত আছে। অন্ত্যজ জাতির ক্ষৌরকার্য্য করিলে অম্বষ্ঠেরা সমাজে পতিত হয়। অম্বষ্ঠ ক্ষৌরকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কামায়; কেহ বা কেশাদিমোচনেচ্ছু ব্যক্তিগণের অপেক্ষায় নদীতীরে বসিয়া থাকে। আবার অনেকে নিজ গৃহের পশ্চাদ্ভাগে একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেই স্থানেই সমাগত ব্যক্তিগণের ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের ক্ষৌরকারের ন্যায় তামিলদেশের অম্বষ্ঠ নাপিতেরাও গ্রামের সংবাদপত্র বিশেষ। গ্রামের আধুনিকতম ঘটনা পর্য্যন্ত তাহাদের নখদর্পণে থাকে। গালগল্পে

তাহাদের জুড়ী নাই। কিন্তু তাহাদের ঔষধের বড়িগুলির উপাদান তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। ক্ষুরই তাহাদের শল্য চিকিৎসার অস্ত্র। কাজের পারিশ্রমিক-স্বরূপ ধোপা, কামার, ছুতার, গণক, পুরোহিত, নটী প্রভৃতির ন্যায় গ্রাম্য নাপিতেরও খানিকটা জমি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই জমি সে পুরুষানুক্রমে ভোগ করে। ইহা ব্যতীত সে যে-সকল পরিবারের ক্ষৌরকার্য্য করে, তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু ধান্য পাইয়া থাকে।

চিকিৎসাবৃত্তির জন্য অম্বষ্ঠেরা বৈদ্য নামেও পরিচিত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে সাধারণতঃ বলা হয় মাশিবন্ অর্থাৎ অপয়া। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাহারা ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিতে পায় না। প্রণম্যদিগকে তাহাদের সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে হয়। রাজগণের নিদ্রা না ভাঙাইয়া ঘুমন্ত অবস্থায় ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন ইত্যাদি অভিজ্ঞ ক্ষৌরকারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প অম্বষ্ঠসমাজে প্রচলিত আছে। তামিল ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—"নাপিত চাই বুড়া, ধোপা চাই ছোঁড়া।"

ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণভাগেও নাপিতেরা অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত। এখানেও অম্বষ্ঠ স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্য করে। পৌরোহিত্য কার্য্যের জন্য ত্রিবাঙ্কুরের অম্বষ্ঠগণ প্রাণোপকারী (অর্থাৎ আত্মার মঙ্গলকারী) নামেও অভিহিত হয়। এ দেশের অনেকস্থলে নাপিতদিগের পনিক্কর্, বৈদ্যন্ প্রভৃতি রাজদত্ত উপাধি দেখা যায়। মলয়ালী ক্ষৌরকারগণের আচার-ব্যবহার অনেকটা নায়রদিগের মত; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তামিল অম্বষ্ঠগণের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। ত্রিবাঙ্কুরের অম্বষ্ঠদিগের বিবাহে বৈদিকাচার প্রতিপালিত হয় না; ব্রাহ্মণেও পৌরোহিত্য করে না। মামাত-পিসতুত ভাই-বোনে বিবাহ সর্ব্বাধিক প্রচলিত। এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের নাপিতেরাই ষোল দিন অশৌচ পালন করে। কিন্তু তামিল দেশ হইতে আসিয়া যাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহারা মাত্র এগার দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকে।

দক্ষিণ-ভারতে ক্ষৌরক, বিল্লব, পুল্লুবন্ প্রভৃতি জাতি বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক রূপে পরিচয় দেয়। এমন কি পরৈয়ন্ জাতির একটি শাখাও আদমসুমারীতে বৈদ্য নাম লিখাইয়াছে। আবার যে-কোন সম্প্রদায়ের গ্রাম্য চিকিৎসকই বৈদ্য নামে পরিচিত।

যাহা হউক, বিহারের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ এবং ভরত মল্লিকাদির মত গৃহীত হইলে বাংলার অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ তামিল ও মলয়ালী দেশের অম্বষ্ঠ নাপিতদিগের সহিত জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আধুনিক সম্প্রদায়গত অন্নগ্রহণ ও বিবাহাদির নিষেধমূলক গোঁড়ামির অনেক স্থলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

যৌবন ও মৃত্যু

শ্রীকরুণাময় বসু

মদির যৌবন-স্বপ্ন মিলায়েনি মোর দুটি তন্দ্রালীন আঁখিপক্ষ্ম হতে,
একটি মুহূর্ত্ত তুমি ক'রো ক্ষমা আজি মুগ্ধ বসন্তের উৎসব-আলোতে
এই জ্যোৎস্না-রাত্রি-বৃন্তে প্রস্ফুটিত ঊর্দ্ধমুখী পরাণের মধুর মিনতি,
মিলন-চুম্বন-স্বপ্নে ঘুমভাঙা লজ্জাভীরু পাপড়ির করিও না ক্ষতি।
সহস্র মুদ্রিত দলে কাঁদিতেছে এ বিশ্বের অসার্থক সহস্র বাসনা,
বসন্ত ফুরায়ে গেলে আমিও ফুরায়ে যাব, তার আগে মৃত্যু আসিও না।
আজিও দুয়ারে মোর কাঁদে বসি চৈত্র-সন্ধ্যা, শরতের পান্থ-সমীরণ,
একটি নক্ষত্র কহে, পাত্র ভরি আনিয়াছি সুদূরের সোহাগ-চুম্বন।

চেয়ে দেখি কথা কয় বনপ্রান্তে লীলামত্ত ফাল্গুনের উদ্ভ্রান্ত রজনী,
গোপন মর্ম্মের গেহে আজ এ কি দ্বার-ভাঙা বারম্বার আগাবার ধ্বনি!
সুন্দর জীবনগুলি জন্ম হতে জন্মবৃন্তে প্রস্ফুটিছে যুগে যুগান্তরে,
প্রাণের সুগন্ধখানি কাহার উদ্দেশে বন্ধু কাঁদিতেছে আত্মার অন্তরে;
মুদিত মর্ম্মের ব্যথা প্রকাশের খোঁজে পথ অকথিত সেই রুদ্ধ বাণী
যখন লভিবে ভাষা পূর্ণতার শেষ তীরে, ওগো মৃত্যু করো কানাকানি।

মধুসূদন ও ফরাসী সাহিত্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে মধুসূদনের মত বহু ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না। তিনি ভার্সাই হইতে ২৬শে জানুয়ারী ১৮৬৫ সালে বন্ধুবর গৌরদাস বসাককে যে পত্র লিখেন তাহাতে স্বচ্ছন্দচ্ছন্দে বলিয়াছিলেন—

I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones.

মাদ্রাজে অবস্থানকালে মধুসূদন প্রত্যহ ছাত্রের মত অভিনিবেশ সহকারে হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, লাটিন ও ইংরেজী অধ্যয়ন করিতেন। গ্রীক ও লাটিন ছাড়া ইংরেজী, ফরাসী, ইতালিয়ান ও জার্মান ভাষা তিনি বিশেষ রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভার্সাই হইতে ৩রা নবেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

I have nearly mastered French and Italian and am going on with German, all without any assistance from hired teachers.

"মধুসূদন ১৮৬২ সালে বিলাত যাত্রা করেন ও জুলাই মাসের শেষভাগে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিক্ষার জন্য Gray's inn-এ প্রবেশ করিয়াছিলেন।" কিন্তু অর্থকষ্টে পড়িয়া তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে গিয়াছিলেন; সেখানে ভাষাশিক্ষার সুবিধাও ছিল ও তাঁহার পত্নীর স্বাস্থ্য ফ্রান্সেই ভাল থাকিত; ইহাও তাঁহার ফ্রান্সবাসের কারণ। অর্থাভাবে তাঁহাকে হয়ত জেলেও যাইতে হইত; কিন্তু একজন ফরাসী মহিলার করুণায় তিনি বাঁচিয়া যান ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে এই দুঃখের দিনে অশেষ সাহায্য করেন। এই দুঃখের দিনেই তিনি ফরাসী ভাষা শিখিতেছিলেন। ৯ই জুন ১৮৬৪ সালে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন—

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better.

মধুসূদন ফরাসীদেশকে সত্যই ভালবাসিতেন নানা কারণে। ঋণের দায়ে তাঁহাকে জেলে যাইতে হইত; সহৃদয়া এক ফরাসী মহিলা তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন।

১৮৬৪ সালের ২৬শে অক্টোবরে লিখিত পত্রে বন্ধু গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a place to live in as this country and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutt's health ....Besides, here, I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going...to add German....This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinner for a few franks than the Rajah of Burdwan dreams of .... Such music, such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী of our ancestral creed....Eeveryone whether high or low, will treat you as a man and not a "d-d" nigger.

ঐ পত্রেই তিনি একটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন: তাহাতে বুঝি মধুসূদন ফ্রান্সের জীবনের সহিত পরিচিত হইতেছিলেন—

I have had the honour of bowing to, and being bowed to beg, the famous Emperor (Napoleon III) and Empress of the French and you will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vive l'Empereur, Vive l'Emperatrice."

মধুসূদন ফরাসী লিখিতেন; ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া অবসর বিনোদন করিতেন। মধুসূদন যে সময় ফ্রান্সে অবস্থান করেন সেই সময় দান্তের মৃত্যুর ত্রিশতবার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ইউরোপীয় অনেক কবি তদুপলক্ষে কবিতা-উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনও এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়া তাহা ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক ইতালীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল তাহা পাঠ করিয়া প্রীতিপ্রকাশ পূর্ব্বক মধুসূদনকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন—আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে। ইহা ব্যতীত মধুসূদন ফরাসী কবি ভিক্টর হুগোকে একটি সনেট লিখিয়া সম্মান দেখাইয়াছিলেন। আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় এই দুই মহাকবি পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা করিয়া কি কি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই। ঐ সনেটটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে।
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল-বকুলে —
বসন্ত অমৃত পান করি তব ফুলে
অলিরূপ মন মোর মত্ত গো সে রসে।
হে ভিকতর, জয়ী তুমি এই মর-কূলে
আসে যবে যম, তুমি হাস হে সাহসে।

অক্ষয় বৃক্ষের রূপে নাম তব রবে।
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে,
(ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে, গ'লে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে।

মধুসূদন ফরাসী সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন; ফরাসীতে কবিতা লিখিয়াছিলেন যদিও কি কি বই তিনি পড়িয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। বন্ধুবর গৌরদাসকে লিখিত শেষোদ্ধৃত ইংরেজী পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again.

ইতালিয়ান ও ফরাসী ভাষার কয়েকটি কবিতা তিনি বাংলা ভাষায় নিজের মত করিয়া লিখিয়াছিলেন। সে-গুলি সংখ্যায় অতি অল্প ও মধুসূদনের গৌরব তাহাদের দ্বারা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন্ কোন্ ফরাসী কবিতার অনুকরণ তিনি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনীলেখক বলিতে পারেন নাই। ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন "নীতিমূলক কবিতাগুলি Æsops Fables-এর আদর্শে, বাংলা কথামালার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল।" কিন্তু বসু মহাশয় মধুসূদনের উপরে লিখিত পত্রাংশের কথা মনে রাখিলে বলিতে পারিতেন যে হিতোপদেশগুলি ফরাসী হিতোপদেশ লেখক La Fontaine-এর Fables-এর অনুকরণে লিখিত। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি স্থানে স্থানে উভয়ের কবিতার আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য আছে—ভাবার মিলও দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন ঠিক অনুবাদ করেন নাই; লা ফন্ত্যান যেমন ঈশপের গল্পগুলি নিজের মনের মত করিয়া লিখিয়াছেন মধুসূদনও লা ফন্ত্যানের গল্পগুলি মনের মত গুছাইয়া লিখিয়াছেন। তবে প্রশ্ন হইতে পারে কেমন করিয়া বুঝিলাম যে মধুসূদনের কবিতাগুলি ফরাসীর অনুকরণে লিখিত। উত্তরে বলিব প্রথম কারণ হইতেছে মধুসূদনের স্বীকারোক্তি; দ্বিতীয়তঃ, লা ফন্ত্যানের কবিতা ও তাঁহার কবিতার স্থানে স্থানে হুবহু সাদৃশ্য। আমরা উভয় কবির কবিতা পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। প্রথম কবিতার ফরাসী নাম Le chêne et le roseau (ওক ও শরগাছ); মধুসূদন ইহার নাম দিয়াছেন 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'। ফরাসী কবিতাটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল :—

'ওকগাছ একদিন শরগাছকে বললে—বিধাতাকে দোষবার কারণ তোমার যথেষ্ট আছে। ছোট একটি পাখী তোমার কাছে কতই না ভারি। মৃদু বাতাস যা জলের বুকে শিহরণ মাত্র আনে তোমার মাথা সে দেয় নুইয়ে। আমি ককেসাসের মত উঁচু, শুধু সূর্য্যের আলোকে প্রতিরোধ করি না, ঝড়ের সঙ্গে করি লড়াই। সবই তোমার কাছে ঝড়; আর আমার কাছে মৃদুতম বাতাস। যদি তুমি জন্মাতে আমার বিশাল ছায়ার তলে যা আমি চারিদিকে বিছিয়ে দিয়েছি তোমার কষ্ট তা হ'লে এত বেশী হত না। ঝড়ের হাত হতে তোমায় বাঁচাতুম আমি। তুমি জন্মেছ উন্মুক্ত জলাভূমির ধারে যেখানে বাতাস ছোটে অপ্রতিহত বেগে। প্রকৃতি তোমার উপর যথেষ্ট কার্পণ্য দেখিয়েছেন। শরগাছ বললে—তোমার করুণা তোমার উচ্চপ্রকৃতিরই যোগ্য। কিন্তু অনুকম্পা আর দেখিও না। ঝড় আমার চেয়ে তোমার পক্ষেই বিপদের কারণ। আমি পড়ি নুয়ে, ভাঙি না। ভীষণ ঝড়ের বেগকে এ পর্য্যন্ত তুমি অবহেলায় প্রতিরোধ করেছ—তবে শেষ পর্য্যন্ত দেখ কি হয়। সে যখন এই কথা বললে দিগন্ত হতে ছুটে এল মত্ত শিশুর দল যা উত্তরের বাতাস নিয়ে আসে তার বাহিনীর সঙ্গে। ওক রইল খাড়া হয়ে আর শরগাছ পড়ল নুয়ে। ঝড়ের বেগ উঠল প্রচণ্ড হয়ে আর ওক গাছটি হ'ল সমূলে উৎপাটিত যার মাথা ছিল আকাশস্পর্শী আর পা ছিল মৃত্যুর রাজ্য পর্য্যন্ত সুদূরবিস্তৃত।'

মধুসূদনের রসাল ও স্বর্ণলতিকা অনেকেই পড়িয়াছেন। তবুও ঐ কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে
মলয় বহিলে হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর ভরে তুমি পড় লো হেলিয়া।
বন-বৃক্ষ কুলস্বামী
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।

এই অংশটুকু হুবহু লা ফন্ত্যানের অনুকরণে লিখিত। কিন্তু পরের অংশ হইতে মধুসূদন আপনার কল্পনায় আপনি লিখিয়াছেন :—

কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন
আমি কি লো ডরাই কখন্?
দূরে রাখি গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে,

বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন !
আমার প্রসাদে ভুঞ্জে পথগামী জন।

দ্বিতীয় কবিতাটির নাম Le cog et la perle ; মধুসূদনের দেওয়া নাম "কুক্কুট ও মণি" ফরাসীর হুবহু অনুবাদ। মধুসূদন এই কবিতাটির মূল দুইটি অংশের মধ্যে প্রথমটির এক প্রকার অনুবাদই করিয়াছেন আর দ্বিতীয় অংশের ভাবাংশ দিয়াছেন। ফরাসী কবিতাটির অনুবাদ এইরূপ :—

'একদিন মাটি খুঁটতে খুঁটতে এক মোরগ পেল একটি মণি। জহরৎওলাকে সেটি দিয়ে বললে যে—এটি দেখতে ভারি সুন্দর। কিন্তু তুচ্ছতম শস্যকণাই হত আমার কাছে বেশী দামী।

এক মূর্খ উত্তরাধিকারী-সূত্রে পেয়েছিল একখানি পুঁথি। সেটি প্রতিবেশী বইওলার কাছে নিয়ে গিয়ে বললে যে—আমার বিশ্বাস জিনিসটি ভাল। কিন্তু আমার কাছে একটা টাকার দামই বেশী।'

মধুসূদনের 'কুক্কুট ও মণি' উদ্ধৃত করিতেছি :—

খুঁটিতে খুঁটিতে খুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন,—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে এ বস্তু কেমন ?"
বণিক কহিল ; "ভাই
এ হেন অমূল্য রত্ন বুঝি দুটি নাই।"
হাসিল কুক্কুট, শুনি—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি, কি আছে তুলনা ?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা
জ্ঞানশূন্য করিল গোঁসাই !"
এই কয়ে বণিক ফিরিল।
মূর্খ যে বিদ্যার মূল্য কভু সে কি জানে ?
নরকুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভানে।

মধুসূদনের 'কাক ও শৃগালী' লা ফন্‌ত্যানের Le Corbeau et le Renard নামক কবিতার অনুকরণ। কাক ও শৃগালীর কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিল বৃক্ষোপরি,
কাক হৃষ্টমনে ;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
শৃগালী আইল ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে ;—
অপরূপ রূপ তব মরি।

ফরাসী কবিতাটির অর্থ—কাক ও শৃগাল। উহার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

এক টুকরা পনির মুখে নিয়ে কাক বসল গিয়ে গাছের ডালে। শৃগাল তার গন্ধ পেয়ে তাকে এই কথাগুলি বললে :—নমস্কার কাকমশাই, কি সুন্দর তুমি! আমার চোখে তোমার কি অপরূপই না দেখাচ্ছে ?

মধুসূদনের 'পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু' নামক কবিতাটির ভাব লা ফন্‌ত্যানের Le Lion malade et le Renard পীড়িত সিংহ ও শৃগালের ভাবের সহিত মিলিয়া যায় অন্য সাদৃশ্য নাই। কিন্তু মধুসূদনের 'ময়ূর ও গৌরী' লা ফন্‌ত্যানের Le Paon se plaignant a Junon (জুনোর নিকট ময়ূরের নিবেদন) নামক কবিতার হুবহু অনুকরণ। ফরাসী কবিতাটির কয়েকটি ছত্রের অনুবাদ দিলাম :—

ময়ূর জুনোর কাছে গিয়ে দুঃখ নিবেদন করলে—"অকারণে তোমার কাছে দুঃখ জানাই না, মা! আমার কেকাধ্বনি জগতে কারুরই কানে ভাল লাগে না। আর ছোট্ট নাইটিংগেল তার তীব্র মধুর কণ্ঠ নিয়ে একাই হয়েছে বসন্তের গৌরব।"

এইবার 'ময়ূর ও গৌরী' কবিতার কয়েকটি ছত্র তুলিয়া দিতেছি :—

তবু, মাগো, আমি দুঃখী অতি !
করি যদি কেকাধ্বনি
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর ভূচর, জন্তু ;—মরি, মা, শরমে !
ঢালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে !
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে
বরেণ বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গলধ্বনি করে।

আমরা দেখিতেছি যে মধুসূদন অনুবাদ তো করেন নাই উপরন্তু অদলবদল করিয়া আপনার খেয়ালে লিখিয়াছেন ; স্থানে স্থানে অবশ্য ফরাসীর সহিত খুব বেশী মিল আছে। এইবার লা ফন্‌ত্যানের Le Lion et le Moucheron (সিংহ ও মশক) নামক কবিতাটির অনুবাদ দিলাম ; মধুসূদন ঐ কবিতার ভাবাবলম্বনে যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহার নাম 'সিংহ ও মশক'।

"সিংহ একদিন বললে একটি মশাকে—'দূর হ তুচ্ছ কীট। জগতের আবর্জনা তুই।' মশা করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা আর বললে—'তোর পশুরাজ উপাধিকে কি করি আমি ডর ? একটা ষাঁড়ও যে তোর চেয়ে বড় ; আর তাকে খুশীমাফিক আমি চালাই।' এই বলেই সে আক্রমণ সুরু করলে—আপনিই হ'ল যোদ্ধা ও দামামাবাদক।

সে প্রথমে গেল একটু দূরে; তার পর সময় বুঝে সিংহের ঘাড়ের উপর ছুটে গেল। সিংহ তো রাগে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তার মুখ দিয়ে বেরল ফেণা, চোখ উঠল জল্ জল্ করে; সে গর্জ্জন করে উঠল। সকলে কেঁপে নিরাপদ স্থানে পালাল—আর এই বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের কারণ একটি মশা। কখন পিঠে কখন নাকে কামড় দিয়ে, কখনও বা নাকের গর্ত্তে ঢুকে সে সিংহকে হায়রান করে তুলছিল। তার রাগ তখন উঠল চরমে। সিংহ নিজের নখদন্ত দিয়ে নিজেকে আঘাত করতে লাগল, রাগে উন্মত্ত হ'ল তার চেষ্টা—তাই দেখে অদৃশ্য-প্রায় শত্রু লাগল গর্ব্ব করতে আর হাসতে। বেচারী সিংহ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করলে; নিজের দেহে লেজ আছড়াতে লাগল—সবই হ'ল নিরর্থক। লম্ফঝম্প করে সে মাটিতে পড়ল লুটিয়ে ক্লান্ত হয়ে। মশা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে গেল জয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে। দামামা বাজিয়ে সে আক্রমণ সুরু করেছিল—বিজয়োল্লাসও দিকে দিকে ঘোষণা করলে দামামা বাজিয়ে। কিন্তু ফেরবার সময় সে পড়ল গিয়ে এক মাকড়সার জালে—সেইখানেই হ'ল তার মৃত্যু।

এ গল্প হতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করলাম? দুটি শিক্ষা হ'ল; প্রথম, আমাদের শত্রুরা হয় প্রায়ই ছোট; দ্বিতীয়, বড় বিপদ যার কিছুই করতে পারে না তুচ্ছ ব্যাপারেই হয় তার মৃত্যু।"

মধুসূদন এই কবিতাটির এক নূতন রূপ দিয়াছেন; তাঁহার কবিতাটিকে সম্পূর্ণ নূতন বলিলে চলে।

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল
ভবতলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
অধীর ব্যথায় হরি
উচ্চ পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা,"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন?
গুপ্ত ভাবে কি জন্য লড়াই
সম্মুখ-সমর কর্, তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প চূর,
লক্ষ্মণের মুখে কালি,
ইন্দ্রজিতে জয় ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি!"
কহে মশা—"শুন মহাপাপী
যদি বল থাকে বিষম-প্রতাপী,
অন্যায় ন্যায় ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায় খাবে,
ধিক দুষ্ট মতি।
মারি তোরে বনজীবে দিব রে মুকতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে,
ভীম-দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদারণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ যে রণচ্ছায়া পড়িল সলিলে,
ডরাইয়া জলজীবী জলজন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে সবে ভাবিল প্রলয়ে,
বুঝি এ বীরেন্দ্রদ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল!
মেঘনাদ মেঘের পিছনে
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে, এসে যায়,
জরজরি শ্রীরামের কটক লজ্জায়!
কভু নাকে কভু কানে
ত্রিশূল সদৃশ হানে,
শুল মশা বীর;
না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্মুহু নাদ করি
হইলা অধীর।
হায় ক্রোধে হৃদয় ফাটিল—
গতজীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল।
ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি অবহেলে যারে
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

গল্প দুইটির উপাখ্যানভাগ এক ও উপদেশ এক কিন্তু লা ফন্ত্যানের কবিতার যে সুষ্ঠু গঠন ও সুন্দর রস আছে মশার যুদ্ধজয়ের পর মাকড়সার জালে প্রাণত্যাগ ব্যাপারে মধুসূদন তাহার কিছুই ধরেন নাই বা ধরিতে চাহেন নাই। ইহার কারণ উভয়ের প্রকৃতিগত সমাজগত দৃষ্টি-ভঙ্গি ভিন্ন ধরণের। সুতরাং এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আশা করা অন্যায়। উপরন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন অনুবাদ করেন নাই—কবিতাগুলি তাঁহার কথায় imitation.

মধুসূদনের আর একটি কবিতা আছে—'অশ্ব ও কুরঙ্গ'। ইহার ভাবটি লা ফন্ত্যানের Le cheval s'étant voulu venger du cerf* কবিতার ভাবটির সহিত মিলিয়া যায় কিন্তু অন্য সাদৃশ্য একেবারে নাই। উপরে দেওয়া কবিতাগুলির মধ্যে দেখি যে, বাংলা কবিতাগুলির

* হরিণ ও প্রতিহিংসাকামী অশ্ব

ভাব ছাড়া অন্য বিষয়েও ফরাসী কবিতাগুলির মিল আছে। কিন্তু এখানে সেটুকুরও অভাব। সাদৃশ্য নাই বলিয়া মধুসূদনের কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহারা উহা পড়িতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যোগীন্দ্রবাবুর লেখা জীবনচরিতের ৫৯৪ পৃষ্ঠায় তাহা যেন দেখিয়া লন। ফরাসী কবিতাটির বাংলা অনুবাদ দিলাম।

'ঘোড়া চিরকাল ধরেই জন্মাত না মানুষের কাজে লাগবার জন্য। মানুষ যখন ফলমূল নিয়েই হত খুশী, গাধা ঘোড়া ও অশ্বতর তখন বনেই বাস করত। মানুষের সঙ্গে তাদের দেখাই হত না যেমন আজকাল হয়। না ছিল লাগাম, না ছিল জিন যুদ্ধ করবার জন্য, না ছিল গাড়ী তখনকার দিনে। এমন ভোজ ও বিয়েও তখনকার দিনে লেগে থাকত না। এক ঘোড়ার একবার লাগল ঝগড়া এক দৌড়বাজ হরিণের সঙ্গে। দৌড়ে তাকে ধরতে না পেরে এক মানুষের কাছে গিয়ে সে সাহায্য চাইল। মানুষ পরাল তাকে লাগাম, উঠল তার পিঠে; তাকে বিশ্রামই দিলে না যতক্ষণ হরিণ না পড়ল ধরা আর হারাল তার প্রাণ। তার পর ঘোড়া উপকারী মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে বললে—তোমার কেনা হয়ে রইলুম, এখন বিদায়, এবার আমি নিজের ঘরে ফিরব। মানুষটি তখন বললে—তা হবে না; আমার কাছে থাকলে তোমার হবে ঢের ভাল। তোমার ভাল আমিই বুঝি বেশী। এখানে যত্নে থাকবে; পেট ঠেসে খাবে বিচালি। হায় রে, স্বাধীনতা যদি না থাকে ভাল খেতে পেলে হবে কি? ঘোড়া বুঝল তার বড় বোকামি হয়ে গেছে। বিশ্রামও আর তার জুটল না, সওয়ার লাগাম নিয়ে সদা প্রস্তুত। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে হ'ল তার মৃত্যু—যদি ছোট অপরাধটুকু ক্ষমা করতুম তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ হত। প্রতিহিংসা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার মূল্য বড় বেশী—আপনার স্বাধীনতা। আর এ স্বাধীনতার অভাবে সব আনন্দই হয়ে যায় তুচ্ছ।'

এই গল্পগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। যোগীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, এই কবিতাগুলি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি "গম্ভীর বিষয়ের ন্যায় সহজ সরল বিষয়েও মধুসূদনের প্রতিভা কিরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইত।" কিন্তু ফরাসীর তুলনায় কবিতাগুলি যথেষ্ট সুন্দর নয়। সেকথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কবিতা কয়টিতে মধুসূদনের যশ কিছু বাড়ে নাই বা লা ফনত্যানের গল্পগুলি ফরাসীতে যে স্থান অধিকার করিয়াছে মধুসূদনের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে সে স্থান পাইতে পারে না। মধুসূদন যখন কাব্য লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন সেই সময়ে এই কবিতাগুলি লিখিত।

আমাদের মনে হয় এই কবিতা কয়টি ছাড়া নাটক লেখায়ও মধুসূদন ফরাসী সাহিত্যের নিকট ঋণী ছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বে কেহ আলোচনা করেন নাই তাই অতি সঙ্কোচের সহিত আমি জানাইতে চাই মধুসূদনের বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ ও মোলিয়্যারের Tartuffe* পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে যে, মধুসূদন ঐ প্রহসনখানি মোলিয়্যার পড়িয়াই লিখিয়াছিলেন। অবশ্য মধুসূদন অনুবাদ করেন নাই বা হীন অনুকরণ করেন নাই। অপরের গুণ বাংলা ভাষায় চালাইবার তাঁহার অসীম শক্তি ছিল। তিনি ফরাসী ভাবকে অতি সুন্দরভাবে বাংলা-সমাজের উপযোগী করিয়া দেখাইয়াছেন। তবে ১৮৫৯-৬০ সালে তিনি ফরাসী ভাষা জানিতেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে মোলিয়্যারের নাটক বহুপূর্ব্বেই অনূদিত হইয়াছিল। মধুসূদন নিশ্চয় তাহা পড়িয়া থাকিবেন। উভয় নাটকের আখ্যানবস্তু হইতেছে দুই ভণ্ডের শাস্তি। তারতুফ্ ও ভক্তপ্রসাদ ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া অধর্ম্ম করিত; তাহাদের পরিচিত লোকের পত্নীর নিকট গোপনে প্রেমপ্রস্তাব উত্থাপন করিতে লজ্জা পায় নাই। অবশ্য উভয়েরই শেষে যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছিল।

তারতুফের কাহিনী এইরূপ। অর্গঁ নামে এক ভদ্রলোক তারতুফ্ নামে এক ধার্ম্মিক লোককে অতি আদরে নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছেন। তারতুফ্ তাঁহার মনে এতখানি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, তাহাকে তাঁদের অদেয় কিছুই নাই। তাহার সহিত নিজ কন্যা মারিয়ানের বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্টমতি তারতুফ্ ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এলমিরের রূপ দেখিয়া মজিয়াছে। তাঁহাকে সে প্রেমনিবেদন করিতেছে এমন সময় ভদ্রলোকের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দামি আসিয়া পড়িয়া সব শুনিয়া ফেলিল। সে ও তাহার বিমাতা ভদ্রলোকের কাছে অভিযোগ করিলেও তিনি বিশ্বাস করিলেন না ও পুত্রকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী চাতুরি করিয়া স্বামীকে গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তারতুফের নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করিলেন। তখন তারতুফের কথা শুনিয়া ভদ্রলোকের চক্ষু খুলিল। কিন্তু পাষণ্ড তারতুফকে তিনি সব সম্পত্তি দিয়া ফেলিয়াছেন; সে তাঁহাকে আইনের জোরে তাঁহার নিজের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহিল; তাঁহার রাজনৈতিক

* ফরাসী ভাষায় Tartuffe শব্দের অর্থ ভণ্ড

কাগজপত্র লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে চাহিল। কিন্তু রাজার সাহায্যে তিনি বাঁচিয়া গেলেন আর ভণ্ড বক-ধার্ম্মিক তারতুফের হইল জেল।

মধুসূদনের নাটকখানির উপাখ্যানভাগ পরিচিত হইলেও আবার এই স্থানে বর্ণনা করিতেছি। ভক্তপ্রসাদবাবু মস্ত জমিদার, হিন্দুধর্মের মাথা বলিলে চলে। কলিকাতায় জাতধর্ম্ম একাকার হইয়া যাইতেছে ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হয় না। কিন্তু এই ধার্ম্মিকের খোলসে আছে এক কামুক। গরীব মুসলমান প্রজা হানিফ, অজন্মা হওয়ার জন্য খাজনা মাফ চায়; জমিদার মাফ করিবেন না। অনুচরের মুখে শুনিলেন হানিফের স্ত্রী ফতেমা সুন্দরী। অমনি গলিয়া গেলেন। চর ছুটিল। সাধ্বী ফতেমা স্বামীকে সবই বলিল। হৃতসর্ব্বস্ব দরিদ্র বাচস্পতি হইলেন হানিফের সহায়। তিনজনে পরামর্শ করিয়া জমিদারকে কথা দিল সন্ধ্যায় ফতেমার সহিত নির্জ্জন বনে তাঁহার দেখা হইবে। বৃদ্ধ জমিদার পরিপাটি সাজ করিয়া আসিলেন অভিসারে—সেইখানে আবার কীচক বধ পুনরভিনীত হইল। ভক্তপ্রসাদ নাকে কানে খৎ দিয়া সাধু হইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন ও হানিফ ও বাচস্পতিকে সন্তুষ্ট করিলেন।

মধুসূদন সুদক্ষ শিল্পীর মত মোলিয়্যারের উপাখ্যানটি আপনার করিয়াছেন। বাঙালী পোষাকে তারতুফ্‌কে ভাল চেনা যায় না। ধর্ম্মের মুখোস-পরা অধার্ম্মিক উভয় নাটকেই স্বরূপে ধরা পড়িয়াছে। ধর্ম্মের ভড়ং উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য করিবার মত। শয়তানিতে তারতুফ্‌ অবশ্য ভক্তপ্রসাদের এক ধাপ উপরে যায়। মোলিয়্যারের নাটকে রাজার সাহায্যে তারতুফের পরাজয় যেন নাট্যকারের দুর্ব্বলতা। মধুসূদনের ভক্তপ্রসাদ লম্পট কিন্তু তারতুফ্‌ লাম্পট্যকে ব্যবসায়ে পরিণত করে নাই। ভণ্ডামি তারতুফের অস্ত্র। অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট মধুসূদনের নাটকখানি; কিন্তু নাটকীয় গুণে উহা তারতুফের সমকক্ষ এমন কি তারতুফকে উঁচাইয়া গিয়াছে, একথা বলিলে বেশী বলা হইবে না।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের তারিখ ১৮৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী শনিবার। ঐ দিন ব্যাঙ্কের যান্মাসিক সভায় ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। এই সভায় ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির খতিয়ান বিবেচিত হইবার পর নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়:

(১) পাওনাদার এবং মালিকদের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইয়া লইবার পরিকল্পনা নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হউক; ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত কার্য্য বন্ধ থাকুক এবং কমিটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

1.—That a Committee be appointed to recommend a plan for the immediate winding-up of the Bank, with reference to the rights and interests of the Creditors and Proprietors; and in the meantime, that all business of the Bank be suspended, and that the Committee be requested to make their report within a week.

(২) আগামী শনিবার বেলা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই সভা মুলতুবী থাকুক, ইতিমধ্যে মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি না করিবার জন্য পাওনাদারগণকে অনুরোধ করা হউক এবং ঐ দিন কমিটির রিপোর্ট ও পরিকল্পনা এবং সভায় কোন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব ধার্য্য হইলে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সভায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হউক।

2. That this Meeting adjourn until Saturday, at 10 o'clock, and that the creditors be requested to suspend all proceedings in the meantime, and be invited to attend on that day to receive the Report and Scheme of the Committee, and such definite proposition to be founded thereon as the Meeting may adopt.

সভার কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়া ১৮৪৮-এর ২০শে জানুয়ারী তারিখের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া মন্তব্য করিতেছেন, "অতএব ব্যাঙ্ক বন্ধ হইল।"

The Bank is, therefore at an end.

সভায় সম্পত্তি ও দায়ের যে খতিয়ান দাখিল করা হয় তাহা এই:

সম্পত্তি—

Dead Stock, Bank Premises and Office Property	..	৮০,৭৬২।/১০ পাই
Cash in hand	..	৭৪৫৶৬ „
Government Paper	..	৭,১৪,৮২৯।৯ „
Discounts of Private Bills	..	১০,৫৬,৬৬৫৶১ „
Loans on Government Paper, Bank of Bengal Shares, the Coal, the Tug, the Fort Gloster, the Assam, the Bengal Indigo, and the Docking Company's Shares, Bonded Warehouse Shares, Lapsed Shares of some of these, Union Bank Shares, Talooks and Houses	..	১৬,১৮,০৫২।৩ „
Loans on Joint and Several Personal Securities	..	২৫,৫৩,১০৬।৶৫ „
Properties	..	৯০,৫২,৪৬৫।২ „
Interest on Open Loans	..	৩,২৭,৩৯০৸৩ „
Claims on Insolvent Estates	..	৫,২১,২৯২।/২ „
		১,৫৯,২৫,৩১০।৶৫ „

দায়—

Circulation		৫৫,৯১০৲
Floating Accounts	..	৮,২০,৭৪৯৶৭ „
Fixed Deposits	..	১২,৩২,৮৮২৶৮ „
Bank of Bengal	..	১,১৭.৫৯৯।/০ „
Bank Post Bills	..	২৭,৮৬,৩৩১।১ „
Bills Payable	..	৫,৮৭,০০০৲ „
Unclaimed Dividends	..	২৫,৯৩৭।৶১ „
Exchange Account	..	৬৩,৭১০৸৶০ „
		৫৬,৯০,১২০।/৫ „

ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল এক কোটি টাকা। উপরোক্ত খতিয়ানের সম্পত্তির হিসাব হইতে এই টাকা বাদ দিলে দেখা যায় লাভ হইয়াছে ২,৩৫,১৯০/০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরে চিনি, রেশম ও নীলের দর পড়িয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্ককে প্রচুর লোকসান দিতে হইয়াছিল। ফলে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন সংবাদপত্রে ডিরেক্টরদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাও হইয়াছে। সুতরাং এই সভায় অংশীদারেরা ডিরেক্টর বোর্ড প্রদত্ত খতিয়ান মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন এবং প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে চাপিয়া ধরেন। ডিরেক্টরেরা তখন সম্পত্তি ও দায়ের আসল খতিয়ান বাহির করিলে দেখা গেল ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তি ৮১,০৭,৮৭০ টাকার বেশী হয় না এবং দায়ের পরিমাণ ৭২,০৮,৬১০ টাকা। পাওনা সব টাকা আদায় হইলে সমুদয় দায় মিটাইবার পর মোট মূলধনের এক-নবমাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ডিরেক্টরদের স্বীকারোক্তির পর দায় মিটাইবার সমস্যা অত্যন্ত তীব্র ভাবে দেখা দিল। দায় অপেক্ষা সম্পত্তির পরিমাণ বেশী ছিল, স্বাভাবিক অবস্থায় কারবার গুটাইয়া লইলে অংশীদারদের পক্ষে মারাত্মক কিছুই হইত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ ১৮৪৭-৪৮-এর পৃথিবী ব্যাপী বাণিজ্য-বিপর্য্যয়ের ধাক্কা ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যকেও ওলটপালট করিয়া দিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের অংশীদারদের দায় আজকালকার ন্যায় পরিমিত (limited) ছিল না, উহা ছিল অপরিমিত (unlimited)। কোন লোক একটি মাত্র শেয়ার কিনিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের যে কোন পাওনাদার লক্ষ টাকার জন্যও মামলা করিতে পারিতেন। কোন্ পাওনাদার কোন্ অংশীদারকে আক্রমণ করিবেন তাহাও তাঁহাদের মর্জ্জির উপরেই নির্ভর করিত। ব্যাঙ্কের নিজস্ব পাওনা হইতে যে-দেনার সবটাই শোধ যাইতে পারিত পাওনাদারদের অধৈর্য্যের জন্য অংশীদারদের উপর তাহার সম্পূর্ণ চাপ পড়াতেই বহু সম্পন্ন পরিবার ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেয়ার কিনিয়া যে মূলধন তাঁহারা যোগাইয়াছিলেন তাহাও গেল, অধিকন্তু ব্যাঙ্কের দায় মিটাইবার দায়িত্বও অংশীদারদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিল।

১৫ই জানুয়ারীর সভায় যে কমিটি গঠিত হয় ২২শে তাঁহারা রিপোর্ট দাখিল করেন। এলিয়ট, মর্টন, ফার্গুসন, জে কাল্ডার ষ্টুয়ার্ট এবং জেমস্ ষ্টুয়ার্ট এই কমিটির সভ্য ছিলেন। ২২শের সভায় ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার প্রস্তাব পাকা হয় এবং এই সম্পর্কে ১৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। টি সি মর্টন, মিঃ শেয়ারউড, মিঃ বার্কিন ইয়ং, মানেকজি রুস্তমজি এবং জেমস ষ্টুয়ার্ট এই পাঁচজনকে লইয়া একটি এক্সিকিউভ কমিটি অফ ম্যানেজমেণ্ট গঠিত হয়। এই কমিটিকে ব্যাঙ্কের লিকুইডেটর নিযুক্ত করা হয়।

২৮শে জানুয়ারী মিঃ মর্টনের সভাপতিত্বে পাওনাদারদের একটি স্বতন্ত্র সভা হয়। লিকুইডেটারদের তরফ হইতে এই সভায় জানানো হয় যে প্রতি শেয়ারে ২০০ টাকা করিয়া দিবার জন্য অংশীদারদের বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, কেহ কেহ টাকা দিয়াছেনও। সকলে টাকা দিলে ২০ লক্ষ টাকা উঠিবে। অত্যন্ত কম দরে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও পাওনা অপেক্ষা দেনার পরিমাণ ১৫।১৬ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না। পাওনাদারেরা লিকুই-

ডেটর কমিটির সাধুতা ও সংপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। অতঃপর জন এলান, হেনরি কাওই, টি এস কেলসল এবং রামগোপাল ঘোষকে লইয়া একটি কমিটি অফ ক্রেডিটর্স নিযুক্ত হয় এবং ইহাদিগকে লিকুইডেটর কমিটির সহিত সহযোগিতা করিবার জন্ম অনুরোধ করা হয়।

দরজা বন্ধ করিবার ছয় মাস পূর্ব্বেও ব্যাঙ্ক শতকরা সাত টাকা লভ্যাংশ দিয়াছিল। একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ভারতীয় ও ব্রিটিশ ডিরেক্টরেরা দেশে ও বিদেশে বাণিজ্য পরিচালনা করিয়াছেন, নানাবিধ শিল্প-প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছেন। ব্যাঙ্কের স্বার্থটুকু মাত্র বাঁচাইয়া চলাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না; ব্যাঙ্কের উন্নতির সঙ্গে বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনও তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। এজন্ম বড় রকমের ঝুঁকি ঘাড়ে লইতেও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছে, ব্যাঙ্কের প্রচুর লাভ হইয়াছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্য ইহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে, ব্যাঙ্কের উপর পূর্ণ আস্থা ছিল বলিয়া বাঙালী এবং ইউরোপীয়ান উভয়েই বহু অর্থ তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। ১৮৪৮-এর বাণিজ্য-বিপর্য্যয়ের মুখে ব্যাঙ্ককে পড়িতে না হইলে এত শীঘ্র উহা উঠিয়া যাইত কি না সন্দেহ।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। একটি ঘটনায় দ্বারকানাথের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪৪-এ নীলের বাজার পড়িয়া যাওয়ায় সেক্রেটরী জেমস ষ্টুয়ার্ট ব্যাঙ্কের অধীনস্থ নীলকুঠিগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন। বাংলার তখনকার অর্থকরী ফসল ছিল নীল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নীলের চালানি ব্যবসা এবং বন্ধকী নীলকুঠিতে নীল উৎপাদন উভয়ই করিতেন। নীলের বাজার বরাবরই খুব বেশী উঠানামা করিত। ১৮৪৪ সালে হঠাৎ এরূপ একটা মন্দার দিনে ব্যাঙ্কের সেক্রেটরী জেমস্ ষ্টুয়ার্ট প্রচুর লোকসান দিয়াও কুঠিগুলি বেচিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিতেছেন,

"My utmost efforts, privately and efficiently, to prevent those outlays, and to compel a sale of the properties even at a great present sacrifice, were exerted, but in vain."

১৮৪৪-এর ১২ই অক্টোবর দ্বারকানাথ লেখেন,

My dear Stewert,—No one is more anxious than myself to see the accounts of the Indigo Blocks all closed, but it will not do to sacrifice the property that this may be effected, for in such case this would be an easy matter to settle. The mischief has been done, and we must just quietly get out of it with as little as possible; it must be effected soberly and advisedly, and not by stopping the advances as you suggested, to the injury of the concerns for this would have made bad worse. The great misfortune of Indigo Factories has been the fall in prices; had there been any decent price, the quantity made on account of the Bank would have not only repaid last year's advance but would have reduced a great part of the Block Account. And these low prices have also been the cause of purchasers not coming forward—there is no want of money, but who in the face of such prices will purchase a concern which will barely pay the interest on his money ?"

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটরীরূপে ষ্টুয়ার্ট যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কের আপাত স্বার্থ রক্ষার জন্ম দেশের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিকর এমন সব প্রস্তাব তিনি করিয়া বসিতেন যে দ্বারকানাথের এবং অন্যান্য ডিরেক্টরদেরও অনেকের সহিত তাঁহার তীব্র মতভেদ হইত। উপরোক্ত পত্র বিনিময়েও দেখা যায় দ্বারকানাথই অবস্থা ঠিক বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতানুসারে চলিয়া ব্যাঙ্কের কোন মারাত্মক ক্ষতি হয় নাই। ১৮৪২ হইতে ১৮৪৭ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক প্রত্যেক বৎসরই লভ্যাংশ দিয়াছে। ষ্টুয়ার্ট শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে টিঁকিতে পারেন নাই। ১৮৪৬-এর অগাষ্টে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়, পরবর্ত্তী জানুয়ারীতেই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। তিনি অতঃপর দেশে ফিরিয়া যান এবং তথায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে সব অংশীদার ছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে সুপারিশ-পত্র সংগ্রহ করিয়া সেক্রেটরীপদে পুনর্নিয়োগের চেষ্টায় জন্ম ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার কয়েক সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে অগাষ্ট মাস পর্য্যন্ত কোন টাকা উঠিল না দেখিয়া পাওনাদারেরা অংশীদারদের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। মোট ৪৩৩ জন এই তালিকাভুক্ত হন, তন্মধ্যে ৭০ জন বাঙালী, দুই জন মুসলমান, একজন মারোয়াড়ী এবং অবশিষ্ট সকলে ইউরোপীয়। এই ভাবে মোট ৫২,০৩,৭০০ টাকা ধার্য্য (assessment) হয়। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন মোট অংশীদারের সংখ্যা ছিল ৮০০। তিন হাজার টাকার অধিক যাঁহাদের উপর ধার্য্য হইয়াছে তাঁহাদের নাম :

আশুতোষ দেব	৩	লক্ষ		টাকা	
প্রমথনাথ দেব	৩	,,		,,	
রাজা নৃসিংহ চন্দ্র	১	,,	৫০	হাজার	
প্রসন্নকুমার ঠাকুর			৪০	,,	,,
রমানাথ ঠাকুর			২০	,,	,,
গোপাললাল ঠাকুর			২০	,,	,,
মথুরানাথ ঠাকুর			৫	,,	,,

উদয়চাঁদ বসাক	২০	,,	,,
রামহরি ভদ্র	১০	,,	,,
হরিদাস বসু	১০	,,	,,
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	,,	,,
তারিণীচরণ বসু	৫	,,	,,
তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫	,,	,,
রামতারণ কুণ্ড	৩	,,	,,
শম্ভুচন্দ্র দাস	১০	,,	,,
শম্ভুপ্রসাদ ঢোল	৫	,,	,,
হরিনাথ দত্ত	৫	,,	,,
রাজা প্রসন্নচন্দ্র দেব	৩০	,,	,,
রামকুমার দাস	৫	,,	,,
গোপীনাথ দে	১০	,,	,,
নন্দলাল দত্ত	১০	,,	,,
লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত	১০	,,	,,
কালীকৃষ্ণ ঘোষ	৫	,,	,,
নবীনকৃষ্ণ ঘোষ	৫	,,	,,
কৈলাসনাথ ঘোষ	১০	,,	,,
কমললোচন গোস্বামী	১০	,,	,,
রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	২৫	,,	,,
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	২৫	,,	,,
মেঘনারায়ণ রায়	১০	,,	,,
কালিদাস সাঁই	৫	,,	,,

ইউরোপীয়ানদের মধ্যে মাত্র দুইজনের উপর ১ লক্ষ টাকা করিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, কয়েক জনের উপর ৫০ হাজার এবং অপর সকলেরই বেলায় ২০ হাজারের নীচে।

ব্যাঙ্কের অংশীদারদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের জন্যও যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। শ্যামাসুন্দরী দাসী নামে জনৈকা স্ত্রীলোক আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ দেবের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া তাঁহাদের পত্নীদের নিকট ৩০০০৲ জমা দিয়াছেন এই সামান্য অছিলায় ইঁহাদের নামে ইনসলভেন্সি কোর্টে মামলা আনা হয়। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাওনা ফাঁকি দিবার জন্য ইঁহারা বেনামীতে সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন, ইহাই ছিল অভিযোগ। প্রধান বিচারপতি সর্ লরেন্স পীল ইঁহাদিগকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন। তবে ঐ সঙ্গে বলেন যে রায় পাল্টাইবার জন্য তাঁহারা দরখাস্ত করিতে পারিবেন। রায় প্রকাশের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের সমস্ত সম্পত্তির অধিকার অফিসিয়াল এসাইনিতে অর্শিয়াছে। এই সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক, ইনসলভেন্সি কোর্টের রায় পাকা হইলে এই সমস্ত সম্পত্তি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাওনাদারেরা দখল করিতে পারিতেন। এই ভাবে বিপদে পড়িয়া আশুতোষ এবং প্রমথনাথ অ্যাসেসমেণ্টের ৬ লক্ষ টাকা দিয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। আইনের প্যাঁচে যে ভাবে তাঁহারা আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে এই টাকা না দিলে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইত। দেউলিয়া ঘোষণার আদেশ পাকা করিবার দিন পাওনাদারদের উকীল আদালতকে জানাইলেন যে তাঁহারা আর মামলা চালাইতে চাহেন না। সর্ লরেন্স পীল ব্যাপারটা বুঝিলেন। মামলা খারিজ করা ছাড়া তাঁহার পক্ষেও গত্যন্তর ছিল না। ভিতরে ভিতরে উভয়পক্ষে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে আদালত তাহা অনুমোদন করেন নাই, রায়ে ইহা তিনি জানাইয়া দেন। ইহা নবেম্বর মাসের ঘটনা, মামলার বিবরণ ইংলিশম্যান পত্রে প্রকাশিত হয়। মামলা খারিজের উপর মন্তব্য করিয়া ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া (১৬ই নবেম্বর ১৮৪৮) লেখেন যে, ইহাতে ভালই হইয়াছে। ইঁহাদের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে ব্রিটিশ বিচার পদ্ধতির উপর ভারতবর্ষের লোকের আস্থা নষ্ট হইয়া যাইত। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লেখেন:—

> Those debts (of Union Bank) were stated in the Schedule at about fifty lakhs of Rupees, and the whole burden of discharging them would thus have fallen upon One out of the Eight Hundred Proprietors;—which would have been much more legal, than equitable. We are happy, however, to say, that the adjudication has been reversed, and we have thus been spared a spectacle which would have placed our legal institutions in the most odious light before the Natives of Hindoostan.

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার তিন মাস পর কার ঠাকুর কোম্পানীও ফেল হইল। ১৮৪৮-এর ৬ই এপ্রিল তারিখের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লিখিলেন,

> "It is with great regret we record that in the general crash of commercial houses, the firm established by the public-spirted Dwarkenath Tagore has been obliged to stop payment....The reputation of Dwarkenath was a national possession, and a more than ordinary interest is felt in the fortunes of his family."

ঐ দিনই ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ায় কার ঠাকুর কোম্পানীর পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে পাওনাদারদের নিকট লিখিত একটি সার্কুলার প্রকাশিত হয়। সার্কুলারের তারিখ ৩১শে মার্চ্চ। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার ঠাকুর কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল।" এখানে সাল ঠিকই আছে, শুধু ফাল্গুন না হইয়া চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হয়। সুতরাং কলিকাতা গেজেটের একটি বিজ্ঞাপনের

উপর নির্ভর করিয়া কার ঠাকুর কোম্পানী বন্ধ হইবার তারিখ ১৮৪৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর নাগাদ বলিয়া যে ধারণা চলিয়া আসিতেছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের প্রচলিত তারিখের ন্যায় উহাও ভ্রান্ত। গুরুত্ববোধে সমগ্র সার্কুলারটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

CARR TAGORE & CO.

Calcutta, March 31, 1848.

It is with much regret that we have to inform you, that we have been compelled to suspend our payments, if not being in our power to meet several liabilities immediately falling due. We have, therefore, deemed it advisable at once to call our creditors together, to lay before them the state of our affairs, and consult with them on what is best to be done.

We beg to assure you that the necessity for this step has come upon us most unexpectedly, and arises solely, from the disappointment we have experienced in carrying out the plan of liquidation under the arrangements made in January last. We then considered that we might realize rapidly a portion of the large amount due to us by others, but in this we have entirely failed, and in three months we have not recovered more than one per cent of the amount, at which at so late a date as November 1846, the debts due to us were valued by ourselves and partners for a settlement of accounts. So unexpected has it been to us, that our late partner Major Henderson left India only two months ago, in full belief that the liquidation would go on successfully, and that there would be no necessity for a suspension of payments.

Though we have for some years past been engaged in no speculative business, beyond the carrying on of our own Indigo, silk and sugar concerns (our shipments having been confined almost entirely to their produce,) still our actual losses in the last two years have been upwards of 23 lacks of rupees, arising chiefly from depreciation in the value of property, Indigo, Silk, Sugar and Saltpetre factories, Union Bank and other Joint Stock Shares; and losses on personal debts from individuals, who within the last year have themselves been ruined, and losses in carrying on the factories.

Notwithstanding this loss, we have no hesitation in stating our confident expectation of still being able to pay in full every rupee we owe. Our liabilities, which when our late father went to Europe amounted to ninety-eight lacks of rupees have been reduced to little more than one-fourth of that amount; and of this considerably more than one-half is on special ample security, leaving less than 11 lacks of rupees of open accounts, our assets, even at present valuation, shew more than sufficient when realized to cover the liabilities, independent of the property in trust for ourselves, and families, our life interest in which will be available to meet any unexpected deficiency.

Full details are being made out, and will be laid before the Meeting, which we propose to hold on Tuesday next, the 4th proximo, at 4 o'clock, when we request your attendance.

Debendernauth Tagore.
Greendernauth Tagore.

P.S.—As parties jointly liable for the debts of Carr Tagore & Co. we concur in the above letter.

D. M. Gordon.
Jas. Stuart.

এই সার্কুলারে কয়েকটি তথ্য জানা যায়। প্রথমতঃ জানুয়ারী মাসে ধীরে ধীরে কারবার গুটাইয়া লইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, কোম্পানীর দরজা বন্ধ করা তো দূরের কথা, এরূপ সম্ভাবনার কথাও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কার ঠাকুর কোম্পানী ফেল হওয়ার একমাত্র কারণ পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিপর্যয়, ব্যবসায় পরিচালনায় কোনরূপ ত্রুটি উহার জন্য দায়ী নহে। তৃতীয়তঃ, বিলাত যাত্রাকালে দ্বারকানাথের ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৮ লক্ষ টাকা; দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কার ঠাকুর কোম্পানীর সুপরিচালনা গুণে তিন বৎসরের মধ্যেই উহার তিন-চতুর্থাংশ শোধ যায়, অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশের মধ্যেও অর্দ্ধেক ছিল বন্ধকী আর অর্দ্ধেক অর্থাৎ প্রায় ১১ লক্ষ টাকা ছিল ব্যক্তিগত ঋণ।

৪ঠা এপ্রিল পাওনাদারদের সভা হয়। উহার বিস্তারিত বিবরণ পর দিবস বেঙ্গল হরকরায় প্রকাশিত হয়। রবার্ট ক্যাসল জেঙ্কিন্স সভাপতিত্ব করেন। মিঃ ডব্লিউ এফ ফার্গুসন বলেন, "সকলেরই জানা আছে দ্বারকানাথের পুত্রগণের কিম্বা অন্য অংশীদারদের দোষে কার ঠাকুর কোম্পানী ফেল হয় নাই; পাওনাদারেরা ইঁহাদের কাহারও নামে ব্যয়বাহুল্যের অপবাদ দিতে পারেন না—তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধও বলা চলে না; সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভ্রাতার জন্য যে বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখা যায় না।"

The public was aware that the downfall of the house of Carr, Tagore and Co. was not owing to the sons of Dwarkanath, nor to the other partners that, with them, constituted the Firm; the creditors could not blame them for extravagance—they could not blame them for folly; and there, therefore, appeared to him no ground for disallowing the indulgence he had proposed for Debendernauth Tagore and his brother; and he was satisfied that every creditor would cordially concur with him in this opinion.

ফার্গুসন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ট্রাষ্ট সম্পত্তির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকোর বসতবাটী ও তথাকার যাবতীয় সম্পত্তি রাখিতে দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ঐ সভাতেই জেঙ্কিন্স, এফ আর হ্যাম্পটন এবং রমানাথ ঠাকুর লিকুইডেটর নিযুক্ত হন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের লিকুইডেটরদের মধ্যে রমানাথ ঠাকুরের নাম পাওয়া যায় না।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর ব্যাঙ্কের পরিচালন ভার একটি দলের হাতে পড়িয়াছিল, ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন পার্শী অপর সকলে শ্বেতাঙ্গ। ইঁহাদের নাম ডব্লিউ পি গ্র্যান্ট, এইচ হলরয়েড, জন ইর্ব, জন লায়াল, ডব্লিউ আর ম্যাকারট্রীন এবং রস্তমজী কাওয়াসজী। ইঁহাদের সকলের নিকট একযোগে এক কিস্তিতে ব্যাঙ্কের পাওনা ছিল ৪

লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এই দেনার উল্লেখ করিয়া ক্রেণ্ড (৭ই ডিসেম্বর ১৮৪৮) টিপ্পনী করিয়াছেন,

"This is the debt due to the Bank by the Confederacy formed to keep up the fictitious value of the Union Bank Share."

এই সম্মিলিত দেনা ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে বাঙ্কে গ্র্যাণ্ট সাহেবের দেনা ছিল ৩ লক্ষ, হলরয়েডের এক লক্ষ এবং ইর্ষের ২৫ হাজার টাকা।

তুষারের মধ্যে পাখী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মাবধি সে ছিল অন্ধ। সেজন্য অন্ধরা যা শিখতে পারে শুধু তাই তাকে শিখানো হয়েছিল—সঙ্গীতবিদ্যা। এতে সে খুব পারদর্শিতা লাভ করেছিল। তার জন্মাবার মাত্র কয়েক বৎসর পরেই তার মা মারা যান ও তার বাপ—যিনি একটা সেনাবাহিনীর ব্যাণ্ডমাষ্টার ছিলেন—গত বছর দেহত্যাগ করেন। আমেরিকায় তার এক ভাই ছিল। সে অন্ধের কোনও খোঁজখবর নিত না। যা হোক্, খবর পেয়ে পরে অন্ধ বালকটি জানতে পেরেছিল যে তার ভাই অনেক দিন হ'ল বিয়ে করেছে ও একটা ভাল পদে নিযুক্ত আছে আর তার দুটি সুন্দর ছোট ছেলে আছে। যখন তার বাপ বেঁচে ছিলেন তখন তিনি তাঁর এই আমেরিকাবাসী ছেলের নাম শুনতে পর্য্যন্ত চাইতেন না—তার অকৃতজ্ঞতার জন্য; কিন্তু অন্ধ বালকটি তা সত্ত্বেও তার ভাইকে খুব ভালবাসত। সে কখনও ভুলতে পারে নি যে তার এই বড় ভাই তার শৈশবের অবলম্বন ছিল ও তাকে অজ্ঞান দুষ্ট বালকের অত্যাচার থেকে রক্ষা করত, তার সঙ্গে কত মিষ্টি কথাবার্ত্তা বলত। এই রকম ভাবে সে আরও ভাবলে কেমন তার বড় ভাই যার নাম ছিল সান্তিয়াগো। প্রত্যুষে সে তার ঘরে ঢুকে এই বলে আদর করে ডেকে তাকে জাগিয়ে দিত :—যুয়ানিতো (আমার প্রিয় জন্)! এখনও তুই শুয়ে আছিস, আমার ছোট্ট ভাইরে? আর কত ঘুমাবি? এইবার উঠে পড়!—তার বড় ভাইয়ের এসব কথা তার কানে পিয়ানোর গৎ বা বেহালার ছড়ের টানের চেয়ে বেশী মধুর মনে হত।

এমন সুন্দর কোমল অন্তঃকরণ কি করে বদলে খারাপ হয়ে গেল সে নিজেকে কিছুতেই বুঝাতে পারে নি। সে বিশ্বাস করত অন্য কোনও কারণে হয়ত সান্তিয়াগো চিঠিপত্র দেয় না। কখনও চিঠিপত্র না আসার কারণ সে ডাক বিভাগেরই দোষ বলে মনে করত। আবার কখনও ভাবত তার ভাই তাকে চিঠি দেবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তার এই অসহায় অন্ধ ভাইয়ের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে না পাঠাতে পারে; বোধ হয় ভাই সান্তিয়াগো তার ছোট ভাইকে একটা কিছু অভাবনীয় ব্যাপার দেখাবার জন্য হঠাৎ একদিন লক্ষ লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে একেবারে তাদের দরিদ্র-নিবাসে উপস্থিত হবে। সে কিন্তু তার এ সব ধারণার মধ্যে একটাও তার বাপকে বলতে সাহস পায় নি; তবে যখন তার বাপ রেগে তাঁর অনুপস্থিত ছেলের উদ্দেশ্যে গালাগাল দিয়ে উঠতেন তখন সে সাহস করে শুধু বলত :—হতাশ হয়ো না বাবা! সান্তিয়াগো ভাল ছেলে, আর আমার মনে হয়—সে নিশ্চয়ই শীঘ্র চিঠি দেবে।

তার পিতা বড় ছেলের চিঠি দেখবার আগেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময় একজন পুরোহিত তাঁর কাছে থেকে শেষ সময়ের কাজ করেন। দরিদ্র অন্ধ বালকটি জোরে মুমূর্ষু পিতার হাত চেপে ধরে তাঁকে এই পৃথিবীতে আটকে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল।

শববাহকরা যখন উপস্থিত হ'ল তখন তাদের সঙ্গে অন্ধের ঘোরতর বচসা লেগে গেল, কিন্তু হায় শেষ পর্য্যন্ত হতভাগ্য বালককে একলাই থাকতে হ'ল। তার কি নিভৃত বাস!—জগতে বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বলতে কেউ নাই, এমন কি যে সূর্য্য সব জীবেরই বন্ধু ও সহায় সেও তার কাছ থেকে দূরে সরে। দু-দিন কিছু না খেয়ে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ করে পিঞ্জরাবদ্ধ নেকড়ে বাঘের মত ঘরের এক কোণ থেকে অপর কোণ খালি ছুটাছুটি ক'রে বেড়িয়েছিল। তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে বাড়ীর চাকরাণী এক করুণহৃদয়া মহিলা প্রতিবেশিনীর সাহায্যে তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচালে। তারপর থেকে সে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করত, পিয়ানো বাজাত ও উপাসনা করত।

তার পিতা মারা যাবার কিছুদিন আগে তাকে পাদরীদের এক গির্জ্জায় অর্গান-বাদকের পদে নিযুক্ত করে দিয়ে যান, এতে সে দৈনিক চৌদ্দ "রেয়াল" (এক রকম স্পেনীয় রৌপ্য-মুদ্রা) বেতন পেত। এটা সহজে বুঝা যায়, এই অল্প মাইনেতে সংসার চালানো—যত সামান্য ভাবেই হোক্ না কেন—সম্ভবপর ছিল না। সেজন্য দিন পনেরো যেতে না যেতেই তাকে বাধ্য হয়ে খুব সামান্য টাকার জন্য বাড়ীর একটা ভাল জিনিস বেচতে হ'ল ও চাকরাণীকে ছুটি দিয়ে দিত হ'ল—তাকে আর রাখতে পারলে না। নিজে একটা বোর্ডিঙে দৈনিক আট 'রেয়াল' দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে আরম্ভ করলে; বাকি ছয় 'রেয়ালে' যা-হোক্ করে তার

অন্যান্য অভাব মিটত। কয়েক মাস শুধু নিজের কাজে যাওয়া ছাড়া সে রাস্তায় বের হত না। শুধু বাড়ী থেকে গির্জ্জায় যাওয়া ও গির্জ্জায় হতে বাড়ী ফেরা। দুঃখকষ্টের পেষণে কিছুদিন সে মুখ খুলে কথা বলতে পারে নি। চুপ করে শুধু একটা বড় রকমের 'রেকৈয়েম ম্যাস্' রচনা করতে লাগল। সে আশা করেছিল রচনাটা শেষ হয়ে গেলে কোনো দয়ালু পাদরী তার স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশ্যে এটা পিয়ানোতে বাজাবার ব্যবস্থা করিয়ে দেবেন।

যদিও এ কাজে সে পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে প্রয়োগ করতে পারে নি, কারণ একটার ত তার অভাব ছিল তবুও আমরা বলতে পারি যে সে এ কাজে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিল।

হঠাৎ স্পেনে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হ'ল ও এর জন্য অন্ধ খুয়ান্ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ভাবলে কারা দলে ভারী হয়ে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতে পারে, কিন্তু সে কিছুই ঠিক বুঝতে পারলে না। এ বিষয়ে সে পরে দেরিতে জানতে পারলে, যখন সে নিজে এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। কিছু দিন যেতে না যেতেই এই নূতন পরিষদ্ এক অধিবেশনে ঠিক করল যে খুয়ান্ রাজকীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপদের কারণ। তাই এ বিষয় তাকে এক দিন সন্ধ্যায় জানিয়ে দেওয়া হ'ল, যখন সে মন প্রাণ ঢেলে পিয়ানোর পর্দাগুলো জোরে জোরে টিপে পবিত্র 'ম্যাস' ও 'সান্ধ্য আরাধনা' গির্জ্জায় বাজাচ্ছিল। সত্যসত্যই তাকে শুধু শুধু অপমান করবার জন্য ও মনে দুঃখ দিবার জন্য গির্জ্জার সঙ্গীত-কক্ষে গানবাজনা যখন খুব জোরে চলছিল তখনই পরিষদের নির্দ্দেশানুযায়ী এ মর্ম্মভেদী ঘোষণা করা হ'ল। এই নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর সভার অধিবেশন হবার সময় এক জন জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠে খুয়ানকে বিতাড়িত করবার মন্তব্য এই বলে প্রকাশ করে যে গির্জ্জায় এমন কোনো লোককে রাখা হবে না যে নূতন দলের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী নয় ও সে জন্য অন্য একজন লোককে খুয়ানের পদে নিযুক্ত করা ঠিক হ'ল যে মন্ত্রীমণ্ডলীর বিধিনিষেধ মান্য করবার ষোল আনা দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। এ খবরটা পেয়ে খুয়ানের আর কোনও উত্তেজনা হ'ল না, শুধু যা সে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল, কারণ সে মনে ভাবলে কাজ থেকে বিতাড়িত হওয়ায় এখন তার অনেক ঘণ্টা অবসর বেশী হবে 'রেকৈয়েম' ম্যাস্ রচনা সমাপ্ত করবার জন্য। তাই সে এটাকে শাপে বর হিসাবে নিলে।

মাসের শেষে যখন বাড়ীওয়ালী ভাড়া আদায়ের জন্য তার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল শুধু তখনই খুয়ান্ টাকাটা না দিতে পেরে নিজের শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দিলে। গির্জ্জার চাকরিটা হারানোর ফলে তার আজ এই অবস্থা! শেষে বাধ্য হয়ে তার স্বর্গীয় পিতার ঘড়িটা ভাড়ার বদলে বাড়ীওয়ালীকে দিলে। তার পর থেকে আবার খুব নিশ্চিন্ত মনে ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সে মনোযোগের সহিত নিজের কাজ করে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বাড়ীওয়ালী আবার ভাড়ার জন্য তাগাদা দিতে উপস্থিত। পুনরায় খুয়ানকে বাধ্য হয়ে তার অতি সামান্য রকমের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আরো একটা জিনিষ বাড়ীভাড়ার বদলে দিতে হ'ল। তার অসহায়তার জন্য বাড়ীওয়ালী দয়া করে তাকে আরও দু'চার দিন বাড়ীতে থাকতে দিলে বটে, কিন্তু পরে ভাড়ার বাকি মাত্র কয়েকটা "রেয়াল" না পাওয়ায় রেগে তার কাছ থেকে তার একটিমাত্র পেঁটরা ও তার গায়ের জামাটা কেড়ে নিয়ে খুব জয়োল্লাস করে তাকে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য করলে। একটা অন্য বাড়ীর তল্লাসে খুয়ান্ ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু এমন কোনও একটা বাড়ী পেলে না যেখানে পিয়ানো বাজাবার সুবিধা হয়,—কারণ তার 'রেকৈয়েম ম্যাস' রচনা এখনও শেষ হয় নি। এর জন্য তার মনে খুব কষ্ট হ'ল। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টার ফলে সে এক দোকানদার বন্ধুর কাছে অল্প সময়ের জন্য রোজ পিয়ানো বাজাবার সুযোগ পেল; কিন্তু বেশী দিন যেতে না যেতেই সে বুঝল যে দোকানদার আর তাকে চায় না, কারণ যখনই সে দোকানদারের কাছে যায় তখনই সে দোকানদারের তরফ থেকে শিষ্টাচারের অভাব দেখে। শেষ পর্য্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করতে সে বাধ্য হ'ল।

কিছু দিনের মধ্যে তাকে অন্য বাড়ী থেকেও বার করে দেওয়া হ'ল,—তবে এবার তার কাছ থেকে কিছু না কেড়ে নিয়ে শুধু তার একটা বাক্স আটকে রেখে দিলে। এখন তার এমন দুঃখ কষ্টের ও ভাবনাচিন্তার সময় এল যে তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। নিয়তির পরিহাসে তার দুর্দ্দশার সীমা রইল না। বন্ধু বলতে কেউ নাই; পরিধেয় বস্ত্র, টাকাকড়ি বলতে কিছুই নাই। অতিকষ্টে তার দিনগুলো কাটতে লাগল। যদি এ সবের উপর আবার দেখতে না পাওয়ার কষ্টটা যোগ করা যায় ও সেজন্য একেবারে অসহায় হয়ে বেঁচে থাকতে হয়, তা হ'লে বোধ হয় দুঃখকষ্টের সীমাটা যে কোথায় তা আমরা নির্ণয় করতে পারি না। দ্বার থেকে দ্বারান্তরে বিতাড়িত, গায়ে মাত্র একটা কামিজ—পরনে ছেঁড়া প্যাণ্ট, চুল না কেটে ও দাড়ি না ছেঁটে খুয়ান্ মাদ্রিদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

করুণহৃদয় এক বাড়ীওয়ালার কাছে খুয়ান্ শেষ পর্য্যন্ত স্থান পায়। তার সহায়তায় সে এক 'কাফে'তে পিয়ানো-বাদক পদের প্রার্থী হয় ও চাকরিটা পায়—কিন্তু মাত্র কিছুদিনের জন্য। খুয়ানের যন্ত্রসঙ্গীত এই 'কাফে'র অতিথিদের ভাল লাগত না, কারণ সে সাধারণ নৃত্যসঙ্গীত বা কোনও রকম জিপ্সি-সঙ্গীত বাজাত না, এমন কি সে কখনো তাদের 'পল্‌কা' বাজিয়েও শুনালে না। শুধু সে এই কাফেতে —যার পুরো নাম ছিল কাফে দে লা খেভাদা—বেটোফেনের সোনাটা ও শোপ্যার কনসার্ট বাজাত। এটা অতিথিদের মোটেই পছন্দ হত না, কারণ তারা সান্ধ্যভোজনের সময় খাবার ছোট চামচে দিয়ে প্লেটে ঠোকা দিয়ে এসব উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে তাল দিতে পারত না। পুনরায় তাই এই হতভাগ্য খুয়ানকে মাদ্রিদের সব চেয়ে অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় পাড়াতে বাড়ী ও কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হ'ল। কোনও করুণহৃদয় ব্যক্তি হয়ত তার

অবস্থা জানতে পেরে কখনও কখনও তাকে পরোক্ষে সাহায্য করতেন, কারণ থুয়ান্ লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা নিতে লজ্জায় শিউরে উঠত। শহরের ছোটলোকের পাড়ায় হয়ত কোনও এক তার্ভেনাতে (ছোট হোটেলবিশেষ) প্রাণ ধারণের উপযোগী খাওয়া-দাওয়া করত ও চার কোয়ার্তো* দিয়ে ভিখারী ও দুর্বৃত্তদের থাকবার চিলেকোঠাতে রাতটা কাটাত। কখনও এ রকম হ'ত যে যখন সে ঘুমোত তার প্যাণ্টটা কেউ চুরি করে নিয়ে তার যায়গায় তালি-দেওয়া ড্রিলের (এক রকম কাপড়) প্যাণ্ট রেখে যেত। এ সময়টা ছিল নবেম্বর মাস।

বেচারি থুয়ান্! তার মনে তার ভাইয়ের প্রত্যাগমনের কল্পনাটা মায়ামরীচিকার মত জেগে উঠত। এখন সে দারিদ্র্যের কবলে প'ড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে, এই আশা তার দেহমনকে সঞ্জীবিত করে তুলতে লাগল। তার ভাইকে একটা চিঠি হাভানায় লেখালে, তবে ঠিকানাটা না জানা থাকায় ঠিকানা ছাড়াই চিঠিটা ডাকে দিলে। অনেক খবর নেবার চেষ্টা করলে যদি কেউ তার ভাইকে কোথাও দেখে থাকেন, কিন্তু কোনই ফল হ'ল না। রোজ কয়েক ঘণ্টা ঈশ্বরের কাছে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করত যাতে তার ভাই তার কাছে ফিরে আসে। গরীবের প্রার্থনা কে আর শোনে! শেষটায় এমন হ'ল যেন সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু করলে। যেখানেই যায় বিতাড়িত হয়, কোথাও একটুকরো রুটি মুখে দিতে পায় না; তার উপর পরনে বসন নেই যাতে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে পারে। একে ত এই অবস্থা, তার উপর হ'ল দুর্ভাবনা যে এবার হাত পেতে ভিক্ষা চাইবার সময় হয়ে এসেছে। এ নিয়ে তার মনে এক ঘোরতর সংগ্রাম সুরু হ'ল, একদিকে অভাব আর কষ্ট, অন্যদিকে লজ্জা। দৃষ্টিশক্তিহীন বলে এযুদ্ধটা তার পক্ষে আরও বেশী কষ্টদায়ক হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত যেমন আশা করা গিয়েছিল ক্ষুধারই জয় হ'ল, কষ্টেরই জয় হ'ল। কয়েক ঘণ্টা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবার পর ও কিছুক্ষণ সময় ভগবানের কাছে এ দারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করবার শক্তি ভিক্ষা করে সে শেষে জনসাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করাই ঠিক করলে। কিন্তু এরকম সঙ্কল্প করা সত্ত্বেও এ অভাগা লোকের অবমাননা এড়াবার চেষ্টা না করে পারলে না। তাই শুধু রাত্রে সরাসরি ভিক্ষা না চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতে লাগল। গান গাইবার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর তার ছিল ও সঙ্গীতকলা খুব ভাল রকম সে জানত; কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কেউ না থাকায় সে পদে পদে অসুবিধা বোধ করতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত অন্য এক হতভাগা—যার নিজের অবস্থা থুয়ানের মত অতটা খারাপ ছিল না—দয়াপরবশ হয়ে তাকে একটা পুরাতন ভাঙ্গা 'গিটার' যোগাড় করে দিল। থুয়ান্ এটাকে তার সাধ্যমত ঠিক করে নিলে ও অনেক চোখের জল ফেলবার পর ডিসেম্বর মাসের এক রাত্রে এটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

* কোয়ার্তো—তাম্র-মুদ্রাবিশেষ

যখন শহরের একটা বড় রাস্তায় এসে গান গাইবে বলে ঠিক করল তখন ভয়ে তার পা দুটো কাঁপতে লাগল ও তার হৃদপিণ্ডটা জোরে ধক্ ধক্ করে তার বুকে আঘাত করতে লাগল। তাই সে গান গাইতে পারলে না। লজ্জা ও কষ্ট জড়িয়ে গিয়ে যেন গ্রন্থি পাকিয়ে তার গলায় আটকে রইল। একটা বাড়ীর দেওয়ালে হতাশ হয়ে হেলান দিয়ে বসল ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে একটু তাজা হয়ে 'লা কাজেরিত' অপেরার প্রথম দৃশ্যের 'টেনর'-গায়কের গান গাইতে সুরু করলে। তার এই গান শোনামাত্রেই রাস্তার লোকেদের চিত্ত তার প্রতি আকর্ষিত হ'ল, কারণ এটা তাদের অসাধারণ বলে মনে হ'ল যে এক অন্ধ গ্রাম্যসঙ্গীত না গেয়ে এত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ঠিক ভাবে গেয়ে যেতে পারছে। তারা তার চার ধারে ঘিরে দাঁড়াল ও তাদের বিস্ময় মৃদুস্বরে জানিয়ে তার হাতে ঝোলানো টুপীতে দু-চার কোয়ার্তো দিলে। এগানটা গাওয়া শেষ হ'লে সে 'লা আফ্রিকানা' অপেরার চতুর্থ দৃশ্যের একটা গান গাইতে আরম্ভ করলে, ফলে অনেক লোক তার চারধারে এসে জমা হতে লাগল। এটা একটা গোলমালের কারণ হতে পারে আশঙ্কা ক'রে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় এত লোকের ভিড়কে 'সামাজিক শৃঙ্খলা' বিরোধী ও 'দেশের নিরাপত্তা' বিরোধী কাজ বলে মনে করলেন। তাই একজন পুলিস থুয়ানের হাত চেপে ধরে তাকে বললে,—

—দেখুন, আপনি এখনই নিজের বাড়ী ফিরে যান।—

—কিন্তু আমি ত কারু কিছু অনিষ্ট করছি না।—থুয়ান্ বললে।

—আপনি যে রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছেন তাই; যান্! সরে পড়ুন! যদি হাজতে আটক না থাকতে চান।—

থুয়ান এখন তার "থাউর্দাতে"* ফিরতে বাধ্য হ'ল ও বিষণ্ণচিত্তে ভাবলে যে সত্যই হয়ত সে রাস্তায় এভাবে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে আভ্যন্তরীণ শান্তি কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট করেছে ও তাই কর্ত্তৃপক্ষের লোক মধ্যস্থ হতে বাধ্য হয়েছে।—সে অত্যন্ত সাদাসিধে ও সরল প্রকৃতির ছিল।

রাস্তার গান গাওয়ায় সে মাত্র পাঁচটি "রেয়াল" ও একটা "পেরয়ো গ্রান্দে"† ভিক্ষাস্বরূপ পেয়েছিল। এই টাকাটা নিয়ে তার পরের দিন সে কিছু কিনে খেলে ও যে খড়ের বিছানাটার উপর সে শুত—তার ভাড়া দিলে।

রাত্রে পুনরায় সে রাস্তায় কিছু উপার্জ্জনের জন্য বের হ'ল ও অপেরার সঙ্গীতাংশ গাইতে আরম্ভ করলে। পুনরায় দলে দলে লোকেরা তার চারপাশে এসে জমা হতে লাগল। তাই পুনরায় কর্ত্তৃপক্ষের লোক বাধা দিতে এল ও চেঁচিয়ে তাকে বললে—রাস্তায় দাঁড়িও না! এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও!—

কিন্তু থুয়ান্ যদি না দাঁড়ায় ত একটা "কুয়ার্তো"ও (কপর্দ্দক) তার উপার্জ্জন হয় না, কারণ তাহলে পথিকরা কেউ ভাল ক'রে

* Zahurda—আস্তাবল বা খুব ছোট ঘর

† Perro Grande—১০ সেনতিমস্ (এক রকম রৌপ্যমুদ্রা।)

চায় গান শুনতে পায় না। যা হোক, বেচারী খুয়ান্ শেষ পর্য্যন্ত কি আর করে তাই এগিয়ে যেতে লাগল; কারণ কর্তৃপক্ষের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে অল্প সময়ের জন্যও দেশের শৃঙ্খলা নষ্ট করতে সে সাংঘাতিক ভয় পেত।

প্রত্যেক রাত্রে বাড়ী ফিরে খুয়ান্ দেখে যে তার উপার্জ্জনের টাকা কমে আসছে, কারণ প্রথমতঃ তাকে বাধ্য হয়ে সর্ব্বদাই এগিয়ে যেতে হয়, রাস্তায় কোথাও দাঁড়াতে পায় না; দ্বিতীয়তঃ, পয়সা খরচ না করলে তার ভায়ের খবরও পাওয়া যায় না। সেজন্য প্রত্যেক দিন তার কিছু-কিছু ছেনটিমস্* কমতে লাগল। যৎসামান্য নিয়ে বাড়ী ফেরে তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। এরই মধ্যে তার অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। তবে এই দুঃখকষ্টের অন্ধকারে শুধু একটা উজ্জ্বল রেখা সে দেখতে পেল ও সেটাকে নাছোড়বান্দার মত ধরে রইল; এই উজ্জ্বল রেখাটা ছিল তার ভায়ের প্রত্যাগমনের আশা। প্রত্যেক রাত্রে যখন "গিটারটা" গলায় ঝুলিয়ে বাড়ী ফেরে সেই একই চিন্তা তার মনে উদয় হয়—যদি আন্তিয়াগো মাদ্রিদে থাকে ও আমায় রাস্তায় গান গাইতে শোনে তাহলে নিশ্চয় সে আমার কণ্ঠস্বর থেকে আমায় চিনতে পারবে।—এই একটা আশা বা আরও ভাল করে বলতে গেলে এই একটা অলীক কল্পনা নিয়ে সে তার দুঃখময় জীবনের ভারী বোঝাটা বইবার শক্তি পেয়েছিল; কিন্তু এক দিন তার কষ্টের ও চিন্তার সীমা রইল না, কারণ আগের রাত্রে ঘুরেফিরে বিশেষ কিছুই উপার্জ্জন করতে পারে নি—মাত্র ছয়টি "কোয়ার্তো" (কপর্দ্দক) ছাড়া। কি ভয়ানক ঠাণ্ডাই না পড়ল! সে দিন সকালাবলায় মনে হ'ল যেন মাদ্রিদ সাদা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। সমস্ত দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও না থেমে তুষারপাত হতেই থাকে, তবে এর জন্য বেশীর ভাগ লোকই মাথা ঘামাল না। যারা সৌন্দর্য্যের পূজারী তাদের এতে আনন্দই হ'ল; বিশেষ ক'রে কবিরা—যাঁরা ভাবনাচিন্তাবিহীন অবস্থায় থেকে আনন্দ উপভোগ ক'রছিলেন—নিজেদের ঘরের সার্শির ভিতর দিয়ে দিনের বেশীরভাগ সময়টাই তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য দেখতে লাগলেন ও সুন্দর মজার উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগ করে কাব্য রচনা করতে লাগলেন; সে সব শুনলে বোধ হয় থিয়েটারে লোকেরা ব্রাভো! ব্রাভো! বলে চেঁচিয়ে উঠত বা যদি কেউ এ সব কোনও কাব্য-গ্রন্থে পড়ে ত নিজের মনে মনে আনন্দ প্রকাশ করে বোধ হয় বলে উঠবে:—"কে তালেন্তো তিয়েনে এসতে খোভেন্" (এই যুবক কবির কাব্য রচনায় কি অসামান্য নিপুণতা!)

খুয়ান্ শুধু এক পেয়ালা খুব খারাপ রকমের কফি পান করলে ও একটা ছোট রুটি খেলে। তুষারপাতের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ক্ষুধার জ্বালাটা যে ভোলে তার উপায় নাই। কারণ তার দৃষ্টিশক্তি নাই, যদি বা তা থাকত তা হলেও তার চিলেকোঠার অপরিষ্কার ও বন্ধ কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে পেত কি না সন্দেহ। তাই সে আর কি করে! সমস্ত দিনটাই হাত পা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে তার খড়ের বিছানাটার উপর শুয়ে ছেলেবেলাকার কথা ভাবতে লাগল ও তার ভায়ের প্রত্যাগমনের অলীক কল্পনায় মগ্ন হয়ে রইল। রাত হতেই অভাবের পীড়নে সে কিছু ভিক্ষা করতে রাস্তায় পুনরায় বের হ'ল। এবার কিন্তু তার আর "গিটারটা" সঙ্গে নেই, কারণ সেটা অভাবের তাড়নায় মাত্র তিন পেসেতো (মুদ্রাবিশেষ) দিয়ে বেচে ফেলেছিল।

তুষার এক ভাবেই পড়ে চলেছে; বলা যেতে পারে যেন এই দরিদ্র অন্ধের ওপর তুষারের আক্রোশ এখনও পর্য্যন্ত কিছু মাত্র কমল না। বেচারীর পা দুটো কাঁপতে লাগল, কিন্তু এবার লজ্জায় নয়,—ঠাণ্ডায় ও ক্ষুধায়। এ অবস্থায় যতটা পারলে ধীরে ধীরে কর্দ্দমময় রাস্তা দিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে পায়ের গোড়ালির উপর পর্য্যন্ত কাদায় ঢুকে যাচ্ছিল। সে তার প্রবল অনুভবশক্তি দিয়ে বুঝতে পারলে যে কোনও পথিক এখন আর রাস্তায় চলচে না; শুধু গাড়ীগুলো নিঃশব্দে বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। এক বার সে প্রায় চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। একটা বড় রাস্তায় এসে একটা অপেরার প্রথম দৃশ্যের সঙ্গীতাংশ গাইতে আরম্ভ করলে; কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ায় তার কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও ক্ষীণ, তাই কেউ আর তার কাছে গান শুনতে এল না—এমন কি এক বার কৌতূহল-বশতও নয়।

—অন্যত্র যাওয়া যাক্।—সে নিজের মনে মনে বললে এবং 'কারবেরা দে সান্ খেরোনিমো'* দিয়ে শ্রান্ত ভারী পায়ে যেতে লাগল। তুষারের সাদা পাতলা পর্দ্দায় তার পা ঢেকে গেল। হাঁটতে গিয়ে পা দুটো যখন তোলে তখন টস্‌ টস্‌ করে ঠাণ্ডা জল ঝরে পড়ে। এখন তার মনে হ'ল যেন ঠাণ্ডাটা শরীরের হাড় পর্য্যন্ত বিঁধছে। ক্ষুধায় পেট জ্বালা করতে লাগল। এক সময় মনে হ'ল যেন যন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট হয়ে সে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে আসছে। ভাবলে বোধ হয় শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে তাই 'ভির্খেন দে লা কারমেনের'† শরণাপন্ন হয়ে করুণ কণ্ঠে বললে—মা, আমায় বাঁচাও!—এ প্রার্থনাটা করবার পর একটু ভাল বোধ করলে ও পুনরায় হাঁটতে হাঁটতে—না, ঠিক ভাবে বলতে গেলে নিজের পা দুটো কোনগতিকে টানতে টানতে, 'লা প্লাথা দে লা কারমেনে' এসে পৌঁছল। এখানে এসে রাস্তার একটা ল্যাম্প-পোষ্টে হেলান দিয়ে বসলে ও লা ভির্খেনের‡ প্রসাদ লাভের আশায় তাঁর উদ্দেশে গুণো রচিত 'আভে মারিয়া' গাইতে আরম্ভ করলে। এ স্তোত্রটি সে খুব ভালবাসত। কিন্তু কেউ তার কাছে এল না। শহরের লোকেরা এ সময় সকলে কাফে বা থিয়েটারে গিয়ে জমা হয়েছে ও যারা

* Centimos—মুদ্রাবিশেষ

* রাস্তার নাম

† ইষ্টদেবী।

‡ মাতা মেরী।

সুখেস্বচ্ছন্দে নিজেদের বাড়ীতে অবস্থান করছিল তারা উত্তপ্ত চিমনির পাশে বসে ছোট ছেলেদের জানুর উপর নাচিয়ে আদর করছিল। আস্তে আস্তে প্রচুর তুষার শুধু পড়েই চলেছে। তার পরের দিন সাংবাদিকেরা নিজেদের সংবাদপত্রে এ তুষার-পাতের সুন্দর বিবরণ বের করে পাঠকদের চিত্ত বিমোহিত করবার চেষ্টা করলে। ছাতা দিয়ে মাথা ঢেকে ও গায়ে বেশ করে জামা এঁটে পথিকেরা মধ্যে মধ্যে দ্রুতবেগে রাস্তা দিয়ে যেতে লাগল। রাস্তার আলোগুলো যেন শুতে যাবার সাদা টুপী মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে চারধারে ক্ষীণ রশ্মি ছড়াচ্ছিল। দূরে গাড়ী চলাচলের মৃদু শব্দ ও হাল্‌কা ও পাতলা রেশমী কাপড়ের খসখসানির মত অবিশ্রাম তুষারপাতের শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। শুধু খুয়ানের কম্পিত কণ্ঠস্বর রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে অসহায়দের ত্রাণকর্ত্রী মাতা মেরীর উদ্দেশে উত্থিত বন্দনা-গানের মত শোনাচ্ছিল। তার এই গানটা সাধারণ স্তুতি-গীতের চেয়ে বেশী কোমল ছিল। এটাকে সময় সময় বিষাদ ও নিরাশাপূর্ণ আর্তনাদ বলে মনে হচ্ছিল, সেটা তুষারের শৈত্যের চেয়ে বেশী শীতল ভাবে মানুষের অন্তঃকরণকে যেন জমিয়ে দিচ্ছিল।

বৃথাই সে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে; বৃথা বার বার মাতা মারিয়ার মিষ্টি নাম উচ্চারণ করলে ও বৃথা এ উচ্চারণটা গানের সুর অনুযায়ী বার বার বদলাতে লাগল। শেষে সে মনে করলে ঈশ্বর ও "লা ভির্খেন" বোধ হয় তার থেকে অনেক দূরে আছেন বলে তার প্রার্থনা তাঁদের কাছে পৌছচ্ছে না। সেখানকার লোকেরা নিকটেই ছিল, কিন্তু কেউ তার প্রতি এক বার কর্ণপাত করলে না, কেউ এক বার এসে তার হাতটা ধরে একটু সাহায্যও করলে না। কোনও বাড়ীর উপরের জানলা থেকে কেউ একটা তাম্রমুদ্রাও ছুঁড়ে ফেলে দিল না। পথিকরা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগল যেন যক্ষ্মারোগীর নিকট থেকে ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছে; কাহারও একটু দাঁড়াবারও সাহস হ'ল না। শেষে সে আর গাইতে পারলে না। তার গলার স্বর গলাতেই মিলিয়ে গেল ও ঠাণ্ডায় তার হাত দুটি যেন অসাড় হয়ে যেতে লাগল। বহু কষ্টে দু-চার পা এগিয়ে "ফুটপাথটার" উপর এল ও একটা বাগানের বেড়ার পাশে এসে বসল। জানুর উপর কনুই দুটো রেখে মাথাটা করতলের মধ্যে পুরল ও কেমন একটা অস্পষ্ট চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বোধ করলে যে তার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে ও তাই পুনরায় ভক্তিভরে ভগবানের করুণা ভিক্ষা ক'রে প্রার্থনা করতে লাগল। কিছু দিন পরে মনে হ'ল যেন এক জন পথিক তার সামনে এসে দাঁড়ালে ও তার হাত দুটো ধরলে। অন্ধ তখন মাথাটা তুললে ও সন্দেহ করলে যে আবার বোধ হয় পুলিস এসেছে তাই সঙ্কোচভরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি পুলিস?

—না, আমি পুলিস নই; আপনি উঠে পড়ুন ত!—পথিক উত্তরে বললে।

—আমি উঠতে পাচ্ছি না যে, মশাই!

—আপনার খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে নয়!

—হ্যাঁ, মশাই···তার উপর আজ কিছু খাই নি।

—আচ্ছা বেশ ত আমি আপনাকে সাহায্য করছি, উঠুন ত!—

ভদ্রলোকটি খুয়ানের হাত দুটো ধরে তাকে তুললেন; ভদ্রলোকের গায়ে যথেষ্ট শক্তি ছিল।

—এখন আপনি আমার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। দেখা যাক্ একটা গাড়ী পাওয়া যায় কিনা।

—কিন্তু আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চান! খুয়ান্ জিজ্ঞাসা করলে।

—কোনও খারাপ জায়গায় নয়। আপনার কি ভয় হচ্ছে!

—না, তা কেন, আমার মন বলে দিচ্ছে যে আপনি একজন ভাল, দয়ালু লোক।

—এখন একটু এগিয়ে যাওয়া যাক ও দেখা যাক তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছান যায় কিনা, যাতে আপনি গাটা পুঁছেই কিছু গরম জিনিস খেতে পারেন।—আগন্তুক বললে।

—ভগবান আপনার বদান্যতার জন্য মঙ্গল করুন! লা ভির্খেন আপনার এই উপকারের জন্য মঙ্গল করুন!···আমি ত মনে করেছিলুম আমি এবার বোধ হয় মারা যাব।—খুয়ান্ বললে।

—মারা যাবার কথা এখন আর বলবেন না। এখন সমস্যা হচ্ছে কি করে একটা গাড়ী পাওয়া যায়। চলুন এগিয়ে।···কি হ'ল? কোনও কিছুতে ঠোক্কর লাগল না কি!

—হ্যাঁ, মশাই। ল্যাম্প-পোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। আমি অন্ধ কিনা।

—কি, আপনি অন্ধ! আগন্তুক একটু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ, মশাই। কতদিন থেকে! যবে থেকে এ পৃথিবীতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।—খুয়ানের মনে হ'ল এ কথাটা শুনে তার রক্ষাকর্ত্তার হাতটা কেঁপে উঠল। তারা উভয়েই এখন নীরবে হেঁটেই চলেছে। শেষে আগন্তুক একটু থেমে গলার স্বরটা একটু চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনার নামটি কি?

আমার নাম খুয়ান্। শুধু খুয়ান্? না, খুয়ান্ মাণ্ডিনেথ। —আচ্ছা, আচ্ছা আপনার পিতার নাম মানুয়েল, কেমন? তিনি কি তৃতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাণ্ডমাষ্টার ছিলেন?

—হ্যাঁ, মশাই।

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই অন্ধের বোধ হ'ল দুটো বলিষ্ঠ হাত তাকে যেন আনন্দে এত জোরে চেপে ধরলে যে সে প্রায় হাঁপিয়ে উঠল ও কানের কাছে যেন একটা কেঁপে-উঠা স্বর বেজে উঠল। হায় ভগবান! কি দুঃখ ও কি সুখ!' ওরে আমি তোর ভাই দুর্বৃত্ত সানটিয়াগো।

এই না বলে দুই ভায়ে গলা জড়াজড়ি ক'রে রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আনন্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তুষার কোমল ভাবে তাদের উপর পড়তে লাগল।

সান্‌টিয়াগো ঝাঁ করে তার ভাইয়ের স্নেহালিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে গাড়ীওয়ালাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে চেঁচাতে লাগল, —গাড়ী! গাড়ী! একটাও গাড়ী কি এ চুলোতে পাবার যো নেই! হা, আমার পোড়াকপাল!···খুয়ান্ ভাইরে, কষ্ট করে আরও একটু এগোবার চেষ্টা কর, তা হলেই আমরা গাড়ী দাঁড়াবার জায়গাটায় এসে পড়ব।···কিন্তু হা অদৃষ্ট আজ গাড়ীগুলো

সব গেল কোথায়! একটাও কি চলতে নেই!…ঐ বুঝি দূরে একটা যাচ্ছে! আঃ ভগবান! পোড়াকপালে গাড়ীটা ত দেখছি চলেই গেল।…আচ্ছা আর একটা আসছে। এটা আর ফস্কাবে না। এটা আমারই হবে। দেখ কোচওয়ান, যদি গাড়ী খুব জোরে চালিয়ে আমাদের "কাস্তেল্লীয়ানাতে" দশ নম্বর হোটেলে পৌঁছে দাও ত পাঁচ দুরো* মিলবে, কেমন?—

অন্ধ ভাইকে ছোট ছেলেটির মত হাত ধরে বুকে করে নিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে নিজে গাড়ীর পিছন দিকটায় উঠে বসল। কোচওয়ান কষে ঘোড়াকে চাবুক মারতে না মারতেই গাড়ী দ্রুতবেগে বরফের উপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে গড়িয়ে যেতে লাগল। গাড়ীতে যেতে যেতে সান্টিয়াগো তার অসহায় অন্ধ ভাইকে—যার হাত সে তখনও ধরে ছিল—তার জীবনের কাহিনী তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগল। কুভাতে নয় কস্তারিকাতে সে এত দিন ছিল ও সেখানেই প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিল। বহু দিন ইয়ুরোপ থেকে কোনও খবর না পেয়ে সে প্রবাসে এ-ভাবে কাটায়; তবে সে তিন-চার বার ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য-জাহাজ মারফৎ নিজের দেশে চিঠি পাঠায় কিন্তু কোনও উত্তর কখনও পায় নি। সর্ব্বদাই সে ভাবত আসছে বছর দেশে ফেরা যাবে, তাই আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে না আছে বৃথা খোঁজ না ক'রে একেবারে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত করে দেবে বলে ঠিক করেছিল। কিছুদিন পরে সে বিয়ে করে। এটাই তার বাড়ি ফিরতে এত বিলম্ব হবার কারণ। মাত্র চার মাস সে মাদ্রিদে এসেছে ও স্থানীয় গির্জ্জায় মৃত্যু-তালিকা দেখে জানতে পারে যে, তার বাপ মারা গেছেন; খুয়ানের সম্বন্ধে সে শুধু গোলমেলে খবর পেয়েছিল, কেউ কেউ বলেছিল যে সে-ও মারা গেছে, আবার কেউ কেউ বলেছিল সে অত্যন্ত দুর্দ্দশায় পড়ে একটা গিটার হাতে নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুয়ানের আবাস-স্থলের কথা জানবার জন্য তার সব চেষ্টাই বৃথা হয়েছিল। শেষকালে সৌভাগ্যবশতঃ স্বয়ং ঈশ্বরই খুয়ানকে তার হাতে তুলে দিলেন। এ সব বলতে বলতে কখনও সান্টিয়াগো হাসে আবার কখনও কাঁদে। সর্ব্বক্ষণই ছেলেবেলায় সে যেমন আমুদে, স্নেহময় ও করুণহৃদয় ছিল, ঠিক সেই ভাবই দেখালে।

গাড়ীটা শেষ পর্য্যন্ত এসে থামল। থামতে না থামতেই একটা চাকর ছুটে গাড়ীর দরজাটা খুলতে এল। গাড়ীটা ঠিক যেন বাতাসের মত দ্রুতগতিতে এসে তাদের একেবারে বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলে। বাড়িতে ঢোকামাত্রই খুয়ান্ উষ্ণতার স্পর্শলাভ করলে ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের পরিচয় পেলে। ঘরে দাঁড়াতেই সুন্দর নরম কার্পেটে তার পা যেন ঢুকে গেল। সান্টিয়াগোর হুকুম পাবামাত্রই দু'জন চাকর তার ছেঁড়া অপরিষ্কার ও সপ্‌সপে ভিজে পোষাকটা খুলে ফেলে তাকে পরিষ্কার ভাল গরম জামা পরিয়ে দিলে। সেই ঘরেই অল্প আগুন প্রজ্বলিত ছিল। সেখানেই তাকে খাওয়াবার ব্যবস্থা হ'ল। প্রথমে তাকে শুধু গরম গরম বলকারক ঝোল দেওয়া হ'ল ও তারপর খুব সতর্কতার সহিত যাতে তার পেটের কোনও অনিষ্ট না হয়, সেইজন্য দেওয়া হ'ল অন্যান্য লঘুপাক খাদ্যদ্রব্য। এ সব খাওয়া শেষ হ'লে সান্টিয়াগো তার জন্য দোকান থেকে খুব ভাল পুরান মদ আনিয়ে দিলে। সান্টিয়াগো এক বারও স্থির হয়ে না বসে চাকরদের খালি হুকুম চালাতে লাগল যাতে তার ভাইয়ের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। উপরন্তু নিজে প্রত্যেক বার তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—এখন কেমন মনে হচ্ছে খুয়ান্? আরও অন্য কোনও ভাল মদ কি আনিয়ে দেব? আরও জামা গায়ে দেওয়া দরকার মনে হচ্ছে কি?"—খাওয়াটা শেষ হ'লে দুই ভায়ে কিছুক্ষণ চিমনির গনগনে আগুনের পাশে বসল। সান্টিয়াগো তার চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, বাড়ির গিন্নি ও ছেলেমেয়েরা এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে কি না। চাকর যখন 'হ্যাঁ' ব'লে উত্তর দিলে সে আনন্দে আকুল হয়ে তার ভাইকে বললে:—আচ্ছা, তুই পিয়ানো বাজাতে পারিস কি?—হ্যাঁ, তা পারি বইকি—খুয়ান্ বললে।—বেশ তা হ'লে মজা ক'রে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের একটু ভয় দেখানো যাক আর আয় ভাই এখন "সালনে" গিয়ে বসা যাক।—এই বলে সান্টিয়াগো খুয়ানকে "সালনে"র পিয়ানোটার সামনে বসিয়ে দিলে; তারপর যাতে আওয়াজটা ভাল রকম শুনা যায় সেজন্যে পিয়ানোর পর্দ্দার উপরকার ঢাকনিটা খুলে দিলে ও পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘরের দরজা, জানালা খুলে দিলে, আরও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করলে যাতে বাড়িতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার সৃষ্টি হয়।

অন্ধ একটা যুদ্ধযাত্রা-সঙ্গীত পিয়ানোতে বাজাতে আরম্ভ করলে, সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটা বাজনার শব্দে কেঁপে উঠল। মনে হ'ল যেন "কাখা দে মুসিকা"তে* দম দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গীতের সুর জোড়ে পিয়ানো থেকে বের হতে লাগল ও সান্টিয়াগো মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—আরও জোরে, প্রিয় হুন্ আরও জোরে! অন্ধও এ কথা শুনে প্রত্যেক বার পরদাগুলো জোরে টিপে যায়।

—"এবার আমি আমার স্ত্রীকে মশারির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি… আরও বাজিয়ে যা ভাই, আরও! বেচারি সে! শুধু একটা কামিজ পরে রয়েছে…হি-হি!…আমি এখন এমন ভাব দেখাব যেন তাকে দেখতেই পাই নি…হি-হি!…বাজিয়ে যা ভাই, শুধু বাজিয়ে যা! সে বোধ হয় মনে করবে, আমি পাগল হয়ে গেছি।" খুয়ান্ তার ভাইয়ের কথামত কাজ করতে লাগল বটে, কিন্তু এখন আর সে এতে তত আনন্দ পায় না কারণ এখন তার বৌদির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্যে আর তার ভাইপো-ভাইঝিদের চুমু খাবার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। "এবার আমি আমার মেয়ে মানোলিতাকে দেখতে পাচ্ছি, একবার চেয়ে দেখ্! সেও কেমন কামিজ গায়ে মশারি থেকে বের হচ্ছে… আবার পাকিতোও উঠে পড়েছে…তোকে ত আমি বলেছিলুম ওরা সকলে ভয় পাবে ও অবাক হয়ে যাবে; কিন্তু ওরা যদি আর বেশীক্ষণ শুধু কামিজ গায়ে থাকে ত ওদের ঠাণ্ডা লাগবে …সুতরাং আর বাজাস নে ভাই, যথেষ্ট হয়েছে!—বাজনার সোরগোলটা এবার থামল।—আদেলা, মানোলিতা, পাকিতো! তোরা এবার গায়ে জামাটামা এঁটে আমার ভাই খুয়ানকে

Duro—স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ

* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ

জড়িয়ে ধর। এই হচ্ছে খুয়ান্ যার কথা তোদের কাছে কত বার বলেছি; আমি তাকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি, যখন সে প্রায় বরফে জমে যাচ্ছিল···এখন তোরা যা আর শীগ্‌গির কিছু গরম জামা-কাপড় গায়ে দিয়ে আয়!—সান্‌টিয়াগোর কথা শেষ হতেই অভিজাতবংশীয়া তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে দরিদ্র অন্ধকে নিবিড় স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করল। সান্‌টিয়াগোর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কি মধুর ও পরিষ্কার, মনে হ'ল যেন স্বয়ং মাতা মেরী, খুয়ানের সহিত কথা বললেন। সে আরও লক্ষ্য করলে যখন সান্‌টিয়াগো তাঁকে খুয়ানকে ফিরে পাওয়ার গল্পটা বললে তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন, তিনি নিজেও তাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগলেন। একটা পা ঢাকা দেবার গরম চাদর আনিয়ে নিজেই খুয়ানের পায়ের উপর সেটা চাপিয়ে দিলেন, তারপর তার মাথায় একটা ভেলভেটের টুপী পরিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েরা খুয়ানের চারপাশে আনন্দে নাচতে আরম্ভ করলে—শুধু তাই নয়, তাকে তারা আদর করতে লাগল আর নিজেরা তার কাছে আদর কাড়তে লাগল।

সকলে চুপ ক'রে বসে মনের আবেগে খুয়ানের দুঃখকষ্টের বিবরণ সান্‌টিয়াগোর কাছে শুনতে লাগল এ সব বলতে বলতে সান্‌টিয়াগো মধ্যে মধ্যে ক্ষোভে মাথাটা চাপড়াতে থাকে, শুনতে শুনতে তার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে কেঁদে উঠেন ছোট ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে খুয়ানের হাতটা চেপে ধরে বললে এবার কিন্তু তোমায় আর খিদের কষ্ট পেতে দেব না, কাকু! আর রাস্তায় ছাতা মাথায় না দিয়ে বেরুতে দেব না, কেমন? আমার ইচ্ছে হয় না··· মানোলিতাও চায় না যে তুমি আর···"কেউ চায় না, না বাবা, না মা।" "তুই তোর বিছানায় তোর কাকুকে বোধ হয় শুতে দিবি না, কেমন পাকিতো?"—সান্‌টিয়াগো দুঃখের কথা বলতে বলতেও ভাইকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তার ছোট ছেলের সঙ্গে ঝাঁ করে ঠাট্টা-তামাশা করে নিলে। "আমার বিছানাটা যে বড্ড ছোট্ট, ওতে কি করে ধরবে বাবা! বড় ঘরটায় একটা খুব, খু—ব বড় বিছানা আছে"···"এখন বিছানার কোনও দরকার বোধ করছি না"—খুয়ান্ কথার মাঝখানে বললে, "আমার ত এখানে এত আরাম বোধ হচ্ছে যে তা আর বলবার নয়!" "কাকু, তোমার পেটে এখন আগেকার মতন কষ্ট হচ্ছে কি?"—মানোলিতা তার হাতটা ধরে ও তাকে চুমু খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে।—"না না, মোটেই নয়! আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও!—এখন আমি খুব সুখী···শুধু যা আমার এখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তাই আর বসতে পাচ্ছি না।"—"তাহলে ভাই তুই আর আমাদের জন্যে না বসে এখনই শুয়ে পড়।"—সান্‌টিয়াগো বললে।

"হ্যাঁ, কাকু একটু ঘুমোও, একটু ঘুমোও!"—মানোলিতা আর পাকিতো তার গলাটা জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললে।

সত্য সত্যই সে ঘুমিয়ে পড়ল। এ ঘুম থেকে জাগল একেবারে স্বর্গে গিয়ে। তার পরের দিন সকালবেলায় একজন পুলিশ তার মৃতদেহটা তুষারের মধ্যে দেখতে পেলে। শব পরীক্ষা করে মর্গের ডাক্তার বললে যে ঠাণ্ডায় রক্ত জমে ছেলেটি মারা গেছে।

—দেখ, খমেনেথ—শববহনকারী পুলিশদের মধ্যে একজন তার বন্ধুকে বললে,—"মনে হচ্ছে যেন ছেলেটির মুখে হাসি ফুটে রয়েছে!"

---

* সুপ্রসিদ্ধ স্পেনিশ লেখক পালাথিও ভালদেস্ রচিত গল্প "Un Pajaro on la Nierce" হইতে অনুবাদিত

মণিপুরের নাগা-সম্প্রদায়

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আট-নয় বছর আগে ডিমাপুর থেকে মোটরে ইম্ফল যাবার পথে কোহিমাতে প্রথম নাগাদের দেখতে পাই। কোহিমার নাগারা আঙ্গামী নাগা নামে পরিচিত। নাগা পাহাড়ে আঙ্গামী ছাড়া আও, লোটা, রেঙ্‌মা, সেমা ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর নাগারা বাস করে। হাটন আর মিল্‌স সাহেব এদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করে কতকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন।

নাগাপাহাড়ের সীমা ছাড়িয়ে মণিপুরের মাও নামক স্থানে আমাদের মোটরখানা এসে থামল। রাস্তার পাশে একটা ছোট টিলার উপরিস্থিত কতকগুলো প্রস্তরস্তম্ভ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ডিমাপুরের নাম্‌বার জঙ্গলেও এ ধরণের একশিলাস্তম্ভ (monolith) দেখে এসেছি। তা ছাড়া খাসীয়া প্রভৃতি আসামের নানা আদিম জাতির সাহচর্য্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় এ ধরণের প্রস্তরস্তম্ভের সহিত আমি বিশেষভাবেই পরিচিত।* স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, মাও গ্রামের এই প্রস্তরস্তম্ভগুলোও মৃতের উদ্দেশে নির্ম্মিত আদিম জাতির স্মৃতি-স্তম্ভ। কতকগুলো পাহাড়ী স্মৃতিস্তম্ভগুলোর পাশে বসে বিশ্রাম করছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, এরা মণিপুরের নাগা-সম্প্রদায়ের

---

* আসামের ডিমাপুর এবং অন্যান্য স্থানে আদিম অধিবাসীদের নির্ম্মিত 'মনোলিথ'গুলো সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লেখকের 'বড জাতি' (প্রবাসী পৌষ, ১৩৪০) নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

অন্তর্ভুক্ত এবং মাও নাগা নামে পরিচিত। এরা বেশ দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সুগঠিত অবয়ব-বিশিষ্ট। মেয়েরা অবশ্য পুরুষদের চেয়ে বেঁটে কিন্তু তাদেরও দেহের বাঁধন খুব শক্ত এবং পেশীবহুল।



নৃত্যের পোষাকে সজ্জিত কাবুই নাগা

ইম্ফলে অবস্থানকালে সেখানকার 'সেনা কাইথেল' নামক নারীদের বাজারে বেড়াতে গেলেই বিভিন্ন শ্রেণীর নাগাদের বিপুল ভিড় নজরে পড়ত। তন্মধ্যে কতকগুলো উলঙ্গপ্রায়, বিচিত্র তাদের গয়নাগাঁটি আর শিরোভূষণ, কেশবিন্যাসেরই বা কত রকমারি। মণিপুর রাজ্যের পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলোতেই প্রধানতঃ এদের বাস, সওদা করবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নেমে আসত ইম্ফলের উপত্যকা-ভূমিতে। এরা মাও, টাংখুল, মারাম, কলিয়া, খইরাও, কাবুই, কুইরেং, চিরু, মারিং ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।*

অর্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ গ্রিমউড্ ও তাঁর পত্নী যে-পথ দিয়ে শিলচর থেকে মণিপুরে গিয়েছিলেন, এবারকার যুদ্ধের কল্যাণে তা প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এটি হচ্ছে বিষেণপুর-শিলচর রাস্তা। তখন কোহিমা-ডিমাপুর মোটর-রাস্তা খোলা হয় নি। পূর্ব্বোক্ত রাস্তাটিই ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে মণিপুরের একমাত্র যোগসূত্র। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জ্জন



কাবুই বালিকাবৃন্দ

যখন ইম্ফল পরিদর্শন করতে যান, তখন এই রাস্তা দিয়েই একখানা ডুলিতে করে তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল*। তখনকার দিনে এ পথে যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। পথের উভয় পার্শ্বে পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলোতে ছিল সভ্য-জগতের সংস্রব থেকে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন নাগাদের বাস। এ রাস্তা† দিয়ে যাবার কালেই মিসেস্ গ্রিমউড টাংখুল, কাবুই প্রভৃতি মণিপুরের নাগাদের সংস্পর্শে আসেন। মিসেস্ গ্রিমউডের 'মাই থ্রি ইয়ার্স ইন্ মণিপুর' নামক পুস্তকে এদের সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

---

* এদের বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির বর্ণনা লেখকের 'মণিপুর প্রবাসে' (প্রবাসী চৈত্র, ১৩৪২) নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

* *Amrita Bazar*, April 25, 1944.

† ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল জি. পি. চ্যাপম্যান এই দুর্গম রাস্তাটিকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য-চলাচল এবং সমরোপকরণ সরবরাহের উপযোগী করবার জন্যে এর সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিন মাস ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার পর তাঁর সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয়। এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন মণিপুরের নাগাদের সহায়তায়। এ সম্বন্ধে গত এপ্রিল মাসে প্রকাশিত তাঁর *The Lampi* নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন—

"And the Nagas?.....They are funny little men, but they did build The Road."

The Lampi, p. VI.

শিলচর থেকে রওনা হয়ে ২৪ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে গ্রিমউড্ দম্পতি জিরি নদীর পাড়ে এসে পৌঁছেন। এখান থেকে মণিপুর রাজ্যের সীমানা আরম্ভ। নিবিড় অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাঁদের ইম্ফল অভিমুখে অগ্রসর হতে হয়। মোটঘাট বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে টাংখুল, কাবুই প্রভৃতি নাগাদের তাঁরা নিযুক্ত করেন। এই উলঙ্গ-প্রায় নাগাদের চেহারায় হিংস্রতার ছাপ মিসেস্ গ্রিমউডের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করে।



যোদ্ধ্ বেশে মাও নাগা

মিসেস গ্রিমউডের পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে মণিপুরী নাগাদের সম্বন্ধে কিছু-কিছু বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু এদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট, রয়েল য়্যান্থ্রপলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের 'ফেলো' টি. সি. হড্‌সনের *The Nāga Tribes of Manipur* নামক পুস্তকে। তিনি বহুকাল মণিপুরে ছিলেন। পুস্তকখানা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন এবং প্রচুর গবেষণার ফল।

মণিপুরের নাগাদের প্রায় সকলেরই নাক চ্যাপ্টা এবং চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। এদের মুখে গোঁফদাড়ি বিরল। দু-এক জনের যাও দু-এক গাছি গজায় মেয়েদের পছন্দসই নয় বলে তাও তারা টেনে তুলে ফেলে।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোঝা বহন করতে পারে। মণ দেড়েক বোঝা পিঠে করে অবলীলাক্রমে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করা নাগা মেয়েদের পক্ষেও কঠিন নয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই যেন স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে উপ্‌চে পড়ছে। সেই জন্যেই এদের জীবনে আনন্দের অভাব নেই। এদের সম্মিলিত উচ্চহাস্যে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত নিভৃত আবাসগুলো নিত্য মুখরিত। মেয়েরা হাস্যমুখে সংসারের সকল বোঝা বহন করে। এদের সমাজে নারীদের প্রতি কোন রকম অত্যাচারের কথা শোনা যায় না।

ভাত পচিয়ে এরা এক রকম মদ তৈয়ার করে, তাকে এরা বলে 'জু'। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে গ্রামগুলোতে প্রচুর পরিমাণে এই ধান্যেশ্বরীর সদ্ব্যবহার হয়। মদ যত কড়া হয় তাদের আনন্দের মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পায়। কুকুর পুড়িয়ে এই 'জু' দিয়ে ভিজিয়ে খাওয়া এদের নিকট অমৃতাস্বাদনবৎ। যেদিন এরা কুকুর খাবার সংকল্প করে তার আগের দিন সেটাকে একদম উপোসী রেখে দেয়। পরদিন হত্যা করবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাকে একেবারে পেট ঠেসে ভাত খাওয়ায়। তার পর সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে ভাতে-মাংসে চট্‌কে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে।†

মণিপুরের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগাদের মধ্যে পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য আছে। ক্ষেতে কাজ করবার সময় টাংখুল মেয়েরা নীল কাপড়ে তৈরি ছোট টুপী মাথায় পরে। মাও পুরুষেরা পরবাদি উপলক্ষে যোদ্ধবেশে সজ্জিত হয়। মাথায় পরে তারা বাঘের চামড়ায় মোড়া বেতের টুপী, তার সুমুখের দিকে থাকে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা হরিণের শিং। কাবুই প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ের নাগাদের লজ্জা-সরমের বালাই নেই বললেই চলে। পুরুষরা তো উলঙ্গপ্রায়। এদের সম্বন্ধে মিসেস্ গ্রিমউড ভারি একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর উদ্যান-পরিচর্য্যার জন্যে মিসেস্ গ্রিমউড্ কয়েকজন নাগাকে মালী হিসাবে নিযুক্ত

† Mrs. Grimwood: *My Three Years in Manipur.*

করেন। এরা সারাক্ষণ প্রায় দিগম্বর অবস্থাতেই থাকত। মিসেস্ গ্রিমউড্ তার এক কুমারী বান্ধবীর নিকট এ-কথা উল্লেখ করেন। সেই ভদ্রমহিলা এই নির্লজ্জ বর্ব্বরতার কথা শুনে একেবারে আঁৎকে উঠেন এবং এদের সভ্য বানাবার উদ্দেশ্যে নয় জোড়া স্নানের পোষাক পাঠিয়ে দেন। মিসেস্ গ্রিমউড্ পোষাকগুলো মালীদের দিয়ে দিলেন। তারা ত পেয়ে মহাখুশী। পরদিন বিকালে বাগানে বেড়াতে গিয়ে শ্রীমতী দেখেন দু'জন নাগাপুঙ্গব বাগানে কাজ করছে। একজন তার দেওয়া পোষাকে মস্ত বড় একটা ফুটো করে তার ভেতর দিয়ে মাথাটি গলিয়ে সেটা জামার মত গায়ে দিয়ে বসে আছে, দেহের নিম্নার্দ্ধ যথাপূর্ব্বং। কিন্তু চেহারায় বেশ একটা গর্ব্বের ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পোষাকটি দিয়ে মাথায় আচ্ছা ক'রে পাগড়ি জড়িয়ে নিয়েছে। এর পর অবশ্য মিসেস্ গ্রিমউড্ বা তাঁর বান্ধবী এদের শ্লীলতা শেখাবার চেষ্টা আর করেন নি।

এই সমস্ত জঙ্গলীরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে রকম ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। ইম্ফলের বাজারে সওদা করতে এরা দলে দলে নেমে আসে। এদের সামনের দিকে, কোমরে বাঁধা সুতোর সাহায্যে একটি নেংটি ঝুলানো থাকে পশ্চাদ্‌ভাগ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত। বর্শা, দা, তীর, ধনু ইত্যাদি এদের প্রধান হাতিয়ার, টাংখুলদের বর্শাগুলো সুদীর্ঘ এবং দুধারী। দা নাগাদের প্রধান এবং নিত্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, এগুলোর হাতল সাধারণতঃ বাঁশ গাছের মূল দিয়ে তৈরি। দা ছাড়া এই সমস্ত পাহাড়ীদের জীবনযাত্রা অচল। দা দিয়ে তারা শস্যকর্ত্তন, গৃহাদি নির্ম্মাণ, মেয়েদের তাঁত নির্ম্মাণ ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করে এবং এরই সাহায্যে বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

শোনা যায় যে, দক্ষিণ অঞ্চলের টাংখুলরা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করত। মারিংরা তীরে এক প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষ-নির্য্যাস মাখিয়ে রাখে। এই বিষ এত তীব্র যে, নাগাদের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরে আহত প্রাণীগুলো আধঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এদের ঢালগুলো মোষের চামড়া অথবা খুব ঠাস-বোনা চেরা বেতের তৈরি। তীক্ষ্ণধার বর্শাও এগুলোকে ভেদ করতে পারে না। এগুলো পাখীর পালক দ্বারা ভূষিত এবং ঠিক মাঝখানে একটি চওড়া লাল আঁজি-কাটা চিতাবাঘের চামড়া অথবা কালো বস্ত্রখণ্ডের আবরণী দ্বারা আবৃত। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও এই পাহাড়ীদের অজ্ঞাত নয়।

কৃষিকার্য্যই এই আদিম জাতির লোকদের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। কৃষিকর্ম্মে শাবল, কোদাল এবং দা-ই এদের প্রধান সম্বল, লাঙ্গলের ব্যবহার এদের জানা নেই। তাঁতে বস্ত্র-বয়ন ত নাগা-গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম। মৃৎ-পাত্রাদি নির্ম্মাণ এদের প্রধান কুটীর-শিল্প। অন্যান্য পাহাড়ী জাতির ন্যায় নাগা মেয়েরাও অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী। উদয়াস্ত এদের খাটুনির আর বিরাম নেই।



টাংখুল নাগা

নাগারা জাত-শিকারী। এরা দলবদ্ধ হয়ে শিকারে বেরোয়। সকলে মিলে তাড়া করে বন্য জন্তুগুলোকে জঙ্গলের ভেতর থেকে খোলা জায়গায় নিয়ে এসে তাদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। কুকুরটা যখন জানোয়ার-টাকে কাবু করে ফেলে তখন তাকে বর্শার ঘায়ে অথব গুলি করে হত্যা করে। হান্‌ডাং এবং উখরুল* বস্তির টাংখুলরা শিকারের সময় যে-কুকুরগুলোকে সঙ্গে করে নেয় সেগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। গায়ের রং তাদের কুচকুচে কালো, পাগুলো ধবধবে শাদা। তাদের লোমগুলো সূত্র-গুচ্ছের

* উখরুল ইম্ফলের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে নাগাপাহাড়ের সীমা-রেখার প্রায় নিকটে অবস্থিত। বিগত মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে এখানে জাপানীদের আক্রমণের চাপ বৃদ্ধি পায়।

মত লম্বা লম্বা, ঘাড়ের কাছে সেগুলো আবার ঝুঁটির মত। শিকার ধরবার জন্তে ফাঁদ পেতে রাখবার রেওয়াজও মণিপুরের নাগাদের মধ্যে আছে।

ভাতই অবশ্য এদের প্রধান খাদ্য। তবে এদের এক রকম সর্ব্বভুক বললেই চলে। একমাত্র বিড়াল ছাড়া আর সমস্ত গৃহপালিত পশুর মাংসই এরা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে। বিড়ালের প্রতি এদের ভক্তি কিন্তু অপরিসীম।



মাও নাগা

কোনো কোনো গ্রামে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা দস্তরমত ঘটা করে বিড়ালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। টাংখুলদের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত যে, যদি কেউ বিড়াল বধ করে তাহলে চিরতরে তার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে যাবে। কুকুরের মাংস হচ্ছে এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। ইম্‌ফলের সেনা কাইথেল বাজারে এগুলো প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হয়। তাছাড়া গরু, মহিষ, হাতী, সাপ, ব্যাঙ, কীটপতঙ্গ কিছুই এদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ে না।

খেলাধুলার প্রতিও নাগাদের প্রবল আসক্তি আছে। ছক কেটে 'বাঘে-মানুষে' নামে এক ধরণের ক্রীড়া এদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। টাংখুলদের মধ্যে দড়ি-টানাটানির খুব প্রচলন। এদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। টাংখুলদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে নৃত্যগীত করবার রেওয়াজ আছে। লুহুপা গ্রামের পুরুষদের মধ্যে কেবলমাত্র এক ধরণের যুদ্ধ-নৃত্য প্রচলিত। নাচের সময় মেয়েদের কাজ হচ্ছে পুরুষদের অনবরত মদ জোগানো। নাচের সঙ্গে তালে তালে কাঁসর বাজতে থাকে। উখরুল গ্রামে কেবল মাত্র বালিকাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাচের প্রচলন আছে, তা প্রায় মণিপুরী 'খুবাই-সাই-সাক্‌পা' নৃত্যের অনুরূপ। এদের মধ্যে কাবুইদের নৃত্য হচ্ছে সকলের সেরা। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চলতে থাকে ঢাকের বাদ্য আর কর্ণপটহভেদী সঙ্গীত। এদের নৃত্যের পোষাকও জমকালো। পরনে কোমরে জড়ানো লাল বস্ত্রখণ্ড, মাথায় চকচকে ধাতব শিরোভূষণ আর দীর্ঘ পাখীর পালক। নাচিয়েদের প্রত্যেকেরই দু'কানে দুটো করে বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতির পাখা আটকানো থাকে। নাচের সময় এদের হাতে থাকে কারুকার্য্য করা হাতল-ওয়ালা দা, সময় সময় বর্শা হস্তেও এরা নৃত্য করে। মেয়েদের মধ্যে কেবল কুমারীরাই নৃত্যে যোগদান করতে পারে। নৃত্য সুরু করবার আগে তরুণ-তরুণীরা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যায়। তার পর সকলে মিলে গান গাইতে গাইতে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। মেয়েদের হাতে থাকে এক একটি করে বংশখণ্ড, ঢাকের বাজনার তালে তালে তারা সেগুলো দিয়ে মাটির ওপর ঘা মারতে থাকে। নাচ খুব ধীরে ধীরে সুরু হয়ে তারপর চলতে থাকে দ্রুততালে। নাচ শেষ হবার আগে দুটি মেয়ে বৃত্তের ভেতরে জোড় বেঁধে নৃত্য আরম্ভ করে। প্রায় পাঁচ-ছয় রকমের নাচ এদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কুমারী অবস্থায় নাগা মেয়েদের যৌন ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। টাংখুলদের মধ্যে শস্য-বপনাদি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত পরব অনুষ্ঠিত হয় তাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে দড়ি-টানাটানির প্রতিযোগিতা হয়। এ সময় তাদের সংযমের বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। এদের সমাজের যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। অনেক সময় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হলে এরা নিজেরাই নিজেদের বিবাহ স্থির করে। অবশ্য বৃদ্ধা ঘটকীদের মধ্যস্থতায় বিয়ের কথাবার্ত্তা চালানোই এদের সাধারণ প্রথা। এদের সমাজে বরকে কন্যাপণ দিতে হয়। আগেকার দিনে কাবুইদের সমাজে সাতটা মোষ, দুটো দা, দুটো বর্শা, কর্ণভূষণ ইত্যাদি কন্যাপণের বায়নাক্কা ছিল বিস্তর। আজকাল একশো ঝুড়ি চাল, একটা দা, কোদাল এবং কনের বাপমাকে পরনের কাপড় দিলেই বর কনেকে কিনে নিয়ে আসতে পারে। বিবাহ-উৎসবের সময় কন্যা-পক্ষের লোকেরা বরপক্ষের কুমারদের সঙ্গে কুস্তি-প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল থেকে বর-কন্যার মধ্যে কে দীর্ঘজীবী হবে তা স্থিরীকৃত হয়। বর্শানৃত্য ইয়াং নামক স্থানের বিবাহ-উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ।

আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনা এদের সমাজে খুব একটা বাহাদুরি বলে গণ্য হ'ত। মানুষের মাথা কেটে আনলে সমাজের ধন সম্পদ শ্রী বৃদ্ধি হবে

এ বিশ্বাসও মণিপুরের কোনো কোনো নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আগেকার দিনে অন্ততঃপক্ষে একটি নরমুণ্ডের মালিক না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহেচ্ছু যুবকের পক্ষে পাত্রী সংগ্রহ করাই ছিল অসম্ভব। গলায় ভল্লুকের দাঁতের হার, আর পরনের কড়িগাঁথা বস্ত্রখণ্ড ছিল নরমুণ্ডচ্ছেদকের নিদর্শন-চিহ্ন। পুরুষদের হৃদয়ে এই পৈশাচিক নরহত্যার প্রেরণা সঞ্চার করত মেয়েরা। গ্রাম্য উৎসবাদি উপলক্ষ্যে যখন স্ত্রী-পুরুষ একত্রে সমবেত হত তখন পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন-চিহ্নসমূহবর্জ্জিত পুরুষকে মেয়েদের বিদ্রূপহাস্তে বিব্রত হতে হ'ত।

অন্যান্য আদিম জাতির মত মণিপুরী নাগারাও উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। অদ্ভুত গঠনের প্রস্তর-খণ্ডগুলোকে এরা 'লাই-ফাম' * বা উপদেবতার অধিষ্ঠান-স্থল বলে নির্দ্দেশ করে। টাংখুলদের বিশ্বাস উরি এবং উরা নামে দু'জন দেবতা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের চারটা ক'রে হাত, চারটা ক'রে পা। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা এই যে, আকাশ হচ্ছে পুরুষ আর পৃথিবী হচ্ছে প্রকৃতি। এদের দৃঢ়বদ্ধ নিবিড় আশ্লেষের ফল ভূমিকম্প, আর তাই থেকে পৃথিবীতে প্রাণ-লীলার বিকাশ।

মণিপুরের সকল শ্রেণীর নাগারাই মৃতদেহ গোর দেয়। টাংখুলরা খুব ঘটা ক'রে মৃতদেহ সমাহিত করে। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার দিন কবর খনন করা হ'লে সম্পন্ন গৃহস্থেরা একটি মহিষ বলি দেয়। মহিষটার নাড়ীভুঁড়ির অর্দ্ধেকটা নেয় মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা, বাকী অর্দ্ধেকটা নেয় কবর-খননকারীরা। প্রাণীটার হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক (Kidney) ইত্যাদি জোটে 'শেরা' বা গ্রাম্য পুরোহিতের ভাগ্যে। এগুলো রান্না ক'রে সে কতকগুলো মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক 'কামিও' বা উপদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে। পুরোহিত কর্ত্তৃক কতকগুলো ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হবার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সমবেত লোকদের এই রান্না-করা মাংস এবং ভাত পরিবেশন করা হয়, এবং সকলে মিলে মহা আনন্দে গোরস্থানে ভোজে প্রবৃত্ত হয়। ভোজনপর্ব্ব শেষ হ'লে সুরু হয় মৃতদেহ সমাহিত করবার আয়োজন। মৃতের একটি আত্মীয় জলন্ত মশাল হস্তে কবরের ভিতর ঢুকে, মশালটি ঘুরাতে ঘুরাতে স্বর্গত পিতৃপুরুষদের নিকট এই প্রার্থনা জানায়, তারা যেন মৃত ব্যক্তির 'কাজাইয়াম' (পরলোক) যাত্রার পথে তার সঙ্গে এসে দেখা করেন। তার পর মৃতের হাত দুখানি জল দিয়ে খুব ভাল করে ধুইয়ে দেওয়া হয়। তখন তার আত্মীয়স্বজনরা সকলে এক জায়গায় জড় হয়ে মড়াকান্না জুড়ে দেয় এবং কবরটিকে দু-তিন বার প্রদক্ষিণ করে। তারপর মৃতদেহটিকে



মারামের নিকটস্থ একশিলাস্তম্ভ (monolith)

শবাধারের সঙ্গে খুব শক্ত করে বেঁধে কবরে রাখা হয় এবং যাতে মৃতদেহে মাটি না লাগতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কবরের ভেতর পাথর দিয়ে তারা একটি বেষ্টনী নির্ম্মাণ করে। কবরে মাটি চাপা দেওয়া হ'লে পর 'শেরা' বা পুরোহিতকে মৃত্তিকাস্তূপের ওপর একটি টাক্তি রাখতে হয়। সর্ব্বশেষে সমাধিক্ষেত্রে একটি দেবদারু কাঠের মশাল জ্বালিয়ে রেখে সকলে মৃতব্যক্তির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এদের বিশ্বাস যে সমাহিত হবার পর দিন কবরের অন্ধকার গহ্বর থেকে মৃতব্যক্তির আবার পুনরুত্থান হয়, সেদিনই অশরীরী আত্মা আবার তার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ফিরে আসে। তাই ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত রাতদিন সকল সময়েই লোকান্তরিত প্রিয়জনের জন্যে তাদের গৃহদ্বার অবারিত থাকে।

* কথাটা 'মৈ-তাই' বা মণিপুরী ভাষা থেকে ধার করা।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[মাধ্যমিক শিক্ষা গবর্ন্মেন্টের করায়ত্ত করিবার জন্ত ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত যে-সব চেষ্টা হইয়াছে সে সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। শিক্ষাব্রতী ও জনগুরু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত বর্তমান বিলের আলোচনা কালে সহায়তা করিবে বলিয়াই আশা করি।]

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের বড় কর্ম্মচারীরা—সবাই বা প্রায় সবাই মুসলমান, কারণ তাঁহারাই জগতে, ভারতে ও বঙ্গে শিক্ষায় অগ্রণী ও অগ্রসরতম—দার্জিলিঙে খসড়াটা পালিস করিতেছেন, তাহাতে শান দিতেছেন। গবর্ন্মেন্ট কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা কমাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দিবার ও ছাত্রছাত্রী পাঠাইবার যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার মালিক থাকায় গবর্ন্মেন্ট নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন নাই। এখন নূতন আইন করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কর্তৃত্ব একটা বোর্ডের হাতে দেওয়া হইবে। বোর্ডটা শুধু শিখণ্ডী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে অভিযান শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরই চালাইবেন। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ বে-সরকারী, দেশের লোকের টাকায় চলে। কিন্তু তাহাদের উপর সরকার প্রভুত্ব করিতে চান। অনেকগুলি বেশ কেজো নয়, সত্য। কিন্তু যথেষ্ট টাকা দিলেই কেজো হয়। সরকার তাহা করিবেন না, অনেকগুলিকে উঠাইয়া দিবেন। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র দেশবাসীরা সামান্য পরিমাণে মোটা ভাত নিরন্নদিগকে দিলে যদি কেহ বলে, "এটা ঠিক নয়, আমি কতকগুলি লোককে রাজভোগ দিব, তোমাদের মোটা ভাতের অন্নসত্র উঠাইয়া দিব—ওরকম খারাপ খাদ্য লোককে দেওয়া উচিত নয়," তাহা হইলে ব্যবহারটা যেমন হয়, শিক্ষাদুর্ভিক্ষগ্রস্ত এই দেশে অকেজোত্বের ওজুহাতে বহু বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়াও সেইরূপ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকাতে যে মাতৃভাষাকে বাহন করিয়াছে, সে ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সম্ভবতঃ সরকারী হুকুমে রদ করিবে। সম্পূর্ণ রদ যদি না-ও করে, তাহা হইলেও, যে-সব বাংলা বহি চলিবে, বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত বহু আরবী-ফারসী শব্দে তাহা কণ্টকিত করা হইবে। মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভা ও শিক্ষাবিভাগ "হিন্দু" বাংলা ভাষা বরদাস্ত করিবে না। আরও কি কি অনিষ্ট বিলটার দ্বারা হইতে পারে, তাহা পরে লিখিব, এখন সংক্ষেপে বলা চলিবে না।

[প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

*

নানা কাগজে দেখিতেছি, বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী একটি সেকেণ্ডারী এডুকেশ্যন বোর্ড গঠন করিতে চান। প্রস্তাবটি নূতন নয়। এই মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহার সরকারী ও বেসরকারী সভ্য কত জন হইবেন, কি প্রকারে তাঁহারা নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবেন, বোর্ডের কর্ত্তব্য ও অধিকার কি কি হইবে, তাহার অধীনস্থ জেলাবোর্ডগুলি কি ভাবে গঠিত হইবে ও তাহাদের কর্ত্তব্য ও অধিকার কি হইবে তাহাও কোন কোন কাগজে দেখিয়াছি। মূল কাগজপত্র কিন্তু আমাদের হাতে আসে নাই। সেই জন্ত সাধারণ ভাবে কিছু মন্তব্য করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের বার শত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় কমাইয়া চারি শত করিবার সরকারী প্রস্তাব যে তরফ হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল, আলোচ্য মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের প্রস্তাবও সেই তরফ হইতে হইয়াছে। এই জন্ত ইহাকে ভয়ের কারণ মনে করি। কারণ, বঙ্গে স্থানবিশেষে এক-আধটা বেশী উচ্চ বিদ্যালয় থাকিলেও মোটের উপর স্কুল কমানর চেয়ে বাড়ানরই দরকার আছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বোর্ডের হাতে স্কুলকে রেকগ্নিশ্যন দেওয়া না-দেওয়া বা তাহা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা থাকিবে, এবং বোর্ডের যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসের দিকেই ঝোঁক থাকিবে তাহা উহার ইংরেজ জনকের প্রবৃত্তি হইতেই অনুমিত হয়। বোর্ড এইরূপ প্রবৃত্তিজাত না হইলে, বঙ্গে বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধনের ইচ্ছা ইহার মূল আদি ও প্রধান কারণ হইলে আমরা বোর্ড গঠনের সমর্থক হইতাম। কেন-না, বঙ্গীয় উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবার মত লোকবল, অর্থবল ও আইনবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। কিন্তু অনুমোদনযোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড না হইলে, উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আপাততঃ থাকাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

বোর্ডের সদস্যদের মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন যে প্রকারে হইবে তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকান হইয়াছে। আমরা

ইহার বিরোধী। যোগ্যতম লোকদিগকেই সদস্য করা উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সদস্যদের চারিত্রিক, জ্ঞানগত ও শৈক্ষিক যোগ্যতাই বিচার্য্য, ধর্ম্মমত বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।

যদি ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে সদস্য লইতেই হয়, তাহা হইলে যে সম্প্রদায় যত বিদ্যালয় চালাইতেছেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে সম্প্রদায় যত টাকা দিতেছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া এক এক সম্প্রদায় হইতে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে সদস্য লওয়া উচিত। মন্দের ভাল হিসাবে আমরা ইহা বলিতেছি। এই প্রণালীরও আমরা সমর্থক নহি।

বোর্ডে উনত্রিশ জন সদস্য থাকিবেন; চৌদ্দ জন গবর্মেণ্টের নিযুক্ত ও মনোনীত, পনর জন নির্ব্বাচিত। কিন্তু বে-সরকারী সদস্যদের এই সামান্য সংখ্যাধিক্য ভ্রান্তিজনক। বস্তুতঃ এংলো ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন বোর্ডের প্রতিনিধি এবং বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশ্যন য়্যাডভাইসরী বোর্ডের প্রতিনিধি সরকারী সদস্যদের পক্ষেই সাধারণত ভোট দিবেন, এবং যাঁহারা নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন গবর্মেণ্টের প্রভাব বশতঃ তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ নামে বে-সরকারী কিন্তু বাস্তবিক সরকারী অনুগ্রহার্থী থাকিবেন। এরূপ সরকারী প্রভাবাধীন বোর্ড আমরা চাই না।

এই মত আমরা কেবল ভাল লাগা না-লাগার জন্য পোষণ করি না, এবং প্রকাশ করিতেছি না। শিক্ষাতথ্য-জিজ্ঞাসু প্রত্যেক বাঙালী জানে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি-মধ্যে কেবল বঙ্গেই মোট শিক্ষাব্যয়ের অধিক অংশ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ও সর্ব্বসাধারণ বহন করেন, গবর্মেণ্ট বহন করেন কম অংশ; অন্যান্য প্রদেশে গবর্মেণ্টই অধিক অংশ বহন করেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, "বাদ্যকরের মজুরীটা যে দেয় গতের ফরমাইস করিবার অধিকার তাহার"। বঙ্গে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিপরীত ব্যবস্থা কায়েম হইতে যাইতেছে। বেশীর ভাগ টাকাটা দি ও দিব আমরা, কিন্তু প্রভুত্ব ও মুরুব্বিয়ানা করিবেন সরকারী লোকেরা! ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। বে-সরকারী লোকদেরই ক্ষমতা বেশী হওয়া উচিত। বঙ্গে যত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে তাহার অধিকাংশ বে-সরকারী, জনসাধারণের ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত।

এই কারণে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকদিগকে যে আপনাদের মধ্য হইতে কয়েক জন সদস্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার অনুপাত সরকারী ও বে-সরকারী বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকাংশ সদস্য বে-সরকারী স্কুলগুলি হইতে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। মোট তিন জন সদস্য হেডমাষ্টারেরা নির্ব্বাচন করিবেন। ইহা যথেষ্ট নহে, এবং সদস্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার পক্ষেও ইহা অসুবিধাজনক। হেডমাষ্টার প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ান উচিত। বলা হইয়াছে, তিনজন হেডমাষ্টার প্রতিনিধির মধ্যে এক জন মুসলমান হওয়া চাই-ই। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করার বিরুদ্ধে আগেই মত প্রকাশ করিয়াছি। আবার সেই কথা বলিতেছি। যদি সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতেই হয়, তাহা হইলে ১২০০ স্কুলের মধ্যে যত স্কুল মুসলমানরা চালান, তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তদনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তাঁহারা ১২০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪০০ বিদ্যালয় চালান না, সুতরাং তিন জন হেডমাষ্টারের মধ্যে এক জন মুসলমান হইবেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

বিদ্যালয়সমূহের অনুমোদন, রেকগ্নিশ্যন, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড-গঠনের আমরা বিরোধী। এরকম পরামর্শ ত স্কুল পরিদর্শন বিভাগের ইনস্পেক্টররাই দিয়া থাকেন। জেলাবোর্ড-সকলে স্থানীয় শাসন ও পুলিস বিভাগের কর্ত্তাদের প্রভুত্ব ও প্রভাব সর্ব্বাভিভাবী হইবে। বিদ্যালয়সমূহে হাকিম ও পুলিসের রাজত্ব কায়েম করার আমরা বিরোধী।

অনুমোদন, রেকগ্নিশ্যন ও সরকারী সাহায্য পাইতে হইলে কি কি সর্ত্ত ও নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বিশদভাবে লিখিত থাকা উচিত; এবং কোন বিদ্যালয় ঐ ঐ সুবিধা না পাইলে বা পূর্ব্বে প্রাপ্ত উক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার কারণগুলিও পরিষ্কার ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। গোপনীয় অপ্রকাশ্য অপ্রকা-শিত কোন রিপোর্টের উপর কোন কাজ হওয়া অনুচিত।

[প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৪

*

১৯৪০-এর বিল সম্বন্ধে বক্তব্যঃ

বিলটার উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষার রেগুলেশ্যন ও কণ্ট্রোল, অর্থাৎ তাহাকে নিয়মিতকরণ ও তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করণ—শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের বালাই ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অথবা ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পর যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ছাড়া যে শিক্ষা, তাহাই মাধ্যমিক শিক্ষা।

এ রকম ব্যাপক সংজ্ঞাও এড়াইয়া পাছে কোন রকম শিক্ষা কর্তৃত্বের বাহিরে চলিয়া যায় সেই ভয়ে একটা উপধারায় বলা হইয়াছে, প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট ইস্তাহার দ্বারা যে-কোন রকম শিক্ষাকে মাধ্যমিক বা অ-মাধ্যমিক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন—ফাঁকি দিবার যো নাই!

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়মিতকরণ ও সংযমন ("regulation and control") জন্য যে বোর্ড গঠিত হইবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর তাহার সর্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে। এই বোর্ডের সভ্য হইবেন ৫০ জন। তাহাতে সরকারী লোক, সরকার-মনোনীত লোক, মুসলমানদের ও হিন্দুদের 'প্রতিনিধি' ইত্যাদি এরূপ সংখ্যায় থাকিবে যে, যে হিন্দুরা ইস্কুল চালায় সব চেয়ে বেশী, টাকা দেয় সব চেয়ে বেশী, ছাত্রছাত্রী যোগায় সব চেয়ে বেশী, তাহারা সরকারী সভ্য, সরকার-মনোনীত সভ্য, ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী সভ্য এবং মুসলমান সভ্যদিগের সম্মিলনে সর্বদাই ভোটে হারিয়া যাইতে পারিবে! বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত করিবেন গবর্মেণ্ট।

বোর্ড ইস্কুল অনুমোদন ও না-মঞ্জুর, সাহায্য দেওয়া না-দেওয়া, ছাত্র ভর্তি করা না-করা, ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া না-দেওয়া, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও অনুমোদন বা অননুমোদন ইত্যাদি সব কাজের কর্তা হইবেন। বোর্ড ক্ষমতা পরিচালন করিবেন একটা কার্যনির্বাহক কৌন্সিলের দ্বারা। ঐ কৌন্সিলটা এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, সরকারী মতের জয় সর্বদাই যাহাতে হইতে পারে।

এই আইন পাস হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় তালিকা (syllabus) নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, প্রণয়ন, সংকলন ও প্রকাশ, এবং পরীক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা আর থাকিবে না। সুতরাং পরীক্ষার্থীদের ফী হইতে ও পাঠ্যপুস্তক-বিক্রয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বহু লক্ষ টাকা আয় হয়, তাহা থাকিবে না। অথচ বিলটাতে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নাই, তাহাকে অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডকে প্রতিবৎসর পঁচিশ লক্ষ এবং তাহার উপর আরও এক লক্ষের অনধিক টাকা দিবার ব্যবস্থা আছে; অধিকন্তু বলা হইয়াছে বোর্ড পরীক্ষার সমুদয় ফীগুলা পাইবে, তাহার প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক-গুলার বিক্রীর টাকা পাইবে, এবং অন্যান্য সব আয়ের টাকা পাইবে। অবশ্য গবর্মেণ্টের সুয়োরাণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর উপর যাহাতে আইন-সভা হস্তক্ষেপ করিতে না-পারে তাহার নিমিত্ত সম্প্রতি আইন করা হইয়া গিয়াছে।

এখন যে-সকল মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত, বিলটা আইন হইলে তাহাদের অনুমোদন দুই বৎসর কায়েম থাকিবে। তাহার পর সেগুলিকে অনুমোদিত তালিকায় রাখা না-রাখা বোর্ডের মরজির ও ইচ্ছার অধীন হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা, লেখান, প্রকাশ করা এমন একটা কমীটির হাতে পড়িবে, যাহাদের অধিকাংশ জ্ঞান-রাজ্যের, সাহিত্য-জগতের, মানুষ নহে, যাহারা আমলাতন্ত্রের অন্তর্ভূত বা তাঁবেদার। তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত বহিগুলা সাহিত্য-পদবাচ্য হইবে না। সেগুলা বঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের মন গড়িতে ঢালিতে চাহিবে গোলামি ছাঁচে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পুস্তকপ্রকাশলব্ধ আয় হইতেই বঞ্চিত হইবেন, তাহা নহে, ভাল পুস্তকের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদিগের মন আদর্শানুযায়ী রূপে গড়িবার সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রকাশিত সকল বহিই অত্যুৎকৃষ্ট, বলিতেছি না। কিন্তু বিলে যে পুস্তক প্রকাশ কমীটির ব্যবস্থা আছে, তাহার নির্বাচন, সঙ্কলন প্রভৃতি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অপকৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহাদের সংখ্যা সমান সমান—যেন মুসলমানরা বঙ্গে হিন্দুদের সমান শিক্ষিত, শিক্ষা-বিষয়ে তাহাদের সমান উদ্যোগী, সমানসংখ্যক স্কুল স্থাপন করিয়াছে, সমান ব্যয় করিয়া আসিতেছে, সমানসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যোগাইয়াছে!

আমরা মনে করি না ও বলি না যে, বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা নিখুঁত কিম্বা প্রয়োজনানুরূপ। অসাম্প্রদায়িক, আদর্শানুযায়ী, নিরপেক্ষ, ও সুচিন্তিত সংস্কারের প্রয়োজন আমরা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করি। কিন্তু বর্তমান গবর্মেণ্টের বা মন্ত্রিসভার সেরূপ সংস্কার করিবার মত সাধারণ জ্ঞান নাই, তদ্রূপ শিক্ষাবিষয়ক আদর্শ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই, তদ্রূপ সংস্কৃতি নাই, তদ্রূপ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নাই, এবং তদ্রূপ ধীরবুদ্ধি ও নিরপেক্ষতা নাই।

[প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭

*

বিলটা আইনে পরিণত হইলে এবং নেতারা তাহার অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিতে না

পারিলে, বঙ্গে শিক্ষার বিস্তৃতির পরিবর্তে সঙ্কোচ হইবে—বিদ্যালয়ের ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পাইবে, এবং শিক্ষার উন্নতির পরিবর্তে বিষম বিকৃতি ঘটিবে; গুণানুসারে যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে ন্যূনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট লোক নিযুক্ত হইবে, সুতরাং বহু সহস্র যোগ্য লোকের চাকরী যাইবে এবং বহু সহস্র যোগ্য লোক চাকরী পাইবেন না; এরূপ বাংলা বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকসমূহ লিখিত ও প্রচলিত হইবে যাহার ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়ই অপকৃষ্ট হইবে। পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা বিস্তর যোগ্য লেখক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; যে-বয়সে বালক-বালিকার মন গঠিত হয় সেই বয়সে অপকৃষ্ট পুস্তক পাঠে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত ও চরিত্র গঠিত না হইয়া, বিপরীত ফল ফলিবে; এবং এইরূপ পুস্তক পাঠের ফলে বঙ্গে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের আবির্ভাব ব্যাহত হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই প্রকারে নানা দিক্ দিয়া দুর্নিবার ক্ষতি হইবে।

এই সকল ক্ষতি নিবারণের নিমিত্ত, বিলটা আইনে পরিণত হইলে আমরা কি করিব, তাহা নির্ধারণ করা আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। অবশ্য উহা যাহাতে আইনে পরিণত না হয়, তাহার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করাই প্রথম কর্তব্য।

[প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৭

*

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের সমালোচনা উপলক্ষ্যে লেখায় ও বক্তৃতায় ইহা অনেক বার বলা হইয়াছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্কোচ সাধন ইহার একটা উদ্দেশ্য; এবং এই উক্তির সমর্থনার্থ মিঃ জেঙ্কিন্স যে কেবল চারি শত উচ্চ বিদ্যালয় রাখিবার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। গবর্মেন্ট-পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, সরকারের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই এবং মিঃ জেঙ্কিন্সের পরিকল্পনাটা সরকারী কোন সঙ্কল্প নহে। পরচিত্ত অন্ধকার; সুতরাং সরকারী কোন চিত্ত থাকিলে তাহার মধ্যে কি মতলব আছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের যে-অংশটির উপর সরকারী ক্ষমতা নিরঙ্কুশ, তাহাতে সরকারী ক্ষমতার ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হইলে তাহা কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ক্রমাগত কমিতেছে; নীচের তালিকা দেখুন।

বৎসর।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা।	হ্রাস।
১৯৩৪-৩৫	৬৪৩০৯	—
১৯৩৫-৩৬	৬২১৫০	২১৫৯
১৯৩৬-৩৭	৬১১৫৭	১০০৭
১৯৩৭-৩৮	৬০০৭৪	১০৮৩
১৯৩৮-৩৯	৫৫৪৫২	৪৬২২

অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচ বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ৮৮৭১টি কমিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব ছেলেমেয়ে পড়িতে পারে। এই সব বিদ্যালয় কমিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে মুসলমানদের নিমিত্ত মাদ্রাসা বাড়িয়াছিল ১২৫টি এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহাদের নিমিত্ত মাদ্রাসা বাড়িয়াছিল ৪১০টি।

ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা কি অযৌক্তিক হইবে যে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীর ব্যবহার্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলির উপর গবর্মেন্টের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হইলে, সেগুলিরও সংখ্যা কমিবে, কিন্তু কেবল মুসলমানদের ব্যবহার্য উচ্চ মাদ্রাসা বাড়িবে?

এখন উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা গবর্মেন্ট ইচ্ছা করিলেই কমাইতে পারেন না। সেগুলি অনুমোদন করা না-করার ক্ষমতা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসনীয় ঝোঁক আছে শিক্ষাপ্রসারণের দিকে। তাহার ফলে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বাড়িতেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িতেছে।

[প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭

*

১৯৪২-এর সম্বন্ধে মন্তব্যঃ

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি সরকারী কল্‌কাতা গেজেটের বিশেষ একটি সংখ্যায় গত ২৮শে মার্চ প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে পেশও হয়ে গেছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল থেকে এটি অনেক বিষয়ে ভিন্ন। সুতরাং এটি সম্বন্ধে লোকমত জানবার জন্যে এর প্রচার আবশ্যক ছিল, কিন্তু এইরূপ প্রচারের প্রস্তাব আইন-সভায় উত্থাপিত হওয়ায় তা অগ্রাহ্য হয়ে গেছে এবং বিলটি সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে, এই ব্যবস্থা ঠিক হয় নি।

এই আইনের খসড়া দেখবার সুযোগ আমাদের এখনও হয় নি। দৈনিক কাগজে যা দেখেছিলাম তার অক্ষর এত

ছোট যে, বৃদ্ধ মনুষ্যের পক্ষে তা পড়া দুঃসাধ্য। খবরের কাগজে এর একটি বিশেষজ্ঞের নিম্নমুদ্রিত বিবৃতি আছে :

A SPECIAL FEATURE

A special feature of the Bill is the constitution of five committees, called the (1) Islamic Secondary Education Committee, (2) Hindu Secondary Education Committee, (3) Girls' Secondary Education Committee, (4) Scheduled Castes Secondary Education Committee, and (5) Provisional Board of Anglo-Indian and European Education. The function of these committees will be to conduct education entirely related to the respective culture and religion."

এই কমীটিগুলি যাদের জন্য স্থাপিত তাদের নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি (বা কৃষ্টি) অনুসারে তাদের শিক্ষাকার্য্য নির্বাহ করা হবে কমীটিগুলির কাজ। হিন্দুদের ও মুসলমানদের ধর্ম আলাদা বুঝলাম। কিন্তু তপসিলভুক্ত জা'তদের ধর্ম কি হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা? তপসিলভুক্ত জা'তরা ত অহিন্দু নয়, তারাও হিন্দু। তাদের কৃষ্টি কি অন্য হিন্দু জা'তদের কৃষ্টি থেকে ভিন্ন? কৃষ্টির একটি প্রধান অঙ্গ সাহিত্য। বাঙালী 'উচ্চ' জা'তের হিন্দু ও তপসিলী জা'তের হিন্দু এদের সাহিত্য কি আলাদা? গীতবাদ্য চিত্র-আদি ললিতকলা কৃষ্টির আর একটি অঙ্গ। সব বাঙালী জা'তের গীতবাদ্যচিত্রকলা কি অভিন্ন নয়? সুতরাং বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে দুটা কমীটি ভেদবুদ্ধি জাত। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের শাস্ত্রীয় ধর্ম্মমত ভিন্ন হ'লেও, তাদের কৃষ্টি, অর্থাৎ প্রধানতঃ সাহিত্য এবং গীতবাদ্য চিত্র প্রভৃতি ত এক। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের কৃষ্টিকে পৃথক ধরে নিয়ে পৃথক পৃথক ব্যবস্থার কোন কারণ নাই।

বালিকাদের ধর্ম ও কৃষ্টি কি বালকদের থেকে ভিন্ন? তা হ'লে বালকদের জন্যে একটা কমীটি কেন হ'ল না? বালিকাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান ব্রাহ্ম প্রভৃতি আছে। তাদের সকলের ধর্ম ও কৃষ্টি কি এক?

শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য মানুষ গ'ড়ে তোলা। সব মানুষের মধ্যে যাতে ঐক্য, সদ্ভাব, সম্প্রীতি বাড়ে সেই রকম শিক্ষাই দেওয়া উচিত। কিন্তু বঙ্গের সমুদয় অধিবাসীকে কতকগুলা টুকরায় ভাগ ক'রে, তাদের কৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন ব'লে ধরে নিয়ে শিক্ষা দিলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে না। সকল বালক-বালিকাকে অসাম্প্রদায়িক লৌকিক শিক্ষা দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে।

[প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৯

কীট-পতঙ্গের শিল্প-নৈপুণ্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শিবপুরের বাগানে একবার প্রজাপতি এবং অন্যান্য পোকা-মাকড় সংগ্রহ করিতেছিলাম। সঙ্গে একটি ছেলে ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বহন করিতেছিল। প্রকাণ্ড একটা গাছের নীচে অনেকটা জায়গা বড় বড় দূর্ব্বাঘাসে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েক রকমের পিঁপড়ে-মাকড়সার সন্ধান পাইয়া ক্লোরোফর্ম-গ্যাস প্রয়োগে তাহাদিগকে ধরিতেছিলাম। প্রায় ২০।২৫ গজ দূরে সহসা একটা মাঝারিগোছের গাছের দিকে নজর পড়িতেই কয়েকটা অদ্ভুত রকমের ফল দেখিতে পাইয়া সঙ্গের ছেলেটিকে তাহার কয়েকটা পাড়িয়া আনিতে বলিলাম। গাছটা খুব উঁচু নহে। কাণ্ডটা প্রায় ১২।১৩ ফুট খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। কাণ্ডের বেড়টাও ১৬।১৭ ইঞ্চির বেশী হইবে না। কাণ্ডটার গায়ে কোন ডালপালার অস্তিত্ব নাই। কেবল মাথার উপরিভাগে পত্র-পল্লবগুলি ছত্রাকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ছেলেটা গাছটার নিকটে গিয়া ডাকিয়া বলিল—"গাছে চড়া যাবে না বাবু, গাময় বড় বড় কাঁটায় ভর্ত্তি।" কিছুক্ষণ বাদে গাছটার নিকটে গিয়া দেখিলাম—সত্য সত্যই গাছটার গায়ে ঈষৎ-লালচে রঙের অসংখ্য বড় বড় কাঁটা। কাঁটাগুলি সূক্ষ্মাগ্র এবং গোড়ার দিকটা ক্রমশঃ মোটা হইয়া গিয়াছে। কাঁটাগুলি দেখিতে দেখিতে গাছটার আত্মরক্ষার অপূর্ব্ব কৌশলের কথা ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ মনে হইল যেন একটা কাঁটা একটু নড়িয়া উঠিল। বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। কাঁটাটাকে নড়িতে দেখিলাম কেন? তবে কি চোখের ভুল? বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তখন নজরে পড়িল—একটা কাঁটাই নহে, এখানে সেখানে অনেক কাঁটাই মাঝে মাঝে নড়িয়া উঠিতেছে। একটা কাঁটা ধরিয়া টানিতেই অতি সহজে গাছের গা হইতে উঠিয়া আসিল। যেন হাল্কা আঠার সাহায্যে আলতো ভাবে সংলগ্ন ছিল। কাঁটাটা তুলার মত নরম এবং ফাঁপা। ধারালো ব্লেডের সাহায্যে একটা কাঁটা চিরিয়া দেখিলাম—ভিতর হইতে সরু এবং লম্বা একটা পোকা বাহির হইয়া পড়িল। পোকাটার মুখের দিকটা গাঢ় খয়েরী রঙের কিন্তু শরীরটা হাল্কা বাদামী। কাঁটার মত পদার্থটা পোকাটার বাসা—একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এই পোকাগুলি মুখ হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতা বুনিয়া কাঁটার

মত আকৃতিবিশিষ্ট বাসার কাঠামো নির্ম্মাণ করে। অবশেষে গাছের ছাল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লালচে রঙের টুকরা সংগ্রহ করিয়া কাঠামোর গায়ে রঙের প্রলেপের মত সর্ব্বত্র সমভাবে লাগাইয়া দেয়। কাজেই স্বাভাবিক কাঁটার সহিত আপাত দৃষ্টিতে কোন পার্থক্যই উপলব্ধি হয় না। ভিতরকার পোকাটা এই কাঁটার মত বাসাটাকে লইয়াই আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। পোকাটার মুখের সম্মুখ ভাগে বাঁকানো সাঁড়াশির মত দুইটি ধারালো দাঁত আছে। এই দাঁতের সাহায্যে বৃক্ষের ছালের গায়ে কামড়াইয়া ধরিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহারা গাছের ছালের সূক্ষ্ম অংশ কুরিয়া কুরিয়া খায়। এক স্থানের খাদ্যবস্তু নিঃশেষ হইলেই অন্য স্থানে নড়িয়া বসে। খাওয়ার সময়ে আঠালো সুতার সাহায্যে কিছুক্ষণের জন্য বাসাটাকে এক স্থানে আটকাইয়া রাখে। নির্দ্দিষ্ট এক জাতীয় গাছের সহিত এই কাঁটা-পোকাদের সম্বন্ধ যেন পরস্পরের প্রতি সাহায্যমূলক। গাছের অনিষ্টকারী শত্রুরা কাঁটা-পোকাগুলিকে প্রকৃত কাঁটা মনে করিয়া ইহার নিকটে অগ্রসর হইতে ভয় পায়। প্রতিদানে গাছগুলি যেন তাহাদের ছাল খাইতে দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। যাহা হউক, খাইতে খাইতে পোকাটা পূর্ণবয়স্ক হইবার পর বাসাটাকে এক স্থানে দৃঢ় ভাবে আটকাইয়া তাহার মধ্যেই পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয়। কিছুকাল পুত্তলী অবস্থায় নিষ্ক্রিয় ভাবে কাটাইবার পর সমজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া যায়। যাযাবর মানুষের মত ঘরবাড়ী সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—কাঁটা-পোকার মত এরূপ অসংখ্য রকমারি পোকা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ ঝুড়ি-পোকা নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় ঝুড়ি-পোকার বাসা নির্ম্মাণের কৌশল এবং কারুকার্য্য দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কীট-পতঙ্গের বাচ্চাগুলিই অপূর্ব্ব শিল্পকুশলতা এবং কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক কীটপতঙ্গেরা কিন্তু এবিষয়ে তাহাদের তুলনায় সম্পূর্ণ অক্ষম।

শিল্প-চর্চ্চায়, সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে মানুষ অসামান্য দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অথবা শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তাহা কেবল মানুষের দৃষ্টিতে রমণীয়; তাহাদের নিজেদের কোন সৌন্দর্য্যবোধ আছে কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। কারণ ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। বাসস্থল নির্ম্মাণেই প্রধানতঃ ইহাদের কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীরা প্রত্যেকেই তাহাদের কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় তাহাদের আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ অথবা তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কারুকার্য্য করিয়া থাকে। ইহা একটা স্বাভাবিক, সংস্কার-জাত ব্যাপার। মানুষের শিল্প-নৈপুণ্য বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কৃতিত্ব পৌনঃপুনিক অভ্যাসের দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। কাজেই সকলে একই রকম কৃতিত্বের অধিকারী হয় না। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতে ইহার বিপরীত ঘটনাই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক সংস্কারবশে প্রত্যেকেই তাহারা একই রকমের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। সৌন্দর্য্যবোধের কথা বাদ দিয়াও প্রয়োজনের তাগিদে মনুষ্যেতর প্রাণী, বিশেষতঃ কীট-পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীরা, যেরূপ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে—বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহাতে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকিবে না।



মাকড়সার জাল অপূর্ব্ব শিল্প-কুশলতার পরিচায়ক

দৈহিক গঠনের বিষয় বিবেচনা করিলে জীব-জগতে মানুষের পরেই বানর জাতীয় প্রাণীদের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে শিম্পাঞ্জি, ওরাং-উটান প্রভৃতি প্রাণীদিগকে মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি বলা যাইতে পারে। হস্ত-পদবিশিষ্ট এই প্রাণীরা বৃক্ষের উপরিভাগে বাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে না আছে কোন সৌন্দর্য্য, না আছে কোন কৌশল। সাধারণ একটা কাক-চিলের বাসাতেও যে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় ইহাতে তাহাও নাই। কতকগুলি ডালপালা একত্র করিয়া কোন রকমে বসিবার অথবা শুইবার স্থান করিয়া লয় মাত্র। তাহা অপেক্ষা অনেক নিম্ন-পর্য্যায়ের প্রাণী মেঠো-ইঁদুর যেরূপ বাসস্থল নির্ম্মাণ করে তাহা অনেকাংশেই উন্নত। ইহারা সুবিন্যস্তভাবে চতুর্দ্দিক আবদ্ধ করিয়া গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে এবং ভিতরে যাতায়াত করিবার একটি মাত্র পথ রাখে। ভিতরে তুলা বা তজ্জাতীয় কোন কোমল পদার্থের আস্তরণ দিয়া দেয়। বিভার জাতীয় প্রাণীদের বাসস্থল নির্ম্মাণের কৌশল

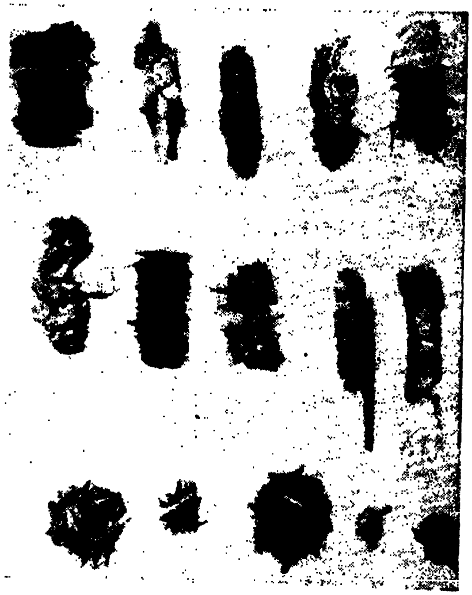
দেখিবার মত জিনিস। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা বাসা নির্ম্মাণে যেরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে অথবা শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় তাহার সহিত উপরোক্ত প্রাণীদের বাসার কোন তুলনাই চলে না। বাবুই পাখীর বাসা অনেকেই দেখিয়াছেন। বাসাগুলির সৌন্দর্য্য এবং নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। টুনটুনি পাখী অতি ক্ষুদ্র হইলেও সূঁচের মত ঠোঁটের সাহায্যে অতি নিপুণতার সহিত পাতা সেলাই করিয়া



বিভিন্ন জাতীয় "ক্যাডিস্‌-ফ্লাই"এর বাসা

বাসা নির্ম্মাণ করে। পাতা মুড়িয়া সেলাই করিবার কায়দা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। মিজলটো নামক পাখীরা তুলা বা পশম সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে অপূর্ব্ব বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তুলা বা পশম সংগ্রহ করিতে না পারিলে গাছের ছাল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। বাহির হইতে দেখিয়া বাসাটাকে অপলকা মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে খুবই দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। অষ্ট্রেলিয়ার ফ্যান-টেইল নামক পাখীর বাসার নির্ম্মাণ-কৌশল এবং গঠন-সৌকর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। ব্ল্যাক-বার্ড নামক পাখীর বাসার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যেও মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু ইহারা সকলেই অভিব্যক্তির ধাপে অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্য্যায়ের প্রাণী। নিম্ন শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের বিষয় আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে এবং শিল্প-নৈপুণ্যে ইহারা উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদিগকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মাকড়সার কথাই ধরা যাউক। এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরা কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অপূর্ব্ব কৌশলে এক একখানি নিখুঁৎ জাল নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মাকড়সার জালের কার্য্য-কারিতাও যেমন অদ্ভূত—গঠন-সৌন্দর্য্যও ইহার তেমনই অপূর্ব্ব। তা' ছাড়া কয়েক জাতীয় মাকড়সা যে চতুর্দ্দিকে সূতা ছড়াইয়া মধ্যস্থলে গর্ত্তের মত করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখে—তাহার গঠন-কৌশল এবং কারুকার্য্যও কম বিস্ময়কর নহে। বোলতা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত চাক পরম বিস্ময়ের বস্তু। ভ্রমরের বাসা দেখিলেও বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। ভ্রমরেরা বাসা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ লম্বা গর্ত্ত-যুক্ত অথবা ফাঁপা কোন পুরাতন কাষ্ঠখণ্ড নির্ব্বাচন করে। পরে সবুজ পাতার অন্বেষণে বহির্গত হয়। সাধারণতঃ ইহারা গোলাপ ও তজ্জাতীয় গাছের পাতা ডিম্বের আকারে কাটিয়া লইয়া আসে এবং চুরুটের মধ্যে তামাকের পাতা যেভাবে সাজান থাকে কতকটা সেইভাবে পাতাগুলিকে পর পর জড়াইয়া ছোট একটা চুরুটের মতই বাসা নির্ম্মাণ করে। পাতার ভাঁজের মধ্যস্থলে ডিম পাড়িয়া তাহার মধ্যে বাচ্চার আহারের ব্যবস্থাও করিয়া রাখে। এক একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পর পর সাজাইয়া আট-দশটা পাতার গুটিকা রাখিয়া দেয়। প্রত্যেকটি গুটিকার অভ্যন্তরেই একটি করিয়া ডিম থাকে।

থুথু-পোকা নামে আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের বাচ্চাগুলি অদ্ভূত উপায়ে



বিভিন্ন জাতীয় কয়েকপ্রকার ঝুড়ি-পোকার বাসা। পোকাগুলি বাসা লইয়াই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে

শরীর হইতে বুদ্‌বুদের মত প্রচুর পরিমাণ থুথু বাহির করিয়া তাহার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। এই থুথুর আবরণই ইহাদের বাসা। ইহার গঠন-প্রণালীরও একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। গুবরে পোকার মত একপ্রকার ক্ষুদ্রকার পতঙ্গের বাচ্চাগুলি যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে এবং অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্বেগে বসবাস করে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে

স্তম্ভিত হইতে হয়। পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা পাতাকে ইহারা কেবল মুখের সাহায্যে মুড়িয়া সুতা দিয়া সুসংবদ্ধভাবে জুড়িয়া দেয়। এই পোকাদের বাসা দেখিলে অনেক সময় টুনটুনি পাখীর বাসা বলিয়া ভুল হইবারই সম্ভাবনা। বড় একটা কচু পাতাকে আগাগোড়া মুড়িয়া ঠিক একটা লম্বা নলের মত করিয়াফেলে, প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা সাধারণ একটা 'ক্যাটারপিলার' একাই এরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। 'ক্যাডিস্-ফ্লাই' নামে আমাদের দেশে কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বাচ্চাগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের বাসা নির্ম্মাণ করে কাহারও কাহারও বাসা দেখিলে মনে হয় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর ইটের কুচি সাজাইয়া কেহ যেন ছোট ছোট নল তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। একজাতীয় 'ক্যাডিস্-ফ্লাই'-এর বাচ্চার কুলগাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালে দলবদ্ধভাবে বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসাগুলি দেখিতে ঠিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শামুকের মত কুণ্ডলী পাকানো।



একজাতীয় মাকড়সার ফাঁদ। ইহাতেও অদ্ভুত শিল্প-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়

এতক্ষণ যে সকল পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির শিল্প-নৈপুণ্যের কথা বলিলাম তাহারা সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যাযাবর প্রকৃতির পোকারা বাসগৃহ লইয়া ঘোরাফেরা করিলেও তাহা নির্ম্মাণে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। যে-কোন বাগানে গোলাপ, করমচা অথবা ঐ ধরণের অন্যান্য গাছের প্রতি একটু মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাদের ডালপালা বা পাতার সহিত কালো রঙের ঝুলের মত এখানে সেখানে এক একটি অদ্ভুত পদার্থ ঝুলিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলিকে ময়লা বা ঝুল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু একটিকে তুলিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে—লম্বা, গোলাকার ঝুলের মত পদার্থটির চতুর্দ্দিকে এক ইঞ্চি, দেড় ইঞ্চি কতকগুলি শুষ্ক কাঠি যেন শক্ত আঠা দিয়া লাগানো রহিয়াছে। সহজে কাঠিগুলিকে টানিয়া বাহির করা যায় না। কাঠিগুলি তুলিয়া ফেলিলেই তুলার মত কোমল পদার্থ নির্ম্মিত একটি নল দেখা যাইবে। তুলার আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিলেই তাহার মধ্য হইতে প্রায় ১/২ ইঞ্চি লম্বা একটি পোকা বাহির হইয়া পড়িবে। এই পোকাটি একজাতীয় ক্ষুদ্রকায় মথের বাচ্চা। ইহারা গাছের পাতা ও ছাল খাইয়া থাকে এবং শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্ত শরীরের চতুর্দ্দিকে আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর ছোট ছোট ডালপালার টুকরা কাটিয়া আনিয়া বসাইয়া দেয়। বাসার মুখটা থাকে উপরের দিকে। পোকাটা মুখ বাড়াইয়া ধারালো দাঁতের সাহায্যে ডালপালা কামড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতেই এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে। বিশ্রাম করিবার সময় বাসার মুখের কাছে সঞ্চিত আলগা সুতার সাহায্যে বোঁটার মত করিয়া বাসাটাকে দৃঢ়ভাবে ঝুলাইয়া রাখে। পোকাটা ভিতরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। ছোট ছোট পাখীরা ইহাদের পরম শত্রু। দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ গলাধঃকরণ করে। কিন্তু এই দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্যে যেমন তাহারা নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারে তেমনই আবার শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রমও ঘটাইয়া থাকে। পোকাটা যথেষ্ট বড় হইবার পর ঝুলানো বাসার মধ্যেই পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে 'মথ' রূপ ধারণ করিয়া গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

ঘাস-পাতা, লতা-গুল্মের মধ্যে ইঞ্চিখানেক লম্বা এক প্রকার ঝুড়ি-পোকার বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দূর্ব্বাঘাসের ছোট ছোট টুকরা সংগ্রহ করিয়া স্তরে স্তরে এমন ভাবে বাসার উপরিভাগে সাজাইয়া দেয়—দেখিলে মনে হয় যেন কোন নিপুণ কারিগর সূক্ষ্ম যন্ত্রসাহায্যে সুদৃশ্য নক্সা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতার মত সরু ও লম্বাটে ধরণের পোকাটা সেই বাসাটাকে লইয়া খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। আত্মগোপনের কৌশল ইহাদের এমনই নিখুঁৎ যে পশুপক্ষী তো দূরের কথা, মানুষের সাবধানী চোখও ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে। সুপারিগাছের কাণ্ডে প্রায় সর্ব্বত্রই সবুজ রঙের গোল দাগের মত শেওলা জাতীয় এক প্রকার পদার্থ জন্মিতে দেখা যায়। এই সকল সুপারিগাছের গায়ে সবুজ শেওলার সাহায্যে গঠিত অবিন্যস্ত ডাল-পালাসমন্বিত এক প্রকার অদ্ভুত ক্ষুদ্রকায় পদার্থকে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। প্রথমে মনে হইবে—কোন রকমে হয়তো শেওলার টুকরাগুলি জমাট বাঁধিয়া ঐরূপ একটা আকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু একটাকে হাতে তুলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেই দেখা

যাইবে—ঐ অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট শেওলার মধ্যে সুতার মত সূক্ষ্ম লম্বাটে একটা পোকা রহিয়াছে। শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐ বাসা লইয়াই পোকাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়।

আমাদের দেশে ঘরের বেড়া অথবা দেওয়ালের গায়ে চিড়ে-পোকা নামে এক প্রকার অদ্ভুত পোকা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন। ছোট, বড় এবং অন্যান্য রকমারি প্রায় পাঁচ-ছয়টি বিভিন্ন জাতীয় চিড়ে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও ঝুড়ি-পোকারই গোষ্ঠীভুক্ত। পোকাটার বাসা দেখিতে ঠিক চেপ্টা একটি চিঁড়ের মত। দেওয়ালের গায়ে অনবরত ইহাদিগকে থামিয়া থামিয়া চলিতে দেখা যায়। চিড়ে-পোকার বাসার একটা বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য পোকার বাসার মত ইহাদের বাসার একটা দরজা বা মুখ থাকে না। যাতায়াত করিবার জন্য দুই দিকেই দুইটি মুখ রাখিয়া দেয়। দরকার মত যে-কোন দিক হইতেই বাসাটাকে ব্যবহার করিতে পারে। চলিতে চলিতে সম্মুখের দিকে বাধা পাইলে তৎক্ষণাৎ অপর দিকের মুখ কাজে লাগাইয়া দেয়। এক মুখ বন্ধ করিয়া দিলে সে অপর দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কাজ করিতে থাকে। নল-খাগড়া বা বাঁশের বেড়ার গায়ে অপর এক জাতীয় ঝুড়ি-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ ছোলা-পোকা নামে পরিচিত। ইহাদিগকে দেখিতেও ঠিক একটি আস্ত ছোলার মত। ছোলার মত আবরণটির অভ্যন্তরে একটি সরু নলের মধ্যে পোকাটি আত্মগোপন করিয়া থাকে। বেড়ার গায়ে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক শেওলা জাতীয় পদার্থ জন্মে ইহারা তাহাদিগকে কুরিয়া কুরিয়া খায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় ইহারা পূর্ব্বোক্ত কাঁটা-পোকারই নিকটতম জ্ঞাতি। এই জাতীয় পোকাগুলি সকলেই পরিণত বয়সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মথ বা পতঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কয়েক জাতীয় ঝুড়ি-পোকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকের টুকরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ অথবা ডিমের খোলা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে এলোমেলো ভাবে আটকাইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে এবং আবর্জ্জনার মত সেই বাসাটাকে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশে আবর্জ্জনার মত বাসা নির্ম্মাণকারী অনেক রকমের ঝুড়ি-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। বাসা নির্ম্মাণে ইহাদের আত্মরক্ষার নিখুঁত কৌশল দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়।

জলের মধ্যে বিচরণকারী বিভিন্ন জাতীয় ঝুড়ি-পোকারও অভাব নাই। আমাদের দেশের খালে বিলে বা অন্যান্য জলাশয়ে পাতি-শালুকের অসংখ্য গাছ জন্মিতে দেখা যায়। গোলাকার ছোট ছোট পাতাগুলি জলের উপর ভাসিয়া থাকে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে—পাতাগুলির অনেক স্থানেই কোন পোকায় যেন অর্দ্ধবৃত্তাকারে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। আরও একটু অনুসন্ধান করিলেই এই অর্দ্ধবৃত্তাকার পত্রখণ্ডগুলিকে দুই ভাঁজে একত্রিত অবস্থায় জলের উপর ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে। ইহাও এক প্রকার ঝুড়ি-পোকার কাণ্ড। পোকাটা দেখিতে চেপ্টা এবং অনেকটা শুঁয়া-পোকার মত। সম্মুখের ধারাল চোয়ালের সাহায্যে এক টুক্‌রা পাতা কাটিয়া সেটাকে জলে ভাসাইয়া অন্য একটা পাতার উপর লইয়া আসে এবং একপ্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে জুড়িয়া দেয়, পরে নীচের পাতাটাকে ঐ মাপে কাটিয়া লয়। তখন উহা ভেলার মত জলে ভাসিতে থাকে। পোকাটা উভয় পাতার মধ্যস্থলে অবস্থান করে এবং প্রয়োজন মত এক ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া সাঁতার কাটিবার মত বাসাটাকে লইয়া খাদ্যান্বেষণে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। কিছুকাল পরে বাসার অভ্যন্তরে সাদা গুটি প্রস্তুত করিয়া পুত্তলীতে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে ক্ষুদ্র পতঙ্গ রূপ ধারণ করে।

স্মৃতি-লেখা

শ্রীগোপাল ভৌমিক

কোন দিন কালো মৃত্যু অজগর-ছায়া
যদি ফেলে, এ দিনের সোনালী স্বপন
তাই বলে মিথ্যা নয়; নয় শুধু মায়া
বার বার অনুভূত জীবন-দর্শন।

তোমাকে পেয়েছি যেন মেঘ-চক্রে আঁকা
একটু রূপালী রেখা; যেন বুটিদার
শাড়ীর আঁচলে ঘেরা তনুখানি বাঁকা
হঠাৎ দৃষ্টির পথে করেছে বিস্তার

বহুদিন আগে দেখা সুন্দর সে ছবি।
বিস্ময়ের ঘোর কেটে চোখ মেলে দেখি—
শান্তি-সুর কেটে গেছে, থেমেছে পূরবী—
মথিত এ অন্ধকারে একা আমি—সে কি!

দীর্ঘায়ত অন্ধকারে মৃদু আলো-রেখা
তবু জানি দিক্-প্রান্তে দিয়েছিল দেখা!

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইয়োরোপের সমরাঙ্গনে এত দিন পরে দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত যোজিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত যোজনার কথা প্রথমে প্রচারিত হয়, তাহার পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে অনেক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অক্ষশক্তির মধ্যে ইটালী ভূপাতিত, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী বিষম ক্ষতিগ্রস্ত এবং ফিনল্যাণ্ড প্রায় নিস্তেজ, কেবলমাত্র জার্ম্মানি প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনও প্রবল প্রতিবন্ধকতায় সক্ষম। দুই বৎসর পূর্ব্বের জার্ম্মানি ও আজিকার জার্ম্মানিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাহার শ্রেষ্ঠ সেনাদলের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং নূতন সেনায় তাহার ক্ষতিপূরণ আংশিক ভাবে হইয়াছে মাত্র। আকাশযুদ্ধে জার্ম্মানির শ্রেষ্ঠতম বৈমানিকগণের অধিকাংশই নিহত এবং স্থলযুদ্ধে তাহার যুদ্ধশকট চালকগণের প্রধান অংশ নিঃশেষিত। অন্য দিকে সোভিয়েট রুশ প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত এবং সাংঘাতিকভাবে আহত বলিলেও চলে। পশ্চিমের মিত্রপক্ষ এখন কিন্তু তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের চরমে উঠিয়াছে, আফ্রিকা ও ইটালীর যুদ্ধে তাহাদের সেরূপ বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, এসিয়ার যুদ্ধেও যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহাপেক্ষা তাহাদের বলবৃদ্ধি অনেক গুণ বেশী হইয়াছে। আকাশ ও জলপথে মিত্রপক্ষ এখন প্রবল শক্তিতে আধিপত্য লাভ করিয়াছে এবং সে শক্তি বিপক্ষের তুলনায় অনেক গুণ অধিক। সুতরাং ক্ষয়ব্যয় ও শক্তিবৃদ্ধির হিসাবে এখন মিত্রপক্ষের দিকে জয়ের পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে এখন যুদ্ধের যে পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে প্রতিরোধকারীর আনুকূল্য কয়েকটি বিষয় আছে তাহাও বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, দুর্গাশ্রয়, এবং এই ব্যাপারে বর্ত্তমানে যে সকল সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিতেছে তাহাতে অবস্থা বিচার দুরূহ, তবে মিত্রপক্ষ যে বিরাট্ শক্তি আজ এক সপ্তাহ যাবৎ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড বেগে প্রয়োগ করিতেছে, তাহার ফলাফল দেখিলে মনে হয় জার্ম্মান রণনায়কগণ দুর্গনির্ম্মাণে বিশেষ কোনও ফাঁক রাখিয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্তের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, যে বৃত্তাংশের উপর মিত্রশক্তির আক্রমণ চলিতেছে তাহা ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তশক্তির পূর্ণপ্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই সেরবুর্গ হইতে হাভ্‌র্ পর্য্যন্ত প্রায় শত মাইল ব্যাপী উপকূল ইংলণ্ডের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং বহু বিমান-পোতাশ্রয়ের সম্মুখে অবস্থিত। ঐ বন্দর ও বিমান-পোতাশ্রয়গুলিকে আক্রমণ-কেন্দ্র করিয়া মার্কিণ ও ব্রিটিশ রণপোত ও আকাশবাহিনীর যুক্তশক্তি সম্যক্‌ভাবে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। কার্য্যতঃও আজ এক সপ্তাহ যাবৎ অবিশ্রাম রণপোত হইতে গোলাবর্ষণ এবং আকাশবাহিনীর বোমাক্ষেপণ চলিয়াছে। এই অগ্নি-বর্ষণের আড়ালে পশ্চিমের যুগ্মমিত্রশক্তির বিরাট্ স্থলবাহিনী ফ্রান্সের উপকূলে নামিয়া দেশের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য লড়িতেছে। এখন পর্য্যন্ত এই আক্রান্ত বেলাভূমির পরিমাণ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ মাইল এবং তাহার প্রায় সকল অংশই নৌবহরের গোলাবর্ষণের আশ্রয়ে রহিয়াছে। নৌবহরের এই অগ্নিময় ছাদ ও দেওয়াল আক্রমণকারী সেনার রক্ষণাবেক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে করিতেছে। জার্ম্মান "পশ্চিমের প্রাকার" নির্ম্মাণকারিগণ এই নৌবহরের গোলাবর্ষণের পাল্লার বাহিরেও যদি দুর্গমালা গঠন করিয়া থাকে তবে এই দ্বিতীয় প্রান্ত যোজনার প্রথম অংশ অতিশয় ক্ষতিকারক এবং আয়াসসাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় প্রান্ত যোজনার সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আরও অন্ততঃ পক্ষে ছয় সপ্তাহ না গেলে ইহার প্রকৃত পরিস্থিতির উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমানে যে অতি ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে তাহা এক দিকে মিত্রপক্ষের যুদ্ধপ্রান্ত গঠনের চেষ্টা এবং অন্য দিকে বিপক্ষের প্রতিরোধ-চেষ্টাই চলিতেছে। যুদ্ধারম্ভ এখনও প্রকৃতপক্ষে হয় নাই, কেননা দুই পক্ষই এখন রণাঙ্গনে নিজ নিজ পরিস্থিতির উন্নতি ও বিপক্ষের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সুযোগ খুঁজিতেছে। অবশ্য প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ চলিতেছে এবং সমুদ্রতটও রক্তের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই যুদ্ধ অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধের সমষ্টিমাত্র, প্রকৃত বল পরীক্ষা নহে। এতাবৎ যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কোন পক্ষেরই বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতির বিষয় কিছু জানা যায় নাই। মিত্রপক্ষ রণাঙ্গনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা চালাইতেছে এবং মিত্রপক্ষের নৌবহর ও আকাশবাহিনীর অতি বিষম অগ্নিবর্ষণ সত্ত্বেও জার্ম্মানসেনা ক্রমাগত পাণ্টা আক্রমণে তাহাদের স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এখনও মিত্রশক্তি যন্ত্রযুদ্ধের উপযোগী যথেষ্ট প্রসারিত ক্ষেত্র নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে নাই, ছোট ছোট অংশে বিভক্ত যুদ্ধাঙ্গনে অতি হিংস্রভাবে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে এবং তাহাতে গোলন্দাজ, পদাতিক, প্যারাট্রুপ ও যুদ্ধশকট একত্রে মিশিয়া সংহার কার্য্যে ব্যস্ত। এইরূপ যুদ্ধের প্রথম দিকে যাহা দেখা যায় তাহার সহিত শেষের পর্য্যায়ের কোন সম্বন্ধ থাকিতেও পারে বা না থাকিতেও পারে। এখন মিত্রপক্ষের চেষ্টা চলিতেছে পাণ্টা আক্রমণ ঠেকাইয়া বিপক্ষ দলের সৈন্যশক্তি যূথবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নিজেদের শক্তি ও অস্ত্রবল দৃঢ়ভাবে ফ্রান্সের ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপনা করার জন্য। অন্য দিকে জার্ম্মানদল চেষ্টা

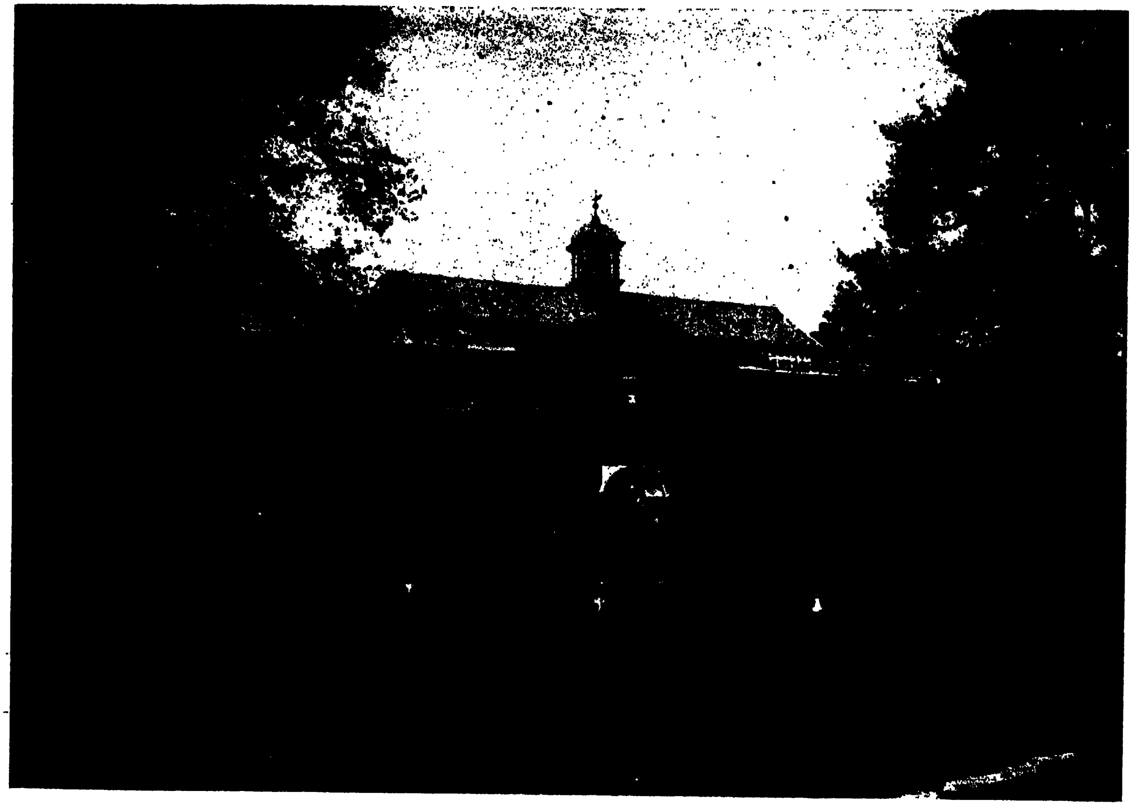
করিতেছে ঐ অগ্রপ্রসরের রণাঙ্গনে তাহাদের যুদ্ধশক্তির এক প্রবল অংশ একত্রিত করিয়া মিত্রপক্ষের স্থলশক্তির যে অংশ এখন ডাঙায় নামিয়াছে তাহাকে ধ্বংস করিতে। মিত্রশক্তি আক্রমণ আরম্ভই করিয়াছে অতি বিরাট্ শক্তির প্রয়োগে এবং তাহার পিছনে ও উপরে নৌবাহিনী ও আকাশবাহিনী যেরূপ অপরিমিত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে তাহা বর্ণনার অতীত।

ফলাফলের বিচার স্থগিত থাকিলেও এই আক্রমণে মিত্রপক্ষ ও জার্ম্মানদলের অর্থাৎ ইয়োরোপীয় অক্ষশক্তির মধ্যে শেষ শক্তিপরীক্ষার আরম্ভ হইল। এই ফ্রান্সের উত্তর-উপকূলে অবতরণ ও সেতুমুখ স্থাপনের চেষ্টার পর আরও অনেক স্থলে সেতুমুখ স্থাপনের ব্যবস্থা হইতে পারে, এমন কি মূল আক্রমণ-কেন্দ্র এখান হইতে হটিয়া অন্য কোথায়ও যাইতে পারে, কিন্তু ৬ই জুন ১৯৪৪ সালে যে শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাহা শেষ নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত চলিতে বাধ্য। ইতিমধ্যে কোন পক্ষই আর রচনা-পরিকল্পনার অবকাশ পাইবে না। জার্ম্মানির শক্তির কতটা অবশিষ্ট আছে, তাহার ইয়োরোপ দুর্গমালা সংরক্ষণের ব্যবস্থা কতটা দৃঢ় হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষের অসীম শক্তি সামর্থ্যের কতটা কিভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে এ সকলেরই পরীক্ষা এবার আরম্ভ হইল। পরীক্ষার শেষ কবে হইবে তাহা বলা অসম্ভব কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে তাহাতে বিশেষ দেরি হইলে মিত্রপক্ষের অন্য ক্ষেত্রে প্রমাদ গণিতে হইবে।

ইটালীতে রোম অধিকৃত হইয়াছে এবং মার্কিন জেনারেল ক্লার্কের অধীনস্থ পঞ্চম সৈন্যবাহিনী রোম ছাড়াইয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধ এখন কেবলমাত্র স্থানীয় জার্ম্মান সেনাদলের ধ্বংস সাধনের জন্য নহে বরঞ্চ ইটালীতে মুসোলিনীর পুনরভ্যুত্থানের পথ রোধের জন্য চলিয়াছে। রোমনগরী রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের পুণ্যতীর্থ এবং সেইজন্য তাহার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্নের লোপ পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। জেনারেল মার্ক ক্লার্কের পঞ্চম বাহিনী এবং জার্ম্মান রক্ষীদল রোমের পাশ কাটাইয়া যুদ্ধপ্রান্ত পিছাইয়া লওয়ায় সে ভয় যায়। রোমের সমতল ভূমিতে সংখ্যা ও অস্ত্রবলে লঘিষ্ঠ জার্ম্মানদলের পক্ষে যুদ্ধদান অসম্ভব নহে, বোধ হয় আরও উত্তরের পাহাড়-তলীতে তাহারা নূতন রক্ষাব্যূহ গঠনের চেষ্টা করিবে। রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষশক্তির ইটালীয় অংশীদার ফ্যাসিষ্ট দলের আশা-ভরসা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে বলা যায়, কিন্তু যত দিন উত্তর-ইটালীর নগরীগুলি জার্ম্মানদলের হাতে আছে তত দিন তাহা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হওয়া সম্ভব নহে এবং উত্তর-পূর্ব্ব ইটালী এবং আড্রিয়াটিক উপকূল মিত্রপক্ষের হস্তগত হইলে তবে যুগোশ্লাভিয়ার উদ্ধার সম্ভব হইবে, এই দুই কারণে ইটালীর যুদ্ধ এখনও মিত্রপক্ষের নিকট বিশেষ ভাবে অপরিহার্য্য এবং ইহাতে দ্রুত জয়লাভে ইয়োরোপের মহাসমরের শেষনিষ্পত্তির দিন বিশেষ ভাবে আগাইয়া আসিতে পারে।

রুশ রণপ্রান্তে সমরানল অস্তমিত হইয়া আসিয়াছিল, সম্প্রতি উত্তরে ফিনল্যাণ্ডের কারেলিয়া অঞ্চলে তাহা জ্বলিয়া উঠিবার আভাস দেখা দিয়াছে। সোভিয়েট সেনার গ্রীষ্ম অভিযান দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে চালিত হইবে এইরূপ ইঙ্গিত বহু বার পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত গঠনের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে রুশসেনা কিছু তৎপরতাও দেখাইতেছে, সুতরাং উক্তরূপ ব্যবস্থায় ইয়োরোপের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জার্ম্মান রক্ষী সেনা যুগপৎ প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়িবে ইহা অসম্ভব নহে। জার্ম্মানী এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তাহা হইলেও তাহার তিনটি সংখ্যা ও সঙ্গতিগরিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে তাহাকে পরাস্ত করিতে হইলে একসঙ্গে বহু দিক হইতে মিত্রপক্ষের সমস্ত শক্তির প্রয়োগে আক্রমণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রেই জার্ম্মান সেনা পূর্ব্ববৎ দুর্দ্ধর্ষ ভাব দেখাইতেছে এবং জার্ম্মানীর ভিতরে নৈরাশ্যের কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা দেয় নাই। মিত্রপক্ষ সৈন্যবলে ও অস্ত্রের ওজনে জার্ম্মানী অপেক্ষা বহুগুণ গরিষ্ঠ, কিন্তু জার্ম্মান যুদ্ধনেতৃবর্গ অতিশয় রণকুশলী এবং জার্ম্মান সেনা যুদ্ধপটু, ফলে ভয়ানক লোকক্ষয়কারী প্রলয়সদৃশ ঘোর রণের মধ্যেই ইয়োরোপের মহাসমরের শেষ অঙ্কের যবনিকাপাত হইবে মনে হয়।

ইয়োরোপে মিত্রপক্ষের কার্য্যপর্য্যায় শেষ হইতে কত দেরি হইবে কেবল তাহার উপরই বর্ত্তমান মহাসমরের সবকিছু নির্ভর করিতেছে। এ দিকে জাপান ক্রমশঃ শক্তি গঠন করিয়া চলিতেছে এবং ইতিমধ্যেই চীনদেশে যুদ্ধের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ম্মা প্রান্তেও জাপান সেরূপ কাহিল হইয়া পড়ে নাই, যদিও নাগা পর্ব্বত, মিচিনা ও মণিপুর অঞ্চলে মিত্রপক্ষের পরিস্থিতি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। ইহা এখন সর্ব্বজনবিদিত যে সময় পাইলে জাপান দ্বিতীয় জার্ম্মানী বা তদপেক্ষাও পরাক্রান্ত সমরশক্তিযুক্ত জাতিতে পরিণত হইবে। ইয়োরোপের যুদ্ধ যতই দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে জাপানের অবস্থার উন্নতি ততই অধিক হওয়া সম্ভব। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চীনের অবস্থা ক্রমশ শঙ্কাজনক হইয়া পড়িতে পারে। চীনের অবরোধ অটুট থাকিয়া যাওয়াতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে এবং সম্প্রতি সে অবরোধ ভাঙিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, বরঞ্চ দক্ষিণ-চীনে তাহা দৃঢ়তর হইবার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। স্বাধীন চীনের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথাও এখন সর্ব্বজনবিদিত। কত দিনে এই বীর জাতির অগ্নি-পরীক্ষার শেষ হইবে বলা অসম্ভব।







মণিপুর। ইম্ফলের চাষী



মণিপুর। ইম্ফলের রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির

আষাঢ়ে গল্প

বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ওয়েল্‌সের লেখা একটি আষাঢ়ে বৈজ্ঞানিক গল্প আছে। গল্পটি পৃথিবী ও মঙ্গল এই দুই গ্রহের যুদ্ধ নিয়ে। হঠাৎ একদিন মঙ্গল গ্রহ থেকে সেখানকার অধিবাসীরা এল পৃথিবী আক্রমণ করতে। মানুষের মত জীব তা'রা নয়, আমাদের মেরুদণ্ডহীন অক্টোপাস জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে তাদের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই জাতীয় জীবই বিবর্ত্তনের ফলে মঙ্গল গ্রহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছে।

পৃথিবীর লোকেরা প্রথমে এই অযাচিত ও অপরিচিত অতিথিদের প্রতি তেমন ভ্রূক্ষেপ করেনি কিন্তু যখন আততায়ীরূপে তাহাদের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করবার দরকার হ'ল, তখনই জানা গেল যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ তাদের অনেক পেছনে পড়ে আছে। মঙ্গলবাসীদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সমগ্র মানব জাতিই ক্রমশঃ লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। সামান্য যে কয়জন এ যুদ্ধে রেহাই পেয়েছিল তারা ইঁদুরের মত মাটির তলায় সুরঙ্গ কেটে রইল লুকিয়ে। মঙ্গলবাসীরা পৃথিবীর ওপর তাদের অদ্ভুত তিনপেয়ে যন্ত্রবাহনে চড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বিচরণ করতে লাগল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল বলেই মঙ্গলবাসীরা এই বাহন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই দারুণ দুর্দ্দিনে মানুষের সভ্যতা যখন পৃথিবী থেকে মুছে যেতে বসেছে তখন ঘটল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

হঠাৎ দেখা গেল বিজয়ী মঙ্গলবাসীর যন্ত্রবাহনগুলি কাতরভাবে দূর থেকে পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে। তার পর সে ধ্বনিও শোনা গেল না। ব্যাপার কি! ব্যাপার বোঝা গেল অনেক পরে। যে সম্ভাবনার কথা কেউ কল্পনাও করেনি তাই মানুষের সভ্যতাকে বিলুপ্তি থেকে বাঁচিয়েছে। মানুষের অস্ত্রবুদ্ধি, বিজ্ঞান যাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি, পৃথিবীর রোগের বীজাণুই হয়েছে তাদের কাল। মঙ্গলবাসীরা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে তাদের গ্রহকে রোগ-বীজাণুমুক্ত করেছিল। সেই বিশুদ্ধ আবেষ্টন থেকে পৃথিবীর দূষিত হাওয়ায় এসে তারা বীজাণুর আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। অনভ্যস্ত বলেই পৃথিবীর সাধারণ রোগও মহামারী রূপে তাদের নির্ম্মূল ক'রে দিয়েছে।

ওয়েলসের কাহিনী যত আজগুবিই হোক তার ভিত্তি আছে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর। সত্যই পৃথিবীতে অধিকাংশ রোগের বীজাণু সব সময়ে আমাদের কাবু করতে পারে না, আমরা তাদের সঙ্গে পরিচিত ব'লে। আমাদের দেহের মধ্যে তাদের প্রতিরোধ করবার শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করবার উপায় আমাদের শরীর জানে। শুধু যখন কোন বিশেষ কারণে আমাদের শরীর অতিরিক্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তার প্রতিষেধক শক্তি হারায় বা বিষাক্ত বীজাণুর অত্যধিক সংস্পর্শে আমরা আসি তখনই রোগ আমাদের দেহে প্রকাশ পায়। তাই যথা-সম্ভব বিষাক্ত বীজাণুর অতিরিক্ত ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার সঙ্গে আমাদের উচিত শরীর কোন কারণে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে **'ভাইনো-মল্টে'র** মত টনিক ব্যবহার ক'রে অবিলম্বে তাকে সবল ক'রে তোলা। রোগের বীজাণুও আরও অনেকের মত দুর্ব্বলেরই যম।

প্রকৃতির পাল্লা

প্রকৃতি-ঠাকরুণ কোথায় বসে কি ভাবে পাল্লা ঠিক রাখছেন তা আমরা অধিকাংশ সময় জানতে পারি না। জীবজগৎ নিক্তির ওজনে পরস্পরকে সামলে রেখেছে এবং তার ফলে সৃষ্টি চলেছে মসৃণ পথে কলের চাকার মত। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকৃতিঠাকরুণেরও তন্দ্রা আসে, সমানে দিনরাত জাগতে জাগতে কোন দিকে পাষাণ হয় কমতি, আর তৎক্ষণাৎ ঘটে বিপর্য্যয়। পঙ্গপালে আকাশ অন্ধকার হয়ে যেতে আমরা দেখেছি। রক্তবীজের মত কত অগণন ইঁদুরের উৎপাতে হঠাৎ কত দেশের শস্য-ক্ষেত্র নির্ম্মূল হয়ে যায় আমরা জানি, নরওয়ের উপকূলে ক্ষুদ্রকায় লেমিংএর দলে দলে সাগরজলে মৃত্যুবরণের বিস্ময়কর কাহিনী আমরা শুনেছি। জীবধাত্রীর নিক্তি না টললে এসব ব্যাপার ঘটতে পারে না। প্রত্যেক জীব-শ্রেণীকে চারি ধার দিয়ে প্রকৃতি যেসব রাশ দিয়ে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে সামলে রেখেছেন তার কোন কোনটি আল্‌গা হওয়ার ফলেই এ সব বিপর্য্যয় দেখা দেয়।

প্রকৃতি-ঠাকরুণের পাল্লা আবার সামলে নিতে অবশ্য দেরী হয় না, কিন্তু তার অনমনস্কতার সুযোগে রাশ ছিঁড়ে যারা ছিটকে বেরিয়েছে সেই বিদ্রোহীদের মার্জ্জনা তিনি করেন না কখনও। সৃষ্টির নিক্তি যারা টলায় তাদের কোথাও পরিত্রাণ নেই। নিয়মের বেড়াজালে এমন ক'রে চারিদিক ঘেরা যে শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাদের মাথা পেতে নিতেই হয়। দিন কতকের দৌরাত্ম্যের পর পঙ্গপাল লোপ পায়, লেমিংবাহিনী দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর তাড়নায় শেষ পর্য্যন্ত সাগরে ডুবে মরে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীই প্রকৃতির শাস্তির বাহক।

শাসনের এই বহর দেখে প্রকৃতিকে নির্ম্মম ভাবা কিন্তু ভুল। সকলের কল্যাণের জন্য প্রকৃতিকে একের প্রতি কঠোর হতে হয়। একজন জুড়ি আসরে ব'সে সারাক্ষণ গলা সাধলে যাত্রা মাটি হয়ে যায়। জীবনযাত্রায় কিন্তু জীবমাত্রেরই একা আসর মাত করবার জেদ। প্রকৃতিকে তাই সে জেদ খর্ব্ব ক'রে পাল্লা ভাগ ক'রে দিতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পোকাদের কথাই ধরা যাক। ষষ্ঠীর এমন কৃপা আর কারুর উপর নেই। পোকাদের মায়েদের তুলনায় গান্ধারীকে বন্ধ্যা বললে বেশী বলা হয় না।

পরমায়ু কারুর হয়ত একবেলা কিন্তু তাঁরা লাখ দু'-লাখের কম এক এক দফায় ডিম পারেন না। সে ডিম-ফোটা ছানারা সবাই বেঁচেবর্ত্তে বাপ-মায়ের নাম রাখতে পারলে পৃথিবীতে আর কারুর নাম শোনা যেত না। প্রকৃতিকে তাই নানা দিক দিয়ে রাশ টেনে এই বৃদ্ধি সামলাতে হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে তাঁর রাশ সর্ব্বত্র ছড়ান। যে পোকা আমাদের ফসলের ক্ষেত উজাড় করে—আমাদের আগেই তিনি তাকে সামলাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন আর এক পোকা দিয়ে। পোকার জাতের তারা কোকিল বলা যেতে পারে। পরের বাসায় শুধু নয়—পরের ডিমের ওপর তারা নিজের ডিমটি পেড়ে রাখে। তারপর পোকা-কোকিলের ছানা পরে ডিমটি মাইপোষ হিসাবে ব্যবহার করে ফোঁপরা করে বেড়ে ওঠে। ক্ষমাহীন প্রকৃতির এই কঠোর শাসন কিন্তু একটি প্রাণী শুধু মানে নি, এবং প্রকৃতির পাল্লা উল্টে দিয়েও সাজার বদলে হয়েছে তার পুরস্কার। মানুষ প্রকৃতির টানা সমস্ত গণ্ডি লঙ্ঘন করে মৃত্যুর নয় উন্নতির দিকেই এগিয়ে গেছে। প্রকৃতির পাল্লা এখন সে নিজের ইচ্ছামতই টলায়। আমাদের প্রত্যেকটি জনবহুল শহর প্রকৃতির শাসনের বিরুদ্ধে মূর্ত্ত বিদ্রোহ। এত সংকীর্ণ জায়গায় এত ভীড় করে আর কোন প্রাণী বাস করলে শুধু দুর্ভিক্ষ নয় মহামারীতেও উজাড় হয়ে যেত। মানুষ যে তা হয় না তার কারণ ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক খাদ্য-বণ্টনের ব্যবস্থা বদলাতে শিখে সে দুর্ভিক্ষ এড়িয়েছে, রোগ ও মহামারীকে জয় করতে সুরু করেছে, স্বাস্থ্যতত্ত্বের গূঢ় নিয়ম আবিষ্কার ও তা নিজের ওপর প্রয়োগ করে। নগরের পরিচ্ছন্নতার জন্য সুবিন্যস্ত পয়োনালী নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাকস্থলীর কার্য্য সুষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়া যে অতি আবশ্যক তাহাও আর তাহার অজানা নেই ; এবং সেই জন্য সামান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনেই **'বাই-ডায়াষ্টেজ'** বা **'বাই-ডায়াষ্টেজ কম্পাউণ্ড'** তাহাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হয় প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি ব্যর্থ করবার জন্য।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নং ১৫। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩৫০।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ও বিচিত্র ধারার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী হইতে যে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ শীর্ষক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অভিনব উদ্যম হইলেও প্রকাশের তৎপরতায়, রচনার উৎকর্ষে, এবং বিষয় ও লেখক নির্ব্বাচনের সতর্কতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুর মত অভিজ্ঞ ও সাবধানী লেখক বিরল। কোন প্রয়োজনীয় কথা বাদ না দিয়া, স্বল্পাকার পুস্তিকার মাত্র ৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি যে ইহার উৎপত্তি হইতে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন পর্য্যন্ত (১৭৯৫—১৮৭৩) বিস্তৃত ও তথ্যবহুল ইতিহাস সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাণ্ডিত্যের সার আছে, খোসার আড়ম্বর নাই। বাঙ্গালীর গৌরবময় প্রচেষ্টার এই লুপ্তপ্রায় অধ্যায়ের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তাঁহার বৃহত্তর গ্রন্থে হয়ত আরও সমগ্রভাবে পাওয়া যাইবে; কিন্তু এখানে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে, নিখুঁত তথ্যনিষ্ঠার সহিত, তিনি যাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের সুলভ ও অনায়াস জ্ঞানের পথ সুগম হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর অধ্যবসায়, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না, শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, বর্ত্তমান রচনা তাঁহার সুপরিচিত প্রতিষ্ঠার গৌরব কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ঋগ্বেদ—প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫৩ পৃষ্ঠা। মূল্য একটাকা মাত্র।

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় আমরা পূর্ব্বে সমালোচনা করিয়াছি। (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৯)। তখন আমাদের মনে একটা আশঙ্কা ছিল এই যে, ঋগ্বেদের মত বড় বই ভাষ্য, টীকা, অনুবাদ এবং আলোচনা সহ এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণ করা এক জনের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও কষ্টকর। বড় বই খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা আরও অনেক হইয়াছে। এই ঋগ্বেদের বেলায়ও অনুরূপ চেষ্টা আরও হইয়াছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে বই শেষ হয় নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও প্রকাশিকার নিবেদন দেখিয়া মনে হয়, ইতিমধ্যেই নানারূপ অসুবিধা দেখা দিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক, আরও দ্রুত প্রকাশ করিয়া বইখানা শেষ করিতে পারিলে সম্পাদক একটা বড় কাজ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই খণ্ডে শুনঃশেফ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু লেখক অধ্যাপক উইণ্টারনিজ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করিয়াছেন (৩৭ পৃঃ), তাহা আমাদের কাছে বড় অশোভন মনে হইয়াছে। উইণ্টারনিজ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। তাঁহাকে একটা অল্প-পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনে করা অসঙ্গত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় অধ্যাপকদের বিদ্যাবত্তা দ্বারাই হয়, ছাত্রসংখ্যা দ্বারা নয়। ভুলভ্রান্তি সকলেরই হয়, মতভেদও অসহনীয় হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তাই বলিয়া উইণ্টারনিজকে অপণ্ডিত মনে করা চলে না।

বইয়ের ছাপা-কাগজ এখনও ভালই আছে। প্রকাশ-কার্য্য আরও দ্রুত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—শ্রীসুকুমার সেন। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকায় পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশের 'রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংসারিক জীবনের' আংশিক ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রধানতঃ সমসাময়িক সাহিত্য ও শিলালিপি প্রভৃতি হইতে এই পরিচয় সংকলিত হইয়াছে। কচিৎ পরবর্ত্তী সাহিত্য হইতেও পূর্বকালের অবস্থার অনুমান করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বহু সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। তবে কোথাও কোথাও মূলের সহিত অনুবাদের কিছু কিছু অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর, বইখানি সুরচিত। সাধারণ পাঠক ইহা পাঠ করিলে প্রাচীন বাঙালীর জীবনধারা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

সম্বন্ধ নির্ণয়—ষষ্ঠ পরিশিষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, চতুর্থ সংস্করণ। পৃষ্ঠা, ১—৭৬+১—১৬৪+১—৬৪, মূল্য দুই টাকা আট আনা। ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

১৩৪৯ সালের ভাদ্রের প্রবাসীতে প্রথম হইতে পঞ্চম পরিশিষ্টের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। ষষ্ঠ পরিশিষ্টের 'প্রথম খণ্ডে কেবল ব্রাহ্মণ বংশ, দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী ও তৃতীয় খণ্ডে বঙ্গের বাহিরে ও প্রবাসী বাঙ্গালীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।' আলোচ্য পরিশিষ্টে যে সকল খ্যাতনামা মহাপুরুষের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অন্নদামঙ্গল রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় ও পাঁচালিকার দাশরথি রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, আধুনিক যুগের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরও উল্লেখ ও পরিচয় ইহাতে আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বাঁকা স্রোত—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাস। পিতৃ-মাতৃহীন আশৈশব স্নেহবঞ্চিত একটি ছেলের করুণ জীবনের ছবি লেখক আঁকিয়াছেন। অত্যন্ত সাধারণ জীবন সঙ্কীর্ণ তার পরিধি, যে দুর্দ্দম প্রাণচাঞ্চল্যে দুঃখ-লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করিবার সাহস ও শক্তি লাগে তাহার আয়োজনও অপ্রচুর, অথচ দুঃখ বহনের যোগ্যতায় সে কাহারও চেয়ে ন্যূন নহে। শৈশবের বঞ্চনা তাহার সারা জীবনকে—সাফল্যের বহু সুযোগ আসা সত্বেও—যে এইভাবে পঙ্গু করিয়া দিতে পারে তাহাও মানিয়া লওয়া কঠিন। পথ-চলার কাহিনী বর্ণনায় দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যে কৃপণ বলিয়া পাঠকের মনকে সর্ব্বক্ষণ যুক্ত করিয়া রাখে না। মনে হয়, আরও সংক্ষিপ্ত হইলে স্বল্পপরিসর পটভূমিকায় অতি সাধারণ জীবনকে ধরিয়া রাখিবার সুবিধা হইত। তথাপি, কাহিনী শেষে এই ছন্নছাড়া ভাগ্যবিড়ম্বিত ছেলেটি মনের মধ্যে একটি গভীর বেদনার রেখা অনায়াসে আঁকিয়া দেয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কস্তুরবাঈ গান্ধী—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড লিমিটেড, ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০।

মহাত্মা গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্বের আড়ালে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কস্তুরবাঈয়ের সমস্ত সত্তা যে আড়াল পড়িয়া যায় নাই, বর্ত্তমান পুস্তকটি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। শ্রীমতী কস্তুরবাঈ আদর্শ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। গান্ধীজীর সেবা ও পরিচর্য্যায় তাঁহার জীবনের অধিকাংশই ব্যয়িত হইয়াছে ইহাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁহার নির্ম্মল স্বার্থলেশশূন্য স্বদেশপ্রেম। যখনই দেশের ডাক আসিয়াছে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাতে সাড়া দিয়াছেন, কারাবরণের ক্লেশ, স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের বেদনা কিছুই তাঁহাকে কাতর করিতে পারে নাই। লেখক বহু যত্নে ও পরিশ্রমে শ্রীমতী কস্তুরবাঈয়ের নিজস্ব কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বইখানি ঘরে ঘরে প্রচারিত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

প্রহত উপল—কয়েকটি কবিতা। শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত, প্রতীপ দাশগুপ্ত, নীতিশ দাশগুপ্ত, রেবা দাশগুপ্তা। দাশগুপ্ত পাবলিশার্স। দাম চার আনা।

প্রথম কবিতা—রেবা দাশগুপ্তার 'ধীবর কুমার' ছন্দের ত্রুটিসত্ত্বেও মন্দ লাগল না। 'বেদুইন' এবং 'ঝড়ে', "পলিটিক্স, সোস্তালিজম, ষ্ট্যালিন, হিটলার, ইউবোট, ক্যাপ্টেন, কমরেড" অনধিকার প্রবেশ ক'রে প্রচুর ধুলো উড়িয়েছে। শেষের দু'টি কবিতাতেও "রডডেনড্রন, পীগ-ম্যালিয়ান, গ্যালেসিয়া, মীনাভো, কিউপিড এবং সুধাময়ী" প্রভৃতির উৎপাত। স্থানে স্থানে কবিত্বের আভাস আছে, কিন্তু ভাষার যথেচ্ছাচারে তার প্রকাশ বাধা পেয়েছে।

বিজন সাথী—কাজি হসমৎ উল্লা। পুস্তকালয়, বাঁকুড়া। মূল্য আট আনা।

একত্রিশটি কবিতা। ভাব ও ভাষা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন।

লজ্জাবতীর দেশ—রূপক-নাটিকা। শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত। দীপালি গ্রন্থমালা। দাম ছ' আনা।

অন্দরমহল থেকে সদরে বেরিয়ে এলেন রাজকুমারী লজ্জাবতী, 'তাঁর দেশ গেল ধ্বংস হয়ে। দুঃখের মধ্য দিয়ে আসবে নূতন জীবন, হবে নূতন সূর্যোদয়, তারই আশ্বাসে নাটিকা পরিসমাপ্ত। রচনায় কমনীয়তা আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আনন্দদর্শন—শ্রীমৎ যোগানন্দ পরমহংস, শ্রীশ্রীযোগব্রহ্মবিদ্যা-শ্রম, পাবনা। মূল্য।০ আনা।

৩৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তিকায় গ্রন্থকার হিন্দু সাধক জীবনের উচ্চতত্ত্বসমূহ সরল পয়ার ছন্দে চৌত্রিশটি অংশে পরিবেশন করিয়াছেন। জীবনকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিলে আনন্দ সাক্ষাৎকার লাভে মানুষ সদানন্দময় হইতে পারে তার সন্ধান মরমী সাধক ইহাতে পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বাংলা বর্ষলিপি (১৩৫১)—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—এ, মুখার্জ্জি য়্যাণ্ড ব্রাদার্স। ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ১৬৪+৩৮; মূল্য দেড় টাকা।

বাংলা ভাষায় 'ইয়ার-বুক'-জাতীয় গ্রন্থ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এই তথ্যবহুল পুস্তকখানা সেই অভাব পূরণ করিবে। ইহাতে শুধু বাংলাদেশই নয়, পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৩৫০ সালের মন্বন্তর, দ্বিতীয় মহাসমর প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায় সুলিখিত। ১৩৫০ সালের 'বাংলা সাহিত্য' এবং বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালীদের বিবরণ অসম্পূর্ণ। পরিশিষ্টে ১৩৫১ সালের সম্পূর্ণ দিন-পঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানা শুধু, ছাত্র, শিক্ষাব্রতী বা সাংবাদিকদের পক্ষেই নয়, বাঙালী গৃহস্থেরও বিশেষ কাজে আসিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

বিপাশবিহারী সরকার

জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়া পরিণত বয়সে যাঁহারা ইহধাম পরিত্যাগ করেন, শ্রদ্ধার সহিত আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করি, কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতি ও দেশের সেবায় আত্মদানের সকল সম্ভাবনাপূর্ণ যে তরুণ প্রাণ অকালে ঝরিয়া যায় তাহার সন্ধান অনেকেই রাখি না। ভারাক্রান্ত চিত্তে আমাদের একান্ত স্নেহ-



বিপাশবিহারী সরকার

ভাজন যুবক বিপাশবিহারী সরকারের অকাল মৃত্যুর সংবাদ আমাদিগকে দিতে হইতেছে। বিপাশবিহারী ছিল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রদৌহিত্র, ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ মনীষী বিজয়চন্দ্র মজুমদারের দৌহিত্র এবং অধ্যাপক বিজলীবিহারী সরকারের একমাত্র পুত্র। দুর্ভিক্ষের পর রোগে শোকে মৃত্যুতে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসক ও ঔষধ প্রেরণের জন্য বাংলা-সরকার যে পরিকল্পনা করেন তাহাতে যোগদানের জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ আহূত হয়। পাস করা ডাক্তারের অভাবে শেষ পর্যন্ত ছাত্রদেরই ডাক পড়িয়াছিল। অধীর আগ্রহে বিপাশ জনসেবার এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং উহাতে যোগদানের জন্য বন্ধুগণকে উৎসাহিত করে। বিপাশ নিজে সব চেয়ে খারাপ কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার খরজুনা গ্রামটি বাছিয়া লয়। দেশবাসীর দুঃখের বাস্তব রূপ দেখিবে, রোগে চিকিৎসা করিয়া তাহাদিগকে একটুখানি সান্ত্বনা দিবে ইহাই ছিল তাহার আকাঙ্ক্ষা। অসীম উৎসাহে পায়ে হাঁটিয়া বহু দূর গ্রামেরও রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া সে ঔষধ দিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে দুই সপ্তাহ পরেই বিপাশ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। চারি দিন জ্বর ভোগের পর অতিকষ্টে একটি গরুরগাড়ী সংগ্রহ করিয়া সারারাত্রি উহাতে বসিয়া ষ্টেশনে আসিয়া তাহাকে কলিকাতাগামী ট্রেন ধরিতে হয়। এই জ্বর টাইফয়েড বলিয়া ধরা পড়ে এবং টাইফয়েডের সকলরকম জটিলতা একসঙ্গে দেখা দেয়। উহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

বিপাশবিহারীর হাতে খড়ি দিয়াছিলেন ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ঋষি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ম্যাট্রিকুলেশন সে ভালভাবেই পাস করিয়াছিল। আই. এসসিতে বায়োলজিতে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। আই. এসসি পাস করিয়া সে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়। প্রথম এম. বিতে ডবল অনার্স লইয়া সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়। ডাক্তারীর কোর্স শেষ করিতে তাহার দুই বৎসর বাকী ছিল, তবুও অধ্যাপকেরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন এ ছেলের ডাক্তারীতে স্বাভাবিক প্রতিভা আছে। রোগ-নির্ণয়ে তাহার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ৩৩ দিন রোগভোগের পর নিজের অন্ত্রে ছিদ্র হইয়াছে সব কারণ দেখাইয়া সে তাহা বলিয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে অস্ত্রোপচারের জন্য মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

লেখাপড়ার সহিত খেলাধুলা এবং ব্যায়াম-চর্চ্চার অপূর্ব্ব সমন্বয় বিপাশের মধ্যে ছিল। খুব বড় খেলোয়াড়ের নিকট ভিন্ন কোন স্পোর্টে কখনও সে হারে নাই। লম্বা দৌড়ে তাহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাকেও সে সাধনার বস্তু বলিয়াই মনে করিত। পরীক্ষা কেন্দ্রের ন্যায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে উপনীত হইবার পূর্ব্বেও সে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত করিয়া লইত। বন্ধুবাৎসল্যেও সে ছিল অদ্বিতীয়।

পণ্ডিত শিবনাথের ধর্ম্মভাব বিপাশের চরিত্রে অনেকখানি অর্শিয়াছিল। রোগ-যন্ত্রণা অসহ্য হইলে সে "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়" এই মহামন্ত্র শুনিতে চাহিয়াছে এবং শুনিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে। সব কিছু মঙ্গল, সুন্দর ও মহৎ লক্ষণ লইয়া যে জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল, মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তাহার অবসান সমগ্র দেশের দুর্ভাগ্য।

ডাঃ প্রমথনাথ রায়

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম্মান, ইতালীয়ান ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ রায় এম-এ, ডি-লিট ৪৩ বৎসর বয়সে কাশীতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। ডাঃ রায়ের নিবাস ছিল কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বনগ্রামে।

নিজ মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া বহু ইউরোপীয় ভাষায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। নব্য ইতালী সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লেখা তাঁহার দুইখানি পুস্তক আছে।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ১লা জুন তাঁহার লক্ষ্ণৌস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ মৈত্র কাশীর খ্যাতনামা ডাক্তার স্বর্গীয় লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের পুত্র। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুরে বালিয়াকান্দি গ্রামে। অধ্যক্ষ মৈত্র ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কার্য্যে যোগদান করেন। তিনি শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজেও কিছুকাল অধ্যাপকের কার্য্য করেন। এই সময় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। মৈত্র মহাশয় শেষে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ মৈত্র বাংলার সাহিত্য জগতেও বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি প্রধানতঃ কবি হিসাবেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। প্রথমে তিনি সুরেশ্বর শর্ম্মা এই ছদ্মনামে কবিতা লিখিতেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্য হইতে ব্রাউনিং, শেলী, কীট্‌স প্রভৃতি কবিগণের বহু কবিতা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' একখানি প্রসিদ্ধ কাব্যানুবাদ গ্রন্থ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন। 'প্রবাসী'তে তাঁহার বহু কবিতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

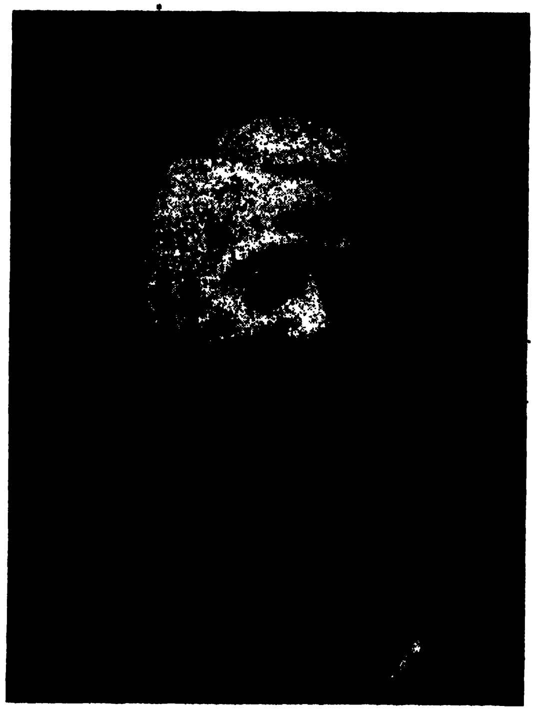
অধ্যক্ষ মৈত্র একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তাঁহার মধ্যে একাধারে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত প্রতিভার এই ত্রিধারার সমন্বয় ঘটিয়াছিল।

সরোজনাথ ঘোষ

প্রবীণ সাহিত্যিক সরোজনাথ ঘোষ গত ২৮শে বৈশাখ সত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি একনিষ্ঠভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তিনি কথাসাহিত্যিকরূপেই পরিচিত ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক সম্পাদিত সাহিত্যে তাঁহার বহু ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষে তিনি দৈনিক বসুমতী ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করেন। মাসিক বসুমতীতে তাঁহার অনেক ছোট গল্প ও বহু সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র বসু

দানবীর কৃষ্ণচন্দ্র বসু গত ৩০শে বৈশাখ পরলোকগমন করিয়াছেন। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সঙ্গীত কলার দিকে আকৃষ্ট হন এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। দান ধর্ম্ম ছিল তাঁহার হৃদয়ের প্রধানতম বৃত্তি। তাঁহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে "যোগেন্দ্র হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্পোরেশনের হাতে সমর্পণ করেন। কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের "যোগেন্দ্র ওয়ার্ড" তাঁহারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও বহু দান ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

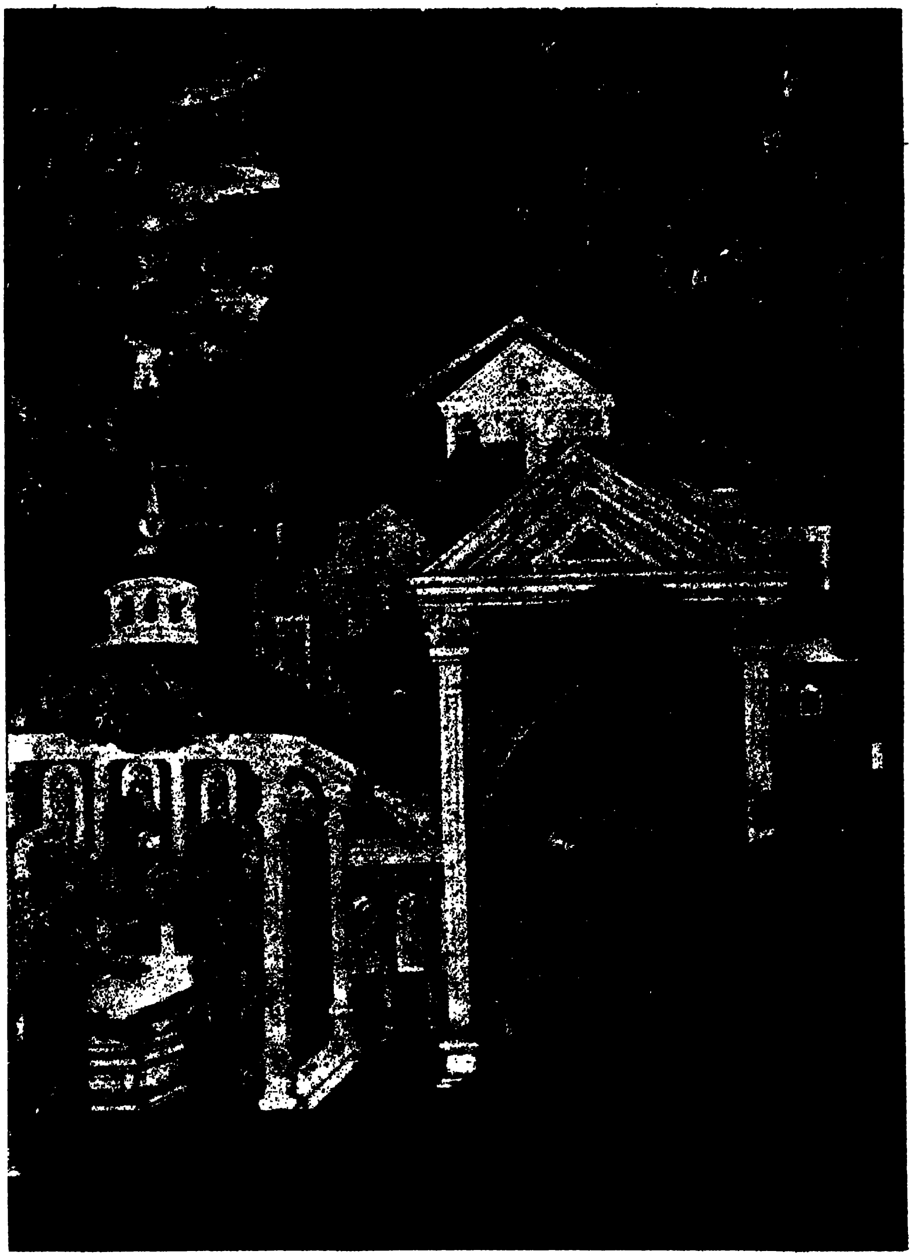


কৃষ্ণচন্দ্র বসু

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

সম্প্রতি উক্ত সমিতির সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত ১৯৪৩ সালের হিসাব এবং ব্যালান্স সীট হইতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে সোসাইটির কার্য্য আশাতীত রূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উক্ত বৎসরের ব্যবসায়ের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইন্স্যুরেন্স ফণ্ডেও ঐ বৎসরে ৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ঐ ফণ্ডে ছিল পাঁচ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। যদি কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় তাহা হইলে খুবই আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে সোসাইটি অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইবেন। গত বৎসরের ব্যবসায়গত সাফল্যের জন্য সোসাইটি উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সেণ্ট জন
(সপ্তদশ শতাব্দী)

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৫১ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজাজীর দৌত্য

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের সহিত রফা-নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান মিলন অসম্ভব। মুসলিম লীগ যে দেশের সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধি নহে এবং উহার সর্বশেষ দাবী পাকিস্তান যে সব মুসলমান সমর্থন করেন নাই ইহা আমরা দেখাইয়াছি। রাজাজীর প্রস্তাব এই :

(১) মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেন এবং পরিবর্তন কালে (অর্থাৎ পরাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থার স্থানে স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন পর্যন্ত) দেশে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার কার্য্যে কংগ্রেসের সহিত সহযোগ করিবেন।

(২) যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব ভাগে সংলগ্ন যে সকল জেলায় মুসলমানরা সুস্পষ্ট রূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল জেলা স্বতন্ত্র করিবার জন্য এক কমিশন গঠন করা হইবে। ঐরূপ ভাবে বিভক্ত অঞ্চলে হিন্দুস্থান হইতে সে সকল বিচ্ছিন্ন করা সম্বন্ধে অধিবাসিগণের মত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে।"

রাজাজীর এই প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধী সম্মতি দিয়াছেন। প্রস্তাবটি মিঃ জিন্নাকে জানাইবার সময়েও তিনি উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, উহা প্রকাশিত হইবার পরও তিনি "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" সম্পাদককে জানাইয়াছেন উহাতে তাঁহার সম্মতি আছে। রাজাজীর প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী মুসলমানদিগকে "সাদা চেক" দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ প্রস্তাবে কি কোন ফল হইয়াছিল? সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে তিনি "না গ্রহণ, না বর্জন" নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাহা কি মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিল? তিনি মিঃ জিন্নাকে ভারতের প্রধান-সচিব করিবেন বলিয়াছিলেন; ইহাতে কি মিঃ জিন্নার মনোবৃত্তিতে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল? গান্ধীজী কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, মিঃ জিন্নার নিকট ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে সুফল হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের যে অংশের সহিত মিঃ জিন্নাকে প্রদত্ত প্রস্তাবের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য ছিল, তাহা কি তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন না? যদি তিনি স্বীকার করিয়া লন যে কোন স্থানের একই ধর্মাবলম্বী অধিকসংখ্যক লোক ভোটের দ্বারা ঐ স্থান হিন্দুস্থান হইতে পৃথক করিয়া লইতে পারে, তবে এই দাবীও কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবে কি না হইবে তাহা ভারতবর্ষের অধিকসংখ্যক লোক দ্বারাই স্থিরীকৃত হইবে? এইরূপ একটা মতভেদাত্মক ও গুরুতর বিষয়ে মিঃ জিন্নাকে কথা দিবার পূর্বে অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহের প্রতিনিধি, বিশেষতঃ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের অভিমত লওয়া কি তাঁহার নৈতিক কর্তব্য ছিল না।

বাংলার হিন্দুরা পূর্বেও গান্ধীজীর নিকট হইতে সুবিচার পায় নাই। রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক মূল বাঁটোয়ারায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তপশীলভুক্তদের জন্য ১০টি আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল, পুণা-চুক্তিতে গান্ধীজী উহা বাড়াইয়া ৩০টি করিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাংলা দেশের মত গ্রহণ করা হয় নাই এবং ইহার ফলে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের শক্তি বাড়িয়াছে।

বাংলার মুসলমানদের আলাদা কোন সংস্কৃতি নাই। বাংলার মাটিতে ইহাদের উদ্ভব, বাংলা ইহাদের মাতৃভাষা, বাংলার ইতিহাস ইহাদেরও ইতিহাস, বাংলার মাটিতেই ইহাদের জন্ম ও মৃত্যু। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ শুধু ধর্মের। এই পার্থক্য যে অনন্তকাল স্থায়ী হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? সুতরাং মাত্র এক বা দেড় শতাব্দীতে যে প্রভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই চূড়ান্ত ও একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া বাংলাকে পাকিস্তানে পরিণত করিবার প্রস্তাবের মধ্যেই বা মুক্তি কোথায়? বাংলা ছাড়া পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতিও পাকিস্তানের কুক্ষিগত হইতে রাজি নয় ইহাও ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। এমনি অবস্থায় রাজাজীর ভারত বিভাগ প্রস্তাব শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকারকই হইতে পারে।

মুসলিম লীগের ঋণ গ্রহণ

মুসলিম লীগের প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের কারণ অনুসন্ধান করা খুব কঠিন নয়। লর্ড কার্জন ও লর্ড মিণ্টোর উৎসাহে ইহার জন্ম। মিঃ আমেরী ও লর্ড লিনলিথগোর সহায়তায় ইহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মুসলিম লীগ কোন দিনই ভারতবর্ষের সকল মুসলমানের প্রতিনিধি ছিল না, আজিও এই অধিকার সে অর্জন করিতে পারে নাই। ভাগ্যান্বেষী কয়েকজন ধনী মুসলমান নবাব, জমিদার প্রভৃতি মুসলমানদের নামে এই লীগের সাহায্যে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। লীগের জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত উহার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯০৬ সালের দুইটি ঘটনায় মুসলিম লীগের জন্ম। প্রথম, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান সমাজও হিন্দুদের ন্যায় ক্ষুব্ধ হন এবং তীব্র ভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন পরিচালিত হয়। বঙ্গভঙ্গকে সলিমুল্লা খাঁ Beastly Arrangement নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন নবাব সাহেবকে এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা নাম মাত্র সুদে ঋণ দিয়া তাঁহাকে হাত করেন। ইহার পর হইতে নবাব সলিমুল্লা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের হাতের পুতুল হইয়া পড়েন। পূর্ব-বঙ্গের সকল মুসলমান কিন্তু এই ব্যাপারে ভোলেন নাই। নবাবজাদা খাজা আতিকুল্লা খাঁ ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন: পূর্ব-বঙ্গের মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আসল কথা এই যে, কতিপয় নেতৃস্থানীয় মুসলমান আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইহা মানিয়া লইয়াছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা, লর্ড মিণ্টোর নিকট আগা খাঁ ডেপুটেশন। ইহারা মুসলমানদের জন্য ব্যবস্থাপক সভা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি সর্বত্র সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়াছিলেন। মনের মত দাবী উঠায় লর্ড মিণ্টো অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন: "আপনাদের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত।" ("I am entirely in accord with you")

ডেপুটেশনের সাফল্যে খুসী হইয়া নবাব সলিমুল্লা অতঃপর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের একটি আলাদা সঙ্ঘ গঠনের জন্য ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনেই মুসলিম লীগ গঠিত হয়। নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নায়ক হন আগা খাঁ।

প্রথম লীগওয়ালারাও সব মুসলমানকে দলে পান নাই। নবাব সৈয়দ মহম্মদ আগা খাঁ ডেপুটেশনে যোগ দিতেই অস্বীকার করেন। এক বৎসরের মধ্যেই লীগে দুইটি দল হইয়া যায়—এক দলের নায়ক হন সর মহম্মদ শফী, অপর দল পরিচালনা করেন মিঞা ফজলি হোসেন। কয়েক বৎসর পরে এই দুই দল এক বার মিলিয়া পরে আবার ভাঙ্গিয়া যায়।

মুসলমান সমাজের বিখ্যাত নেতা মৌলানা শিবলি নোমানি লীগের কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলিম গেজেটে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন: "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকেও কি রাজনীতি আখ্যা দিতে হইবে? রাজনীতির অর্থ শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ নির্ণয়, শাসিতদের নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঝগড়া-বিবাদকে রাজনীতি বলে না।" ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও মুসলমানদের মধ্যে মৌলানা শিবলির প্রভাব অসাধারণ ছিল। তিনি সর সৈয়দ আমেদের বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন, জাতীয়তা-বিরোধী কার্য্যকলাপের সমর্থনে সর সৈয়দের নাম: টানিয়া আনিলে তিনি সর্বদা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ইঁহার অসংখ্য মন্ত্রশিষ্যের অন্যতম।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল। এই ব্যাপারে মুসলমানদের মত না লওয়াতে নবাব সলিমুল্লা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তুরস্কের বিখ্যাত যুব আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষেও আসিয়া লাগে। এই আন্দোলন দমনে ইংরেজের সহায়তায় ভারতীয় মুসলমানেরাও অসন্তুষ্ট হয়। এদিকে মৌলানা শিবলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নূতন নূতন মুসলমান নেতা যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। ডাঃ আনসারী এক দল চিকিৎসক লইয়া তুরস্কে যান। তরুণ আবুলকালাম আজাদ আলহিলাল নামে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া জাতীয়তার বাণী প্রচার করিতে থাকেন। মৌলানা মহম্মদ আলিও তখন ইংরেজী কমরেড এবং উর্দ্দু হামদার্দ পত্রিকা পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনিও আসিয়া আবুলকালামের সহিত যোগ দেন। মুসলমান সমাজে জাতীয়তাবাদের এই অভ্যুদয় লীগ উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। ১৯১৪ সালের লীগ অধিবেশনে ডাঃ আনসারী, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ এবং হাকিম আজমল খাঁ যোগদান করিলেন এবং এই অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমান মিলন স্থাপনের চেষ্টার উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হইল।

মুসলিম লীগের ঋণ পরিশোধ

ইহার পর আসিল গত মহাযুদ্ধ। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

দেওবন্দের মৌলানা মামুদ-উল-হাসান তাঁহার শিষ্য ও বেদুল্লা সিন্ধিকে জর্মান ও তুরস্কের রাজদূতদ্বয়ের সহিত পরামর্শের জন্য কাবুল পাঠাইলেন। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে আমীরকে প্ররোচিত করাও অপর উদ্দেশ্য ছিল। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে প্রথম সভাপতি করিয়া স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল মৌলানা সাহেবের স্বপ্ন। ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। মৌলানা সাহেব এবং তাঁহার সহকর্মী মৌলানা হুসেন আমেদ নাদভি ও মৌলবী আজিজ গুলকে গ্রেপ্তার করিয়া মাল্টায় অন্তরীন করা হয়। পর বৎসর মহম্মদ আলি, সৌকৎ আলি, আবুলকালাম আজাদ এবং হজরত মোহানিকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯১৫তে মুসলিম লীগ রাজনীতির মোড় ঘুরিয়া গেল। কংগ্রেসের সহিত একসঙ্গে লীগের অধিবেশন হইল এবং মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মালবীয় এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উহাতে যোগদান করিলেন। লীগের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে সজ্ঘবদ্ধ করা, উহা এই ভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া লীগের স্থায়ী সভাপতি আগা খাঁ পদত্যাগ করিলেন। লীগে মিঃ জিন্নার প্রতিষ্ঠা এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের সহিত একযোগে শাসন-সংস্কারের খসড়া তৈরি করা হউক, এই প্রস্তাব মিঃ জিন্নাই প্রথমে লীগের সমক্ষে উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের আলোচনা অনুসারে যে চুক্তি হয় তাহাই লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে বিখ্যাত। এই চুক্তিতেই প্রথম দাবী করা হয় যে ভারতবর্ষকে অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বায়ত্তশাসনশীল ডোমিনিয়ন-সমূহের সমকক্ষ রূপ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদাররূপে পরিগণিত করা হউক। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী স্বীকার করা হইয়াছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে দেশে যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর অনেক দিন পর্য্যন্ত লীগ জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচার করিয়াছে। ১৯১৭ সালে কারারুদ্ধ মৌলানা মহম্মদ আলি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে মামুদাবাদের রাজা তাঁহার অভিভাষণে বলেন: "দেশের স্বার্থ সকলের উর্দ্ধে। আমরা আগে মুসলমান কি আগে ভারতীয় ইহা লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। সত্য কথা এই যে আমরা দুই-ই, কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তাহা লইয়া বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন।" মৌলানা আবদুল বারি, মুফতি কিফায়েতুল্লা, মৌলানা আহমদ সৈয়দ প্রভৃতি বিখ্যাত উলেমারাও এই সময় লীগে যোগ দিয়াছিলেন।

খিলাফৎ আন্দোলন

১৯১৮-তে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর খিলাফৎ আন্দোলন ভারতীয় মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসের আরও নিকটে টানিয়া আনিল। মাল্টা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মৌলানা মামুদ-উল-হাসান ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ১৯১৯-এ জমিয়ত-উল-উলেমা ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুসলমানদিগকে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া জমিয়তের বিখ্যাত ফতোয়া প্রচারিত হয়। ৪২৫ জন বিখ্যাত মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ প্রথমেই এই ফতোয়া স্বাক্ষর করেন, পরে আরও ৪৭০ জন উহাতে নাম দেন। ইহার অল্প দিন পরে মৌলানা সাহেবের মৃত্যু হয় এবং মুফতি কিফায়েতুল্লা জমিয়তের নেতৃপদে বৃত হন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর কংগ্রেস আন্দোলন জমিয়ত-উল-উলেমা সমর্থন করিয়াছেন এবং উহার অনেক নেতা কারাবরণও করিয়াছিলেন। ১৯৩৯-এর আজাদ মুসলিম সম্মেলনেরও জমিয়ত প্রধান সমর্থক ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যোক্তারা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিলেন। মাথা তুলিবার প্রথম সুযোগ তাঁহারা পাইলেন ১৯২৭-এ সাইমন কমিশনের আগমনে। সমগ্র দেশ যখন কমিশনকে বয়কট করিল, ইহারা তখন উহার সহায়তা করিতে চাহিলেন। কিন্তু তখনও লীগের জাতীয়তাবাদী দল যথেষ্ট প্রবল। প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতা মালিক ফিরোজ খাঁ নূন এবং সর মহম্মদ ইকবাল লীগের কলিকাতা অধিবেশনে সুবিধা করিতে না পারিয়া সভাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং লাহোরে সর মহম্মদ শফীর সভাপতিত্বে এক পাল্টা অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহাতে যে-সব "প্রতিনিধি" যোগ দেন তাঁহাদের সংখ্যা ছিল—পঞ্জাব ৩০০, যুক্ত প্রদেশ ২১, সীমান্ত প্রদেশ ১২, বোম্বাই ৬, দিল্লী ৬, কলিকাতা ৪, সিন্ধু ৩—মোট ৩৫২। সর মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ সাইমন কমিশনকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রস্তাব আনেন এবং উহা পাস হয়। এ দিকে কলিকাতায় লীগের অধিবেশনে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে সাইমন কমিশন বয়কটের প্রস্তাব এবং বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির দাবী গৃহীত হয়। সর্বদলসম্মতিক্রমে ভারত-শাসনতন্ত্র রচনার জন্য লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই গ্রহণ করে। নেহেরু রিপোর্ট রচিত হয়। ১৯২৯-এর দিল্লী লীগ অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্ট আলোচনার সময় প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবাদী দুই দলে তীব্র মতভেদ হয়। শেষোক্ত দল সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া রিপোর্ট গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। মিঃ জিন্না ছিলেন সভাপতি; তিনিও ভুল করিলেন। কোন মীমাংসা না হওয়াতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি সম্মেলন স্থগিত করিয়া দিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা

লীগ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ; লীগ এবার সম্পূর্ণরূপে মডারেটদের করায়ত্ত হইল।

১৯৩১-এ জাতীয়তাবাদী মুসলমান সম্মেলনের সভাপতিরূপে সর আলি ইমাম যৌথ নির্বাচন সমর্থন করিয়া জানাইলেন যে দেশের সকল স্থান হইতে যৌথনির্বাচনের সমর্থনে তিনি লক্ষ লক্ষ বাণী পাইয়াছেন।

এলাহাবাদে লীগের অধিবেশন

সর মহম্মদ ইকবালের সভাপতিত্বে লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে মাত্র ৭৫ জন লোক যোগদান করিল। পরবর্তী অধিবেশন সর মহম্মদ জাফরুল্লার সভাপতিত্বে দিল্লীতে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় কোনরূপে সমাধা করা হইল। ১৯৩৭-এ মিঃ জিন্না পুনরায় সভাপতি হইয়া লীগ পুনর্গঠনের চেষ্টা করিলেন। এই বৎসরই লীগ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সমর্থন করিল। ১৯৩৬-এ লীগের বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতি সর উজীর হাসান হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়োজনীয়তার উপর আবার জোর দিলেন। ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইনের ফেডারেল স্কীম বর্জন করিয়া এই অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৯৩৭-এ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে মন্ত্রীমণ্ডলে স্থানলাভ এবং চাকুরি প্রভৃতির ভাগাভাগি লইয়া লীগ মাতিয়া উঠিল। ১৯৩৮-এ কলিকাতায় মিঃ জিন্না কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি হইল পাকিস্তানের দাবী। জাতীয়তাবাদী-সঙ্ঘ হইতে লীগকে বিচ্যুত করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, সর মহম্মদ সফী, ফিরোজ খাঁ নূন, সর জাফরুল্লা প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদের প্রত্যেকেই গবর্মেন্টের নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ; আজও করিতেছেন। নবাব সলিমুল্লার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন মিঃ জিন্না ও খাজা নাজিমুদ্দীন।

ভারতের সমগ্র মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দাবী মুসলিম লীগ কোন মতেই করিতে পারে না। জমিয়ত-উল-উলেমা এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল আজও বর্তমান আছে। উহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও লীগের চেয়ে কম নয়। তাহার উপর অরহর দল, মোমিন দল এবং খাকসার দলও শক্তিতে ও প্রতিষ্ঠায় উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমোক্ত দুই দল গোড়া হইতেই লীগবিরোধী। বাঙলাতেও লীগবিরোধী শক্তিশালী একটি কৃষক প্রজা দল বর্তমান। খাকসার দলও লীগের পতাকাবাহী নহে। ভারতের নয় কোটি মুসলমান লীগের অনুসরণ করে এই ধারণা শুধু ভ্রান্ত নহে, ইহা অভিসন্ধি-প্রণোদিত প্রচারকার্য্য। মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু যাঁহারা, তাঁহারা কোন সময়েই মুসলিম লীগের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই। পাকিস্তানী কল্পনার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেও ইহারা কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। উলেমাদের প্রতি আবদার রহমান সিদ্দিকীর ন্যায় লীগ-নেতার ক্রোধের কারণ উপলব্ধি করাও কঠিন নয়।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা বলবৎ করা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী প্রতিবাদ উঠিয়াছে। এই আদেশের ফলে সাময়িক পত্র, পুস্তক প্রকাশক ও ছাপাখানা তিনটিই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং বহু লোক বেকার হইবে। ক্লারিজ এবং থ্যাকার কোম্পানী প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলিও বলিতেছেন যে এই আদেশ মানিয়া ছাপাখানা চালান প্রায় অসম্ভব। সাময়িক পত্রিকাগুলির অবস্থা আরও সঙ্গীন হইবে। কাগজের ব্যবহার কমাইবার জন্য গবর্মেণ্ট এবং কাগজওয়ালাদের অনুরোধে এবং কাগজের দুর্মূল্যতার জন্য ইহাদের প্রায় সকলেই আকার কমাইয়াছেন। এই সঙ্কুচিত আকারের এক-তৃতীয়াংশ রাখিতে গেলে কাগজ বাহির করাই অসম্ভব হইবে। এই আদেশ জারী করিবার পূর্বে যাহাদের উপর উহা প্রযোজ্য হইবে তাহাদের কাহারও কোন মতামত জানিবার চেষ্টা গবর্মেণ্ট করেন নাই। জনৈক বড় কাগজের কলওয়ালা এবং জনকয়েক সরকারী কর্মচারীর সহিত পরামর্শ করাই তাঁহারা যথেষ্ট বোধ করিয়াছিলেন। আদেশ প্রদানের সমর্থনে কোন যুক্তিও তাঁহারা দেখাইতে পারেন নাই। দেশব্যাপী প্রতিবাদের জবাবে বাধ্য হইয়া ভারত-সরকার এক প্রেস নোট জারী করিয়া কারণ দেখাইয়াছিলেন যে পঞ্জাবের কোন জমিদার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত লাটবেলাটের সুপারিশপত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অথবা কোন রাজনৈতিক নেতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বিবৃতিগুলি সংগ্রহ করিয়া বই ছাপাইবার চেষ্টা করিতে পারেন এই জন্যই কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক হইয়াছে। পরে ভারত-সরকারের বাণিজ্য-বিভাগের সেক্রেটরী সর মামুদ হায়দরী বলিয়াছেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দরিদ্র গ্রন্থকারেরা যাহাতে কাগজ পাইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করাই এই নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দরিদ্র গ্রন্থকারদের প্রতি ভারত-সরকারের এই আকস্মিক দরদ লোকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবে।

নূতন আদেশে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বোম্বাইয়ে তাহাদের এক সম্মেলন ১১ই জুলাই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহার সভাপতিরূপে সর মামুদ হায়দরী যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ভারত-সরকার তাঁহাদের আদেশ পরিবর্তন করিতে অনিচ্ছুক। প্রথম দিনের বক্তৃতায় সর আকবর বলিয়াছেন :

মোটের উপর বর্তমানে এই দেশে কাগজের ব্যবহার শতকরা ৯০ ভাগ যে কমাইতে হইবে তাহা ধরিয়া লইয়াই আলোচনা

চালাইতে হইবে। এই আদেশ নিপুণতার সহিত পালন করা হইলে স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং যে সমস্ত গ্রন্থকার কাগজের অতিরিক্ত মূল্যের দরুণ তাহাদিগের পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না তাঁহাদিগের সুবিধা হইবে।

আমাদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আমরা কাগজ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেই নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হইয়াছিল এবং বৎসরে ১ লক্ষ টন পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইতেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়লার অভাবের দরুন উৎপাদন আবার হ্রাস পাইয়াছে এবং এই বৎসরে (১৯৪৪-৪৫) ৭০ হাজার টনের বেশী কাগজ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না। এখন আমদানীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাউক। ১৯৩৬-৩৭ ও পরবর্তী দুই বৎসরে গড়ে ভারতে ৭৫,৫০০ টন কাগজ আমদানী হইতেছিল। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমদানী হয় ৮৮০০ টন এবং ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯০০০টন আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অনেকে এই কথা বলিয়াছেন যে, ব্রিটেনে অনেক কাগজ আছে এবং ভারত-সরকার আমদানীর লাইসেন্স দিলেই তাহা আনা যাইতে পারে। একথা মোটেই সত্য নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে মাত্র ১৩ শত টন কাগজ ভারতের জন্য বরাদ্দ করিয়াছিলেন।

কাজেই মোটের উপর দেখা যাইতেছে, এই বৎসরে ৯ হাজার টন বিদেশ হইতে আসিবে এবং ৭০ হাজার টন এ দেশে হইবে। সবসমেত ৭৯ হাজার টন। ভারতে উৎপন্ন ৭০ হাজার টনের শতকরা ৭০ ভাগ অর্থাৎ ৪৯ হাজার টন রিজার্ভ রাখা হইয়াছে। কাজেই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ৩০ হাজার টন অবশিষ্ট থাকিবে। যেখানে যুদ্ধের আগে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন ব্যয় হইত সেখানে ৩০ হাজার টন দিয়াই কাজ চালাইতে হইবে। ভারত-সরকার কিছুদিন হইতে উত্তর-আমেরিকা হইতে বেশী পরিমাণ কাগজ আমদানীর ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের এই প্রচেষ্টা সফল হইলে সঙ্কট অনেকটা দূর হইবে।

কাগজের ব্যবহার কমাইবার জন্য দায়ী ভারত-সরকার, দেশবাসী নয়। কয়লার উৎপাদন আজ কমে নাই, বৎসরাধিক কাল যাবৎ কয়লা-বিভ্রাট চলিতেছে। এই সময়ের মধ্যে উত্তর-আমেরিকা হইতে কাগজ আনা যাইত না ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। শুধু তাই নয়, ভারত-সরকারের লাইসেন্স প্রদানের গোলযোগে ব্রিটেন হইতে যত কাগজ আনা যাইতে পারিত তাহাও আসে নাই, ইহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সময় থাকিতে কাগজ আমদানীর চেষ্টা না করিয়া ভারত-সরকার ছাপাখানা ও সাময়িক পত্রগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাহাদের ব্যবহার্য্য কাগজ টানিয়া লইয়া নূতন এক বেকার সমস্যার সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

গবর্ন্মেণ্টের জন্য যত কাগজ রিজার্ভ হইতেছে তাহার ব্যবহার সঙ্কোচ করা যায় কি না ভারত-সরকার ইহা চিন্তাও করেন নাই। জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস এদিক দিয়া ব্যবহার সঙ্কোচের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কলিকাতা রেশনিঙে কাগজের ব্যবহার অনাবশ্যক বাড়ানো হইয়াছে। ভারতবাসী যেখানে একটি মাত্র খেরো বাঁধানো জাবেদা খাতায় কোটি কোটি টাকার কারবারের হিসাব রাখিয়াছে, সেখানে এক একটি রেশন দোকানের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাত-আট খানি খাতা দেওয়া হইয়াছে। রকমারি ফরম তৈরি হইয়াছে, নূতন রেশন কার্ডের আকারও পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া সহস্রবিধ নিয়ন্ত্রণ আদেশের দৌলতে যে রকমারি 'রিটার্ণের' বন্দোবস্ত হইয়াছে একমাত্র তাহাতেই কত সহস্র টন কাগজ অপচয় হইতেছে তাহাও কেহ ভাবিয়া দেখে নাই।

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় সর মামুদ হায়দারী একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনে স্বীকৃত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন ভারত-সরকার প্রতিবাদের মূল বিষয়গুলি মানিয়া লইতে অসম্মত। সাময়িক পত্র ও পাঠ্যপুস্তকের জন্য কতক পরিমাণে নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহারের অনুমতি দানের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন কতক কাগজ ও কতক নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইবে না। নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহার করিতে চাহিলে সম্পূর্ণ রূপে উহা লইতে হইবে অর্থাৎ তাহাকে নিউজপ্রিণ্ট কণ্ট্রোল আদেশের প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সাময়িক পত্রগুলিকে অস্তিত্ব রক্ষার সুযোগ দেওয়া হইবে না, তাঁহার বক্তৃতায় ইহা সুস্পষ্ট।

দরিদ্র গ্রন্থকারদের দরদে ব্যাকুল ভারত-সরকার তাঁহাদের কাগজপ্রাপ্তির পথ করিয়া দিয়াছেন এই আশ্বাস দানের সঙ্গে সঙ্গে সর মামুদ ছাপাখানার চার্জ বাড়াইবার অনুমতি দিয়াছেন, দর অত্যধিক বাড়াইতে দেওয়া হইবে না শুধু এইটুকু সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

ভারত-সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক এবং অত্যধিক কঠোর বলিয়া আমরা মনে করি। কতকগুলি কাল্পনিক সুবিধার অজুহাতে প্রদত্ত এই আদেশে ভারতবর্ষের সাড়ে আট হাজার ছাপাখানা এবং তিন সহস্রাধিক সাময়িক পত্র সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অনেকের অস্তিত্বও লোপ পাইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গৌরবদীপ্ত জীবনের অবসানে উনবিংশ শতাব্দীর সহিত বাঙালীর শেষ যোগসূত্র ছিন্ন হইল। পরিণত বয়সে তাঁহার পরলোকগমনে শোকের কারণ নাই, কিন্তু এই একটি জীবনদীপ নির্বাণে বাংলার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমিকের তিরোধান ঘটিল। দেশের এ ক্ষতি পূরণ হইবার নয়। আচার্য্যদেবের পুণ্য জীবন মহামানবের প্রতি অসীম করুণাবারি অকাতরে বর্ষণ করিয়াছে, মিতব্যয়ী বিলাস-বাহুল্যবর্জিত সরল জীবনযাত্রার নামমাত্র প্রয়োজন মিটাইয়া তাঁহার অর্জিত সকল অর্থ পরহিতব্রতে অর্পিত

হইয়াছে। ১৫ বৎসর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রসায়নের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন, তাঁহার বেতনের সমুদয় অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যই এই অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ইহা ভিন্ন কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনাথাশ্রম, দরিদ্র ছাত্র এবং অসহায়া নারী ও শিশু যে তাঁহার প্রদত্ত অর্থে উপকৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি "সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরের ভারতবর্ষ" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া সেখানেই তাহা প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের অনেক মনীষী উহার প্রশংসা করেন।

ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার গবেষণা অতুলনীয়। তাঁহার "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" এবং "রসার্ণবম্" গ্রন্থদ্বয় প্রগাঢ় মনীষা ও সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করিতেছে।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তিনি যৌবনেই যোগদান করেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তিনি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে ব্রাহ্ম আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। শেষজীবনে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষক দল সৃষ্টি আচার্য্যদেবের সর্বপ্রধান কীর্তি। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আজ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজকে তিনি স্বীয় আবাসগৃহ করিয়া লইয়াছিলেন। বিজ্ঞান কলেজকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসিতেন, সেখানেই তিনি থাকিতেন এবং এই কলেজ-গৃহেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য স্পর্শে বিজ্ঞান কলেজ সমগ্র ভারতের বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

এদেশে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগেরও তিনিই পথ-প্রদর্শক। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস তাঁহারই সৃষ্টি। বাংলাদেশের বহু রাসায়নিক এবং অপর শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁহার পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বিপদের দিনে তাঁহারই সাহায্যে অনেকের অস্তিত্ব রক্ষা হইয়াছে।

মানবসেবাব্রতে আচার্য্যদেবের তুলনা বিরল। ১৯২২ সালে উত্তর-বঙ্গের বন্যায় ৬০ বৎসর বয়স্ক এই বৃদ্ধের অদ্ভুত কর্মশক্তি দেখিয়া মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—মহাত্মা গান্ধী আর দুইটি পি. সি. রায় তৈরি করিতে পারিলে এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করিতে পারিতেন।

পুণ্যশ্লোক এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

মুসলমানের ভারত জয়

বহু মুসলমান কারণে অকারণে বলিয়া থাকেন তাঁহারা ভারত-বিজেতা, ইংরেজ তাঁহাদের হাত হইতে নবাবী লইয়াছে, তাঁহাদের হাতেই রাষ্ট্রশক্তি ফিরাইয়া দিতে ইংরেজ বাধ্য। মিঃ জিন্না নিজেও ইহা ঘোষণা করিতে ছাড়েন নাই। আজিকার মুসলমান যদি ভারত-বিজেতা হয়, তাহা হইলে এক দিন অনুন্নত হিন্দু হইতে ধর্মান্তরিত ভারতীয় খ্রীষ্টানও আপনাদিগকে ভারত-বিজেতা বলিয়া দাবী করিতে পারে।

মুসলমানের ভারত জয়ের দাবী আলেকজাণ্ডারের ভারত জয়ের দাবীরই ন্যায় ভ্রান্ত, ইহা আজ পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। আলেকজাণ্ডার শুধু পঞ্জাবের কয়েকটি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন জনপদ মাত্র জয় করিতে পারিয়াছিলেন, বঙ্গ মগধের সহিত শক্তি পরীক্ষার সাহস তাঁহার সেনাধ্যক্ষেরা পান নাই। মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি সুলতান মামুদ বা নাদির শাহের ন্যায় কেহ বা লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছেন। যাঁহারা দিল্লীতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে সর উইলিয়ম হাণ্টারের গ্রন্থ প্রাচীন মুসলমান বিজেতা (Early Mahommedan Conquerors) হইতে নিয়োক্ত অংশটি উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে :

"ভারতবর্ষ সহজেই মুসলমানের করায়ত্ত হইয়াছিল বলিয়া যে ধারণা চলিয়া আসিতেছে তাহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। ভারতে মুসলমান শাসন বার বার আক্রমণ এবং আংশিক জয় লাভ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সমগ্র ভারতবর্ষে কোন সময়েই ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বড় বড় স্থানে হিন্দু রাজবংশ সব সময়েই রাজত্ব করিয়াছে। মুসলমান শক্তি যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই সময়ে অধীনস্থ হিন্দুরাজারা কর দিয়াছেন ও সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইয়াছেন। কিন্তু দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রাধান্যও দেড় শতাব্দীর অধিককাল স্থায়ী হয় নাই (১৫৬০-১৭০৭)। এই রাজত্ব শেষ হইবার পূর্ব্বেই হিন্দুরা হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে রাজপুতেরা দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল এবং উত্তর-পশ্চিমে শিখেরাও সামরিক শক্তিরূপে সংগঠিত হইয়া উঠিতেছিল। মারাঠাদের মধ্যে নিম্নজাতি হিন্দুর সংগ্রামশক্তি এবং ব্রাহ্মণের রাজনৈতিক বুদ্ধির সমন্বয়ে যে নূতন শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল তাহার চাপে দক্ষিণ-ভারতের মুসলমান রাজ্যসমূহ মারাঠার করদরাজ্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে শুধু ব্রিটিশ শক্তির আগমনের জন্যই মুসলমান সাম্রাজ্য পুনরায় হিন্দুর হাতে ফিরিয়া যায় নাই।"

মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে দলত্যাগী মুসলমান সদস্যদের অভিযোগ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীদল পরিত্যাগ করিয়া নয় জন মুসলমান সদস্য এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে মন্ত্রিমণ্ডল প্রায় একটা পারিবারিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। যোগ্যতা কিম্বা জনসেবার কার্য্যাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবেচনা না করিয়াই প্রধান মন্ত্রীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণকে কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমন্বিত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কয়েক জন মন্ত্রীর পত্নী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামে কখন কখন সরকারী কণ্ট্রাক্টের কাজ লওয়া হইয়াছে। কোন প্রকার গুণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিষয় বিবেচনা না করিয়াই মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থকগণ ও আত্মীয়স্বজনদিগের মধ্যে অন্যান্য রকমের সরকারী অনুগ্রহ যথেচ্ছ ভাবে বিতরণ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা সচিবসঙ্ঘ হইতে ভিন্ন রাজনীতিক মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করা হইয়াছে। বিরোধী দলভুক্ত ব্যবস্থা-পরিষদের সম্ভ্রান্ত সদস্যকে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ হইতে যে বে-আইনীভাবে ও স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ব্বক অপসারিত করা হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। কিন্তু মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীগণ নিতান্ত অভদ্রোচিত ও অন্যায় ভাবে কোন কোন স্থলে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও জেলা বোর্ডের ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ জোঁকের মত আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন।"

দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান এবং মফঃস্বলে নিকৃষ্ট চাউল প্রেরণ সম্বন্ধেও ইঁহারা গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। ইঁহারা বলিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষে সাহায্য দানে সর্বদাই বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র সাহায্য পৌঁছে নাই। মন্ত্রীদের সঞ্চয়বিরোধী অভিযান গ্রামাঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আগষ্ট হাঙ্গামার দায়িত্ব অস্বীকার

১৯৪২-এর আগষ্ট হইতে ১৯৪৪-এর এপ্রিল পর্য্যন্ত গান্ধীজীর সহিত লর্ড লিনলিথগো, লর্ড ওয়াভেল, লর্ড সামুয়েল ও ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের যে সকল পত্র বিনিময় হয়, ভারত-সরকার সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪২-এর হাঙ্গামায় কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে সরকারী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল মহাত্মা গান্ধী তাহার ৭৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী উত্তর দিয়াছিলেন। উহাও এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী আগষ্ট হাঙ্গামার সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া দেখাইয়াছেন উহা সম্পূর্ণ রূপে গবর্ন্মেণ্টের অবিবেচনা-প্রসূত কার্য্যের ফল। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার না করিলে এই গোলযোগ হইত না। গান্ধীজীর পত্রগুলিতে সমস্ত সরকারী অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে খণ্ডন করা হইয়াছে। গান্ধীজী বলিয়াছেন :

"আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইংরেজদের ভারত ত্যাগের প্রস্তাবের ফলে গণ-আন্দোলনের বিশেষ কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই ; আমি কিংবা অপর কোন কংগ্রেস-নেতা কখনও হিংসার কথা চিন্তা করি নাই ; আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, কোন কংগ্রেসকর্ম্মী যদি কোন প্রকার হিংসার আশ্রয় লন তাহা হইলে আমি তাহাদের মধ্যে থাকিব না ; গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার ভার একমাত্র আমার উপরই অর্পিত হইয়াছিল কিন্তু আমি গণ-আন্দোলন আরম্ভ করি নাই ; আমি গবর্ন্মেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এই আলোচনার জন্য "দুই তিন সপ্তাহ" সময় দিয়াছিলাম, এই আলোচনা ব্যর্থ হইলে মাত্র তখনই আমার আন্দোলন আরম্ভ করিবার কথা ছিল। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তার না করিলে ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে ও তৎপরবর্ত্তীকালে যে সকল গোলযোগ হইয়াছিল তাহা হইত না। প্রথমতঃ, গবর্ন্মেণ্টের সহিত আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম এবং দ্বিতীয়তঃ আলোচনা যদি ব্যর্থ হইত তাহা হইলে যাহাতে গোলযোগ না ঘটে তাহার চেষ্টা করিতাম।"

যুদ্ধে সংযোগিতা সম্বন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন :

"আমার মতে গাহা ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক আকাঙ্ক্ষা মাত্র তাহাতে এই প্রকার ক্ষোভ হইতে জনসাধারণের এই সন্দেহই সমর্থিত হয় যে, যুদ্ধের পর গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা প্রদান সম্বন্ধে সরকার যে-সব কথা বলিয়াছেন সেগুলি আন্তরিক নহে। সরকারের আন্তরিকতা থাকিলে কংগ্রেস যে সহযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছিল তাহাতে তাঁহারা আনন্দে সম্মত হইতেন। কংগ্রেসকর্ম্মীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল সংগ্রাম করিতেছে, সরকার সম্মত হইলে তাহারা ভারতের সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দলে দলে মিত্রপক্ষের পতাকাতলে ছুটিয়া যাইত। কিন্তু ভারতবর্ষকে সমতুল্য অংশীদার এবং মিত্র বলিয়া গণ্য করিবার ইচ্ছা সরকারের ছিল না।"

অন্নসমস্যা সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

সর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মিঃ ফ্র্যাঙ্ক এণ্টনি, ডাঃ জি, এন, আরুণ্ডেল, শ্রীযুক্ত জি, ডি, বিড়লা, সর সুলতান চিনয়, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, ডাঃ এম, আর, জয়াকর, সর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী, এন, সি, কেলকার, পণ্ডিত কুঞ্জরু, হোমি মোদী, সর মুদিয়া চেট্টিয়ার, সর এস, রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ বি, সি, রায়, সর তেজ বাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত এন, আর, সরকার, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সর চিমনলাল শীতলবাদ, সর শ্রীরাম, শ্রীযুক্ত বি, দাস, শ্রীযুক্ত কস্তুরভাই লালভাই, মিঃ হোসেনভাই লালজী, সর রুস্তম মাশানি, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা, মিঃ কে, এম, মুন্সী, শ্রীযুক্ত কে, সি, নিয়োগী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত একটি যুক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গনের আশু প্রয়োজন স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসীর মঙ্গলামঙ্গল ও নিরাপত্তা এবং প্রধান আক্রমণ ঘাঁটির নিরাপত্তার খাতিরে বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং খাদ্যশস্য নীতি নির্দ্ধারণ কমিটি যে হার সুপারিশ করিয়াছেন সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে সেই হারে আমদানীর কার্য্যসূচী পরিচালনা করার বন্দোবস্ত করেন, সেই উদ্দেশ্যে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানান আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। মোটের উপর স্বাভাবিক খাদ্যাভাব ও তথায় সামরিক চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গম ভালরূপ উৎপন্ন না হওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় আগামী মাসগুলিতে ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

"ভারত যাহাতে অপর একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে আমরা তাহাই সাগ্রহে আশা ও প্রার্থনা করি। যদি পুনরায় গত বৎসরের ন্যায় অবস্থা দাঁড়ায়, তবে সেই অবস্থার জন্য লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষই দায়ী হইবেন, কারণ এই দেশে অসামরিক ও সামরিক কার্য্য পরিচালন সম্পর্কে তাঁহাদের উপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ন্যস্ত আছে।"

এই বিবৃতি প্রকাশের কয়েক দিন পর বিলাতের 'ডেলী হেরাল্ড' লিখিয়াছেন,

গত বৎসর মিঃ আমেরী যে দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টায় বলিয়াছিলেন—ভারতে যে-সকল প্রদেশে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত আছে, সে-সকল প্রদেশে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ভার প্রাদেশিক সরকারের। এইরূপে দায়িত্ব এড়াইবার ক্ষীণ চেষ্টায় ব্রিটেনের সুনাম বর্দ্ধিত হয় নাই। পৃথিবীর লোক ব্যাপারটা এইরূপ দেখিতেছে—নাৎসী শাসন হইতে যে-সকল দেশ অব্যাহতি লাভ করিবে, সে-সকলের স্বল্পাহার-দুর্বল অধিবাসিগণকে সাহায্যদান কার্য্যে ব্রিটেন সক্রিয়ভাবে তৎপর; ব্রিটেন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে হটস্প্রিংস বৈঠকের নির্দ্ধারণ সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছে—লোকের পুষ্টিবিষয়ে আদর্শের উন্নতিসাধন তাহার উদ্দেশ্য; কিন্তু ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে ব্রিটেনের অধীন এবং তথায় বহু লোক আজও আবশ্যক আহার্য্য পাইতেছে না ও তথায় যেমন গত বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এ বৎসর তেমনই (সম্প্রতি প্রকাশিত বিবৃতি অনুসারে) দুর্ভিক্ষের ভয় আছে।

ভারতীয় নেতাদের বিবৃতি ভারত-সচিব দেখিয়াছেন কি না, মিঃ সোরেনসেন পার্লামেণ্টে এই প্রশ্ন করিলে মিঃ আমেরী বলেন তিনি উহা পাঠ করিয়াছেন।

কয়েক দিন পূর্বে নয়া দিল্লী হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে জানা যায় যে আগামী সেপ্টেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্বেই ভারতবর্ষে ৪ লক্ষ টন গম পৌছাইয়া দিবার আয়োজন করা হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারত-সরকারকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন। গত অক্টোবরের পর আর ৪ লক্ষ টন গম এ দেশে পৌছিয়াছে। অতএব ১৯৪৩-এর অক্টোবর হইতে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষে মোট ৮ লক্ষ টন গম আমদানী হইবে এবং ইহার পর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সমস্ত অবস্থাটা পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

গত অক্টোবরে গ্রেগরী কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ টন গম আমদানী করিতে হইবে এবং ইহার পরও প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টন গম বাহির হইতে আনা দরকার। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয় নাই। গ্রেগরী কমিটি অবিলম্বে যে পরিমাণ গম আমদানী করিতে বলিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধেক পাঠাইয়াই ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিতে চাহিতেছেন এবং নবেম্বর মাসে আর একবার তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া দেখিবেন বলিয়া ভারতবাসীকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

বাংলায় দুর্নীতি

বাংলার লাট মিঃ কেসী তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "সকলেই জানেন বাংলায় যথেষ্ট দুর্নীতি আছে ; বহু ভদ্র বাঙালীর ন্যায় আমিও ইহাতে দুঃখিত। দুর্নীতি-মূলক কার্য্যকলাপকেই লোকে যেন স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমি বিব্রত বোধ করিতেছি। বাংলার জনসাধারণ—অন্ততঃ কলিকাতার নাগরিকগণও যদি এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করেন তাহা হইলেও হয়ত এই অবস্থার কিছু প্রতিকার হইতে পারিত। গোপনে বে-আইনী কমিশন অথবা ঘুষ আদায়ের সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহারা যদি সম্মুখে আসেন তাহা হইলে কিছু করা যাইতে পারে।"

সর জন হার্বার্টের আমল হইতে বাংলায় ঘুষ ও বে-আইনী কমিশনের রাজত্ব চরমে উঠিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রীদলের নেতাদের মধ্যে অনেকেই এই সংবাদ রাখেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে হক মন্ত্রীমণ্ডলের সমালোচনার সময় মিঃ সিদ্দিকী এবং ইস্পাহানী উভয়েই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে ঘুষ ছাড়া সরকারের নিকট কোন কাজ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান মন্ত্রীরা কার্য্যভার গ্রহণের পর কোন প্রতিকার তো হয়ই নাই বরং বাড়িয়াছে। মন্ত্রীদল বজায় রাখিবার জন্য ১৩ জন মন্ত্রী ১৩ জন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটরী এবং চার জন হুইপ নিযুক্ত করিয়া জন-সাধারণের অর্থের যে অপব্যবহার করা হইতেছে তাহা রাজনৈতিক ঘুষ ভিন্ন আর কিছু নয়। কলিকাতা রেশনিঙে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চারি শত সরকারী দোকান সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রীদলের সমর্থকবৃন্দের চাকুরীর ব্যবস্থা আর এক দফা রাজনৈতিক ঘুষ। অনুমোদিত মুদীখানার সংখ্যা বাড়াইয়া অনায়াসে কাজ চলিতে পারিত, সরকারী দোকানের ঘর ভাড়া, ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার প্রভৃতি বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা অনাবশ্যক ব্যয় ইহাতে বাঁচিয়া যাইত। বোম্বাইয়েও ইহাই করা হইয়াছে, সেখানে সরকারী দোকানের সংখ্যা খুব কম। কলিকাতায় যে কয়টি মুদীখানা রেশন সরবরাহের ভার পাইয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে, বাংলা-সরকারের উদ্যমে নয়। মাল সরবরাহের বন্দোবস্ত না করিয়া যেরূপ অদূর-দর্শিতার সহিত বাংলা-সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহাতে বে-আইনী কমিশন আদায়েরও সদর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নালিশের অথবা প্রতিকার প্রাপ্তির সহজ পন্থা প্রথম হইতেই বন্ধ রাখা হইয়াছে। অভিযোগ অথবা প্রতিকার লাভের যে সব উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাহিরে। বর্ত্তমানে বাংলায় ঘুষ ও অবৈধ কমিশন আদায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে শুধু এই একটি কারণে যে ইহার প্রতিকারের কোন সহজ-লভ্য উপায় আজ পর্য্যন্ত বলিয়া দেওয়া হয় নাই।

সিভিলিয়ান কর্মচারীদের সহিত বোধ হয় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও লোকের পক্ষে সাক্ষাৎ করা এবং অভিযোগ জানানো সহজ ছিল। তাঁহারা প্রকাশ্য অফিসে আসিয়া বসিতেন, দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ নিবেদন করিতে পারিত এবং ইঁহারাও তাহার প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। বর্ত্তমানে অধিকাংশ সিভিলিয়ানেরই অফিস তাঁহাদের খাস বাংলোয়, দরিদ্র জন-সাধারণের ত দূরের কথা, শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ দুষ্কর। আগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি মফঃস্বল সদরে গেলে গ্রামবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। বর্ত্তমানে মফঃস্বল যাওয়াই কমিয়াছে, যদি বা কেহ যান তাহা হইলেও কতিপয় খাঁ সাহেব, খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি ধামাধরাদের সেলাম গ্রহণ করিয়াই কর্ত্তব্য সমাপন করা হয়। কোন কোন সিভিলিয়ানের বিরুদ্ধে উৎ-পীড়ন ও অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগও উঠিয়াছে, তাহারও কোন প্রতিকার হয় নাই। মেদিনীপুরের অত্যা-চারী সিভিলিয়ানদের বিরুদ্ধে তদন্তের বন্দোবস্তটুকু পর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক করাইতে পারেন নাই।

দুর্নীতির ব্যাপারে শ্বেত কৃষ্ণ, হিন্দু মুসলমান সাহেবে কোন তফাৎ আছে বলিয়া লোকে মনে করে না। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতের পর স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখিয়াছিলেন যে এখানকার শ্বেতাঙ্গ কর্ম-চারীদের উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিতে হইলে ইহাদের বেতন যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে বর্ত্তমান যুদ্ধে দেখা গিয়াছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বেতন ও ভাতা প্রদানও ঘুষ বন্ধের শ্রেষ্ঠ উপায় নহে।

দুর্নীতি দমনের জন্য মিঃ কেসীর ইচ্ছা আন্তরিক হইলে অভিজ্ঞ বিচারপতিদের লইয়া একটি কমিশন গঠন করিয়া ব্যাপক তদন্তের দ্বারা প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন তাঁহার সর্বপ্রথম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য দরিদ্রতম ব্যক্তিটির পক্ষেও অভি-যোগ জানাইবার এবং প্রতিকার প্রাপ্তির পথ সহজলভ্য করিয়া দেওয়া।

নিখিল-ভারত কাটুনী সঙ্ঘের আয়কর হইতে অব্যাহতি

বোম্বাই হাইকোর্ট নিখিল-ভারত কাটুনী সঙ্ঘের আয়

আয়-করের আমলে আসে কি-না, সে সম্বন্ধে যে রায় দিয়াছিলেন, প্রিভি কাউন্সিল তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ঐ সঙ্ঘ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন গান্ধীজী উহার অন্যতম ট্রাষ্টি। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উহা রেজেষ্টারী করা হয় নাই। ট্রাষ্ট সম্বন্ধে কোন দলিল হয় নাই বটে, কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির এক প্রস্তাবে উহার উদ্দেশ্য ও গঠন বিবৃত হয়। সঙ্ঘ গ্রামে লোককে চরকা, তাঁত ও তুলা সরবরাহ করেন—লোক সুতা কাটিয়া তাহাতে তাঁতে কাপড় বুনিবে এবং সেই কাপড় (খদ্দর) ভিন্ন ভিন্ন খদ্দরের দোকানে বিক্রীত হইবে। সঙ্ঘ কাটুনী ও তাঁতীদিগের পারিশ্রমিকের হার বর্দ্ধিত করিবেন স্থির করেন। ফলে খদ্দরের মূল্য কিছু বর্দ্ধিত করিতে হয়। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বৃদ্ধি আমলে আসিবার পূর্বেই যে সকল খদ্দর প্রস্তুত হইয়াছিল, সে সকলের কতকগুলিও বর্দ্ধিত মূল্যে বিক্রীত হয়। ফলে ঐ সময়ে সঙ্ঘ কিছু লাভ করে। সেই লাভ ট্রাষ্ট সম্পত্তি হইতে লব্ধ—তাহা দাতব্য ব্যাপার কি না তাহাই বিচারের বিষয় হয়। বোম্বাই হাই-কোর্ট রায় দেন ঐ লাভে আয়-কর দিতে হইবে। প্রিভি কাউন্সিল বোম্বাই হাইকোর্টের রায় বাতিল করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ লাভের উপর আয়-কর দিতে হইবে না; কারণ আয়-কর আইনে দরিদ্রদিগকে সাহায্য-দান, শিক্ষাদান, চিকিৎসা প্রভৃতি দাতব্য খাতে পড়ে।

খুলনায় নমঃশূদ্রদিগের উপর উৎপীড়নের অভিযোগ

খুলনা জেলার অন্তর্গত মোল্লারহাট থানার এলাকায় হাঙ্গামার ফলে যে সাম্প্রদায়িক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার আলোচনার জন্য ২৫শে জুন কলিকাতায় বাংলার বিভিন্ন জেলার তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিরাটচন্দ্র মণ্ডল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থান-সমূহের বর্তমান অবস্থা এবং সেখানকার হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের কথা সভায় আলোচিত হয়। সভায় নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে তিনটিতে অতিশয় গুরুতর অভিযোগ আছে। প্রস্তাব তিনটি এই :

অবিলম্বে খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সসপেণ্ড করা হউক, কারণ তাঁহাদিগের বাসস্থানের এক মাইলের মধ্যে বহু গৃহ ভস্মীভূত করা হয়। যথেচ্ছ লুঠতরাজ চলে ও বহু ব্যক্তিকে বেপরোয়া প্রহার করা হয়। এই সভা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অযোগ্য বলিয়া মনে করেন।

১৭ই জুন মোল্লারহাট থানার অন্তর্গত গিরিশনগর গ্রামে শত শত মুসলমান গুণ্ডা সমবেত হইয়া বহু নমঃশূদ্রের গৃহে যে লুঠতরাজ করে ও হাবিলদার মেজর ভি, এন, রায়ের গৃহ হইতে তাহারা তাঁহার বিধবা ও যুবতী শ্যালিকা শ্রীমতী অনন্তবালাকে বাহির করিয়া আনে এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, অবিলম্বে তাহার তদন্ত করিয়া অপরাধীদিগের শাস্তিবিধান করা হউক।

এই সভা খুলনার কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছেন। তাঁহারা এক জন মুসলমানকেও গ্রেপ্তার করেন নাই অথচ এই সম্পর্কে বহু হিন্দুকে বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

৮শে জুন প্রস্তাবগুলি কলিকাতার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আজ (৯ই জুলাই) পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতিবাদ গবর্মেণ্ট করেন নাই, সুতরাং অভিযোগ-গুলি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

মৌচাকের পঁচিশ বছর

ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রিকা "মৌচাকে"র পরিচয় বাংলা দেশে নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সখা, সাথী, বালক, মুকুল, ও সন্দেশের পর মৌচাক বাঙালীর শিশু ও কিশোর সাহিত্যে এক অপূর্ব দান। এ দেশে শিশুদের একটি পত্রিকার পক্ষে চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া পঁচিশে পদার্পণ সামান্য ব্যাপার নহে, মৌচাকই সর্বপ্রথম এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। মৌচাক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকারের এই কৃতিত্ব অসাধারণ। "ভারতী"র সাহিত্যের আসরে মৌচাকের জন্ম, উহার নামকরণ করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। মৌচাকের বিশেষ কৃতিত্ব বড় বড় সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিককে, যাঁহারা কখনও শিশু সাহিত্যের জন্য কলম ধরেন নাই, তাঁহাদের এই আসরে নামানো। হাসির গল্প, কবিতা ও ভ্রমণ-কাহিনীতে মৌচাকের স্থান কম নয়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত শিশু উপন্যাস বুড়ো আংলা প্রথম বৎসরের মৌচাকে প্রকাশিত হয়।

চাউল সম্বন্ধে আসাম-সরকারের বিজ্ঞপ্তি

আসাম-সরকারের নিম্নলিখিত বিবৃতি দুইটি উল্লেখযোগ্য—

শিলং, ১লা জুলাই :—আসাম-সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, উত্তর বঙ্গ হইতে হাজার হাজার টন চাউল আসাম উপত্যকায় প্রেরিত হইতেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, সৈন্যবাহিনীকে চাউল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। সরকার আসামে ধান্য ও চাউলের বাজার নষ্ট করিতে এবং আসামের বাহির হইতে লবণ, চিনি, ডাল ও তদ্রূপ অন্যান্য পণ্য আন-য়নের প্রয়োজনীয় যান-বাহন ব্যবহার করিতে চাহেন না। কিন্তু

আসামে যাহাদিগের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান্য আছে, তাহারা যত দিন বর্ত্তমান মূল্যে ধান্য বিক্রয় না করিবে, তত দিন সরকার চাষী ও ক্রেতৃবৃন্দের স্বার্থহানি করিয়া চাউল আমদানী করিতে থাকিবেন। আসাম উপত্যকায় ধান্ত ও চাউলের মূল্য হ্রাস পাইবেই এবং উৎপাদকগণকে এখনই তাহাদিগের অতিরিক্ত ধান্য বিক্রয়ের উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে সরকার জানাইয়াছেন যে, সুরমা উপত্যকায় ধান্যের দাম অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং দাম যাহাতে আর না কমে তজ্জন্য সরকারের দালালরা অন্যান্য ধান্যের সহিত বোরো ধান্তও ক্রয় করিতেছে। সরকারের এই ধানের প্রয়োজন অধিক না থাকিলেও তাঁহারা ধান্যচাষীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ইহা ক্রয় করিতেছেন।

সরকার আরও জানাইয়াছেন যে, ধান্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিলেও তাঁহারা অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য আমদানীর যে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কার্য্যে পরিণত করিতেছেন না। সরকার এ বিষয়ে আসামের ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

প্রথম প্রেস নোটটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-সরকার এবং ভারত-সরকারের পূর্বাঞ্চলের ফুড কমিশনার উহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে আসামে অবস্থিত সৈন্যদের জন্য বাংলা হইতে যে দশ হাজার টন চাউল প্রেরিত হইয়াছে তাহা ঋণ মাত্র, ভারত-সরকার অপর প্রদেশ হইতে উহা পূরণ করিয়া দিবেন। যান-বাহনের সুবিধার জন্যই উত্তর-বঙ্গ হইতে এই চাউল প্রেরিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে আসাম-সরকার জানাইয়াছেন যে সুর্মা উপত্যকায় ধানের দাম এত কমিয়া গিয়াছে যে আর যাহাতে দাম না কমে সেজন্য সরকারী দালালেরা ধান কিনিতেছে। প্রয়োজন না থাকিলেও চাষীদের বাঁচাইবার জন্যই নাকি এই ক্রয়কার্য্য চলিতেছে। প্রথম বিজ্ঞপ্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টির রহস্য এখনও প্রকাশ হয় নাই। সুর্মা উপত্যকায় ধান নেহাৎ কম জন্মে না, সেখানে তবে বিনা প্রয়োজনে ক্রীত ধানগুলি ভানাইয়া সৈন্যদলকে দেওয়া হইল না কেন?

আসামে ইস্পাহানী কোম্পানীর সঙ্গে সর মহম্মদ সাদুল্লার এক পুত্রও চাউলের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছেন এ অভিযোগও উঠিয়াছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে জেলা বোর্ডের কার্য্যকলাপ

সুন্দরবন প্রজা-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়-বিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে ঐ অঞ্চলের প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সুন্দরবনের প্রজাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পথঘাটের অসুবিধার কথা বলিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে একমাত্র কাকদ্বীপ ও সাগর দ্বীপের সাগর মেলা রাস্তা ছাড়া জেলা বোর্ড এই অঞ্চলে অত্যন্ত কম টাকা খরচ করিয়া থাকেন। যথা, সুন্দরবনের ১৪৪৪ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে মাত্র ৫ ফার্লং পাকা রাস্তা এবং ৪২ মাইল কাঁচা রাস্তা আজ পর্য্যন্ত তৈরি হইয়াছে। ১৯৩৬-এর রিপোর্টে দেখা যায় এই বিরাট্ অঞ্চলে নলকূপের সংখ্যা ছিল পনরটি। অথচ সুন্দর-বনের প্রজারা বার্ষিক এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা রোড-সেস দিয়া থাকে। এই টাকার দশভাগের এক ভাগও তাহাদের জন্য খরচ হয় না। কলিকাতা মহানগরীর ৩০ মাইলের মধ্যে জেলা বোর্ড এই অন্যায়-অবিচার নির্বিবাদে করিয়া চলিয়াছেন, ইহার কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মতে ভাল করিয়া হিসাব করিলে রোড-সেসের টাকা প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশী হইবে; খাজনার পরিমাণ হইবে ইহার ত্রিশ গুণ, অর্থাৎ বার্ষিক ৪৫ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য এই অঞ্চলে অর্থ ব্যয় হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ডাক্তারখানা বা ঔষধ এখানে বিরল। অনগ্রসর স্থানসমূহে প্রজার নিকট টাকা আদায় ভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যে কোন ফল হয় নাই, সুন্দরবন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লাহোরে অরহর সম্মেলন

লাহোরে অরহর সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ বদরুদ্দোজা তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, যে সকল মুসলমান এতকাল আজগুবী পাকিস্তান পরিকল্পনার মোহে অন্ধ ছিলেন এখন তাঁহারা মুসলিম লীগের ধাপ্পার অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলেন:

"ভারতের বিভিন্ন মোসলেম প্রধান প্রদেশে মোসলেম লীগ সচিবসঙ্ঘের কার্য্যাবলীতে সকলের মনে এই সন্দেহই সৃষ্টি হইয়াছে যে, এই সকল সচিবসঙ্ঘ বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণর-দিগের অভিভাবকত্বে গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারা রক্ষা না করিলে এই সকল সচিবসঙ্ঘ একদিনও টিকিতে পারে না। মোসলেম লীগ ভারতে মুসলমান প্রভুত্ব স্থাপনের মিথ্যা আশার অনুকূলে কোন প্রমাণ দর্শাইতে পারেন নাই। লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের রাজনীতিক সমস্যা বিশে-ষতঃ মোসলেম সমস্যা সমাধান করিবার ভান করিতেছেন। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ। লীগ যে কেবলমাত্র ভারতের রাজ নীতিক সমস্যা সমাধানেই অকৃতকার্য হইয়াছেন তাহা নহে,

তাঁহারা দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন এবং ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আরও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছেন। মোসলেম প্রধান প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানগণ তাহাদিগের লক্ষ্য লাভ করিবে—এ ধাপ্পায় আর তাহারা ভুলিবে না। সুতরাং মুসলমানদিগকে এই বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিবার সময় আসিয়াছে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের জুন মাসের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়:

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আবহাওয়া ক্রমশঃ নষ্ট হওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের সহানুভূতি ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় এই সভা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং শিক্ষার আবহাওয়ার উন্নতি ও হিন্দু জনসাধারণের আতঙ্ক দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মিঃ এ এস লার্কিন আই-সি-এসকে সভাপতি এবং মিঃ পঙ্কজকুমার ঘোষ ও সুলতানউদ্দীন আমেদ এম-এল-সি'কে সদস্য করিয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক।"

কোর্টের মুসলমান সদস্যদের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি আলোচিত হইতেও পারে নাই। এক প্রশ্নের উত্তরে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ ছিল:

১৯৩৯-৪০	৮৬১
১৯৪০-৪১	৭২২
১৯৪১-৪২	৭৪০
১৯৪২-৪৩	৬৫৯
১৯৪৩-৪৪	৫৩৯

বর্তমান বৎসরে মোট ছাত্রসংখ্যা ১১০০। ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের কারণ ভাইস-চ্যান্সেলর বলিতে পারেন নাই অথবা বলেন নাই। সর মির্জা ইসমাইলকে অপমানিত করিবার পর লোকের ধারণা হইয়াছে যে ঢাকার ছাত্রেরা বিদ্যাচর্চা অথবা শিষ্টতা কোন দিক দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ছাত্রদের যোগদান ঢাকার ন্যায় ভারতের অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

—

বঙ্গীয় শব্দকোষ-কার পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা

বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বতন ছাত্রেরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য শান্তিনিকেতনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। ২৮ বৎসরব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার যে ফল পণ্ডিত হরিচরণ বাঙালীকে দান করিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্তকাল তাহা অক্ষয় সম্পদরূপে বিদ্যমান থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই শব্দকোষ রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে ইহার মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছিল। শব্দকোষ রচনা সমাপ্ত হইয়াছে, মুদ্রণ কার্যও প্রায় সম্পূর্ণ। পণ্ডিত মহাশয়ের এই কীর্তি সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের বস্তু। গবর্মেণ্ট ইহাকে মহামহোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনারারী ডক্টরেট উপাধি প্রদান করিলে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

বঙ্গীয় শব্দকোষের ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের নিজের উক্তিরই কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন:

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যখন এলাম, তখন আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা, বোধ হয়, চৌদ্দ-পনর। সে সময়ে সংস্কৃতের পাঠ্যপুস্তক ছিল না, কয়েক পৃষ্ঠার সংস্কৃত-পাঠের পাণ্ডুলিপি গুরুদেব আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, এইটা দেখে এখন পড়াও, আর এই পদ্ধতি-অনুসারে একটা সংস্কৃতপাঠ্য লিখতে আরম্ভ কর। সেই পাণ্ডুলিপির প্রণালী অনুসারে আমি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ "সংস্কৃতপ্রবেশ" লিখেছিলাম। এই সময় কবি একদিন বাংলার শব্দকোষ-সংকলনের কথা আমাকে বলেন। তাঁর আদেশে ও প্রবর্তনায়ই "বঙ্গীয় শব্দ-কোষ" অভিধান লিখতে আরম্ভ করি। সেটা ১৩১২ সাল, আটত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। প্রাচীন বাংলা হ'তে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত, অর্থাৎ ডাক-খনার সময় হ'তে কবির সমসময় পর্যন্ত, প্রকাশিত বিখ্যাত বাংলার কবি-লেখকগণের প্রসিদ্ধ কাব্য-প্রবন্ধাদি প'ড়ে অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করেছি আমি একাই; এ পথে কখনও কোনও সহায় পাই নি। বিদ্যালয়ের কাজ ক'রে অবসরমত অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করেছি।

অভীষ্ট বিষয়ের সমাপ্তিতে, বিশেষতঃ এরূপ দীর্ঘকালসাধ্য অভিপ্রেত ব্রতবিশেষের উদ্‌যাপনে, স্বীয় শ্রমসাফল্যে ব্রতীর নিরতিশয় আনন্দ স্বাভাবিক; কিন্তু বিশেষ বিষাদের বিষয় যে, আমার এই ব্রতসাধনের বিপৎসঙ্কুল কঠোর পথে, আমার ক্ষণিক পরম সৌভাগ্যোদয়ে যে সকল সহৃদয় দরদী মহাজনের সঙ্গতিলাভ করেছিলাম, তাঁরা এখন কোথায়!—শব্দকোষের প্রবর্তক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কাল-কবলিত! দীর্ঘকাল বৃত্তিদাতা দানবীর মহাত্মা

মণীন্দ্রচন্দ্র অস্তমিত! শব্দকোষের দরদী হিতৈষী সাংবাদিক-শিরোমণি রামানন্দ পরলোকপ্রবাসে প্রবাসী! তাই, আমার সেই নিরতিশয় আনন্দ ভাগ্যচক্রের ক্রূর আবর্তনে নিরতিশয় বিষাদের কালিমায় মলিন!

জনতথ্য অনুসন্ধিৎসা পরিষৎ

জনতথ্য অনুসন্ধিৎসা পরিষৎ নামে একটি সঙ্ঘ সম্প্রতি কলিকাতায় গঠিত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধানের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষের সামাজিক বিবর্তনের গতি ও কারণ নির্ধারণ ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। পুঁথিপত্র হইতে সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বাস্তব তথ্য সংগ্রহের দ্বারা বর্তমান সমস্যা-সমূহের আলোচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির খ্যাতনামা অধ্যাপক বর্তমানে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্দ্র রায় এই নবগঠিত পরিষদের সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ও উৎসাহী ছাত্র ইহার সদস্য। জনতথ্য অনুসন্ধিৎসা পরিষৎ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সাধনার বস্তু। ইহারা সাফল্য লাভ করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা

আমাদের দেশে শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় সমস্যা এ দেশে এখনও জাতীয় শিক্ষার পত্তন হয় নাই, এবং এই পত্তন যাহাতে না হইতে পারে তাহার জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সুরু হইতে সুপরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবাসীর শিক্ষা যতটুকু অগ্রসর এযাবৎ হইয়াছে তাহাও সাম্রাজ্যবাদী বাধার সহিত সংগ্রামের ফলে সম্ভব হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টীচার্স ট্রেনিং বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ এই যে, এই ব্যবস্থায় দেশের সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের প্রয়োজন মত শিক্ষার আয়োজন থাকে। শুধু একটা বিশেষ বয়সের বা বিশেষ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যেমন দরকার, লোকশিক্ষাও তেমনি প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। মাতৃভাষা, জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করিয়া যে শিক্ষা-ব্যবস্থা রচিত হয়—তাহাকে জাতীয় বলিতে পারা যায় না। আজও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজও আমরা ইতিহাসের নামে স্বজাতির মিথ্যা কলঙ্ক-কাহিনী পাঠ করিতেছি, বিদেশীকে অযথা বড় করিয়া দেখিতে শিখিতেছি। মিথ্যা ইতিহাস, ভ্রান্ত অর্থনীতি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান পাইতে পারে না। যে শিক্ষা জাতির কল্যাণে নিয়োজিত নহে, যে শিক্ষা দেশকে ভালবাসিতে শিখায় না সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নহে।

ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষার পত্তনে যে বাধা দেওয়া হইয়াছে তাহা খাপছাড়া ভাবে হয় নাই, উহার পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি আছে। কোন দেশকে পরাধীন রাখিতে হইলে তাহাকে শুধু আত্মবিস্মৃত করিলেই চলে না, সে জাতিকে আত্মবীতশ্রদ্ধও করিয়া তোলা দরকার। এই কারণেই স্কুলপাঠ্য পুস্তক, বিশেষতঃ ইতিহাসের বইয়ের উপর গবর্ন্মেণ্টের এত সতর্ক দৃষ্টি।

জাতীয় শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে কংগ্রেসের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমীটি আলোচনা করিয়াছিলেন। সর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে একটি শাখা সমিতি একটি বিস্তারিত পরিকল্পনাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষও একটি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ সার্জেণ্ট যুদ্ধোত্তর কালে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা লইয়া আলোচনাও অনেক হইয়াছে।

মিঃ সার্জেণ্ট জাতির সকল স্তরের জন্য শিক্ষার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তাহার আরম্ভ আট বৎসর ব্যাপী আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষায় এবং পরিণতি বয়স্ক শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এত ব্যাপক ভাবে এদেশের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। মিঃ সার্জেণ্টের মতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে এ দেশে শিক্ষার সংস্কার সম্ভব নয়। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের আরও বেশী বেতন দিতে হইবে। তাঁহার মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ টাকা হওয়া দরকার। তাহার কমে উপযুক্ত লোকে স্বেচ্ছায় এ কাজ গ্রহণ করিবে না, করিলেও উহাতে সর্বশক্তি ও উৎসাহ নিয়োগ করিবে না। মিঃ সার্জেণ্টের হিসাবে সমগ্র দেশে আট বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে শুধু প্রাথমিক

শিক্ষার জন্তই প্রায় দুই শত কোটি টাকার দরকার হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে তিন শত কোটি টাকা লাগিবে। তাঁহার মতে বাংলা দেশের শিক্ষার জন্য সাতান্ন কোটি টাকা দরকার। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য তিন শত কোটি টাকা ব্যয় অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়। ইহাতে মাথাপিছু দশ টাকার কমই পড়িবে। ইংলণ্ডের বর্তমান শিক্ষার ব্যয় মাথাপিছু পঞ্চাশ শিলিং, অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা। এত টাকা আমরা কোথায় পাইব—এই প্রশ্নের উত্তরও মিঃ সার্জেণ্টই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যুদ্ধের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে পারিলে অর্থের অভাব হয় না। যদি আমরা সত্য সত্যই মনে প্রাণে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি তাহা হইলে অর্থের অভাব হইবে না।

সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নহে, কিন্তু উহাকে কাঠামো ধরিয়া বাকিটুকু আমরা করিয়া লইতে পারি। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা ভারত-সরকারের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-সংস্কার কমীটির দ্বারা অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তাড়াহুড়া করিয়া পাস করাইয়া লইয়া আগে হইতে প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা-ব্যবস্থাটিকে পোক্ত করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে দেখিয়া বুঝা যায় জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার একটি মোটামুটি কাঠামো খাড়া করিতে গেলেও প্রবল বাধা আসিবে।

হাস্যোদ্দীপক বিচার

ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগে মাঝে মাঝে কিরূপ খামখেয়ালীর পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে তাহার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হেণ্ডারসনের এজলাসে এক মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দায়রা জজের বিচারবুদ্ধির যে নমুনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা বিরল। শ্যামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি আসানসোলের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ভারতরক্ষা বিধির ৭৮ (৫) ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বর্ধমানের দায়রা জজ এই দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। অতঃপর হাইকোর্টে আপীল করা হইলে বিচারপতি হেণ্ডারসন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দায়রা জজের দণ্ডাদেশ বাতিল করিয়াছেন এবং জরিমানার টাকা আদায় হইয়া থাকিলে তাহা প্রত্যর্পণের আদেশ দিয়াছেন। বিচারপতি তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে আবেদনকারীকে দেশরক্ষার হানিজনক কাজ করিবার জন্ত দণ্ডিত করা হইয়াছে; চুক্তিভঙ্গের দ্বারা যে এরূপ কোন অনিষ্ট হয় তাহা এই প্রথম তিনি শুনিলেন। চাউল সরবরাহ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের এসিষ্ট্যাণ্ট রাইস এডমিনিষ্ট্রেটার বলিয়া বর্ণিত কর্মচারীর সহিত আবেদনকারী তিনটি চুক্তি করিয়াছিলেন। ইনিই এই মামলার প্রকৃত ফরিয়াদী এবং আবেদনকারীর নিকট হইতে চাউল আদায় করিবার জন্য এই মামলা রুজু হইয়াছিল।

বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, আবেদনকারীর কার্য্য দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া বাদী পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ পরিচালনের জন্য কয়লা আবশ্যক। খনির লোকেরা কয়লা উৎপাদন করে। তাহাদিগকে আহার্য্য প্রদান করা আবশ্যক। বাদী তাহাদিগের আহার্য্য পাইবার জন্য চুক্তি করিয়াছিলেন। বিবাদী চুক্তিভঙ্গ করায় খনির লোকেরা অনাহারে মারা যাইতে পারিত এবং তাহারা মারা গেলে কয়লা পাওয়া যাইত না। বাদীপক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে, আবেদনকারীর আচরণ দ্বারা খনির লোকদিগের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাদীপক্ষের প্রমাণ করা উচিত ছিল যে, বিবাদী কয়লা উৎপাদন বন্ধ করিবার জন্য আহার্য্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং অন্য কোন উপায়ে আহার্য্য পাওয়া অসম্ভব। বিচারপতি বলেন যে, উপরোক্ত প্রমাণগুলির অভাববশতঃ এই অভিযোগ নিতান্ত অযৌক্তিক। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণের পরে যখন সত্য প্রকাশিত হইল তখনও ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলা পরিচালন করিলেন। সুবিজ্ঞ দায়রা জজ নির্ধারণ করেন যে চাউলের চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় আবেদনকারীর পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক।

লোকায়ত্ত গবর্মেণ্ট ভিন্ন অন্ন-সমস্যার সমাধান অসম্ভব

পুনায় মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস-কর্মীদের নিকট বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে না আসিলে, দেশে লোকায়ত্ত গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে অন্ন-সমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। তিনি বলিয়াছেন:

সাম্প্রদায়িক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা, অন্ন-সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে আপনারা আমাকে হয়ত প্রশ্ন করিবেন, কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমার একটি মাত্র কথা বলিবার আছে, কিন্তু এই সভায় তাহা আমি বলিতে বিরত

থাকিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করা যাইবে না। কয়েকটি ক্ষুধার্ত মুখে আহার তুলিয়া দিলেই অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে না। দেশের পুঁজিপতিদের সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। দরিদ্র জনগণের জন্য ঐ অর্থে ভাগ বসানই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু বর্ত্তমানে লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষুধা উহার দ্বারা মিটান যাইবে না। সমগ্রভারতব্যাপী কেন এই অসহায়ের তাণ্ডব লীলা—ইহার মূলকারণ কি? যুদ্ধ-পরিস্থিতির নামে নিরন্ন কৃষকদের অধিকতর অন্নহীন করা হইয়াছে। একমাত্র লোকায়ত্ত গবর্ন্মেণ্ট ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হইবে না। আমার অভিমত এই যে ভারত যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলে জাপানের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিত না। একান্তই যদি উহা ঘটিত তবে অধিকতর যোগ্যতার সহিত আমরা কর্তব্য পালন করিতে পারিতাম। আমি প্রভু বদল চাই না, সমগ্র বৈদেশিক অধীনতা হইতে আমি মুক্তি চাই।

আপনারা হয়ত সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রাবলী পাঠ করিয়াছেন। ভারতের শহরগুলির ঐশ্বর্য্য যেন আমাদের প্রতারিত না করে। উহা ইংলণ্ড অথবা আমেরিকা হইতে আসে নাই। দরিদ্রের শোণিত হইতেই উহার উদ্ভব। ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম আছে বলিয়া জানা যায়, তন্মধ্যে কতকগুলির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়াছে। বাংলা, কর্ণাটক ও অপরাপর স্থানে অনাহারে ও রোগে যে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, কেহ তাহাদের কোন তালিকা রাখে নাই, পল্লী অঞ্চলের লোকেরা কি ভাবে দিন যাপন করিতেছে সরকারী পুঁথিপত্রে তাহার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। উপরের চাপেই নীচের লোক পিষ্ট হয়। এক্ষণে সর্বাগ্রে নীচের লোকদের পিঠ হইতে নামিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ইহাকেই বলে পাপের বা অন্যায়ের সহিত অসহযোগিতা। অহিংসা এক মহাশক্তিশালী অস্ত্র। কার্য্যকালে ইহা আইন অমান্য অথবা অহিংসা ও অসহযোগিতার আকার ধারণ করে। যাঁহারা অসহযোগের গোপন রহস্য অবগত আছেন তাঁহারা সকল অসুবিধা হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইবেন। আজ যদি আমি আমার অন্তরের আস্থার কিছুমাত্রও আপনাদের অন্তরে সঞ্জীবিত করিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে আপনাদের নৈরাশ্য বা হতাশার কোন কারণ থাকিবে না।

বাংলার অন্ন-সমস্যার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা

ইতিমধ্যে বাংলায় গত বৎসরের সমস্যাগুলি আবার এক এক করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৪ঠা জুলাই রাইটার্স বিল্ডিংএ এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া রাজস্ব সচিব সকলকে জানান যে কলিকাতায় আবার অন্নের সন্ধানে দুর্গতদের আগমন সুরু হইয়াছে। ইহারা বিনা টিকিটে রেলে চড়িয়া কলিকাতায় আসিতেছে এবং এই আগমন বন্ধ করা দরকার ইহাই ছিল রাজস্ব সচিবের মূল বক্তব্য। সম্মেলনে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনার, হাওড়া ও ২৪-পরগনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বেঙ্গল আসাম ও কালীঘাট ফলতা রেলওয়ের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। মফস্বলে সাহায্য দানের ব্যবস্থা অবিলম্বে বাড়াইবার জন্য সেখানে প্রস্তাব করা হয়।

পর দিন ঐ রাজস্ব সচিবই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলেন যে আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে নাই, অবস্থা স্বাভাবিকই আছে। যদি তাই হয়, তবে পূর্ব দিন ঘটা করিয়া সম্মেলন আহ্বানেরই বা কি প্রয়োজন ছিল। ৭ই জুলাই এক প্রেস নোটে বাংলা-সরকার জানাইয়াছেন যে, রাইটার্স বিল্ডিংএর সম্মেলনের অর্থ কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বিনা টিকিটে যাহারা কলিকাতায় আসিতেছে তাহারা সর্ব্বনিম্ন স্তরের দরিদ্র, ডেষ্টিটিউট নহে; কলিকাতায় আসিয়া চাউল, আম, তরকারী, ডিম প্রভৃতি বিক্রয় করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।

রাইটার্স বিল্ডিং সম্মেলনের গুরুত্ব কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; বাংলার মন্ত্রীদের পরম মিত্র ষ্টেটস্‌ম্যানও নহে। সুতরাং বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ ভিন্ন আর সকলেই উহা ভুল বুঝিয়াছে ইহা অবিশ্বাস্য। গত বৎসর এই মন্ত্রীরাই যে ভাবে চোখ বুঁজিয়া দুর্ভিক্ষ এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবারও যেন ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি সুরু হইয়াছে। অন্ন-সমস্যা লইয়া ছেলেখেলা এবার যাহাতে না হয় সেজন্য সময় থাকিতে ভারতের সকল প্রদেশের নেতৃবৃন্দ সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, বিলাতেও তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বর্তমান মন্ত্রীদের উপর বাঙালীর বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। গবর্ণর মিঃ কেসী যেন এই সত্য উপেক্ষা না করেন।

বাংলার মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ

অন্যান্য দিক দিয়াও বাংলার বর্তমান মন্ত্রীরা জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা না করিয়া তাঁহাদের বিরাগই অর্জন করিয়াছেন। ইউরোপীয়ানদের উপর এমন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং ইহাদের সর্ববিধ স্বার্থসাধনে এমন তৎপর মন্ত্রীদল ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। হিন্দুদের উপর এক কাল্পনিক আক্রোশ চরিতার্থ করিয়া দল

পুষ্টির জন্য কিছু ছিটেফোঁটা সুবিধা অর্জন মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য। ব্যবস্থা-পরিষদের বিরোধী দল যেভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাসে বাধা দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। বিরোধী দল প্রতিদিন পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে সমর্থন লাভ করিয়াছেন; বহু বর্ণ হিন্দু, তপশীলী হিন্দু এবং মুসলমান সদস্য মন্ত্রীদল ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগ দিয়াছেন। মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে মন্ত্রীদল ১১৯-১০৬ ভোটে টিকিয়া গিয়াছেন। এই ১১৯ জনের মধ্যে ১৯ জন ইউরোপীয় এবং বিরোধীদলের দশ জন সদস্য কারাগারে।

প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব কোনরূপে কাটাইয়া উঠিবার পর মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দীনের নামে আবার এক অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ পড়ে। ক্রমক্ষীয়মান দলের সাহায্যে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে বুঝিয়া বহু সরকারী কাজ অসমাপ্ত থাকিতেও গবর্ণরকে দিয়া পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন:

বহু সরকারী কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন যদি অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া না যাইত তাহা হইলে সচিব-সমর্থক দলের ক্রমক্ষীয়মান শক্তি অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত এড়াইতে পারিত না। সচিবত্ব বজায় রাখিবার জন্য এই সকল সচিব সব কিছুই করিতে পারেন। বাংলার বে-সরকারী য়ুরোপীয়ানদিগের ও স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদিগের এক প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এই সাক্ষীগোপাল সচিবসঙ্ঘের গদি নিরঙ্কুশ করিতে ইচ্ছুক। অথচ তাঁহারা ভালরূপেই জানেন, অধিকাংশ ভারতীয় সদস্য ইঁহাদিগকে বিশ্বাস করেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের এই প্রহসন শান্তির সময় অসহ্য হইত। কিন্তু এখন এই অবস্থা আরও বিপজ্জনক। যুদ্ধ ও খাদ্য সঙ্কটের এই অবস্থায় জনসাধারণের আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘ থাকা প্রয়োজন। পঞ্জাবে মুসলিম লীগের বুদ্বুদ ফাটিয়াছে। সিন্ধুতে ইহার ভাগ্য আশা ও নিরাশায় দুলিতেছে। বাংলায় মুসলিম লীগ তাসের ঘরের মত উড়িয়া যাইতেছে। বড়লাট ও মিঃ কেসী যদি খাদ্য-সমস্যার সমাধান চাহেন, তাহা হইলে হয় তাঁহারা বাংলার বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘকে বরখাস্ত করুন, নতুবা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে আইনসঙ্গত উপায়ে এই সচিবসঙ্ঘের বিরোধিতা করিবার সুযোগ দিন। প্রকৃত শক্তিপরীক্ষা করাই যদি কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ভোটের দিনে অন্ততঃ বিনা বিচারে আটক পরিষদের ১০ জন সদস্যকে পরিষদ-গৃহে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি প্রদান করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মাধ্যমিক শিক্ষাবিল ভীতি

মিঃ এস রহমতুল্লা মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। গত ১২ই মে তারিখে তিনি তথাকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে একটি গোপনীয় পত্র লেখেন। পত্রখানি দৈনিক বসুমতীতে ২২শে আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রটির বঙ্গানুবাদ:

"আমাকে জানান হইয়াছে গোরাবাজার হাই ইংলিশ স্কুলের ও কৃষ্ণনাথ কলেজের স্কুলের হিন্দু ছাত্রগণ মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদকল্পে ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মুসলমান ছাত্রদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে স্কুলের হদ্দায় প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছে। গোরাবাজারের আনোয়ারুল আবেদীন নামক দশম শ্রেণীর ছাত্রকে না-কি ঐ স্কুলের ছাত্ররা প্রহার করিয়াছে এবং তাহার (বর) অঙ্গে না-কি এখনও ইষ্টক নিক্ষেপজনিত ক্ষত চিহ্ন রহিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, ষড়যন্ত্র হইয়াছে, আগামী কল্য প্রাতে ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় কতকগুলি হিন্দু ছাত্র লাঠি প্রভৃতি লইয়া আসিবে এবং সুবিধা পাইলেই মুসলমান ছাত্রদিগকে আক্রমণ করিবে। তাহারা এক সপ্তাহকাল বা ঐরূপ সময় পর্য্যন্ত প্রহার চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে মুসলমান বালকগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তেজস্বী এবং অকারণ আঘাত সহ্য করিবে না। বিশেষরূপ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকায় আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি আগামী কল্য প্রাতঃকাল হইতে অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি ঐ ২টি প্রতিষ্ঠানে আবশ্যকসংখ্যক পুলিস মোতায়েন করিবেন।"

মূল ইংরেজী পত্রটিও ঐ সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর বসুমতী লিখিয়াছেন যে গোরাবাজার হাই স্কুলে আনোয়ারুল আবেদীন নামে কোন ছাত্র নাই। তাহাকে প্রহারের কাহিনী কাল্পনিক ভিন্ন কিছু নয়। গোরাবাজার স্কুলের ছাত্রগণ কাহাকেও প্রহার করে নাই; পরন্তু সেখানে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছে:

মিষ্টার এ. গনী নামক এক জন উকীলের পুত্র সমশের রহমান—২০ জন মুসলমান ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া ১১ই মে সকাল প্রায় সাড়ে ৬টায় গোরাবাজার স্কুলে হেড মাষ্টারের আফিস ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখায় ও যে ভাবে স্কুলের শিক্ষকদিগকে অপমান করিয়াছিল, তাহাতে মাষ্টাররা অত্যন্ত দুঃখিত হন—ইহাই হেড মাষ্টারের অভিযোগ। হেড মাষ্টার উহা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া না-কি সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছিলেন—স্কুলে হাঙ্গামা করাই আগন্তুকদিগের উদ্দেশ্য ছিল।

উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া পুলিসবাহিনী মোতায়েন করিবার হুকুম দেওয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হয় নাই। ইহাতে দুষ্কৃতকারীদেরই প্রশ্রয় পাইবার কথা।

—

বাঙালীর ইতিহাস

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।" খ্যাতনামা মনীষীর এই বাণী বাঙালীর মনে আত্মপ্রসাদ জাগাইয়াছিল, বাঙালীর কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। শুধু এই ধারণা প্রচারিত হইল যে বাঙালীর প্রতিভা ছিল বীরত্ব ছিল, বাঙালী চিরকাল অর্দ্ধমৃত কেরানীর জাতি ছিল না। আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাই আমরা অতীতের আলোকধারায় স্নান করিয়া ধন্য হইলাম।

বাংলায় আর্য্যসংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কথা। মহর্ষি পতঞ্জলি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) জীবিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশকে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত রূপে গণ্য করিয়াছেন। মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের সীমা পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মতে মনুসংহিতা গুপ্ত যুগে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে) বর্ত্তমান আকারে গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে পতঞ্জলির পরে, এবং মনুসংহিতার বর্ত্তমান আকার লাভের পূর্ব্বে, কোন সময়ে বাংলায় আর্য্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

গ্রীক লেখকগণ বলিয়াছেন যে 'গঙ্গারিডী' (Gangaridae) প্রদেশ নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে 'গঙ্গারিডী' বাংলার বিকৃত নাম মাত্র। অশোকের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রবলপরাক্রান্ত নন্দ ও মৌর্য্য রাজগণের সময়ে বাঙালী জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ সমরক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রীক লেখকগণ বলিয়াছেন যে. 'গঙ্গারিডী' ও 'প্রাচ্য' (Prasii) রাজ্যের অধিপতি নন্দরাজের বিশাল বাহিনী ছিল। সমগ্র ভারত বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের বাহিনীও নগণ্য ছিল না। কিন্তু নন্দ ও মৌর্য্যরাজগণের পতাকাতলে সমবেত হইয়া যে অজ্ঞাতনামা বীরের দল ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহারা বাঙালী ছিলেন কিনা কে বলিবে?

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল বাংলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায় ইহার কোন কোন অংশে সম্প্রতি আলোকসম্পাত হইতেছে। দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বাংলার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই। সমুদ্রগুপ্তের সামরিক শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া যাঁহারা তাঁহার 'প্রচণ্ড শাসন' মানিয়া লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সমতট ও ডবাক রাজ্যের অধিপতিগণ অন্যতম। পূর্ব্ববঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অংশকে সমতট বলা হইত; সম্ভবতঃ কুমিল্লা শহরের নিকটবর্ত্তী বড়-কামতা গ্রামে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ডবাক রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাহা হউক, সমতট ও ডবাক রাজ্যের অধিপতিগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাহিরে থাকিয়া (এলাহাবাদ লিপিতে তাঁহাদিগকে 'প্রত্যন্ত নৃপতি' বলা হইয়াছে) কর প্রদান এবং বশ্যতা স্বীকার দ্বারা স্ব-স্ব রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। যে সমুদ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের বহু রাজাকে 'উন্মূলিত' করিয়া তাঁহাদের রাজ্য নিজের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাঁহার বিশাল বাহিনী বিজয় গৌরবে সুদূর দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তিনি কি কারণে রাজধানী পাটলিপুত্রের নিকটবর্ত্তী বাংলার এই দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করেন নাই, তাহা বলা কঠিন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি (উত্তর বঙ্গ) তাঁহার বংশধরগণের, এবং সম্ভবতঃ তাঁহারও, অধিকারভুক্ত ছিল, তথাপি তাঁহারা বঙ্গ-বিজয় সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য পশ্চিমে শকরাজ্য ধ্বংস করিয়া আরব সাগর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার সমুদ্রতীরবর্ত্তী অংশ তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। বাঙালীর বাহুবলে ভীত হইয়া গুপ্ত সম্রাটগণ বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হন নাই, এরূপ অনুমান বাঙালীর আত্মপ্রসাদ লাভের পক্ষে অনুকূল হইলেও ইহার স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ সেকালে শিক্ষায়, সভ্যতায়, ঐশ্বর্য্যে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের সমকক্ষ ছিল না; এই নদ-নদী-প্লাবিত জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি সেকালে 'প্রত্যন্ত' প্রদেশ রূপে অবজ্ঞাত হইত। এলাহাবাদ-লিপিতে কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি 'প্রত্যন্ত' রাজ্যের সহিত সমতট ও ডবাক রাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই

জন্যই গুপ্ত সম্রাটগণের দৃষ্টি দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছিল, 'প্রত্যন্ত' প্রদেশ জয়ের জন্য শক্তির অপব্যয় করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড়ীয় শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। মৌখরীবংশীয় কনৌজরাজ ঈশান বর্ম্মার হরাহা শিলালিপিতে গৌড় জাতিকে সমুদ্রতীর-নিবাসী রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন গৌড়রাজের নাম শিলালিপিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙালীর জাতীয় জীবনে নবশক্তি সঞ্চারের জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন তাহা জানিবার উপায় নাই। কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের সময়েই বাঙালী নিজের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির প্রথম পরিচয় দেয়। মালব রাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় শশাঙ্ক মৌখরীরাজবংশ ধ্বংস করিয়া কনৌজ অধিকার করেন এবং থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। বাণভট্ট বলিয়াছেন, 'গৌড়ভুজঙ্গ' (শশাঙ্ক) বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবির এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে, কিন্তু ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও শশাঙ্ককে কাপুরুষ ও গুপ্তহত্যাকারী রূপে গণ্য করা যায় না। গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নারীর ছদ্মবেশে পশ্চিম-ভারতের শকরাজকে হত্যা করিয়াছিলেন, এই কাহিনী বাণভট্টই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অরাতি নিধনের জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ বোধ হয় কোনকালে নিন্দনীয় ছিল না। যাহা হউক, শশাঙ্ক যে ক্ষমতাশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন হর্ষবর্দ্ধন বাংলার স্বাধীনতা হরণ করিতে পারেন নাই। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী কোঙ্গোদ (বর্ত্তমান গঞ্জাম) পর্য্যন্ত শশাঙ্কের রাজ্যসীমা প্রসারিত হইয়াছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্ত্তী যুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় যে তাঁহার গৌরব ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ফল মাত্র, জাতীয় শক্তির পরিচায়ক নহে। শিবাজী মারাঠা জাতিকে যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্ব শিখ জাতিকে স্থায়ী মানসিক বল প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু শশাঙ্ক বাংলার বুকে বিদ্যুৎ-রেখার মত যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কনৌজরাজ যশোবর্ম্মা গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 'গৌড়বহো' নামক প্রাকৃত কাব্যে এই ঘটনার কল্পনারঞ্জিত বিবরণ পাওয়া যায়। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' নামক ঐতিহাসিক মহাকাব্যে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে।

দীর্ঘকালব্যাপী 'মাৎস্যন্যায়' হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার জননায়কগণ 'অরাতিনিধনকারী' বপ্যটের পুত্র গোপালকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেকালের অন্যান্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতার ন্যায় গোপাল নিজকে চন্দ্রবংশের বা সূর্য্যবংশের অলঙ্কার রূপে বর্ণনা করেন নাই। খালিমপুর তাম্রশাসনে দেখি, 'সর্ব্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ' দয়িত বিষ্ণুর পুত্র 'অরাতিনিধনকারী' বপ্যট, তৎপুত্র 'নরপাল চূড়ামণি' গোপাল। গোপালের শক্তির প্রকৃত উৎস বংশগৌরব নহে, বাহুবল নহে, প্রজাবৃন্দের মিলিত আহ্বান। বাংলার জাতীয় জীবনে তখন যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল তাহার অবসানকল্পে জাতির আহ্বানে গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই পালরাজগণের আমলে বাঙালীর প্রতিভা আপনার যথার্থ পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপালের বিজয়কাহিনী স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপন্যাসাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।* কিন্তু এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি বাঙালী পাঠকসমাজে যথোচিত সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ধর্ম্মপাল কনৌজ অধিকার করিয়া উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন; ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার, কীর প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ বাংলার এই বীর পুত্রের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের কীর্ত্তি স্থায়ী হয় নাই। রাজপুতবংশীয় প্রতীহাররাজ, বৎসরাজ ও নাগভট এবং দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও গোবিন্দ তাঁহাকে বার বার পরাজিত করিয়াছিলেন। কনৌজ তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়া নাগভটের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। বাঙালীর দিগ্বিজয় বাঙালীর হৃদয়োচ্ছ্বাসের মতই অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইল।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল নাকি হিমালয় হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সসাগরা ভারতভূমির অধিপতি ছিলেন।

* গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'ধর্ম্মপাল'।

দুঃখের বিষয় এই যে এই সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব চাটুবাক্যপারদর্শী শিলালিপি রচয়িতার কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিলালিপিতে দেখি, দেবপাল হূণদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং দ্রাবিড়রাজ ও গুর্জ্জরপতির দম্ভ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। হূণদের সহিত সত্যই তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল কিনা বলা যায় না। গুর্জ্জরপতি ভোজ পূর্ব্ব দিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া সফলকাম হন নাই, ইহা আনুমানিক সত্য। দ্রাবিড়রাজ অমোঘবর্ষের সহিত দেবপালের সংঘর্ষ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। পালবংশের শিলালিপিতে পাই দ্রাবিড়রাজের দম্ভনাশের কাহিনী, আর রাষ্ট্রকূটবংশের শিলালিপিতে দেখি অমোঘবর্ষ কর্ত্তৃক অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ জয়ের কাহিনী—সত্য নির্ণয় করিবে কে? দেবপালের শিলালিপিতে উৎকল (উড়িষ্যা) এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ বিজয়ের কাহিনীও পাওয়া যায়। ইহার সত্যতা স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে দেবপালের রাজনৈতিক প্রভাব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ও আসামে সীমাবদ্ধ ছিল। সার্ব্বভৌম সম্রাটের পদ দাবী করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না।

দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলার আবার দুর্দ্দিন দেখা দিল। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৮৫৮-৯১২ খ্রীষ্টাব্দ) গুর্জ্জররাজ মহেন্দ্রপাল বিহার ও উত্তর বঙ্গ অধিকার করেন এবং পূর্ব্ব বঙ্গে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধিকার স্থাপিত হয়। অতঃপর মঙ্গোলবংশোদ্ভব কম্বোজ জাতি উত্তর বঙ্গ অধিকার করে। মহীপালের রাজত্বের (আনুমানিক ৯৯২-১০৪০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম ভাগে পালবংশের লুপ্ত গৌরব কিয়ৎপরিমাণে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রের আক্রমণে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ বিধ্বস্ত হয়। ইহার পরে ধীরে ধীরে পালরাজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল, বাংলার বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের অভ্যুদয় হইল।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সেন বংশীয় রাজগণের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সমাজবিপ্লবের এই নায়কেরা বাঙালী ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ সোমেশ্বর আহবমল্লের রাজত্বকালে (১০৪২-১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য মিথিলা, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। মহীপালের দুর্ব্বল বংশধর তাঁহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বংশীয় সামন্তসেন সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেই দক্ষিণ ভারত হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং মুসলমান যুগের ভাগ্যান্বেষীর মত মাৎস্যন্যায়-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে রাজ্যস্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেন বংশ কখনও বাংলার বাহিরে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। শিলালিপিতে দেখা যায়, লক্ষ্মণ সেন কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন এবং বারাণসীতে ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কাহিনী সত্য কিনা সন্দেহ।

সিরাজউদ্দৌলাকে বাঙালীর জাতীয় স্বার্থের রক্ষকরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য আজকাল এক শ্রেণীর বাঙালীর যেরূপ হাস্যকর ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মণ সেনের কাপুরুষতার অপবাদ ক্ষালনের জন্যও বহু বাঙালী লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ অনুরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই বিষয়ের চূড়ান্ত আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে লক্ষ্মণ সেনকে কাপুরুষরূপে গণ্য করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।* ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণের প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমস্যার অভাব নাই, তবে মিনহাজউদ্দীনের উল্লিখিত একটি হাস্যকর গল্প সম্বন্ধে বাঙালীর এই দুর্ব্বলতা কেন? বাংলার কোন রাজা যদি বৈদেশিক আক্রমণকালে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া থাকেন, তবে তদ্দ্বারা সমগ্র বাঙালী জাতি কাপুরুষতার অপবাদে কলঙ্কিত হইবে কেন? পারস্যরাজ ডেরায়স আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে পলায়ন করিয়াছিলেন, সে জন্য পারসিক জাতি ভীরুতার অপবাদ লাভ করে নাই। মেবাড়ের অধিপতি উদয় সিংহ আকবরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া আরাবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেবাড়ের রাজপুতের বীরত্বখ্যাতি তাহাতে ম্লান হয় নাই।

লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের কাহিনী সত্য হউক বা না হউক, বাঙালীর প্রকৃত কলঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায় বক্তিয়ার-পুত্রের সাফল্যলাভে। লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার বংশধরগণ যদি পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর হইতে ধীরে ধীরে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহাদের সাহস ও রাজোচিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয়

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত *History of Bengal Volume I* দ্রষ্টব্য।

পাইতাম। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের তাম্রশাসনে এইরূপ প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পাই না। তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের জলাভূমিতে নিরাপদে রাজত্ব করিবার সুযোগ পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, বিধর্ম্মী আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্বপুরুষের রাজ্য উদ্ধারের বীরোচিত সঙ্কল্প তাঁহাদের ছিল না। বাঙালী জাতিও এতটা স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল না যে বুকের রক্ত দিয়া এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের প্রতিবিধান করিবে। সুযোগের অভাব ছিল না। লক্ষ্মণাবতী অধিকারের কিছু কাল পরেই বক্তিয়ার-পুত্র বোধ হয় তিব্বত জয়ের বাসনায় হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অভিযানে তাঁহার বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি বহু কষ্টে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সুযোগে বাংলার অধিবাসীরা যদি মস্তক উত্তোলন করিত তবে ফল কি হইত তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু বীর্য্যহীন উদ্যমহীন বাঙালী পরাধীনতাকেই বিধিলিপি বলিয়া মানিয়া লইল।

আনুমানিক সাড়ে পাঁচ শত বৎসর (১২০০-১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) বাঙালী জাতি মুসলমান শাসকগণের পদানত ছিল। বাংলার মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত দিল্লীর সুলতানগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। সেকালের একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "দিল্লী হইতে লক্ষ্মণাবতীতে যে সকল শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইতেন তাঁহারা প্রত্যেকেই পথের দূরত্ব এবং যাতায়াতের অসুবিধার সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং বিদ্রোহী না হইলে অন্য কেহ তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া দেশ অধিকার করিত। সেই দেশের লোক বহু দিন হইতেই বিদ্রোহে অভ্যস্ত ছিল, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অসন্তুষ্ট এবং কুবুদ্ধিপরায়ণ ছিল তাহারা প্রায়ই শাসনকর্ত্তৃগণকে রাজদ্রোহে প্ররোচিত করিতে সমর্থ হইত।" দিল্লী হইতে বাংলার দূরত্ব বশতঃই হউক, অথবা বাংলার দুষ্ট লোকের প্ররোচনার ফলেই হউক, বাংলার শাসনকর্ত্তৃগণ যে সুযোগ পাইলেই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ফীরুজ শাহ তুঘলুককে কর না দিলে বাঙালী জাতির তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি হইত? বাংলার হিন্দুরা শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণের অধিকারী হইত না, হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতায় বাংলায় জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইত না। দিল্লীর প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া বাংলার মুসলমান অধিপতিরা যদি হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে একটি মিলিত জাতি গঠনের প্রয়াস পাইতেন তবে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হইত না। হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি সুলতানগণ বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু রাজা গণেশের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মুসলমান শাসকের বঙ্গসাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ রাজা গণেশ হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করিয়া মুসলমানগণের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কেবল যে সংস্কৃতচর্চ্চার প্রচলন ছিল তাহা নহে, বাংলা ভাষার উন্নতির সূচনাও এই সময়েই হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার হিন্দুর শক্তি তখন অতি ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল, অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে চঞ্চল মুসলমানের সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাই গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যদু ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের সহিত আপোষ করিলেন। কিন্তু রাজা গণেশের স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক প্রভুত্ব হিন্দুর প্রাণে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল না, রাজনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ দেখিয়া তাহা ধর্ম্মে ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু সমাজের ইতিহাস যখন রচিত হইবে তখন সম্ভবতঃ দেখা যাইবে যে রাজা গণেশ ও শ্রীচৈতন্য একই জীবনী শক্তির প্রতীক, ঐতিহাসিক কারণে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন।

মুঘল সাম্রাজ্য সমগ্র ভারত একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিল। এই সুদৃঢ় বন্ধন হইতে বঙ্গদেশ মুক্ত থাকিতে পারে নাই। আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গ বিজয়ের সূত্রপাত, জাহাঙ্গীরের সময়ে ইহার পরিণতি। আকবর আফগান সর্দ্দারগণকে দমন করিয়া এবং বারভুঁইয়ার উন্নত মস্তক অবনত করিয়া জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলার অভ্যন্তরে মুঘলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। রাজমহলে বসিয়া মুঘল সুবাদার পূর্ব্ব বঙ্গ শাসন করিবেন কিরূপে? তাই জাহাঙ্গীরের সময়ে মুঘলের শাসনযন্ত্র বাংলার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল, ঢাকা মুঘল সুবাদারের রাজধানী হইল। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে, ঔরংজীবের দুর্ব্বল বংশধরগণের রাজত্বকালে, মুর্শিদকুলী খাঁ নামে বাদশাহের অধীন থাকিয়াও কার্য্যতঃ বাংলায় স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মুঘল আমলে বাঙালী জাতি বাদশাহী প্রজার মর্য্যাদা (?) লাভ করিল বটে, কিন্তু ভারতের বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালী ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগ পাইল না।

ইরান তুরান হইতে নবাগত মুসলমানেরা বাদশাহী দরবারে পদমর্য্যাদা লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু বাঙালী মুসলমান দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত রহিল। মুসলমান রাজ্যে হিন্দুর স্থান সঙ্কীর্ণ। সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রবেশের অধিকার পাইলেন মানসিংহ—জয়সিংহের ন্যায় রাজপুত এবং তোডরমলের ন্যায় পঞ্জাবী ক্ষত্রী—বাঙালী হিন্দুর সেখানে প্রবেশাধিকার রহিল না। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ভারবাহী গর্দ্দভের মত রাজস্বের ভার বহন করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। বাঙালীর অর্থে সুজা ময়ূর-সিংহাসনের জন্য লড়াই করিলেন, শাসনকর্ত্তৃত্বের আড়ালে বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া, বাদশাহের মামা সায়েস্তা খাঁ স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি লুণ্ঠন করিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে যে পাঁচ জন মুসলমান শাসক (মুর্শিদকুলী খাঁ, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দ্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা) স্বাধীন ভাবে বাংলায় নবাবী করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদেশী, তাঁহারা কেহই বাঙালী জাতির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। মুর্শিদকুলী এবং আলিবর্দ্দী ইংরেজ বণিকগণের স্বার্থসাধনে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালী বণিকের স্বার্থ-রক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহারা নিজের এলাকায় এক প্রবল বণিক-শক্তির উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়াই সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কীর্ত্তিকাহিনী নিশ্চয়ই আলিবর্দ্দীর কর্ণগোচর হইয়াছিল; হায়দরাবাদের নিজাম এবং আর্কটের নবাব বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছিলেন তাহাতে যে কোন ভারতীয় রাজার আতঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক। সিরাজও স্বাভাবিক স্বার্থবুদ্ধি বশতঃই মাতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক বণিকশক্তির সহিত মৈত্রী স্থাপনের পরিণাম সম্বন্ধে যদি তিনি সত্যই সচেতন থাকিতেন তবে ফরাসী-দের সহিত মিত্রতাস্থাপনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইতেন না। সেকালের অন্যান্য ভারতীয় রাজার মতই তিনি ভোগসর্ব্বস্ব, প্রজার হিতাহিত সম্বন্ধে অন্ধ, অপরিণামদর্শী ছিলেন। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্" নীতির অনুসরণ করিয়াই তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ফরাসীর সহায়তা চাহিয়াছিলেন; অনুরূপ নীতি গ্রহণ করিয়াই জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রধানগণ নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ফরাসী বণিকের সহায়তা হায়দরাবাদের নিজামকে কিরূপ নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল তাহা সিরাজ হয় ত জানিতেন না, বণিকের মানদণ্ড যে রাজদণ্ডে পরিণত হইবে তাহাও জগৎশেঠ ও তাঁহার সহযোগিগণ মনে করেন নাই। মাত্র ষোল বৎসর পূর্ব্বে জগৎশেঠ প্রভৃতির সাহায্যে আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করিয়াছিলেন; ষোল বৎসর পরে সেই নাটকের পুনরভিনয় হইলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি কতখানি হইল তাহা পলাশীর যুদ্ধের পরে দেখা গেল। বিপ্লবের সূত্রপাত করা সহজ, কিন্তু বিপ্লবের গতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। পলাশীর রক্তরঞ্জিত প্রান্তরে যে বিপ্লব জন্মলাভ করিল তাহার স্রোতে অবাঙালী জগৎশেঠ ও বাঙালী রাজবল্লভ ভাসিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া গেল সমগ্র বাঙালী জাতি। আজ দুই শতাব্দী পরে বাঙালী সেই বিপ্লবের দায়িত্ব জগৎশেঠ-রাজবল্লভের স্কন্ধে চাপাইতে চায়, যে অকর্ম্মণ্য শাসক মূঢ়ভাবে ষড়যন্ত্র জালে জড়াইয়া পড়িল তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য উৎসব করে, আলিবর্দ্দীর গুণগান করিয়া তাঁহারই শিষ্য বিশ্বাসঘাতক রাজ্যলোভী মীরজাফরের নামে অভিশাপ দেয়—কিন্তু কেহ কি একবার ভাবিয়া দেখে, জগৎশেঠ-রাজবল্লভ-মীরজাফরের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমান একবার জাগিয়া উঠিল না কেন?

প্রথম

শ্রীকালিপ্রসাদ বিশ্বাস

আজ যেন মনে হ'ল প্রথম শ্রাবণ
হৃদয়ের কূলে কূলে মেলেছে কামনা,
আমার মনের যত পুষ্পিত ভাবনা
আকাশে মেলিয়া দিল সোনার স্বপন।

রজনী বিনিদ্র আজ—মেলেছে নয়ন,
পল্লবমর্ম্মরে যেন মদির নিশ্বাস,
ভেসে আসে চামেলির সুরভি সুবাস—
সহস্র কামনামালা করেছি বয়ন।

আজ যেন মনে হয় প্রথম শ্রাবণ
ধারাজলে স্নান করে আতপ্ত ধরণী,
কদম্বকেশরকীর্ণ কনকবরণী
বিস্মৃতির যত ফুল করেছে চয়ন।

আজ রাতে মনে হয় সোনার স্বপন
হৃদয়ের কূলে কূলে এনেছে শ্রাবণ॥

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৪

মধ্যাহ্নের রৌদ্রও এই পরিবেশে কোমল হইয়া আসে। কত কাল পরে এই পরিচিত কলরব—এই পরিচিত প্রিয়স্পর্শ। যোগমায়ার সংসার হইতে এই সংসার সম্পূর্ণ পৃথক্‌; আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-শয়নের ব্যবস্থায় পর্য্যন্ত কোন মিল নাই, তবু বহু কণ্ঠের হাসি-কান্নায় ভরা—সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার বিনিময়-মুহূর্ত্তে যে সুর কানে আসিয়া বাজিতেছে—সে মন-ভরানো সুর চিরকালের বস্তু। সেই সুরই কি বৈরাগী-চয়কে ভুলাইয়া দিয়া খণ্ডিত গৃহ-সীমানায় যোগমায়াকে পুনরায় বন্দিনী করিয়া ফেলিল? বন্ধন মনে করিলে কি আর দিনের পর দিন যোগমায়া এখানে থাকিতে পারিতেন? চয় মনের সাম্য আনিয়া দিয়াছে—ঘর তাই পরম কাম্য হইয়া উঠিতেছে।

অন্তরের পরিচয়টা শুধু গাঢ় হইয়াছে, বাহিরের পরিচয় তেমন স্পষ্ট হয় নাই।

প্রৌঢ়া একদিন সে কথা বলিলেন, আমাদের আর নাম জানাজানিতে লাভ কি ভাই। তাই জিজ্ঞাসা করি নি। কিন্তু ঘরের ঠিকানাটা তো জানা উচিত।

যোগমায়া বলিলেন, না ভাই, আর দিনকতক যাক।

—বাঃ রে, বোন বলছ অথচ আমাদের হাতের রান্না খাচ্ছ না। সেই স্বপাকে—হবিষ্যির মত খাওয়া।

—বিধবার তো ওই খাওয়া। তোমরা কি কর জানি না।

আমরা! প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিলেন, আমরা স্বামী গত হলে বিয়েও করি। একটু থামিয়া যোগমায়ার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিলেন, তবে বিয়ে করবার বয়স আর সাধ যদি থাকে।

—তোমাদের পাপ হয় না?

—কি জানি ভাই, এতটা বয়স হ'লো কেমন যে পাপের চেহারা—পুণ্যের চেহারাই বা কেমন তাতো ধরতে পারি নে। পাপ তো লোকের মনে।

—মনে তো বটেই, আচার-ব্যবহারেও কম পাপ হয় না। শাস্ত্রে—

—শাস্ত্র আমি বুঝি নে ভাই। মানুষ শাস্ত্র তৈরি করেছে তার অসুবিধার জন্য নয় তো।

—মানুষ নয়—মুনিঋষিরা বিধান দিয়েছেন।

—তুমি হয়তো বলবে একজন মানুষের অসুবিধে হ'লো বলে তো আর সমাজ-বিধান উল্টে দেওয়া যায় না। সত্যি কথা। কিন্তু অনেকগুলি মানুষে যে বিধানটি অসুবিধের বলে মনে করেন—তা কি বদলানো দরকার নয়?

এ সব লইয়া তর্ক করিবার পটুতা যোগমায়ার নাই। পাপ যাহা—তাহা চির দিনের পাপ। তাহার মূর্ত্তি কেমন সে দেখিবার চক্ষু ও সে বিশ্লেষণ করিবার মন তাঁহার নাই। প্রৌঢ়ার কথাগুলি তাঁহার ভাল লাগিল না। চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রৌঢ়াও হয়ত সে কথা বুঝিলেন। অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, আজ আমার ছেলে বউমাকে নিয়ে আসছেন—এখনই একবার ষ্টেশনে যাব।

এই কয়দিন খুঁটিয়া খুঁটিয়া গৃহসজ্জা দেখিয়াছেন যোগমায়া। ঘরের আসবাব-পত্রের মধ্যে টেবিল-চেয়ারের বাড়াবাড়ি। বই ভর্ত্তি আলমারি। টিপয় শেলফ প্রভৃতির ঢাকনিতে লতাফুল-আঁকা কারুকার্য্য। অনেকগুলি পূর্ণবক্ষ ছবি—সব কয়টিই মানুষের। কোনটা কেশবচন্দ্র সেনের—কোনটা বিবেকানন্দের—আরও নাম-না-জানা অনেক মানুষের। রামকৃষ্ণের ছবিখানি ক্ষুদ্র—মাথার উপর হাত রাখিবার ভঙ্গিতে কালীমাতা দাঁড়াইয়া নাই। জপের সময় চক্ষু মুদিয়া ঠাকুর-দেবতাকে স্মরণ করিবার কোন আয়োজনই নাই। একখানি পূর্ণাঙ্গ তৈলচিত্রের সজ্জা-পারিপাট্য বেশী। সাদা তোয়ালে দিয়া প্রত্যহ সেটি মোছা হয়, প্রত্যহ সেটিতে পুষ্পমাল্য ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। গললগ্নীকৃত-বাসে সেই প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে প্রত্যহ সুদীর্ঘ ও সভক্তি প্রণাম নিবেদন যোগমায়া দেখিয়াছেন। নিকটে আসিয়া ছবিটি দেখিবার সৌভাগ্য যোগমায়ার হয় নাই।

প্রৌঢ়া চলিয়া গেলে তিনি ছবির নিকটে আসিয়া দেখিলেন—দু'লাইন কবিতা—দিব্য পরিষ্কার ঝরঝরে হাতের লেখা—ছবির মতই ছোট্ট একটি ফ্রেমে বাঁধানো রহিয়াছে—ওই তৈলচিত্রের তলদেশে। লেখা আছে:

মরণ অমৃত-লোকে জীবনের নব অভ্যুত্থান।
বিচ্ছেদ-বিহীন সঙ্গ নিত্য তুমি করিতেছ দান॥
—সুচরিতা।

—এই দিকে একবার এস, নন্ত তোমায় প্রণাম করবে।

এত বয়স হয় নাই যোগমায়ার, দিনের আলোকও প্রখর—ভুল হইবার কথা নহে। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তিনি অপরিচিত যুবক-যুবতীর প্রণাম গ্রহণ করিলেন। সঙ্কুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলেন।

প্রৌঢ়া বলিলেন, ওটি আমার ছেলে, ওটি ছেলের বউ। ওকে নাম ধরেই ডাকি—রেবা।

ঠিক কথা, রেবা। সে দিনের কথা। কালীঘাটে আঁচল-ভর্ত্তি পুতুল লইয়া অকাল-বাদলের দিনে ইহাদেরই বৈঠকখানার আশ্রয় লইয়াছিলেন যোগমায়া। নিস্তারিণীর জলতৃষ্ণা ও জাতি-

নাশের ভয়ে তাঁহাদের চুপিসারে পলায়ন। সঙ্কুচিত হইবারই কথা। রেবা নামটি ভুলিবার যো কি?

রেবা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। না পারিবারই কথা। এমন কত লোক তাহাদের বাড়ির পাশ দিয়া নিত্য আসা-যাওয়া করে, নিত্য তাহাদের বাড়িতে আশ্রয় লয়। আশ্রিত যে সে-ই শুধু কৃতজ্ঞ মনে আশ্রয়দাতাকে চিনিয়া রাখে; বৃহৎ বটবৃক্ষের নিশানা রাত্রিযাপনকারী পাখীরা কোনদিন ভুলে না, বটবৃক্ষ প্রত্যেক পাখীকে না চিনিলেই বা ক্ষতি কিসের?

এক বাড়িতে থাকিলেও স্বপাকে আহার তিনি ছাড়েন নাই। ত্রিবেণীতীরের হবিষ্য বিধিই ঠিক চলিতেছে না, দু' একখানা তরকারিও রাঁধিতে হয়। শেষ পাতে একটু দুধ। এসব ব্যবস্থা অবশ্য গৃহকর্ত্রীর পীড়াপীড়িতে যোগমায়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাছে তাঁহার ছুঁৎমার্গের কোন অনিয়ম হয়—স্বতন্ত্র একখানি ঘর ও বারান্দা গৃহকর্ত্রী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারান্দার দুয়ারটি বন্ধ করিয়া দিলে—বড় বাড়ির সঙ্গে কোন সংস্রবই থাকে না।

যে জীবনের সঙ্গে কোন পরিচয়ই নাই যোগমায়ার সেই জীবন যাপন করেন ইঁহারা। দেশের গণ্ডীবদ্ধ আবহাওয়ার ও সমাজ-বন্ধনের চাপে এই সর্বত্রব্যাপী স্বাধীন জীবনের ফুল হয়ত এমন পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটিবার সুযোগ পাইত না; পশ্চিমের এই বড় শহরে শিথিলীকৃত সমাজের আবহাওয়ায় এই জীবন নিতান্ত বেমানান দেখায় না। এখানকার এই যেন রীতি। লজ্জার অনুশীলনই যেন এই অ-বাঙালী শহরে পীড়নের মত। প্রয়াগ-তীর্থের সুবিস্তীর্ণ চরের মত—মুক্তির প্রসার এই শহরের অসংখ্য অট্টালিকার সম্পদই বুঝি।

কালীঘাটের সঙ্কীর্ণ পরিসরে যাহা দৃষ্টিকটু মনে হইয়াছিল—সেই তীব্র বিরাগের ভাব যোগমায়াকে এই মুহূর্তে তেমন সঙ্কুচিত করিতে পারিল না। কিছু পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া তিনি হাসিমুখে প্রণামের পরিবর্তে আশীর্বাদ করিলেন।

সুচরিতা ডাকিলেন, রেবা, দোতলায় তোমাদের ঘর ঠিক করা আছে—একটু বিশ্রাম কর গে। নন্তু শোন।

ছেলে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

—কদিন থাকবি রে?

—পরশুই ফিরব।

—পরশু! তা কি করে হবে। পরশু যে আমরা পিকেটিঙে বেরুব।

—কিন্তু চিঠিতে তুমি তো কিছু লেখ নি মা।

—লেখবার দরকার ছিল না বলেই লিখি নি। একটু ভাবিয়া বলিলেন, আর লিখবারই বা দরকার কি, কাজ যখন সামনে আসে—তখন তাতে যোগ দিতেই হয়। পাশে পিছনে তাকাবার নিয়ম তো আমাদের নেই।

—রেবাও কি পিকেটিং করবে মা?

—না, এখনও ওর ট্রেনিং পাওয়া দরকার।

—ও কিন্তু জোর ক'রে চলে এলো—কাজে নামবে বলে।

—একদিন তো কাজে নামতেই হবে, কিন্তু আজ নয়।

—কেন আজ নয় মা? শুভকাজে দেরি করা উচিত নয়।

—না নন্তু, আজ নয়। আজ আমরা সবাই যদি জেলে যাই—

কথাটা আর সম্পূর্ণ করিলেন না সুচরিতা। দেওয়াল-বিলম্বিত সেই পূর্ণাঙ্গ তৈল-চিত্রটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

ছেলে বলিল, গেলামই বা জেলে। এই বাড়ি ঘর এ-ও কোনদিন থাকবে না। তুমি যা শিখিয়েছ ছেলেবেলা থেকে—

—না না, আজ নয়। ঘর গড়ার কথা তোদের কোন দিন বলি নি বটে, ওঁর নিষেধ ছিল, কিন্তু—

ছেলে মায়ের পানে চাহিয়া হাসিল, মা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন তোমার নরম হয়ে পড়ছে।

সুচরিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তাতো হবই রে। দেহের শক্তি কমে—মনের শক্তিও কমে, যাঁরা বলেন দেহের শক্তি আর মনের শক্তি দু'টো আলাদা জিনিস—তাঁদের কথা আমি ভুল বলি নে, কিন্তু দেহের শক্তি কমলে মন খানিকটা দুর্বল হয় বইকি। আজ বেশ বুঝছি।

—মিশিরজীকে বাড়ি দেখা-শোনার ব্যবস্থা করে দাও।

—তাই দেব। তোদের জন্যই তো মাঝে মাঝে ভাবি। বেশ, রেবাকে আর একবার আমি জিজ্ঞাসা করি, সে যদি বলে—

আমি ডাকছি। বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেই সুচরিতা বাধা দিয়া বলিলেন, এখন নয়, সবে এসেছে—বিশ্রাম করুক। পরামর্শ করবার জন্য পুরো একটি দিন আছে।

বিশ্রাম! হাসিয়া নন্তু আর কোন কথা বলিল না। তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

যোগমায়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। সুচরিতা তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, ভাই, একটা অনুরোধ করব—রাখবে?

—কি বলবে?

—পরশু আমরা পিকেটিং করতে যাব তাতে আমাদের জেল হতে পারে। ছ' মাসের কম তো নয়। সেই ছ' মাস তুমি এখানেই থাক না কেন?

যোগমায়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু সাধ ক'রে জেলে যাবে কেন তোমরা? সেখানে শুনেছি চোর-ডাকাতরা থাকে।

হাসিয়া সুচরিতা উত্তর দিলেন, ঠিকই শুনেছ। কিন্তু আমরা তো চুরি-ডাকাতি করে জেল খাটব না, ভারতের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করব শুধু।

—তা তোমাদের অস্ত্র কই?

—আছে। তবে তলোয়ার, কামান, বন্দুক আমরা ব্যবহার করি নে। আমাদের যুদ্ধ নিরস্ত্র। মানে কেউ যদি আমাদের মারে আমরা মার খেয়ে যাব, তাদের গায়ে হাত তুলব না।

—তাই কি হয়?

—আগে হ'ত না—এখন হয়। অস্ত্রের বল হ'ল পশুবল —আর আত্মার বল হ'ল দেববল। কোন্‌টা বড় ভাই?

—দেববল।

—তবে? দেববলের জয় হবেই। তুমি ভেব না। একটু থামিয়া বলিলেন, তুমি মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছ?

যোগমায়া মাথা নাড়িলেন। বহু দিন পূর্ব্বের কার্ত্তিকী-পূর্ণিমার একটি ছবি তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। সে ছবি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে। শীর্ণকায় কালো ছেলেটি—মুখে তার প্রশান্ত নির্ম্মল হাসি—মা বলিয়া যোগমায়ার হারান ছেলেটির স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে—এমনই সময়ে গঙ্গার দক্ষিণ দিকের সীমাহীন পথের প্রান্তে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইচ্ছা করিয়া নহে —অস্ত্রের তাড়নায়। সুচরিতার ঘর-ভাঙার মন্ত্রণার মধ্যেও সেই বিগত দিনের বিভীষিকা। যে আগুনের আঁচ সেদিন গায়ে লাগিয়াছিল—সেই অগ্নিসৃষ্টির তথ্য আজও যোগমায়া বুঝিতে পারেন না।

—মহামানব গান্ধী—এই যুগের কানে 'অভী' এই মন্ত্র দিয়েছেন। অন্যায় না করে কেন আমরা মানুষকে ভয় করব ভাই। মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ত ভালবাসার।

ওপারের গঙ্গাতীরের সুউচ্চ পাড়ে তখন যোগমায়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সেই ছেলেটি কি সাদা উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া বিশৃঙ্খল চুল উড়াইয়া শীর্ণ হাত দু'খানি আন্দোলিত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে? মাথার উপর কালো আকাশ আর নাই; পেঁজা তুলার মত সাদা মেঘে হুড়াহুড়ি করিয়া ছেলেটির আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

শরতের বিস্মৃতপ্রায় চেহারার সঙ্গে নন্তর আশ্চর্য্য মিল। প্রিয়-দর্শন নন্ত ততটা রোগা নহে, কালো ত নহেই। চুলের পারিপাট্য আছে—বেশের পারিপাট্য আছে, চাল-চলনের মধ্যে সাচ্ছন্দ্যের মসৃণতা চোখে পড়ে—তবু কথার সুরে শরতের কণ্ঠস্বরের খানিকটা যেন ধরা পড়ে; আর তেমনই বড় বড় চোখের স্বপ্ন-মোহভরা দৃষ্টি। এই ছেলেরা যুগে যুগে এমনই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে হয়ত। বিবাহ এদের কাছে হয়ত বা পদ্মপাতার উপর জলের মত। যতক্ষণ জলবিন্দু পাতার উপরে থাকে—ততক্ষণই শোভা; না থাকিলেও পাতার দাগ বা সিক্ততার চিহ্ন থাকে না।

কখন সুচরিতা চলিয়া গিয়াছেন—যোগমায়া জানেন না। চমক ভাঙিল ক্লক ঘড়িটার টং টং শব্দে। কাঁটাগুলা আস্তে আস্তে ঘুরিয়া কালের চক্রটিকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। টিক্ টিক্ করিয়া ঘড়ি অনবরত কি কথা বলিতেছে। ঘড়ির লেখা যোগমায়া আজও পড়িতে পারেন না।

রাত্রির অন্ধকারে নিজের ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যোগমায়া। বৈরাগ্য-বাঞ্ছিত প্রয়াগের সুবিস্তীর্ণ তীরভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, ওপারে ঝুঁসির মঠাভ্যন্তরেও পুঁথি-পড়ার সুরটুকু আর প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করে না। তিন দিকের সেতু-বন্ধনে আবদ্ধ চরভূমি ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণতর হইতেছে। মাথার উপরের আকাশ নামিতে নামিতে ঘরের ছাদে আসিয়া ঠেকিয়াছে—চারি পাশের দেওয়ালে সঙ্কুচিত হইয়া চরভূমি যেন বাসগৃহে রূপান্তরিত হইয়াছে। নদীর ধারে বসিয়া নুড়ি সংগ্রহ করিয়াছেন এতকাল? প্রয়াগে বৎসরে কত পুণ্যতিথিই আসে—কত মেলা বসে। কুটীরে বসিয়াও যোগমায়া সংগ্রহ করিয়াছেন—ছোট মাটির পুতুল, চুপড়ি, হাতপাখা, সিঁদুর-কৌটা, নামাবলী, পাথরের ছোটবড় বাটি অনেকগুলি, রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ ও তুলসীর মালা, গোপী তিলকের মাটি, ছোট শ্বেত চামর···। ক্ষুদ্র ঘরখানি এই সব সংগ্রহে ভরিয়া উঠিয়াছে। বৈরাগ্য বৈশাখী বায়ুর মত সহসা উঠিয়াছিল। দু-দণ্ডের ঝড় তুফান দণ্ড কয়েকের মধ্যেই শেষ হইয়াছে—এখন সংগ্রহের পালা। ভিতরে গিরিমাটির রং কোনদিনই ধরিতে পারে নাই।

ওপাশের ঘরে আজ যাহারা পরিপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া যাইবার আয়োজনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের জন্য এত ব্যথা মনের মাঝে জমা হয় কেন? এ ব্যথা তাহাদের জন্য, না নিজের অফুরন্ত সংগ্রহ-বৃত্তির অপূর্ণতার পানে চাহিয়া এই কাঙাল-পনা। সুচরিতা দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা নহেন—নগ্নিকা সংহারিণী মূর্ত্তি কালিকা। ওঁর খড়্গের উদ্যত ভঙ্গিমার অন্তরালে বরাভয়যুক্ত শ্রীকর অদৃশ্য। পায়ের তলায় মঙ্গলমূর্ত্তি শিবকে দলন করিয়াই সর্ব্বনাশিনীর কত যে পরিতৃপ্তি!

—এ কি মাসীমা, আপনার চোখমুখ শুকনো কেন? অসুখ করেছে নাকি?

—না মা, কাল রাতে ভাল ঘুমুতে পারি নি।

রেবা হাসিয়া বলিল, আমরাও ঘুমুতে পারি নি। মার কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে বা আনন্দ হ'ল।

যোগমায়া বলিলেন, তোমার শাশুড়ী যাই করুন—এই কচি বয়সে ও রকম কাজে তোমার না নামাই উচিত।

—কেন নামব না মাসীমা। বুড়ো হলে তখন কি আর কাজ করতে পারব?

—জেলে যাওয়ার চেয়ে নিজের ঘর-সংসার দেখাতেও পুণ্যি আছে।

—ঘর কোথায় মাসীমা? সে জায়গা ছোট—এ জায়গা খানিকটা বড়—এই তো? পুণ্যি কোথাও নেই মাসীমা—ওটা নেহাৎ মনভুলানো কথা।

—কি বলছ?

—যে কাজ ক'রে মনে আনন্দ হয়—তাই তো পুণ্য।

যোগমায়া তর্ক তুলিয়া মেয়েটিকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিবেন এমন সময়ে সুচরিতা আসিয়া কহিলেন, রেবা, আজ সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিতে হবে। আনন্দভবনে মহিলা-কর্ম্মীরা সব আসবেন।

যোগমায়ার পানে চাহিয়া কহিলেন, কি ভাই, কিছু বলবে?

মুখ নামাইয়া যোগমায়া বলিলেন, আমি তো তোমার সম্পত্তি

আগলে পড়ে থাকতে পারব না ভাই। দু'চার দিনের মধ্যেই আমাকে দেশে ফিরতে হবে।

সুচরিতা হাসিমুখে বলিলেন, বেশ তো, ফিরে যাবে। তোমার যাতে অসুবিধে হয় সে কাজ তুমি করতে যাবে কেন?

—কিন্তু এই বাড়ি-ঘরের ভার কার ওপর দিয়ে যাব!

—কেন মিশিরজী রইলেন। না হয় একটা তালা ঝুলিয়ে দিও।

—তাই কি হয়?

—কেন হবে না, সমুদ্রে যাদের বাস শিশিরে তাদের ভয় করলে চলবে কেন ভাই। আজ এই বাড়ি-ঘর আমার আছে—কাল সরকারের হাতেই বা কতক্ষণ। সুচরিতা হাসিমুখে জবাব দিলেন।

যোগমায়া সমস্ত আবেগ একত্রিত করিয়া সুচরিতার দু'খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, না ভাই, এই সর্ব্বনাশের কথা আর বলো না। তোমার হাসি দেখে আমার মন কেমন করে।

—কেন?

—কেন? ঘর না থাকলে মেয়েমানুষ কি নিয়ে বাঁচবে!

—বাঁচবে ভাই—বাঁচতে হবে তাদের অন্য রকমে।

না জাগিলে সব ভারতললনা
এ ভারত কভু জাগে না জাগে না।

প্রস্তরমূর্ত্তির মত যোগমায়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রেবা কখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে—কখন চলিয়া গিয়াছে; মনে মনেও আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিবার অবসর তিনি পান নাই।

ক্রমশঃ

আসামের ইমিগ্র্যাণ্ট-সমস্যা

শ্রীললিতমোহন কর

'আসামে লাইন প্রথা' ও ইমিগ্র্যাণ্ট সমস্যা সম্বন্ধে ১৩৩৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় কতক আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আরও কতক তথ্য দেওয়া হইতেছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১৯২৩ সালে সর্ব্বপ্রথম আসামে লাইন-প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহার পূর্ব্বে অন্য প্রদেশ হইতে আগতদের সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ ছিল না। ইমিগ্র্যাণ্ট কর্ত্তৃক স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান দৌরাত্ম্য এবং জমি দখলের অপকৌশলই লাইন-প্রথা প্রবর্ত্তনের কারণ। মিঃ হিগিন্স, আই. সি. এস.-এর আদেশ অনুযায়ী ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইমিগ্র্যাণ্টদের উপর বাধা-নিষেধ জারি করা হয়। ১৯২৪ সালে মিঃ টমাস, আই. সি. এস.-এর আদেশ অনুযায়ী বন্দোবস্তযোগ্য ভূমির ও মৌজাগুলির শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ইহার দ্বারা (১) কতকগুলি মৌজা কেবল আসামীদের জন্য রিজার্ভ হয়, (২) কতকগুলিতে লাইন নির্দ্ধারণ করিয়া আসামী এবং ইমিগ্র্যাণ্টদের এলাকা পৃথক করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করা হয়, (৩) কতকস্থানে লাইন নির্দ্ধারণ করা হইবে বলিয়া রিজার্ভ রাখা হয়, (৪) কতক স্থানে লাইন নির্দ্ধারণ সম্ভবপর নহে বলিয়া ইমিগ্র্যাণ্টদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়, (৫) কতক স্থান বিনা বাধা-নিষেধে (লাইন ব্যতীত) অবাধ বন্দোবস্তের জন্য দেওয়া হয়, (৬) কতক স্থান কেবল ইমিগ্র্যাণ্টদের বন্দোবস্তের জন্য খোলা হয়। এতদ্ব্যতীত যে-সকল স্থানে ইমিগ্র্যাণ্টরা ইতঃপূর্ব্বে অস্থায়ী পাট্টা বন্দোবস্ত করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিল এইগুলিতে তাহাদের দখল স্থির রাখা হয় কিন্তু এতাধিক বিস্তার-লাভ বারণ করা হয়। ইমিগ্র্যাণ্টরা অতঃপর ছলে-বলে-কৌশলে বা দরজোত গ্রহণ করিয়া নির্দ্ধারিত সীমার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং পাট্টা বন্দোবস্তকালে জমির দখলকার বলিয়া বন্দোবস্তী আইন অনুযায়ী তাহাদের নামে জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ আরম্ভ করে। ইহার দ্বারা লাইন-প্রথার মূল নীতি ব্যাহত হইতেছিল। ১৯২৫ সালে মিঃ পিচার্ড, আই. সি. এস.-এর আদেশ অনুযায়ী পূর্ব্ব অনুমতি না লইয়া আসামীদের জন্য রক্ষিত লাইন মধ্যে জমি খরিদ বিক্রী বা দখলকার হওয়া সত্ত্বেও তাহা কার্য্যকরী হইবে না। অর্থাৎ, বন্দোবস্তকালে এইরূপ দখলকারকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের দখল উচ্ছেদ করা হইবে বলা হয়। প্রথমে কেবল ময়মনসিংহ জেলা হইতে আগত অধিবাসীদের প্রতিই বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল। পরে তাহা সর্ব্বশ্রেণীর ইমিগ্র্যাণ্টদের প্রতি প্রযোজ্য হয়।

লাইনপ্রথার প্রয়োজনীয়তা—সরকারী অভিমত: 'আসাম ভেলী'র কমিশনার মিঃ কেণ্ট্লী, আই, সি. এস.-এর রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ,—

ইমিগ্র্যাণ্টদের মধ্যে কেহ আসামীদের গ্রামে এক খণ্ড জমির মালিক বা দখলকার হইয়াই অন্তকে ডাকিয়া আনে এবং জোরজবরদস্তি করিয়া এই 'প্লটে'র বাহিরের অন্য জমিও দখল করিয়া লয়। আসামী বলপ্রয়োগ করিয়া বা ফৌজদারী কি দেওয়ানী আদালতে গিয়া অর্থব্যয় করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে বা স্বাধিকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। অতঃপর তাহারা বাধ্য হইয়া স্থান ত্যাগ করে বা অনিচ্ছাসত্বেও জমি বিক্রী করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ইত্যবসরে ইমিগ্র্যাণ্টরা সমস্ত গ্রামের উপর অধিকার স্থাপন করে। লাইন-প্রথা বর্তমান থাকায় এইরূপ কার্য্যের প্রতিবিধান করা যায় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া ও হাঙ্গামা নিবারিত হয়।

রিপোর্টে আরো প্রকাশ—(১) আসামীদের কাছে আজ এই কথা অতি পরিষ্কার যে, সরকার হইতে তাহাদিগকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা না করিলে তাহারা নিজেদের গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইতে বাধ্য হইবে।

(২) নওগাঁ জেলার সকল অফিসাররা এই বিষয়ে একমত যে, লাইন-প্রথা রদ করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ আসামীদের উপর দিয়া বিরাট্ অভিযান হইয়া তাহারা তলাইয়া যাইবে।

(৩) ইমিগ্র্যাণ্ট জমির জন্য অত্যন্ত লালায়িত। তাহাদের জানা আছে, আসামী তাহাদের ভয়ে এত ভীত যে, জোর করিয়া বেদখল বা উগ্র মেজাজ দেখাইয়া খারাপ ভাষায় গালাগালি করিয়াই তাহারা জমির মালিক হইতে পারে। পৃথিবীতে যে-কোন লোক এই উপায়ে জমির মালিক হওয়া যায় বুঝিলে তাহা করিতে চাহিবে।

(৪) আসামীরা অভিযোগ করে, ইমিগ্র্যাণ্টরা তাহাদের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া নানা ভাবে অত্যাচার উপদ্রব করিয়া থাকে।

(৫) মেয়েরা ক্ষেতের কাজ উপলক্ষে তাহাদের সান্নিধ্য লাভ করিলে তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া ধর্ষণ করে, নদীতে মাছ ধরিতে গেলে শাসাইয়া থাকে।

(৬) তাহাদের জমিতে গো-মহিষাদি ছাড়িয়া দিয়া ফসলের অনিষ্ট সাধন করে। তাহারা গো-মহিষাদি ধরিয়া খোঁয়াড়ে লইয়া যাইতে চাহিলে দলবদ্ধ ভাবে লাঠি-সোঁটা সহ আক্রমণ করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায়।

এই সব উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া আসামীরা জমি ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হয় এবং তাহারা জমির দখলকার হইয়া বসে। কমিশনার সাহেব এই সব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং বল প্রয়োগ করিয়া নিজেদের অধিকার রক্ষা করার কথা বলিলে তাহারা উত্তর দিয়াছিল, ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীরা জেলকে ভয় করে না। হাঙ্গামা করিয়া জেলে যাওয়া আসামীরা লজ্জাজনক মনে করে। বিশেষতঃ তাহারা এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করিলে ইমিগ্র্যাণ্টরা তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া তাহাদের মুখে ভাত গুঁজিয়া দিয়া তাহাদের জাতি নষ্ট করে, বাড়ীতে গিয়া তাহাদের গরু-বাছুরের গলা বা লেজ কাটিয়া দেয়।

ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব পুলিস মিঃ আর. সি. আর. কামিঙের রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—

(১) মুসলমান ইমিগ্র্যাণ্টরা অত্যন্ত অপরাধ-প্রবণ, তাহারা এত বেশী অপরাধ-প্রবণ যে, তাহাদের প্রথম আগমনে সম্পূর্ণ ভাবে অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯২৩ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ইহাদের সামলাইতে গিয়া ১২টি নূতন থানা খুলিতে হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ইহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিতে এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে।

(২) দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন, ডাকাতি, চুরি, নারীধর্ষণ, ইত্যাদি অপরাধ ইমিগ্র্যাণ্ট অঞ্চলে বিশেষ ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। নওগাঁ, দরং, কামরূপ, গোয়ালপাড়া এই চারিটি জেলায় যে-সকল স্থানে ইমিগ্র্যাণ্টরা বসবাস করিতেছে গত ১৫ বৎসরে (১৯২২-৩৬) এইরূপ অপরাধের সংখ্যা পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী ২৮১৮৪টি। কেবল নারীঘটিত অপরাধ—ধর্ষণ, নারীহরণ, অনিচ্ছায় জোর করিয়া বিবাহ করা, শ্লীলতা-হানি কেবল এই শ্রেণীর অপরাধ-সংখ্যা ২৮০২।

এই শ্রেণীর অধিকাংশ ঘটনা পুলিসে যে রিপোর্ট করা হয় নাই এই কথা বিশ্বাস না করার কারণ নাই।

নওগাঁ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে. চৌধুরী রিপোর্টে মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিয়া লাইন-প্রথা উঠাইলে বর্তমান পুলিশ বাহিনীর দ্বারা শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

মিঃ সি. এস. স্যানিং, আই. সি. এস.-এর অভিমত :—

লাইন-প্রথা আসামের স্থায়ী অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বলবৎ থাকা প্রয়োজন।

মিঃ সি. বি. সি. পেইন, আই. সি. এস.-এর অভিমত :—

যাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, বল প্রয়োগ অথবা আইনের সাহায্য গ্রহণে অপারগ, তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের প্রধানতম কর্তব্য। লাইন-প্রথাই একমাত্র পন্থা, যাহা দ্বারা এই সব ব্যক্তিকে সাহায্য করা যাইবে।

মিঃ জি. সি, বড়দলই, সবডিবিসন্তাল অফিসার, বর-

পেটা, অত্যাচারের তিনটি সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন :—

(১) জমি দখলের জন্য খুন করা একটা সাধারণ ঘটনা।

(২) জোরে অন্যের ফসল কাটিয়া নেওয়া বা ফসলের মধ্যে গরু ছাড়িয়া তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া একটা সাধারণ ঘটনা।

(৩) যথেচ্ছভাবে নারীর উপর অত্যাচার করা একটা সাধারণ ঘটনা।

এই রিপোর্ট হইতে আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভারতবর্ষে বিশেষ রক্ষাকবচ দ্বারা দুর্ব্বল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা স্বীকৃত নীতি। মিঃ জিন্না সংখ্যাগুরু হিন্দু-সম্প্রদায়ের হাত হইতে সংখ্যালঘু মুসলমান-সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য লড়িতেছেন। এই নীতি অনুসারে দুর্ব্বল আসামীদিগকে বিশেষভাবে কাছাড়ীদিগকে ইমিগ্র্যাণ্টদের জুলুম-জবরদস্তির হাত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য লাইন প্রথার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আসাম উপত্যকাবাসী মুসলমানদের অভিমত। মৌলবী আব্দুল কাদির, উকিল নওগাঁ :—

বর্ত্তমান লাইন-প্রথা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনই এই প্রথা প্রবর্ত্তনের জনক। ইমিগ্র্যাণ্টদের যথেচ্ছ অত্যাচার হইতে শান্তিপ্রিয় আসামের অধিবাসীদের রক্ষার জন্য ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

মৌলবী আব্দুল হামিদ, সেক্রেটরী আঞ্জুমান ইসলামিয়া :—

লাইন প্রথা প্রবর্ত্তনই ইহার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ। স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ইমিগ্র্যাণ্টদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ইমিগ্র্যাণ্টদের জুলুমের হাত হইতে রক্ষার জন্যই ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মৌলবী হাফিজুর রহমান, উত্তর লখিমপুর :—

ইমিগ্র্যাণ্ট ও আসামীদের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য লাইন-প্রথা থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে।

মৌলবী আবদুল হাই—সেক্রেটরী আসাম ভেলী মুসলিম পার্টি :—

আমার মতে লাইন-প্রথা সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে। নবাগত ইমিগ্র্যাণ্টদের প্রতি ইহার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

মৌলবী কবিরউদ্দিন আহম্মদ, সেক্রেটরী আঞ্জুমান, বরপেটা :—

বর্ত্তমান লাইন-প্রথা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা প্রয়োজন। আসামবাসীরা শান্তিপ্রিয় লোক, তাহাদের প্রতিবেশীরা তাহাদের মত শান্তিপ্রিয় হউক, এই তাহারা কামনা করে। পূর্ব্ববঙ্গীয় ইমিগ্র্যাণ্টদের স্থানীয় অধিবাসীদের নিকটে বসবাস করিতে দেওয়া স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইমিগ্র্যাণ্ট অঞ্চলে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যাই তাহাদের অত্যাচারের সত্যতার প্রমাণ।

মৌলবী আকবর আলী ও মাহম্মদ খাঁ রজিয়া :—

ইমিগ্র্যাণ্টরা জমির জন্য এত লালায়িত যে জমির দখল ত্যাগ করা অপেক্ষা মৃত্যু বরণ তাহারা শ্রেয়ঃ মনে করে। ইমিগ্র্যাণ্টরা যাহাতে তাহাদের সীমা ছাড়িয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য আরো কঠোর আইন হওয়া প্রয়োজন।

সেন্সস রিপোর্ট—আর স্থান আছে কি না ?

সেন্সস্ রিপোর্টে আসামে আর কত লোক বাহির হইতে আসিয়া বসবাস করিতে পারে, এই সম্বন্ধে নওগাঁ, দরং, কামরূপ এবং গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটি কমিশনারগণের মত আলোচনা করা হইয়াছে। নওগাঁ—১৯৩১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট অনুযায়ী নওগাঁ জেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত ৪১·৩। পূর্ব্বে আগত ও স্থানীয় অধিবাসীদের চাহিদা মত জমির সংস্থান সম্ভব হইতেছে না। কামরূপ জেলার বরপেটা সবডিবিসনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত শতকরা ৬৯। ব্রহ্মপুত্র নদের সমস্ত (available) চর ইমিগ্র্যাণ্ট দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইমিগ্র্যাণ্টদের আর বিস্তার লাভের স্থান কামরূপে নাই। দরং জেলায় গোচারণের জন্য রিজার্ভ রাখা জমি ব্যতীত অন্য জমি ইতঃপূর্ব্বেই ইমিগ্র্যাণ্টদিগকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। ইমিগ্র্যাণ্টদের বিস্তার লাভের স্থান এই জেলায় আর বেশী নাই। গোয়ালপাড়া জেলায় বসবাস বা কৃষির জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে এমন জমি আর বেশী অবশিষ্ট নাই। অবশিষ্ট দুই জেলা—লখিমপুর ও শিবসাগর চায়ের জেলা (Tea districts) বলিয়া খ্যাত। লখিমপুরের ডিব্রুগড় মহকুমাকে সেন্সস্ রিপোর্টে Mainly a vast Tea garden—বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মার্গারিটা ও ডিগবয়ে বহু সহস্র শ্রমিক কর্ম্মী বসবাস করিতেছে। শিবসাগর জেলা লোকসংখ্যায় 'আসাম ভেলী'র মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৯৩১ সালে কেবল এই জেলায় নূতন ভাবে তিন লক্ষ শ্রমিক আমদানী করা হইয়াছে। উত্তর-লখিমপুরে ইতঃপূর্ব্বে সুবিধাজনক স্থান ইমিগ্র্যাণ্টরা বন্দোবস্ত লইয়াছে এবং আসামের স্থায়ী অধিবাসীরাও অন্যান্য স্থান হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছে। ১৯২২-৩৬ সালের মধ্যে আসামী এবং ইমিগ্র্যাণ্টদের মধ্যে যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার এবং কৃষিকার্য্যের উপযোগী অবশিষ্ট জমির বিবরণ নিম্নের তালিকায় দেখান হইল :—

গণেশচন্দ্র দে

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মীরাটে আমার অবস্থান হ'ল একুশ বছর ধরে, অবশ্য অনিরবচ্ছিন্ন ভাবে। প্রায় দুই যুগের মত এই দীর্ঘ সময়ে আপামর সাধারণ সকলকে নিঃসংশয়ে শ্রদ্ধা করতে দেখেছি মাত্র একজন লোককে—তিনি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে।

এই অশেষ শ্রদ্ধার হেতু কি হতে পারে অনেক বার ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছি। উত্তর যা পেয়েছি সেই কথাটাই আজ তাঁর লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন উপলক্ষ্যে ব্যক্ত করব।

যাঁরা গণেশবাবুকে না জানেন আমার উপরের ভূমিকাটুকু থেকে তাঁরা মনে করবেন যে গণেশবাবু নিশ্চয় কন্‌ট্রোলার আপিসের একজন অফিসার ছিলেন এবং অনেক বিত্তসম্পদের অধিকারী ছিলেন। কেননা অধুনা বিংশ শতাব্দীতে আমরা শ্রদ্ধা করি ক্ষমতাকে এবং বিত্তকে। কিন্তু আশ্চর্য এই প্রহেলিকা—গণেশবাবুর ক্ষমতাও ছিল না, বিত্তও ছিল না—তিনি কন্‌ট্রোলার আপিসের অফিসারও ছিলেন না, এমন কি একাউণ্ট্যাণ্টও ছিলেন না—তিনি ছিলেন আরো দশজনের মত একজন সাধারণ কর্মচারী।

তা হ'লে কি ছিল তাঁর সম্পদ যার জোরে তিনি জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলের মনের উপর আধিপত্য করতে পেরেছিলেন? সে হচ্ছে তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক বল এবং সে বল তিনি প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রবলের প্রধান উপকরণ ছিল নিষ্ঠা—যাকে তিনি আদর্শ বলে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। যে দুর্গাবাড়ীতে দাঁড়িয়ে আজ আমরা তাঁর শোক-সভার আয়োজন করেছি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল কি অসাধারণ! যত দিন চাকরি করেছেন তত দিন ত বটেই, অবসর গ্রহণ করার পরও যত দিন চলাফেরা করার শক্তিসামর্থ্য ছিল তত দিন তাঁর সমস্ত সময় এবং শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে। এই সম্বন্ধে তাঁকে আলোচনা করতেও শুনেছি। ধর্মজীবনে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুগামী শিষ্য ছিলেন। তিনি দীক্ষালাভ করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের নিকট। উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার একবার মীরাটে আসেন এবং কিছুদিন এখানে ছিলেন। সেই সময় গণেশ বাবু এবং আরো কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক মজুমদার মহাশয়ের নিকট-সম্পর্কে এসেছিলেন। গণেশবাবু বলতেন যে মজুমদার মশায় বলেছিলেন, "বাবা, টাকাকড়ি সকলের থাকে না, ইচ্ছে থাকলেও তাই অনেকে পয়সা দিতে পারেন না। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে সময় সকলেই দিতে পারেন।" কোন এক বার দুর্ভিক্ষের চাঁদা সংগ্রহ ব্যাপারে মজুমদার মশায় ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। যুবক গণেশচন্দ্র তখনই ঝুলি নিয়ে বাজারে চাঁদা সংগ্রহ করার জন্যে বেরিয়ে পড়েন। এ আপিস থেকে ফিরে এসে বিকালবেলার ঘটনা। ঘণ্টাখানেক ঘুরে গণেশচন্দ্র আশার অতিরিক্ত পয়সা এবং চাল আটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। মজুমদার মশায়ের ঐ শিক্ষা গণেশবাবু জীবনে ব্যর্থ হতে দেন নি। তার পর থেকে তিনি সাধারণের কাজে সময়-দান করেছিলেন। দুর্গাবাড়ীর জন্য কত কষ্টে যে চাঁদা আদায় করতেন, কত লাঞ্ছনা, অপমান এবং অবাঞ্ছিত উপদেশ যে সহ্য করতে হত তার আনুপূর্বিক ইতিহাস মাঝে মাঝে কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। যত দিন শক্তি-সামর্থ্য ছিল দুর্গাবাড়ীর সেবা করেছেন। যখন বুড়ো হলেন, শক্তি-সামর্থ্য গেল তখন দুর্গাবাড়ীর সামনে বাড়ি কিনলেন এবং সেই বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। আমি নিজে দেখি নি কিন্তু অনেককে বলতে শুনেছি যে বুড়ো বয়সেও তাঁর ঘরের জানালা থেকে গণেশবাবুকে তাঁরা দুর্গাবাড়ীর দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখেছেন। হাঁটতে কষ্ট হত কিন্তু তবু মহাষ্টমী পূজার দিন এক বার তিনি দেবীদর্শনে আসতেন। কি আশ্চর্য, কি অসাধারণ ছিল এই নিষ্ঠার রূপ!

যেমন দুর্গাবাড়ীর প্রতি, তেমনি মীরাটের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠা। পেন্সন নেওয়ার পর মীরাটের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে তিনি একবার বাংলাদেশে বাস করার জন্যে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বোধ হয় বৎসরও পুরে নি এমন সময় তিনি ফিরে এলেন। বললেন, দেশে শরীর টিকল না। তার পর থেকে শেষ দিন পর্যন্ত মীরাটেই কাটালেন। ৭৮ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছেন, সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বরাবর তিনি ধর্মালোচনা এবং ধর্ম-জীবন যাপন করেছেন, সুতরাং স্বভাবতই মনে হতে পারত যে তাঁর নশ্বর দেহ গড়মুক্তেশ্বরের গঙ্গাতটে

ভস্মীভূত করার নির্দেশ তিনি দিয়ে যাবেন। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হলুম এই সংবাদে যে, অশীতিপর বৃদ্ধ গঙ্গালাভের ইচ্ছা মনের মধ্যে সংবরণ করে মীরাটের সূর্য্যকুণ্ডেই তাঁর নশ্বর দেহ দাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন। এই পরমাশ্চর্য নিষ্ঠার পরিবর্তে মীরাটবাসী এবং মীরাটের দুর্গা-বাড়ী গণেশবাবুকে কি কখনো ভুলে যাবে?

তাঁর চারিত্রিক বলের ইঙ্গিত আগেই করেছি। তার একটা উদাহরণ দেব। ৩৬।৩৭ বছর আগে মীরাটে এক-বার মহামারী রূপে প্লেগ দেখা দেয়। সেই ভীষণ রোগের কবলে গণেশচন্দ্রের সহধর্মিণী, ছয়টি শিশুপুত্র এবং একটি কন্যার এক সময়ে মৃত্যু হয়। মাত্র একটি শিশুপুত্র (পরেশ) রক্ষা পায় যে বর্তমানে তাঁর একমাত্র সন্তান। এই যে অপরিসীম দুঃখের এক করুণ কাহিনী গণেশ বাবু কোন দিন কারুর কাছে এর উল্লেখ করেছেন বলে শুনি নি, এ নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে কখনো দেখি নি। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, এরূপ মর্মান্তিক ঘটনায় যা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা হয় নি অর্থাৎ তিনি ভগবানের ন্যায়-বিধানের উপর বিশ্বাস হারান নি এবং তিনি মনুষ্য-বিদ্বেষী হন নি। বরঞ্চ তাঁর জীবন থেকে এই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে তিনি এই ঘটনাকে ভগবানের নির্দেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিল।

উপরে যতটা বলেছি তার থেকে মনে হবে যে, গণেশ-বাবু বুঝি রুক্ষ কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁর অন্তর্গূঢ় আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলতে পারব না কিন্তু সমাজজীবনে তিনি সরল এবং মধুর স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মকে তিনি তার ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়ের আবেদনও তাঁর মনের দুয়ারে সহজে পৌঁছুতে পারত। তিনি আমাদের সাহিত্য-সভায় খবর পেলেই আসতেন এবং সেই সভায় একবার আমাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে 'ধর্ম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। পরে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি কয়েক সংখ্যা "উদ্বোধনে" ছাপা হয়। আগ্রায় যে বৎসর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয় সে বার আমরা গণেশবাবুকে আমাদের সহযাত্রী হওয়ার জন্যে ধরে বসলুম। তিনি রাজী হলেন এবং শুধু তাই নয়, সেখানে গিয়ে সম্মেলনের অধিবেশন দেখে এত খুশী হয়েছিলেন যে রাত্রে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। তার নাম দিয়েছিলেন, "বৃদ্ধের প্রথম কবিতা।" কবিতাটি পরের দিন সম্মেলনে পড়া হয়েছিল।



গণেশচন্দ্র দে

প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমতা যদি মানুষের গুণ হয়, প্রতিষ্ঠানকে সেবা, মানুষের সেবা যদি ভগবানের সেবা বলে গ্রাহ্য হয়, তবে গণেশবাবু সে বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। দুর্গাবাড়ীর পূজার বাসন শেষের দিন পর্যন্ত তিনি যক্ষের মত আগলে থাকতেন। অথচ নিজের জন্য তিনি কিছুই চান নি—না অর্থ, না সম্মান, না প্রতিপত্তি। যে দুর্গাবাড়ীর তিনি এত সেবা করতেন তার কিন্তু তিনি সেক্রেটারী কিংবা কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। সংসারে ঐ একটি পুত্র ভিন্ন কোন আকর্ষণই ছিল না কিন্তু তবু নিরলস চিত্তে কর্তব্য পালন করে গেছেন—সংসার ত্যাগ করে চলে যান নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং যখন যা কথা দিয়েছেন তা রক্ষা করেছেন। প্রাচীন আদর্শ তাঁর জীবনে সার্থক হয়েছিল—সেই আদর্শের প্রতি আমার অকুণ্ঠিত প্রণতি নিবেদন করি।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

(ভারতীয় প্রাচ্য-কলা সমিতি)

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট বা ভারতীয় প্রাচ্য-কলা সমিতি একটি প্রাচ্যদেশীয় প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয় রূপবিদ্যা বা ললিতকলা-বিষয়ক আলোচনা, গবেষণা, অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পায়তন।

বিখ্যাত কলাবিদ এবং শিল্পসমালোচক হ্যাভেল, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং শিল্পকলার নিষ্ঠাবান ভক্ত উডরফ এবং বাংলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মারকুইস অব জেটল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ও রূপরসিক এবং আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ, বিখ্যাত শিল্পসমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী, ভগিনী নিবেদিতা, শিল্পরসিক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পী ও সুধীবৃন্দের সমবেত চেষ্টা ও উৎসাহে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকলা বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রচার ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সমালোচকের মতে এই ঘটনাটি ভারতের শিল্পকলার নবজন্মের সূচনা করিতেছে; কাহারও কাহারও মতে ইহা তৎপূর্ব্বযুগের পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে উদ্‌ভ্রান্ত ভারতীয় শিল্পপ্রতিভার মোহভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি সম্বন্ধে পণ্ডিত ও সমালোচকগণের মধ্যে যতই মতানৈক্য থাকুক না কেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি-চর্চ্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এই শিল্পায়তনের গবেষণা এবং প্রচারকার্য্য ইতিমধ্যেই আশাতীতরূপে প্রসারলাভ করিয়াছে।

যে সময়ে এই সমিতি স্থাপিত হয় তখন পর্য্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি রূপবিদ্যার দিকটা আধুনিক জগতের নিকট অত্যন্ত অস্পষ্ট ও কুহেলিকাচ্ছন্ন ছিল। এমন কি অনেক ঐতিহাসিকের এরূপ অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকলার অস্তিত্বই ভারতবর্ষে নাই। কিন্তু এই সমিতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ভ্রান্ত ধারণা এখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। এই শিল্পায়তন-সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণের সমবেত সাধনায় ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান প্রাচ্যকলাবিদ্যার ইতিহাস আধুনিক জগতের নিকট আজ অনেকটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে এত দিন জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের যে প্রদোষ অন্ধকার বিরাজ করিত তাহা আজ কাটিয়া গিয়াছে।

পক্ষান্তরে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলে ভারতের তরুণ শিল্পিগণের অন্তরে একটা বলিষ্ঠ আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নব্য শিল্পিগণের রূপ-সৃজনের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট রীতি ও ধারা ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে এই প্রতিষ্ঠানই সেই সুমঙ্গল ধারার উৎসমুখ। আজিকার দিনে ভারতবর্ষে এমন কোন রূপদক্ষ শিল্পী নাই যিনি এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবান্বিত হন নাই। এত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আর্টস্কুলসমূহে ছাত্রগণকে ইউরোপীয় শিল্পরীতি অনুসারে শিক্ষাদানের 'ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সমিতির চেষ্টায় ও কার্য্যাবলীর প্রভাবে আজ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী ও বে-সরকারী সকল আর্ট স্কুলেই ভারতীয় রীতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকন্তু ভারতের নানাস্থানের আর্ট স্কুলসমূহে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের পদে যে সমস্ত খ্যাতনামা আধুনিক শিল্পী অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের সকলেই* এই শিক্ষায়তনের সহিত সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমানে কি চিত্রাঙ্কনে, কি স্থাপত্যশিল্পে, কি ভাস্কর্য্যে—শিল্পচর্চ্চার সর্ব্ব ক্ষেত্রেই ভারতীয় রীতির অনুশীলন ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় রূপশাস্ত্রের সূত্রসমূহ হইতে প্রেরণা, উপদেশ ও নির্দ্দেশ লাভ করিয়া নবীন শিল্পিগণ শিল্পরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ইহার ফলে আধুনিক ভারতের শিল্পকলা আপনার একটা নিজস্ব গৌরব ও বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিপর্য্যয়ের বিরাট্ আলোড়নে যুগযুগান্তের অন্ধকারের অতল হইতে প্রাচ্যের কলালক্ষ্মী আজ আপনার সুধাভাণ্ড হস্তে আবির্ভূ‌তা হইতেছেন।

* বম্বে স্কুল অব আর্ট এবং অন্য কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। প্র. স.

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আর্টের উপর কোন প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলে আর্টের সার্ব্বজনীনতাকে খর্ব্ব করা হয়; তাঁহাদের মতে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের আর্টের মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্য বিরাজ করিতেছে। এক দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ইহা খুবই সত্য। এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ নানা-ভাবে বিশ্বমানবের অন্তরে যে আবেদন বহন করিয়া আনিতেছে তাহা যখন শিল্পীর ধ্যানে রূপান্তরিত হইয়া সত্য ও সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তাহা হয় আর্ট। বিশ্বমানবের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আনন্দ-বেদনা হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তার স্বপ্ন, তার অমৃততৃষার চিরন্তনী কলামূর্ত্তিই হইতেছে আর্ট। কিন্তু আর্ট মূলতঃ এক এবং অখণ্ড হইলেও রীতি ও প্রকাশভঙ্গী, দেশ ও কালের ভেদ ইহার মধ্যে একটা অনন্ত বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। এই বৈচিত্র্য আর্টের বিশ্বজনীনতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া নানা বৈশিষ্ট্যে ইহাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্ব-দেশের ও সর্ব্বকালের মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে, অথচ দেশ, কাল, পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও জলবায়ুর বিভিন্নতার প্রভাবে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের অল্পবিস্তর পার্থক্য ঘটিয়াছে। স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই প্রত্যেক জাতির চরিত্র একটি বিশিষ্টরূপে অভি-ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের শিল্পপ্রতিভাও তেমনি প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া সেই দেশ ও জাতির ধর্ম্ম-দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও সামাজিক আবেষ্টনীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর্ট নব নব বৈশিষ্ট্যে মহনীয় হইয়া উঠে। কাজেই কোন জাতীয় বা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন অঙ্কিত হইলেই আর্টের মর্য্যাদাহানি হইল, এই কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমালোচকের উদার দৃষ্টি ও প্রশান্ত মনোভাব লইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ আর্ট কোন একটি জাতি বা দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারা এবং রসসৃষ্টির বিশিষ্ট রীতির সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। র‍্যাফেলের তুলিকার শ্রেষ্ঠ অবদান সিষ্টাইন ম্যাডোনা এবং অজ্ঞাতনামা ভারতীয় শিল্পী কর্ত্তৃক অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে পরিচ্ছদ ও প্রকাশভঙ্গিগত যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, কিন্তু উভয় চিত্রেই সন্তান-বাৎসল্যের যে অনবদ্য সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের; ইহা সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার ঊর্দ্ধে চিরন্তন ভাবরাজ্যের সম্পদ।

তাহা ছাড়া যে আর্ট আপনার স্বাভাবিক আবেষ্টনী হইতে—দেশের মাটি, দেশের জলবায়ু, আকাশ আলো বাতাস হইতে আপনার জীবনরস সংগ্রহ না করিয়া বিদেশীয় আদর্শের অনুকরণকেই আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, তাহা কখনই প্রকৃত আর্ট হইতে পারে না। তাহা কতকগুলি সৌখিন শিল্পীর রুগ্নভাববিলাস মাত্র; পরগাছার মতই তাহা মূলশূন্য; দেশের প্রাণ-প্রবাহের সহিত তাহার কোন যোগ নাই। এইরূপ অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কখনও শ্রেষ্ঠ আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে না। স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক নিয়মগুলি মনুষ্যশরীর সম্পর্কে যেমন সমাজদেহ এবং আর্ট সম্বন্ধেও তেমনই প্রযোজ্য। অস্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে সমাজ-জীবন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরানুকরণ কোন দেশ বা জাতির আর্টের একমাত্র উপজীব্য হইলে তাহাও জাতীয় দুর্ব্বলতারই একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ। রাষ্ট্র ও শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে পরানুচিকীর্ষা জাতীয় জীবনের চরম দৈন্য ও অধঃপতনেরই সূচনা করে। কারণ, কোন জাতির আর্টের মধ্যেই সেই জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। কোন জাতির জীবনধারা, তার সভ্যতা, তার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, তার ইতিহাস, তার আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সাধনা তার আর্টের মধ্যেই চিরন্তন রূপ লাভ করে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির আর্টের একটা নিজস্ব ধর্ম্ম, একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে। পরানুকৃতিতে জাতীয় আর্টের ছন্দোভঙ্গ হয় এবং উহা বিকৃত হইয়া পড়ে। ভারতীয় আর্টকে এই বিকৃতি হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিজস্ব গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। আজিকার দিনে শ্রদ্ধানম্রশিরে আমরা তাঁহাদের এই কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে বারম্বার অভিনন্দিত করিতেছি।

ইতিহাসের এক দুর্য্যোগের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনের ধারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদার প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিজাতীয় আদর্শের মরুপ্রান্তরে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। জগতের সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসেই কোন-না-কোন কালে এমনি দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে। মানবসভ্যতার এই পতন-অভ্যুদয়েই ইতি-হাসের পথ চিরকাল বন্ধুর হইয়াছে। এই উত্থান-পতনকে উপেক্ষা করিয়া এক অজ্ঞাত শক্তির দুর্নিবার তাড়নায়

বিভিন্ন দেশের যাত্রীদল যুগে যুগে এই পথে ধাবিত হইয়াছে। মহাকালের জটাজালে অবরুদ্ধ শিল্পসুরধুনী আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাধনার বলে এই পুণ্যভূমিতে অবতরণ করিয়া জাতীয় জীবনের ভস্মস্তূপে জীবনসঞ্চার করিয়াছেন। 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট' বা ভারতীয় প্রাচ্য-কলা সমিতির উদ্বোধন সেই পথপরিচায়কগণেরই শঙ্খধ্বনি। এই অগ্রগামী দলের পুরোভাগে রহিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভারতীয় রূপতত্ত্বের মধ্যে ভারতের আত্মবিস্মৃত বিরাট্ জাতির শিল্পকলা আপনার রূপানুভূতিকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

ঘৃতকুমারী ফুলের মতই মানব-সভ্যতার শতদল আপনার স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে যুগযুগান্তে একবার বিকশিত হয় এবং পুনরায় শুকাইয়া যায়; এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রহিয়াছে একটা রহস্যময় গাম্ভীর্য্য ও মন্থরতা। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, পালযুগে একবার বাংলার কলাপ্রবাহিণী আপনার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে দুই কূল প্লাবিত করিয়া বাঙালীর জীবনকে রসসিক্ত করিয়াছিল। আজ আট-নয় শত বৎসরের ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়, রাষ্ট্রবিপ্লব ও মন্বন্তরেও সেই শিল্পকলা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাংলা দেশের লোকশিল্পের (Folk Art) মধ্যে পালযুগের আর্ট অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আজিও আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। আর্ট একটি বিশিষ্ট সভ্যতার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যেরই অভিব্যক্তি; যে সভ্যতার প্রাণস্পন্দন আর্টের মায়ামুকুরে আপনাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই সভ্যতার মৃত্যু নাই। পক্ষান্তরে কালের প্রভাবে কোন সভ্যতা যখন আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়, কোন জাতির প্রাণের প্রবাহ যখন ক্ষীণ হইয়া আসে, এবং তার শিল্প-প্রতিভা যখন নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে তখন সেই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে দীর্ঘকাল ব্যাপী নীরব সাধনার প্রয়োজন। বাংলার জনৈক বাউল গাহিয়াছেন, 'আমার পরম গুরু সাঁই। ও সে যুগযুগান্তে ফুটায় যে ফুল, তাড়াহুড়া নাই॥' শিল্পের ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়ার কোন অবকাশ নাই; শিল্পকলার এই ফুলটিকে ফুটাইয়া তুলিতেও যুগযুগান্তের অবিশ্রান্ত চেষ্টার আবশ্যক। এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, আর্টের মধ্য দিয়া জাতীয় আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে পঞ্চাশ বা এক শত বৎসর অতি অকিঞ্চিৎকর সময়। এই মহান্ আদর্শকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শত শত শিল্পী ও রূপস্রষ্টাকে অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত আজীবন নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই শিল্পায়তন ও আর্ট সম্বন্ধীয় এই গবেষণা-মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পী ভারতীয় শিল্পকলার সেই গৌরবময় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। সেই সাধকগণের স্পর্শে পবিত্র-করা তীর্থনীরে, তাঁহাদের শিল্পরচনার বিচিত্র অর্ঘ্যেই ভাবী ভারতের কলাদেবীর অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইবে।

সত্য

শ্রীকমলরাণী মিত্র

দুঃখের সাথে প্রতিদিন যুঝি—সেকথা থাক,
আঙিনায় মোর নেমেছে আকুল জ্যো'স্নাধারা;
বালুচরেচরে কাঁদিছে একাকী চক্রবাক—
রজনীগন্ধা বিভোল বিলাসে আত্মহারা।
কাঁটা-কণ্টকে কুসুমের সমাবেশ,—
রাত্রির শেষে নবীন উষার অভি[illegible]ষ;—
আমার ভুবনে মরু-মরীচিকা জলে,
গগনে জলিছে অনিমিলা ধ্রুবতারা॥

ঘন-দুর্য্যোগে অশনি দীপ্তিময়ী
চকিতে জানায় অন্ধকারের পারাপার আছে আছে;
বেদনাগুলিরে বক্ষে তুলিয়া লই
অমর হইয়া আনন্দ তাই নব নব গানে বাঁচে!
জীবনের মাঝে জীবনাতীতের বাণী
ভোরের আকাশে শুকতারা যেন স্বপনের সন্ধানী—
নয়নের জলে তাই কলোচ্ছল বলে
অপরূপ দ্যুতি মণিকা-মুক্তাধারা॥

শিশু-শিক্ষার ধারা

শ্রীমৃন্ময়ী রায়

বিলেতে এসে সর্ব্বপ্রথম আমার মনে যা বড় আঘাত করেছিল তা আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু-জীবনের রিক্ততা। মায়েদের না-জানার জন্যেই হোক বা অর্থাভাবের জন্যেই হোক আমাদের ছেলেরা অনেক কিছুই শিশু-জীবনে পায় না। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হলে সাধারণ হিসেবে তারা স্কুলে ভর্ত্তি হয় এবং তাদের শিক্ষা হয় সুরু। গতানুগতিক নিয়মে মা এদের খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়েই কর্ত্তব্য শেষ করেন এবং শিক্ষয়িত্রীও চিরাচরিত প্রথামত তাকে গণনা ও প্রথম ভাগের পড়া পড়িয়েই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ করেন। প্রকৃতির নিয়মে যে ছেলে বেশী করে খানিকটা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, সে-ই এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভিতরেও নিজের জায়গা বেছে নিতে পারে এবং যে পারে না—'ওর কিছু হবে না' 'এমন বোকা, এমন দুষ্টু, এর কি কিছু হয়' এই বলেই সকলে তার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করেন। ঝড়ে-পড়া গাছের মত তার পরেও সে যতটুকু পারে হয়ত তার মনের সবুজ রং জগতে একটু আধটু বিকীর্ণ করবার সুবিধা পায়, সে-ও তাতেই খুশী হয়। মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোন দিনই তার বাড়বার সুবিধা পায় না। অথচ আমরাই বলি ছেলেকে 'আমার গোপাল'। বৈষ্ণবেরা মাটির প্রতিমাকে ঠাকুর রূপে খাওয়ান, নাওয়ান, ভোগ-আরতি প্রভৃতি করেন বাৎসল্য-ভাব সাধনের জন্য। এই সাধন আমাদের দেশে উচ্চসাধনার মধ্যে গণ্য হয়। কাজেই বর্ত্তমান যুগের এই সন্তান-পালন সমস্যা আমাদের দেশে নূতন নয়।

ইউরোপে আমি দেখেছিলাম শিক্ষয়িত্রীদের দু-তিন বছরের ছেলেদের শিক্ষিতা ধাত্রীর জাগ্রত চক্ষু আর মায়ের অপরিসীম স্নেহ নিয়ে ছেলে মানুষ করা। তাদের নাওয়ান-খাওয়ান, শিক্ষাপ্রদ দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে খেলা- দেওয়া, ডাক্তার দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়মিত পরীক্ষা করান, একনিষ্ঠ দেব-সেবিকার মত অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাদের সেবা করা। মানবের সংগ্রাম-সঙ্কুল জীবন-পথে কার কতখানি কি প্রয়োজন ব্যক্তিবিশেষে তাতেও এতটুকু ত্রুটি ঘটত না। তাদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার কোনদিনই মনে হয় নি যে অপরিণতবুদ্ধি সদ্য-কলেজ প্রত্যাগতা তরুণীদের সঙ্গে আমি কাজ করছি।

আজকাল অনেক মায়েরা ছেলেকে ক্লেশজনক ও তাদের অপ্রীতিকর কাজ থেকে দূরে রাখবার জন্য সে কাজগুলিকে খেলার মধ্যে দিয়ে করিয়ে নেন অথবা শিশুচিত্ত অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য এটা খুবই প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে খুব ছোটদের পক্ষে। কিন্তু অপ্রীতিকর কাজ খেলার ভিতর দিয়ে করিয়ে নেওয়াটাই বেশী ভাল। কারণ যদি সেই কাজ থেকে শিশুকে একেবারে অন্য কাজে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে হয়তো শিশু খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে, না হলে পূর্ব্বের কাজ একেবারে ভুলে যাবে। শিশুরা এমন কি আমরাও অনেক সময় শক্ত শক্ত কাজ ভাল ক'রে করতে পারি আর নাই পারি, করে আনন্দ লাভ করি। আর তা ছাড়া, যদি প্রত্যেক কঠিন কাজ থেকেই শিশুকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে বহির্জ্জগৎ থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সে বেড়ে উঠবে। তাতে সে মনে করবে যে তাকে প্রত্যেক কাজেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। শিশু যেখানে যেভাবে থাকে, সে-ভাবে থেকেই তার যা করতে ইচ্ছা করছে, তা-ই সে করতে চায় এবং যদি প্রত্যেক বারেই তাকে নূতন কাজ করবার জন্য আকৃষ্ট করা হয় তাহলে সে তার মনকে কেন্দ্রীভূত করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।



লণ্ডনের একটি শিশু-বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ও লেখিকা

যদি আমরা সব সময়ে মনে রাখি যে শিশু তার ক্ষমতা অনুসারে কাজ করে থাকে এবং নূতন কাজ করবার সময় সে সেটা ধীরে ধীরে করে ও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে সেটা সুন্দর ক'রে শেষ করে তাহলে তার আর ধৈর্য্য হারাবার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের যদি তাদের কাজ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা সেটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। যদি আমরা শিশুকে নিয়ম করে অভ্যাস করিয়ে, ধীরে ধীরে কাজ শিক্ষা দিই তাহলে আর কঠিন কাজ থেকে শিশুকে সরিয়ে নেবার জন্যে অন্য খেলা সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন হয় না।

শিশুরা সব সময়েই এলোমেলো কাজ করার চেয়ে ধীরভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে পেলে বেশী আনন্দ লাভ করে। কিন্তু আমরা অনেক সময় শিশুদের নিয়মানুবর্ত্তিতা না শিক্ষা দিয়ে

তাদের যথেচ্ছভাবে কাজ করতে দিই এবং তাতে শিশু প্রথম থেকেই কি ভাবে কোন্ কাজ আরম্ভ করা উচিত সেটা শিখতে পারে না।



কলিকাতার জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশু-লালন বিদ্যালয়। শিশুগণ জলযোগে রত। দক্ষিণ পার্শ্বে লেখিকা

কখনও কখনও আমরা শিশুর সঙ্গে ঠিক বড়দের মতই ব্যবহার করি ও প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ নিই। কিন্তু তখনও আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে শিশুর সঙ্গে সমান ব্যবহার করা প্রয়োজন হলেও তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার জন্যে উপদেশেরও দরকার। শিশুর মনে কখনও বড়দের মত দায়িত্ব-বোধ আসতে পারে না এবং তাকে তাঁদের মত সুযোগ-সুবিধা দেওয়াটাও ঠিক নয়।

আমরা কখনও কখনও নিজেদের ছোটবেলার কথা স্মরণ করে শিশুকে চারদিককার বাধাবিপত্তি থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে সব-সময়েই অস্থিরতা প্রকাশ করি। এটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, কোন্‌টা শিশুর পক্ষে ভাল। শিশুর দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে ও মনোযোগ দিয়ে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, আস্তে আস্তে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষা দিতে হবে। তা হলে সে হঠাৎ কোন বাধা পেলে মুষড়ে পড়বে না এবং জীবনকে চিন্‌তে শিখবে।

ছেলেকে কখনও কোন উপদেশ বা পরামর্শ দিলে তার কারণ ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল, তাহলে সে তাড়াতাড়ি জিনিসটা বুঝতে পারবে ও সে-কাজটা করবার আগ্রহ অনুভব করবে।

প্রভাতী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সূর্য্যের আলো পড়েছে তোমার মুখে
সূর্য্যের আলো অমনি করিয়া পড়ে,
নীরব নিথর অন্ধকারের বুকে
নব সূর্য্যের আলোর ঝরণা ঝরে।

দেখ ত, কেমন মলিন আনন খানি
প্রথম আলোর পরশে উঠিল হেসে
সুন্দর মুখে দিও না ঘোমটা টানি
মুখ তুলে চাও একেবারে কাছে এসে।

অবারিত আলো নাই তার কৃপণতা
ক্ষণেক দাঁড়াও ভাল করে দেখে নিই,
প্রিয়তম মোর ক্ষমিও দুর্ব্বলতা
যদি ভুল করে' ও হাতে এ হাত দিই।

অলকে তোমার পরাব চাঁপার কলি
নব সূর্য্যের সুবর্ণ সৌরভে
সুরভিত কেশে গুঞ্জরি যাবে অলি
গ্রীবা হেলাইয়া দাঁড়াও সগৌরবে।

সোনালী রৌদ্রে আলোর বন্যা নামে
সেই বন্যায় তুমি কি করেছ স্নান?
দোপাটি ফুলের কেয়ারি ডাইনে বামে
নিশির শিশিরে শেফালি হয় না ম্লান।

সূর্য্যের আলো তোমারে চিনেছে ভালো
নয়নে তোমার ভাতিছে তাহারি জ্যোতি,
হৃদয়ের মধু উজাড় করিয়া ঢালো
তৃষ্ণা লুকায়ে চাহি না তোমার নতি।

আলোকে পুলক জাগাও সকৌতুকে
অমৃত-সরস-পরশ-পিয়াসী দেহ,
বাহির হইতে চাহি যে তোমারে বুকে
অণু-পরমাণু চাহে প্রেম-অনুলেহ।

নবপ্রভাতের নবীন সূর্য্যালোকে
কত না ভাগ্যে পেলাম তোমার দেখা,
হেন অপরূপ কখনো পড়ে নি চোখে
হৃদয়-হরণী অন্তরে এস একা।

বাঙালী হিন্দুর জাতীয় ক্ষয়রোগ

স্বামী বেদানন্দ

ঐতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায়ের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময় পর্য্যন্ত প্রায় শতাব্দী কাল যাবৎ বাঙালী হিন্দুর জাতীয় জীবনে অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভার উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়—ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা সংস্কৃতি—সর্ব্বক্ষেত্রে। ধর্ম্ম ও সমাজক্ষেত্রে—রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সঙ্ঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ এবং সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁহাদের ছাত্রবৃন্দ; আইন ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে—রামগোপাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি; সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য শক্তিশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাবে সমগ্র বাঙালী জাতি শতাব্দীকাল যাবৎ সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতীয়গণের এবং ভারতের অন্যান্য দেশের বিস্ময়বিমিশ্রিত সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বাঙালী হিন্দুর শক্তি ও প্রতিভা শুধু যে বাঙালীর জাতীয় জীবনকেই সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছিল তাহা নহে, ভারতের সর্ব্বত্র—তথা পাশ্চাত্য জগতেও উহার প্রেরণা ও অবদানপরম্পরা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জ্ঞান ও কর্ম্ম-প্রতিভা আমেরিকা ও ইউরোপের গর্ব্বোন্নত শিরকে পদানত করিয়াছিল। বাঙালী হিন্দুই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি শহরে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় নাগরিক ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া নেতা ও পরিচালকরূপে তৎস্থানে যাবতীয় উন্নতির সূচনা করিয়াছিল।

কিন্তু বাংলার সেই গৌরব আজ অতীতের কথা। বাঙালী হিন্দুর শক্তি ও প্রতিভার ক্ষেত্রে আজ ভাটা পড়িয়াছে; বাঙালী হিন্দুর জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে দ্রুত ক্ষয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একটি শতাব্দীর ব্যবধানে বাঙালী হিন্দু আজ শুধু রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে—বৈদেশিক রাষ্ট্রের শাসন, শোষণ ও পীড়নে নিঃশক্তি ও নিঃস্ব নয়, পরন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী হিন্দুর সেদিকে লক্ষ্য কই?

আজ যে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে বাঙালী-বিদ্বেষ উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে তজ্জন্য যদি আমরা অবাঙালীর সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার উপর দোষার্পণ পূর্ব্বক নিজেদের নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করি, তবে তদপেক্ষা ভ্রান্তি ও আত্মপ্রতারণা আর কি হইতে পারে? বিগত ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিংশ বর্ষাধিক যাবৎ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারক-দলের নেতারূপে সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীবৃন্দের সহিত ভারতের প্রত্যেক শহরে ও প্রধান প্রধান স্থানে বৎসরের পর বৎসর উপস্থিত হইয়া তত্রত্য বাঙালী ও অবাঙালী সকলের সহিত নানাভাবে ঘনিষ্ঠরূপে মিশিয়া, বিবিধ প্রকারে সহযোগিতা ও ভাবের আদান-প্রদানক্রমে লব্ধ অভিজ্ঞতা এই যে বাঙালী হিন্দুর শক্তি ও প্রতিভার ক্ষয়ই উক্ত বাঙালী বিদ্বেষের প্রথম ও প্রধান উত্তেজক কারণ।

ভারতের সকল প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের—মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি পৌর ও জনপদ এবং কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিল এক সময়ে বাঙালী। সর্ব্ব প্রদেশে সর্ব্ববিধ জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী ছিল বাঙালী; এজন্য সর্ব্বত্রই বাঙালীর আদর ও সম্মান ছিল। আজ দেখি—সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক শহরে আজকাল দেখি—তত্রত্য প্রবাসী বাঙালীগণ সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থকেন্দ্রিক; কোন প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সহিত তত্রত্য বাঙালীগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা নাই। পূর্ব্বে যখন প্রবাসী বাঙালীগণ

তত্তৎ স্থানীয় অধিবাসিগণের ধর্মসংক্রান্ত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতাপরায়ণ হইয়া তাহাদের সহিত জীবনে মরণে জড়িত ছিল, তখন সেইসব স্থানে বাঙালী-বিদ্বেষ জাগিবার সম্ভাবনা ছিল না। বাঙালী ছাড়া ঐসব স্থানের অধিবাসীগণ চলিতে পারিত না, চলিতে চাহিতও না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক শহরে দেখিয়াছি যে প্রবাসী বাঙালীগণ তত্তৎস্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধচ্যুত; তাহাদের কোন প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রবাসী বাঙালীর আদৌ যোগাযোগ নাই—সুখ দুঃখ, বিপদাপদের সহিত জড়িত হওয়া তো দূরের কথা।

যদি প্রশ্ন হয়—প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থকেন্দ্রিকতা কেন আসিল? উত্তরে বলিব—বাঙালীর শক্তি ও প্রতিভার দ্রুত অপচয় ও ক্ষয়। বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই দ্রুত ক্ষয় ও অপচয়ই তাহাকে স্বদেশে ও বিদেশে এরূপ হীন, অবনত, অবজ্ঞাত ও পশ্চাৎপদ করিয়া ফেলিতেছে।

সম্প্রতি বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের নানা শহরে প্রচারকার্য্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তুলনামূলক চিন্তায় উপরোক্ত সত্য—"শক্তি ও প্রতিভার দ্রুত অপচয় ও ক্ষয় বাঙালী হিন্দুকে স্বদেশে ও বিদেশে লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, অবনত ও পশ্চাৎপদ করিয়া তুলিয়াছে"—বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি।

উৎকলবাসিগণের কথা বাদ দিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যে বাঙালী পুরুষ ও রমণী অন্যান্য যাবতীয় প্রদেশের নরনারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাঙালী ছাত্রগণ আজ অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রগণের সহিত প্রতিযোগিতায় হীন প্রতিপন্ন হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষার কাগজে অধিক নম্বর পাইয়া উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও কৃতকর্ম্মতায় বাঙালী ছাত্রগণ পশ্চাৎপদ—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রতিভা ও শক্তির ক্ষয় ও অপচয় বাঙালী হিন্দুর জাতীয় জীবনে কি কি লক্ষণ রূপে প্রকটিত হইয়াছে, অন্যান্য প্রদেশবাসীর সহিত তুলনায় যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিতেছি:—

সংযম (discipline) এবং নেতৃঅনুসরণ (Obedience)এর আত্যন্তিক অভাব। কোনো আদর্শ, কোনো নীতি, কোনো বিধিনিষেধ পালন করিয়া চলার সংযমমূলক মনোবৃত্তি বাঙালী হারাইয়া ফেলিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারই বাঙালীর বাহাদুরির বিষয়। আদর্শ ও নীতি, বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিতে হইলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের আবশ্যক। সেই শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে বাঙালী আবালবৃদ্ধ নারী উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে—অধিকতর শক্তিহীন ও প্রতিভাশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

বাঙালী আবালবৃদ্ধ সকলে নিজেদের সমান বুদ্ধিমান মনে করে। ব্যক্তিত্ববোধ (!) এতই উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে বালক-পুত্রও পিতার আদেশ বিনা বিতর্কে পালন করিতে অনিচ্ছুক। বাঙালী-সমাজে বালক ও যুবকের নিকট বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধের কোনোই মর্য্যাদা নাই। সমালোচনা ও পাকা কথায় বাঙালী বড়ই দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ্ঞাবহতা বা নেতৃঅনুসরণ গুণ বাঙালী চরিত্র হইতে মুছিয়া গিয়াছে। বাঙালী-সমাজে সবাই বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ নেতা। হুকুম জাহির করিতে, সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে, প্ল্যান, প্রোগ্রাম রচনা করিতে বাঙালী অতিরিক্ত ওস্তাদ। ফলে বাঙালীর চরিত্রে কোনো মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতেছে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে এই যে ঔদ্ধত্য, দম্ভ ও স্বেচ্ছাচার,—এর মূলেও শক্তির অভাব। কারণ নেতৃঅনুসরণ ও আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি—সংযম, সহিষ্ণুতা, তৎপরতা ও শ্রমশীলতা আবশ্যক। কিন্তু বাঙালী চরিত্রে সেই শক্তি-সামর্থ্য কোথায়?

সংযম, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সময়নিষ্ঠা এবং আজ্ঞাবহতা বা নেতৃ-অনুসরণ—এই গুণ চতুষ্টয়ের অভাবে বাংলা দেশে সমবায়কার্য্য বা সঙ্ঘশক্তি গড়িয়া তোলা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালীর মেধা, প্রতিভা, কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি সবই অন্যান্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বেশী ছিল; কিন্তু উপরোক্ত গুণগুলির অভাবে উহা দ্রুত নিস্তেজ ও নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে।

কলিকাতায় যে সমস্ত মাড়োয়ারী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী আছে, তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমবায়-শক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধতা বিশেষভাবে রহিয়াছে। অথচ বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশের শহরে শহরে যে-সব প্রবাসী বাঙালী আছে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার একান্ত অভাব। যে শহরে দশ ঘর বাঙালী আছে, সেখানে দুইটি দল দেখা যায়। একতা বিদেশে প্রবাসী বাঙালীরা দুর্ব্বল, সুতরাং তত্রত্য অধিবাসীগণের দ্বারা উপেক্ষিত ও নির্য্যাতিত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী লোক যখন বাংলাদেশে জীবিকার্জনের জন্য আসে তখন মাড়োয়ারী, গুজরাটী, পঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি সকল প্রদেশবাসীরাই তাহাদের দলে [illegible] নামা

ভাবে সাহায্য করিয়া আগন্তুক ভ্রাতৃগণের বাঁচিবার ও উন্নতির উপায় করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে নিঃসহায় নিঃসম্বল কোন বাঙালী ভিন্ন প্রদেশে গিয়া পড়িলে তত্রত্য বাঙালীগণের সাহায্য ও সহানুভূতি পায় না। কারণ বাঙালীগণ সঙ্ঘবদ্ধ নয়, তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যও কেন্দ্রীভূত নয়। কোন উড়িয়া বামুন কলিকাতায় উপস্থিত হইলে যত দিন সে কোথায়ও কাজ জুটাইতে না পারে তত দিন অন্যান্য উড়িয়া বামুনগণ তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখে। বাংলার বাহিরে প্রবাসী বাঙালীগণের নিকট হইতে কোনো বিপন্ন বাঙালীই এরূপ আশা করিতে পারেনা।

দিল্লীতে অন্যূন তিন চারি সহস্র বাঙালীর বাস। এক ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া বাঙালীদের লইয়া চেষ্টা করিয়া নিউ দিল্লীতে একটু স্থান সংগ্রহ পূর্ব্বক কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দেখিলাম মন্দির এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক বলিলেন—বাঙালীদের মধ্যে দলাদলি ও মতানৈক্য হওয়ার দরুন এই অবস্থা। রাঁচিতে সহস্র সহস্র বাঙালীর বাস। রামনবমীতে স্থানীয় হিন্দুগণ যে মহাবীর ঝাণ্ডার মিছিল বাহির করে তাহাতে অন্ততঃ বিশ হাজার হিন্দু ঝাণ্ডা লইয়া বাহির হয়; কিন্তু সেই বিশ হাজারের মধ্যে এক জনও বাঙালী দেখি নাই। রাঁচিতে বিহার প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলনের অধিবেশনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রধান সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও রাঁচি শহরের একজন ব্যতীত কোন বাঙালীই অগ্রণী হইয়া কার্য্যে সহযোগিতা করে নাই। গাজিপুর সহরে সামান্য কয়েক ঘর বাঙালীর বাস; প্রতি বৎসর শুনা যায় দুই দলে পৃথক পৃথক ভাবে দুর্গাপূজার প্রতিযোগিতা করিয়া মারামারি করিবার উপক্রম করে।

বিগত দুইটি মাস ধরিয়া বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়—সকল প্রদেশের অধিবাসিগণই উন্নতিশীল ও শক্তিসামর্থ্যবান। একমাত্র বাঙালীই সর্ব্ববিষয়ে ক্রমশ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে।

বাঙালী হিন্দু এত অধিক পরিমাণে কর্ম্মকুণ্ঠ, শ্রমবিমুখ, আত্মপ্রতারণাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে যে এভাবে চলিতে থাকিলে অত্যল্পকালের মধ্যেই বাঙালীর স্থান ভারতে সর্ব্বনিম্নস্তরে গণ্য হইবে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তি ও বৃত্তিগুলি অবিরত অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য চাই—উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত কর্ম্মতৎপরতা ও শ্রমশীলতা। কিন্তু আলস্যপরায়ণ ও দীর্ঘসূত্রী বাঙালী হিন্দুর জীবনে স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তিগুলির অনুশীলন ও বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা কোথায়?

পথের সন্ধানে

শ্রীসুজাতা রায়

শিক্ষা সম্বন্ধে নানা আলোচনা আজকাল চারদিকেই দেখতে পাই। বয়স যখন কম ছিল তখন এ আলোচনা মনে খুব উৎসাহ আনত। ইচ্ছা হত এই যে আমাদের পুরাতন সভ্যতার অথই জল, এক দিকে যার গভীরতার মাপ নেই, অন্য দিকে যার মধ্যে ইয়ত্তা নেই কত গাছপাতা জীবজন্তু মরে পচে তাকে এই গভীর কালো বর্ণ করে রেখেছে। সেই জলে একটা নাড়া পড়ুক, সব চঞ্চল হয়ে উঠুক। একটা স্রোত ব'য়ে গিয়ে আমাদের পুঞ্জীকৃত ময়লার কিছু অংশ অন্ততঃ ধুয়ে যাক্ আর থাক শুধু স্বচ্ছ, নির্ম্মল অতল অম্বুরাশি; কিন্তু এখন অভিজ্ঞতার বিষ শরীরে প্রবেশ করেছে, এখন দেখি এই পুরাতন সভ্যতার অথই জলে ঢিল ফেলার ফলে টুপ করে একটা শব্দ হয় বটে, আর তার চারদিকে একটা হিল্লোল ওঠে, তার পাশ দিয়ে আর একটা হিল্লোল ওঠে কিন্তু ক্ষীণতর। এই রকম ক্ষীণতর হতে হতে সে হিল্লোল কোথায় মিলিয়ে যায়। স্রোতের আশা কোথায়? তা সত্ত্বেও যখন গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "শিক্ষার পথ" প্রবন্ধ পড়লাম তখন আবার মনে আনন্দ হ'ল। পথ যে কোথায়ও আছে এ কথা কেউ জোর করে বলছেন শুনলেই আনন্দ হয়। কিন্তু সে পথের সন্ধানে কে যাবে, এ কথা ভেবে নৈরাশ্য আসে। তবু এ বিষয়ে আলোচনা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

"শিক্ষার পথ" প্রবন্ধের ছোটখাটো সব বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও তাঁর মূল প্রতি-

পাদ্য বিষয়টি—শিক্ষাকে জীবিকার্জ্জনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করা,—এবং তা ছাড়াও মেনে নেওয়া যে মনের বিকাশের জন্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক, (তাতে ক'রে জীবিকার্জ্জনের সাহায্য হোক বা না-ই হোক) এ কথা দুটি বড় ভাল লাগল। দেশে এই জ্ঞান ও এই আদর্শের বহুল প্রচার আবশ্যক। কিন্তু ইংরেজীতে একটি কথা আছে—who is to bell the cat? এর উত্তর লেখকের কাছে পেলাম না।

এ বিষয়ে আমি ভালভাবে ভুক্তভোগী বলেই এই প্রশ্নটি করছি। শিক্ষার প্রচার হয় স্কুলগুলির মধ্য দিয়ে। স্কুলের অংশীদার হচ্ছেন (১) ছাত্রছাত্রী, (২) অভিভাবক, (৩) সরকার বাহাদুর অর্থাৎ তাঁর প্রতিনিধি ইন্‌সপেক্টর বা ইন্‌সপেক্ট্রেস, (৪) শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। হাতের কাজ শেখাতে গিয়ে দেখেছি প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তা আসবে না জেনে সেটা শিখতেই ছাত্রছাত্রীদের দারুণ অনিচ্ছা। যদি তবুও জোর করে শেখানোর ব্যবস্থা করা গেল তবে অভিভাবক চিঠি পাঠাতে আরম্ভ করলেন তার "ওয়ার্ড"টিকে এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কোনও রকমে যদি ১ ও ২ নং-কে ঠেকিয়ে রাখলেন তবে তখন ৩ নং এলেন। আপনার যা টাকা দরকার তা ত তাঁরা দেবেনই না, উপরন্তু নিয়মের বাইরে একাজ, ওকাজ, সে কাজ হচ্ছে কেন তার কৈফিয়ৎ চাইতে আরম্ভ করলেন এবং affiliation কেটে দেওয়ার ভয় দেখালেন। অনেক চেষ্টা করে হয়ত ৩নং-কেও সামলে উঠলেন কিন্তু ৪ নং-এর ধাক্কা সামলানো শক্ত। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয় তো ট্রেনিং পাস করে এসেছেন। ডল্টন প্রোজেক্ট, মন্তেসরি, সবই তাঁরা পরীক্ষার সময়ে বলে এসেছেন, কিন্তু সেগুলো যে পরীক্ষা পাশের পরেও কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হয় তা তাঁরা বেশীর ভাগই জানেন না। বরং এমন দেখেছি যে যদি কোনও তরফ থেকে ট্রেনিং পাস করা বা না করা কোনও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, বা যে-কোনও লোক, গতানুগতিক পন্থা থেকে একটুও অন্য পথে গিয়েছেন, তবে তখনই নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ হয়েছে। এটা ঠিকই যে স্কুলের বাঁধা নিয়মের মধ্যে এবং জীবনসংগ্রামের প্রবল চাপে নতুন কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ ভাবে উন্নততর উপায়ের জন্য একটা চেষ্টা, বা শুধু একটা সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দেখলেও এতখানি আপশোষ থাকত না। মনুষ্যত্বের বিকাশ তো অসুবিধার মধ্য দিয়েই হয়।

বিদেশের শিক্ষার পদ্ধতি কিম্বা রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। আমরা আজকাল সর্ব্বদাই বলছি—কমিউনিজম্, সোস্যালিজম্, আয়র্লণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, মন্তেসরি, ডল্টন প্ল্যান, প্রোজেক্ট মেথড ইত্যাদি। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে কাজে কোন্‌টা করতে পারছি? কিম্বা কোন্‌টা করবার সম্ভাবনা আছে? নারকেল গাছের সার ধানগাছের গোড়ায় দিলেই কি ধানকে নারকেল করে ফেলতে পারব? দুই গাছকে একরকম সার দিলেই চলবে না, দুই গাছে এক ফল আশা করেও লাভ নেই। এই কথাটা খুব ভাল ভাবে বুঝে তবে আমাদের কাজে নামা দরকার। দেশ বিদেশের খবর সংগ্রহ প্রয়োজনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তার থেকে বেশী প্রয়োজনীয় নিজেদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা।

অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা চলে না। যে দুটি জিনিস মানুষের বেঁচে থাকবার পক্ষে এবং মানুষ হওয়ার পক্ষে আবশ্যক আমাদের সে দুটিরই অভাব। একটি হচ্ছে খাদ্য, অন্যটি নিজস্ব সংস্কৃতি। আমাদের নিজেদের দেশ বলেই কিছু নেই। আমরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হয়ে আছি। কাজেই খাদ্যও জোটাতে পারি না এবং আমাদের পুরনো সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়েছি অথচ নতুন কিছু অর্জ্জন করতে পারি নি। তাই নিজস্ব সংস্কৃতিও নেই। কেউ যেন ভাববেন না যে হঠাৎ ঘোর সনাতনপন্থী হয়ে উঠলেই আমরা পুরনো সংস্কৃতি ফিরে পাব।

আধুনিক যুগে বসে ওভাবে পুরনো সংস্কৃতি ফিরে পাওয়া যায় না। গুটি থেকে বার হবার পর প্রজাপতিকে আবার পোকার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় না। কালের স্রোত নির্ম্মম ভাবে বয়ে চলেছে, পিছনে কি ফেলে এসেছি সে কথা ভেবে এখন লাভ নেই। এখন নতুনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। কাজের মধ্য দিয়েই কাজ হয়, বিধিনিষেধ দিয়ে হয় না, তাই সাম্‌নে যা কাজ আছে তার মধ্যে নেমে পড়লে তবেই আমরা নতুন করে নিজেদের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারব। এখন আমাদের সামনে কাজ হচ্ছে (১) খাদ্যের সংস্থান এবং তার আনুষঙ্গিক (২) আনন্দের সংস্থান এবং এই দুটির সহায়তায় (৩) শিক্ষার বিস্তার।

(১) খাদ্যসমস্যা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা। খাদ্য না পেলে মানুষের কাছে মানুষের ব্যবহার আশা করাই বৃথা। কিন্তু সেই খাদ্য আমরা পাই কোথায়? যারা চাকুরীজীবী তারা চাকুরীর অভাবে মারা যাচ্ছি, যারা কৃষি ও ব্যবসায়জীবী আজকাল তাদেরও কোন সুবিধা নেই। আমরা সবাই বলি যে সরকারের কাছে

সাহায্য চাওয়া বৃথা। কিন্তু দেশের লোকেরাই কি কেউ সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন? ভাদ্রের "প্রবাসী"তে দেখলাম শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এক বক্তৃতায় বলেছেন "বাঙালীদের শৃঙ্খলানুরাগী ও সঙ্ঘবদ্ধ" হতে হবে। কথাটা খুবই ভাল কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যদি আরও বলতেন যে কিসের মধ্যে দিয়ে তারা এ জিনিস লাভ করবে তাহ'লে আরও ভাল হত। শুধু "আমাদের এখানে অভাব" বলা যথেষ্ট নয়, সে অভাব দূর করবার বিশেষ ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার। একটা অভ্যাসের ভেতর দিয়ে ছাড়া কোনও শক্তি লাভ করা যায় না। আমাদের স্কুল কলেজগুলির শিক্ষা হ'ল বাইরের থেকে বসিয়ে দেওয়া শিক্ষা। তার মধ্যে দিয়ে আমাদের আত্মপ্রকাশের চেষ্টা নেই, কতকগুলো তথ্য মুখস্থ ক'রে, আমরা পরীক্ষার খাতায় স্মৃতিশক্তির কিছু জিমন্যাষ্টিক্ দেখিয়ে আসি। এর ভেতর দিয়ে শৃঙ্খলানুরাগ বা সঙ্ঘবদ্ধতা গড়ে ওঠে না। এমন কাজ আমাদের ছেলে-মেয়েদের কোথায় আছে যার মধ্যে দিয়ে তারা নিজেকে প্রকাশ করবে, যে কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের শরীর ও মন স্ফুরণের চেষ্টা করবে এবং তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শিখবে। কোনও রকমে যদি বা দেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শেখান যায় তারপরে সে অভ্যাস কাজে লাগিয়ে উপার্জ্জন করবার কোনও পথ আমাদের নেই। "শিক্ষার পথ" প্রবন্ধে স্কুলের মধ্যে এ রকম কাজ কি করে প্রবর্ত্তন করা যায় তার একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ডেনমার্কের এস্‌বার্গে ছাত্রেরা কি ভাবে কৃষিকার্য্যে মন দিয়েছে সে কথা লেখা হয়েছে। উদাহরণটি খুব সুন্দর কিন্তু তার প্রয়োগ করবে কে? লেখক খুব আশান্বিতভাবে বলেছেন যে সোভিয়েটতন্ত্র ছাড়াও কৃষিপ্রধান দেশে কি করা যায় তা আমরা ঐ উদাহরণ থেকে বুঝব। ডেনমার্কে যে উন্নতি সম্ভব সে উন্নতি আমাদের রাজতন্ত্রের কাছে আমরা আশা করতে পারি কি? অন্য সব উন্নতির কথা ছেড়ে দিই, ডেনমার্কের প্রাথমিক শিক্ষা ও ফোক্ হাইস্কুলই কি আমাদের পাওয়া সম্ভব? আশা করবার ও কথা বলবার দিন আর নেই। এখন কোন্ পথে নিজেরা বার হয়ে পড়তে পারি তাই আমাদের ভাবতে হবে। কি করলে দেশের খাদ্যসমস্যা কিছু পরিমাণে মেটে এবং তার সঙ্গে লোকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শৃঙ্খলানুরাগী হতে শেখে (কারণ এ যুগ সঙ্ঘের যুগ, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনও কাজ সফল হবে না) তাই আমাদের এখন ভেবে দেখতে হবে।

আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের অনেকেরই অবসর আছে এবং কাজ করবার ইচ্ছাও আছে কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে কিছু করে উঠতে পারে না। সবদিক ভেবে দেখে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কুটির-শিল্প, ছোট ব্যবসায় ও চাষবাস করবার ব্যবস্থা করা এবং ঐ প্রচেষ্টা-জাত জিনিস শহরে বিক্রীর চেষ্টা করাই আমার কাছে আজকালকার দিনের প্রয়োজন বলে মনে হয়। কিন্তু এই ভাবে কাজ আরম্ভ করতেও যে সামান্য মূলধন প্রয়োজন তা-ও আমাদের নেই। মূলধনের অভাবে ছোট ছোট সমবায় সমিতি স্থাপন প্রয়োজন। জিনিস তৈরি এবং বিক্রী—এই দুই উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতির সাহায্য দরকার। কি কি কুটির-শিল্প আমাদের দেশে চলতে পারে সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু একখানি পুস্তিকা লিখেছেন (কুটির-শিল্প—বিশ্বভারতী)। এই পুস্তিকাখানি পড়লে চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। বিশ্ব-ভারতীর শ্রীনিকেতনে অনেক দিন থেকে নানা কুটির-শিল্পের প্রচেষ্টা চলেছে। সেখানকার অধ্যক্ষের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার অংশ দান করে দেশকে সাহায্য করবেন—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

কুটির-শিল্পের সাহায্যে জীবিকার্জ্জন যে একেবারে অসম্ভব নয় বরং খুবই সম্ভব, তার দুই একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত যে আমাদের চোখের সামনে নেই তা নয়। একেবারেই সামান্য মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে, এখন অনেক অনেক লোক সেখানে জীবিকার্জ্জনের পথ পেয়েছে। এ রকম উদাহরণ আমরা জানি। তাদের প্রস্তুত জিনিস ভারত-বর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রী হচ্ছে এবং তারা অনেকে নিজেদের খাদ্য উৎপাদনও খানিকটা পরিমাণে নিজেরাই করছে। এ রকম গৌরবময় একটি দৃষ্টান্তের কথা জানলেও মনে ভরসা আসে।

তার পরে (২)। আনন্দ ছাড়া জীবন চলে না। শুধু খাদ্যে প্রাণ বাঁচে না। চীন দেশের কথা পড়েছি যে এই বিরাট যুদ্ধের মধ্যেও তাদের ছেলেমেয়েরা ভ্রাম্যমাণ অভিনয়-সঙ্ঘ চালিয়ে চলেছে। এ দেশ থেকে ওদেশে মানুষকে সরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আনন্দ তারা বিসর্জ্জন দেবে না। আনন্দের অভাব আমাদের দেশের নির্জ্জীবতার একটা বড় কারণ। কিছুদিন আগে বিধিনিষেধের আধিপত্যে আমাদের স্বাভাবিকভাবে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে এবং সব মানুষের সঙ্গে যোগ রেখে আনন্দ করবার কোনও উপায় ছিল না। কালাপানি পার হওয়া যেত না, মেয়েরা অন্তঃ-

পুরের বাইরে যেতে পারতেন না, স্ত্রীপুরুষে ঘরের বাইরে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারতেন না, যে কোনও জাতের বন্ধুর সহিত একসঙ্গে বসে খাওয়া যেত না। এক কথায় যাত্রা দেখা ও পূজাপার্ব্বণ ছাড়া আনন্দের অন্য সোজা পথ ছিল না। বাঁকা পথ ছিল নানারকম কিন্তু সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমরা এ সব বিধি-নিষেধ ভেঙেছি। আনন্দকে জীবনে খানিকটা স্থান দিয়েছি—ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু সেটা নিতান্তই খাপছাড়া ভাবে আমাদের জীবনে রয়েছে। আমরা আনন্দকে জীবনের অঙ্গ বলে স্বীকার করে জীবনকে সে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনও চেষ্টা এখনও করি নি। কবিগুরু ও কর্ম্মগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এক মহান্ আদর্শ আমাদের সামনে এনেছে। আনন্দের উৎস হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র আমাদের দেশে নয়, অনেক দেশেই আদর্শ হতে পারে। সহ-শিক্ষাকেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশেও দেখেছি—কিন্তু বিশ্ব-ভারতীতে এ বিষয়ে একটা স্বাভাবিকত্ব আছে যা সব জায়গায় পাওয়া শক্ত। উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সরল যোগ এক দিকে, অন্য দিকে গানে, ঋতু-উৎসবে, সৌন্দর্য্যের সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানটি আদর্শ স্থান নিয়েছে। এখানে আনন্দ একটা হঠাৎ এবং কোনওরকমে পাওয়া জিনিস নয়, আনন্দ জীবনেরই অঙ্গ। কিন্তু এই ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকলে দেশের বিশেষ লাভ হ'ল না। যাঁরা দেশের খাদ্য-সংস্থানের ব্যবস্থা করবেন, তাঁদেরই দেশময় আনন্দের সংস্থানের ব্যবস্থাও করতে হবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে (৩) শিক্ষার ব্যবস্থা – বড়দের এবং ছোটদের। ইংরেজীতে যাকে বলে Three R.'s শেখা (লেখা, পড়া এবং সামান্য অঙ্ক শিক্ষা) এবং সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে হাতের কাজ শেখা—এ অধিকার মানুষ মাত্রেরই দাবী করা উচিত। এই শিক্ষা প্রসারের জন্য দেশব্যাপী প্রচেষ্টা দরকার। পড়তে এবং লিখতে শিখলে পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র মানুষ নিজেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তার পরে ভূগোল শিক্ষায় মহকুমা থেকে আরম্ভ করব, না ম্যাডাগাস্কার থেকে আরম্ভ করব—তাতে কিছু আসে যায় না। ইতিহাস সম্বন্ধেও তাই; কি ভাবে শেখাচ্ছি তাতে খুব বেশী তফাৎ হয় না, যদি কেবল মুখস্থ না করিয়ে সত্যি শেখানোর দিকে দৃষ্টি রাখি। আমরা যে যুগে পড়েছিলাম তখন ডলটন ছিল না, কিন্তু আমরা আবার ডলটন ভক্ত। যাদের ডলটন অনুসারে শেখাচ্ছি তারা আবার কিসের ভক্ত হবে কে জানে? কাজেই ভাল প্রণালীতে কাজ করতে পারি ভালই, না পারলাম ত একটু কম ভালতেও চলবে। যা মূলতঃ চাই তা হচ্ছে প্রাণ। সেটা যেন কোনও রকমে রোধ না করি। সেই প্রাণ যথেষ্ট দেওয়ার এই উপায় নয় যে শিশুর সব কাজ সহজ করে দেব। উপায় হচ্ছে তাকে নিজের পথে বাড়তে দেওয়া। শিশুদের শরীর ও মনের বাড়বার একটা ধারা আছে, আমাদের শক্ত-হয়ে-যাওয়া-মন দিয়ে সেই ধারার গতি বোঝা খুব কঠিন কাজ, তবু শিক্ষকের আসন নিলে সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে এবং নিজেদের এই অক্ষমতার জন্যই শিশুর ওপর বিধি-নিষেধ কেবল ততটাই রাখব যতটাতে সে অন্যের বা নিজের অনিষ্ট না করে। সেই অল্পমাত্রায় বিধিনিষেধটুকু যেন সর্ব্বদা প্রতিপালিত হয় সেটা দেখতে হবে। আর দেখতে হবে যে শিশু যে কাজ করতে চায় তার যেন সুযোগ পায়। যাতে শিশু একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে শেখে সেই সুযোগ দেওয়াটাই শিক্ষার সব চেয়ে বড় কথা। সেই আদর্শ, সেই পারি-পার্শ্বিক অবস্থা এবং সেই সুযোগ তাকে দিতে হবে। এই লক্ষ্যটিকে মনে রেখে আমরা শিশুকে লেখা, পড়া, অঙ্ক, হাতের কাজ এবং অন্যান্য যা কিছু ভাল মনে হয় তা শেখাব। কুটির-শিল্পের কেন্দ্রের কাছাকাছি জায়গায় শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঐ আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে ওঠার জন্য শিশু আপনার থেকেই কুটির-শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। লেখাপড়া এবং কুটির-শিল্পের কাছাকাছি মানুষ হলে দুটোই শিশুর স্বাভাবিক ভাবে আয়ত্ত হবে। যে শিশুরা এই শিল্প শিখবে তারা বড় হয়ে কেউ এ পথেই থেকে যাবে, কেউ থাকবে না। যারা থাকবে না তাদেরও ছোটবেলায় এ শিক্ষা-লাভ কিছু ক্ষতিকর হবে না। মানুষের শিক্ষা-লাভের ক্ষমতা অপর্য্যাপ্ত। যা ভবিষ্যতে কাজে ব্যবহার করতে পারব শুধু যে তাই শিখলেই চলে তা নয়, জগৎকে বোঝবার জন্য, নিজের হাত-পায়ের দক্ষতা আনবার জন্য মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য এবং আনন্দের জন্য ভবিষ্যতে ব্যবহার্য্য ছাড়া অন্য জিনিসও শেখা দরকার। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কবি ও রাজনীতিজ্ঞ হলেও ছোটবেলায় যে রন্ধন-বিদ্যা শিখেছিলেন তা পরে ব্যবহার করেছিলেন জেলে থাকবার সময়ে। সেখানে তিনি নানারকম রন্ধন করে সময়ও কাটাতে পারতেন, আনন্দও পেতেন। দু-চারটে জিনিস বেশী শিখে রাখলে জীবনে ক্ষতি কি?

সমস্ত দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার মনে হয়, আমাদের এখন এমন কয়েকটি কেন্দ্র করে ফেলা দরকার যেখানে এক দিকে কুটির-শিল্পের বা ছোট ব্যবসায়ের কাজ

চলবে, অন্য দিকে আনন্দ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে। সেই সব জায়গায় কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া, জীবনযাত্রাও এমন সুশৃঙ্খল ভাবে চালাতে হবে যাতে করে জীবনের ধারাটাই বদলে যায়। এ রকম কেন্দ্র খুলতে প্রথম চাই উৎসাহী কর্মী, তার পরে চাই মূলধন, তার পরে স্থান ও কাজ নির্ব্বাচন। এক এক জায়গা এক এক কাজের জন্য সুপ্রশস্ত। কোন্‌টা কোথায় ভাল তা বুঝে নিয়ে স্থান বুঝে কাজ আরম্ভ করলে কাজ সহজ এবং লাভ বেশী হয়। গোলাপের চাষের, গুটিপোকার চাষের, দুধ ডিম প্রভৃতির ব্যবসার সাফল্য বিশেষ ভাবে স্থানের ওপরে নির্ভর করে। তার পরে মনে রাখতে হবে যে কাজ আরম্ভের সময়ে একেবারে আনাড়ি লোক দিয়ে কাজ চলে না। ভাল ভাবে মাইনে দিয়ে বিশেষজ্ঞ লোক রেখে কাজ আরম্ভ করা দরকার। (বিশেষজ্ঞ মানে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী লোক নয়। সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা ঐ কাজ ক'রে অভ্যস্ত, খোঁজখবর করে সে রকম লোক যোগাড় করে আনা দরকার।) প্রথম থেকেই লাভ যে ষোল আনা হবে তা নয়, কিন্তু আরম্ভটা আশাপ্রদ হওয়া চাই, তা না হ'লে লোকের মনে উৎসাহ হয় না, কেউ যোগ দিতে চায় না। কিছু দিন বাইরের লোক মাইনে দিয়ে রেখে, পরে নিজেদের লোক তৈরি হয়ে উঠলে তাদের দিয়ে কাজ চালানো যায়।

এখন আবার আমরা সেই প্রথম প্রশ্নে ফিরে এলাম—কাজ আরম্ভ করবে কে? আমি এ প্রশ্নের উত্তরে বলি দেশের তরুণদের এ কাজে নামতে হবে। তাদের কাছে এখনও পৃথিবী সজীব, নানাবর্ণে উজ্জ্বল, তারাই আমাদের ভরসা। দেশের নেতারা যদি সমবায় সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে দেন এবং তরুণরা এগুলি কাজে চালিয়ে অর্থকরী বস্তু উৎপন্ন ক'রে বড় বড় শহরে জিনিসগুলি বিক্রীর ব্যবস্থা করেন তবে আশা করা যায় যে দেশে একটা কর্ম্মপ্রবাহ বইতে আরম্ভ করবে। এই সঙ্গে তাঁরা জীবনের আর দুইটি লক্ষ্য—শিক্ষা ও আনন্দ বিস্তারের দিকে যদি সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেন তবে আমাদের সেই অচল জলের বাঁধের জায়গায় জায়গায় ভাঙন ধরবে। একবার বাঁধ ভাঙতে পারলে সে জলের স্রোত নিজের পথ নিজেই করে নেবে, নিজেদের গতির বেগেই আমরা চলে যাব।*

* নিখিল-ভারত নারী-সম্মিলনী—পূর্ব্ববঙ্গ শাখার পঠিত।

আলোচনা

"ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গত আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণের 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। এই প্রবন্ধে তিনি কার ঠাকুর কোম্পানী দেউলিয়া হইবার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ঐ দিনই [৬ই এপ্রিল ১৮৪৮] ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ান কার ঠাকুর কোম্পানীর পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে পাওনাদারদের নিকট লিখিত একটি সার্কুলার প্রকাশিত হয়। সার্কুলারের তারিখ ৩১শে মার্চ্চ। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, '১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার ঠাকুর কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসার পতন হইল।' এখানে সাল ঠিকই আছে, শুধু ফাল্গুন না হইয়া চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হয়। সুতরাং কলিকাতা গেজেটের একটি বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া কার ঠাকুর কোম্পানী বন্ধ হইবার তারিখ ১৮৪৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর নাগাদ বলিয়া যে ধারণা চলিয়া আসিতেছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের প্রচলিত তারিখের ন্যায় উহাও ভ্রান্ত।"

দেবজ্যোতিবাবু কার ঠাকুর কোম্পানী 'বন্ধ' হইবার যে তারিখ ভুল বলিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঠিক। অর্থাৎ, ১৮৪৭, ৩১এ ডিসেম্বর তারিখেই কার ঠাকুর কোম্পানী দেউলিয়া হয়। কলিকাতা গেজেটেই শুধু এ সংবাদ বাহির হয় নাই, সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহেও এ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ ২০শে জানুয়ারী তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিতেছেন,—

"The papers announce that Major Henderson's term of partnership in the firm of Carr, Tagore and Co. having expired, and Baboo Debendranath and Greendernath Tagore being desirous of retiring from commercial business, the accounts of that Firm have been closed to the 31st of December last, to which date the two Baboos will collect all debts and discharge all liabilities. Thus, the family of Dwarkenath Tagore, has at length ceased to have any interest in the Firm which he established."* (W. Ep. of News, Jan. 13.)

দেবজ্যোতিবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বাক্ষরিত যে সার্কুলার উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেও আছে,—

"We beg to assure you that the necessity for this step has come upon us most unexpectedly, and arises solely, from the disappointment we have experienced in carrying out the *plan of liquidation* under the arrangements *made in January last*." (*Italics mine.*)

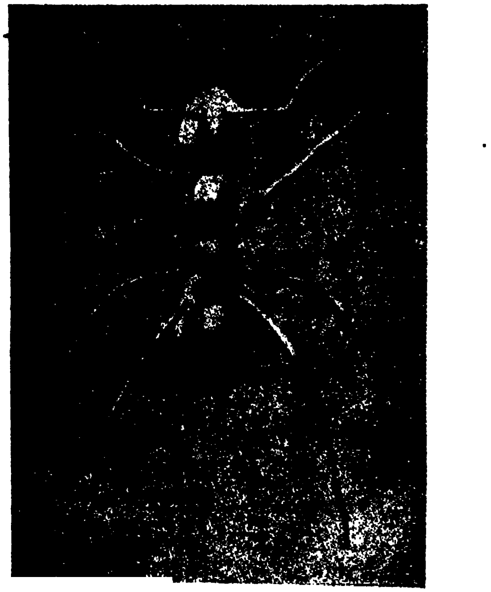
১৮৪৭, ৩১এ ডিসেম্বর কার ঠাকুর কোম্পানী 'বন্ধ' হইবার পর পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে দেউলিয়া অবস্থায় কোম্পানীর দেনা-পাওনা চুকাইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল এখানে তাহারই স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।*

* এ সম্বন্ধে 'বঙ্গশ্রী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

শ্রমিক-পিঁপড়ের জন্ম-রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমাদের আশেপাশে রকমারি পিঁপড়ে দেখিতে পাই। ইহাদের বাসস্থান অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই, তিন বা ততোধিক বিভিন্ন আকৃতির পিঁপড়ে রহিয়াছে। একই জাতীয় পিঁপড়ের এই আকৃতি-বৈষম্য স্বভাবতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। খুঁটিনাটি বৈষম্য থাকিলেও সন্তান, মাতা অথবা পিতার মত আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া থাকে—জীবজগতের



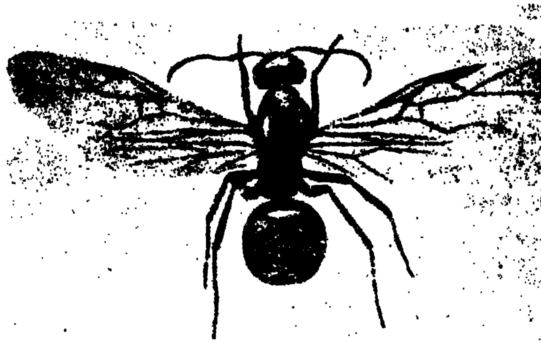
শ্রমিক-পিঁপড়ে

ইহাই অতি পরিচিত ঘটনা। কদাচিৎ কখনও দুই-এক ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়; কিন্তু তাহারও কারণ সুস্পষ্ট। পিঁপড়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাতা অথবা পিতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির সন্তান জন্মগ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। মাতা বা পিতার অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করাটা কতকটা সাময়িক এবং অনেকটা আকস্মিক ব্যাপারের মত। এক-একটা পিঁপড়ের বাসায় সাধারণত চার-পাঁচ রকমের পিঁপড়ে থাকে। কয়েক শত রাজা কয়েক শত রাণী এবং কয়েক হাজার কর্ম্মী বা শ্রমিক। আমরা সচরাচর শ্রমিক-পিঁপড়েই দেখিয়া থাকি এবং ইহাদের দ্বারাই জাতি নির্ণীত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে কতকগুলি থাকে মাথা মোটা সৈন্য এবং বাকীগুলি ছোট বড় মাঝারি—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাণীর আকৃতি, সাধারণ পিঁপড়েদের তুলনায় অসম্ভব বড়। রাজার আকৃতি মাঝারি-গোছের। কিন্তু কর্ম্মীরা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং পিতা বা মাতার সহিত ইহাদের আকৃতিগত কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা বা রাণী পিঁপড়েদের প্রত্যেকেরই ডানা আছে; কিন্তু কর্ম্মীদের কাহারও ডানা নাই, অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রাজা ও রাণীর মধ্যে মিলন সংঘটিত হইবার পর রাণীর ডিম হইতে কেবল এই কর্ম্মীশ্রেণীর পিঁপড়েরাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কি উপায়ে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে প্রত্যেকেরই তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন জাতীয় কয়েক প্রকার পিঁপড়ের মধ্যে এইরূপ আকৃতি-বৈষম্য দেখিয়া এক সময়ে আমারও কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার গবেষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

কিছুকাল যাবৎ পিঁপড়েদের এই অদ্ভুত প্রজনন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পরীক্ষার ফলে এই রহস্য সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি মোটামুটি ভাবে এ স্থলে তাহা আলোচনা করিব। প্রথমতঃ, কাঠ-পিঁপড়ে লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার পর ক্রমাগত ডেঁয়ো-পিঁপড়ে, বিষ-পিঁপড়ে, সুড়সুড়ে-পিঁপড়ে লইয়া পরীক্ষা করিয়াও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারি নাই। কারণ এই পিঁপড়েরা প্রত্যেকেই মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। বাচ্চা প্রভৃতি মাটির নীচে অন্ধকারেই প্রতিপালিত হয়। বাহির হইতে দেখিবার কোন উপায় নাই। কৃত্রিম বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হাজার হাজার পিঁপড়ে প্রতিপালন করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা—রাণী, বাচ্চা, ডিম প্রভৃতি অন্ধকারে অথবা কোন কিছুর আড়ালে অতি সঙ্গোপনে রক্ষা করে। কাজেই ইহাদের স্বাভাবিক কার্য্য-প্রণালী প্রত্যক্ষ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। অবশেষে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত লাল-পিঁপড়ে পুষিতে আরম্ভ করিলাম। লাল-পিঁপড়েরা গাছের ডালে পাতা জুড়িয়া গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে। পাতার ভিতর দিয়া বাসার ভিতরের অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই কৃত্রিম বাসার সাহায্য লইতে হইল। অনেক রকমের ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে পাৎলা সেলোফিন মুড়িয়া বাসা তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইলাম। পুরুষ, রাণী, ডিম, বাচ্চা সমেত হাজার হাজার পিপীলিকা বাসায় ছাড়িয়া দিলাম। তাহারা সেলোফিনে আবৃত বাসায় উপস্থিত হইয়া কাটা এবং ফুটা স্থানগুলি বন্ধ করিয়া দিল এবং বিভিন্ন কুঠুরি নির্ম্মাণ করিয়া বেশ সহজ ভাবেই বসবাস করিতে লাগিল। পাৎলা সেলোফিনের পর্দ্দার ভিতর দিয়া পিঁপড়েগুলির কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতে কোনই অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়েদের আকৃতি এবং প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং প্রজনন



ডানাওয়ালা পুরুষ-পিঁপড়ে

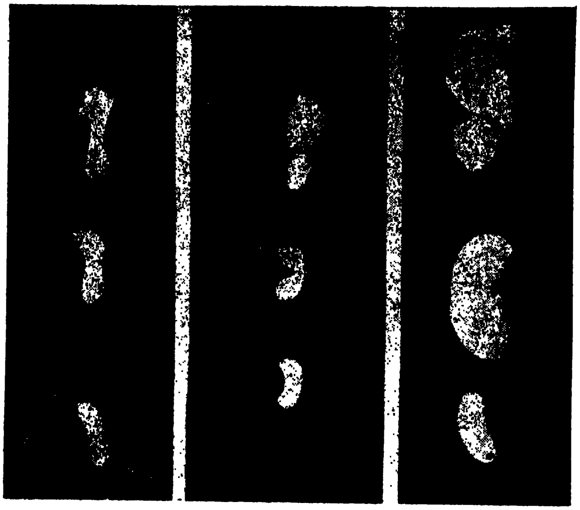


ডানাওয়ালা রাণী

ব্যাপারে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই লাল-পিঁপড়েদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই সাধারণ ভাবে পিঁপড়েদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

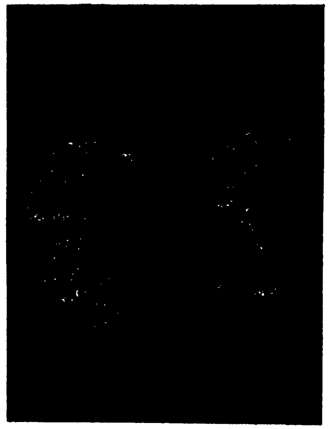
মানুষ সামাজিক প্রাণী। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে মানুষের মত সমাজ-ব্যবস্থা না থাকিলেও মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি নিম্ন স্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে এরূপ সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। তাহাদের সমাজের রীতিনীতি যাহাতে অক্ষুণ্ণভাবে নিরুপদ্রবে চলিতে পারে তাহার জন্যও একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। মানুষেরা বুদ্ধিমান্ এবং কৌশলী হইয়াও পিঁপড়ে অথবা মৌমাছির মত সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত একটা পাকাপোক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। প্রত্যেকেই সুবিধামত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ফলেই দাসত্ব প্রথা, বাধ্যতামূলক বেগার খাটা এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক প্রথার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। স্বার্থান্বেষী ও প্রভুত্ব-প্রয়াসী ব্যক্তিরা অস্ত্রপ্রয়োগে মানুষের প্রজননশক্তি নষ্ট করিয়া নিজেদের সুখসুবিধা বিধানের নিমিত্ত কায়েমী ভাবে এক ধরণের শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু যে কারণেই হউক তাহাদের এই প্রচেষ্টা অধিক দূর প্রসার লাভে সমর্থ হয় নাই। যাহা হউক, মানুষের প্রয়োজনে আজ পর্য্যন্তও গৃহপালিত পশুপক্ষীর উপর এ ব্যবস্থা অবাধে প্রযুক্ত হইতেছে। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উপায়টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রমসাধ্য যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পিঁপড়েরা কিন্তু অতি সহজ উপায়ে এইরূপ এক প্রকার শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন করিবার উপায় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। মনুষ্য কর্তৃক অবলম্বিত উপায় অপেক্ষা ইহাদের উপায় যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বার্থান্বেষী, পুঁজিবাদী, প্রভুত্ব-প্রয়াসী মানুষেরা যদি পিঁপড়েদের অবলম্বিত কৌশলের মত এমন কোন সহজসাধ্য উপায় আবিষ্কারে সমর্থ হইত তবে তাহার প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই হয়তো বংশানুক্রমে কায়েমী শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া যাইত। প্রভুর তুষ্টি বিধান ও স্বার্থ ছাড়া তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিয়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকিত না। কৃত্রিম বাসার মধ্যে হাজার হাজার পিপীলিকা প্রতিপালন করিয়া বছরের পর বছর তাহাদের যে সকল আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা হইতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক-একটা পিঁপড়ের বাসায় কয়েক শত রাণী, কয়েক শত পুরুষ এবং হাজার হাজার কর্ম্মী বা শ্রমিক-পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। রাণী এবং পুরুষ পিঁপড়েরা কোন কাজই করে না, কেবল অলস ভাবে বাসার মধ্যে এ দিক ও দিক ঘুরিয়া বেড়ায় মাত্র। শ্রমিকরা রাণী ও পুরুষদিগকে সর্ব্ব-প্রকার সেবা যত্ন করিয়া থাকে। শ্রমিকরা খাবার সংগ্রহ করিয়া রাজা ও রাণীদের মুখের কাছে তুলিয়া ধরে। আহারান্তে তাহা-দিগকে একাধিক শ্রমিক মিলিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দেয় এবং অবসর মত তাহাদের প্রসাধনে ব্যাপৃত হয়। ডিম পাড়িবার সময় হইলেই হাজার হাজার কর্ম্মী-পিঁপড়ে তাহার আপাদমস্তক আড়াল করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। সেই সময়ে শ্রমিকরা রাণীর যেরূপ সেবাযত্ন করিয়া থাকে তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। একটির পর একটি করিয়া ডিম বাহির হইতে আরম্ভ করিলেই শ্রমিকরা সেগুলিকে অতি যত্ন সহকারে মুখে তুলিয়া লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট কুঠুরীতে সাজাইয়া রাখে। অন্য এক দল শ্রমিক তখন ডিমের তদারকে নিযুক্ত হয়। তাহারা ডিম ছাড়িয়া কোথাও নড়ে না। দুই-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। এক-একটি কর্ম্মী এক-একটা বাচ্চা প্রতি-পালনের ভার গ্রহণ করে। ইহাদিগকে খাওয়ানো, পরিষ্কার করা, উন্মুক্ত স্থানে বেড়াইয়া আনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ শ্রমিকরাই করিয়া থাকে। রাজা বা রাণীরা কোন কাজেই বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ করে না। ইহারা বহু দূর দূরান্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাসায় লইয়া আসে এবং রাজা রাণীকে শ্রেষ্ঠাংশ খাওয়াইবার পর



বামে—(নীচে হইতে উপরে শ্রমিক-পিঁপড়ের বাচ্চা ও পুত্তলী
মধ্যে—পুরুষ-পিঁপড়ের বাচ্চা পুত্তলী
দক্ষিণে—রাণীর বাচ্চা ও পুত্তলী

যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সকলে মিলিয়া ভাগাভাগি করিয়া খায়। ইহাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস নাই। যাহা সংগৃহীত হয় তাহাই খাইতে সুরু করিয়া দেয়। যদি খাদ্যের অনটন ঘটে তবে যৎ-সামান্ত যাহা সংগৃহীত হয় তাহা হইতে প্রথম বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায় এবং পরে রাজা-রাণীকে খাওয়াইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা নিজেরা ভাগাভাগি করিয়া খায়, নচেৎ অনাহারে থাকিয়াই প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম চালাইয়া যায়। অনাহার সহ্য করিয়া মৃত্যু বরণ না করা পর্য্যন্ত ইহারা নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিবে না। শত্রুর আক্রমণে ভীত হইয়া হয়ত বাচ্চা মুখে করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিতেছে সেই সময়ে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি, অর্দ্ধাংশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেও বাচ্চাকে মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে না। শত্রু-কবলিত বাচ্চা, রাণী অথবা রাজাকে উদ্ধার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রচেষ্টা জানিয়াও জীবন দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। দুই-একটি ব্যতীত অধিকাংশ ঘটনা দেখিয়া মনে হয়—জীবনের প্রতি ইহাদের সত্যসত্যই কোন মমত্ববোধ আছে কিনা সন্দেহ। ইহাদের কোন চালকও নাই বা কার্য্য বণ্টনও কেহ করিয়া দেয় না। যখন যাহার প্রয়োজন উপস্থিত হয় সংস্কার বশেই যেন সে-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত তাহা সম্পন্ন করে। ইহাদের মধ্যে কঠিন বা সহজ বলিয়া কোন কাজের বিচার নাই। কঠিনই হউক কি সহজই হউক, প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্র ইহারা নির্ব্বিচারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। শত্রু প্রবলই হউক, কি দুর্ব্বলই হউক, নাগালের মধ্যে আসিবামাত্রই সমস্ত শক্তি লইয়া নির্ব্বিচারে তাহাকে আক্রমণ করিবে। একটা কাঠি, বা এক টুকরা ইট কাছে লইয়া আসিবামাত্রই তাহাকে প্রাণপণে কামড়াইয়া ধরিবে এবং ভারী হইলে তাহা টানিয়া তুলিতে না পারিলেও সেই নিরীহ ইটের টুকরা মুখে করিয়া দিনের পর দিন ঝুলিয়া থাকিবে—এমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং বিশ্বস্ত ইহারা।



পিঁপড়ের বাচ্চা

বাসা বাঁধিবার সময় কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। লাল-পিঁপড়েরা একটির পর একটি পাতা জুড়িয়া গাছের ডালে গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে। শত শত কর্ম্মী একত্র হইয়া কাছাকাছি অবস্থিত দুইটি পাতা টানিয়া ধরিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখে। আর এক দল কর্ম্মী বাচ্চা মুখে করিয়া সে স্থলে উপস্থিত হয় এবং বাচ্চার মুখনিঃসৃত সুতার সাহায্যে পরস্পর সংলগ্ন পাতা দুইটিকে মুড়িয়া দেয়। এভাবে অনেক পাতা জুড়িয়া ক্রমশঃ একটি বড় বাসা গড়িয়া তুলে। অনেক সময় দেখিয়াছি—হাজার হাজার পিঁপড়ে একত্রিত হইয়া এক সঙ্গে গাছের পাতা মুড়িয়া টানিয়া রহিয়াছে। সুতা বোনা শেষ হইলে কর্ম্মীরা একে একে টানা ছাড়িয়া দিতে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একবার সুতা-বোনা পিঁপড়েগুলিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইল না। কৌশলে তাহাদের গতিরোধ করা হইল। এদিকে কর্ম্মীরা পাতা টানিয়াই রহিয়াছে। এক দিন, দুই দিন করিয়া ক্রমাগত দশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি পাতার টানা ছাড়িবার কোনই লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। অনাহারজনিত দুর্ব্বলতায় দুইএকটা করিয়া পিঁপড়ে কামড় ছাড়িয়া নীচে পড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অন্য পিঁপড়ে আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু সুতা বুনিবার সুযোগ আর আসিল না। ইহা হইতেই পিঁপড়েদের স্বভাবের দৃঢ়তার এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

একই জাতীয় দুই দল পিঁপড়ের মধ্যে সময় সময় লড়াই বাধিতে দেখা যায়। পরস্পর পরস্পরকে কামড়াইয়া ধরিয়া, হয়

উভয়ে টানাটানি নতুবা গড়াগড়ি দিতে থাকে। বিজেতা পরাজিতকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। অনেক সময় দেখা যায়—বিজেতার পায়ে অথবা শুঁড়ে পরাজিতের মস্তক অথবা দেহের প্রথমার্দ্ধ ঝুলিয়া রহিয়াছে। পরাজিত যে মরণ-কামড় দিয়াছিল, মৃত্যুর পরেও তাহা ছাড়ে নাই; শরীরের কতকাংশ সমেত তাহা বিজেতার শরীর আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। বিজেতাকে আমরণ এভাবে শত্রুর দেহাংশ বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে। কর্ম্মীদের এই যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ়তা এবং রাজা-রাণীর প্রতি সেবাপরায়ণতা—এই সকল প্রবৃত্তির বিকাশ হইল কেমন করিয়া? অথচ ইহারা নিজের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন—ইহাই বা সম্ভব হইল কিরূপে? তা ছাড়া, আর একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইহাদের প্রজনন-ক্ষমতা নাই। কিন্তু কোন কারণে বাসার শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকিলে অথবা রাণীর অভাব ঘটিলে এই শ্রমিকদলের মধ্য হইতেই দুই-একটি, যৌন-সম্পর্ক ব্যতীতই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে এবং এই প্রকার ডিম হইতে কেবল শ্রমিকই জন্মগ্রহণ করে। এস্থলে একটি কথা জানা দরকার যে, পিঁপড়েদের শ্রমিকরা সকলেই স্ত্রী-জাতীয়, কিন্তু অপরিপুষ্ট অর্থাৎ ইহাদের প্রজনন-যন্ত্র মোটেই পরিপুষ্টি লাভ করে না। তথাপি প্রয়োজন বোধে যৌন-সংসর্গ ব্যতীতই ডিম পাড়িতে পারে।


লাল-পিঁপড়ে পুরুষ


রাণী


লাল-পিঁপড়ে শ্রমিক

কিন্তু কেমন করিয়া রাণীর ডিম হইতে নির্দ্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পিপীলিকা জন্মগ্রহণ করে? পর্য্যবেক্ষণের ফলে যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়—সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের প্রথম দিক হইতে বাসার মধ্যে রাণী এবং রাজাদের অপরিণত বাচ্চার আবির্ভাব ঘটে। ইহার পরে আষাঢ়-শ্রাবণ মাস হইতে আবার রাজা এবং রাণীর অভাব লক্ষিত হয়। যাহা হউক, রাজা এবং রাণী পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবার পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ডানায় ভর করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়। উড়িতে উড়িতে রাজা-রাণীর মিলন সংঘটিত হয়। রাজারা আর বাসায় ফিরিয়া আসে না। রাণী যে-কোন একটা বাসায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পরেই তাহার ডানা খসিয়া যায় এবং কিছুকাল বাদেই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই ডিম হইতে যে-সকল বাচ্চা হয় তাহারা সকলেই শ্রমিক জাতীয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—রাণীর সহিত রাজার মিলন ঘটিতে না দিলেও রাণী ডিম পাড়িয়া থাকে। কিন্তু সেসকল ডিম হইতে কেবল পুরুষ-সন্তানই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ডিম হইতে সরাসরি রাণী জন্মগ্রহণ করে না। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বাসা হইতে রাণীদের সরাইয়া লইলে কিছুকাল পরেই শ্রমিকদের মধ্য হইতে দুই-একটি প্রচুরসংখ্যক ডিম পাড়িতে সুরু করিয়াছে এবং সেই ডিম হইতে শ্রমিক-পিপীলিকাই উৎপাদিত হইতেছে। সমস্যা ইহাতে বড়ই জটিল বোধ হইতে লাগিল, কারণ জীব-জগতের প্রজনন প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মের মধ্যে ইহাদিগকে আনা চলে না।

বিবিধ পরীক্ষার পথে অবশেষে দেখা গেল যে, পিঁপড়েদের ডিম পর্য্যন্ত আদিম জৈব-বস্তুর বংশানুবর্ত্তী একটা ধারাবাহিকতা আছে বটে; কিন্তু ডিম ফুটিবার পর হইতেই বিশিষ্ট একটা খাদ্যবস্তুর প্রভাবে বাচ্চার আকৃতি এবং প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই খাদ্যবস্তুর পরিমাণের উপর আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বিভিন্ন পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। অবশ্য ইহারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া বলিতেছি। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বাসার মধ্যে কেবল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-পিপীলিকাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকদের দুই-একটার ডিম হইতে সেই সময়ে আরও কিছু কিছু শ্রমিক-পিপীলিকা জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পিঁপড়েরা গাছের উপর বাসা বাঁধে এবং সাধারণতঃ গাছের উপরই ঘোরা-ফেরা করিয়া থাকে এবং মৃত কীট-পতঙ্গ, পাখীর পালক, মাছের কাঁটা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শীত ঋতুর অবসানে ফাল্গুনের প্রারম্ভে গাছে গাছে নূতন পত্র-পল্লব এবং মুকুল বাহির হইতে সুরু করে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—এই সময়ে নূতন নূতন পত্রপল্লব এবং মুকুলের মধ্যে কয়েক প্রকারের অজস্র গাছ-উকুন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সকল মুকুল এবং গাছ-উকুনের শরীর হইতে অতি অল্প পরিমাণে মধুর মত এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই সময়ে পিঁপড়েদের মধু সংগ্রহ করিবার মরসুম পড়িয়া যায়। তাহারা প্রায় সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মধুর লোভেই দিনরাত্রি পত্র-পল্লব এবং গাছ-উকুনের মধ্যে অবস্থান করে। এই মধুর মধ্যে ভিটামিন-বি(১) নামক এক প্রকার খাদ্য-প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পেট ভরিয়া এই মধু খাইবার পর শ্রমিক-পিঁপড়েরা বাসায় আসিয়া তাহা উদগীরণ করিয়া বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায়। শ্রমিক-পিপীলিকারা অনেকেই পর পর বাচ্চাগুলিকে উদগীর্ণ মধু খাওয়াইতে থাকে। এক



বাসার মধ্যে পুরুষ ও শ্রমিক-পিঁপড়ে

একটা বাসার হাজার হাজার বাচ্চা থাকে এবং শ্রমিকদের সংখ্যাও অগণিত। কাজেই কোন্ কোন্ বাচ্চাকে কত বার খাওয়ান হইল তাহার কোন হিসাব ঠিক রাখিতে পারে না। ইহার ফলে কোন কোনও বাচ্চা প্রচুর পরিমাণে এই খাদ্য পায় আবার অনেকে অতি সামান্য মাত্র পাইয়া থাকে। যাহারা এই খাদ্য বেশী পরিমাণে পায় তাহারা অতি দ্রুত গতিতে বর্দ্ধিত হইয়া রাণীর আকৃতি পরিগ্রহ করে। যাহারা মাঝামাঝি পরিমাণে মধু খাইতে পায় তাহারা পুরুষ-পিঁপড়েতে পরিণত হয়। যাহারা অতি সামান্য পায় অথবা মোটেই পায় না তাহারাই বড় এবং ছোট বিভিন্ন রকমের কর্ম্মী বা শ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যৌন-মিলন ব্যতিরেকে উৎপন্ন পুরুষ এবং মধুর প্রভাবে উৎপন্ন পুরুষ পিপীলিকাদের মধ্যে হয়ত কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকিতে পারে। ইহা এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ বলিয়া নিশ্চিত-রূপে কোন কথা বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে পত্র-পল্লব এবং গাছ-উকুনের দেহনিঃসৃত রস পরিবেশনের তারতম্যানুসারে প্রয়োজন মত রাণী এবং কর্ম্মী-পিপীলিকা উৎপাদন করা যাইতে পারে। মোটের উপর খাদ্য পদার্থের মধ্যে ভিটামিন বি (১) এবং সেই জাতীয় অন্যান্য কোন কোন পদার্থের অভাবের ফলেই শ্রমিক-পিঁপড়ের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

ভারতীয় রসায়ন-শিল্পের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

আমাদের দেশ রসায়ন-শিল্পে যে কিরূপ পশ্চাৎপদ তাহা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ ভাবে বুঝা যাইতেছে। বিলাস-সামগ্রীর কথা ছাড়িয়া দিলেও যে সকল ঔষধ-পথ্যাদির সহিত জীবনমরণ-সমস্যা জড়িত তাহার কিরূপ ভয়াবহ অভাব ঘটিয়াছে তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের দেশে অধিকাংশ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কাঁচামালের অভাব নাই। অথচ কোন্ গ্রহ-বিপাকে যে আমরা রসায়ন-শিল্পে অগ্রসর হইতে পারি নাই তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। আমি এ স্থলে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি—ইহা হইতেই গলদ কোথায় ও কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

আমাদের দেশে এত দিন পর্য্যন্ত গোড়াকার রাসায়নিক পদার্থ (basic chemicals) উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থাই হয় নাই। যদিও দেশে পাথুরে কয়লা অপর্য্যাপ্ত, তথাপি আলকাতরা হইতে যে-সব অমূল্য রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় সেগুলি প্রস্তুত করিবার কোনো চেষ্টাই প্রায় হয় নাই। তাই আজ বিবিধ ঔষধ, রং এবং বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত রাসায়নিক জুটিলেও গোড়ার জিনিসের অভাবে রাসায়নিকগণ আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমি ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ঔষধ অ্যাটেব্রিন তৈয়ারী করিতে পারি অথচ উহার মালমশলা না পাওয়ায় আমার চোখের সামনে আমারই প্রিয় পরিজন ম্যালেরিয়ার কবলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতেছে—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? অ্যাটেব্রিন সম্বন্ধে এ যাবৎ অনেক আলোচনা হইয়াছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় "Shipping Space and Import of Medicine" শীর্ষক প্রবন্ধে বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রসন্ন সেন মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি দেখাইয়াছেন অনেক কম দরকারী এমন কি প্রায় অকেজো ঔষধ আমদানির জন্য জাহাজে জায়গার অভাব হইতেছে না অথচ অ্যাটেব্রিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ঔষধের উপকরণ কোনো স্থান পাইতেছে না। যদি ঐ সব উপকরণ আনা সম্ভব না হয় তবে এদেশে ঐগুলি তৈয়ারীর জরুরী ব্যবস্থাই বা কেন অবলম্বিত

হইতেছে না? দেশে উচ্চ শ্রেণীর গবেষণাগারের ও তদুপযুক্ত অধ্যাপকের অভাব নাই—তাঁহারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কাজ না করিলে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াও ত কাজ আদায় হইতে পারে। যেখানে চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ লোক ঔষধের অভাবে প্রাণ হারাইতেছে সেখানে অধ্যাপকগণ নিছক বিজ্ঞান-বিলাসে রত থাকিবেন ইহা কোনো সভ্য দেশের পক্ষেই সহনীয় নয়।

ইহা সত্য যে ঐ সব রাসায়নিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইলে উপযুক্ত যন্ত্রাদির আবশ্যক কিন্তু যেখানে প্রতিনিয়ত শত শত যন্ত্রাদি জাহাজযোগে আসিতেছে সেখানে দুই-দশটি অত্যাবশ্যক যন্ত্র আমদানি করা কি একেবারেই অসম্ভব? উচ্চাঙ্গের অনেক ঔষধের উপকরণ অতি দাহ্য ও বিস্ফোরক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াও জাহাজে স্থান পায় না। কিন্তু ঐ সব দ্রব্য তৈয়ারী করিতে যে সকল যন্ত্রাদির প্রয়োজন সেগুলি সম্বন্ধে ত ঐ কথা প্রযোজ্য নহে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিলেই আজ দেশের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অচল অবস্থার অনেকটা সমাধান হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, যে-সকল পদার্থের কাঁচামালের এদেশে আদৌ অভাব নাই সেগুলি প্রস্তুত করিবারও এ পর্য্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইল না। উদাহরণস্বরূপ এ স্থলে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সামরিক বে-সামরিক সকল হাসপাতালের পক্ষে অপরিহার্য্য পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট। ভারতবর্ষ উহার কাঁচামাল ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুতের জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত। অথচ কেন যে প্রচুর পরিমাণে ঐ মহদুপকারী পদার্থ এখনো প্রস্তুত হইতেছে না তাহা নিতান্তই লজ্জার কথা।

ইহার পরেই গ্লুকোজের কথা মনে পড়ে। রোগীর পথ্য হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকার গ্লুকোজ প্রতি বৎসর আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি হয় অথচ ইহার কাঁচামাল শ্বেতসার এ দেশে দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নয়। গ্লুকোজ হইতে মূল্যবান্ ঔষধ গ্লুকোনিক অ্যাসিড তথা ক্যালসিয়ম গ্লুকোনেট এবং ভিটামিন সি প্রস্তুত হয়। আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সময় আমেরিকাতে প্রতি বৎসর ৮০ হইতে ১০০ টন ভিটামিন সি কৃত্রিম উপায়ে গ্লুকোজ হইতে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে ঠিক সেই সময় ভারতের কোনো গবেষণাগারেও উহার এক তোলা তৈরী হইল না।

গ্লুকোজের পরেই মল্ট এবং ঈষ্টের (খামী) কথা। প্রথমটি দুর্ব্বল রোগীর পথ্য ও ঔষধ, দ্বিতীয়টি সাধারণতঃ ঔষধরূপে তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। মল্ট যব ও জোয়ার হইতে এবং খামী (yeast) গুড় হইতে উৎপন্ন হয় অথচ এখন পর্য্যন্ত ভারতে প্রস্তুত এই দুই দ্রব্য লক্ষিত হয় না। কয়েমবাটোর, নীলগিরি ও অন্য দুই-এক স্থলে এগুলি প্রস্তুতের প্রাথমিক চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র।

অনেকেই জানেন ভারতের চিনির কলগুলি হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ টন ঝোলাগুড় পাওয়া যায়। ধরিতে গেলে এই গুড় চিনির কলের একটি উপ-সামগ্রী (by-product) অথচ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ইহা হইতে কোটি কোটি টাকার মূল্যবান্ পদার্থ প্রস্তুত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। বায়ো-কেমিক্যাল উপায়ে এই অকেজো ঝোলাগুড় হইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড এমন কি গ্লিসারিন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। গুড় হইতে খামী (yeast) প্রস্তুতের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুড় হইতে সাধারণ মদ্য এবং অ্যামিল অ্যালকহল প্রভৃতি বিবিধ উপকারী সুরা উৎপন্ন হয়। যদিও দেশে দুই-এক স্থলে ল্যাকটিক অ্যাসিড কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি উহার সম্ভাব্যতা এবং প্রয়োজনীয়তার তুলনায় উহা নিতান্তই নগণ্য। ক্যালসিয়ম ল্যাক্‌টেটের উপকারিতার কথা কাহারও অবিদিত নাই। সাইট্রিক অ্যাসিড ও ইহার বিভিন্ন লবণ-পদার্থ চিকিৎসকগণের নিত্য ব্যবহার্য্য অপরিহার্য্য সামগ্রী অথচ আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে সস্তা কাঁচামালের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও আমরা এই সকল পদার্থের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া মৃত্যু ও দারিদ্র্য ডাকিয়া আনিতেছি। আমাদের খ্যাতনামা রসায়নবিদ্ অধ্যাপকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেশের অনেক দুর্গতির লাঘব এবং প্রভূত অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

আমাদের দেশের রাসায়নিক কারখানার মালিকগণ সাধারণতঃ অতিমাত্রায় রক্ষণশীল এবং আপাতলাভের দিকেই তাঁহাদের সমধিক আগ্রহ। গবেষণায় অর্থব্যয় এখনও তাঁহাদের অনেকেই অপচয়ের মধ্যেই গণ্য করেন। নতুবা তাঁহাদের উদ্যোগে উপযুক্ত গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহযোগিতায় উল্লিখিত অনেক রাসায়নিক পদার্থই এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারিত। পূর্ব্বে অধিকাংশ সামগ্রী সুলভে বিদেশ হইতে আমদানি হইত এবং সেগুলির খুচরা কারবারই দেশী রাসায়নিক কারখানার মুখ্য অবলম্বন ছিল। বর্ত্তমানে এই অবস্থা

অন্তর্হিত হওয়ায় অনেক দেশী প্রতিষ্ঠানে সহজলভ্য কোনো কোনো রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে বটে, তবে সত্যিকারের প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি যে সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না তাহাও অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য যুদ্ধের পরে বিদেশ হইতে বহু সামগ্রী এত সুলভে আমদানী হইবে যে, সেই আশঙ্কায় অনেকেই নূতন বিষয়ে হাত দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন।

তবে একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, যে সকল মূল্যবান পদার্থের কাঁচামাল এদেশে পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় সেগুলি যদি এই সঙ্কটকালে রাসায়নিকগণের একনিষ্ঠ সাধনা ও ধনিকগণের অকাতর অর্থানুকূল্যে দাঁড়াইয়া যাইত তাহা হইলে যুদ্ধান্তেও অনেক নবীন রাসায়নিক ও সহস্র সহস্র শ্রমিক এই সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত হইবার সুযোগ পাইতেন এবং দেশও অত্যাবশ্যক ঔষধ-পথ্যাদি বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে আংশিক অব্যাহতি লাভ করিত।

মালকোণ্ডা পেণ্টার জঙ্গল, করনুল

শিকার-কাহিনী—(সত্য ঘটনা)

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

১৯৪৪ সালের ৮ই মে কিছুকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১০৩ ডিগ্রী জ্বর লইয়া ট্রেনে উঠিয়াছিলাম। গম্যস্থল পাঁচ শত মাইল দূরে, গভীর অরণ্যে। ভয়াল আবেষ্টনীর আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি নাই। জীবহিংসার আদিম প্রবৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্ত অরণ্য আমাকে টানিতেছিল। প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে বাধা আসিয়াছিল কিন্তু আমার দারুণ উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত জ্বর লইয়াই যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বাধা দিলে জ্বর অপেক্ষা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিয়া যাইবে।

আরজি মঞ্জুর হওয়াতে মাঝপথ হইতে দুই বার তারে স্বাস্থ্যের খবর জানাইব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে পিয়ন ছিল, ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তাহাকে সুস্থতার সংবাদ সহ দুইটি পৃথক্ টেলিগ্রাম দিয়া দিলাম—আদেশ ছিল যথাস্থান হইতে কাজটা সারিয়া ফেলিবে, আমি কি রকম থাকি তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া দেখি দুইটি গোরা এক দিককার গদি দখল করিয়া বসিয়াছে—কাঁধের উপর ধাতুনির্ম্মিত অনেকগুলি তারকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অনুমান করিলাম সামরিক বিভাগের কোন হোমরা-চোমরা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইবে। গোরার অবাঞ্ছনীয় সান্নিধ্যের সম্ভাবনা হইলেই আমি সময় থাকিতে আস্তিন গুটাইয়া প্রস্তুত হইতাম ইহা আমার বাল্যকালের স্বভাব, পূর্ব্বাভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই, আস্তিন গুটাইবার চেষ্টা করিলাম—বাহু উপযুক্তভাবে নড়িল না, গাঁটে গাঁটে বেদনা—প্রতি অঙ্গের জোড়-গুলি অচল হইয়া গিয়াছে।

গাড়ীতে আমার দিকটায় বিছানা পাতা ছিল—যাঁহারা ষ্টেশন পর্য্যন্ত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া সটান বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরেই বম্বে মেল ছাড়িয়া দিল। জ্বরও রেলচক্রের দ্রুত গতির সহিত পাল্লা দিয়া বাড়িতে লাগিল। প্রায় বেহুঁসের মত হইয়া আসিতেছিলাম। যাহাদের দেখিয়া কিছু পূর্ব্বে ভিন্ন উদ্দেশ্যে বাহু নাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাদেরই দিকে কোন প্রকারে হস্ত প্রসারিত করিয়া জল ভিক্ষা চাহিলাম। তখন আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই।

সাহেব আমাকে উঠাইয়া সামরিক জলের পাত্র হইতে জল খাওয়াইলেন। তাহার পর নিজের রুমাল লইয়া আমার কপালে জলপট্টি দিয়া দিলেন। অপরিচিত পরদেশীর কৃপায় অনেকটা আরাম বোধ করিলাম, ধীরে ঘুম আসিতে লাগিল। পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। কপালে বিদেশী দরদীর রুমাল শুকাইয়া গিয়াছে। বন্ধুকে হয়ত জীবনে আর দেখিতে পাইব না, দেখিলেও চিনিতে পারিব না—কিন্তু তাহার জলপট্টির শীতল অনুভূতি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পণ্টাকাল জংসন হইতে ট্রেন বদল করিয়া পাহাড়ী পথের যাত্রী হইলাম। গোড়ার দিকটা উপত্যকার মত ধূ ধূ করিতেছে, দিগন্তব্যাপী অনুর্ব্বর শুষ্ক মাঠ, মাঝে মাঝে দেখা যায় চটা-ফাটা অতিকায় প্রাচীন পাথর অজানা অতীতের নিশ্চল প্রহরী, জীর্ণ অস্তিত্ব লইয়া প্রখর রৌদ্রে যুগ যুগান্তর ধরিয়া পুড়িতেছে। বেশীক্ষণ প্রকৃতির এই অগ্নিতপ্ত রূপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যায় না, চোখ ঝল্‌সাইয়া উঠে।

গাড়ীতে কেহ ছিল না, সব কয়টি খড়খড়ি বন্ধ করিয়া নিজেকে এলাইয়া দিলাম। অনেকটা সময় বোধ হয় এই ভাবে কাটিয়া গিয়াছিল—আমার গন্তব্য স্থলে আসিয়া পড়িয়াছি জানিতে পারি নাই। দরজা ঠেলাঠেলিতে তন্দ্রাবেশ কাটিয়া গেল। জানালা খুলিয়া দেখি ডিগুভামেটায় আসিয়াছি। স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটারমনী তাঁহার এলাকার রেঞ্জার ও অন্যান্য লোক ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—তাহাদের সাহায্যে মাল নামাইতে কোন অসুবিধা হইল না। ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস ষ্টেশন হইতে নিকটে নয়। বেলা তখন চারটা হইবে। রৌদ্ররশ্মির



শিকারী বেশে লেখক। পশ্চাতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম

অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম—সবুজের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। পাকা রাস্তার পাশে ঘাস শুকাইয়া পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, দগ্ধ পাথরের উত্তাপ সাধারণ টেনিস জুতার রবারকে প্রায় গলাইয়া ফেলিতেছিল। মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ হইতেছে। কোন প্রকারে দেহটা টানিয়া হেঁচড়াইয়া বাংলোয় টানিয়া তুলিলাম। ডি. এফ. ও. আমার অভ্যর্থনার জন্য বারান্দাতে দাঁড়াইয়াছিলেন—ভদ্রতার অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইতেই বলিলাম, আমার জ্বর বাড়িতেছে বিশ্রামের প্রয়োজন।

তিন দিন জ্বর ভোগের পর স্থানীয় ডাক্তারের কৃপায় চতুর্থ দিনে পথ্য পাইলাম। পথ্যের পরেই শিকারে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ডি. এফ. ও. স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন—গতিক সুবিধার নয়, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে না। সুতরাং কথাটা তখনকার মত চাপিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে লেপার্ডে ছোট মহিষ ও কুকুর মারার খবর আসিতেছিল—আমি গোপনে সংগ্রহ করিতেছিলাম, কিন্তু বড় বাঘের থাবার চিহ্ন কেহ দেখিয়াছে বলিল না। এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, এ তল্লাটে বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। ডি. এফ. ও. সাহেব ও ট্যুরে বাহির হইয়া গিয়াছেন—অবশ্য রেঞ্জ অফিসার বোপাইয়াকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খবর নাই, কাজ নাই, বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম। এক দিন প্রাতে অপ্রত্যাশিতভাবে রেঞ্জার আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন—শুভ সংবাদ। মালকোণ্ডা পেণ্টা হইতে খবর আসিয়াছে—ওখানে এক বিরাট আকারের বাঘ নাকি রোজ পেণ্টার (ক্ষুদ্র জলাশয়) দিকে জল খাইতে যায়। রেঞ্জারকে বলিলাম আর কাল-বিলম্ব নয়, এখুনি রওনা হইবার ব্যবস্থা করুন। তিনি উত্তর করিলেন—এখন রওনা হইলে মালকোণ্ডা পেণ্টার পৌঁছিতে বেলা একটা বাজিয়া যাইবে—এই রৌদ্রে কোন গাড়োয়ান ১০ মাইল পথ যাইতে রাজি হইবে না। কাল সকালে অন্ধকার থাকিতে রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতেছি। অগত্যা তাঁহার কথা মানিয়া তখন হইতেই পরের দিনের ভোরের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম—যাহোক একটা কাজ পাওয়া গেল—প্রস্তুত হওয়ার সহিত জঙ্গলের নানা কাল্পনিক রূপ মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলাম।

১৬ই মে অন্ধকার থাকিতেই ওয়েষ্টলী রিচার্ডের ৪২৫ বোর এবং কেলনারের ৩৫৫ বোর রাইফেল দুইটা পরিষ্কার করিলাম—ফরাসী দোনলা বন্দুকের ভিতরটা তাচ্ছিল্যের সহিত দেখিয়া লইলাম। দোনলাটা মাল-বাহকের হাতে তুলিয়া দিয়া রাইফেল দুইটা নিজের কাছে রাখিলাম। হাজার হোক রাইফেলের জাতিগত আভিজাত্য আছে, তাহা ক্ষুণ্ণ করি কেমন করিয়া। জড়কেও জাতি অন্তর্ভুক্ত করায় ফলাফল সুবিধার হয় নাই। পরের ঘটনায় তাহা জানা যাইবে।

আমরা যখন মালকোণ্ডা পেণ্টায় উপস্থিত হইলাম তখন দুপুর বারটা, অসুস্থ শরীরের কথা ভুলিয়াছি; রৌদ্রের উত্তাপে আবেষ্টনী তখন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—সেদিকে লক্ষ্য নাই, বলিলাম পাগ মার্ক দেখিতে যাইব। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—এখন সেখানে

যাওয়া অসম্ভব। এখান হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ, পৌঁছিতে বেলা দুইটা বাজিয়া যাইবে—ফিরিতে চারটা। তৎ-পরিবর্ত্তে কাল সকালেই মওড়ায় মাচান তৈয়ারী করিয়া রাখিব। আপনি বৈকালে বাঘের পদচিহ্ন দেখিয়া মাচানে বসিতে পারিবেন। ও রাস্তায় মানুষ চলে না। প্রস্তাবটা মন্দ লাগিল না। মাচানে বসার আশু সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

এখানকার রেষ্ট হাউসে কোন জমকালো ভাব নাই। মাত্র দুইটি ঘর, কোনটারই কবাট বন্ধ করা যায় না—যে কোন হিংস্র জানোয়ার নির্ব্বিবাদে ঝড়বৃষ্টিতে আশ্রয় লইতে পারে। আশ্রয় না লউক শিকারের সন্ধানে হরিণ অথবা শূকরের পিছনে ধাওয়া করিয়া ব্যর্থ হইলে এমন একটি অন্ধকারে পূর্ণ আস্তানা পাইলে খানিকটা জিরাইয়া লইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি আছে। ভাবিলাম ডি. এফ. ও. রায় মহাশয় পশুরাজ শার্দ্দূলের দর্শন নিজের টেবিলের তলায় পাইয়াছিলেন। কুকুর ভাবিয়া তাড়াইতে গিয়া একেবারে রাজদর্শন। তিনি জাগিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘ যদি অভ্যর্থনা করিতে আসে তখন বন্দুক চালাইবারও অবসর পাইব না।

রাত্রির কথা, যৎসামান্য আহার করিয়া রেষ্ট হাউস সংলগ্ন স্বল্প পরিসর খোলা বারান্দার মেঝেতে সকলের শুইবার ব্যবস্থা হইল। মিঃ জন আমার পাশে শুইলেন—উভয়ে বন্দুক ভরিয়া পাশে রাখিলাম। সবে নিদ্রা আসিতেছিল এমন সময় দেখিলাম সামনের জঙ্গল আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—চার ধারে পোড়া গন্ধ ও বাঁশ ফাটার দারুন আওয়াজ, কতকটা কুচ্‌কাওয়াজে একসঙ্গে অনেক বন্দুক চালানর মত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জনকে জাগাইলাম। সে দৃশ্যটি দেখিয়াই রেঞ্জারের নিকট ছুটিল। আমি বারান্দা হইতে নামিয়া ঘরের পিছন দিকে গেলাম—দেখি জঙ্গলে আগুন লাগিয়াছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশ ঠেলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বগ্রাসী আগুন আমাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। মহাশক্তিমান্ রাক্ষস ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তারিত করিয়া চলিয়াছে—আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম—ইতিমধ্যে রেঞ্জার দলবল সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আগুনের রূপ দেখিয়াই প্রায় সামরিক কায়দায় হুকুম দিলেন—"কাউণ্টার ফায়ার", সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লোকগুলি সার বাঁধিয়া শুকনা ঘাসে রেষ্ট হাউসের গা ঘেঁসিয়া আগুন লাগাইয়া দিল। অল্পক্ষণের ভিতর আমাদের দিককার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং পূর্ব্বের অগ্রগামী অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিপরীতমুখী আগুনের গতি একত্রে মিলিত হইতেই হাওয়ার গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমান্বয়ে আগুনকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম।

পরের দিন পেণ্টার মওড়ার নিকট মাচানে গিয়া বসিলাম। মাচানটি ঠিক মনঃপূত হইয়াছিল বলিতে পারি না—প্রথম বাঘের লাফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, তদুপরি আড়াল হইতে নজরে পড়ে। সহজে মাচানে উঠিয়া এক পার্শ্বে খানিকটা জায়গা খালি রাখিয়া দিলাম,—ঠিক নীচে বাঘ আসিলে যাহাতে সহজেই গুলি চালাইতে পারি। ইহার প্রয়োজনীয়তা অভিজ্ঞতা হইতে বোধ করিয়াছিলাম। মামুন্ডরে (চিতুর জেলা) মাচানের তলায় বাঘ বাঁধা মহিষকে মারিবার জন্য প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। গুছাইয়া বসিয়া মাল-বাহকদের জোরে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। ধীরে গোধূলির ক্ষীণ আলোক তিরোহিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার আমাদের ঘিরিতে লাগিল। সাংঘাতিক গুমট, হাওয়া নাই, শব্দ নাই, অরণ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে। জনকে রাত্রি জাগিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলাম—পরে তাহার রাত্রি জাগিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিতও হইয়াছিলাম। উভয়েই নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছি—সামনের জঙ্গলে শুকনা পাতার উপর এক সঙ্গে অনেকগুলি জন্তুর পদশব্দ শুনিলাম। অনতিকাল পরেই বুঝিলাম জন্তুগুলি একপাল বন্য বরাহ—মিনিট পনর এদিক ওদিক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া সদলবলে চলিয়া গেল।

বরাহগুলি চলিয়া যাইতে, কাল্পনিক বাঘকে বাঁধা মহিষের নিকট দাঁড় করাইয়া ৪২৫ বোরের রাইফেল দিয়া টিপ করিবার চেষ্টা করিলাম। বন্দুকের দৈর্ঘ্য অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল—মাচানের ভিতর ইচ্ছামত নাড়াইবার উপায় নাই, তাহার উপর মাচান এমন খাড়াই স্থানে বাঁধা হইয়াছে যে বাঘের শিরদাঁড়া ছাড়া আর কিছু ভাল ভাবে দেখিতে পাইব না—গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন আর ত্রুটির কথা ভাবিয়া লাভ নাই। নিস্তব্ধতার মাঝে চিন্তাস্রোত বাঘকে কেন্দ্র করিয়াই আবদ্ধ ছিল না। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিতে লাগিল—ক্লান্ত ও অসুস্থ শরীর লইয়া বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। জনের দেহে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক স্পর্শ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ জন প্রায় নখী জন্তুর মত খামচাইয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। শিকারের অভ্যাস অনুসারে সন্তর্পণে উঠিলাম—বসিবার পূর্ব্বেই শুনিলাম ঠিক আমার মাথার পাশে পূর্ব্ববর্ণিত খালি জায়গাটায় হুড়ামুড়ি চলিয়াছে, জনের দেহ সাংঘাতিক ভাবে দুলিতেছে। পকেটেই ছোট টর্চ ছিল, সুইচ টিপিতে দেখি জন তাহার বন্দুকের বাঁট খোলা জায়গাটার ভিতর চালাইয়া দিয়া কোন একটি জন্তুকে ধপাধপ পিটাইতেছে—যথাস্থানে আলো ফেলিয়া আবিষ্কার করিলাম একটি প্রকাণ্ড ভালুক মাচানের এক হাত নীচে আমার সোলার হ্যাটটা কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে আর জন বন্দুকের বাঁট দিয়া সেটাকে নীচে নামাইবার জন্য পিটিতেছে। আলো ভিন্ন দিকে ঘুরাইতে দেখি প্রথমটার নীচে আর একটা, তাহার পর আরো একটা এবং গাছের গোড়ায় চার-পাঁচটা জড় হইয়াছে—একেবারে ভালুকের পল্টন।

মাচানের উপর যে ধস্তাধস্তি হইয়া গেল তাহাতে বাঘ ত্রিসীমানায় থাকিলে ভৌতিক গুণসম্পন্ন বৃক্ষের নিকটে আর আসিবে না। স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল—"ভালুক পেলে তাই

মেরো—বাঘের আশায় ভালুক ছাড়া চলবে না, ওর চামড়ায় ড্রইং-রুমের সামনে খাসা পা-পোষ হবে"। ক্ষিপ্রতাসহ বড় রাইফেলটা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, অস্ত্র ঘুরিল না অধিকন্তু তৎসংযুক্ত আলোর তার ছিঁড়িয়া গেল। নিরুপায় হইয়া পাশেই দাঁড়-করান দোনলা বন্দুকটা খালি জায়গাটার ভিতর ঢুকাইলাম, পণ্ডশ্রম হইল, ইতি-মধ্যে সব কয়টা ভালুক গাছের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। শুকনা পাতার আওয়াজ শুনি নাই, ভাবিলাম নিকটেই আছে। বন্দুক রেডি করিয়া জনকে মাচানের উপর দাঁড়াইয়া টর্চ জ্বালিতে বলিলাম, তাহার পর আলোর সাহায্যে চার ধার খুঁজিলাম, কোন দিকে তাহাদের দেখিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার ভালুক তো মানুষের নিকট প্রহার খাইয়া অত সহজে পলাইবার পাত্র নয়; তাছাড়া পলাইল কোন দিক দিয়া, জঙ্গলের দিকে পলাইলে পাতার শব্দ শুনিতাম তবে পাকা সড়ক দিয়া পলাইয়াছে। ভয় না পাইলে পাকা সড়ক ধরিবে কেন? ভয় পাওয়া অশোভনীয় নয়, যে ভাবে টর্চের আলো ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে ভড়কানই স্বাভাবিক।

ইহার পর ইসারা অথবা চুপি চুপি কথা বলার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। বড় বাঘ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেও লেপার্ড ভোরের দিকে আসিতে পারে ভাবিয়া ছোট রাইফেলটা 'গন রেষ্টে' সাজাইয়া রাখিলাম। দুই একবার আলোটাও পরীক্ষা করিয়া লইলাম। তাহার পর সিগারেট ধরাইয়া মনের সুখে ধূম পান করিলাম। সিগারেটের শেষ অংশ ভিজা কাপড়ের সংস্পর্শে আনিয়া নিভাইতে যাইব এমন সময় অতি পরিচিত পদধ্বনি ঠিক মাচানের পাশে শুনিলাম। জনকে টিপিয়া সাবধান হইতে বলিলাম সে সঙ্কেতের অর্থ বুঝিল না, সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—"কি"? আমি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলাম—"বাঘ আমাদের অতি নিকটে আসিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে মহিষটার উপর লাফ মারিতে পারে। আমার দোনলাটা লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।" কথাটা শেষ করিয়াছি এমন সময় আর এক পা চলিবার শব্দ স্পষ্ট শুনিলাম। তখন আমি রাইফেল বগলে তুলিয়া লইয়াছি এবং লক্ষ্যের আনুমানিক স্থানের দিকে নল ঠিক করিয়া ধরিয়াছি। গোলমালের পর বাঘের আগমন—ভাবিয়াছিলাম হয়ত বা মামুনডুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হঠাৎ মহিষটা ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল, দু-এক সেকেণ্ডের ঝটাপটি, তাহার পর ভারী ওজন মাটিতে ধপ করিয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল সংযুক্ত টর্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম, সামনেই প্রকাণ্ড বাঘ, অত নিকটেও খুব স্পষ্ট দেখিতেছি না—বাঘ ও মহিষের ঝটাপটিতে যে ধূলা উড়িয়াছিল তাহাতে ঘন ধোঁয়ার মত পর্দ্দা সৃষ্টি করিয়াছে বাঘের মাথাও বিপরীত দিকে ঘোরান, বুক লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিলাম। গুলি খাইয়া বাঘ খাড়া ভাবে লাফাইয়া উঠিল। মাটিতে পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না, ইতিমধ্যে আর একটা গুলি চালাইয়া শিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে চাহিয়াছিলাম। ম্যাগাজিন রাইফেলে গুলি ভরিয়া নিশানা করিবার পূর্ব্বে বাঘ জনের দিকে গড়াইয়া গেল। জনকে অনবরত টিপিতেছি গুলি চালাইবার জন্য, সে বন্দুকের নলটা একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। ইতি-মধ্যে বাঘ তাহারই দিকে আবার আছাড় খাইয়া পড়িল তাহার পর আমাদের মাচানের পিছনে চলিয়া গেল। বেশী দূর যাইতে পারে নাই - আবার পড়িয়া গেল। ইহার পর বার তিন গোঙানি শুনিলাম—পরে কিছুক্ষণের জন্য বনানী অসম্ভব নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দূরে একটি শুকনা পাতা পড়িলেও তাহার আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি—থাকিয়া থাকিয়া হৃদয় ভয়মিশ্রিত উত্তেজনায় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। বেশীক্ষণ এই ভাবে কাটিল না, পাতার শব্দে স্পষ্ট বুঝিলাম বাঘ আবার উঠিয়াছে এবং চলিতেছে। ধীরে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিতে-ছিল কিন্তু শব্দ বিলীন হইবার পূর্ব্বে পুনরায় পতনধ্বনি শুনিলাম—এবার আর সন্দেহ থাকিল না বাঘ মারিয়াছি। জনের দিকে ফেলিয়া বলিলাম—"বাঘ মরিয়াছে।"

আমাদের মধ্যে কন্‌গ্রাচুলেসন্‌স্ এবং থ্যাঙ্কস্‌-এর আদান-প্রদান হইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে শুইলাম। উত্তেজিত হইয়াছিলাম, ঘুম আসিতেছিল না। প্রিয়ার জন্য বাঘের নখ ও দন্তের সাহায্যে নূতন রকমের গহনার ডিজাইন্ মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। আমার কারুশিল্পের দক্ষতা রুচিসম্পন্ন নারীমহলে কি ভাবে প্রচার লাভ করিবে তাহাই ভাবিতেছিলাম। ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী যে শিকারে আমায় বাধা দিবেন না—সে বিষয়ও কতকটা নিশ্চিন্ত যে হই নাই তাহা বলিতে পারি না। চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া আছি, ঘুমও আসিতে চায় না ভোরও হয় না। আন্দাজ তিন ঘণ্টাকাল অর্দ্ধনিদ্রা এবং অর্দ্ধতন্দ্রাগ্রস্ত অবস্থায় কাটিয়া যাইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল—অর্থাৎ যখন গুলি চালাইয়াছিলাম তখন রাত দুইটা হইবে।

অসহিষ্ণু ভাবে সকালের আলোর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। তখন ভোর ৬টা হইবে, দূরে মাল বাহকদের গলা শুনিলাম। রাত্রে গুলি চলিয়াছে, কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া সময়ের আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জনকে চিৎকার করিয়া বলিতে বলিলাম জখুমি বাঘ পড়িয়া আছে, রোদ না উঠিলে যেন এদিকে না আসে। জন মাচানের উপর দাঁড়াইয়া চার ধার ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর বিমর্ষভাবে বলিল—কৈ বাঘ তো নাই। আমি বলিলাম—"পিছন দিকে একটু দূরে পড়িয়াছে, খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।" বাঘ যে মরিয়াছে সে বিষয় আমার কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না, সেই কারণেই অতটা জোর দিয়া বলিতে পারিয়াছিলাম।

সামান্য রোদ উঠিতেই আমি ডবল ব্যারেল গান-এ তিন ইঞ্চি এল জি গুলি পুরিয়া নামিয়া আসিলাম,—জন আমার ছোট রাইফেল লইয়া নামিতেছিল। বারণ করিলাম রাইফেল কোন কাজে আসিবে না। বাঘ যদি এখনও বাঁচিয়া থাকে এবং আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে তো উড়ন্ত স্নাইপ পাখী মারার মত হঠাৎ গুলি চালাইতে হইবে, রাইফেল দিয়া টিপ করিবার সময় পাওয়া যাইবে না। যুক্তিটি বোধগম্য হইতে রাইফেল রাখিয়া নিজের বন্দুকটিরও

টোটা বদল করিয়া ফেলিল। জনকে উপরে থাকিতেই বলিলাম দূরবীন ছাড়া জলটুপি ইত্যাদি কিছু সঙ্গে না লইতে। প্রয়োজন হইলে চোচা দৌড় মারিতে হইবে। আমি জানিতাম বাঘ নিকটেই পড়িয়াছে ১০।১৫ মিনিটের ভিতর খুঁজিয়া পাইব। মাচানের সামনে পতনের স্থানগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—রাইফেল নিজের জাতের মান রাখিয়াছে, যেখানে বাঘ গুলি খাইয়াছিল ঠিক তাহার নিকটে একটি নাতিবৃহৎ পাথরের চাঁই টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। পদ-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে পিছন দিকে গেলাম—যেখানে জন্তুটা বেশ খানিকক্ষণ পড়িয়াছিল। এই স্থান হইতেই রক্তস্রাব সুরু হইয়াছিল—প্রায় ঘটিখানেক রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমাদের মাচানের গাছকে কেন্দ্র করিয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা ছিল, তাহার পরই খাড়া শুকনা ঘাস—একেবারে বাঘের গায়ের রং—উহার ভিতর বড় বাঘ দুই গজের মধ্যে আত্মগোপন করিলে, দিব্য দৃষ্টি না থাকিলে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য কর্ম, রক্তের দাগ ঐ খাড়া ঘাসের দিকেই চলিয়া গিয়াছে।

মাল-বাহক লামবাডীরা নিকটে ছিল। আমাদের পিছন হইতে ঢিল ছুড়িতে বলিলাম—আর আমরা একপা দুইপা করিয়া রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ ঘাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ঘাসের নিকটে আসিতে অবর্ণনীয় আতঙ্কে প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলাম। অশুভ লক্ষণ, জোর করিয়া নিজেকে টানিয়া লইয়া চলিলাম, খানিকটা পথ অতিক্রম করিতে খাড়া ঘাসে রক্তচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রায় তিন ফুট উচ্চ সরল রেখার ন্যায় রক্তের দাগ রাখিয়া গিয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইতে আবার খানিকটা খোলা জায়গা সামনে পড়িল—এইখানে লামবাডীরা দুই একদিন আগে রান্না করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল, শুকনা ছাই ও পোড়া কাঠের টুকরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাঘ এইখানে বসিয়াছিল, নরম ছাইয়ের উপর তাহার চলার ভঙ্গী জনকে দেখাইলাম। বাঁ দিককার পা একেবারে জখম হইয়াছে অর্থাৎ তাহার অস্থি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত পা-টাই মাংসপেশী অথবা চামড়ায় ঝুলিতেছে। চলিবার পথে সামান্য একটি পোড়া কাঠের টুকরা পড়িয়াছিল তাহাও পায়ের সহিত ঘষটাইয়া খানিকটা চলিয়া গিয়াছে—এইখানেই আমার খট্‌কা লাগিয়া গেল। জন আমার আগে ছিল তাহাকে থামিতে বলিলাম, লামবাডীদের ঢিল ছুঁড়িতে বারণ করিলাম। জন নিকটে আসিতে দেখাইলাম হৃদয়ে গুলি লাগে নাই—বাঘের কাঁধের নিকট জখম হইয়াছে। যে জানোয়ার এতটা হাঁটিয়া আসিয়াছে তাহার শক্তিকে অবিশ্বাস করা বাতুলতা, তদুপরি তাহার গন্তব্যস্থান অনতিদূরে পেণ্টার দিকে, ওখানে যেরূপ ঘন বাঁশের ঝোপ তাহাতে এই কয়টি লোক লইয়া অগ্রসর হওয়া ঠিক হইবে না। জনকে বলিলাম জঙ্গলী চঞ্চুদের ডাকো। জনের নিকট হইতে দূরবীন লইয়া আনুমানিক সন্দেহের স্থান লক্ষ্য করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঝোপের তলায় যেখানে আলো পাইতেছি সেখানেই পরীক্ষা করিতেছি যদি তাহাকে পাওয়া যায়। বাঘের স্বভাব তাড়া খাইলে অনেক সময় কোন একটি আড়ালের পিছনে অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহার পর নিরাপদ ভাবিলে এক ঝোপ হইতে অপর ঝোপে বুকে হাঁটিয়া চলিয়া যায়। আমাদের গতি থামিয়া গিয়াছিল—ভাবিলাম এই বার হয়ত নড়িবে—অনুমান ভুল হয় নাই পুনরায় দূরবীন লাগাইতেই দেখিলাম আন্দাজ তিন ফার্লং দূরে বাঘ দাঁড়াইয়াই চলিতেছে এবং বাঁ পা-টা ঝুলিতেছে। রাইফেল নিকটে থাকিলে এবং শুধু চোখে অতটা দূরে নিশানা সম্ভব হইলে এইখানেই বাঘ পাইয়া যাইতাম। মনে মনে হাওদায় চড়া শিকারীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলাম। এখন হাতীর দ্বারা 'বিটিং' করিলে শিকার অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিত? তিনটি লোক চঞ্চুদের ডাকিতে চলিয়া গেল, আমরা জঙ্গলের পাকা রাস্তার ফাঁকায় আসিয়া বসিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরে তিন জনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল সব চঞ্চু বাঁশ কাটিতে কূপে চলিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় বাঘকে ছাড়িয়া গেলে আর উহাকে পাওয়া যাইবে না। জনকে বলিলাম—আমরা যদি এই কয় জনে বাঘের পিছনে যাই তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুব বেশী। তুমি আমার সঙ্গে যাইতে রাজী আছ? জন নিজে একটি বাঘ মারিয়াছিল, তাহার অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত আমাকে বার তিনেক শুনাইয়াছিল, বলিল—মাচান হইতে বাঘ মারিয়াছি সত্য কিন্তু এ যে জখমি বাঘ আর মাত্র দুইটা বন্দুক—তাহার কথা শুনিয়া আমিও দোমনা হইয়াছিলাম—কিন্তু অত বড় বাঘ সচরাচর দেখা যায় না, মারিতে পারিলে··· ভাবিলাম—দিনের বেলা আমার নিশানা ভুল হইলে বন্দুক ধরাও উচিত নয়। লক্ষ্য-ভেদের অহমিকা আমাকে তেজীয়ান্‌ করিয়া তুলিল, উত্তর দিলাম—আমার নিশানা রেষ্ট হাউসে দেখ নাই? তা ছাড়া সঙ্গে দোনলা রহিয়াছে—তোমার কাছে আর একটা বন্দুক, বাঘ তিনটা গুলি হজম করিয়া ফেলিবে?

আমার তাগমারীর কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে সত্যই জন মনে বল পাইল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন।

সড়ক দিয়াই চলিতে লাগিলাম, কিন্তু জনকে পাশের খাড়া ঘাসের দিকে নজর রাখিতে বলিলাম। অনেক সময় বাঘকে সামনে দেখা গেলেও শিকারীর অলক্ষ্যে কেমন করিয়া পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং আক্রমণ করে। বলিয়া দিলাম পাশের খাড়া ঘাস দূরে অথবা নিকটে নড়িতে দেখিলেই বুঝিবে বিপদ সন্নিকট।

পূর্ব্ববর্ণিত ঝোপের নিকটে আসিতে বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছিল। ক্রমান্বয়ে হৃৎকম্পন দারুণ ভাবে বাড়িয়া চলিল—আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িতেছিলাম পাছে মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে—ঝোপের আরো নিকটে যাইতে উভয়ে প্রস্তুত হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম—যে ঝোপ দূরবীন দ্বারা পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলাম সেইখান হইতে বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—তাহার পরই ঝোপের বিপরীত দিক মৃদু দুলিতে দেখিলাম—বাঁচা ও মরার মীমাংসা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়া যাইবে—আমি ঝোপের

দিকে তাকাইয়া আছি এমন সময় জন গুলি চালাইয়া দিল—ফিরিয়া দেখি কতকটা আমাদের পিছন দিকে খোলা জায়গায় একটি উঁচু টিলার অপর পার্শ্বে বাঘ গড়াইয়া পড়িয়া গেল। জন ও বাঘের মাঝে যে ব্যবধান ছিল তাহা দুই শত গজের উপর হইবে তো কম হইবে না। জন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, নিকটে আসিয়া বলিল—তাহার গুলিতে বাঘ মরিয়াছে। আমিও খুশী হইয়া উঠিয়াছিলাম—বাঘটা শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল—খানিকটা অগ্রসর হইতেই সাধারণ এল জি টোটা ও বন্দুকের পাল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম, জনকে হাতছানি দিয়া তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিতে বলিলাম। আমার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দেখিয়া লোকগুলি কি ভাবিয়াছিল জানি না—জন নিকটে আসিতে বলিলাম—তোমার গুলিও লাগে নাই বাঘও মরে নাই। সাধারণ এল জির পাল্লা অতটা হইতে পারে না—গুলি যদি ওখানে পৌঁছাইয়া থাকে তো মাটিতে গড়াইয়া গিয়াছে। বাঘ তিন পায়ে চলিতেছে কোন কিছুতে ঠোকর খাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে—এখন ফের। জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। আমাকে একজন পরশ্রীকাতর ব্যক্তিও ভাবিয়া থাকিতে পারে।

বেলা এগারটার কাছাকাছি। ইতিমধ্যে রাস্তা তাতিয়া উঠিয়াছে। পেণ্টা হইতে রেষ্ট হাউস প্রায় চার মাইল পথ পাড়ি দিতে হইল। রেষ্ট হাউসে ফিরিতেই অনুভব করিলাম মাথাটা বেশ ধরিয়াছে—তথাপি নিজ হাতে মারা বাঘের লোভ সামলাইতে পারিলাম না, রেঞ্জারকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি লোকজন সংগ্রহ করিয়া বৈকালে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বেলা বাড়ার সহিত শরীর উষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, ম্যালেরিয়া যে ধুম করিয়া আসিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। বৈকালে আমার যাওয়া হইল না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রেঞ্জার আমার দোনলাটা লইয়া জন সহ সদলবলে চলিয়া গেলেন। বেলা পড়িয়া আসিতে দুই বার বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম, জঙ্গলে গুলি চলিলে চার-পাঁচ মাইল দূর হইতে শব্দ শোনা যায়। উদ্‌গ্রীব হইয়া খবরের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম, সন্ধ্যার আগেই সকলে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে বাঘ নাই। কোথায় গুলি লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিতে রেঞ্জার সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তিনি বাঘকে গুলি মারেন নাই, শূন্তে আওয়াজ করিয়াছিলেন—জন্তটাকে বাহির করিয়া আনিবার জন্ত—বাঘ বাহির হয় নাই তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিয়া সব লোক পলাইয়া আসিয়াছিল। পরে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কাল অফিসার ভাল থাকিলে নিজে গিয়া চেষ্টা করিতে পারেন। আজকালকার দিনে দুইটি তিন ইঞ্চি এল জি টোটা শূন্তে উড়াইয়া দেওয়া! তদুপরি অম্লান বদনে যাহাকে বাঘের পিছনে ধাওয়া করিবার প্রস্তাব করিলেন সে তখন জ্বরে ধুঁকিতেছে। সকালেই চঞ্চুদের পেণ্টায় পাঠাইয়াছিলাম তাহারা ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—বাঘ পলাইয়াছে। বাঘের বুদ্ধির তারিফ করিতে হইল।

দুই দিন জ্বরের সহিত বোঝাপড়া করিয়া তৃতীয় দিনে 'হেড কোয়ার্টাসে' ফিরিয়া আসিলাম। দেহ মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—মাদ্রাজে ফিরিবার বন্দোবস্ত করতেছি। ইহারই ভিতর একটি সুখবর আসিয়া পৌঁছিল—বড় বাঘ ডিগুভামেটার নিকটেই সরকারী রাস্তার উপর কয় দিন ধরিয়া চলাফেরা করিতেছে। সঙ্গে দুইটি বড় বাচ্চাও আছে। স্থানীয় শিকারী উপদেশ দিল একটু দূরে গেলে তিনটি রাস্তার সঙ্গমস্থল, ঐ মওড়ায় মহিষ বাঁধিলে—যে দিক দিয়াই বাঘ চলুক না কেন মহিষকে মারিবেই। প্রস্তাবটি ভালই লাগিল, অনিশ্চিত live baitএর উপর বসিবার উৎসাহ অথবা ক্ষমতা ছিল না, বলিলাম—মহিষ ঐখানেই বাঁধা হউক যদি মারে তো কিল্-এর উপর বসিব—এখন মাচান বাঁধার কোন দরকার নাই।

যেরূপ কপাল লইয়া শিকারে আসিয়াছিলাম, তাহাতে কোন আশাই পোষণ করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। দুই দিন কাটিয়া গেল, বাঘ মহিষকে মারিল না, বিরক্ত হইয়া রেঞ্জারকে বার্থ রিজার্ভ করিবার জন্ত বলিয়া পাঠাইলাম—দুই দিন পরেই রওনা হইব। ভাবিতেছিলাম আমার ব্যর্থতার অজুহাত লইয়া বেদরদীরা বলিয়া বেড়াইবে বাঘ শিকার একটা বাজে কথা—আসলে লেখার সখ মিটাইবার জন্ত জঙ্গলে যায়! গভীর অরণ্যে রাতের বেলা বাঘের সামনে মুখোমুখি হইয়া গুলি চালান চারটিখানি কথা? বেদরদীরা কি জানে আমি যেভাবে শিকার করি তাহা নিরবচ্ছিন্ন ভাগ্যের ব্যাপার। এ দিক দিয়া হাওদায় চড়া শিকারীরা কতটা বেশী সুবিধা পায় তাহা অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রেই জানেন। এ বিষয় বেশী লিখিয়া নিজের দুর্ভাগ্য অধিকতর পীড়াদায়ক করিয়া তুলিতে চাই না।

পরের দিন সকালে বসিয়া আছি এমন সময় একটি লামবাডী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাঘ মহিষকে মারিয়াছে এবং বাঁধন ছিঁড়িয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া রেঞ্জারকে ডাকিতে বলিলাম। তিনি আসিতে, লোক জন দিয়া মহিষটাকে পুনরায় যেখানে মারিয়াছিল সেখানেই আমার ইস্পাতের নমনীয় তার দিয়া বাঁধিতে বলিয়া দিলাম এবং মরা মহিষের নিকটেই মাচানের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার জানাইয়া দিলাম।

বেলা পড়িতে ছোট রাইফেল এবং দোনলা বন্দুক লইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিলাম। গম্যস্থল নিকট হইলেও হাঁটিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

মওড়ায় পৌঁছিয়াই মরা মহিষটাকে কি ভাবে বাঘ খাইয়াছে পরীক্ষা করিলাম। পিছন দিককার একপাশ সব নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে. সন্দেহ রহিল না যে বাঘেই মারিয়াছে—(লেপার্ড সামনের দিক হইতে খাইয়া থাকে) কিন্তু মাচানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দমিয়া গেলাম, অত্যন্ত নীচু। আক্রমণ কালীন

বাঘকে কষ্ট করিয়া লাফাইতে হইবে না, সামনের পা বাড়াইয়া সমস্ত মাচানটা মাটিতে নামাইতে পারে, একেবারে পল্‌কা গাছ। এখন আর ওকথা ভাবিয়া লাভ নাই। জনকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহাকে জল ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া আগে উঠিতে বলিলাম। আড়ালের পাতাগুলি যথাসম্ভব ঠিক করিয়া বেলা থাকিতেই মাচানে গিয়া বসিলাম।

বৈকাল হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণায় মেঘ জমিতেছিল। হাওয়ার গতিও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—ঝড়ের পূর্ব্বসঙ্কেত। অল্পক্ষণ পরেই জোর হাওয়া থামিয়া গিয়া গুমট আসিয়া পড়িল। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ হনুমান আতঙ্কের ডাক সুরু করিয়া দিল। এবার আর রাইফেল নয়, দোনলাটা লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাঘ গর্জ্জন করিয়া অভুক্ত খাদ্যের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকনা কাঠ মচকাইয়া যাইবার মত মহিষের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। বাঘ মহিষটাকে ধরিয়াই টান মারিয়াছিল, তারের দড়ি ছিঁড়িতে পারে নাই; হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পরক্ষণে টর্চের সুইচ টিপিতেই তীব্র আলোকে চক্ষু দুইটি অগ্নি-গোলার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—মাথাটা সামনেই পাইয়াছিলাম—মধ্যস্থল লক্ষ্য করিতে কিছু মাত্র অসুবিধা হয় নাই। গুলি খাইয়াই বাঘ আগের মত লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর বার বার আছাড় খাইতে খাইতে জলের দিকে কোন কঠিন বস্তুর উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। তাহার সহিত দীর্ঘ গোঙানি শুনিলাম। একটু সময় কাটিতে যেখানে বাঘ পড়িয়াছিল তাহার অতি নিকটে হনুমানগুলি জড় হইয়া অনবরত ডাকিয়া চলিল। সন্দেহ রহিল না বাঘের চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছে। না মরিয়া থাকিলেও বেশীক্ষণ আয়ু নাই।

রাত বাড়িয়া চলিয়াছে, গুমট কাটিয়া শীতল জলীয় হাওয়ার আভাস পাইতেছি। ক্রমে হাওয়ার বেগ ঝড়ের আকার ধারণ করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া যে দমকা হাওয়া আসিতেছিল তাহাতে নাগর-দোলার মত মাচানের উত্থান-পতন সুরু হইয়াছে,—গতিক সুবিধার নয়। জনকে বলিলাম তোমার বন্দুকের ট্রিগার ঠিক করিয়া রাখ। জন উত্তর দিল তাহার বন্দুক মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। আর একটি ফাঁড়া কাটিয়া গেল। পতনকালীন রেডি ট্রিগার কোন কিছুর সহিত সংঘর্ষিত হইলে টোটা ফাটিতে এবং নলের মুখ আমাদের দিকে থাকিলে—বাঘের সহিত আমাদের মধ্যে কেহ শিকার হইয়া যাইত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি এমন সময় দূরে বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ শুনিলাম। বায়ু দারুণ বেগে আমাদের নিকটে চলিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে মাচান যেন গাছের উপর মোচড় খাইতে লাগিল। কপালগুণে মাচানের ভিতরেই একটি মোটা ডাল ছিল তাহা আঁকড়াইয়া না ধরিতে পারিলে ঝাঁকুনিতে নীচে পড়িয়া যাইতাম। ঘোর অন্ধকার, অনতিদূরে আহত শার্দ্দুল, তাহার সামনে মানুষ নিরস্ত্র অবস্থায় পড়িলে ঘটনাটি কি রকম দাঁড়াইত সহজেই অনুমেয়। কিছু কাল পরে ঝড় কাটিয়া গেল—আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে ক্ষীণ চাঁদের আলো পাইলাম।

ভোর হইতেই জন পাশের পাতা সরাইয়া ফেলিল। সুপ্রভাত, বাঘিনীর ভয়াল মূর্ত্তি অসাড় ভাবে পড়িয়া আছে, অধিকতর হিংস্র-জীবকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য। নীচে নামিয়া লক্ষ্যের স্থান পরীক্ষা করিতে আবিষ্কার করিলাম, আমার নিশানার জয়টীকা চক্ষু দুইটির ঠিক মধ্যস্থলে রক্ত রঙে রঙীন হইয়া আছে। বাঘিনীর আসিবার পথে বাচ্চার পায়ের দাগ খুঁজিলাম—পাওয়া গেল না। ফরেষ্ট আপিসে রিপোর্টের নিমিত্ত বাঘিনীর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপিলাম—লম্বায় নয় ফুট ছয় ইঞ্চি, লেজের ডগা হইতে নাকের ডগা পর্য্যন্ত উচ্চতা তিন ফুট চার ইঞ্চি। মহিলার পক্ষে আকারটি ছোট নয়।*

* এবারকার শিকারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা অস্ত্র সম্বন্ধে সতর্কতা। নিকট হইতে বাঘ ভালুক শূকর স্যামবার ইত্যাদি নরম চামড়ার জন্তু মারিতে হইলে রাইফেল অপেক্ষা দোনলা বন্দুক অধিকতর সুফলদায়ী। রাইফেলের গুলি মাথায় অথবা হৃদয়ে না লাগিলে—বাঘ আঘাত পাইয়াও আক্রমণ করিতে পারে কিন্তু lethel ballএ কখন এরূপ ঘটনা ঘটে না। দ্বিতীয়, শিক্ষিত বাঘ না হইলে মানুষের কথা, আলো, গোলমাল কিছুই ভয় করে না এবং তাহার শিকারের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ও নাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীকরুণাময় বসু

ভারতের ভাগ্যাকাশে নির্বাপিত শেষ সূর্য আজি,
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অস্তমিত, এই ধ্বনি বাজি
উঠিয়াছে দিগন্তরে ; আর্তকণ্ঠে ডাকে যাত্রীদল,
তটপ্রান্তে লুপ্ত রেখা, পথভ্রান্ত তরী টলমল।
বর্ষণকরুণ মুখে সুধাস্নিগ্ধ শরতের হাসি,
সতেজ শ্যামল দান চিরদিন উঠেছে বিকাশি
হৃদয়ের বন্ধ্যাশাখে ; প্রাণ তাই পুষ্প মুকুলিত,
আকাশে আলোর লীলা, রঙে রঙে মন লীলায়িত।
স্থায়নিষ্ঠ সত্যবিদ, বিজ্ঞানের জ্ঞানের আধার,
মানবের চিত্তপটে মুছিয়াছ ছায়ার আঁধার
সুদূরের রশ্মি ফেলি ; চিরভোলা হে মহা-পথিক
এক বার ফিরে চাও, এ দুর্দিনে আলো দেখা দিক।
দরিদ্র দরদী বন্ধু, হে তপস্বী, কর্মক্লান্ত বীর !
যাও তুমি ফিরে যাও, ডাকিতেছে ছায়া সন্ধ্যানীড়।
সুষুপ্তির শান্তি-স্বর্গে ; আজ হ'তে শতাব্দীর পথে
তোমার অমৃত রূপ রেখে গেলে মৃত্যুর জগতে,
দেহ হীন ভাব মূর্তি অচঞ্চল স্বপ্ন-স্বর্গ-তটে ;
তুমি নাই, তুমি আছো মানুষের কল্পনার পটে।

মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য সংবাদ

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

বিহার এবং উড়িষ্যাবিজয় মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের পটভূমি-স্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। শরণগড় দুর্গে অবরুদ্ধ- উড়িষ্যার হিন্দু-মুসলমান ভূমিয়াগণের যুদ্ধ, খুরদার রাজা রামচন্দ্রের প্রতি মানসিংহের অবিচার, আকবর বাদশার আদেশে মানসিংহ কর্ত্তৃক স্বীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা আকবর-নামা ও অন্যান্য সমসাময়িক ইতিহাসে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা কাব্য এবং জনশ্রুতিমূলক মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য বিষয়ক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক আলোচনা করিব। বাঙালী মানসিংহ অপেক্ষা প্রতাপাদিত্যকে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন—বিশেষতঃ স্বর্গীয় ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র। সুতরাং এ প্রবন্ধে প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ অবতারণা অপরিহার্য্য।

প্রতাপাদিত্যের বংশ-পরিচয় এবং বাল্যজীবন যশোর-খুলনার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। মোগল দরবারের সহিত প্রতাপাদিত্যের যেটুকু সম্বন্ধ আমরা শুধু সেটুকুরই সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যুবক প্রতাপ শঠতাক্রমে খুল্লতাত বসন্ত রায়কে ঠকাইবার জন্য নিজের নামে বাদশাহী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য জনশ্রুতি মাত্র। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বপ্রথম কোথায় এবং কেন সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল মোগল দরবারী ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ঘটকপঞ্জী, ভারতচন্দ্রের কাব্য, ক্ষিতীশবংশাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত কিংবা বাংলায় যাহা কিছু মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য সংবাদ বর্ণিত আছে সবই পরবর্ত্তী কালের বিকৃত জনশ্রুতি এবং উদ্ভট কল্পনার সমাবেশ মাত্র। সতীশচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস রচনায় "বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণের প্রতিবন্ধক" একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় (যশোহর-খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) নিয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতামত খণ্ডন পণ্ডশ্রম মাত্র। ৺নিখিলনাথ রায় সম্বন্ধে প্রায় ঐ কথাই বলা যায়—তবে অনেক মৌলিক উপাদানের জন্য আমরা তাঁহাদের কাছে অশেষ প্রকারে ঋণী।

মানসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী তথাকথিত "বাইশ আমীর" প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ৺নিখিলনাথ রায় যুক্তিসঙ্গতভাবে ঐ কাহিনী অবিশ্বাস করিয়াছেন (প্রতাপাদিত্য, পৃ. ১৫৮-১৫৯)। অন্নদামঙ্গল কাব্যের "বাইশ লস্কর সঙ্গে" উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সম্ভবতঃ নিখিলনাথ অনুমান করিয়াছেন এই "বাইশ আমীর" বোধ হয় মানসিংহের সঙ্গেই প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অভিযান করিয়াছিলেন। মানসিংহের সহিত বাইশ কিংবা ততোধিক আমীরের উপস্থিতি কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে; কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে এই বাইশ আমীরের অনুসন্ধান নিছক গরু-খোঁজা ব্যাপার মাত্র। আমাদের মতে মানসিংহের সহিত কস্মিন্ কালে আদৌ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয় নাই এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় এরূপ সংঘর্ষের সম্ভাবনাও ছিল না।

কথাটা কিছু নূতন নহে। বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় Bengal Chiefs' Struggle for Independence প্রবন্ধ-পর্য্যায়ে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভট্টশালী মহাশয়ের যুক্তি-প্রমাণ নিখুঁৎ; নিখিলনাথ রায় শ্রেণীর লেখকের উপর তিনি একেবারে খড়্গ-হস্ত। তবে মনে হয় তিনি একটু অতিরিক্ত অসহিষ্ণু; তাঁহার দৃষ্টিপ্রসার একটু অনুদার—প্রতাপকে তিনি মোগল সুবাদারগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত, এমন কি দেশদ্রোহী বলিতেও দ্বিধা করেন নাই।

বাঙালী লেখকগণের মধ্যে ৺রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" পুস্তকে লিখিত আছে মানসিংহ যখন সসৈন্যে পাটনা হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন তখন প্রতাপাদিত্যের আমন্ত্রণে যশোরে গমন করিয়া মৌতালার দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা হয়ত সত্য ঘটনা নয়। কিন্তু "সিংহ রাজার সহিত প্রতাপের অধিক অন্তরঙ্গতা" ঐতিহাসিক সত্য। প্রতাপাদিত্য কিংবা যশোরের কোন হিন্দু জমিদার মানসিংহের সহিত উড়িষ্যা অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন—এই কথা আকবরনামায় পাওয়া যায় না। কিন্তু গোপালপুরের সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি "গোবিন্দদেব", উক্ত বিগ্রহের সহিত আগত সেবাইৎ বল্লভাচার্য্য, উৎকলেশ্বর শিব—এই সমস্ত প্রতাপাদিত্য কোথা হইতে পাইলেন? সুতরাং দরবারী ইতিহাসে

না থাকিলেও আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সহিত উড়িষ্যা অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন, এবং খুরদার রাজা রামচন্দ্রের সহিত সন্ধির পর লুটের অন্যান্য মালের সহিত যশোরে আনিয়া মহাসমারোহে বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং সতীশ মিত্র মহাশয়ের পরিশ্রম এক্ষেত্রে সফল হইয়াছে। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২৫৫)

কিন্তু আসল কথা, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ, ভবানন্দ মজুমদারের সহিত বাদশাহের সাক্ষাৎকার, মজুমদারের রাজ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার। "যশোরজিৎ" রাঘব রায় দেশদ্রোহী, জাতি-দ্রোহী হইয়া ইসলাম খাঁ চিশতীর সৈন্যদলে সম্ভবতঃ যোগ দিয়াছিলেন, প্রতাপের পতনের পর বাংলার সুবাদার-গণের নিকট হইতে ভবানন্দ মজুমদার হয়ত জমিদারীর কোন পরওয়ানা বা নিশান পাইয়াছিলেন—কিন্তু মান-সিংহের শাসনকালের সহিত উক্ত ঘটনাবলী জড়িত করিয়াই ইতিহাসমূলক জনশ্রুতি পরবর্ত্তীকালে বিকৃত হইয়াছে। জনশ্রুতির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকার না করিলে ইতিহাসের অঙ্গহানি ঘটে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি কমল খোজা বা খাজা কামাল উদ্দীন খাঁর পরিচয় একমাত্র 'বাহারিস্থানে'ই পাওয়া যায়; জাহাঙ্গীরের সমকালীন অন্য কোন মুসলমান ইতিহাসে নাই। আজ পর্য্যন্ত যদি বাহারিস্থান অনাবিষ্কৃত থাকিত তাহা হইলে অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিকপন্থী ঐতিহাসিকগণ হয়ত কমল খোজাকে কাল্পনিক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়া প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে বাদ দিয়া বসিতেন। সূর্য্যকান্ত গুহ ইত্যাদি প্রতাপের হিন্দু সেনাপতিগণের নাম জনশ্রুতিমূলক কারিকা অপেক্ষা প্রাচীন কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না—এই অজুহাতে তাঁহাদিগকে ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া অবিচার মাত্র। কিন্তু "নামূলাঃ জনশ্রুতিঃ" এই দুর্ব্বলতা বিচারের সীমারেখা অতিক্রম করিলেই ইতিহাস উপন্যাস হইয়া পড়ে। "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে"র ত্রিংশ এবং একত্রিংশ পরিচ্ছেদ এই কারণেই উপন্যাস বলিয়া উপেক্ষিত। "ক্ষিতীশ বংশা-বলী"কে ইতিহাস ভ্রম করিবার কোন হেতু আছে কি না উহার আলোচনা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

নূতন পরিচ্ছেদ

কটকের সন্ধির পর ওসমান প্রমুখ পাঠান সর্দ্দারগণ উড়িষ্যা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা মানসিংহ সরকার খেলাফতাবাদে (বর্ত্তমান যশোর-খুলনা জেলায়) তাঁহাদের জায়গীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠানেরা সপ্তগ্রাম অতিক্রম না করিতেই মোগল সুবাদার হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ শিবিরে তলব করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠানগণ মানসিংহের অন্য দুরভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আবার বিদ্রোহী হইল এবং লুটতরাজ করিতে করিতে ভূষণা বা ফরিদপুর জেলায় উপস্থিত হইল। শ্রীপুরের প্রবল-পরাক্রম ভূঁইয়া বৃদ্ধ কেদার রায়ের পুত্র চাঁদ রায় পদ্মার দক্ষিণ তীরে সরকার ফতেহাবাদ বা বর্ত্তমান ফরিদ-পুর জেলা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধিকার করিয়া ভূষণা দুর্গে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যা হইতে নির্ব্বাসিত ওসমান প্রভৃতি পাঠানগণকে স্বীয় রাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়া পরে তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। আবুল ফজল সংক্ষেপে ঘটনা বর্ণন করিয়াই দায়মুক্ত হইয়াছেন। রাজা মানসিংহ প্রথমে ওসমান প্রভৃতি পাঠানগণকে কেন ভূষণা বাক্‌লা (বরিশাল), এবং যশোর-খুলনার হিন্দু জমিদারত্রয়ের রাজ্যের প্রত্যন্ত ভাগে জায়গীর দিয়াছিলেন এবং পরে কেনই বা মত পরিবর্ত্তন করিলেন; পাঠানগণের প্রতি চাঁদরায়ের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে রাজা মানসিংহের কোন প্ররোচনা ছিল কিনা—কোন ঐতিহাসিক এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করেন নাই। অথচ মনে হয় এই অজ্ঞাত মনস্তত্ত্বের পশ্চাতে অনেকখানি ইতিহাস আছে।

অসাধু তারিণী সাধু

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাধু বলিয়াই যে লোকে তাহাকে সাধুবাবা বলিত তাহা নহে—সাধু বলিবার পারিপার্শ্বিক কারণ ছিল। মাথায় সাদা লম্বা বাবরী চুল, পাকা দাড়ি, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র—তাহার উপর তারিণী মুখুজ্জে মশাই চির-কুমার। একাকী একটি বনঢাকা বাড়ীতে বাস করেন, সম্পত্তির মধ্যে দেড় বিঘা খামার জমি ও এই বাড়ীখানি—উভয়ই পৈতৃক।

তারিণী সাধু যে মিথ্যা গল্প, কেবল মিথ্যা নহে অবিশ্বাস্য এবং অলৌকিক রকমের গল্প করিয়া থাকেন তাহা সকলেই জানিত—

তাঁহার এই মিথ্যা গল্প শুনিতে সকলে বিরক্ত হইত, কারণ মিথ্যা জানিয়া গল্প শোনা যায় না; কিন্তু আমার কেন যেন এই লোকটিকে ভাল লাগিত। গল্পে তাঁহার অসঙ্গতি থাকিত, অনেক সময়ে অপ্রাসঙ্গিকও হইত কিন্তু যে জন্যই হউক আমি তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইতাম। লোকে তাঁহাকে ঠাট্টা করিত, তিনিও জানিতেন লোকে তাঁহাকে ঠাট্টা করে।

জীবনপ্রণালী তাঁহার খুব সরল।

যেদিন কোথায়ও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন রাঁধিবার বালাই নাই, নইলে প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর দোর ঝাঁট দিয়া ছিপ হাতে মাছ ধরিতে যান। সামান্য মাছ ধরিয়া আনিয়া, বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরিয়া কিছু তরকারী সংগ্রহ করেন, তাহার পর একটু চা পান করিয়া রান্না আরম্ভ করেন। পরে হয়ত বাগানে একটু কাজ করিয়া স্নান আহার করিয়া নিদ্রা দিলেন। নিদ্রান্তে একটু অহিফেন এবং সন্ধ্যায় পাইলে একটু গাঁজাও সেবন করিতেন—এই সময়টিতে কোন জায়গায় একটু আড্ডা দিবার প্রয়োজন হইত। গল্প বলিবার জন্যই বেশী, শুনিবার জন্য নহে।

পাড়ার লোকে বিরক্ত হইয়াছিল, গল্প শুনিত না। আমরা নারিকেল, কুল, কলা প্রভৃতি পাইবার লোভে বৈকালে সমবেত হইতাম, তিনি গল্প করিতেন। গল্পগুলি একান্তই অবিশ্বাস্য—

একদিন গল্প বলিলেন—তিনি শহরে বেড়াইতে গিয়াছেন, ডেপুটিবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন হঠাৎ দেখা। সাধু বলিলেন—চল্ বাড়ী চল্। ডেপুটি বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—কোথাকার পাগল, যাও এখান থেকে। উত্তরে তিনি বলিলেন—বটে! এক চড়ে সিধে ক'রে দেব—চল্—বাড়ী চল্। তোর মার নাম সুবাসিনী নয়? ডেপুটি বাবু একটু চমকাইয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন—চল্—বাড়ী চল্, আজকাল ছেলেরা এমনি বাঁদরই হয়েছে। বাড়ী আসিতেই ডেপুটি-মাতা গড় হইয়া প্রণাম, যেহেতু তিনি তাঁহাদের কুলপুরোহিত, তৎপর ডেপুটিবাবুর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা এবং ভূরি ভোজন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গল্পের সাক্ষ্য হিসাবে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরও নাম করিলেন কিন্তু নিষ্প্রয়োজন বোধে কেহ তাহার মোকাবিলা করে নাই।

আর এক বার একটি ঘটনা মনে পড়ে, আমি একটু বেকুব হইয়াছিলাম—তখন আমি কলিকাতায় বি-এ পড়ি। আমাদের বৈঠকখানায় কয়েকজন লোকের সম্মুখে গল্প হইতেছিল—কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে, এমন সময় তারিণী সাধু কহিলেন—ও সে আমাকে যে সম্মান করে, অত বড় লোক হয়েও তার মনে এতটুকু গর্ব্ব নেই। সেবার যাচ্ছি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে হঠাৎ দেখি একখানা বড় মোটর সামনে এসে থাম্‌ল। প্রণাম করে সে বললে, বাড়ীতে চলুন, আপনি এখানে খবর দেন নি।

যে লোকটির সম্বন্ধে এই গল্প বলা হইল তাহার পক্ষে এইরূপ সাধুপ্রীতি একেবারেই অসম্ভব, অতএব সকলে হাসিয়া উঠিল। তারিণী সাধু হঠাৎ বলিলেন—কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? এই জয়ন্ত আমার সঙ্গে তখন ছিল—

সকলে আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি হে তুমি ছিলে নাকি? উনি ত ক'লকাতায়ই যান নি কখনও—

আমি চুপ করিয়া রহিলাম—এই লোকটিকে এত লোকের সমক্ষে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিতে আমার কেমন যেন দ্বিধা করিতেছিল। আমি নিরুপায় হইয়া কোলাহলের মাঝে পলাইয়া আসিলাম। তথাপি কেন যেন অসাধু সাধুবাবার জন্য আমার একটি দুর্ব্বলতা ছিল।

বৈশাখের প্রথম হইবে। নির্মেঘ আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে—সমস্ত গ্রামখানি আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সাধুবাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—সাধুদাদা আছেন?

—এস এস ভায়া—তিনি উঠানে বঁটি পাতিয়া বসিয়া ঝাঁটার জন্য নারিকেলের পাতা ছাড়াইতেছিলেন। একটু পুলকিত হইয়া বলিলেন—তোমরা এস না একেবারেই, ছোট বেলায় কত আস্‌তে, কত কুল খেয়েছ। বসো একটু গল্প করি।

অবান্তর গল্পের ফাঁকে আমি প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা দাদা, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

—কেন? শুন্‌বি? সে অনেক কথা—

—বলুন না।

—বিয়ে করিনি বুঝলি কেমন ক'রে? বউ দেখতে পারিস না তাই?

—শুনিছি, কোন কালেই ত বিয়ে আপনি করেন নি।

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ঠিকই শুনেছিস্। আমার বউয়ের কান্না দেখিস নি তাই ত? কিন্তু কান্নাহীনও ত থাক্‌তে পারে…

—সে কেমন?

—শুন্‌বি? আচ্ছা বস বলি। বস এই পিঁড়িখানায়। তারিণী-দা বলিয়া চলিলেন…

দ্যাখ্ মানুষে দুই বার তিন বার বিয়ে যে কেমন ক'রে করে তাই বুঝি না। মানুষ কি দুই বার ভালবাসতে পারে? তাই আর কারাকে ভালবাসা চলে না। তিনি হঠাৎ একটু থামিলেন, আমি একটা ব্যর্থপ্রেমের ইতিহাসের আশায় উদগ্রীব হইয়া ভাল করিয়া বসিলাম। তিনি আবার বলিয়া চলিলেন, ওই যে পূব পাড়ায় চাটুয্যেদের ভিটে, ওদের বড় ভাই ছিল শশী আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তার মেয়ের নাম ছিল কমল, দেখতেও পদ্ম ফুল। ওই যে মজা পুকুর, ওখানে আমি বড়সী নিয়ে রোজ যেতাম, বড় বড় কই মাগুর পেতাম। কমলের বয়স তখন পনর হবে, আর আমার ধর্ পঁয়ত্রিশ। ঘাটের পাশে বসতাম, ও দেখি রোজই বার বার ঘাটে আসতো আর জলে ঢেউ দিয়ে তামাসা করত। বলত দাদু কি পেলে? শশী আমাকে কাকা বলে ডাকতো কিনা। এ পাড়া ও পাড়া থেকে সকলে এসে বলত, কমল ত তোমাকে বিয়ে করবার জন্ত পাগল তারিণী। আমি হাসতাম, আমি বলতাম—কি করব? আমার কি বিয়ে করলে চলে?

আমি প্রশ্ন করিলাম—কেন?

আমার সাধন-ভজনে ব্যাঘাত হয়। তখন ত সাধন সবে আরম্ভ করেছি—তারিণী-দা একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কহিলেন—এক দিন সন্ধ্যায় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। আমি ছিপ গুটিয়ে ফিরে

আসছি, তখন পুকুর-পাড়ে বেশ অন্ধকার জমে উঠেছে। কমল কোথা থেকে ফস করে এসে বললে দাদু একটা কথা আছে। কি? আমার একটা কথা রাখবেন? রাখবার হয়ত নিশ্চয়ই রাখবো। সে আমার হাত ধ'রে বললে—আমাকে গ্রহণ করুন। আমার বড় দয়া হ'ল। ঠিক না ব'লতে পারলাম না, বললাম—আচ্ছা কাল ভেবে বলব। সারারাত্রি ভাবলাম, আমার সাধনাই বড় না কমলই বড়, কিন্তু কিছু হ'ল না সাধনার দাঁড়িপাল্লাই ভারী হ'ল। পর দিন ইচ্ছা করেই সন্ধ্যার একটু পরেও ছিপ নিয়ে বসে রইলাম, হ্যাঁ কমল ঠিক এল। আমি বললাম—তা হয় না কমল। সাধন ভজন ত ত্যাগ করতে পারি না। সে আমার পায়ের উপর ঠস ক'রে পড়ে বললে—আপনি গ্রহণ না করলে আত্মহত্যা করব। আমি তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম—দুঃখ করিস নে ভাই, আমার সাধন জোরে তুই সব ভুলে যাবি। কমল কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল—

তারিণী-দা একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া চুপ করিলেন,—মনে হইল কমলের অশ্রুপ্লুত মুখখানি স্মরণ করিয়া আজও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি প্রশ্ন করিলাম এরকম দুঃখ দেওয়া কি আপনার পুণ্য হ'ল?

তারিণী-দা একটু বিমনা হইয়া কহিলেন—তাই ভাবি। এই পাপেই বোধ হয় সাধনও গেল—

নির্জ্জন বাড়ীখানা যেন রোরুদ্যমানা কমলের দীর্ঘশ্বাসে বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল—আমি আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।

বাড়ীতে আসিয়া দেখি বৈঠকখানা সরগরম—কে যেন ব্যঙ্গ করিল, এস হে তারিণীসাধুর চেলা। বৃদ্ধ খুড়া মহাশয় বলিলেন—কি বাবাজী, সাধুবাবার আখড়ায় নাম লিখিয়েছ। কি গল্প শুনলে? সকলেই তারিণীসাধুর কুৎসা করিবার জন্ত যেন ব্যাকুল। সকলের অনুরোধে কমল-তারিণী কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

খুড়া মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ সবই প্রায় ঠিক ঠিক শুনেছ, একটু গলদ আছে।

তিনি পুরাতন লোক, এ-কাহিনীর সত্যতা জানেন, তাই সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিল, গলদ কি?

খুড়া মহাশয় বলিলেন—কমল যে ওকে বিয়ে করতে পাগল ঐ পাড়ার লোকে এ কথা সত্যিই বলত। আমরাও বলতাম—কারণ উনি একটু বিয়ে-পাগলা ছিলেন, আমরা ওঁকে ঐ বলে নাচাতাম কিন্তু তার ফল ভাল হ'ল না।

—কেন?

—উনি মাছ ধরে ফিরবার পথে এক দিন কি যেন বললেন, তাতে কমল বেশ কিছু তিরস্কার করল। তাতেও উনি থামলেন না। কমল ওর পা ধরে নি, উনিই কিছু বলে থাকবেন, কমল চেঁচিয়ে ওঠে, উনি বেত-বাগান ভেঙে পালিয়ে আসেন। কিন্তু শশী আর তার ভাই ছিল রীতিমত জোয়ান। এক দিন তারা খুড়ো মশায়কে আদর ক'রে ডেকে নিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করে গুঁদোর কাঠের রুল দিয়ে বেশ করে অঙ্গসেবা করে দিল—ওর সোনার বরণ কয়েক দিন একেবারে বেগুনে হয়ে রইল—

সকলে হাসিয়া উঠিল—তারিণী সাধু যে এইরূপ মিথ্যা গল্প করেন ইহা ত আর নূতন নহে।

তাহার পরে আরও অনেক দিন তারিণীসাধুর ওখানে বসিয়াছি, তিনি অনুরূপ বহু গল্প বলিতেন। সর্ব্বত্রই নানারূপ স্ত্রীলোক তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত অকারণেই পাগল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু সাধন-ভজনের বাধা হয় বলিয়া তিনি আর বিবাহ করেন নাই। গল্প শুনিতাম বটে, কিন্তু কদাচিৎ তাহা বিশ্বাস করিয়াছি, কারণ তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য কাহারও পাগল হওয়া স্বাভাবিক নহে। এমন গল্পও করিয়াছেন যে, কোন প্রচুর সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও বাঁধিতে পারে নাই। আমি শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছি মাত্র।

সেদিন পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতেই কালবৈশাখীর মেঘ আকাশে ঘনাইয়া আসিতেছিল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেগে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল—দ্রুত-পায়ে বাড়ী ফিরিতেছিলাম কিন্তু তারিণী সাধুর বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না—বাতাসের সহিত বৃষ্টিও নামিয়া পড়িল। সাধু রান্নাঘরে কি যেন করিতেছিলেন ডাকিতে ডাকিতে সেখানে উঠিয়া বলিলাম—দরজা খুলুন দাদু, ভিজে গেলাম—

সাধু দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন—বসো দাদা, রুটি সেকছি।

—রুটি কেন?

—আজ যেন পূর্ণিমা, একটু বাতের আভাস যেন পাচ্ছি।

একটা রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ঝড়ো বাতাসে বার বার নিবু নিবু হইয়া আসিতেছে—বাহিরে তখন ভয়ঙ্কর ঝড়ের সহিত বেগে বৃষ্টি হইতেছে। চারিপাশে ঘনীভূত আর্দ্র অন্ধকার, তারিণী-দা রুটি সেকিতে সেকিতে বলিলেন—বেশ ঝড় হচ্ছে না?

—হ্যাঁ। আচ্ছা দাদা, সাধন-ভজনের কথা ত বলেন কিন্তু কিসের সাধন তা'ত এক দিনও বললেন না।

তারিণী-দা একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল দিনেই ভাল কথা আরম্ভ করেছিস, আজ যে পূর্ণিমা, আজ সে-সব কথা বললে বাড়ীই যেতে পারবি নে।

—না পারব না, বলুন না, এখন বসে বসে শুনি—

—শুনবি! শোন, তোর কাছে ত আর গোপন কিছুই নেই।

—বলুন, শুনব বলেই ত আসি।

তারিণী-দা হুঁকাটা সাজিয়া লইয়া আরম্ভ করিলেন—সাধন অনেক রকমই করেছি—কালী সাধন, হনুমান সাধনও করেছি, কিন্তু তাতে কিছু করতে পারি নি।

—কেন?

—নিজের দোষ। কালী সাধন নষ্ট হ'ল ভয়ে—রাত্রে শ্মশানে তাজা মড়ার বুকে বসে সাধনা করাটা ত যা-তা কথা নয়। কত ভয় আসে, তাতে টিকলে তবে দর্শন মেলে—যাক সে-সব শুনে

কাজ নেই তুমি ছেলেমানুষ। সে-সব বুঝতে পারবে না, তবে পরীসাধনে কিছু হয়েছে – অন্ততঃ সব নষ্ট হয় নি। তা নইলে কি ঐ কমল, আর এত মেয়েলোকের এর প্রলোভনকে তুচ্ছ করতে পারি ভাই। তারিণী-দা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, আচ্ছা পরীসাধনের কথাটাই বলুন না।

—আমার গুরু কে জানিস্? হিমালয় পর্ব্বতে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়, বয়স তখন তাঁর তিন শ'র কাছে। আমি পায়ে ধরায় বিরক্ত হয়ে বলেন—যা এই মন্ত্র নিয়ে সাধন কর, যদি পারিস পারবি না হয় মরবি। সাধনার গুহ্য কথা সব বলে দিলেন বটে, কিন্তু নিজে গুরুগিরি করা অস্বীকার করলেন। আমি মন্ত্র নিয়ে বাড়ীতেই ফিরে এলাম—প্রথম ছ'বারই হ'ল না। যাক্, পরীসাধন করতে হলে প্রথম জিনিস কি চাই জানিস্? শনিবারে অমাবস্যায় মরেছে এমন চণ্ডালিনীর মাথার খুলি—জোগাড় করা কম কথা নয়। তিন বৎসর ঘুরে ঘুরে মদনপুরের শ্মশানে পেলাম বস্তু। তার পর চাই মঙ্গলবারে জন্ম-কালো গরুর দুধের ঘৃত—তাও সংগ্রহ করলাম। বাকী থাকল আর একটা বস্তু—সধবা ব্রাহ্মণ-বধূর কপালের সিঁদুর, তাজা মানুষের সিঁথির সিঁদুর সংগ্রহ করা সব চেয়ে কঠিন। এক দিন পাড়ার এক ঘরে সিঁদ কেটে ঢুকলাম—আগেই ভারাণ দিয়েছি—সাত বার মন্ত্র পড়ে, জাগবার উপায় নেই। আলো জেলে, সিঁথির থেকে সিঁদুর নিলাম আর বাঁ হাতের নোয়া খুলে নিয়ে এসে ঘরে রাখলাম। তবে তাদের ক্ষতি করি নি—বাঁধ কেটে দিয়ে ঝাড় ফুঁক দিয়েই এসেছিলাম। শতভিষা-নক্ষত্রে কৃষ্ণা-সপ্তমীতে সাধনা আরম্ভ করতে হবে। দিনক্ষণ দেখে বসে রইলাম—ঘরের মাঝে জিনিসক'টি রেখে এক কোণে শুয়ে থাকি। গাছগাছড়া যা দরকার একে একে সংগ্রহ করলাম কিন্তু গুরুজি যা বলেছিলেন তাই—

—কি?

—রোজ শুয়ে শুয়ে শুনি, কি যেন ঘরের কোণে সাপের মত গজরায়—আলো জ্বালি, কিন্তু কিছু নেই। আবার শুই কে যেন ঘরের কোণে বসে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমায় মারলে ধরলে—উঃ আর মেরো না—

বাহিরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব তেমনি চলিয়াছে। নিবিড় অন্ধকারে বৃষ্টির ঝুপ্ ঝাপ ও ঝড়ের শন্ শন্ শব্দ ভাসিয়া আসিয়া সাধুবাবার নির্জ্জন আশ্রমটিকে যেন রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। স্বল্পালোকে বসিয়া তারিণী সাধুও যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন।

—কারা কাঁদে জানিস্? পরীরা ঐ সাধনায় আগেই অমনি ক'রে সাধককে ভয় দেখায়—আমি ত গুরুর কৃপায় জানি। রাত্রে শুয়ে গুরুমন্ত্র জপ করি। নানা শিকড় দিয়ে গাঁঠরি করি, যাতে ওরা ক্ষতি করতে না পারে। যা হোক্, তার পরে দিন এল। ঘরের কোণে রাত্রি প্রায় ১১টায় মড়ার মাথার খুলির মাঝে ঘি দিয়ে আলো জ্বালালাম, পূজার উপকরণ নিয়ে বসে জপ করতে আরম্ভ করলাম। নিত্যই এমনি করে জপ করি, তার পরে যখন প্রায় লক্ষ বার হয়ে এল তখন আরম্ভ হ'ল উৎপাত—সে দিন এমনি বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ীতে কোথাও কেউ নেই, চারি দিক ঘন অন্ধকার, হঠাৎ আলো নিভে গেল। এক বিরাটকায় সাপ তার মাথায় আলো জ্বলছে, আমাকে খাবার জন্যে ছুটে আসছে—এসে চার পাশে ঘুরতে লাগল কিন্তু আমি আসন ত্যাগ করলাম না। জানি আমি ভয় দেখাবেই—তার পরে এল এক গো-দান, মাথাকাটা ষাঁড়। তার পর ডাকডাকিনী, ভূতপেত্নী কত কি ভয় দেখালে কিন্তু আমি জপ করেই যাই। পেত্নীটা তিন দিন পূজার সমস্ত নষ্ট করে দিল, আলো নিভিয়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল কিন্তু আমি ঠিক রইলাম। জানি গুরুদত্ত বন্ধ আছে কেউ কিছু করতে পারবে না—

তার পরে সে দিন রাত্রে লক্ষ জপ সমাপ্ত হ'ল, আমি শেষ প্রণাম পাঠ করলাম—তখন রাত্রি প্রায় ভোর। রুণু ঝুণু মল বাজিয়ে কে যেন উপর থেকে আস্‌ছে—আস্তে আস্তে নেমে সে এসে সামনে দাঁড়াল। আমার প্রদীপ কানা হয়ে গেল এমনি তার রূপ—পাখায় ঝলমল করছে মণিমাণিক্য, গায়ে কত উজ্জ্বল গহনা—গায়ের রং কনক চাঁপার মত। সমস্ত ঘর পদ্মগন্ধে ভরে গেছে—

আমায় প্রশ্ন করলে—কি চাই? আমাকে ডাকছ কেন? আমি বললাম, কিছুই না। টাকা? ধনসম্পদ বাড়ী-কোঠা? আমি বললাম—না কিছুই চাই না। তবে কি চাও—বললাম—তোমাকে। সে হেসে বললে—আমরা ত মানুষ নই। আমাকে নিয়ে কি করবে? কি করব জানি না, তোমাকে চাই! পাগল, বলে পরী হেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নিভে গেল—দেখি ভোর হয়ে গেছে।

পর দিন আবার জপে বসলাম—সে এল। আবার নানা ছলনা করলে কিন্তু আমি বললাম—তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু সে নিলে না। পর দিন আবার এল, সে দিন সে বললে—আচ্ছা চল; তার ডানা দুটো মেলে ধরল, আমি তার উপর শুয়ে পড়লাম, সে আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ল—কত দেশ পার হয়ে এক রাজপুরীতে ঢুকল। এক রত্নখচিত পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে সে বললে, তুমি একটু বিশ্রাম কর। দাসীরা বাতাস দিচ্ছে। চারি পাশে সব পরী-দাসীরা চামর হাতে দাঁড়িয়ে বাতাস করলে—আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরী খাবার নিয়ে এসে বললে—খেয়ে নাও। খেলাম। তার পর সমস্ত দেহে যেন এক অলৌকিক আনন্দ বয়ে যেতে লাগল। সে ঘুরে ঘুরে রাজপুরী দেখালে—কত ঐশ্বর্য্য, কত সোনা মণি-মাণিক্য! বললে—যা চাও নিয়ে যাও। আমি বললাম—না, আমি তোমাকেই চাই। সোনা চাই না। তার পরে আমরা প্রমোদ উদ্যানে গেলাম, কত নর্ত্তকী নাচ গান করছে। এমনি করে সেখানে দিন কাটল—পর দিন রাত্রে আমাকে আবার রেখে গেল।

পাড়ার সকলে বললে—কোথায় গিয়েছিলে সাধু? আমি হেসে বলি, একটু ঘুরে এলাম। তাই বলি, যারা এই কায়াহীন প্রেম পেয়েছে তারা কি আর কমলের ধার ধারে ভাই!

বাহিরে তখনও ক্লান্ত ঝড় রহিয়া রহিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে—অন্ধকারের মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা ঝুপঝাপ করিয়া পড়িতেছে।

বাহিরের অন্ধকারের পানে চাহিয়া গা ছম ছম করিয়া উঠিল—সত্যই এই অসাধু সাধু রহস্যময়।

আমি প্রশ্ন করিলাম, তারপর কি হ'ল তারিণী-দা?

এর পরেও শুনবি? তা বৃষ্টি থামে নি, বলছি, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্ কি বলিস্ দাদা? সাধুগিরির সবখানিই প্রায় করেছি কিন্তু এটা আর ছাড়তে পারলাম না।

তিনি উনুনে একটু চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, ওরা অমনি করে কেন জানিস? ধনরত্ন নিয়ে যদি কেউ ফিরে আসে, তবে সে তাকেও হারায় ধনরত্নও হারায়। আমি তা জানতাম কি না! আবার সাধনা করি—সে আসে। আমি যাই ওদের রাজ্যে—এমনি করে কত দিন যায়। কিন্তু সে আমাকে ছুঁতে দেয় না। এক দিন পালঙ্কে শুয়ে আছি, এমনি সময়ে ও পাশে এসে দাঁড়াল, আমি ওর হাত ধরতে গেলাম—সে সরে দাঁড়িয়ে বললে—এখনও দেরি আছে। আমি বললাম—আর কত দিন এমনি করে সাধনা করব। সে বললে—তিন বৎসর।

কিন্তু আমি ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলাম না—অমনি এক দিন জোর করে তাকে ধরলাম—সে আপত্তি করল না। পালঙ্কের পাশে শুয়ে সে বললে—কিন্তু তুমি হারালে—সব হারালে—

সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার হয়ে গেল—জ্ঞান হলে দেখলাম বাড়ীর উঠানে পড়ে আছি, আর আমার হাতখানা অবশ। সেই অবধি ডান হাতখানা কাঁপে, ঠিক জোর পাই নে। তবে এখনও সাধনা করলে সে আসে, দেখা দেয় কিন্তু নিয়ে যায় না—আর ধরাও দেয় না। পেয়ে হারিয়েছি ভাই; সে দুঃখ তোমরা কি বুঝবে?

তারিণী-দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। এ দুঃখ যেন তাঁহার জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে এমনি মর্ম্মবেদনায় তিনি উনুনের মাঝে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। আমি চা'য় শেষ চুমুক দিয়া বলিলাম, উঠি দাদা, বৃষ্টি ধরেছে।

কয়েক দিন পরে দেড় বছরের ভাইপোটিকে কোলে করিয়া সাধুর আশ্রমে গেলাম—দাদা তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া বলিলেন—বেশ ছেলে ত!

ভাইপোটি সাধুর শুভ্র শ্মশ্রুর মাঝে কি যেন একটি পাইয়া সজোরে তাহা টানিতে লাগিল। তারিণী সাধু কহিলেন—বেশ বেশ, দাড়িতে হাত বুলিয়ে দাও।

ছেলেটিকে কোলে করিয়া তিনি নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তারিণী সাধুর নীরবতায় যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা দাদা, আপনি টাকা-পয়সা আফিং খেয়ে নষ্ট না ক'রে কিছু জমি জায়গা কিন্‌লে পারতেন—

তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, হুঁ।

—চিরদিন ত সমান যায় না। যদি দু'চার দিন অসুস্থ হন তবে সেজন্যও তো দু'চার টাকা রাখা দরকার।

ভাইপোটি দাড়ি টানিয়াই যাইতেছিল, দাদা চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কার জন্যে সঞ্চয় করব, আমার জন্যে? কি হবে? অসুখ হয় মরে যাব—

—তবুও।

—না দাদা, নিজের জন্যে অত মায়া নেই ভাই। আজ যদি এমনি ছেলে, মেয়ে থাকৃত, বৌ থাকৃত, তবে কি না করতে পারতাম! বাড়ীতে সোনা ফলিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি! আমার জন্যে ত কিছুই দরকার নেই!

বৃদ্ধ তারিণী-দার চোখ দুটো ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল, যেন ধীরে ধীরে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। গৃহীহীন গৃহে বসিয়া তিনি যেন উদাস দৃষ্টিতে কোন পরীরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছেন!

ওঁর ভিখারী অন্তর পার্থিব কমলের দূর হইতে বুভুক্ষিতের মত ফিরিয়া আসিয়া কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তৃষ্ণা তাহার মেটে নাই। আজও তারিণী-দা তাই মিথ্যা গল্পের মাঝে আত্মতৃপ্তি খুঁজিয়াছে, পৃথিবীতে নিঃসহায় ভাবে একটা কিছু আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে।

মানুষ জানে না, অসাধু তারিণী সাধুর মিথ্যা গল্পের মাঝে তাঁর অন্তর কেমন ব্যাকুল ভাবে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরে।

মনে মনে দুর্ভাগ্য তারিণী-দার প্রতি একটা আন্তরিক সমবেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ভোরের বেলা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গাঁয়ের ধারে প্রাচীন তরু দোলায় স্মৃতির ঝুরি,
নতুন পাতায় জাগছে ভোরের আলো।
বালুর তটে দাঁড়িয়ে দেখি এই যে শ্মশান-পুরী,
মনের আকাশ এই তো করে কালো!
বনের বুকে পাতায় ঢাকা পথ যে গেছে ঘুরে
লোকালয়ের জীবন-অবসান।
আশাবরীর সুরের খেলা হারিয়ে গেছে দূরে,
বৈরাগীদের নেইকো টহল গান।
জাগরণের নেইকো সাড়া হেরি মরণ ঘুম
ফুটছে ভোরে ব্যথার শতদল।

নদীর সাথে গাঁয়ের সদা কোলাকুলির মধু
নেইকো বলে ঝরছে আঁখিজল।
মধ্যযুগের সতীর শাঁখা ভাঙা বটের মূলে
ঘন ছায়ায় দেউলভাঙা ইট;
দুশো বছর পেরিয়ে এসে মরা গাঙের কূলে
প্রাণ হারালো পল্লীমায়ের পীঠ।
আকাশ পানে ধায় যে পাখী শূন্য ক'রে মন
সে কি আবার ফিরবে হেথা ভাবছি অনুক্ষণ!

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ

অধ্যাপক শ্রীকালীকিঙ্কর দাশ, এম, এ.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। উত্তর-ভারতের আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যভাষা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাংলা দেশে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী আর্য্যেতর জাতির বাস ছিল। বঙ্গ শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে। সেখানে বঙ্গ বগধ এবং চেরপাদ অসভ্য জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[১] বৈদিক যুগে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতার বহির্ভূত ছিল বলিয়াই বোধ হয় আর্য্যগণের নিন্দাভাজন হইয়াছিল। বঙ্গদেশে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন উত্তর-ভারতের আর্য্যগণের পক্ষে অনেক দিন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। আরট্ট, কারস্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং প্রানূন দেশে গমনকারীর জন্য বৌধায়ন (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) শুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।[২] পরবর্ত্তীকালে স্মৃতিশাস্ত্রেও অনুরূপ বিধানের উল্লেখ পাই—

> "অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
> তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।"

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধদেশে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্য ভিন্ন গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই।

এত বিধিনিষেধ সত্ত্বেও কিন্তু আর্য্যগণ স্বকীয় বিশুদ্ধতা পুরাপুরি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। রক্তের মিশ্রণ, ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মিশ্রণ আর্য্যবিজয়ের প্রথম যুগেই হইতে থাকে, পরে এই মিশ্রণের গতিবেগ দ্রুততর হয়; অবশেষে যখন তাঁহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন তখন আর্য্য ও অনার্য্য মিশিয়া এক হিন্দু জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ভাষার দিক দিয়া আর্য্যগণ বহুল পরিমাণে শুচিতা রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাই বলিয়া আর্য্যভাষা সম্পূর্ণরূপে অনার্য্য-প্রভাবমুক্ত এরূপ উক্তি ভ্রমাত্মক। শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণগণকে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে;[৩] ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণের যুগে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০) বহু অনার্য্য শব্দ আর্য্য-ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতেছিল।

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ Jean Przyluski ইন্দোচীন, মালয়, নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশের অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত কদলী, কম্বল, তাম্বূল, লিঙ্গ, লাঙ্গল, লাঙ্গুল প্রভৃতি শব্দ অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত।[৪]

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাংলা দেশের ভাষায় লক্ষণীয় অনার্য্য উপাদান বিদ্যমান। ইহার নদ নদী স্থান ও গ্রামের নামে অনার্য্যভাষার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়—যথা, অনার্য্য ভোটব্রহ্ম ভাষায় দিস্তাং হইতে তিস্তা, দ্রাবিড় জোল প্রত্যয়যোগে নাড়াজোল হিট্টি প্রত্যয়যোগে বালুটে (বালহিট্টা), গাঙ্গুটে (গাঙ্গহিট্টা), গড্ডি প্রত্যয়-যোগে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি;[৫] তাহা ছাড়া বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি পদবিন্যাস রীতি আছে, যাহা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না; ইহা স্পষ্টই অনার্য্যপ্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়—যথা, প্রায় সমার্থক অনুকার শব্দের প্রয়োগ—মনটন, জলটল, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি; সহকারী ক্রিয়ার প্রয়োগ যথা মারিয়া ফেলা, পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত খোকা, খুকি, পাগল, ঠেঙ্গ, কানি, বাসি প্রভৃতি অসংখ্য অনার্য্য শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে—কারণ বাংলাদেশ বহুদিন পর্য্যন্ত অনার্য্য-অধ্যুষিত ছিল।

ঠিক কোন্ সময়ে বঙ্গদেশ আর্য্য-সভ্যতার প্রভাবে আসে তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। খুব

১।—"তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।" ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১ : বঙ্গ বগধ এবং চেরপাদ এই তিন জাতি পক্ষী—অর্থাৎ পক্ষীর ন্যায় ইহাদের ভাষা অবোধ্য। কেহ কেহ পক্ষী ইহাদের totem (বংশচিহ্ন) এইরূপ অর্থ করেন। পশু-পক্ষী, সর্প, কচ্ছপ প্রভৃতিকে আদিপুরুষরূপে কল্পনা অসভ্য জাতীয় রীতি। বাংলা দেশে বুনো (সর্দ্দার) জাতির মধ্যে এখনও এ রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিয়া আশ্চর্য্য উত্তর পাইয়াছি। তাহাদের কাহারও গোত্র শাণ্ডিল্য অর্থাৎ ষাঁড় কাহারও বা কাশ্যপ অর্থাৎ কচ্ছপ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ ষাঁড় দাগাইতে ও শেষোক্ত ব্যক্তিগণ কচ্ছপ ভক্ষণ করিতে কখনই রাজী হইবে না।

২। আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গকলিঙ্গান্ প্রানূনানিতি চ গত্বা পুনস্তোমেন যজেত সর্বপৃষ্ঠয়া বা। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ১।২।১৪

৩। "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ"—শতপথ ব্রাহ্মণের বচন পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (১,১,১) উদ্ধৃত।

৪। *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India* by Sylvain Le'vi, Jean Przyluski and Jules Bloch. Translated from French by Dr. P. C. Bagchi গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫। In the formation of these names we find some words which are distinctly Dravidian, *e.g.*, jola,—jota joli; hitti bhitti; gadda—gaddi. The modern Bengali word Siliguri can be compared with the common Telegu affix gadda;—*The origin anl development of Bengali Language*, Part I, pp. 65-66.

সম্ভবতঃ মৌর্য্যরাজগণই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশ জয় করিয়া (আঃ ৩০০ খ্রীঃ পূঃ) আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র স্থাপন করেন। "গঙ্গার মত আর্য্য-ভাষার নদী বাঙ্গালা-দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্য্য-ভাষা ভাসিয়া গেল—আর্য্য-ভাষা—প্রাকৃত এই বাঙ্গালায় আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালারূপ ধারণ করিল; প্রাকৃতের সঙ্গে তার ধাত্রীরূপে সংস্কৃতও আসিল।" আচার্য্য দণ্ডীর সময়ে (আঃ ষষ্ঠ শতক) বাংলা দেশে সংস্কৃত ভাষা এত দূর প্রসার লাভ করিয়াছে যে সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ী রীতির উদ্ভব হইয়াছে।[৬] সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়াং চুয়াং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে ভারত ভ্রমণে আসিয়া গৌড় বঙ্গ কামরূপ রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা বলিতে শুনিয়াছিলেন; সুতরাং মনে হয় সপ্তম শতকের পূর্ব্বেই সমগ্র বঙ্গ দেশ আর্য্যভাষী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। তখন মাগধী প্রাকৃত—অপভ্রংশের যুগ। মগধ হইতে আগত মাগধী প্রাকৃত এবং বাংলা দেশে প্রবর্ত্তিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ—এই দু'য়ের সংমিশ্রণে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করে সম্ভবতঃ দশম শতকের মধ্যভাগে।

আজ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যগণের সাধনতত্ত্বজ্ঞাপক চর্য্যাপদগুলি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার ঘাঁটিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পুথিগুলি আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে "হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশ করেন। চর্য্যাগুলি সবই এক সময়ের রচনা নহে। ইহার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেগুলির রচনাকাল দশম শতক। প্রহেলিকার আকারে রচিত তান্ত্রিক সাধন-সঙ্কেতে কণ্টকিত এই চর্য্যাপদগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ নিরূপণ অনেক স্থলেই দুঃসাধ্য। কুক্কুরী-পাদের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই।
আঙ্গন ঘর পন সুন ভো বিআতী। কানেট চোরে নিল অধরাতী।
সসুরা নীন্দ গেল, বহুড়ী জাগই। কানেট চোরে নিল কাগই মাগই।
দিবসই বহুড়ী কাঅই ডরে ভাই। রাতি ভইলে কামরূ জাই।
অইসন চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইড়। কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড়।

অর্থাৎ কচ্ছপ দুহিয়া (দুগ্ধ) পাত্রে ধরিতেছে না; গাছের তেঁতুল কুমীরে খাইতেছে। অঙ্গন ঘরের দিকে; ওগো মহিলা শুন। অর্দ্ধ রাত্রে চোরে কর্ণভূষণ লইয়া গেল। শাশুড়ী নিদ্রা গিয়াছেন, বধূ জাগিয়া আছে; কর্ণ-ভূষণ চোরে লইয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়া সন্ধান করা যায়? দিবসে বধূ কাকের ডাকেও ভয় পায়, আর রাত্রি হইলে কামরূপ যায়। এইরূপ চর্য্যা কুক্কুরীপাদ গাইল; কোটী মাঝে এক জনের হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল।

বাহ্য অর্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কচিৎ কোথায়ও একটু চমৎকারিত্বের আভাস যে পাওয়া যায় না এমন নহে। উদাহরণ-স্বরূপ শবরপাদের একটি চর্য্যা হইতে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

উচা উচা পাবত তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ শবরী, গিবত গুঞ্জরীমালী।

অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত; তথায় শবরবালা বাস করে। শবরীর পরিধানে ময়ূরপুচ্ছ; গ্রীবায় গুঞ্জা ফুলের মালা। ইহা ছাড়া দৃঢ়বদ্ধ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বলিয়া এগুলি বেশ শ্রুতিমধুরও বটে; তথাপি চর্য্যাপদগুলিকে পুরাপুরি সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায় না।

বাংলার অমর কবি জয়দেব হইতেই বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসের আরম্ভ। জয়দেব লক্ষ্মণসেন দেবের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন;[৭] সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ পাদ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও "গীতগোবিন্দ" এমন "সরল-তরলরচনা-প্রাঞ্জল" যে ইহা প্রায় বাংলা। একটু উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য পরিস্ফুট করিব।

"ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।"
"লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম।"

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, গীতগোবিন্দের পদগুলি প্রথমে বাংলায় রচিত হইয়াছিল, পরে ঐগুলির সংস্কৃতরূপ দেওয়া হয়। গীতগোবিন্দের সরল রচনারীতি আলোচনা করিলে এই অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহাতে গীতিকবিতার বড় আধিপত্য। বৈষ্ণব যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই গীতিকাব্যপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন

---

(৬) "অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।
তত্র বৈদর্ভ গৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ।" কাব্যাদর্শ ১।৪০
বাঙালীর সংস্কৃত রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য যে শব্দাড়ম্বর-বাহুল্য একথা সপ্তম শতকে বাণভট্টও উল্লেখ করিয়াছেন—"গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ।" বাঙালী কবি-গণ অনুপ্রাস-প্রিয় এই অখ্যাতিও পাইয়াছিলেন।
"ইতীদং নাদৃতং গৌড়ৈরনুপ্রাসস্ত তৎপ্রিয়ঃ।" কাব্যাদর্শ ১।৫৪

(৭) "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ।"
গীত-গোবিন্দের প্রস্তাবনায় পণ্ডিত রজেশ রামকৃষ্ণ তৈলাঙ্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

গতিতে প্রবাহিত হইয়া দেশের মনোভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিয়াছে। "এই অনন্তচারিণী সুখদুঃখভক্তিবাহিনী সুরধুনী গীতিকবিতার অমৃতধারার হরিদ্বারক্ষেত্র জয়দেব গোস্বামী। জাহ্নবী সর্ব্বত্রই পূত-সলিলা; তথাপি হরিদ্বার সেই পূতবারির পুণ্যতীর্থ। গীত-গোবিন্দ সেইরূপ বাঙালীর গীতিকাব্যের অপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থ।" বাংলা ভাষায় রচিত না হইলেও বাঙালীর মানস-প্রকৃতি গঠনে এই গ্রন্থের দান অতুলনীয়। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করিয়া প্রেমভক্তির যে বিচিত্র কলগীতি বৈষ্ণবযুগে বাংলার কাব্যকুঞ্জে কূজিত হইয়াছিল, জয়দেবের গীতগোবিন্দই তাহার অগ্রদূত। মেঘদূত যেমন বহু কবিকে দূত-কাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়াছে তেমনি গীতগোবিন্দও শত শত কবিকে গোবিন্দ-গীত-কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে। তাই বঙ্গদেশে কানুছাড়া আর গীত ছিল না।

জয়দেবের পর যে বিরাট্ ও বিচিত্র বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহার মূলে ছিল দুই জন শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভা। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সমুজ্জ্বল স্তম্ভস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলায় জন্মগ্রহণ এবং মৈথিলী ভাষায় পদ-রচনা করিলেও বাঙালীরই কবি। মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলার সহিত বাংলার সাংস্কৃতিক যোগ ছিল। বঙ্গদেশ হইতে বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত মিথিলায় গমন করিত। কৃতবিদ্য বাঙালী ছাত্রগণ অন্যান্য শাস্ত্রাদির সহিত বিদ্যাপতির কবিতাও কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেন। এইরূপে তাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

বিদ্যাপতির ভাষা বাঙালী কবিগণকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে তাঁহারা মৈথিলী ভাষার অনুকরণে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে যে কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হইল ইহাই বিখ্যাত ব্রজবুলি ভাষা। ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচলিত পশ্চিমা হিন্দি ব্রজভাষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। মৈথিলী এবং বাংলা ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন ইহা নিতান্তই একটি কেতাবী ভাষা। এই ভাষার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া গোবিন্দদাস প্রমুখ বহু বাঙালী কবি মধ্যযুগে ইহার মধ্যস্থতায় অনুপম পদ রচনা করিয়াছিলেন। শুধু মধ্যযুগে নয়, আধুনিক কালেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"তে বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে ব্রজবুলিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা-সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকার শাশ্বত রূপটি অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ণে, অলঙ্কারে, সঙ্গীতে, আবেগে, উচ্ছ্বাসে, বিদ্যাপতির পদ একেবারে পরিপূর্ণ; সর্ব্বোপরি তাঁহার কবিতায় এমন একটি পরম আশ্চর্য্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাক্ষাৎ লাভ করা যায়, যাহা জগতের সাহিত্যে দুর্ল্লভ।

"জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সো…ই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু—
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।"

এ কবিতার কোন বিশ্লেষণ চলে না। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ইহার নিগূঢ় রসটুকু উপলব্ধি করিতে হয়।

যে সময়ে মিথিলায় বিদ্যাপতি তাঁহার অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া লোকের মনোহরণ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই বাংলাদেশে আর এক জন কবি একই সুরে বঙ্গদেশকে মোহিত করিতেছিলেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই সমসাময়িক ছিলেন। গঙ্গাতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এরূপ প্রবাদও আছে।[৮] তবে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষপাদ; তাহা হইলেও চণ্ডীদাসকেও ঐ সময়ে টানিতে হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চণ্ডীদাস-কবিতা-প্রীতি এই মতেরই পোষকতা করে।[৯] কারণ চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের কবিত্ব-খ্যাতি নিশ্চয়ই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অতএব চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতকের শেষের দিকে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ বলিলে খুব বেশী ভুল হয় না। কিন্তু তাঁহার নামে যে-সমস্ত পদ

(৮) সময় বসন্ত মাস দিন মাঝহি
বটতলে সুরধুনী তীর
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল
পুলকে কলেবর গীর।

—বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২; ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত।

(৯) চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্র দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

পাওয়া যায় ভাষার দিক দিয়া সেগুলির সঙ্গে বর্ত্তমান বাংলার অল্পই প্রভেদ।

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা"
"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।"

প্রভৃতি পদগুলিকে আধুনিক কোন কবির রচনা বলিয়া অনায়াসে চালাইয়া দেওয়া যায়।

সম্প্রতি এই সমস্যার এক আশ্চর্য্য সমাধান হইয়াছে। ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে এক গোয়ালঘরের মধ্যে চণ্ডীদাসের একখানি পুথি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ সালে তাঁহারই সম্পাদনায় ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি আবিষ্কার প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। ইহাতে একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসই আদি কবি। ইঁহার কবিতাই মহাপ্রভুর প্রিয় ছিল; সুতরাং ইনি জয়দেব ও চৈতন্যদেবের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ অল্পই। কিন্তু দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলী কোন অর্ব্বাচীন কবির রচনা।

ধর্ম্মপূজাবিষয়ক শূন্যপুরাণ খুব প্রাচীন গ্রন্থ এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে একাদশ শতকের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন;[১০] কিন্তু শূন্যপুরাণের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে তাহার বয়স মাত্র তিন শত বৎসর। "ময়নামতীর গান" এবং "মাণিকচন্দ্র রাজার গানে"রও সংশোধিত সংস্করণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানিতে মূলের ভাষা আশ্চর্য্যজনকরূপে অবিকল রক্ষিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ইহার উপরে কাহারও হস্তাবলেপ পড়ে নাই। চতুর্দ্দশ শতকের বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান।

ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্র রাজার গান এবং শূন্য-পুরাণের স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব আছে—যেমন শূন্য-পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ—

নাহিরেক(ক) নাহি রূপ না ছিল বন্ন(খ) চিন(গ)।
নাহি রবি নাহি শশী নাহি ছিল রাতি দিন।
নাহি ছিল সৃষ্টি আর নাহি সুর নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাহি ছিল আছিল অম্বর।
শূন্যেতে ভ্রমণ প্রভুর শূন্যে করি ভর।
কাহারে সৃজিব প্রভু ভাবেন মায়াধর।

তথাপি মূলতঃ এগুলি কাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালীর আদি-কাব্য। গীতগোবিন্দের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকিলেও ইহাতে মৌলিক সৃষ্টিও যথেষ্ট আছে। জন্মখণ্ডে নারদের কৌতুক-কর চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে।

আয়িলা দেবের সুমতি শুনী।
কংসের আগক(ঘ) নারদমুনী।
পাকিল(ঙ) দাড়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড়(চ) বেশ।
নাচয়ে নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত(ছ) মতী।
খনে খনে হাসে বিনি কারণে।
খনে হএ খোড়(জ) খোনেকেঁ কানে(ঝ)।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমই এই কাব্যের উপজীব্য; সুতরাং রূপ-বর্ণনা, পূর্ব্বরাগ বিরহ, মিলন প্রভৃতি ইহার অনেক-খানি স্থান জুড়িয়া আছে; আদি রসের অনাবৃত বর্ণনারও অভাব নাই; কিন্তু বংশীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধিকার অন্তরের ব্যাকুলতাকে কবি যে রূপ দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

কে না বাঁশী বাএ(ঞ) বড়ায়ি(ট) কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো(ঠ) আউ লাইলোঁ রান্ধন।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ(ড) আপনা।

কোন্ আদিম উষায় বাংলার গীতিকাব্য ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল জানি না। চণ্ডীদাসের সময়ে ইহার বিকশিত অবস্থা; কিন্তু তার আগে অনেক গীতিকবিতা না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সেই হারানো ধারার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

১০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(ক) রেখা, (খ) বর্ণ, (গ) চিহ্ন।

(ঘ) সম্মুখে, (ঙ) পাকা, (চ) মর্কট, (ছ) উন্মত্ত, (জ) খোড়া, (ঝ) কাণা, (ঞ) বাজাইতেছে, (ট) রাধার সহচরী, (ঠ) আমার, (ড) নিক্ষেপ করিব অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিব।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অধ্যাপক এস্. এন্. কিউ. জুলফিকার আলী

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই—তাই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার বড় কোনদিন হয় নি। তবে একটি দিন আমি তাঁকে খুবই কাছে পেয়েছিলাম। সেই দিনটির কথা আমার স্মৃতির মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে, সেই দিনের কথা—আর, তিনি সাহিত্যিরসিক হিসাবে কি প্রভাব আমার উপর বিস্তার করেছিলেন তা-ই আপনাদের নিকট আজ আমি নিবেদন করব।

সবেমাত্র আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে বেরিয়েছি, তখন পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে মাসিক পত্রের মারফতেই আমার পরিচয়। এমন সময় তিনি আমাদের তখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গত জে. এন. রায়, আই-সি-এস,এর সঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ীতে আসেন। মোটরটি যখন গ্রামের পথে আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি এল আমরা ছেলে-ছোক্‌রারা মোটরের পা-দানিতে লাফিয়ে উঠে পড়লাম, আচার্য্য ত মহা খুশী—আমাদের কারো কান টেনে দিলেন; কারো বুকের উপর জোরে ঘুষি চালিয়ে দিয়ে হেসে কুটিকুটি হয়ে পড়লেন। মিঃ রায় অবশ্য খুবই যে স্বস্তি বোধ করছিলেন তা' নয়—কারণ, সরু রাস্তায় মোটর উল্টে যাবার যথেষ্ট ভয় ছিল। যা হোক, মোটর শেষ পর্য্যন্ত এসে বাড়ীর দরজায় নিরাপদেই পৌছল।

তখন কিছুদিন চোখের অসুখের জন্য আমাকে চশ্‌মা ব্যবহার করতে হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র গাড়ী থেকে নেমেই আমার চশ্‌মা জোড়া ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিলেন—ভাগ্যিস্, বড় বড় ঘাসের উপর গিয়ে পড়ল—তাই ভাঙে নি। তারপর আমার এক বলিষ্ঠ বন্ধুর গলা ধরে পড়লেন ঝুলে—সে বেশ শক্ত ছোঁড়া এতটুকু হেলে নি। এতে তিনি খুশী হয়ে বেশ জোরে তার বুকের উপর কষিয়ে দিলেন এক কিল, তাতেও সে কাবু হয় নি। এতে তিনি আরো খুশী হয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন,—"হ্যা, বেশ ষণ্ডা আছিস্—তুই-ই হবি কাজের লোক!"...কি আনন্দের মধ্যেই দু-তিনটি ঘণ্টা কেটে গেল!

কলেজে যখন ফিরে গেলুম, ইতিহাসের অধ্যাপক আমার ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করায় প্রফুল্ল চন্দ্রের কথা উঠল, তিনি সেবার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আসার সংবাদ পেয়ে তিনি জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় যান। গেটে চাপরাসীকে জিজ্ঞেস করেন যে সর প্রফুল্লচন্দ্র আছেন কিনা। চাপরাসী বললে, না, সর প্রফুল্লচন্দ্র ত এখানে আসেন নি। অধ্যাপক একটু নিরাশ হলেন—প্রফুল্লচন্দ্রের যে ওখানেই থাকবার কথা! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন কিনা। চাপরাসী বললে যে তিনি আছেন। "আর কি তাঁর ওখানে কেউ আছে?" অধ্যাপক শুধোলেন। "হাঁ, বিশ্রী এক ঢোলা কোট গায়ে—বড় বড় দাঁড়ি গোঁফ-ওয়ালা এক বুড়ো আছেন—বোধ হয় কোনো পণ্ডিত হবেন।" অধ্যাপক অন্ধকারে যেন কিছু আলো দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর 'কার্ড' পাঠিয়ে দিলেন।

এই অভিজ্ঞতার কথা বললে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রফুল্লচন্দ্র ও অধ্যাপক—তিনজনের মধ্যে বেশ এক চোট হাসাহাসি হ'ল। হঠাৎ, এক সময় প্রফুল্লচন্দ্র গম্ভীর হয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন—"কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, তোমার চাপরাসী সম্বন্ধে নালিশ—সে আমার এ কোটের অপমান করেছে, সে একে বিশ্রী বললে। জানো, এ কোট বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে।" ম্যাজিষ্ট্রেট ও অধ্যাপক দু'জনেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চাইতে তিনি 'কোটে'র ইতিহাস বললেন। সেবার তিনি কোনো ব্যাপার উপলক্ষে দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে কোনো এক বড় হোটেলে গিয়ে তিনি ওঠেন। সঙ্গে তাঁর যা সাধারণ কাপড়-চোপড় তা-ই ছিল। কিন্তু পর দিন ভোর না হতেই এক বড় 'ফার্ম্মে'র এক কর্ম্মচারী কয়েক প্রস্থ 'সুট' নিয়ে এসে হাজির। প্রফুল্ল-চন্দ্র ত অবাক! তিনি এ অর্ডার কখন দিলেন? হোটেলের ম্যানেজার একটু লজ্জিত ভাবে হাত কচলাতে কচলাতে এসে বললে, সর, আমিই আপনার পক্ষ থেকে এ অর্ডার দিয়েছিলাম। কাল আপনি বাইরে গেলে দেখলাম আপনার ঘর খোলা—আপনার সুটকেসটিও খোলা এবং তাতে বিশেষ কোনো কাপড়ও নেই। মনে করলাম হয়ত ভুলে আপনার কাপড় আনা হয় নি। অথচ, আজ ভোরেই হিজ এক্-সেলেন্সির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করতে হবে ইত্যাদি। হেসে পি, সি, রায় বললেন—বাধ্য হয়ে 'সুট' একটি রেখে সে দিন পরতে হ'ল। কিন্তু ট্রাউজার ও ভেস্‌টটি যে তার পরে কোথায় গেল তা আর খুঁজে পাই নি। কিন্তু,

ব্যাপারটি এখন তোমরাই বিবেচনা করে দেখ যে ব্যাটা চাপরাসীর এ কোটটির নিন্দে করা ঠিক হয়েছে কিনা! —বলে তিনি ছেলেমানুষের মত এমন প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন।

সত্যি এমনি ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এমনি অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন; এমনি ছিলেন তিনি আত্মভোলা। অথচ, শুধু বিজ্ঞানেই নয় কত দিকে ছিল তাঁর প্রতিভা। এই সময়ে তিনি খবরের কাগজের 'কাটিঙে'র বিরাট স্তূপ সঙ্গে ক'রে ফিরতেন, এবং বক্তৃতার সময়ে নানা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে-সব তথ্য দিতেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল।

এর কিছুদিন পরই পড়বার সুযোগ হয় খবরের কাগজে তাঁর আলিগড় ছাত্র-সংঘে প্রদত্ত "মোসলেম সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতাটি। এই বক্তৃতাটি দেশের সুধী সমাজে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক তিনি—সারাদিন কাটে তাঁর রসায়নাগারে—ইতিহাস পাঠের এত সময় জুটল তাঁর কোথা থেকে? বাস্তবিকই সে বক্তৃতাটি তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞানের অপূর্ব্ব সাক্ষী।

এরও কিছুদিন পরে পড়লাম তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনী। বিস্মিত হলাম শুধু তাঁর ইংরেজী লিপি-কৌশল দর্শনেই নয়, তাঁর ইংরেজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দর্শনেও অবাক হতে হ'ল। কত দিন আগে পড়েছি সে বই, কিন্তু আজও মনে পড়ে Fielding-এর বইয়ের Country Esquire-এর সঙ্গে তাঁর পিতার তুলনা ইত্যাদি। তাঁর শেক্সপীয়ারের প্রতি অনুরাগের কথা সকলেরই জানা আছে; কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির সঙ্গেও যে তাঁর কত নিবিড় পরিচয় ছিল তা এই আত্মজীবনী থেকে জানা যায়।

এই বইয়ের আর একটি কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। সে হচ্ছে বাঙালীর ডিগ্রীর মোহ দূর করবার প্রয়াস। সত্যিকার পাণ্ডিত্য যে ইউনিভার্সিটি-ডিগ্রীর উপর আদৌ নির্ভর করে না তা তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে যে শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য" বইটির উল্লেখ করেছেন তাও বেশ মনে পড়ছে।

কিন্তু আপনাদের যদি এই ধারণা জন্মে থাকে যে প্রফুল্লচন্দ্র শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন তা হ'লে অত্যন্ত ভুল হবে।

এক সময় স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায়ের পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয় এবং কামিনী রায়ের স্নেহলাভে ধন্য হই। তখন আমার জানবার সুযোগ হয় যে প্রফুল্লচন্দ্র কামিনী রায়ের কাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং গোটা "আলো ও ছায়া" কাব্য গ্রন্থখানি তাঁর মুখস্থ ছিল।

কলকাতায় একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের কতিপয় বন্ধুর নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করি যে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাব। এক বন্ধু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,—রবীন্দ্রনাথ আপনি খুব পড়েন জানি, কিন্তু তাঁর কতগুলি কবিতা মুখস্থ আছে—শরৎচন্দ্রেরই বা কি কি বই পড়া আছে, কত পাতা মুখস্থ বলতে পারবেন—এ সব ঠিক করে তার পরে যেন যান। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করায় বললেন, যে আর্টের ছাত্র পেলে এ সব বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ভাল কাব্যগুলিই নাকি তাঁর ছিল মুখস্থ এবং শরৎচন্দ্রের সমস্ত বই-ই নাকি ছিল তাঁর তন্ন তন্ন ক'রে পড়া এবং ভাল ভাল অংশগুলি মুখস্থ। সে যাত্রা আর সাহস ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি।

দেশের সাহিত্য, সাময়িক পত্রগুলি যে তিনি কত অভিনিবেশ সহকারে পড়তেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়। বহুদিন পূর্ব্বে পড়া তাই জোর করে বলতে পারছি নে,—তবু যেন বেশ মনে পড়ছে যে তাঁর 'আত্মজীবনী'তে ময়মনসিংহের করটিয়া কলেজ ম্যাগাজিন থেকেও উদ্ধৃতি রয়েছে।

বাস্তবিকই, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, দরদী শিক্ষক, স্বনামধন্য পণ্ডিত, সর্ব্বজনপূজ্য দেশনায়ক বা দেশের শিল্পোন্নতির তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন—এ বললেও তাঁর সম্বন্ধে যেন সব বলা হয় না। তিনি কতিপয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করেছেন তা'ও ঠিক—কিন্তু এতেও দেশের অগ্রগতির পক্ষে তাঁর দানের মূল্য নিরূপিত হয় না। তিনি বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম স্রষ্টা এ বললেও তাঁর ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ তিনি জাতীয় জীবনে এক বিরাট মহীরুহ সম ছিলেন। আমার মতে তিনি সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন যাঁরা নিজেদের কর্ম্মজীবনের সফলতারও বহু উর্দ্ধে বাস করেন—যাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারা অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনের মূল উৎসে আঘাত ক'রে জাতিকে এক নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা দেয়। ভারতের এই নবজাগরণের মূলে প্রফুল্লচন্দ্রের স্থান ঠিক কোথায়—সে বিচারের ভার রইল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের উপরে।*

* ২৩ জুন (১৯৪৪) তারিখে ঢাকা পূর্ব্ব বাংলা ব্রাহ্ম-সমাজে অনুষ্ঠিত শোক-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলেখন।

ভারতবর্ষের ও বাংলার কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং একমাত্র কৃষি ভিন্ন উপার্জ্জনের অন্যান্য পথ রুদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় কৃষক বর্ত্তমানে এক জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কোনরূপে একটুখানি মাটি খুঁড়িয়া যৎসামান্য ফসল ফলাইয়া তাহার দ্বারা আত্মরক্ষার প্রয়াসের যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে, তাহাতে কৃষির উন্নতি সাধনের কথা কেহ ভাবেও নাই, সে চেষ্টাও হয় নাই। সেচ-কার্য্যের স্বাভাবিক ও সামাজিক যে-সব ব্যবস্থা ছিল সেগুলি কতক মজিয়াছে কতক লোপ পাইয়াছে। ভারতীয় কৃষি আজ সম্পূর্ণরূপে বরুণদেবের কৃপার উপর নির্ভরশীল। সমগ্রভাবে ভারতবর্ষ, বিশেষভাবে বাংলার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

১৮৮১ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নোক্তরূপ :

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা		প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা	
	১৮৮১	১৯৪১	১৮৮১	১৯৪১
আসাম	৪৮ লক্ষ	১ কোটি ২ লক্ষ	৮৭	১৮৬
বাংলা	৩ কোটি ৬৩ "	৬ " ৩ "	৪৬৯	৭০৮
বিহার ও উড়িষ্যা	৩ " ৯ "	৪ " ৫১ "	৩৭৩	৪৪২
বোম্বাই	১ " ৪১ "	২ " ৮ "	১৮২	২৭২
মধ্যপ্রদেশ	১ " ১৯ "	১ " ৬৮ "	১২০	১৭০
মাদ্রাজ	৩ " ৮ "	৪ " ৯৩ "	২১৭	৩৯১
পঞ্জাব	১ " ৬৯ "	২ " ৮৪ "	১৭১	২৮৭
যুক্তপ্রদেশ	৪ " ৩৮ "	৫ " ৫০ "	৪১২	৫১৮
সীমান্তপ্রদেশ	১৬ "	৩৩ "	১১৭	২১৩

প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হইলেও উহা অর্থহীন নয়। দেশের শিল্প ধ্বংস হইবার পর কৃষি এবং স্বভাবজাত দ্রব্যাদি আহরণই ভারতবাসীর জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। কাজেই যেখানে বৃষ্টিপাত কতকটা স্বাভাবিক কিংবা সেচ-ব্যবস্থা ভাল বলিয়া কৃষিকার্য্যের সুযোগ বেশী, অথবা যেখানে স্বভাবজাত অন্যান্য দ্রব্য আহরণের উপায় আছে, সেখানেই লোকে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। এই দিক দিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে চারি ভাগে ভাগ করিলে ঘনবসতি বৃদ্ধির কারণ পাওয়া যায় :*

অঞ্চল	১৮৮১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার—
১। কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, পূর্ব্ববঙ্গ, ছোটনাগপুর উপত্যকা, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম পঞ্জাব এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ...	৬০ এবং তদূর্দ্ধে
২। মাদ্রাজের পূর্ব্ব উপকূলের উত্তর ও দক্ষিণ, বোম্বাই এবং সুর্ম্মা উপত্যকা ...	২০ হইতে ৪৫
৩। গুজরাট, উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থান, উত্তর বিহার এবং পঞ্জাবের হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চল ...	১০ " ১৬
৪। সিন্ধু ও গঙ্গা উপত্যকার পূর্ব্ব পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চল, মধ্যভারত, দক্ষিণ বিহার, পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থান, এবং কোঙ্কণ ...	১০ " তন্নিম্ন

প্রথম ভাগে যে-সব স্থান ধরা হইয়াছে সেখানে জমির উর্ব্বরা শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক এবং সেচ-ব্যবস্থা ভাল অথবা বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক বলিয়া চাষের সুবিধা বেশী। সিন্ধু এবং ছোটনাগপুর উপত্যকা বাদ দিলে এবং স্থানীয় হিসাব ধরিলে দেখা যায় কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, পূর্ব্ববঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবে ঘন বসতি দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের সংখ্যা বৃদ্ধিরও ইহাই কারণ। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে যে-সব স্থান ধরা হইয়াছে ১৮৮১ সালের পূর্ব্বেই সেই সব স্থানে লোকসংখ্যা এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে আর বেশী লোকের আহার যোগাইবার ক্ষমতা সেখানকার মাটির নাই। শিল্পকেন্দ্রসমূহে শ্রমিকের আমদানীও বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চল প্রভৃতি হইতেই অধিক পরিমাণে হইতেছে।

এক একটি স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিরূপ অতিরিক্ত ভাবে হইতেছে, নিম্নের তালিকায় তাহা বুঝা যাইবে :*

স্থান—(শতকরা)	৫৭ ৭	২২·১	৮·৩	৫·৫	৬·৪
জনসংখ্যা—(")	১৭·৫	২৩·৪	১৫·৩	১৪·৩	২৯·৫
ঘন বসতি (প্রতি বর্গমাইলে)	১৫০-এর কম	১৫০-৩০০	৩০০-৪৫০	৪৫০-৬০০	৬০০ এবং তদূর্দ্ধ

এই তালিকায় দেখা যায়, ভারতবর্ষের শতকরা ৫৭·৭ ভাগ ভূমিতে মাত্র ১৭·৫ ভাগ লোক বাস করে, এবং ৬·৪ ভাগ ভূমিতে ২৯·৫ অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক গিয়া ভিড় করিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে

---

* N. V. Sovani: *The Population Problem in India: A Regional Approach*, Ch. IV.

* Gyan Chand: *India's Teeming Millions*, pp. 90-91.

ঘন বসতির মাত্রা প্রতি বর্গমাইলে ২৫০-এর বেশী হওয়া উচিত নয়, অথচ উপরের তালিকায় দেখা যায় শতকরা অনূন ৫৯ জন লোক অর্থাৎ প্রতি দশ জনে ছয় জন মাত্র শতকরা ১৯ ভাগ অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশেরও কম জমির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ঘন বসতির সীমা যাহা হওয়া উচিত, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের বেলায় তাহার দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে।

শিল্পোন্নতি দেশে অনেকটা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে লোকের অন্নসমস্যা দূর হয় নাই, কৃষিক্ষেত্র যাহারা ছাড়িয়াছে সেরূপ খুব কম লোকেরই কাজ কল-কারখানায় জুটিয়াছে। গ্রাম ও শহরের লোকসংখ্যার নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বুঝা যায় :*

	১৮৮১		১৯২১		১৯৩১		১৯৪১		১৮৮১ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির শতকরা হার
জনসংখ্যা	কোটি	লক্ষ	কোটি	লক্ষ	কোটি	লক্ষ	কোটি	লক্ষ	
মোট	২৫	২	৩০	৫৫	৩৩	৮২	৩৮	৮২	১৩৮·৬
সহরের	২	৩০	৩	১৩	৩	৭৫	৪	৯৬	২৩·৬
গ্রাম্য	২২	৭২	২৭	৪২	৩০	০৭	৩৩	৯২	১১২·০

অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন এখনও গ্রামবাসী এবং জমির উপর নির্ভরশীল। কানাডায় গ্রামবাসীর সংখ্যা শতকরা ৪৬, উত্তর-আয়র্লণ্ডে ৪৯ এবং ফ্রান্সে ৫১।

জাত ব্যবসা ছাড়িয়া লোকে কি ভাবে অগতির গতি রূপে কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার পরিচয় :

জাতি	কর্ম্মরত লোক-সংখ্যা	জাত-ব্যবসায়ে রত	কৃষি-কার্য্যে রত	জাত-ব্যবসায়ে রত আছে শতকরা হার	লাঙ্গল ধরিয়াছে শতকরা হার
চামার, ধাঙ্গড়, নাপিত	৬৭ লক্ষ	১২ লক্ষ	৪০ লক্ষ	১৭·৮	৬০
খটিক (শূকর পালক) গুজর (পশুপালক) ও তেলি	১৬ লক্ষ	৭ লক্ষ	১১ লক্ষ	২৫·৯	৪৩·৯
পিঞ্জার (তুলা-বীজ ছাড়ায়) দর্জ্জি, মোমিন (তাঁতি) ধোপা	২৮ লক্ষ	১০ লক্ষ	১১ লক্ষ	৩৩·৯	৩৯·২
কুম্ভকার ওদ (মাটিকাটে)	১০ লক্ষ	৪ লক্ষ	৪ লক্ষ	৩৭·৫	৩৮
ছুতার, লোহার সোনার	১৮ লক্ষ	৮ লক্ষ	৪ লক্ষ	৪২	২৩·১
চাষবাস যাহাদের জাত-ব্যবসা নহে এরূপ অন্যান্য জাতি সমেত মোট	১ কোটি ৬৭ লক্ষ	৪৫ লক্ষ	৮০ লক্ষ	২৬·৯	৪৭·১

* Nanavati and Anjaria: *The Indian Rural Problem*, p. 23.

সংখ্যাগুলি ১৯৩১-এর সেন্সাস রিপোর্ট হইতে গৃহীত। ইহা হইতে দেখা যায় ১৯৩১ সালে মাত্র শতকরা ২৭ জন জাত-ব্যবসায়ে রত ছিল এবং যাহারা জাত-ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৬৪ জনই লাঙ্গল ধরিয়াছে।

এমনি বেপরোয়াভাবে লোকে কৃষিকার্য্যে ঝুঁকিয়াছে বলিয়া অনেকেই ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়াছে। ১৮৯১-তে ইহাদের সংখ্যা ছিল এক কোটি সাতাশি লক্ষ, ১৯৩১-এ উহা বাড়িয়া হইয়াছে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ। ১৯১১ হইতে ১৯৩১-এর মধ্যে প্রতি হাজার কৃষকে দিনমজুরের সংখ্যা বাড়িয়া ২৫৪ হইতে ৪১৭তে দাঁড়াইয়াছে। ইহা সর্ব্বভারতীয় সংখ্যা। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে দিন মজুরের আনুপাতিক হার অত্যন্ত বেশী এবং উহা দ্রুত বাড়িতেছে। সারা বৎসরের মধ্যে এক মাত্র কৃষিকার্য্যের সময়েই ইহাদের কাজ জোটে, অন্য সময়ে ইহাদিগকে মোট বহা, গরুর গাড়ী চালনা প্রভৃতি কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহাদের মজুরীও যৎসামান্য ; পুরুষের পক্ষে দৈনিক ৩ হইতে ৬ আনা, স্ত্রীলোকের ২ হইতে ৪ আনা এবং বালকের ছয় পয়সা হইতে ২ আনা মাত্র।

ভূমিহীন দিনমজুরের সংখ্যা বাংলা দেশে এই ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে :

	পুরুষ	স্ত্রী
১৯১১	১৩,০৮,৬৪৫	২,৪১,৫৫৯
১৯২১	১৫,২৫,৫৬২	২,৫৪,৯৭৮
১৯৩১	২২,৪১,৮৫৩	২১৫,৮৮২

এই সংখ্যা বাংলায় ক্রমাগত বাড়িতেছে। বর্ত্তমানে উহা ২৮ লক্ষ ৭০ হাজার। এই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু লোকের চাপে জমির অবস্থা কি হইয়াছে তাহাও দ্রষ্টব্য। জমির উৎপাদিকা শক্তি তো সর্ব্বত্রই কমিয়াছে, ঘন বসতিসঙ্কুল প্রদেশগুলিতে উর্ব্বরা শক্তির ক্ষয় ভয়াবহ। নীচের তালিকায় ইহার পরিচয় মিলিবে :*

চাউল উৎপাদন (একর প্রতি পাউণ্ডের হিসাবে)

	বাংলা	বিহার	মধ্যপ্রদেশ
১৯৩১-৩২	৯৬১	৯১২	৭১৮
১৯৪০-৪১	৬৫২	৫১৯	৪১৯
কমিয়াছে	৩০৯	৩৯৩	২৯৯

সার না দিয়া জমি পুনঃ পুনঃ চাষের ইহা স্বাভাবিক পরিণতি। এই প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি তুলনীয় :

* Estimates of Area and Yeild of Principal Crops in India. 1940-41, Table 2.

	চাউল (একর প্রতি পাউণ্ডের হিসাবে)
স্পেন	৫৫৪২
মিশর	৩৭১৯
ইটালী	৪৭৪৩
জাপান	২৯৯৮
আমেরিকা	২১৮৫
চীন	২৪৩৩
ভারতবর্ষ	৮২৮

গমের হিসাব ধরিলে দেখা যায় ভারতবর্ষের গম উৎপাদনের পরিমাণ মিশরের তিন ভাগের এক ভাগ এবং ইংলণ্ড ও ডেনমার্কের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এ দেশে আখের উৎপাদন জাভার তিন ভাগের এক ভাগ এবং তুলা জন্মে মিশরের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটিতে সর ম্যাকডুগাল বলিয়াছিলেন: ভারতবর্ষের গম উৎপাদনের পরিমাণ ফ্রান্সের সমান করিতে পারিলে দেশের সম্পদ ৬৬ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ইংলণ্ডের সমান করিতে পারিলে ১০০ কোটি পাউণ্ড বাড়িবে। ডেনমার্কের সমকক্ষ হইতে পারিলে বাড়্তি সম্পদের পরিমাণ হইবে ১৫০ কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ ২২৫০ কোটি টাকা। ইহা স্বপ্ন নয়, অসম্ভবও কিছু নয়। ঐ সব দেশ প্রত্যেকেই জমিতে সার দিয়া এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি অবলম্বন করিয়াই উৎপাদন বাড়াইয়াছে, ম্যাজিক করিয়া নহে। ভারতের জমিতে সার ব্যবহারের নমুনা এই:

দেশ	প্রতি বর্গ মাইল জমিতে ব্যবহৃত সার
বেলজিয়ম	৬০০ পাউণ্ড
জাপান	৪১০ "
জার্ম্মেনী	৩১০ "
ডেনমার্ক	২২৬ "
বৃটেন	১৭৮ "
ফ্রান্স	১৪১ "
ভারতবর্ষ	০·৬ "

বাংলায় চাউল উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ হইতেও অনেক কম। ১৯৪০-৪১-এর হিসাব:*

	চাউল (একর প্রতি পাউণ্ডের হিসাব)
বাংলা	৬৫২
বোম্বাই	৯১২
কুর্গ	১৬২২
মাদ্রাজ	১০৭৪
পঞ্জাব	৭০৯
ভারতবর্ষের গড়পড়তা হিসাবে	৬৮৪

বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় চাউল উৎপাদনের পরিমাণ বাংলা অপেক্ষা কম।

ভারতবর্ষের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে লিনলিথগো কৃষি কমিশন ১৯২৮ সালে মন্তব্য করিয়াছিলেন:

Such experimental data as are at our disposal support the view that when land is cropped year by year, and when the crop is removed and no manure is added, a stabilised condition is reached......A balance has been established, and no further deterioration is is likely to take place under existing conditions of cultivation."*

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে এরূপ মন্তব্য কেহ করিতে পারিত কিনা তাহা বিবেচনাযোগ্য। এই মন্তব্যের পর ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কত কমিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা ভাল হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় চাউলের উৎপাদন অন্যান্য প্রদেশ অথবা বিদেশ অপেক্ষা কম; সার ব্যবহার কম-হওয়া ইহার প্রধান কারণ।†

সেচ-ব্যবস্থাও তথৈবচ:

(লক্ষ একরের হিসাব)

	মোট কর্ষিত জমি	জল সেচের উপায়: খাল — সরকারী	খাল — বে-সরকারী	পুকুর	অন্যান্য	মোট সেচ-ব্যবস্থা সম্পন্ন জমি	মোট জমির শতকরা কত ভাগে সেচ-ব্যবস্থা আছে।
১৯০২-০৩	২২,২৪	১৫৬	১৩	৮১	১৯১	৪৪১	১৯·৫
১৯৩৯-৪০	২৪,৪০	২৫১	৩৯	৫৯	২০০	৫৪৯	২২·৫

মোট জমির শতকরা ২৩ ভাগে জল সেচনের বন্দোবস্ত আছে, বাকি ৭৭ ভাগের একমাত্র ভরসা বরুণদেব। গত ৩৮ বৎসরে শতকরা ৩ ভাগ মাত্র অধিক জমিতে জল সেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সামান্য বৃদ্ধিতেই পঞ্জাব ও সিন্ধু এই দুটি প্রদেশের চেহারা যে ভাবে ফিরিয়া গিয়াছে তাহাতে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ আয়োজন হইলে কৃষকের দুরবস্থা অনেকটা দূর হইতে পারিত।

জমিতে জল সেচের বন্দোবস্তের জন্য কোন্ প্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট কত টাকা মূলধনস্বরূপ লগ্নী করিয়াছে (capital expenditure on Irrigation) তাহার হিসাব:— ‡

বাংলা ...	৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা
মাদ্রাজ	২০ „ ১৬ „ „
বোম্বাই	১০ „ ৭৫ „ „
যুক্ত প্রদেশ	২৮ „ ৬১ „ „
পঞ্জাব	৩৪ „ ৯২ „ „
সিন্ধু	২৯ „ ৭৫

* Estimates of Area and Yeild of Principal Crops in India, 1940-41, Table 2.

* Para 77. † Floud Commission Report, Para 166.
‡ *Bengal Weekly*, Oct. 9, 1939.

জমির উপর চাপ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিবার ফলে জন প্রতি জমির পরিমাণ কমিয়াছে। ফ্লাউড কমিশন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে বর্ত্তমানে (১৯৪০-এ) বাংলায় হাজার করা ৪১৯টি পরিবারের প্রত্যেকের সম্বল ৬ বিঘা অথবা তাহারও কম জমি; ৬ হইতে ১২ বিঘা জমি আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা হাজার করা ২০৬। ১২ বিঘা জমিতেও একটি পরিবারের সম্বৎসরের খোরাকি চলে না, অথচ দশটির মধ্যে ছয়টি পরিবারকেই এই সামান্ত জমির উপর নির্ভর করিয়া উহারই যৎসামান্ত অনিশ্চিত আয়ে আধপেটা খাইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে হয়। ৩০ বিঘা অথবা তার চেয়ে বেশী জমি আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা সারা বাংলায় একশোর মধ্যে ৮টি।*

জমির আয়ে কৃষকের খরচ চলিতে পারে না, ইহা ১৯২৯-এ বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি এবং ১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশন হিসাব করিয়া অঙ্ক কষিয়া দেখিয়াছেন। ব্যাঙ্কিং কমিটির হিসাবে ১৯২৯-এ বাঙালী কৃষকের ফসল হইতে মোট (gross) আয় হইয়াছিল ২৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ফ্লাউড কমিশন এই হিসাবের ভুল ধরিয়া বলিয়াছেন কোন কোন জমিতে যে দুই বার ফসল হয় তাহা ধরিলে কৃষকের মোট প্রাপ্তি হইয়াছে ২৯৭ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৩০-এর পর ফসলের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধেক হইয়াছে ইহা ফ্লাউড কমিশনকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কিং কমিটির হিসাবেই কৃষকের আয় ১৪৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ফ্লাউড কমিশনের নিজের হিসাবে উহা ১৪৩ কোটি টাকা। ১৯৩১-এর সেন্সাসে বাংলায় কৃষকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ। অতএব কৃষকের জনপ্রতি আয় ছিল বার্ষিক ৪৩ টাকা। কৃষি কার্য্যের খরচ বাদ না দিয়াই কিন্তু এই অবস্থা। কৃষি ভিন্ন আয়ের অন্ত পন্থাও প্রায় নাই বলিলেই চলে। গাড়ী অথবা নৌকা চালানো, মাছ ধরা, মুরগী পোষা, দুধ বিক্রয় প্রভৃতিতে যে আয় হয় ফ্লাউড কমিশন তাহারও পরিমাণ বৎসরে ২৫ টাকার বেশী টানিয়া তুলিতে পারেন নাই। ব্যাঙ্কিং কমিটি কৃষকের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় ১৯৩০-এর মন্দার বাজারের পর হইতে বাঙালী কৃষককে ক্রমাগত দশ বৎসর আয়ের দ্বিগুণ ব্যয় করিতে হইয়াছে। ইকনমিক এনকোয়ারি বোর্ডেরও ইহাই অভিমত। অর্থাৎ এই কয় বৎসর প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত কৃষককে ক্রমাগত ঋণ করিতে হইয়াছে।† ঋণ শুধু জমিয়াছে শেষ হয় নাই। সমবায় সমিতিগুলি মরিয়াছে, ঋণ প্রাপ্তির অন্তান্ত পথগুলিও একে একে রুদ্ধ হইয়াছে।

* Floud Commission Report, Para 173.

† Floud Commission Report, Introduction to Statistics. by Sir F. Sachse. Vol. II.

ঋণ কি ভাবে বাড়িয়া চলিতেছে তাহার হিসাব :—

বৎসর	কৃষকের মোট ঋণ কোটি টাকা	কে হিসাব করিয়াছেন
১৯১১	৩০০	সর এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান
১৯২৪	৬০০	সর ম্যালকম ডার্লিং
১৯৩০	৯০০	সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কমিটি
১৯৩৮	১৮০০	মিঃ মনিরম

এই অসহনীয় অবস্থা হইতে কৃষককে বাঁচাইবার উপায় তাহার আয় বৃদ্ধি। বাঙালী কৃষক কোন কালেও একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে নাই, একটা না একটা কুটীর শিল্প প্রত্যেকেরই আয়ের দ্বিতীয় পন্থা ছিল। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সকলেই নানাভাবে কাজের সুযোগ পাইত এবং প্রত্যেকেই প্রয়োজনানুসারে কিছু-না-কিছু উপার্জ্জন করিত। ব্রিটিশ আমলে কারখানায় তৈরি মালের আমদানীতে এবং প্রায় সর্ব্ববিধ কুটীরশিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় এই সচ্ছলতা দূর হইয়া যায় এবং বাঙালী ও ভারতবাসী নিত্য অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কৃষিকার্য্যই হয় জীবিকানির্ব্বাহের চরম ও পরম অবলম্বন। ১৯২৮ সালে লিনলিথগো কমিশন কৃষকের আয় বৃদ্ধির উপায়-স্বরূপ ধানভানা, তেলপেষা, চিনি তৈরি, তুলা ঝাড়াই, লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি ও কাগজ তৈরি, হাড় পিষিয়া সার তৈরি, রেশমের কাপড় বোনা, মুরগী পোষা, মাদুর ঝুড়ি ও দড়ি তৈরি প্রভৃতি কুটীর শিল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে বাংলায় ইহাদের সবগুলিই প্রচলিত ছিল। এই সব সুপারিশ দাখিল করিবার পর লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষে বড়লাটরূপে সাত বৎসর কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রজনন ষণ্ড লইয়া এক আধটু হৈ চৈ করা ভিন্ন কৃষকের উন্নতিকল্পে আর কোন কাজই তিনি করিবার সময় পান নাই।

এই মারাত্মক অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার মধ্যেও বাংলাকে অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ট্যাক্স দিতে হয়। প্রমাণ*

	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের জন্ত জনপ্রতি দেয় ট্যাক্স
বাংলা	৭।০
মাদ্রাজ	৫।৶০
যুক্ত প্রদেশ	৩৶০
বিহার	১৸০

	জনপ্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত ট্যাক্স
বাংলা	৫৶০
মাদ্রাজ	১৸০
যুক্তপ্রদেশ	১।০
বিহার	৶০

* Floud Commission Report, Vol. I., p. 346.



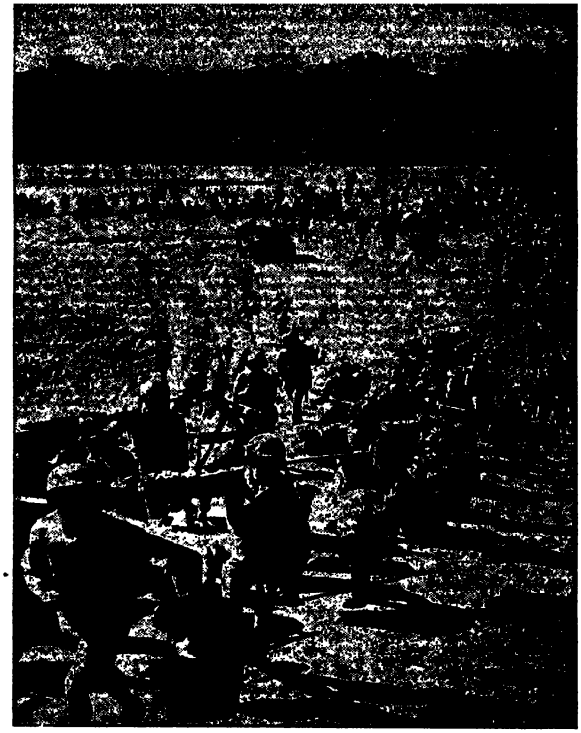
মাকিন জেনারেল ষ্টিলওয়েল কর্ত্তৃক মিত্র-বাহিনীর উত্তর-ব্রহ্মে অগ্রগতি অবলোকন



ব্রহ্মদেশের অরণ্যে আমেরিকান সৈন্যদের পায়ে হাঁটিয়া একটি নদী অতিক্রমণ



চিয়াং-কাই-শেক



ব্রহ্মে জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনা-বাহিনীর অভিযান

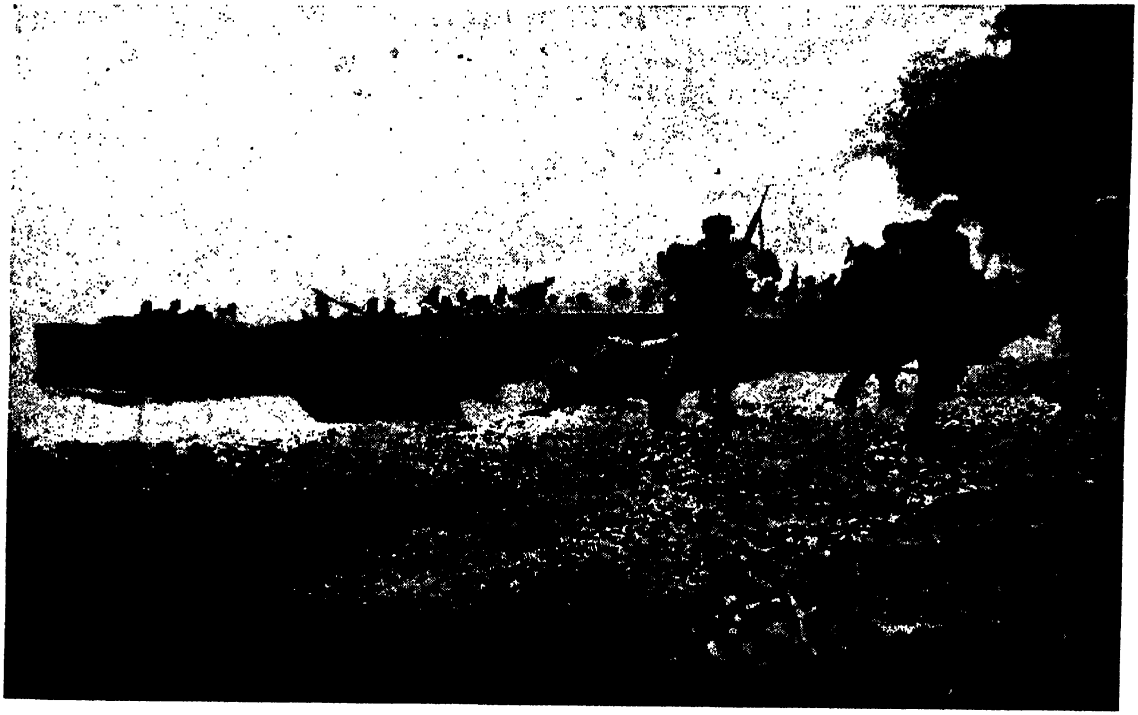


তিব্বতের লাবরাং মঠের প্রতিনিধিদের নেতা হুয়াং-চেং-চিং-(দক্ষিণে)এর সহিত আলোচনা-রত
চীনের সমর-সচিব জেনারেল হো-ইং-চিন (বামে)

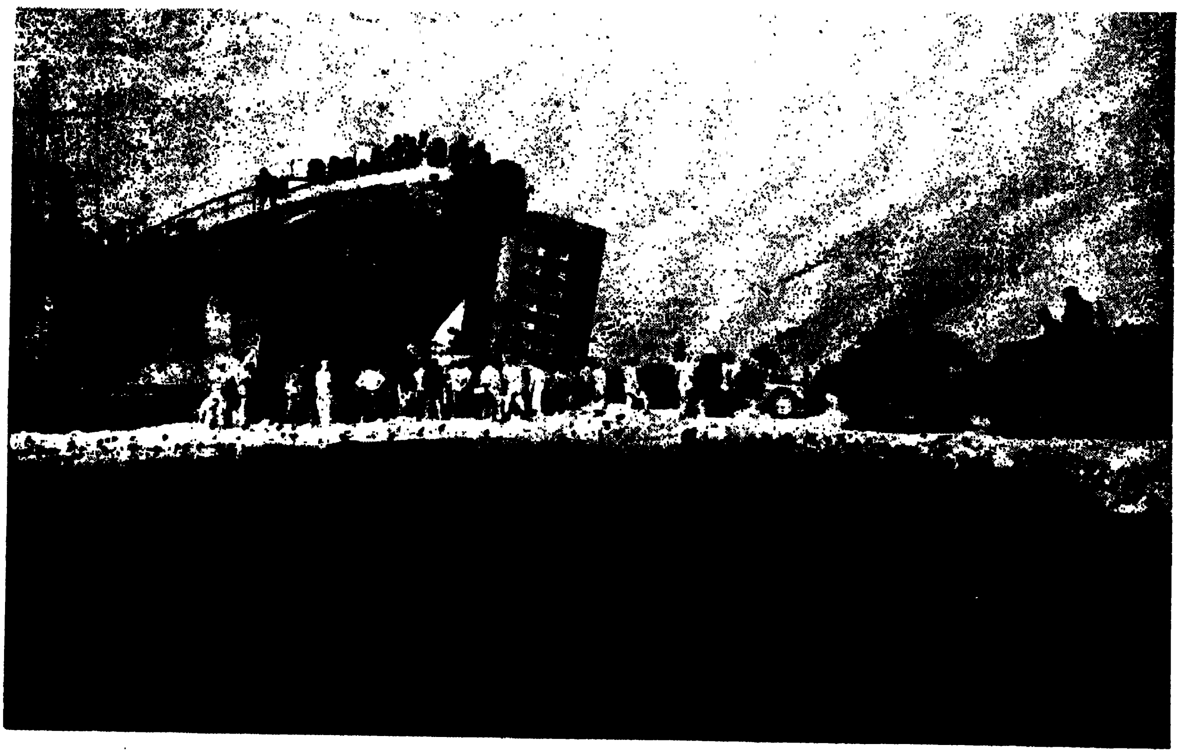




দক্ষিণ-চীনের কোনও এক স্থানে যুদ্ধ-শিক্ষা কেন্দ্রে চীনা সামরিক কর্ম্মচারী এবং পদাতিক সৈন্যগণ



মিত্রপক্ষের আক্রমণকারী সৈন্য বহনোপযোগী এক ধরণের উভচর নৌকা



দ্রুত ট্যাঙ্ক অবতরণ ব্যবস্থাযুক্ত মিত্রপক্ষের বিরাট 'ল্যাণ্ডিং-শিপ-ট্যাঙ্ক'

বাংলায় দুর্ভিক্ষের যে ঝড় বহিয়া গেল তাহা হঠাৎ আসে নাই। এক বৎসরের ফসল উৎপাদনের স্বল্পতা আপাতদৃষ্টিতে উহার প্রধান কারণ মনে হইলেও মূল কারণ উহা নহে। ১৯৩০ সালের পর হইতে কৃষিজাত ফসলের মূল্য অর্দ্ধেক কমিয়া যাওয়ায় এবং কৃষি ভিন্ন উপার্জ্জনের অপর সমস্ত পথ রুদ্ধ হওয়ায় বাঙালী কৃষক গত ১৪ বৎসর যাবৎ ধীরে ধীরে যে অনিশ্চিত মহা বিপদের মুখে পা বাড়াইতেছিল, গত দুর্ভিক্ষ তাহারই এক স্ফুরণ ভিন্ন আর কিছু নয়। তাহা ছাড়া বাংলায় উৎপন্ন ধানে বাঙালীর অনেক দিন ধরিয়াই কুলাইতেছিল না। বঙ্গীয় ধান ও চাউল অনুসন্ধান কমিটিকে হুগলী জেলা কৃষি সমিতি ১৯৩৮ সালেই বাংলার চাউলের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন ;*

আহার্য্যের জন্য প্রয়োজন	৯৮ ৩০ লক্ষ টন
বীজের জন্য প্রয়োজন	২ ৪০ "
	১০০·৭০ "
১৯৩১ হইতে ১৯৩৮এর মধ্যে শতকরা ৩ জন লোক বাড়িলে তাহাদের জন্য প্রয়োজন	২·৯৮ "
বর্ত্তমান প্রয়োজন	১০৩·৬৮ "
বাংলার মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ	৮৮·৩৮ "

* Report of the Paddy and Rice Enquiry Committee, Vol. II, p. 133.

দুর্ভিক্ষ এখানে হইবে না তো হইবে কোথায় ? অবস্থাটা দিন দিন কি ভাবে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, বেকার পোষ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যায় :

	উপার্জ্জনকারী	বেকার পোষ্য
১৯১১	১,৬২,২০,২০৫	২,৯২,৬১,৮৭২
১৯২১	১,১৮,৭২,৬৪৭	২,৪৮,৭৮,৪২৩
১৯৩১	১,৩৭,৫০,৫৮৫	৩,৫৬,৯৯,৫৮০

কিঞ্চিৎ কৃষি-ঋণ দান, বীজ সরবরাহ অথবা খাদ্যশস্য বৃদ্ধি আন্দোলন প্রভৃতির দ্বারা বাঙালী কৃষকের উন্নতির কিছু মাত্র আশা নাই ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে কৃষি, শিল্প ও সমবায় বিভাগকে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। জমির জন্য সার, সেচ ব্যবস্থা ও ভাল বীজ যেমন দরকার তেমনি প্রয়োজন কৃষকের আয়ের দ্বিতীয় পন্থা উদ্ভাবন, দালাল ফড়িয়ার কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করা এবং অল্প সুদে সহজলভ্য ঋণ দান। ধানের দর দশ টাকা চিরদিন থাকিবে না, যুদ্ধের পর উহা এক টাকায় নামিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে ; সেই সময় কৃষককে আবার যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তাহার কথাও আজ হইতেই ভাবিতে হইবে।

মেঘ

শ্রীগোপাললাল দে

মেঘ আসিয়াছে আকুল আকাশ ছেয়ে,
এমনি একদা মেঘ এসেছিল কালিন্দী-কূল বেয়ে।
ছায়া ঘনাইয়া ভাণ্ডীর বনে ব্যাকুলি' তমাল বন,
ভরি' দিল নভোকোণ ;
কদম্ব ফুটে, কেকারব উঠে, ত্রিমি ত্রিমি আহ্বানে,
গৃহকোণ সনে বনের বিরহ দুঃসহ করি আনে ;
কি মহাবিরহ ঘনাইল প্রাণে ! মিলিয়া অযুত কবি,
সীমাহীন কালে নিখিলের মনে এঁকে দিয়ে গেল ছবি।

আকুল আকাশ ঘিরে,
আর একদিন মেঘ নেমেছিল শিপ্রা নদীর তীরে।
জনপদ-বধূ হেরিছে তাহারে শফরী নয়ন দিয়া,
কোথাকার বাণী কোন্ অলকায় চলিছে বহিয়া নিয়া ;
কভু গরজনে, তড়িত দাহনে, কখনও বরষ-ক্ষীণ,
সিদ্ধ-বালার মুগ্ধ নয়নে রামধনু—রঙীন,
বায়ু অনুকূল বলাকা বিছানো বরিহা-রুচির ছবি,
মন্দাক্রান্তে গাঁথিয়া সাজালো মহাকালে মহাকবি।

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গগনে গগনে বাজি,
আবার একদা মেঘ ছেয়েছিল নীল অরণ্য রাজি,
পথে বেণুবন দুলে ঘন ঘন কুলায়ে কপোত কাঁপে,
দাদুরী সঘনে ডাকে কেয়াবনে উন্মদ উত্তাপে,
তালীবন-শিরে বনের শিয়রে মেঘের উপরে মেঘ,
বাতায়নবাসী কবিঋষি-প্রাণে ছন্দে বাড়ায় বেগ ;
স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল দিনে,
নবগীত ঝরি চির ঝঙ্কৃত রহিল রবির বীণে।

তেমনি আবার মেঘ ফিরে এলো মোদের গ্রামের শীষে,
ঘন কালো ছায়ে ভরি প্রান্তর বনান্তে গিয়ে মিশে,
কচি পাতাগুলি, অশথ তরুটি অজানা কি ভয় গ'ণে,
সার দিয়ে চলে সারসের মালা গগনের অঙ্গনে,
ঘাট হতে ফেরে ত্রস্ত বধূরা উদগ্রীব গাভী ছুটে,
সহজ চপল বালকের দল আম্রকানন লুটে ;
নিম-নিকুঞ্জে একমনা পিক গায়,
এত সুন্দর ! জলের লিখনে শুধু লেখা থাকে হায়।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

উত্তর-ফ্রান্সের নর্ম্মাণ্ডি অঞ্চলের যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায় এখনও সমাপ্ত হয় নাই। ঐ অঞ্চলে মিত্র পক্ষের রণনায়কগণ এখনও যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি এবং যন্ত্র-যুদ্ধের উপযোগী রণাঙ্গন স্থাপনের প্রয়াসে ব্যস্ত। আজ প্রায় ছয় সপ্তাহ হইতে চলিল, উত্তর-ফ্রান্সে এই তাণ্ডবলীলা চলিতেছে কিন্তু এখনও ইহা চরমে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখনও মিত্রপক্ষের চেষ্টা চলিতেছে অল্পে অল্পে রক্ষণ-দুর্গমালা ভাঙিয়া, নিজ করায়ত্ত করিয়া, প্রতিরোধকারী পক্ষকে বিপাকে ফেলিয়া সম্যক্‌ভাবে নিজের আক্রমণ-শক্তিকে প্রয়োগ করার জন্য। এখন যে অবস্থায় যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে মিত্রপক্ষ নিজের প্রচণ্ড সৈন্যবল ও অস্ত্রবল যুদ্ধে যোজিত করিতে পারিতেছে না। অন্য দিকে জার্ম্মান রণনায়কগণের চেষ্টা চলিতেছে মিত্রপক্ষের সমস্ত শক্তিকে অল্প আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার অস্ত্র চালনায় বাধা দেওয়ায়। যে বিরাট্ সৈন্য ও অস্ত্রবল এখন মিত্রপক্ষে যুদ্ধে নামিয়াছে তাহার কোনও বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই, তবে জার্ম্মান সাংবাদিক দপ্তরের অনুমানে একমাত্র ব্রিটিশ দলই সংখ্যায় পাঁচ লক্ষাধিক। তাহাদের সঙ্গী মার্কিণ দলও কাছাকাছি ঐরূপ সংখ্যায় সৈন্যবল উত্তর-ফ্রান্সে নামাইয়াছে ইহা ভাবা বোধ হয় অসমীচীন নহে। জার্ম্মান অনুমান অনুসারে এই যুক্তদলের সঙ্গে ৩০০০ বা ততোধিক ট্যাঙ্ক রহিয়াছে এবং বলা বাহুল্য অসংখ্য কামান ইত্যাদিও নামিয়াছে। এই বিরাট্ শক্তির ভার অতি বিষম সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সম্যক্ প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত দৈর্ঘ্য প্রস্থ অস্ত্রচালন ভূমি প্রয়োজন এবং ঠিক ঐ কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্যই জার্ম্মানি তাহার রক্ষাব্যূহের সঙ্গে দুর্গমালার যোজনা করিয়া "পশ্চিম প্রাকার" নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই রক্ষাব্যূহ গঠন ও দুর্গমালা নির্ম্মাণে জার্ম্মানি চার বৎসর কাল এবং অশেষ মালমসলা ও শক্তিসাধ্য যোজনা করিয়াছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষ যে প্রচণ্ড শক্তিপ্রয়োগে অবিশ্রাম অগ্নি ও রক্তের প্লাবন বহাইতেছে তাহা সত্ত্বেও যে ইহা অতি ধীরে ধীরে ভাঙিতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। জার্ম্মানি জানে যে মিত্রপক্ষ যদি ঐ দুর্গমালা ছেদ করিয়া ফ্রান্সের ভিতরে কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইলেই আরও সৈন্যবল ও আরও অস্ত্রবল ফ্রান্সে নামিবে এবং তাহার অল্প দিনের মধ্যেই ফ্রান্সে পূর্ব্ব-ইউরোপের মত সুদূর প্রসারিত রণাঙ্গনে ঘোর যুদ্ধ চলিতে থাকিবে যাহার ফলে জার্ম্মানির যুদ্ধশক্তি দ্রুত ক্ষয় পাইয়া ধ্বংসের পথে চলিবে। সুতরাং এখন জার্ম্মানি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে মিত্রশক্তির অভিযান ঐ বিস্তৃত "পশ্চিম প্রাকার"-স্থিত দুর্গমালার মধ্যেই এখন কিছুদিন আবদ্ধ থাকে। পশ্চিম প্রাকারের দুর্গমালার প্রসার কতটা তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং ইহাও সম্ভব যে জার্ম্মানদল তাহাদের শক্তির বৈষম্য দূর করার জন্য অন্য প্রকার রক্ষা-ব্যূহ গঠনের ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছে—ম্যাজিনো এবং জিগ্‌ফ্রিড দুর্গমালা তো আছেই—কিন্তু মিত্রপক্ষের সর্ব্ব প্রধান সমস্যা এখন এই—"পশ্চিম প্রাকারে"র রক্ষাব্যূহকে বিফল করা এবং যত দিন না তাহা হইতেছে তত দিন দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্তের সম্যক্ যোজনা হওয়া সম্ভব নহে।

ইতিমধ্যে জার্ম্মানি "উড়ুক্কু বোমা" চালাইয়া মিত্র-পক্ষের যুদ্ধচেষ্টায় বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই বোমা ক্ষতিকারক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা স্বয়ং চার্চ্চিল ইহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মনে হয় ইহার ক্ষমতা অতি সীমাবদ্ধ এবং ইহার যুদ্ধাস্ত্র রূপে প্রয়োগও বিশেষ সম্ভব নহে, তবে মিত্রপক্ষের অসামরিক লোকজনের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি ইহা হইতে ঘটিতে পারে।

রুশ রণপ্রান্তের অবস্থা ভিন্ন রূপ। সেখানে তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্ম্মান রক্ষাব্যূহ বহু স্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কোথাও জার্ম্মান রক্ষীসেনা দাঁড়াইয়া যুদ্ধদানে সমর্থ হয় নাই। সোভিয়েট সেনা সংযুক্ত অভিযানে প্লাবনের স্রোতের ন্যায় ক্রমেই জার্ম্মান সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। রুশ সমর-পরিষদ এই অভিযানে সোভিয়েটের শক্তি সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সবকিছু প্রয়োগ করিয়া শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, সুতরাং জার্ম্মানদলের এই প্রচণ্ড অগ্নিপরীক্ষা উত্তরোত্তর চরমে উঠিবে সন্দেহ নাই। আর পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ইহা প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, জার্ম্মানির শক্তি সামর্থ্যের কতটা অবশিষ্ট আছে এবং তাহার কতখানি অংশ সোভিয়েট সেনার বিরুদ্ধে প্রযোজিত হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় জার্ম্মানদল পিছাইয়া আসিয়া রক্ষাব্যূহ সঙ্কুচিত

করার চেষ্টা করিতেছে যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সৈন্যবল লইয়া রক্ষণকার্য্য সম্ভব হয়। সোভিয়েট সেনার অগ্রগতির বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু হ্রাস পাইয়াছে মনে হয় এবং তাহার ফলে বল্টিক রণাঙ্গনের জার্মানবাহিনীর সোভিয়েটের বেড়াজালে না পড়াই সম্ভব। জার্মান জাতির পিতৃভূমির বিপদ এখন ঘনাইয়া আসিতেছে এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, যুদ্ধ এই সকল অঞ্চলে ক্রমেই ঘোর হইতে ঘোরতর আকৃতি ধারণ করিবে। আগামী চার মাসের মধ্যে পূর্ব্ব-ইউরোপে শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা চরমে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই এবং তাহার ফলাফল নির্ভর করিবে পশ্চিমে মিত্রপক্ষের ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগের উপর।

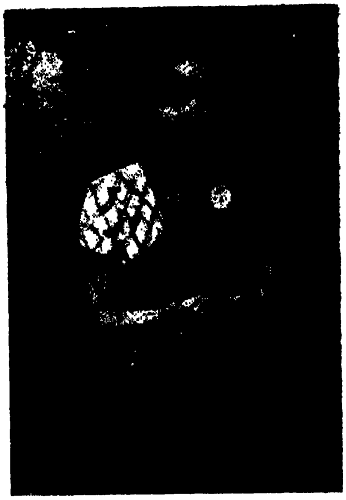
ইটালীতে যুদ্ধ পূর্ব্বেরই মত এক ঘাঁটি ডিঙ্গাইয়া আর এক ঘাঁটিতে গিয়া ঠেকিতেছে। ইটালীর পর্ব্বতমালা ও নদ-নদী-হ্রদ রক্ষী জার্মানদলের বিশেষ সহায়ক এবং উহারাও তাহার সুবিধা-সুযোগ পুরাপুরিই গ্রহণ করিতেছে। জার্মান সেনানায়কদিগের শক্তি-সামর্থ্য এখন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মিত্রপক্ষের অনেক নীচে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহারা রণকুশলী এবং তাহাদের সেনাদলও সুদক্ষ, সুতরাং ইটালীতে দ্রুত মীমাংসার কোনও বিশেষ চিহ্ন এখনও দেখা দেয় নাই।

মোটের উপর সম্মিলিত জাতি দলের নেতৃবর্গ আজ দুই বৎসর ধরিয়া যে-দিনের কথা জগতের লোককে শুনাইয়া আসিতেছিলেন এখন সেই দিন উপস্থিত। ইউরোপে অক্ষ শক্তি এখন পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে যুগপৎ আক্রমণে বিব্রত এবং শেষ পরীক্ষার জন্য মিত্রপক্ষের সবল প্রয়াসের কোনও বিরাম বিরতি নাই। চার্চ্চিল তো এক রকম স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই গ্রীষ্মকালের মধ্যেই জার্মানীর পতন হইবে এবং অন্যান্য উচ্চ অধিকারিবর্গের অনেকেই এই বৎসরের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত জার্মানীর অন্তের শেষ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বলা চলে যে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ আয়োজন এখন চরমে পৌছিয়াছে এবং তাহার নেতৃবর্গের মনে সন্দেহ নাই যে ১৯৪৪ সালে ইউরোপের মহাযুদ্ধ সাঙ্গ হইবে। আমরা ইউরোপের বিশেষ জার্মানির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অল্পই জানি এবং মিত্র পক্ষের আয়োজন সম্বন্ধেও বিশেষ খবর পাই নাই সুতরাং এ বিষয়ে বিচার করা আমাদের পক্ষে বৃথা। তবে ইহা দেখা যাইতেছে যে, জার্মান নেতৃবর্গের যুদ্ধেচ্ছা এখনও কমে নাই এবং জার্মান সেনা এখনও পূর্ব্ববৎ দুর্দ্ধর্ষ রহিয়াছে এবং এইরূপ অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন না ঘটিলে এই বৎসরের মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধের শেষ কি ভাবে ঘটিতে পারে তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম। বৎসর কাল যুদ্ধ চলিলে অবস্থা অন্যরূপ হওয়া খুবই সম্ভব তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

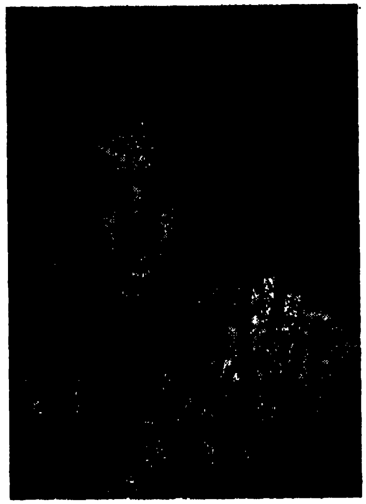
এসিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা পূর্ব্বের ধারাতেই চলিয়াছে। জাপানের যুদ্ধশক্তিতে অধোগতির কোনও নির্দ্দেশ আমরা পাইয়াছি মনে হয় না, বরঞ্চ চীনদেশে তাহাদের নূতন অভিযান যেভাবে চালিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে জাপান ক্রমেই তাহার শক্তি গঠনের কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্রপতি খোলাখুলি ভাবেই বলিয়াছেন যে, স্বাধীন চীনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চীন তাহার স্বাধীনতার যুদ্ধের অষ্টম বৎসরে প্রবেশ করিয়াছে এবং আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদযুক্ত জাতিবর্গ সঙ্গী এবং সহায়ক, অথচ যদি এত দিন পরে এরূপ কথা আমাদের শুনিতে হয় তবে আমাদের বলিতেই হইবে যে সম্মিলিত জাতিবর্গের উচ্চতম অধিনায়কগণ চীনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন কি না তাহা জিজ্ঞাস্য। চীন জাপানের বিরুদ্ধে যেরূপ আত্মবলিদান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে সেই দৃষ্টান্ত জগতে অতুলনীয়। সোভিয়েট রুষও স্বাধীনতা-যুদ্ধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়াছে কিন্তু তাহার সঙ্গতি ছিল চীনের বহু সহস্রগুণ এবং সে ছিল যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। বিত্তহীন, সামর্থ্যহীন, প্রায় সঙ্গীহীন, প্রায় নিরস্ত্র জাতি কেবলমাত্র স্বাধীনতার আদর্শে বলীয়ান হইয়া সাত বৎসর দুর্দ্ধর্ষ রণকুশল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করিয়াছে এই দৃষ্টান্ত জগতে চীন প্রথম দিল। এই সঙ্গে বলা উচিত যে, এই সাত বৎসরের প্রথম চার বৎসরে চীনের বর্ত্তমান মিত্রপক্ষ তাহাকে কেবল মুখের কথাতেই উৎসাহ দিয়াছিল, যুদ্ধের সম্ভার দিয়াছিল জাপানকে। অথচ চীন বাধা না দিলে জাপানের জয়যাত্রার প্লাবন এসিয়ার অন্য প্রান্তে গিয়া ইউরোপের অক্ষশক্তির সহিত মিলিত হইতে পারিলেও পারিত একথা বলা নিতান্ত অত্যুক্তি নহে।

আশা করা যায় মিত্রপক্ষের উচ্চতম সমর-পরিষদের এসিয়ার বিষয়ে এই দৃষ্টিভ্রম হইতে আরও বিষময় ফল কিছুই ফলিবে না। অবশ্য সময় এখনও আছে এবং ইউরোপের যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইলে জাপানের শক্তিগঠনের ব্যাপারে অতি প্রবল বাধা পড়িবে। কিন্তু সব কিছুরই সীমা আছে, সময়েরও এবং যুদ্ধ ও সহ্যশক্তিরও, এবং স্বাধীন চীন সেই সীমার নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। যদি কিছু অঘটন ঘটে তবে দোষ তাহার নয়, যদিও বিপদ তাহারই অধিক—অন্ততঃ প্রথম দিকে।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী জয়া গঙ্গোপাধ্যায়



শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

শ্রীমতী জয়া গঙ্গোপাধ্যায় নন্-কলেজিয়েট ছাত্রী রূপে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ব্বে আই-এ পরীক্ষার পাঠ এক বৎসরের মধ্যেই সমাপন করিয়া তিনি ইহাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি বহু সুবর্ণ পদক এবং পুরস্কারও লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী জয়ার বয়স মাত্র অষ্টাদশ বৎসর। তিনি অমরাবতীর (বেরার) লেঃ কর্ণেল নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুহিতা।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ময়মনসিংহের উকীল পরলোকগত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

পুস্তক-পরিচয়

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ২২৩। মূল্য ৩৷৹।

এই রচনা পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে, তারপর এ পর্যন্ত আরও ছ'বার ছাপা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক ব্যক্তি, বিষয় এবং ঘটনা সম্বন্ধে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য—গ্রন্থের শেষে যোজিত ৫১ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'গ্রন্থপরিচয়', কবির বংশলতা, এবং বর্ণক্রমিক উল্লেখপঞ্জী।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র সূচনায় লিখেছেন—'এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য।…নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।…এই স্মৃতিগুলি সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।'

রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, পাঠকবর্গের কাছে এই রচনা শুধুই সাহিত্য নয়। জীবনবৃত্তান্ত হিসাবে 'এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ' হ'তে পারে, কিন্তু 'অনাবশ্যক' মোটেই নয়। কেউ যদি নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা নাও বলেন তথাপি নানা উপায়ে তাঁর জীবনের একটা ইতিহাস সঙ্কলন করা যেতে পারে। অধিকাংশ জীবনবৃত্তান্ত এই রকম। কিন্তু এ সব বৃত্তান্ত যতই উত্তম হ'ক, তা মূলত বাহ্যদৃষ্ট জীবন-চরিত, অর্থাৎ কীর্তি বা আচরণের ইতিহাস। মানসিক ইতিহাস বা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় জানবার শ্রেষ্ঠ উপায় আত্মচরিত, তা যতই অসম্পূর্ণ হ'ক। 'জীবনস্মৃতি'র একটি পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে—দর্শক ভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি। ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ।' এই পশ্চাদ্দর্শন বা retrospection এর জন্যই 'জীবনস্মৃতি' অমূল্য গ্রন্থ।

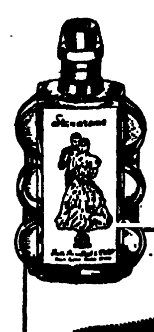
বর্তমান সংস্করণের শেষে যে 'গ্রন্থপরিচয়' সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা মূল গ্রন্থের পরিপূরক এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। যাঁদের চেষ্টায় এই সুদৃশ্য সুমুদ্রিত সটীক তথ্যবহুল সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা অশেষ প্রশংসার যোগ্য।

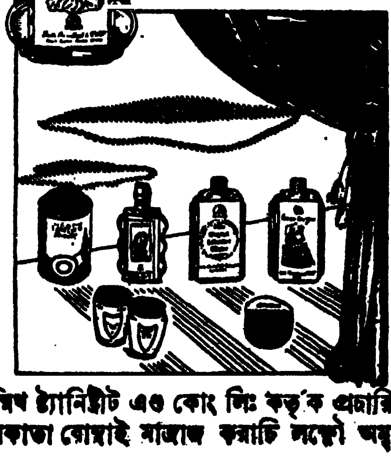
শ্রীরাজশেখর বসু

দুঃখনিশার শেষে—শ্রীমনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গল্পের বই। এই সংগ্রহে মন্বন্তর, বন্যা, কণ্ট্রোলের লাইন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, মানুষ ও গোরু, নেতা মহিমার্ণব, ঘরে আগুন, দুঃখ-নিশার শেষে প্রভৃতি গল্পগুলি আছে। কাহিনীগুলি সর্বহারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দরিদ্রের দুঃখ-দুর্দশা লইয়া রচিত। ধনবৈষম্যে সমাজ-ব্যবস্থার কলুষ কত দিকে এবং কত ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করিয়া মানুষের







জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে—এগুলিতে তাহা নিপুণভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

মনোজবাবু শক্তিমান্ লেখক। অনুভূতি তাঁহার তীব্র, মন দরদী। এই দরদ কোন কোন ক্ষেত্রে ভাববিলাসে পর্য্যবসিত হইয়া একশ্রেণীর পাঠকচিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। মনোজবাবু সে চেষ্টা মাত্র করেন নাই। গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয়, কৃষক-জীবনের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। তাই উহাদের আচার-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-জাড্য-মূঢ়তা মিশাইয়া বেদনা-জ্বালাময় ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন। এই বেদনা কোথাও ঘটনা-বিন্যাসে, কোথাও কোথাও সংলাপে, কোথাও বা মন্তব্যের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভূমি ও অন্নবঞ্চিতের জ্বালা কোন কোন গল্পে এত তীব্র হইয়া ফুটিয়াছে যে, আখ্যান ভাগকে অতিক্রম করিলেও গল্প-রস-বিচ্যুত মনে পীড়া জন্মায় না।

পয়লা এপ্রিল—কানাই বসু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

লেখক বাংলা-সাহিত্যে নবাগত। নবাগত হইলেও তাঁহার বলিবার ভঙ্গিটুকু ভাল। প্লটে বৈচিত্র্য আনিবার ও কৌতুক রসে গল্পগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার প্রয়াস আছে। পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রাখিবার জন্য গল্পের গতিকে ভিন্ন পথে চালনা করিবার কৌশলও তিনি জানেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এই একটি নীতি অনুসরণ করিলে বৈচিত্র্যহানি ঘটে এবং অতি আকস্মিকভাবে গল্পের মোড় ঘুরাইয়া দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে রসভঙ্গ হয়। ছোট গল্পের আরও শেষের মধ্যে একটি সুরের সংহতি থাকা আবশ্যক। পরিমিত মাত্রাজ্ঞানের অভাবে—বহু ভাল গল্পও ঠিকমত জমে না। কোন কোন গল্পে এইভাবের ত্রুটি কিছু আছে। 'বড়বাবু' গল্পটি অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার দৃষ্টির প্রসার আছে। কতকগুলি চিরাচরিত প্রথার অন্ধকার কোণে—সুকৌশলে যে আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহাও উপভোগ্য।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গে সুফী প্রভাব—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল্ হক্, এম্-এ, পিএচ-ডি। মোহসিন্ এণ্ড কোং, ৬৬।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজি, ২৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থখানিতে সুফী মত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সুফীমতের উৎপত্তি ও প্রসারের ইতিহাস এবং বঙ্গের তথা ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুফীগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলার হিন্দুদের উপর সুফী প্রভাবের নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থকার চৈতন্য ও বাউল সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে এই দুই সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মতত্ত্ব সমস্তই বহুল পরিমাণে সুফী প্রভাবে প্রভাবিত—পক্ষান্তরে পীরবাদ বা পীর পূজার উপর হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব পরিস্ফুট। গ্রন্থকারের ভাষায়—'সুফীদের জীবনের সহিত তাঁহার (চৈতন্যদেবের) জীবনের যে মিল তাহা গভীর ও ব্যাপক' (পৃ. ১৬৯); 'বঙ্গীয় মুহ্‌রবর্দীয়হ ও চিশ্‌তীয়হ্ সম্প্রদায়ের "সমা"-এর প্রভাবে কীর্ত্তনের সৃষ্টি বলিয়াই আমাদের ধারণা' (পৃ. ১৭০); 'সুফীদের "ইশ্‌ক্" তত্ত্ব ও বৈষ্ণবদের "রাধাতত্ত্বে"ও মিল রহিয়াছে' (পৃ. ১৭৪); 'প্রেম ধর্ম্ম প্রচার যদি সত্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা তাঁহারা বঙ্গীয় সুফীদের নিকট হইতে

লাভ করিয়াছিলেন' (পৃ. ১৭৮) ; 'বাউলদের অজ্ঞাত মর্ম্ম-সন্ধানের ধারা, সুফীদের "হয়্‌ব্‌" সন্ধানের (তলব) ধারার সহিত সমসূত্রে গ্রথিত' (পৃ. ২১০) ; 'প্রাচ্য মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ "চৈত্য পূজা" যদি "পীর" পূজা, গোর পূজা প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই' (পৃ. ২৩১) ; 'প্রাচ্য দেশীয় মুসলমানদের "পীরী-মুরীদী" হিন্দু "গুরুবাদেরই" নব্য সংস্করণ' (পৃ ২৩২)। অবশ্য সাদৃশ্য মাত্রই একের উপর অন্যের প্রভাবের প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া সকল ক্ষেত্রে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। তবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের মানবের চিন্তাধারার ঐক্যের নিদর্শন হিসাবে এই জাতীয় সাদৃশ্য কৌতূহলজনক। এই দিক দিয়া গ্রন্থখানি বিশেষ উপভোগ্য। গ্রন্থকারের কয়েকটি উক্তির সমর্থক তেমন কোন সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নাই। যথা—'এদেশের তান্ত্রিক শক্তি দরবীশ্‌দের হাতে অপ্রত্যাশিত ও প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত হইয়া পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক কালক্রমে ধীরে ধীরে দেশ হইতে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল' (পৃ. ১২৯-৩০)। 'যদিও রঘুনন্দন সমাজে প্রাচীন হিন্দু আচার-বিচারের পুনঃপ্রচলন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার হাতে হিন্দু ধর্ম্ম ও আচার অনেকখানি না হইলেও কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাহা ইস্‌লামেরই প্রভাবে সংঘটিত হয়' (পৃ. ১৮৫)। স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

পীরবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কতকগুলি উক্তি (২২৮, ২৩৩ পৃষ্ঠা) এ জাতীয় আলোচনামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের পক্ষে শোভন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা—শ্রীঅনাথনাথ বসু। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

এখানি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ত্রয়োবিংশ পুস্তক। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান কালে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই লেখক বিশেষভাবে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, শিক্ষা-সংস্কার কল্পে ইদানীন্তন সরকারী ও বে-সরকারী পরিকল্পনাসমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষা, বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা, বর্ত্তমানে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ইহার পরিচালনায় সরকারী ও বে-সরকারী কর্ত্তৃত্ব কতখানি থাকিবে, এবং কোন্‌টি কতখানি থাকিলে তাহা সাধারণের কল্যাণপ্রদ হইবে, ইহা লইয়া বর্ত্তমানে ভীষণ তর্ক উঠিয়াছে। শিক্ষাবিৎ অনাথবাবু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া এবিষয়টিও আলোচনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সব বিবেচনা করিলে, স্বল্পপরিসর এই পুস্তকখানি যে বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই বলিতে হয়। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

যুদ্ধ যখন থামবে—শ্রীসুবিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমলেন্দু দাস গুপ্ত। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯২। মূল্য এক টাকা।

বইখানির আলোচ্য বিষয় যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংগঠন ও ভারতবর্ষ, যুদ্ধোত্তর সাহিত্য এবং যুদ্ধোত্তর জীবনাদর্শ। প্রথমটা লইয়া ইতিমধ্যে সরকারী ও বে-সরকারী আলোচনা সুরু হইয়াছে, এমন কি ভারত ও প্রাদেশিক সরকারগণের নূতন বিভাগ খোলা হইতেছে। এই বিষয়ে মিত্রপক্ষের প্রত্যেক জাতি সজাগ, যদিও যুদ্ধবিরতির চিহ্ন এখনও বিশেষভাবে দেখা যায় না। লেখক দেশী বিদেশী পরিকল্পনার বিচার করিয়া ভারতের স্বার্থের মানদণ্ডে তাহা যাচাই করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক বিদেশী সাহিত্যের বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু স্বদেশী বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ততটা তৎপরতা দেখান নাই। জাতীয় স্বাধীনতার অভাবই যে জাতীয় সাহিত্যের স্ফুরণের পক্ষে প্রতিবন্ধক লেখক তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু জাতি কেবল স্বাধীন হইলেই যে তাহার সাহিত্য বড় হইবে ইহাও স্বীকার করা যায় না। তবে জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা জাতীয় সর্ব্বমুখী উন্নতির সহায়ক সন্দেহ নাই। যুদ্ধোত্তর জীবনাদর্শ একটা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা। সংকীর্ণ জাতীয় আদর্শ এই মহত্তর জীবনাদর্শের প্রতিকূল। যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর দেশ ও জাতিসমূহ যে পরিমাণে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবে সেই পরিমাণে এই মানবজীবনাদর্শ উন্নত ও পূর্ণ হইবে।

তরুণ লেখকগণ বাংলা ভাষায় বর্ত্তমান সময়ের এই সকল জীবন্ত বিশ্ব-সমস্যাগুলির আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকের পরিচিতিতে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইহাকে সুলক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জীবনের চলস্রোত

গতির ভেতর দিয়ে জড়-জগৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবনের সাদৃশ্য লাভ করে বলেই হয়ত প্রবল জলস্রোতের একটি অদ্ভুত আকর্ষণ আছে মানুষের কাছে। বিশাল নদী মানুষকে চিরদিন কাছে টেনেছে শুধু প্রয়োজনের দিক দিয়েই নয় সৌন্দর্য্য দিয়েও।

কিন্তু জড়ের এই প্রবাহের চেয়েও বিস্ময়কর বুঝি জীবন্ত জীবন, দুরন্ত জনস্রোত বৈচিত্র্যে ও বর্ণাঢ্যতায় নদীর বন্যারূপকেও ছাড়িয়ে যায়। হাওড়ার পুলের কাছে দাঁড়িয়ে নীচের নদীকে ভুলে মানুষের অপরূপ প্রবাহের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। নিছক গতির চেয়েও আরো কিছু আছে সেখানে দুর্ব্বোধ্য ও ভয়ঙ্কর কোন ইঙ্গিত। চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ নগরের সত্যকার অর্থ প্রতিভাত হয়ে ওঠে আমাদের মনে। নগর মানে জীবনের একটা প্রচণ্ড বিপুল ঘূর্ণিপাক, উত্তাল হয়ে। উঠেছে আকাশের পানে, গভীর ভাবে যা নেমে গিয়েছে রসাতলে। তার দুর্ব্বার আকর্ষণে নানা মানুষের স্রোত এসে মিলেছে দুরন্ত বেগে, উঠেছে উত্তুঙ্গ হয়ে, ঢেউয়ের মাথায় তলিয়ে যাচ্ছে অসহায় ভাবে; নগরের মোহনায় এই জনস্রোতের দিকে চাইলে বিস্ময়ের সঙ্গে একটি বেদনাও জাগে আমাদের মনের নেপথ্যে। এই বিপুল ঘূর্ণিপাকে যারা মিলিত হতে চলেছে, কে জানে, তাদের কত জন সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাবে। জাহ্নবীর সেতু নয় অনেকে বুঝি এই সঙ্গে জীবনের সেতুও পার হচ্ছে, তারা নগরে নয় তাদের সমাধিতেই প্রবেশ করছে।

নগর তোরণের এই জনস্রোতকে একটু বিশদভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তার ভেতর অনেক শ্রেণীর অনেক বয়সের অনেক রকম মানুষ চলেছে নূতন জীবনের উন্মাদনায়। দরিদ্র দম্পতি আসছে সচ্ছল একটি সংসারের স্বপ্ন নিয়ে, দিনমজুর চলেছে সুযোগের আশায়, ধূর্ত্ত সমাজ-শত্রু চলেছে শিকারের খোঁজে।

এর মধ্যে দরিদ্র দম্পতিকেই অনুসরণ ক'রে নগরের অত্যন্ত ঘিঞ্জি নোংরা অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে সস্তা বাসস্থানের খোঁজে যাওয়া যেতে পারে। সংকীর্ণ গলিপথে সূর্য্যের আলো ঘৃণায় আসে না সেখানে, সেখানকার বদ্ধ বাতাস ধূলি, ধূম ও বিষাক্ত জীবাণুতে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে নিরন্তর। সঙ্কীর্ণ একটি কি দুইটি একতলার গবাক্ষহীন অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে এই ছোট্ট পরিবারের সংসার-যাত্রা আরম্ভ হয়। স্বামী সারাদিন জীবিকার জন্য ঘুরে হয়রান হয়। বধূটি সঙ্কীর্ণতার কারাগারে গৃহের শ্রী দেবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে। আহারের পুষ্টিকর খাদ্য মেলে না, নিশ্বাসের বিশুদ্ধ বাতাসও নয়। ধীরে ধীরে বুঝি মেয়েটিই প্রথম কৃশ হতে থাকে। শীর্ণ মুখে দেখা যায় অস্বাভাবিক দীপ্তি—স্বাস্থ্যের লাবণ্য এ নয়, মুখে তার শুধু মৃত্যুর অপার্থিব আভা লেগেছে। নির্ব্বাণের আগে দীপ উঠেছে উজ্জ্বল হয়ে শেষ বার। অক্লান্ত চেষ্টায় হয়ত ছেলেটি একটা কাজ পেয়েছে। কিন্তু কি লাভ আর কাজ পেয়ে। নগরের বিষক্রিয়া তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। মেয়েটির জর তখন ধরা পড়েছে, সঙ্গে খুস্ খুস্ কাসি। ডাক্তার যা বলবার বলে গেছেন, শুধু নিজেদের কাছে একে যক্ষ্মা বলে স্বীকার করবার তাদের সাহস নেই।

প্রতিদিন এ মর্ম্মান্তিক কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে নগরের নানাস্থানে। এই মেয়েটির মত আরো অনেকেই নগর থেকে আর ফিরবে না আমরা জানি। সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার এই যে, সময়ে সামান্য একটু চেষ্টা করলে এ কাহিনীর সমাপ্তি এমন করুণ হ'ত না।

দামী ঔষধ খাওয়া হয়ত তাদের সম্ভবপর হ'ত না কিন্তু **'পেট্রোমাল্সন্'** নিয়মিত প্রথম থেকে খেলে হয়ত এ কাহিনী সম্পূর্ণ অন্য পথে ঘুরে যেত।

বিজ্ঞাপন

চিরন্তনী

সারা বাড়ীতে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। আজ ক'দিন হ'ল ছোটবৌ সুলতা একটি সন্তান প্রসব করে এমন কাহিল হয়ে পড়েছে যে, আর বুঝি বাঁচান যাবে না তাকে। নিরুপায় দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল অনাদি।

বড় বৌদি ব'ললেন, "তোমায় বরাবরই ব'লে আসছি ঠাকুরপো, মেয়েদের এই অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক। গোড়া থেকে সাবধান না হ'লে শেষকালে পোয়াতি আর ছেলে দুই-ই বাঁচান শক্ত হয়।"

মেজদা ব'ললেন, "তুই একটা রাস্কেল। কোনকালে যদি বুদ্ধি হয় তোর। মাথার হাত নামিয়ে ডাক্তার ডাক এখন।"

বাধ্য হয়েই মাথার হাত নামাতে হ'ল অনাদিকে; বাধ্য হয়েই তাকে যেতে হ'ল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের কাছে যেতেই ডাক্তার প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন অনাদির ওপর, "এখন ডাকতে এসেছ কেন? গোড়াতে যখন ব'ললাম, কথাটা কানে গেল না। এখন ঠেলা সামলাও।"

বেচারা অনাদি! বংশের ছোট বলেই তার দায়িত্ব-জ্ঞান একটু কম, আর সেই জন্যেই সকলের কাছে ধমক খেতে হয় যখন-তখন। কিন্তু আজকে তার মনের যে-রকম অবস্থা তাতে ধমকটা আর বরদাস্ত হ'তে চায় না। তবু ডাক্তার তার চাইতে বয়সে অনেক বড়, দাদাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, নিজের ছোট ভায়ের মতই তিনি দেখেন অনাদিকে। তাই ডাক্তারের খেঁকানি গায়ে না মেখে তাঁকেই আবার খোসামোদ করে' নিয়ে এল অনাদি।

ডাক্তার এসে রোগীকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, তার পর প্রেসক্রিপশনের ওপর ওষুধের নাম লিখে দিলেন কতকগুলো।

অনাদির আজকে মনটা খুবই খারাপ। ভয়ে ভয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল সে, "ও বাঁচবে ত ডাক্তারবাবু?"

ছেলেমানুষ অনাদির করুণ স্বর শুনে কেমন যেন মায়া হ'ল ডাক্তারবাবুর। গলায় সহানুভূতি এনে তিনি ব'ললেন, "আশা ত করছি। কিন্তু আজকাল দেশে ওষুধের যে অবস্থা, তাতে যদি **'ভাইনো-মল্টে'র** মত একটা টনিক ওয়াইন বের না হ'ত তবে এই আশা-টুকুও করতে পারতাম না। বাস্তবিকই এই ওষুধটা প্রসূতিদের পক্ষে অমৃততুল্য। প্রসবের পরে ত বটেই, তাছাড়া খুব বেশী মানসিক পরিশ্রম করলে অথবা দীর্ঘ দিন রোগে ভোগার পর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। যা' কিছু খাওয়া যায় কিছুতেই হজম হ'তে চায় না এই সময়। এই সব ক্ষেত্রে আমি **'ভাইনো-মল্ট'** ব্যবহার করে দেখেছি যে, এতে অতি অল্প সময়ের ভেতরই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে। এই জন্যেই আজকাল আমি ভগ্নস্বাস্থ্য প্রসূতিকে কিংবা ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টায়ফয়েড, নিউমোনিয়া, কালা-জ্বর প্রভৃতি থেকে সদ্য আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগী ও পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সকলকেই **'ভাইনো-মল্ট'** খেতে দিই। যাই হোক, তুমি ভয় পেয়ো না; আমার মনে হয় **'ভাইনো-মল্টের'** জোরে ছোটবৌ শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে।"

দুদিন পরে ডাক্তার আবার এলেন। চৌকাঠের ওপার থেকেই দেখলেন ছোটবৌ উঠে বসেছে বিছানার ওপর; দুধ খাওয়াচ্ছে তার সন্তানকে।

বিজ্ঞাপন

পৃথিবীর বড় মানুষ শ্রীগোপাল ভৌমিক, এম-এ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ. ১১২, মূল্য পাঁচ সিকা।

পুস্তকখানাতে সক্রেটিস, অ্যারিষ্টোট্‌ল, রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সন্, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ পৃথিবীর নানা দেশের জ্ঞানী গুণী এবং মহাপুরুষদের জীবন এবং কৃতির কথা ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বই-খানা যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। রূপকথার রাজা প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে দরদী লেখকের কবিচিত্তের পরিচয় সুপরিস্ফুট। পুস্তকখানি শুধু যে বালক-বালিকাদের কল্পনাকেই উদ্বোধিত করিবে তাহা নয়, ইহা তাহাদিগকে মহৎ জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার পক্ষেও বিশেষ ভাবেই সহায়ক হইবে। অন্ধকারের বন্দী নামক প্রবন্ধে বাংলা 'ব্রেল' পদ্ধতির (Braille Method) উদ্ভাবক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করায় পুস্তকখানিতে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কথাপ্রসঙ্গে—স্বামী অভেদানন্দ। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত এবং নদীয়া—কুমারখালি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম হইতে প্রকাশিত শ্রীসারদা গ্রন্থমালার ১ম গ্রন্থ। পৃ. ১৩৪, মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্যদের অন্যতম পণ্ডিত ও সুবক্তা শ্রীমদ্ অভেদানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল ইউরোপ-আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিয়া শেষজীবনে মধ্য-কলিকাতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাঁচ বৎসর হইল পরলোকগত হইয়াছেন।

সঙ্কলয়িতা স্বামীজির শিষ্যরূপে তাঁহার নিকট অবস্থানকালে ১৯৩৫, মার্চ হইতে ১৯৩৭, এপ্রিল পর্যন্ত যে যে উক্তি লিখিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তৎসমুদয় এবং স্বামীজির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পরিশিষ্টে শিষ্যদের ৫ তি কয়েকটি চিঠি এই প্রথমভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

নক্ষত্র-পরিচয়—শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা। পৃ. ৪১। মূল্য আট আনা।

চোখের সম্মুখে এই যে বিশাল নক্ষত্র-জগৎ প্রসারিত এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা অতি অস্পষ্ট। পর্য্যবেক্ষণ এবং গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা নক্ষত্র-জগৎ সম্বন্ধে যে সকল অপূর্ব্ব রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা অভাবনীয় বিস্ময়ের বস্তু। জনসাধারণের এ বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষাও যথেষ্ট। আলোচ্য পুস্তকখানিতে প্রমথবাবু সংক্ষেপে অতি নিপুণভাবে নক্ষত্র-জগতের প্রকৃত রূপের পরিচয় দিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক মাত্রেই বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জনসমুদ্র—শ্রীপ্রজেশকুমার রায়। মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। দাম চার আনা।

জনদেনা এবং লাল বাণ্ডার কথা আছে, কিন্তু ভাষার হেঁয়ালি নেই। কবিতা কয়টি সহজ ও সাবলীল।

চন্দ্রসূর্য—শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযাদন গ্রন্থ বিভাগ। মূল্য এক টাকা।

'কম কুয়াশা', 'ক্রোড়পত্র' এবং 'ঈশতেহার' তিনভাগে কবিতাগুলি বিভক্ত। দু'এক জায়গায় অতি আধুনিক বুলির নেশা প্রকাশ পেলেও কবিতাগুলি নিষ্প্রাণ বা অর্থহীন নয়। 'চোখ···হেঁটে হেঁটে যায়' এবং 'ব্যাওনেট' চোখে ও কানে খারাপ লাগল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

ব্রজদুর্ল্ভ হাজরা

ব্রজদুর্ল্ভ হাজরা মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি গুরুতর সরকারী কার্য্যের মধ্যেও আমৃত্যু সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। "বোবার বাণী" ও "পরকালের পরিচয়" নামক পুস্তক দুইখানির তিনি প্রণেতা। রামসাগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের নেতা ও বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সংসদের সভাপতি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি ৭৩ বৎসর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। যে-সব মনীষী সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্দ্ধে সমাজকে ও দেশকে পথের নির্দ্দেশ্ দিয়া গিয়াছেন, সতীশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। কার্য্যারম্ভের প্রথমে তিনি আলিপুরে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। ১৯১০ সালে শ্রীরামপুর কলেজের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে তিনি সহকারী অধ্যক্ষপদে



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

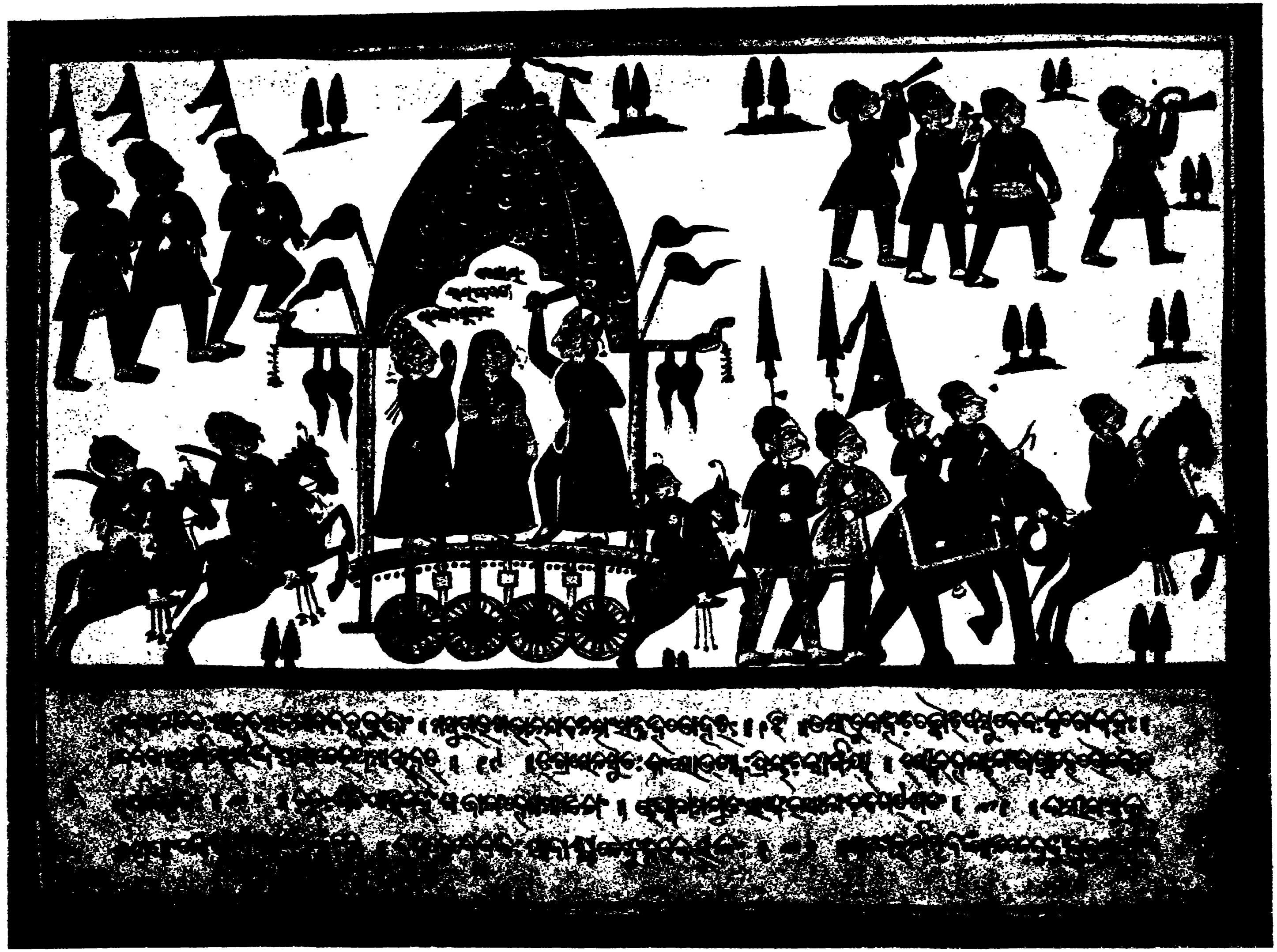
নিযুক্ত হন ও সতর বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনার কার্য্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় উহা ত্যাগ করেন এবং পুনরায় আলিপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। পর পর তিন বার তিনি পুরাতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। খ্রীষ্টীয় সমাজের পৃথক্ নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও "ইম্‌র্যাল ট্র্যাফিক বিল"-এর প্রবর্ত্তন—এই সময়ে তাঁহার দুইটি উল্লেখযোগ্য কাজ। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি খ্রীষ্টীয় সমাজের পক্ষ হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ ছিলেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য্য

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ গত ১৯৪২ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাংলা ও উড়িষ্যায় ১২টি কেন্দ্র হইতে প্রতি সপ্তাহে ২৪ হাজার নরনারীকে নিয়মিত চাউল, ডাল প্রভৃতি, ৭টি অন্নসত্র হইতে প্রত্যহ ৩ সহস্র বুভুক্ষুকে খিচুড়ী, ২টি কেন্দ্র হইতে চিড়া ও গুড়, ৪৫টি কেন্দ্র হইতে কাপড়, কম্বল, ২০টি কেন্দ্র হইতে প্রত্যহ দুই সহস্র শিশু ও রোগীকে দুগ্ধ এবং ১০টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৩০টি সাময়িক কেন্দ্র ও ২৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মারফত ঔষধ ও কুইনাইন প্রভৃতি বিতরণ, বন্যা ও বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ৬০০টি কুটীর নির্ম্মাণ, ১৬টি পুষ্করিণী সংস্কার, সুন্দরবন অঞ্চলে মাদুর শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা নিঃস্ব শিল্পিগণকে রক্ষা, ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্য দান, সঙ্ঘের বিভিন্ন আশ্রম ও সেবাকেন্দ্রগুলিতে ১০০ অনাথ বালককে আশ্রয় দান প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬০টি গ্রাম্য রিলিফ কমিটিকে আংশিক সাহায্য, ৩টি কেন্দ্র হইতে সূতাকাটা, ধানভানা ও কাপড় বোনার কার্য্য এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন মিলন-মন্দিরগুলির মধ্য দিয়াও সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সঙ্ঘের উপরোক্ত সেবাকার্য্যের জন্য প্রাপ্ত জিনিষপত্রাদি সব নিঃশেষ হইয়াছে। নগদ টাকাও যৎসামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে মাত্র ৫টি কেন্দ্র হইতে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ, ৭টি কেন্দ্র হইতে দুগ্ধ ও ঔষধপথ্যাদি এবং ৩টি কেন্দ্র হইতে টেষ্ট রিলিফের কার্য্য চলিতেছে। পুনরায় চারি দিক হইতে অন্নকষ্টের সংবাদ আসিতেছে। ক্রমে উহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে। সুতরাং তখন ব্যাপকভাবে সেবা-কার্য্য চালাইবার আবশ্যক হইবে। দেশবাসিগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি প্রেরণ করিয়া সঙ্ঘের এই সঙ্কটত্রাণ কার্য্যে সাহায্য করেন :—স্বামী বেদানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বসুদেব সহ দেবকীকে লইয়া কংসের প্রস্থান

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একখানি হস্তলিখিত সচিত্র ভাগবত হইতে

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৫১

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব

গত ৮ই আগষ্ট ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব সম্বন্ধে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে—একটি দিয়াছেন গান্ধীজী, অপরটি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি ১৯৪০ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধসমূহের কতকগুলি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে ভারত-ব্যবচ্ছেদকে তিনি পাপ বলিয়াছেন। পূর্বের এই উক্তির সহিত তাঁহার বর্তমান সিদ্ধান্ত খাপ খায় কিনা এই প্রশ্ন করিলে গান্ধীজী বলেন, "আমি জানি আমার বর্তমান মনোভাবে অনেকেই বিব্রত ও দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি মত পরিবর্তন করি নাই। যে সময়ে আমি ঐ কথা বলিয়াছি সেই একই সময়ে আমি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পৃর্কিত প্রস্তাবও সমর্থন করিয়াছি। আমার ধারণা শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া ঐ প্রস্তাবকেই কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন।" একই সঙ্গে দুইটি পরস্পরবিরোধী কাজ করা কিরূপে সম্ভব, গান্ধীজীর বিবৃতিতে তাহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা নাই।

গান্ধীজী ও রাজাজীর প্রস্তাব দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর বিবৃতি তাহার পরিচয়। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের একটা ক্ষুদ্র অংশের নাম হইবে হিন্দুস্থান। করদ রাজ্য-সমূহকে বাদ দিলেও ভারতে আরও অন্ততঃ দুইটি স্থান—পাকিস্থান ও বাঙালীস্থান গঠিত হইবে। এক হাজার মাইল বিস্তীর্ণ বৈদেশিক এলাকার উভয় প্রান্তে অবস্থিত দুইটি অঞ্চল লইয়া কি ভাবে একটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হইবে আমি তাহা বুঝিতে পারি না; উন্মত্ত ব্যক্তিগণ অবশ্য যে কোন জিনিসই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে। মিঃ জিন্না আমাদিগকে নীরবে প্রতীক্ষা ও প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন; তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তিনি ঈপ্সিত পুরস্কার পাইয়াছেন, এখন উহা মুষ্টিগত করিতে পারিলেই হয়। কিন্তু যাহারা ভারত-ব্যবচ্ছেদের বিরোধী, তাহারা কি করিবে? উত্তরাধিকার বিক্রীত হওয়ার পরে কাঁদিতেও বাধা পাইলে মর্ম বেদনা দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। মহাত্মাজী সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকার যেরূপ ভারতবাসীর দেহের ও পার্থিব সম্পত্তির উপর শাসন করেন—কংগ্রেসও তদ্রূপ ভারতবাসীর মনের উপর শাসন করে। গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রাণকেন্দ্র কিন্তু অতিবিনয়ের পরিচয় দিয়া তিনি নিজেকে অজ্ঞ বিশেষণ দ্বারা পরিচিত করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কিম্বা নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত ও নিজেদের স্বতন্ত্র মত প্রকাশে সাহসযুক্ত বেশীসংখ্যক দৃঢ়চেতা লোক নাই। আমি অনুমান করিতেছি যে, তথায় তুমুল বিতর্ক চলিবে ও গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইবে; কিন্তু আমি আরও জানি যে, অত্যধিক উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে অশ্রুবর্ষণের মধ্যে তাহা উপশম হইবে এবং বিরুদ্ধবাদীরা সম্পূর্ণ একমত হইয়া চুক্তিতে সম্মতি দিবেন। গান্ধীজীও অবশ্যই তাহা জানেন।"

দেশবাসীকে আভাসমাত্র না দিয়া গান্ধীজীর পক্ষে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং পুণা চুক্তির ফলে যে বাংলা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছে তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া এই মত প্রকাশ সঙ্গত হয় নাই, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী ইহা বিশ্বাস করেন। তাঁহার ধারণা গান্ধীজীর মত পরিবর্ত্তন করান সহজ হইবে না।

গান্ধীজীর মত পরিবর্তনের সম্ভাবনা

উপরোক্ত বিবৃতি দুইটি প্রকাশের পর ৯ই আগষ্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপূর্বে গান্ধীজীর সহিত এ সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ কথাবার্তা হইয়াছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন:—

প্রথমতঃ, মহাত্মাজী যদি বুঝিতে পারেন এবং কেহ যদি তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন যে, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র ভারতের, অথবা কোন একটি প্রদেশের অথবা কোন একটি সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হইবে তাহা হইলে তিনি তাঁহার মতের পরিবর্তন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, ভারত বিচ্ছেদ করা সম্পর্কে দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত যাহা ছিল আজও ঠিক তাহাই আছে। তৃতীয়তঃ, রাজাজীর প্রস্তাব সম্পর্কে

তিনি সমস্ত কংগ্রেসকর্মীর এবং সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ মতামত জানিতে ব্যগ্র—যাহাতে মহাত্মাজী এই প্রস্তাব সম্পর্কে দেশের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারেন।

ভারতবর্ষের উপর শাসনকর্তৃত্ব কায়েম রাখিবার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবাসীর মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং যত দিন এই তৃতীয় পক্ষ ভারত শাসন করিবে তত দিন হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হইবে না। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা, চাকুরি ভাগাভাগি এবং সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচন ভেদনীতির এই তিন বিষ সমাজ-দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল। ১৯৪০এ প্রথম ভারত-ব্যবচ্ছেদের দাবী ওঠে। এই নূতন দাবীর বাস্তব রূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে উগ্র পাকিস্থানওয়ালারাও এখনও পর্য্যন্ত কোন অস্পষ্ট ধারণাও দিতে পারেন নাই। বাংলার হিন্দুস্বার্থ যে ভাবে পদদলিত হইতেছে তাহা দেখিয়া পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত মাইনরিটিদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। পাকিস্থানের মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষার আয়োজন কি হইবে মিঃ জিন্নাও তাহা বলিতে পারেন নাই, কিন্তু কংগ্রেস কি ভাবে মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষা করিতে চাহে তাহা পরিষ্কার জানাইয়াছিল। কংগ্রেস শাসনে মুসলমান স্বার্থের ক্ষতির যে ধুয়া মিঃ জিন্না তুলিয়াছিলেন অনুসন্ধানে তাহা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছিল। গণপরিষদে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনার সময় মাইনরিটি সমস্যার সমাধান না হইলে এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বাহিরের কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মত মানিয়া লইতেও কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল। মাইনরিটি সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসের কথায় ও কাজে গরমিলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বরং বহু ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব অহেতুক প্রীতি বলিয়া লোকে আপত্তিই করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে না-গ্রহণ না-বর্জনকে মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের পক্ষপাতিত্ব বলিয়াই বলা হইয়াছে।

মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেস কখনও দেশ শাসন করে নাই। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলে সর্বত্র মুসলমানেরা স্থান পাইয়াছেন। এমন কি সমগ্র কংগ্রেস ডাঃ আনসারী, মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা হজরত মোহানী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে সর্বোচ্চ সম্মান দানে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলিম লীগকে কংগ্রেস প্রাধান্য না দিতে পারে, কিন্তু মুসলমান তাহার নিকট কখনও অবজ্ঞা বা অবহেলার পাত্র হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় লীগ ধীরে ধীরে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে পূর্বে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। লীগের সহিত চুক্তি করিতে অস্বীকার করিলে যে সমগ্র মুসলমান সমাজকে উপেক্ষা করা হয় না, লীগের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস জানা থাকিলে তাহা বিশ্বাস করা সহজ হইবে।

রাজাজীর প্রস্তাবে গান্ধীজীর সম্মতি দানে প্রগতিশীল এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইয়াছে। ইহার পরিণাম বিষময় হইতে বাধ্য। কংগ্রেস এত দিন ইহাদিগকেই মুসলমান সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে গণ্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজী যে ভাবে ইহাদিগকে আবর্জনা-স্তূপের ন্যায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন তাহাতে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের আন্তরিকতা সম্বন্ধে ইহাদের মনে সন্দেহের উদয় হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। তবে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে সিদ্ধান্তটি গান্ধীজীর ও রাজাজীর ব্যক্তিগত, কংগ্রেস উহা বিচার করিবার সুযোগ পায় নাই, সমর্থনও এখনও করে নাই।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টা হইবে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় উভয়েই এ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি গ্রহণ বা বর্জন গান্ধীজীর প্রতি আস্থা-অনাস্থার প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হইলে অল্প বর্ষণের মধ্যে উহা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রহিয়াছে ইহাদের অনেকেই তাহা বিশ্বাস করেন।

তার পর গণভোটের কথা। ইউরোপে গত দশ বৎসরের মধ্যে যে কয়টি গণভোট লওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে ভোট গ্রহণের ভার যাহাদের হাতে থাকে ফলাফল তাহাদেরই অনুকূল হয়। এ ক্ষেত্রে গণভোট যদি-বা লওয়া হয়, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে এ সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার মনোভাব আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজী ভারত-বিচ্ছেদের দাবী মানিয়া লওয়াতে মিঃ জিন্নার জোর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার দাবী অতঃপর আরও চড়িবে এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য গণভোট লওয়া হইবে না, এবং যদি লওয়া হয় শুধু মুসলমানদেরই লওয়া হইবে এই দাবী তিনি তুলিবেন এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে আধাআধি আসন চাহিবেন, ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় দেশবাসীও ইহা বিশ্বাস করে।

গান্ধীজী ও রাজাজীর প্রস্তাব দেশকে এমন এক অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে যে উহার সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়েই দেশের ক্ষতি। এই চুক্তি স্বীকৃত হইলে ভারতের জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। ব্যর্থ হইলেও ভেদনীতির চূড়ান্ত নিদর্শন ভারত-বিভাগের মূলনীতি এবং মুসলিম লীগই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি ইংরেজের এই দাবী স্বীকৃত হইয়া থাকিবে। এই চুক্তি হইলেও ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবে ইহা যেমন অসার কল্পনামাত্র, ভবিষ্যতে কখনও স্বাধীনতা-সংগ্রাম হইলে মিঃ জিন্না আসিয়া তাহাতে যোগদান করিবেন গান্ধীজীর মনে এ আশা উদিত হইয়া থাকিলে তাহাও তেমনি ভ্রান্ত। মিঃ জিন্না নিজেই বলিয়া রাখিয়াছেন প্রয়োজন হইলে ব্রিটিশ শক্তির সহায়তায় তিনি পাকিস্থান রক্ষা করিবেন।

রংপুরে রাজাজীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ

গত ২৫শে জুলাই রংপুরে প্রায় পনর হাজার লোকের এক সভায় বাংলার বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হয়। সভায় মৌলবী আবু-হোসেন সরকার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মৌলবী ফজলুল হক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু, সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো-

পাধ্যায়। শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, যখন লোক অনাহারে মরিতেছিল তখন দিনাজপুরে সরকারী গুদামে চাউল পচিয়াছে ইহাও দেখা গিয়াছে। সৈয়দ বদরুদ্দোজা বাংলায় রাজাগোপালাচারিয়ার প্রস্তাব প্রয়োগ করা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন; কারণ তাঁহার মতে বাংলায় উহা কার্যে পরিণত করার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে। যে সকল প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেখানে পাকিস্থান সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজাগোপালাচারিয়ার প্রস্তাবে কিছুতেই সাম্প্রদায়িক ঐক্য আসিবে না। দেশকে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য আসে না। উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের দ্বারাই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। মিঃ সুরাবর্দী প্রভৃতির নেতৃত্বে অল্প কিছুদিন পূর্বে রংপুরে এক পাকিস্থানী সভার পর এই জনসভায় পনর হাজার হিন্দু মুসলমানের সমাবেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু আইনের খসড়া

সর বি. এন. রাওয়ের সভাপতিত্বে হিন্দু আইন কমিটী হিন্দু আইনের এক খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন। খসড়াটি সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

খসড়াটি ছয় ভাগে বিভক্ত এবং নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে:—উইল ব্যতীত ও উইলের বলে প্রাপ্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং তাহা হইতে উদ্ভূত খোরপোষ, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, নাবালকত্ব, অভিভাবকতা ও দত্তক গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়। খসড়াটি পরীক্ষামূলকভাবে রচিত হইয়াছে এবং কমিটী জনমত অনুযায়ী খসড়াটি সংশোধন করিবার অভিপ্রায় পোষণ করেন। বর্তমানে হিন্দু আইনের অধীন ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত হিন্দুদিগের প্রতিই প্রযোজ্য করিয়া আইনটি পরিকল্পিত হইয়াছে।

উইল ব্যতীত যে উত্তরাধিকার, সেই সম্পর্কে আইনটি প্রধানতঃ জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক সংশোধিত উত্তরাধিকার বিলের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে ভরণপোষণের জন্য নির্ভরশীল পিতামাতা ও পুত্রবধূকে এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু খসড়া আইনে ঐ স্বজনদিগকে এই পর্য্যায়ে না ফেলিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পিতামাতা ও পুত্রবধূর ভরণপোষণের ব্যবস্থাটুকু মাত্র করিয়া দিলেই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। নৈতিক দায়িত্বকে আইনের ভাষা দিলেই নির্ভরশীল পিতামাতা বা পুত্রবধূর উপর অবিচার হইবে না ইহা মনে করা কঠিন। সম্পত্তির উপর ইঁহাদের সুনির্দিষ্ট অধিকার মানিয়া না লইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে কিনা সন্দেহ।

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ

বিবাহ সম্পর্কিত ব্যবস্থাটি প্রধানতঃ আইন-পরিষদে উত্থাপিত বিবাহ বিলের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। তবে বিবাহ (১) এক স্ত্রী কিম্বা স্বামী জীবিত থাকিতে বিবাহ চলিবে না; (২) বর কিম্বা কন্যা উন্মাদ কিম্বা জড়বুদ্ধি হইলে চলিবে না; (৩) নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিবে না, (৪) কন্যার বয়স ১৬ বৎসরের অল্প হইলে বিবাহে কন্যার অভিভাবকদিগের সম্মতি লইতে হইবে। কমিটী সিভিল ম্যারেজ সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই। শুদ্ধি বিবাহকে সিভিল ম্যারেজের মত রেজিষ্টারী করিবার জন্য কমিটী একটি ধারা যোগ করিয়াছেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, স্ত্রী যতক্ষণ স্বামীর সহিত থাকিবে, ততক্ষণ স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। কিন্তু স্বামী যদি কুৎসিত রোগাক্রান্ত হয় কিম্বা গৃহে উপপত্নী রাখে, কিম্বা নিষ্ঠুর হয়, কিম্বা অন্য আরও কোন সঙ্গত কারণ থাকে, তবে স্ত্রী ভরণপোষণের দাবী ত্যাগ না করিয়াও স্বামী হইতে পৃথক্ থাকিতে পারিবে। কমিটী নিম্নলিখিত কারণসমূহের দরুণ বিবাহ বাতিলের আদেশ প্রদান করার সুপারিশ করিয়াছেন:—(১) বিবাহকালে কিম্বা মামলা দায়ের করিবার সময় বিবাদীর যদি ক্লীবত্ব থাকে; (২) যদি বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয়তার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়; (৩) বিবাহের সময় কোনও এক পক্ষ যদি উন্মাদ কিম্বা জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে; (৪) স্বামী কিম্বা স্ত্রী বর্তমানে যদি বিবাহ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটিও অযৌক্তিক নহে, নূতনও নয়। বৈদিক ভারতে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যারই বিবাহ হইত, বহুবিবাহ প্রায়ই দেখা যাইত না, বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ উভয়ই প্রচলিত ছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে প্রথম বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের সূত্রপাত হয়। সম্ভবতঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই এই অবস্থা হইয়াছিল। সমাজদেহে একবার প্রবেশ লাভ করিবার পর এই দুই পাপ আর দূর হয় নাই। হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারে কিছু সাময়িক জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু ইহার আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বে-সামরিক পদের জন্য সামরিক কর্মচারী

কতকগুলি বে-সামরিক উচ্চ পদের জন্য সামরিক কর্মচারী চাহিয়া বাংলা-সরকার ভারত-সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের এই কার্যের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। প্রস্তাবটি এই:

"এই প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ বে-সামরিক পদের জন্য বহুসংখ্যক সামরিক লোক চাহিয়া বাংলা-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভা তাহার অনুমোদন করিতেছেন না। ইহাতে এই সকল পদের জন্য বাঙালীদিগের দাবী নষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে বাংলার বেকার-সমস্যা বর্দ্ধিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস বলেন যে, বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

ইঁহাদের মধ্য হইতে কর্মচারী সংগ্রহ না করিয়া সামরিক বিভাগ হইতে লোক আনা প্রদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। সরকার দলের অন্যতম নেতা খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট না দিলেও উহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, সামরিক কর্মচারীরা এদেশের লোকের সহিত, তাহাদিগের আচার-ব্যবহারের সহিত পরিচিত নহেন। আই-সি-এস কর্মচারীদিগের এজন্য দুই বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। খাঁ বাহাদুর বলেন যে, যদি প্রধান-সচিব বলিতে চাহেন যে, বাংলায় উপযুক্ত সংখ্যক লোক পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে তিনি বলিতে পারেন যে, শত শত উকিল বেকার বসিয়া আছেন, তাঁহারা এই সকল পদে ভালভাবে কাজ করিতে পারিবেন। বাংলা-সরকারের পক্ষে এই কার্য্য সঙ্গত হয় নাই। এই নীতি আত্মহত্যাকর হইবে। তিনি আরও বলেন যে, যদি তাঁহারা বে-সামরিক পদের জন্য সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে সমর বিভাগের কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার প্রভৃতির মধ্য হইতে তাঁহারা সচিবও সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহাতে মিঃ বি. ডব্লিউ. লেডন বলেন, তাহা আপনি পছন্দ করিবেন না। মিঃ মোমিন—পছন্দ অপছন্দ করিবার ব্যাপার নহে। তাঁহারা ভারতীয়দিগের ন্যায় উপযুক্ত হইবেন না। উপসংহারে তিনি বলেন যে, তাঁহারা যদি বে-সামরিক ব্যাপারের ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসন চলিতে দিতে পারেন না।

দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের উপযুক্ত লোকের অভাব বাংলাদেশে আছে ইহা অবিশ্বাস্য। বাঙালী অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বেও শুধু বাংলায় কেন ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের উচ্চ পদসমূহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। সুযোগ পাইলে আজও তাহা করিতে পারেন।

বগুড়ার মুসলমান নেতাদের বিবৃতি

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য বগুড়াবাসী ডাঃ মফিজুদ্দীন আমেদ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাবে বিরোধী দলের সহিত ভোট দেওয়ায় মুসলিম লীগের কতিপয় যুবক কর্তৃক বগুড়া শহরে অপমানিত হন। স্থানীয় প্রায় ৫০ জন বিশিষ্ট মুসলমান 'বগুড়ার কথা' পত্রিকায় (৩০শে আষাঢ়) এক দীর্ঘ বিবৃতিতে লীগের এই আচরণের প্রতিবাদ করেন। মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাবে ইহাতে করা হইয়াছে। বর্তমান মন্ত্রীদের হাতে কৃষকদের স্বার্থ কি ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তৎসম্পর্কিত অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

আজ দেশের এই বিষম সঙ্কটের দিনেও কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য্য করার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হইতেছে, তাহাতে কৃষির উন্নতির কোন ব্যবস্থা নাই। বিক্রয়-কর পূর্ব হারের দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিয়া ক্রেতার কষ্ট বাড়ান হইয়াছে। কৃষি-আয়কর বিল হইতে চায়ের আবাদী জমিকে ট্যাক্স ধার্য্যের অযোগ্য বলিয়া দিয়া ইউরোপীয় বণিক সমাজের স্বার্থরক্ষা করিয়া ইউরোপীয় সদস্যগণের ভোট সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রিসংঘের অস্তিত্ব রক্ষা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে কৃষি-আয়করের সমগ্র বোঝা দেশের প্রজা সাধারণের উপর চাপাইয়া প্রজাস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে সে দিকে দৃকপাত ও তাহা মাত্র ১৭ টাকায় কলিকাতার বাজারে দর নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ায় কৃষক সাধারণের নহে, তবে অন্য লোকের উপকার হইয়াছে। গুড় নিয়ন্ত্রণের যে আদেশ মন্ত্রিমণ্ডল জারী করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও আখচাষীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তবে চিনির কলের মালিকগণ উপকৃত হইয়াছে, এ কথা বলা যায়। আজ অতি প্রয়োজনীয় লবণের অভাবে দেশের সর্ব্বত্র বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে অথচ লবণ ও কেরোসিন সঙ্কটের কোন মীমাংসা হইতেছে না। মন্ত্রিমণ্ডল কেবল যে খাদ্য-সমস্যা, লবণ ও কেরোসিন সমস্যা সমাধান করিতে অক্ষম হইয়াছেন তাহা নহে সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ব্যাপারেও কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। আজ মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দেশের সমগ্র স্বার্থ ও কল্যাণকে আদর্শ ও একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কোনরূপ যোগ্যতা, গুণ বা অভিজ্ঞতার বিষয় বিশেষ বিবেচনা না করিয়া মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগত বন্ধু-বান্ধবগণকে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইতেছে এবং সমর্থক ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সরকারী অনুগ্রহ যথেচ্ছ ভাবে বিতরণ করা হইতেছে। অথচ উপযুক্ত ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত দাবী বরাবর উপেক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য কারণে ডাঃ মফিজউদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইঁহারা অসহিষ্ণু মুসলমানদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মুসলমান ধর্ম্মে ও রাজনীতিতে পরমতসহিষ্ণুতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আজ যদি নবজাগ্রত মুসলমান সমাজে ইহার অভাব দেখা দেয় তবে মুসলমান সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড অতি দ্রুত ভাঙিয়া পড়িবে এবং সমগ্র সমাজ অশেষ অকল্যাণের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে।

হাওড়া মিউনিসিপালিটির মামলা

প্রধান বিচারপতি সর টোরিক আমীর আলি এবং বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশ হাওড়া মিউনিসিপালিটির মামলায় যে রায় দিয়াছেন তাহাতে ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া গবর্ণরের স্বাক্ষরে ভারতরক্ষা আইনে যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনকে বাঁচানোই তাহার উদ্দেশ্য ছিল এ অভিযোগ প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও আনীত হইয়াছিল কিন্তু সাহেব দলের ভোটের জোরে তিনি বাঁচিয়া যান হাইকোর্টের রায়ে প্রমাণিত হইয়াছে জনসাধারণের আশঙ্কাই সত্য। রায় প্রকাশের পর শ্বেতাঙ্গ দলের মুখপত্র ষ্টেটসম্যান যে মন্তব্য করেন নিম্নে প্রদত্ত তাহার সারমর্ম হইতেই বিষয়টির গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি হইবে,—

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনভার বাংলা-সরকার কর্তৃক স্বহস্তে গ্রহণ করা সংক্রান্ত মামলার রায় বাংলার সচিবসঙ্ঘের উপর একটি গুরুতর আঘাত। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বাংলা সরকার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন-ক্ষমতা হইতে কমিশনারগণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং নোমানী নামক একজন ম্যাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যভার গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্ষমতাচ্যুত কমিশনারগণের মধ্যে তিন জন ও দুই জন করদাতা এই ব্যাপার হাইকোর্টে উত্থাপিত করেন এবং দীর্ঘ

মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য-পরিচালন হইতে কমিশনারগণের অপসারণ হাইকোর্ট অন্যায় ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, নোমানীর উপর যে কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহা সম্পাদন না করিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

এই ব্যাপারের পশ্চাতে একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল বলিয়া আইন সভায় বিরোধী দল দৃঢ়তার সহিত অভিযোগ করিয়াছিল এবং আরও অনেকের মনে এই প্রকার অস্বস্তিকর সন্দেহ জাগিয়াছিল। মিষ্টার বি, পি. পাইন সচিব হইবার পরও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ না ছাড়িয়া অবিবেচকের মত কাজ করিয়াছেন। সম্প্রতি সেখানে তাঁহাকে প্রতিকূল-আবহাওয়ার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন-কার্য্য প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল, নূতন নির্বাচনের সাহায্যে প্রতীকার অন্বেষণ অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল,—যেহেতু এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্পকেন্দ্রে এই নির্বাচন ব্যাপার শ্রমিকদিগের মধ্যে এমন উত্তেজনার সঞ্চার করিতে পারিত যাহাতে কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইত; এমতাবস্থায় ভারতরক্ষা নিয়মের বলে মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনভার কমিশনারগণের হাত হইতে সরকারের হাতে নেওয়া এইরূপ পরিস্থিতি হইতে অব্যাহতির সহজ পন্থা বলিয়া সচিবসঙ্ঘ মনে করিলেন; শত্রুর আক্রমণ দ্বারা যে সকল স্থান বিপন্ন হইতে পারে, কেবল ঐ সমুদয় স্থানেই এই ভারতরক্ষা নিয়ম প্রযোজ্য। জনসাধারণ ইহাতে হাসিয়াছিল। যদি হাওড়ার বিপদ আসন্ন হইয়াই থাকে, কলিকাতা কি তাহা হইলে বিপদের আরও একটু বেশী নিকটবর্ত্তী নহে? তাহা হইলে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনভার সরকার নিজ হাতে নিলেন না কেন? মিষ্টার পাইনের উপর যে সকল আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তৎসমুদয় হইতে মাননীয় মিষ্টার পাইনকে রক্ষা করাই সচিবসঙ্ঘের প্রধানতঃ ভাবনার বিষয় হইয়াছিল কিনা, তাহা লইয়া অনেক জল্পনাকল্পনা চলিয়াছিল।

বিচারপতি মিষ্টার দাশ মামলার এই অংশ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কঠোর। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, মিষ্টার পাইনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইবে বলিয়া যে ভয় দেখান হইয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহাকে বাঁচাইবার পরোক্ষ উদ্দেশ্যেই মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনভার সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং মিউনিসিপালিটির অত্যাবশ্যক কার্য্যাদি পরিচালন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার সহিত এই আদেশের কোনও সম্পর্ক নাই। ভারতরক্ষা নিয়মে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার অপব্যবহার হইয়াছে কিম্বা অন্ততঃপক্ষে ভুয়া উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করা হইয়াছে; ঐ সকল ক্ষমতা যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এমন মনে করা যাইতে পারে না; সুতরাং ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আদালতের হস্তক্ষেপ হইতে অব্যাহতির দাবী এইরূপ ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইতে পারে না। উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত ঘটনা কিম্বা অবস্থা সম্বন্ধে মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিয়াছেন, অথবা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সেই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। বিচারপতি ইহাকে হীন এবং নিন্দনীয় ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বাদী পক্ষের আবেদন পত্রে লিখিত অভিযোগগুলিকে অস্বীকার করিয়া প্রতিপক্ষ যে কোনও দরখাস্ত দাখিল করেন নাই, তজ্জন্য তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

ফেডারেল কোর্টে আপীল দায়ের করিবার জন্য যে অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে, বিচারপতিগণ তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং আপীল দায়ের করা হইবে বলিয়া অনুমান হয়। আপাততঃ ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে বাংলার মন্ত্রীরা গুরুতর ভুল করিয়াছেন।

মামলাটিতে সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বাংলা-সরকার অভিযোগ অস্বীকার করেন নাই। মামলাটির বিচারে হাইকোর্টের অধিকার নাই আইনের এই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের ভিতর দিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া আসিতে চহিয়াছিলেন। মামলাটি প্রথমে বিচারপতি এজ্‌লির আদালতে উঠিয়াছিল। তিনি অথবা প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি দাশ কেহই এই দাবীর সারবত্তা স্বীকার করেন নাই।

লর্ড সভায় ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যার আলোচনা

হাউস অফ লর্ডসে ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিয়া লর্ড ফারিংডন বলেন:—

অনেকেরই উদ্বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করা হইতেছে, তিনি তাহা জানিতে চান। লণ্ডন টাইমসের এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, গ্রেগরী কমিশন ভারতে যে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিবার সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৮ লক্ষ টন আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমদানী করা হইবে। কিন্তু ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রিজার্ভ রাখিবার জন্য যে সুপারিশ করা হইয়াছে, সে বাবদ কিছুই আমদানী করা হইবে না। এ অবস্থায় আশান্বিত হইবার কারণ নাই। লোকের ব্যবহারের উপযোগী খাদ্যশস্য ২ লক্ষ টন কম থাকিতেছে, আর রিজার্ভ কিছুই থাকিতেছে না। সরকারের হাতে যদি ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য রিজার্ভ থাকিত, তবেই তাঁহারা রেশন-ব্যবস্থা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন। নতুবা সে কার্য্য তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইবে। বাংলার মেডিক্যাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্ত্তা ডাঃ রায়ের রিপোর্টে প্রকাশ, বাংলা ও বিহারের প্রায় ২ কোটি লোক সংক্রামক ব্যাধিতে বিপন্ন। বিহারে কলেরার অবস্থা খারাপ। দুর্ভিক্ষের জন্য লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে। সাধারণ অবস্থায় সেখানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে পারিত, সংক্রামক ব্যাধিতে বিপন্ন হওয়ায় সে পরিমাণ খাদ্যশস্যের আশা করা যায় না। ভারতের ঔষধ তৈয়ারীর অবস্থার উন্নতির জন্য ও এ দেশ হইতে ভারতে ঔষধ আমদানীর নিমিত্ত সরকার কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা আশ্বাস দিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা করিতেছেন। প্রদেশগুলি হইতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে, তাহা যদি পাওয়া যায় এবং অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে হইতে যদি খাদ্যশস্য পাঠান সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে সকল লইয়া যাওয়ার সমস্যা দেখা দিবে।

সহকারী ভারত-সচিব লর্ড মুনষ্টার উত্তরে বলেন যে তাঁহার

ধারণা-ভারতে সুদিন আসিতেছে। বর্তমান বর্ষা অনুকূল হইলে এ বৎসর সকল অসুবিধার প্রতিকার করা ও প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হইবে। নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে সব ত্রুটি আছে তাহা দূর করিবার জন্য সকলপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। লর্ড মুনষ্টার ইহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতবাসী ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিবে না। গবর্মেন্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনও এত বেশী ত্রুটিপূর্ণ যে তাহা জনসাধারণের কোন কাজে আসিতেছে না। নিকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহের অভিযোগ আজও দূর হয় নাই।

লর্ড মুনষ্টারের আর একটি কথাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন এ বৎসর উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবহাওয়ার গোলযোগের জন্য গমচাষের ক্ষতি হইয়াছে। কাজেই সেখানে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে না। বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য ব্রিটিশ সরকার জাহাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সহকারী ভারত-সচিবের এই আশ্বাসে কয়জনে আশ্বস্ত হইবেন জানি না। বিশেষতঃ গ্রেগরী কমীটির প্রধান সুপারিশ কার্যে পরিণত হইতে না দেখিয়া জনসাধারণের মনে আশঙ্কা থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

রেশনিঙে পচা খাদ্য

কলিকাতা রেশনিঙে সম্প্রতি যে নিকৃষ্ট চাউল, গম ও আটা দেওয়া হইতেছে তাহাতে শহরবাসীর স্বাস্থ্যহানির প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গমের বরাদ্দ কমাইয়া দিয়া লোককে শুধু অখন্ড আটা খাইতে বাধ্য করা হইতেছে না, জাঁতা পিষিয়া যে-সব দুঃস্থা নারী অন্নসংস্থান করিত তাহাদেরও ভাত মারিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গম ঝাড়িয়া বাছিয়া তার পরে পিষাইয়া লইলে ভাল আটা পাওয়ার যে উপায় ছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে। এই নিকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি উল্লেখযোগ্য:

কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট:—কলিকাতার বহু সরকারী ষ্টোরে ও রেশনের দোকানে বর্ত্তমানে যে চাউল ও আটা দেওয়া হইতেছে, তাহা এত খারাপ যে, তাহাতে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতি লোকের আটার বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়ার ফলে সহরবাসীদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে।

এই অবস্থায় শহরবাসীদিগের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়া অনিবার্য্য, সুতরাং এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে জনসাধারণকে অবিলম্বে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ আন্দোলন চালাইতে হইবে।

সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তজ্জন্য একটি রেশন অভিযোগ কমিটি গঠিত হইয়াছে। ৩৯১ নং আপার চীৎপুর রোডে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির ভবনে এই কমিটির কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা যেন রেশনের দোকান হইতে প্রাপ্ত খারাপ চাউল ও আটার নমুনা সহ উপরে লিখিত ঠিকানায় কমিটির নিকট তাঁহাদিগের অভিযোগ প্রেরণ করেন।

১২ই আগষ্টের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় গম সম্বন্ধে একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল:

চিকিৎসকের আদেশে আমার পক্ষে ভাত অথবা ময়দা খাওয়া নিষিদ্ধ, আমাকে আটা খাইতে হয়। যে দোকান হইতে আমি রেশন আনি সেখানকার আটা এত বেশী পরিমাণে করাতের গুঁড়া মিশ্রিত যে আমাকে উহা আনা বন্ধ করিতে হইয়াছে। আমি গম কিনিতেছি। ধান, পাথর প্রভৃতি বাছিয়া লইয়া এই গম আমাকে পিষাইয়া লইতে হয়। গত চালানে উহাতে দেখিলাম লোহার টুকরা, অন্যান্য ছোট ছোট ধাতব বস্তু এবং ধাতব দ্রব্যের গুঁড়া রহিয়াছে (steel filings, small pieces of metal and a quantity of metal dust)। ইহার নমুনা আমি রাখিয়া দিয়াছি; কাহাকে দেখাইলে প্রতিকার হইবে যদি কখনও জানিতে পারি তবে তাঁহাকে দেখাইব। গম পিষাইবার পূর্ব্বে উহা বাছিয়া লইবার সতর্কতা অবলম্বন না করিলে এবং এই সব ধাতব গুঁড়া উহার সহিত মিশিয়া পেটে গেলে কি অবস্থা হইত তাহা ভাবিয়াও আমি শিহরিয়া উঠি। ক্রেতারা প্রদত্ত বস্তুর পরিমাণ অথবা উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে তাহাদিগকে অপমানিত হইতে হয়। আমার বিশ্বাস শহরের সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

পরাধীন দেশে রেশনিঙের সাফল্য সম্বন্ধে আমরা প্রথম হইতেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। বিশেষতঃ যেখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীবর্গের যোগানে জনসাধারণের সহিত বিন্দুমাত্র যোগ নাই সেখানে পদে পদে ত্রুটিবিচ্যুতি স্বাভাবিক। কলিকাতা রেশনিঙে শহরবাসী সম্পূর্ণরূপে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে, বাধ্য হইয়া অখাদ্য কুখাদ্য আহারের ফলে স্বাস্থ্যহানি পর্য্যন্ত তাহারা সহিয়াছে। কিন্তু সরকার এই সহযোগিতার মর্যাদা রক্ষা করেন নাই, ইহার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দুঃসহ অবস্থা একেবারে অসহনীয় করিয়া তুলিতেছেন। ইহার প্রতিকারের জন্য জনমত অত্যন্ত তীব্রভাবে জাগ্রত ও সক্রিয় হওয়া দরকার।

এই সম্পর্কে ১০ই আগষ্ট তারিখে নয়া দিল্লী হইতে প্রচারিত নিম্নলিখিত সংবাদটি অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সংবাদটি এই:

কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরে অনুসন্ধানে জানা গেল কলিকাতা রেশনিঙে চাউল, গম, আটা, ময়দা প্রভৃতি বরাদ্দের মোট পরিমাণের শতকরা ৬০ ভাগ লোকে গ্রহণ করিয়াছে; চাউলের মোট বরাদ্দের শতকরা ৬৪ ভাগ বিক্রয় হইয়াছে।

উপর্য্যুপরি তিন সপ্তাহাধিক কাল যাবৎ কদর্য খাদ্য বিক্রয়ের সহিত উপরোক্ত সংবাদের কার্য কারণ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা বিবেচনার যোগ্য। রেশনের চাউলের সবটা লোকের দরকার নাই এই অজুহাতে চাউলের বরাদ্দ কমে কিনা তাহা দেখিলে ব্যাপার বুঝা যাইবে। আপাততঃ শুধু এইটুকু দেখা যাইতেছে যে জনসাধারণ অথবা কর্পোরেশন কাহারও প্রতিবাদে কদর্য খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

ভারতরক্ষা আইনের বলে পচা আটা বিক্রয়

২৬শে শ্রাবণের দৈনিক বসুমতী বহরমপুরের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী ১৩ হাজার মণ আটা আটক করেন। দেখা যায়, উহা মানুষের অখাদ্য। ঐ আটা বাংলা-সরকারের। তাঁহারা ঐ আটা পশুখাদ্যরূপে বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটী তাহাতেও আপত্তি করেন—কারণ ঐ আটা পশুরও অখাদ্য এবং উহা যদি নষ্ট করিয়া ফেলা না হয়, তবে উহাই চোরাবাজারে বিক্রীত হইয়া ঘুরিয়া লোকের রন্ধনশালায় আসিবে।

বসুমতী অতঃপর কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন:

(১) ঐ অমূল্য সম্পত্তি বাঙ্গালা-সরকার কোথায় পাইলেন? যে

খাদ্য-দ্রব্য বাঙ্গালার সচিবমণ্ডলের অসাধারণ যোগ্যতাহেতু অতল গহ্বরে অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহারই কতকাংশ কি এখন তাঁহাদিগের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে বাহির হইয়া আসিতেছে? না ঐ আটা শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে শিশিরসিক্ত ও রৌদ্রপক্ব হইয়া বহরমপুরে গিয়াছে?

(২) কলিকাতায় সচিবগণ কি ঐ বিকৃত আটার সদ্ব্যবহার আপনারা করিতে না পারিয়া উহা পশুর জন্য বহরমপুরে পাঠাইয়াছিলেন? বহরমপুরের পশুর প্রতি তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টির কারণ কি?

(৩) বাঙ্গালা-সরকার কত দিন হইতে পশুখাদ্যের ব্যবসা করিতেছেন?

(৪) ঐ আটা কি পশুখাদ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া বহরমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল? এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিতে চাহি, কলিকাতা সর্ষপ তৈলের কলে (আইন বাঁচাইবার জন্য) সাইন বোর্ড দেখা গিয়াছে—"এই কলে গোঁজা বাদাম প্রভৃতি মিশ্রিত মানুষের অখাদ্য তৈল প্রস্তুত হয়"—কোন কোন দুগ্ধ বিক্রেতা তাহাদিগের দুগ্ধ পাত্রের গাত্রে লেবেল আঁটিয়া রাখে-"জল মিশ্রিত দুগ্ধ"। আশা করি এ ক্ষেত্রে সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, এমন সন্দেহ করিবার কোন কারণ বা উপায় নাই।

(৫) ঐ আটায় যে লোকসান হইবে, তাহার জন্য কে দায়ী এবং কাহাকে বা কাহাদিগকে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য করা হইবে? কাহাকেও বাধ্য করা হইবে কি? না—বাঙ্গালীর ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে?

(৬) ঐ আটা যদি পশুরও অখাদ্য হয়, তবে কি তাহা নষ্ট করাই সঙ্গত নহে?

(৭) ঐ আটা কে বহরমপুরে প্রেরণ করিয়াছে?

(৮) মিউনিসিপ্যালিটির মতই কি গ্রহণযোগ্য নহে?

প্রশ্নের কোন উত্তর বসুমতী প্রকাশ্যে অন্ততঃ পান নাই ইহা নিশ্চিত। ইহার কোন প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়ে নাই। কিন্তু বহরমপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ভারতরক্ষা আইনের বলে প্রদত্ত একটি আদেশে ইহার জবাব অন্যভাবে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৭ই আগষ্ট এসোসিয়েটেড প্রেস বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) হইতে সংবাদ দিয়াছেন :

> মুর্শিদাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতরক্ষা নিয়মবলে আদেশ জারি করিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের নির্দ্ধারণ যাহাই কেন হউক না—মিউনিসিপ্যালিটির অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বা খাদ্য-দ্রব্য আটক করিবার যত ক্ষমতাই কেন সে আইনে মিউনিসিপ্যালিটির থাকুক না মুর্শিদাবাদে কোন মিউনিসিপ্যালিটী সরকারের বা বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ঐরূপ অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য আটক করিতে পারিবেন না এবং সরকার বা বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ চাহিলেই আটক করা (অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বা খাদ্য-দ্রব্য) ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটির কোনরূপ দাবী থাকিবে না।

ভারতরক্ষা আইনের বলে মানুষ অথবা পশুকে স্বাস্থ্যহানিকর অখাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা ঐ আইনের অপপ্রয়োগ কি না এ সম্বন্ধে হাইকোর্টের অভিমত জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত।

বহরমপুরের পচা আটা

বহরমপুরের মিউনিসিপ্যালিটি মানুষের এমন কি পশুরও খাদ্যের অনুপযুক্ত যে ১৩০০০ মণ পচা আটা আটক করিয়াছিলেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়ায় সেখানে ঐ আটা বিক্রয় হইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার আশঙ্কা হইয়াছে এই অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ আলোচনার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মহলানবিশ অভিযোগ করেন যে ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশের দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটির আইনসঙ্গত কার্য্যে বাধা দেওয়া হইয়াছে। মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনে আপত্তি করিয়া প্রধান মন্ত্রী খাজা সর নাজিমুদ্দীন বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে এখনও কিছুই জানেন না, প্রশ্নের আকারে বিষয়টি জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে উহার জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রধান মন্ত্রীর এই উত্তর বিস্ময়কর। ব্যাপারটি কলিকাতার সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। ইচ্ছা থাকিলে সর নাজিমুদ্দীন অনায়াসে অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লইতে পারিতেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের পীড়াপীড়িতে প্রধান মন্ত্রী আলোচনা এড়াইতে পারেন নাই। তারযোগে সমস্ত ঘটনা জানিয়া লইবার পর ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দাখিল করিবেন।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় সাক্ষ্য গ্রহণ চলিতেছে।

কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে হইবে :—(১) ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলায় খাদ্যাভাবের কারণ কি? এবং (২) ঐ খাদ্যাভাবের পর মহামারীর প্রকোপের কারণ কি? কমিশনকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে হইবে,—(৩) কি ভাবে খাদ্য-সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে; (৪) দুর্ভিক্ষের অবস্থায় জরুরী চিকিৎসার ও সংক্রামক ব্যাধি দমন ব্যবস্থার উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে; (৫) কি উপায়ে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে; (৬) কি প্রকারে লোকের আহার্য্যের উন্নতি হইতে পারে; এবং (৭) খাদ্যাভাবের পুনরাবৃত্তি নিবারণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের কথা কমিশনকে জানাইবার দায়িত্ব নেতাদের উপর। ইঁহারা প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের মধ্যে সংবাদ প্রকাশে বহু বাধানিষেধ আরোপিত হইয়াছিল, সুতরাং শুধু প্রকাশিত সংবাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষে লোকের কি অবস্থা হইয়াছিল, সরকার কর্তৃক চাউল ক্রয়ে বাজার কি ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, সরকারী এবং বে-সরকারী সাহায্যদান কিরূপে চলিয়াছে, কোন কোন স্থানে লোকে সরকারী সাহায্যকেন্দ্রে কেন যাইতে চাহে নাই, প্রভৃতি অপ্রকাশিত বহু সংবাদ যথোপযুক্ত প্রমাণসহ কমিশনের নিকট উত্থাপিত হওয়া দরকার। কোন কোন স্থানে যথাসময়ে মজুত চাউল বিলি না হওয়ায় অনাবশ্যক মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ অভিযোগও আছে, তাহা সত্য হইলে উপযুক্ত প্রমাণসমেত তাহাও দাখিল হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ প্রণীত *Famines in Bengal* বইখানির কথা নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যে উপাদান উহাতে রহিয়াছে তাহাকেই

বিস্তৃত তথ্যাদির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইলে দুর্ভিক্ষে মৃত লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্দশার কাহিনী অন্ততঃ খানিকটাও বলা হইবে।

হরিবংশের ফার্সী অনুবাদ

হরিবংশের একখানি ফার্সী অনুবাদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক মফিজুল হক কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অনুবাদটি সম্রাট আকবরের সভায় কোন পণ্ডিত কর্তৃক কৃত ও তদানীন্তন শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছিল। মোগল দরবারে হিন্দু সংস্কৃতির অজস্র নিদর্শনের মধ্যে এই পুঁথিখানিও একটি। ইহার চিত্রগুলি মুসলিম ভারতীয় চিত্রকলার প্রামাণিক নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আদর্শ তাঁহার জীবনে ও কর্মে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই হিন্দু সংস্কৃতির মর্মদেশে প্রবেশের জন্য তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁহার সভাসদ ফৈজী বাদশাহের অনুরোধে হিন্দু সংস্কৃতির পরিচায়ক বহু গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহাভারতের অনুবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের কোন পত্রিকায় ফৈজী কর্তৃক ফার্সীতে অনূদিত মহাভারত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আকবরের পর দারা শিকোও হিন্দু সংস্কৃতির মর্মোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হন। উপনিষদের অনুবাদ দারার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আকবরের ন্যায় মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞেরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সম্ভাবনার কথাই ভাবিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান সবকর্মে পৃথক হইয়া দুইটি নিত্য বিবদমান দলে যাহাতে পরিণত না হয় সেজন্য উদার সহনশীলতার দ্বারা পরস্পরকে জানিবার চেষ্টায় তাঁহাদের অন্ত ছিল না।

কলিকাতার যানবাহন সমস্যা

কলিকাতার যানবাহন সমস্যা অতিশয় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। সকালে ৮॥টা হইতে ১১টা এবং অপরাহ্ণে ৫টা হইতে ৮॥টা এই কয় ঘণ্টার মধ্যে ট্রামে বা বাসে কাহারও উঠা অসাধ্য। মাঝপথে ওঠা-নামা তো প্রায় অসম্ভব। ট্রাম কোম্পানীর ধারণা তাঁহারা যথাসাধ্য করিতেছেন, জনসাধারণের বিশ্বাস যাত্রীদের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্যপালনে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। শ্যামবাজার লাইনে গাড়ীর সংখ্যা রীতিমত কমিয়াছে ইহা বেশ বুঝা যায়, দুই বৎসর পূর্বেও যে সময় অন্তর এই লাইনে ট্রাম পাওয়া যাইত এখন তাহা অপেক্ষা অনেক দেরীতে গাড়ী আসে। বাসের অবস্থা আরও শোচনীয়। পেট্রলের অভাব তো আছেই, বহু বাস এ-আর-পির জন্য আটকাইয়া রাখাও হইয়াছে। এই সব বাসের যতগুলি সম্ভব অবিলম্বে ছাড়িয়া দিলে, আরও কিছু বাস ঋণ ও ইজারা আইনে আমদানী করিলে এবং উহাদের জন্য পর্য্যাপ্ত পেট্রলের বন্দোবস্ত করিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

ফরিদপুরের অনাথ আশ্রম

৯ই আগষ্ট মিঃ কেসী ফরিদপুরের অনাথ আশ্রমের উদ্বোধন করিয়াছেন। ফরিদপুরের অধিবাসী মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ উপস্থিত হইতে না পারায় মিঃ বটমলী তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় জানা গিয়াছে আশ্রমটি অনাথ মুসলমান বালকবালিকাদের জন্য এবং সেই ভাবেই কল্পিত। ইহার কর্মচারীও ঐ ভাবেই নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই অনাথ আশ্রমের জন্য বাংলা সরকার এককালীন ৩,২৬,৬৫০ টাকা দিয়াছেন এবং উহার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বার্ষিক ৩,১৩,৯৬৮ টাকা বরাদ্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

মুসলমান ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ও যে দেশে আছে, তাহাদের মধ্যেও যে অনেক বালকবালিকা দুর্ভিক্ষে অনাথ হইয়াছে, ইহাদেরও যে আশ্রয়ের প্রয়োজন এ কথাটা মন্ত্রী অথবা গবর্ণর কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহা শুধু দুঃখের বিষয় নয়, সমগ্র গবর্মেণ্টের পক্ষে কলঙ্কের কথা। এই প্রকার একদেশদর্শী কার্য যাহাতে না ঘটিতে পারে সেজন্য সংখ্যালঘুদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য গবর্ণরকে রাজকীয় উপদেশ পত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুরের সংখ্যালঘু হিন্দুর প্রতি না তাকাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আশ্রমের উদ্বোধন করিয়া মিঃ কেসী রাজকীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, জনসাধারণকে ইহা মনে করিবার সুযোগ দেওয়া সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

যুদ্ধের পর রেলের উন্নতি সাধন

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য সর লক্ষ্মীপতি মিশ্র নয়াদিল্লীতে ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণকারী রেলযাত্রীদের সুবিধা বিধানের জন্য যুদ্ধাবসানের প্রথম সাত বৎসর ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্ল্যাটফর্ম, ওভারব্রিজ, পায়খানা, বিশ্রামাগার, জল সরবরাহ, টিকিট ক্রয়, বসিবার স্থান প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা হইবে।

দেশের সাধারণ অভিমত হইতেছে, তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর উন্নতি সাধন করা এবং একটিমাত্র উচ্চশ্রেণী রাখা। চারিটি শ্রেণী রাখা ব্যয়বহুল সন্দেহ নাই। একটি শ্রেণী উঠাইয়া দিলে যাত্রীদের অবস্থার আরও উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। বোর্ড নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সাধারণতঃ তৃতীয়, মধ্যম এবং উচ্চ এই তিনটি শ্রেণী থাকিবে। যে সকল ট্রেন এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে যাতায়াত করে সেই সকল ট্রেনে অতিরিক্ত আরামদায়ক কোচ থাকিবে এবং বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর জন্য যে ভাড়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী ভাড়া দিতে হইবে। মালপত্রের জন্য আরও উন্নতির ব্যবস্থা করা হইবে। যুদ্ধোত্তর কালে আরও পাঁচ হাজার মাইল নূতন লাইন নির্মাণ করা হইবে। প্রথম সাত বৎসরে ২৫ শত মাইল লাইন নির্মাণ করা হইবে। ইহার জন্য কয়েক বৎসর পর্যন্ত বারো কোটী টাকা বার্ষিক ক্ষতি হইবে। ভারতে এঞ্জিন নির্মাণ সম্পর্কে সর লক্ষ্মীপতি বলেন, যুদ্ধ শেষ হইলে পর যত শীঘ্র সম্ভব কাঁচড়াপাড়াতে একটি কারখানা স্থাপন করা হইবে। সেই কারখানায় বৎসরে ৮০টি এঞ্জিন এবং ৮০টি বয়লার নির্মাণ করা যাইবে। বৎসরে প্রায় এক শত এঞ্জিন এবং বয়লার নির্মাণের জন্য একটি বে-সরকারী কার্মের সহিত কথাবার্তা হইতেছে। ইহা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে এই কার্মকে এঞ্জিন নির্মাণের কারখানায়

রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে। যুদ্ধোত্তর কালে রেলওয়ের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতে প্রস্তুত করা চলিবে। কয়েকটি কার্ম ইতিমধ্যেই এই সকল যন্ত্রপাতি প্রভূত পরিমাণে নির্মাণ করিতেছে।

এই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পর্কে সর লক্ষ্মীপতি বলেন, ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত ভাণ্ডার হইতে ১২৫ কোটি টাকা গ্রহণ করা হইবে এবং ভারত-সরকার ১২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিবেন।

রেলওয়ের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন ও মোটর যানের ব্যবহার বৃদ্ধিরও আবশ্যক হইবে। জেলার অভ্যন্তরে মোটর ও লরী চলাচল অবাধ ও ব্যাপক হইলে জনসাধারণের পক্ষে রেলের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা সম্ভব হইবে। ইউরোপে এবং আমেরিকায় রেলের সঙ্গে সঙ্গে মোটর বাস সার্ভিসও আছে। কিন্তু যুদ্ধের আগে এদেশে মোটর যান চলাচলের উৎসাহ তো দেওয়াই হয় নাই বরং রেওলয়ের মুখ চাহিয়া উহাকে বাধাই দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়ে বিস্তারের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে মোটর চলাচলের আয়োজন কি হইবে তাহাও এখন হইতেই ভাবিয়া দেখা উচিত।

বাংলায় ছাত্র আন্দোলন

ওয়ার্দ্ধার এক সংবাদে প্রকাশ, ইউনাইটেড ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ বসু গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে এই নবগঠিত ছাত্র সঙ্ঘটি বাংলার অধিকাংশ ছাত্রকে কম্যুনিষ্ট ও র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাট দল হইতে সরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ছাত্রসমাজের সম্মুখে রাজনীতি ভিন্ন আরও বহু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ভারতবাসীর সমাজ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া চলিয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনার দ্বারা দেশের কল্যাণময় পথ নির্দ্ধারণের চেষ্টাই ছাত্র সমাজে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। জাতির মেরুদণ্ড সুদৃঢ় করিতে গেলে যে চরিত্রবলের প্রয়োজন, ছাত্রসমাজে তাহার অভাব আজকাল সহজেই চোখে ঠেকে। ছাত্রেরা নিজেরাই ইহার প্রতিকার করিতে পারেন। সস্তা রাজনৈতিক বুলির মোহ হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে দৃঢ়চরিত্র এবং প্রকৃত ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে ইউনাইটেড ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের অভ্যুদয় সার্থক হইবে।

পুষ্টিকর খাদ্য আহারের পরামর্শ

বাংলার কৃষি বিভাগের একটি উপবিভাগ আছে, তাহার নাম ডেভেলাপমেন্ট বিভাগ। এই বিভাগ সম্প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রাপ্তবয়স্ক যে-সব লোক দৈনিক ছয়-সাত ঘণ্টা পরিশ্রম করে তাহাদিগকে নিম্নোক্ত তালিকানুযায়ী খাদ্য আহারের পরামর্শ দিয়াছেন ঃ—

চাউল	—	৪ ছটাক
গম	—	২ „
ডাইল	—	দেড় „
শাকসব্জী	—	এক „
অন্য উদ্ভিদ	—	এক „
তৈল (স্নেহ পদার্থ)	…	এক „
দুগ্ধ	…	৪ „
মাছ	…	২ „
ফল	…	এক „
গুড়	…	ঐ „

আর সপ্তাহে ২ দিন মোট ৪ ছটাক মাংস।

দৈনিক বসুমতী সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য ধরিয়া এই তালিকাভুক্ত খাদ্য আহার করিতে গেলে কত টাকার দরকার তাহার নিম্নোক্ত হিসাব দিয়াছেন ঃ—

চাউল	…	দেড় আনা
ময়দা (গম ময়দা বা আটা না করিয়া খাওয়া যায় না)	…	দেড় আনা
ডাইল	…	প্রায় তিন পয়সা
শাকসব্জী	…	২ পয়সা
আলু	…	২ পয়সার অধিক
দুগ্ধ	…	৩ আনা
মাংস (দৈনিক হিসাবে)	…	ঐ
তৈল বা ঘৃত	…	২ আনা তিন পয়সা
মাছ	…	৫ আনা
ফল	…	৩ আনা
গুড়	…	এক পয়সা

যোগ করিলে দাঁড়ায়—১ টাকা ৫ আনা ৩ পয়সা।

ইহার সহিত কয়লার জন্য অন্ততঃ ৵৫ এবং লবণের দরুণ ৻১০ ধরিলে মোট দাঁড়ায় দৈনিক ১।৫ পয়সা অর্থাৎ মাসিক ৪৫৸৶০। ইহার উপর কাপড়, সাবান, ঘরভাড়া, ঔষধ প্রভৃতি আছে অর্থাৎ প্রায় ৬০৲ টাকার কমে এক এক জনের কুলাইতে পারে না। অথচ বাংলার মধ্যবিত্তদের অধিকাংশেরই আয় মাসিক ৫০ টাকার অধিক নহে। এই আয় সাধারণতঃ এক জনের এবং ইহার দ্বারা বহু ব্যক্তিকে ৪।৫ জনের পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। ১৯৪৩ সালের ৫ই মে সর নাজিমুদ্দীন নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে বাংলার দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মাসিক আয় ৩০ হইতে ৪০ টাকা এবং শ্রমিকের মাসিক আয় ১৮ টাকা।

বাংলায় শাকসব্জীর অগ্নিমূল্য

ঢাকা, ৯ই জুলাই—এখানে মাছ ও শাকসব্জীর একান্ত অভাব হইয়াছে। একটা ইলিস মাছের দাম এক টাকা হইতে ২।০ আনা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতেছে। অন্যান্য মাছ একরকম পাওয়াই যায় না।—ইউ. পি.

শুধু ঢাকায় নয়, বাংলার অন্যান্য স্থানেও বিশেষ কলিকাতায় শাকসব্জী ও মাছ অগ্নিমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মাছ ও সব্জীর দর এই ভাবে বাড়িয়াছে ঃ

	স্বাভাবিক দর	বর্ত্তমান দর
আলু	৵৹ সের	১৲ সের
পটল	/৹ "	৷৹ "
ঝিঙা	/৹ "	৷৵৹ "
বেগুন	/৹ "	৷৹ "
মাছ	৷৹ "	৩৲ "
কুচো চিংড়ি	৷৹ "	১৸৹ "
পুঁটিমাছ	৷৹ "	২৷৹ "
পুঁই ডাটা	এক পয়সায় ছুটি	এক আনায় একটি

গত বৎসর নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী তরকারীর এই দুর্ম্মূল্যতার প্রতি ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জানিতে চাহেন যে সৈন্যদলের জন্য প্রচুর পরিমাণে তরকারী ক্রয়ই এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ কিনা। বাংলায় তরকারীর কণ্ট্রাক্টরেরা বেপরোয়া ভাবে ক্রয় করে বলিয়াই দাম এত বেশী বাড়িয়াছে এই স্পষ্ট অভিযোগ তিনি করেন।

শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব সর জে. পি. শ্রীবাস্তব মূল্যবৃদ্ধির কথা স্বীকার করেন কিন্তু ঐ সঙ্গে বলেন যে সৈন্যদল বহুক্ষেত্রে নিজেদের সব্জী সরবরাহের বন্দোবস্ত নিজেরা করিয়া লইয়াছে। স্থানীয় বাজারে সব্জী ক্রয়ের ভার যাহাদের উপর আছে তাহাদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তাহারা সরবরাহ ও বাজার দরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রয় করে। শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব কতকগুলি সব্জী ও ফলের তালিকা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আলু ও টোমাটোর দাম এই রূপে বাড়িয়াছে।

	আলু	টোমাটো
১৯৪৩		
জানুয়ারী	৪৸৵৹ মণ	৶৹ সের
ফেব্রুয়ারী	৫৷৵৹ "	৶৹ "
মার্চ্চ	৮৸৵৹ "	৵৹ "
এপ্রিল	৮৵৹ "	৵১৹ "
মে	৮৸৹ "	৷৷৵৹ "
জুন	১০৷৵৹ "	১৷৷৹ "
জুলাই	১২৲ "	২৲ "
আগষ্ট	২০৷৹ "	২৷৹ "
সেপ্টেম্বর	১৬৸৹ "	১৸৹ "
অক্টোবর	২৭৲ "	১৷৷৶৹ "

মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরেরা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইয়া তরকারী ক্রয় করিতেছেন এরূপ অভিযোগে আছে এবং শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকারের কোন উপায় করিতে পারেন নাই। সাহেবদের জন্য দার্জিলিং হইতে তরকারী আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মন্ত্রীরা ব্যবস্থা-পরিষদে এবং শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মুখপত্রে সাহেবদের সমালোচনার হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু দেশের লোকের দুর্দশা দূর করিবার কোন বন্দোবস্ত তাঁহারা করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদলেরই অনেক সদস্য অভিযোগ করেন যে প্রতিদিন মিলিটারী অথবা তাঁহাদের কণ্ট্রাক্টরগণ কলিকাতা ও মফস্বলের বাজার হইতে গাড়ী গাড়ী তরিতরকারী কিনিয়া লইয়া যায়। মন্ত্রী মহাশয় ইহা অবগত আছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, "ইহা সত্য হইলেও আমাদের করার কিছু নাই। আমরা তাঁহাদের ক্রয় করিতে বাধা দিতে পারি না। আমরা কেবল নাগরিকদের জন্য আরও প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারি।" প্রশ্নের উপর প্রশ্নের চাপে পড়িয়া কৃষিমন্ত্রী এই স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু ঐ সঙ্গে তরকারীর উৎপাদন বাড়াইবার দায়িত্বের যে কথা ছিল পরে এক বিবৃতিতে তাহাও তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন।

আসামে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের দুর্গতি

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ, শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজারে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের আলোচনায় তথাকার পাঠশালা ও মক্তব ইত্যাদির শিক্ষকগণের যে আর্থিক দৈন্যের কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যে-কোন সভ্য গবর্ণ্মেণ্টের পক্ষেই একান্ত লজ্জার বিষয়। সভাপতি শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সরকারী বিবরণ হইতে তথ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ চা-বাগানের শ্রমিকগণের অপেক্ষাও অল্প বেতন পান। সাধারণতঃ এক এক জন শিক্ষকের মাসিক আয় ১২ টাকা মাত্র। এই আয়ের দ্বারা আজিকার দুর্দিনে পরিবার পালন দূরে থাকুক একজনের ক্ষুধার অন্নও জুটান যায় না। শিক্ষকেরা মাসিক ৩০ টাকা মাত্র বেতন, অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীর ন্যায় রেশন-প্রাপ্তির সুবিধা এবং যুদ্ধান্তে পরিশোধ করিবার সর্ত্তে কিছুটা ঋণ পাইবার দাবী করিয়াছেন। এতদপেক্ষা অধিক দাবী করিলেও বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার দিনে বিশেষ কিছু অন্যায় হইত না।

এবিষয়ে মন্তব্য অনাবশ্যক। আসামের মন্ত্রীদল দেশে শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে কতটা আগ্রহশীল ইহা তাহারই নিদর্শন।

গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং এজেণ্টদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের চেক প্রেরণ করিবেন ২৫ পঁচিশ টাকার কম হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রতি চেকের সহিত ব্যাঙ্কিং চার্জ ৷৵৹ ছয় আনা অতি অবশ্য যোগ করিবেন। নতুবা চেক গ্রহণ করা হইবে না।

ভাব-সাদৃশ্যে বর্ষা-চিত্র

শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ

বর্ষার অপূর্ব বৈভবের ছবি দেখিয়া মহাকবি কালিদাস লিখিলেন, রাজার মত উদ্ধত দীপ্তিতে জলদ-জাল নামিয়া আসিতেছে—"সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতিঃ।" রবীন্দ্রনাথও বর্ষা-প্রকৃতিতে দৃষ্টি দান করিয়া অনুরূপ উক্তি করিলেন—"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে।" এই বর্ষার পরিপূর্ণ যৌবন-রূপের অভিব্যক্তি মহাকবির বর্ণনায় দেখিতে পাই—'কচিৎ সগর্ভ-প্রমদা-স্তন-প্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ"—সন্তান-সম্ভবার পয়োধরের রূপমাধুর্য লইয়া জলদজাল গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ চিত্রে দেখি—"ঘন-গৌরবে নব যৌবনা বরষা।" কালিদাস দেখিলেন—কলাপ বিস্তার করিয়া শিখি-কুল নৃত্য করিতেছে—"বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণ কলাপ-শোভিতং প্রবৃত্ত নৃত্যং কুলমত্ত বর্হিনাম।" অতি অল্প কথায় অনুরূপ শোভা অভিনব রূপে রবীন্দ্রের রচনায় দেখা দিল—"উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে।" রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তও মেঘ-দর্শনে ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে।" মহাকবি লিখিয়াছেন—'সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসং"—চিত্তের ঔৎসুক্য বিধান করে এই বর্ষা। রবীন্দ্রনাথের চিত্তেও হর্ষের ঐ রূপ দেখা দিয়াছে। রূপাঙ্কনের অপূর্ব তুলিকায় কবীন্দ্র সেই হর্ষ-চিত্র অঙ্কন করিলেন:—"নিখিল-চিত্ত-হরষা"—বর্ষা নিখিল চিত্তের হর্ষ বিধান করে।

মূলতঃ, কৈশোর হইতেই রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া, কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আর তাঁহার প্রাণ এবং কাণ সুর ও ছন্দের দিকে এতখানি সজাগ-সচেতন যে প্রথম হইতেই সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও রূপের সঙ্গে তাঁহার একটা নিবিড় ঐক্যের ভাব-সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাই রবীন্দ্রের কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের—বিশেষতঃ কালিদাসের রচনার ভাব-লাবণ্য এবং ধ্বনি-মাধুর্য নব বিভূতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ফলতঃ, আকৈশোর কালিদাসের কাব্যের অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ মহাকবির বর্ণিত সৌন্দর্যের নিলয়কে এতখানি ভালবাসিয়াছেন, মহাকবির বর্ণিত চরিত্রের মাধুর্যে এতখানি মুগ্ধ হইয়াছেন যে শুধু মানস-চক্ষুতে দেখিয়া তাঁহার যেন পরিতৃপ্তি নাই। এই যুগে সেই সেই চরিত্রের একান্ত অভাব কবির রূপ-পিপাসু অন্তরে পীড়া দিয়াছে। সেই মুগ্ধ সেই সব মুগ্ধ কই? সেই মনোহর রূপ লইয়া বর্ষা আসিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের যুগের সে অভিসারিকা কোথায়? কালিদাস বর্ষায় দেখিয়াছেন অভিসারিকাদের অনুরাগভরে অভিসার—"প্রযান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ।" রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁহার প্রাণের অতৃপ্তিকে ভাষায় রূপায়ে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"কোথা তোরা অভিসারিকা?" তিনি তো কালিদাসের ঐ দর্শন-সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি তো এই বর্ষায় "ঘন নীলবসনা" বেশে "ঘনবনতলে" তাহাদের ললিত নৃত্য দেখিতে পাইলেন না। ললিত নৃত্যে তাহাদের স্বর্ণের কাঞ্চীদাম বাজিত, আর সেই সঙ্গে তাহারা মনোহর বীণাবাদ্য করিত—কি সুন্দর! বর্ষার "নিখিল-চিত্ত-হরষা" রূপ দেখিয়াও কবি এ যুগে কালিদাসের সেই অনুরাগিণীদের দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছেন—হে প্রিয় সুখভাগিনীন বাহুরাগিণীগণ, মধুর মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী লইয়া এস, শঙ্খ বাজাও, হুলু ধ্বনি কর—আজ যে বর্ষা আসিয়াছে। কালিদাসের ললনাগণ যে এই দিনে কুঞ্জ-কুটিরে ভাবাকুল-লোচনে ভূর্জপত্রে নবগীত রচনা করিত, আর মেঘ-মল্লারে সেই গান গাহিত, আজ আর সে দৃশ্য কই? কালিদাস দেখিয়াছেন—"কদম্ব নব কেসর-কেতকীভিরভিযোজিতা শিরসি···সুরতীকৃত-কেশপাশাঃ।" কামিনী জনের সেই রূপ-মোহে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—"কেতকী-কেসরে কেশ-পাশ কর সুরভি।" কালিদাসের যক্ষ বার্তাবহ মেঘকে বলিতেছে—অলকাতে প্রণয়িনীর কঙ্কণ-ধ্বনির সঙ্গে নৃত্যরত তোমার শিখি-বান্ধবকে দেখিবে—"তালৈঃ শিঞ্জা-বলয়-সুভগৈ নর্তিতঃ কান্তয়া যো যামধ্যাস্তে দিবস-বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদবঃ।" রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্যের প্রতি অনুরাগ-ভরে অনুরূপ ধ্বনি-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অভাবের মধ্যেই সেই ভাবের সৃষ্টি করিলেন—"তালে তালে দুটি কঙ্কণ কণকণিয়া, ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া।'

আষাঢ়ের প্রথম দিবসের যে রূপ-মোহে উজ্জয়িনীর কবি চিরজীবী মেঘদূত প্রণয়ন করিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রাণেও আষাঢ়ের সেই আকর্ষণ। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়।" মহাকবি "কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে" "মেঘমন্দ্র শ্লোকে" "বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক" "সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত" করিয়া গিয়াছেন কে জানে? কিন্তু যে-দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের উপর নূতন আলোকপাতে অভিনব ভাব-

মহিমা প্রকাশ করিলেন, সে-দিন চির-পরিজ্ঞাত হইয়া ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিল।

মহাকবির 'মেঘদূত' পাঠ করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথের "গৃহত্যাগী মন" "মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে" আসন গ্রহণ করিয়া "সানুমান্ আম্রকূট" হইতে কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী পর্য্যন্ত উড়িয়া চলে। বিশ্ব-কবি মহাকবির নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—"সেথা কে পারিত লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া কবি অবারিত লক্ষ্মীর বিলাসপুরী অমর ভবনে?"

কবি দৃষ্টিতে বর্ষা-প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে চির-বিরহের অপূর্ব রূপ ধরা পড়িয়াছে। কালিদাস তাঁহার অমর কাব্য মেঘদূতে উহা যেমন প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা নাই। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া উহার রমণীয় মাধুর্য উপভোগ করিয়াছেন এবং জনে জনে তাহা বিলাইয়া অদ্বিতীয় সমালোচক কবির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বর্ষায় কাব্যরূপের অতুল ঐশ্বর্য উপলব্ধি করিয়া তিনি দেখাইলেন যে বিরহে বৈষ্ণব-কাব্য অমর হইয়া আছে সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীমতী-শ্রীকৃষ্ণের ব্যবধান সামান্য মাত্র—বৃন্দাবন হইতে মথুরার যেটুকু ব্যবধান। তাই, সেখানে লঘু বসন্ত-সমীরণই দৌত্যে নিযুক্ত। কিন্তু যেখানে "অস্তং গমিত-মহিমা" যক্ষ হিমালয় হইতে সুদূর রামগিরিতে নির্বাসিত হইয়া "ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠ" হইয়া পড়িয়াছে, সে বিরহে দৌত্য-কর্মের যোগ্যতা একমাত্র বর্ষার বারিধরের। বিরাট্ বিরহে মিলন সংসাধনের যোগ্যতা একমাত্র তাহারই। বিপুল বিরহ-বর্ষ্ম পূর্ণতার প্রাচুর্যে ভরিয়া দিয়া, শ্যামল গৌরবে মণ্ডিত করিয়া বর্ষার মেঘই এই বিরহের বার্ত্তা বহিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ। তাই মেঘদূত শ্রেষ্ঠ বিরহ-কাব্য। প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, তখনই এই বর্ষার আবির্ভাব। সে যে "প্রাণিনাং প্রাণভৃতঃ।" এমন না হইলে কি সর্বধ্বংসী মহাকালের গতির মহাচক্রে আবর্ত্তন করিয়া জীবলোকের এতখানি কল্যাণ করিতে পারে? স্থূলতঃ বাস্তবে, আর কবিদের প্রসাদে সূক্ষ্মরূপে দেখিতে পাই—বর্ষা পরম কল্যাণের মূর্তিতে সর্বঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার রহস্যাবৃত সৌন্দর্য বিরহের অপূর্ব রূপে কবি-কুলের চিত্ত হরণ করিয়াছে। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts." রসের মধ্যে করুণ রস শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, আর তাহা হইয়াছে বিরহেরই ভাব-গৌরবে। বর্ষায় সেই বিরহের মধুরতম রূপ—তাই, বিরহ-রস-প্রধান বর্ষায় শিব-সুন্দর মূর্তিকে অবলম্বন করিয়া মহাকবি বিরহের স্বর্গলোক—মিলনের সূর্য্যলোক রচনা করিলেন মেঘদূতে।

[illegible] অস্ত-লোকের [illegible] বিরহের জন্য মিলনের অপূর্ব সম্পদ্ লাভ করিবার কাল এই বর্ষা। কবি কালিদাস অন্তরের দৃষ্টি দিয়া বর্ষা-রূপ নিরীক্ষণ করিয়া বিরহের মধ্যে মিলনের ঐ অপূর্ব রূপ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব-কবি অন্তরের কর্ণে শুনিতে পাইলেন—কালিদাস-রচিত সেই মহামন্ত্র যাহা হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন-ব্যথা দূর করিয়া দেয়। "কবি, তব মন্ত্রে আজ মুক্ত হয়ে যায় রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা। লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া, অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া।"

ফলতঃ, বিরহের স্মৃতি এই বর্ষায় জাগিয়া মিলনের আনন্দ আস্বাদনে যে সহায়তা করে, উহাই বিরহীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। উহাই "সদ্যঃপাতি প্রণয়ি-হৃদয়ের" পরম "আশাবন্ধ।" এই জন্যই "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘ এত প্রিয় হইয়াছিল, আর, আষাঢ়ে আষাঢ়ে দূর-বিরহের স্মৃতি জাগাইয়া এই মেঘ প্রাণে প্রাণে পুণ্য মিলনানন্দের সুখই রচনা করিয়া যায়।

তবে, মহাকবি ভিন্ন যেমন "বিরহের স্বর্গলোক" বিশ্ব-কবিকে আর কেহ দেখাইতে পারিত না, তেমনই বিশ্ব-কবি ভিন্ন আমাদিগকে "কামনার মোক্ষধাম"ও কেহ দেখাইতে পারিত না। যেখানে সশরীরে লোকে যাইতে পারে না, সেই "মানস-সরসী-তীরে" "রবি-হীন মণি-দীপ্ত প্রদোষের দেশে, জগতের নদী-গিরি সকলের শেষে" কবীন্দ্রই আমাদের লইয়া যাইতে পারিয়াছেন।

ভাষা ও ছন্দের আদি যুগের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখিতে পাই—বর্ষার মনোহর কাব্য-কবিতা রচনায় মহাকবি যেমন বিশ্বকবির প্রাগ্-বর্ত্তী, তেমনি ঋষি-কবি বাল্মীকি মহাকবির পূর্ববর্ত্তী দ্রষ্টা। কালিদাস যক্ষের বিরহকে অবলম্বন করিয়া "জনক-তনয়া-স্নান-পুণ্যোদকেষু ··· রামগির্য্যাশ্রমেষু" বর্ষার রূপ অঙ্কন করিয়াছেন, আর ঋষি-কবি সেই জনক-তনয়ার বিরহে বিরহী রামচন্দ্রের মধ্যে বিরহের নব উদ্দীপনা দেখিয়াছেন এই বর্ষায় আর এক পর্বতে। অপহৃতা সীতার বিরহে তাঁহার ভাবোদ্দীপনা হইয়াছিল আর এক বর্ষায় মাল্যবান্ পর্বতে। মহর্ষি ও "জলাগমে" দেখিতেছেন, নভোমণ্ডল জলদ-জালে আচ্ছন্ন। "নভো মেঘৈঃ সংবৃতম্।" যক্ষ আট মাস কাল বিরহে যাপন করিয়া আষাঢ়ের আগমনে বলিয়া উঠিয়াছে—হে মেঘ, তুমি দেখা দিলে আমার মত পরাধীন ভিন্ন কে জায়াকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে? কঃ সন্নদ্ধে বিরহ-বিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং, ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীন-বৃত্তিঃ।- বাল্মীকির লেখনী-মুখে বিরহী রামচন্দ্রের উক্তিতে দেখিতে পাই—এমন [illegible] বর্ষায় সুগ্রীব সস্ত্রীক সুখে বাস করিতেছে, আর হতভাগ্য আমি [illegible]—

ইমা স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমগ্নুতে বিজিতারিঃ সদারশ্চ রাজ্যে চ মহতি স্থিতঃ, অহন্তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ নদী কূলমিব ক্লিন্ন মবসীদামি লক্ষ্মণ।" যক্ষ মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে, "কালে কালে ভবতি ভবতো যস্যে সংযোগমেত্য স্নেহ ব্যক্তি শ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্"—রাঘবের পদ-চিহ্নে চিহ্নিত চির-বিরহী চিত্রকূট বর্ষে বর্ষে মেঘের সঙ্গ লাভ করিয়া বিরহের বাষ্প মোচনছলে স্নেহ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বারি-বর্ষণ যেন তাহার অশ্রু-বিসর্জন—আর সেই অশ্রু-বিসর্জন যেন তাহার স্নেহেরই অভিব্যক্তি। বাল্মীকির বর্ষা-চিত্রে শুধু পর্বতের নহে, সমগ্র পৃথিবীর বাষ্প মোচনের রূপ। এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারি-পরিপ্লুতা, সীতেব শোক-সন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি।" কালিদাসের "প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্" আর বাল্মীকির প্রবৃত্ত-নৃত্যোৎসবের-বর্হিণানি" ভাব-সাদৃশ্যের উজ্জ্বল ছবি। বাল্মীকি মাল্যবান্ পর্বতে কুটজ পুষ্পের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন—'কুটজান্··· কাম-সন্দীপনান্', কালিদাস যক্ষের হস্তে ঐ কুটজ কুসুম দিয়া মেঘের অর্চনা করাইয়াছেন—"স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ কুসুমৈঃ···" ইত্যাদি। এমনি অসংখ্য চিত্রের মধ্য দিয়া বর্ষা-কাব্যে ভাব-সাদৃশ্যের মনোহর রূপ নিরীক্ষণ করি। এই যে ভাবের ঘরে চুরি, ইহার সাদৃশ্যের অন্তরালে, কবিদের স্বতন্ত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যকে স্বীকার করিতে হয়। বাল্মীকি-কালিদাসের পরবর্তী সংস্কৃত-ছন্দের কবি জয়দেব আর এক বর্ষার দিনে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" অবলোকন করিয়া শ্রীমতীর অভিসার-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিরহে-মিলনের আর একটি অপূর্ব-মনোহর রূপ এই চিত্রে। তাহার পর এই দেশের কত কবি যে বর্ষার ঐ ভাব-সাদৃশ্যে বিরহ-মিলনের অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বাংলা-কবিতায় অল্প নহে।

এই বর্ষা যে কবি-কল্পলোকে শ্রেষ্ঠ ঋতু হইয়াছে, সে দেখিতেছি, শুধু কাল্পনিক আনন্দ বিধানে নহে, প্রকৃত পক্ষে, প্রয়োজন-সাধনেও সে যে শ্রেষ্ঠ ঋতু। জীব-লোকের শিব-সাধনে আর আনন্দ-বিধানে এই বর্ষার অপূর্ব মহিমা বলিয়াই অখণ্ড কালের মধ্যে খণ্ডরূপে ইহার শিব-সুন্দরের সত্য মূর্তি এত অপরূপ।

বিশ্ব-ব্যাপী তাপ-দাহের দুর্দিনে—প্রাচীর দিগন্তে মহা-মন্বন্তরের যুগ-সন্ধি-ক্ষণে আবার ঐ আষাঢ় নামিয়া আসিয়াছে। পূর্ব দিগন্তে আজ আমরা রবীন্দ্র স্মরণে মহাকবির মহাবাক্যের ভাব-সাদৃশ্যে এই বলিয়া বর্ষাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করি—এস বহু গুণে রমণীয় বর্ষা, এস নারীদের চিত্ত-হারী বর্ষা, এস বৃক্ষ-লতার অকপট বন্ধু বর্ষা, এস প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ বর্ষা,—তোমার কল্যাণ-মূর্তিতে আসিয়া বিশ্বের কল্যাণ কর।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

তবু যোগমায়া যাইতে পারেন নাই। পরের ঘরের কোথাকার সঞ্চিত মমতা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কত দিন পরে তাহারা আসিবে ঠিক নাই। সুদীর্ঘ চারি মাস—ছয় মাস—পূজা আসিয়া চলিয়া যাইবে—তখনও কি যোগমায়ার এই দায়িত্বের শেষ হইবে? কারাবরণ উঁহারা করে নাই, যোগমায়াকেই বন্দিনী করিয়া গেল বুঝি! বিমলের চিঠি আজকাল ঘন ঘন আসে। তীর্থযাত্রীর দল দেশে ফিরিয়াছে—মায়ের জন্ত তাহারও ভাবনা বাড়িয়াছে। সেই বাড়িতে মা কত দিন পরে ফিরিবেন—কত দিনে তাহারা স্বস্তি লাভ করিবে।

লতার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁহার দুর্জয় অভিমান ও সে অভিমানের পরিসমাপ্তি। বধূকে লইয়া তুচ্ছ সাংসারিক খুঁটিনাটির সংঘর্ষে যে অশান্তি জমা হইতেছিল দিন দিন—আজ সংসার হইতে এত দূরে বসিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যোগমায়া সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করিতে থাকেন। সুচরিতাও শাশুড়ী—কিন্তু রেবার তিনি শাশুড়ী নহেন—মা। শাশুড়ীর কাছে অসঙ্কোচেই রেবা আবদার করে, জিদ করিয়া শাশুড়ীকে বশ্যতা মানায়, স্বামীর সম্মুখে মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া লজ্জায় কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া আনে না। এইগুলি অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু ঠিক হিন্দু-সংসার বলিতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা-ঘেরা সংসারটিকে যোগমায়া আজীবন জানেন—ইহা তাহা হইতে বিভিন্ন। বিভিন্ন বলিয়াই যে সব দিক দিয়া অসুন্দর তাহা নহে। এ সংসারেও শুচিতা আছে—আনন্দ আছে। পরিষ্কার দিনের আলোর সব দিক হইতে জীবনীরস আহরণ করিবার শক্তি এই সংসারও রাখে। দূরে দাঁড়াইয়া এই সংসারকে না মানার চেষ্টা হয়তো সহজ, বর্ষার রাত্রিতে বাহিরের অন্ধকারকে যেমন ভয়-ভয় লাগে—কিন্তু সত্যই তো মনের অলীক ভয় চিরকালের সত্যকে চাপিয়া রাখিতে পারে না।

আশ্চর্য, সময় কাটাইবার মন্ত্র চিরকালই যোগমায়া জানেন। বাঁধা-মাহিনার চাকর ঘরের যে ধুলা ঝাড়িয়া যায় তাহা যোগমায়ার মনঃপূত হয় না। নূতন করিয়া তিনি গৃহ-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ছবির ফ্রেমগুলি কয়লা তোয়ালে দিয়া নিত্য মুছিয়া দেন,

বড় অয়েল-পেণ্টিংটায় ফুলের মালা টাঙাইবার অবসর না মিলিলেও একগোছা ফুল ফ্রেমে আটকাইয়া দেওয়া নিত্য পদ্ধতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অকারণে বইগুলি হয়ত মুছিয়া দেন। সেগুলি তাঁহার নিপুণ করের সোহাগ-স্পর্শ পাইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া হাসিতে থাকে। সকালে দুয়ারে গঙ্গাজল না ছিটাইলেও—সন্ধ্যায় ধুনা জ্বালার কাজটি করিতে ভুল হয় না। শাঁখ বাজাইবার জন্ম মাঝে মাঝে প্রবল ইচ্ছা হয়, কিন্তু ও-জিনিসের অভাব শুধু তাঁহাকে পীড়া দেয়। প্রয়াগের এই পল্লীতে সন্ধ্যার আগমনী নিঃশব্দেই শুরু হয়। বোতাম টিপিলে আলো জ্বলে—উনুনের ধোঁয়া এত গাঢ় যে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম। তরল ধুনার ধোঁয়া শুধুই সুগন্ধ বিস্তার করে না—সহজে নিশ্বাস লইবার প্রশান্তিতে মনটি পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ করিয়া তুলে। মিশিরজীকে বলিয়া একটি তুলসীর চারা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। উদ্যানের এক পার্শ্বে সযত্ন-জল-সিঞ্চনে সেটি দিন দিন স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিতেছে।

দুপুরের অবসরে বিমল ও লতার চিঠিগুলি লইয়া তিনি পড়িতে বসেন।

চিঠি পড়িতে পড়িতে যোগমায়া কখনও হাসেন—কখনও বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। চিঠি তো নহে, ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া সেই চিরজীবনের কাম্য ভূমি কোলের পানে টানিতে থাকে। সেই স্বপ্নে দুপুর কাটিয়া যায়, রাত্রি কাটিয়া যায়। এ বাড়ির সযত্ন সেবায় নিষ্ঠা তাঁহার প্রগাঢ় হইতে থাকে।

প্রয়াগে তিনি নিত্য স্নান করেন। নিত্য-স্নান কালে যাত্রীর ভিড়—পাণ্ডার কলহ—বনশীবাবার বাঁশী ও বালু লইয়া ঢিবি তৈয়ারী করা—সবই তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আইজাক সেতু কাঁপাইয়া অজগরের মত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সুদীর্ঘ মালগাড়ির শ্রেণী গঙ্গা অতিক্রম করে—ঝুঁসির মঠের উচ্চতা দূর হইতে মনোরম তপোবনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে, কিন্তু এসবের অর্থ আজ ভিন্নতর। আজ জীবনের কলরব ছাপাইয়া ঝুঁসির অঙ্গুলি-সঙ্কেত, আকাশের নক্ষত্রের রহস্য বা বনশীবাবার বাঁশী কোনটাই অনিত্য-জীবনের কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দেয় না। চিতার ধূমে ও অগ্নিশিখায় মনের কামনাগুলি বৈরাগ্যের ধূসর আবরণে মিশিয়া যায় না। এই পুণ্য সঞ্চয়ের পিছনে সংসারের সুশীতল কোলে জুড়াইবার যে বিচিত্র ব্যবস্থা আছে—তাহারই মধ্যে হাসি-কান্নায় জড়াইয়া বাঁচিয়া থাকাটাই বুঝি জীবন। সেই জীবন-তরু শাখা-প্রশাখায় শত দুরন্ত বাহু মেলিয়া আর সব কামনাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে দ্রুত।

...মা, তুমি না ফিরে এলে বাড়ি আমাদের ভাল লাগছে না। কবে ফিরবে? আমাদের চেয়ে তীর্থই কি তোমার বড় হ'ল?...

কঠিন অভিযোগের উত্তর দিবার সাধ্য যোগমায়ার নাই। তোমরাই যে আমার সব চেয়ে প্রিয়তর। তোমাদের শান্তির জন্মই ত তোমাদের ছাড়িয়া এত দূরে আমার আসা। আমার সংসারে তোমাদের প্রতিষ্ঠা—এর চেয়ে বড় সাধ আমার কোন্ দিনই বা ছিল?

...মা, আপনি আমায় ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, এখন বুঝিতেছি—সে ক্ষমা আন্তরিক নয়। এই নির্জ্জন ভিটায় মাসের পর মাস একলা থাকিয়া আর আমার ভয় হয় না, কিন্তু মন কেমন করে। যে প্রণাম তুলসীতলায় আপনার রাখিবার কথা—যে প্রদীপ আপনার হাতে জ্বলিলে বেশী উজ্জ্বল দেখায়...কিন্তু আপনি কি আসিবেন না? না আসিলে আজীবন এই শাস্তি আমায় বহন করিতে হইবে।

পাগলী মেয়ে! এ কি শাস্তি, না আশীর্ব্বাদ। প্রণামের মন্ত্র মেয়েছেলের ভুল হইবে কেন; সে মন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের যে জন্মগত সংস্কারের মিল আছে, তাহাদের হাতের আলো জ্বলিবার কালে কখনও কি কম-জোরী হইয়াছে?

যোগমায়া হাসেন। মনে মনে সেই দণ্ডে সেই ভিটায় ফিরিয়া গিয়া বধূকে কোলের কাছে টানিয়া অশ্রুজলের অভিষেকে আনন্দ-আপ্লুত করিয়া তুলেন।

তুমি যে আমার বড় আদরের বিমলের বউ, তোমায় শাস্তি দেওয়া মানে নিজেকেই দুঃখ দেওয়া।

এক মাসে ক'টি দিন, ক্যালেণ্ডারের তারিখে যোগমায়া প্রত্যহ একটি করিয়া দাগ দেন। যে-দিন শেষ হইয়া গেল—তাহারই অভ্রান্ত হিসাব।

দু-খানি পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিবার পর এক দিন বিমলের আর একখানি পত্র আসিল। শ্রাবণ মাসের শেষই হইবে তখন। পশ্চিমের শহরে বর্ষার উপদ্রব নাই। প্রখর রৌদ্রভরা আকাশ সারাদিন অগ্নি বর্ষণ করে, ভোর রাত্রিতে গায়ে কাপড় টানিয়া না দিলে শীত-শীত বোধ করে। রুক্ষ প্রকৃতি সর্ব্বদাই মানুষকে শাসন করিতেছে। বাংলায় তিনি স্নেহের আতিশয্যে কোমলা। নূতন মেঘে আকাশ কোমল, পায়ের পাতা ডুবাইয়া নরম সবুজ ঘাস জন্মিয়াছে—বৈশাখের চিকণ পাতাগুলি পুরাতন ও সতেজ হইয়া প্রত্যেক গাছকেই ঢাকিয়া দিয়াছে। ভিজা কাঠ ও ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া মানুষের মন সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইয়া থাকে। ডোবায় জল জমিলে ব্যাঙেরা সারারাত্রি মহোৎসবে মাতিয়া চীৎকার করে। ঘটির চাল-কড়াই ভাজা ভাল করিয়া ঢাকা না দিলে মিয়াইয়া যায়। সঞ্চিত কলাই-মুগে পোকা ধরে, হাওয়া ভিজে স্যাঁৎসেঁতে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই অদ্ভুত কোমলতা।

বাহিরের ঘরে মিশিরজী তুলসী দাসের রামায়ণ পড়িতেছে:

শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল

নব কঞ্জলোচন, কঞ্জমুখকর, কঞ্জপদ কঞ্জারুণম্।

সুরটিই শুধু মিষ্ট—ভাষার মধ্য দিয়া ভাব সেখানে মিতালী পাতায় না। কাজেই কান ছাড়া মনের সহযোগ সেখানে নাই।

তাঁহার গ্রামের সন্ধ্যা বেলায় রামায়ণের আসর মনে পড়ে। বিস্তৃত উঠানের এক প্রান্তে চারিখানি বাঁশ বা নোনা আতার মোটা ডাল পুঁতিয়া—তাহার মাথায় মোটা বিছানার চাদর বাঁধিয়া চন্দ্রাতপ তৈয়ারী হইয়াছে। তাহারই তলে পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া চারি জন ধুয়াদারকে দু-পাশে লইয়া নধরকান্তি গৌরবর্ণ ক্ষুদিরাম ভাট রামায়ণ গান আরম্ভ করিয়াছেন। সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজিবার পালা শেষ হইলেই গানের আসর জমিবে। শাদা মল্লিকা বা টগর ফুলের মালা গলায়—হাতে শ্বেত চামর—পরনে

কাবার বস্ত্র ও গলদেশে কাবার উত্তরীয়ের অন্তরালে শাদা ধবধবে পৈতাটি বামস্কন্ধদেশের উপর হইতে দক্ষিণ-বাহুর নীচে পর্য্যন্ত বিলম্বিত। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। ভাট মহাশয়ের বড় চুলে চূড়া বাঁধা। চূড়া বেড়িয়া ছোট একগাছি মালাও শোভা পাইতেছে। সম্মুখের জলচৌকিতে রক্ষিত বড় পিত্তলের থালে কাঠাখানেক (আড়াই সের) চাল—তদুপযুক্ত ডাল, মশলা, মিষ্ট, আনাজপাতি ও একখানি নববস্ত্র বা গামছা দিয়া গৃহস্থ সিধা সাজাইয়া দিয়াছেন। তা ছাড়া মূল গায়কের সম্মুখে আর একখানি থালা পাড়িয়া আছে, তাহাতে প্রণামীর পয়সা জমিতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়েদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া হাসিমুখে গায়কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। হাসিমুখে তাহাদের হাত হইতে পয়সা লইয়া গায়ক ঠুন করিয়া থালায় ফেলিতেছেন এবং ছেলে বা মেয়েদের মাথায় চামর বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। গায়কের হাতে পয়সা তুলিয়া দিবার জন্ত ছেলেদের কি হুড়াহুড়ি! কৃত্তিবাসের অমর পয়ার ছন্দে গায়ক রামায়ণ-কাহিনী আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। দোয়াররা ধুয়া ধরিয়াছে:

রামপদপঙ্কজ ভজরে মন।

যুক্ত প্রদেশের ভূমিতে বসিয়া এমনই করিয়া বাংলার স্বপ্ন দেখেন যোগমায়া।

ঠিকানা খুঁজিয়া বিমল এক দিন তাঁহার কাছে আসিল।

কে রে—বিমল? কি করে এলি?

প্রণাম করিয়া বিমল বলিল, যে করেই আসি—তুমি ত গেলে না।

বউমা একলা রইলেন ত?

তা কি করব—তোমার অনুমতি না পেলে সে ভিটে ত্যাগ করবে না।

পাগল! বড় তৃপ্তির হাসি হাসিলেন যোগমায়া। একটু থামিয়া বলিলেন, বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছিস, রং যেন পুড়ে গেছে।

যাবে না কেন, আমাদের কথা আর কে ভাবে বল?

যোগমায়ার বুকে অকস্মাৎ সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

মা।

বালতিতে জল আছে—হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হ। আমি আসছি।

যোগমায়া আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। এত দীর্ঘ দিন পরে দেখা—ঝড় থামিয়া সমুদ্র শান্ত হইয়াছে। সে সমুদ্রে অকস্মাৎ পূর্ণিমার জোয়ার লাগিলে তরঙ্গ-বেগকে সংযত করা বুঝি এমনই কঠিন। বিমলের এই বিবর্ণ মুখ—অনুযোগভরা কথা—এ সহ্য করিবার মত মনোবল যোগমায়ার নাই। না পলাইয়া উপায় কি?

রেকাবী ভরিয়া জলখাবার লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

বিমল বলিল, আজই তোমায় যেতে হবে মা।

আজ? শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া যোগমায়া বিমলের পানে চাহিলেন।

হাঁ। মাত্র দুটি দিন ছুটি আমার আছে। কাল গেলেও চলবে। কিন্তু বিশ্রাম না নিলে ভারি কষ্ট হবে।

কিন্তু আজ কি করে যাই বল্? এই সব কার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে যাব?

কেন, যাঁদের বাড়ি তাঁরা বুঝে নিন না।

তাঁরা? কপালখানা আমার! তাঁরা কি এখানে আছেন? স্বদেশী করতে গিয়ে জেল হয়েছে যে?

জেল! এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া মায়ের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, তোমার পরনে ওখানা কিসের কাপড় মা?

খদ্দরের। গিন্নী যে-দিন জেলে যান—আমায় এক জোড়া কাপড় দিয়ে বললেন, এইটি পরলেই আমাকে তোমার মনে পড়বে ভাই। তাই রোজ পরি। এমন দেবীর মত মানুষ—তুই দেখতে পেলি নে তাঁকে।

বিমল বলিল, দেবী দেখবার সৌভাগ্য আমাদের মেলে না—মা।

বিমলের শুষ্ক স্বরে যোগমায়া অবাক হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে ঈষৎ অনুযোগভরা কণ্ঠে কহিলেন, তুই জানিস নে বিমল, তাঁকে দেখবার ভাগ্য আলাদা। সে ভাগ্য সকলের হয় না। বয়সে তিনি আমার চেয়ে হয়ত বড়ই হবেন, ও ভাবে কথা বললে আমার বড্ডই লাগে।

বিমল হাসিয়া বলিল, তুমি ভুল করছ কেন মা। ওঁদের সঙ্গে আমাদের যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক। পুলিসে আমি চাকরি করি যে।

তাই বলে মাথা কিনেছিস আর কি। ধমকের সুরে যোগমায়া বিমলকে নিরস্ত করিলেন।

নে, জলখাবার খেয়ে নে।

নিচ্ছি। কিন্তু মা, এখানে আর একদণ্ডও থাকা তোমার চলবে না। হিউয়েট রোডে আমার বন্ধুর বাড়ি জিনিসপত্তর আছে, তোমাকে সেইখানে যেতে হবে।

আচ্ছা যাব'খন। তুই খেয়ে নে তো আগে।

হাসিতে হাসিতে বিমল বলিল, ছেলেবেলায় কাক দেখিয়ে যেমন দুধ খাওয়াতে—তেমনি ধারা করছ না তো?

কাকে-বকে ভোলবার ছেলেই বটে তুমি! যেটুকু দুধ কাক ডেকে ঝিনুকে করে তোমায় খাইয়েছি—বমি করে সবটুকু না তুলে ছাড়তে কিনা।

ছেলেবেলার অভ্যাস এখনও আমার আছে।

খুব বাহাদুর! মাকে জব্দ করবার ফন্দী তোমাদের বলে দিতে হয় না।

আর ছেলেদের জব্দ করতে মায়েরাও এমন তীর্থ খুঁজে নেন—

হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়া জলযোগ শেষ হইল। বিমল বলিল, এইবার গুছিয়ে নাও।

তাঁরা ভাত চাপিয়ে এলাম এই মাত্তর—ধরে-পুড়ে না যায়।

যোগমায়া ফিরিয়া আসিলে বিমল বলিল, কিন্তু এখানে তো আমি খেতে পারব না—মা।

কেন? একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পুলিসে চাকরি কর বলে—

সেটাও কারণ, কিন্তু সবটুকু নয়। বন্ধু আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

বন্ধুর নেমন্তন্নটাই তোমার বড় হ'ল! বিমলের নতমুখের পানে চাহিয়া যোগমায়া বলিলেন, বেশ, তবে সেইখানেই খাও গে।

তুমি যাবে না?

না।

এই তো রাগ হ'ল! তোমায় নিতে এলাম সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে—আর তুমি—

আমি তোমায় আসতে লিখি নি।

মা! সাদরে যোগমায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বিমল বলিল, সত্যি বল নি? সত্যি না?

ছাড়—ছাড়, পাগল দেখ। হাসিয়া ফেলিলেন যোগমায়া।

আহার শেষে বিমল বিশ্রাম করিতে রাজী হইল না। আজই যাব আমরা, গুছিয়ে নাও।

যোগমায়া বলিলেন, না রে, ওদের সংসার, ওদের হাতে না তুলে দিয়ে আমি যেতে পারব না।

অভিমান-আহত কণ্ঠে বিমল বলিল, আমি মিছেই এতদূর ছুটে এলাম!

কি করব বাবা, পরের সংসার বলে তো ভাসিয়ে দিতে পারি নে।

তুমি জান মা, এদের সংসারে তুমি আছ জানলে আমার চাকরির ক্ষতি হতে পারে।

শঙ্কিত কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, কেন রে?

খবর তো কিছু রাখ না।

খানিকক্ষণ দুই জনেই চুপচাপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া বলিলেন, খবর রাখি না বটে, তোর খবরটা তো রাখি। তোর শুধু চেহারাই বদলায় নি খোকা!

বিমলের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ওষ্ঠের কম্পন-আবেগে বঙ্কিম রেখা ফুটিল, কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

যোগমায়া অতটা লক্ষ্য করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, তুই এক দিন আমার হাতে রাখী পরিয়ে দিয়ে কি বলেছিলি—মনে আছে?

মাথা নাড়িয়া বিমল বলিল, না। ছেলেবেলায় খেয়ালে কবে কি করেছি—মনে নেই।

আমার মনে আছে। পাতলা বিলিতী কাপড় ছাড়িয়ে—মোটা গুণচটের মত একখানা কাপড় দিয়েছিলি আমায় পরতে।

অস্থির হইয়া বিমল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ তাহলে যাবে না?

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, আজ থাক না। অন্তত একটা খবর পাঠিয়ে দিই ওঁদের।

খবর পাঠাবে জেলে তো? নৈনী জেলে! না মা, তার চেয়ে তুমি থাক। আমি বরঞ্চ অন্য ব্যবস্থা করব।

কিসের ব্যবস্থা রে?

নত মুখেই বিমল বলিল, আমাদের যখন তুমি ভালবাস না—তখন নাই-বা শুনলে সে কথা।

তাহার কাঁধের উপর ডান হাতখানি রাখিয়া সস্নেহকণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, তবু শুনিই না।

না, শুনে কাজ নেই। মুখ ফিরাইয়া বিমল মনে মনে হাসিল। মায়ের এই দুর্ব্বলতাটুকু সে চিরকাল পরম আনন্দে উপভোগ করিয়াছে।

যোগমায়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, আবার দুষ্টুমি আরম্ভ করলি খোকা? জানিস, এখনও তোর কান মলে দিতে পারি।

তাই দাও না মা। তোমার ওপর জোর করব—সেটুকু দাবিও যে খুঁজে পাচ্ছি না আজ।

যোগমায়া পুনরায় বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া বলিলেন, কি বলছিস?

বলছিলাম, একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুখ নামাইয়া সে বলিল, তোমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল—বাপপিতামহের ভিটের তাঁদের প্রথম বংশধর যেন ভূমিষ্ঠ হয়।

খোকা! আনন্দে যোগমায়া প্রায় আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। চোখ দিয়া তাঁহার জল গড়াইয়া পড়িল।

কাঁদছ কেন মা?

ওরে অনেক কথা আজ আমার মনে পড়ছে। টপ টপ করিয়া অবাধ্য অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

খানিকটা পরে শান্ত হইয়া চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, আজ রাত্তিরে গাড়ি তো?

হাঁ মা। কিন্তু এ সংসার ফেলে তুমি যাবে কি করে?

যাব—ওরে যাব। আর থাকতে পারব না আমি। শুষ্ক চোখের কোল পুনরায় চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

বিমল হাসিয়া বলিল, যাকে দেখ নি সেই হ'ল তোমার সব চেয়ে বড়! আর আমি।

যোগমায়ার মুখ অশ্রু-হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া অপরূপ দেখাইল। কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন, টাকার চেয়ে সুদের মায়া ঢের বেশি খোকা।

*

ভগবানকে একমনে ডাকার ফল কিনা বলা যায় না—অন্তত যোগমায়ার সেই বিশ্বাস—সেই দিন অপরাহ্ণে রেবা ফিরিয়া আসিল।

মাসীমা, আমায় ছেড়ে দিলে।

প্রণামরত রেবার চিবুক ধরিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন যোগমায়া। কহিলেন, আসতেই যে হবে মা। আমি ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে মানত করছিলাম।

কেন মাসীমা?

বিমল এসেছে ওবেলা, আমাকে নিয়ে যেতে চায়।

রেবার মুখখানি এই কথায় শুকাইয়া গেল। দু'টি মাসে সে

[illegible]

রৌদ্রোত্তাপে এলাইয়া পড়িয়াছে। তবু কৃশাঙ্গী রেবার সৌন্দর্য্য তাহাতে এতটুকু হ্রাস হয় নাই। গৌরবর্ণটি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে; পরিসর ললাট ও ভাসমান চক্ষু দু'টি লাবণ্যের পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। তপস্যামগ্না গৌরীর জ্যোতিবিকীর্ণ মুখমণ্ডলের মতই তাহা প্রোজ্জ্বল।

তুমি এলে বাঁচলাম।

মাসীমা, আমাকে একলা ফেলে রেখে আপনি যাবেন?

যোগমায়া সস্নেহে কহিলেন, একলা কেন মা, নন্তুকে একটা তার করে দাও না।

ইস্ তিনি এসে তো সব করবেন। সংসারের বুদ্ধি তাঁরও যেমন—আমারও তেমনি।

তোমরা হৈ চৈ করে বেড়িও না, মা। এইবার গুছিয়ে ঘর-সংসার কর।

এই তো ঘর-সংসার করে এলাম, মাসীমা।

না না, ওসব পাগলামি আর করো না।

উত্তর না দিয়া রেবা হাসিতে লাগিল।

তাহলে আজ রাত্তিরের গাড়িতেই আমি যাব মা।

আপনাকে ধরে রাখতে তো পারব না। সে জোর আমার নেই।

ছল ছল চোখে রেবার চিবুক স্পর্শ করিয়া যোগমায়া বলিলেন, সে জোর তোমার আছে, কিন্তু বউমা আমার একলাটি ভিটে আগলে পড়ে আছেন। ছেলেমানুষ বউ।

রেবা বলিল, না মাসীমা, তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছে। আপনার যাওয়া উচিত।

পাপিষ্ঠা আমি—প্রয়াগে সারা জীবনটা কাটাতে এসেছিলাম—পারলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন যোগমায়া।

রেবা বলিল, না মাসীমা, ওই গঙ্গার চর আপনার জন্ত নয়। ওখানে হয়ত পুণ্যি আছে—কিন্তু সে পুণ্য অর্জ্জনে সবাই তো তৃপ্তি পায় না।

পুণ্য করে যাঁরা তৃপ্তি পান—তাঁরা সাধু-সন্ন্যেসী লোক। তাঁরা দেবতা, আমরা সংসারের জীব। তীর্থভূমি ছাড়িবার দুঃখে সত্যই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

মাসীমা, আমার একটি সাধ আছে।

কি সাধ মা! বল, লজ্জা কি?

এ বেলায় আপনি খান না—কিছু জলখাবার যদি করে দিই—

খুঁৎখুঁতানি যে মনের মধ্যে না জাগিল তাহা নহে, কিন্তু স্নেহের উত্তাপে নিষ্ঠার কাঠিন্ত তখন দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদায়বেলার তীব্র বেদনায় সব ভুলাইয়া-দেওয়া ঔদার্য্যের আকাশটি যোগমায়ার সারা মনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ততক্ষণে।

হাসিমুখে বলিলেন, দিও। মেয়ের হাতের খাবার খাব বইকি মা। কিন্তু আচমনী তো রাত্তিরে খাই নে। একটু দুধ জ্বাল দিয়ে দিও—একটু যা হয় মিষ্টি—

জলযোগ শেষ হইলে রেবা বলিল, মাসীমা, আপনার কিন্তু হার হ'ল আজ।

কেন?

মনে করে দেখুন দেখি—সেই ভাদ্র মাসের কথা। মনে পড়ে না? কালীঘাটে—

যোগমায়া হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে মা?

কেন পারব না। সে-দিন দেবস্থানে আমার হাতের জল খান নি বলেই তো আজ খাবার খাইয়ে আপনার জাত মেরে দিলাম মাসীমা। খিল খিল করিয়া রেবা হাসিয়া উঠিল।

যোগমায়া এতটুকু লজ্জিত বা আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন না। হাসি-মুখেই বলিলেন, তখন তো আর তুমি আমার মেয়ে ছিলে না, ছিলে পরের বউ। তখন তোমার হাতের জল খেয়ে কেন জাত দিতে যাব। একটু হাসিয়া বলিলেন, তা প্রথম যে-দিন আমায় দেখলে—সে-দিন আমায় জানালে না কেন?

জানাবার সময় পেলাম কৈ। এসেই তো কাজের মধ্যে পড়ে গেলাম। আর দেখা হবামাত্র বললে আপনার লজ্জা হ'ত না বুঝি।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। এমন বউ লইয়া সংসারে মনোমালিন্ত কোনদিন ঘটে না। তাই সুচরিতার মেয়ের আসনটি এমন অসঙ্কোচেই ও দখল করিতে পারিয়াছে।

সবটুকুই বিদায়-বেলার উদার বিস্তৃত আকাশের মহিমা নহে, প্রয়াগের চরভূমিও সেই আকাশের নীচেয় প্রশান্তভাবে আত্মমগ্নের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। মানুষকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার—বদ্ধমূল সংস্কার কাটাইয়া নূতন পথপ্রান্তের সন্ধান দেওয়ার কাজে চিরদিনই উহাদের সহযোগিতা গভীর।

খোকা, একটা কথা সত্যি বলবি?

কি মা?

তুই কি আমার ওপর রাগ করেছিস?

হাসিতে হাসিতে বিমল বলিল, রাগ—কোথায় দেখলে মা?

যোগমায়ার মুখের বিষাদ বিমলের হাসিতে কাটিল না। বিষণ্ণ স্বরেই তিনি বলিলেন, আজকালের কথা বলছি না। যেন অনেক দিন থেকেই তুই বদলে গেছিস। তোর মনে কি কষ্ট—আমায় বলবি নে—বাবা?

এই স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। মায়ের স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি হইতে মর্ম্মব্যথার কালো দাগটুকু দীর্ঘকাল লুকাইয়া রাখা চলে না। কিন্তু প্রকাশ করিয়াও লাভ নাই। মুখ ফিরাইয়া উচ্চ হাসির শব্দ তুলিয়া সে বলিল, তুমি পাগল মা।

মুখ ফেরালি কেন—আমার পানে চা।

বিমল চাহিল না। দ্রুতগামী গাড়ির তালে তালে মায়ের কথা যেন সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পশ্চিমের রুক্ষ প্রান্তর, চক্ষুপীড়াদায়ক কুশ্রী কুটীরশ্রেণী, মাঠের বুকে গভীর ক্ষতের মত ডোবার-সঞ্চিত সবুজ রঙের জল, শ্রেণীবদ্ধ আম ও পেয়ারা বাগান দ্রুত বেগেই চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, মা, আমরা কলকাতা হয়ে বাড়ি যাব।

যোগমায়া মাথা নাড়িলেন।

ট্রেনের গবাক্ষপথে গাছপালা—নদী-প্রান্তর—আকাশের টুকরা সবই—তীরবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে। একদৃষ্টিতে যোগমায়া ইহাদের পলায়নের শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিলেন। এই শোভাযাত্রার মধ্যে—শৈশবকালের বিমলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাওয়ার নিষ্ফলতা অনুক্ষণই তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। যোগমায়ার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

ভারতীয় শিল্পে মিথুনমূর্ত্তি

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

ভারতীয় শিল্পে, বিশেষতঃ উড়িষ্যায় (পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকে) মিথুনমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাধারণভাবে মনে হয় যে, ইহা তদানীন্তন কালের শিল্পে জাতীয় হীন মনোভাবের পরিচয়-পত্র মাত্র, কিন্তু বিশেষভাবে ভারতীয় শিল্প আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই মিথুনমূর্ত্তি কোন দেশের সাময়িক সৃষ্টি মাত্র নহে এবং এই মূর্ত্তি-চিহ্নগুলির নির্ম্মাণের পশ্চাতে গভীর তত্ত্বসমূহ বর্ত্তমান। যাঁহারা এই সকল তত্ত্বের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের কাছে এইগুলি অত্যন্ত অসুন্দর ও কুৎসিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভারতীয় শিল্পিগণ কোন কুৎসিত বা অসুন্দর মনোভাব লইয়া বা মনোভাব সৃষ্টির জন্য এইগুলি নির্ম্মাণ করেন নাই।

ভারতীয় শিল্প-ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে মুসলমান রাজাদের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত এই মিথুনমূর্ত্তি-চিহ্নটি সারা ভারতের শিল্পে বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ তৃতীয় শতকে নির্ম্মিত একটি জৈন-স্তম্ভের গাত্রে নরনারীর আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্ত্তির সন্ধান আমরা প্রথম পাই লক্ষ্ণৌ-যাদুঘরে। ইহার পর বুদ্ধগয়ায় (২য় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ), কার্লিগুহা-স্তম্ভে (১ম খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ), গান্ধারে (১ম খ্রীষ্টাব্দ), মথুরায় (২য় খ্রীষ্টাব্দ), দক্ষিণ-ভারতে, বাংলায়, অজন্তা, ইলোরা এবং আইহোলের মন্দিরগাত্রে গুপ্ত এবং প্রাক্‌গুপ্তযুগের এইরূপ স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ-মূর্ত্তির নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকি। ইহার মধ্যে উড়িষ্যার, বিশেষতঃ কোনারকের মূর্ত্তিগুলি (১২৩৮-৬৪) বিশেষ ভাব-প্রকাশক ও নিখুঁত। ভারতীয় শিল্পে মিথুনমূর্ত্তির ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে ১৯২৫ সালের 'রূপমে' লিখিত সুবিখ্যাত কলাশিল্পবিদ্ শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের "Mithunas in Indian Art" নামক প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানা ভাবে বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলী ও শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন শাস্ত্রের (পুরাণ, লোকাচার ও দর্শন) মধ্য দিয়া এই মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

পৌরাণিক :—বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি কেবলমাত্র আপনাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজের দেহ দুই ভাগে ভাগ করেন এবং ফলে প্রকৃতি ও পুরুষের সৃষ্টি হয়। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি এইজন্য বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের দেহ অর্দ্ধশস্যবীজের ন্যায় অসম্পূর্ণ। ভগবান্ প্রজাপতি অতঃপর সেই স্ত্রী-দেহের সহিত সম্ভোগকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং তাহার ফলে সৃষ্টি হয় এই বিশাল জগৎ। সেইজন্যই সৃষ্টিকার্য্যের সহায়ক চিহ্ন-স্বরূপ ভারতীয় স্থপতিগণ মন্দিরের প্রবেশ-পথের দুই ধারে এবং মন্দিরগাত্রে এই মিথুনমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেন। অগ্নিপুরাণে কথিত আছে যে, যেখানে বৃহৎ জলাশয়, ফলেফুলে সুশোভিত বনানী ও প্রমোদ-কানন বিদ্যমান, যেখানে সুন্দর সুন্দরীর সঙ্গে বিচরণ করে; ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করে, মরাল মরালীর পাছে উড়িয়া বেড়ায় সেই স্থানই মন্দির নির্ম্মাণের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। পুরী, কোনারক এবং ইলোরায় মন্দির দর্শনে উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োগ অনুভূত হয়; কিন্তু জনাকীর্ণ শহরে মন্দির নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইলে শিল্পী অপ্রাকৃত উপায়ে ঐ সমুদয় নির্ম্মাণ করিয়া আরাধ্য দেবতাকে তুষ্ট করেন। ভারতের সমস্ত দেবালয়ের আশে-পাশে বিভিন্ন আকারের জলাশয় আজিও দৃষ্ট হয়। শিল্পী মন্দিরপার্শ্বে কৃত্রিম কানন এবং জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়াই শুধু যে দেবতাকে তুষ্ট করেন তাহাই নহে, সুনিপুণ হস্তে মন্দিরগাত্রে ফল-ফুল, লতাপাতা, নানা প্রকার পশুপক্ষীর চিত্র এবং সুন্দর-সুন্দরীর নানা প্রকার সম্ভোগ-চিত্র রূপায়িত করিয়া শাস্ত্রবাক্য এবং নিয়ম অটুট রাখিয়া ইষ্টদেবকে তুষ্ট করেন।

লৌকিক-ব্যাখ্যা :—পণ্ডিতপ্রবর ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার *Orissa and Her Remains* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"In the case of a building under construction when the uprights for the scaffolding have just been set up we notice that a basket or a broomstick, an old rejected shoe and such other filthy things are tied to the end of a scaffolding pole so as to attract notice of a passer-by. They are meant to withstand the evil effects of the

jealous gaze of the observers to war of the evil spirits that may possess the building under construction, hamper its progress by causing a catastrophe to befall it. This superstition of the 12th Century furnishes the key to unravel the mystery of the indecent figures of the medieval times and this view has been corroborated by the Oriya architects and artists."

গৃহনির্ম্মাণ কালে বংশদণ্ড, সম্মার্জ্জনী, ছিন্নপাদুকা প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখার যে প্রথা অদ্যাপি দৃষ্ট হয় তদনুযায়ী মন্দিরগাত্রে এই চিহ্নগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়। উৎকল-খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়—

"বজ্রপাতাদি-ভীত্যাদি বারণার্থং যথোদিতং।
শিল্পশাস্ত্রেঽপি মন্থাদি বিন্যাসং পৌরুষাকৃতিং॥"

ভগবৎ-প্রাসাদের উপরিভাগে বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থে শিল্পী শাস্ত্রোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি মন্যাদির বিন্যাস সমাহিত হইল। এই শ্লোকটির অস্পষ্ট স্মৃতি হইতেই ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ বোধ হয় লিখিয়াছেন :—

"Such sculptures are supposed to be a protection against the evil spirits and so serve the purpose of lightning conductors."

দার্শনিক :—লৌকিক ও পৌরাণিক শাস্ত্র ব্যতীত দর্শন-শাস্ত্রের মধ্য দিয়াও একদল ইহাদের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র মতে—"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমঃ বিকারঃ।" অর্থাৎ মনে ভগবদ্ভক্তি ও ভাবের প্রথম উন্মেষ ঘটাইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার করিতে হইবে যাহাতে মানব-মন ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যকর বিষয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও নির্ব্বিকার ও নিশ্চঞ্চল থাকিতে পারে। ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের মতে,

"The test of the purity of the mind is the absence of all manner of sense quickening even in the presence of the object of senses before the senses and through them before the mind. The purity can only be attained by what is called the vicarious method of idealisation and spiritualisation."

মানব-মন যখন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার এবং নিশ্চঞ্চল, পার্থিব কোন সম্পদ, কোন লোভ ও লালসা যখন তাহার মনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও তাহাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, তখনই সেই মানব-মন ভগবদারাধনায় একমাত্র উপযুক্ত ও অধিকারী। সাধারণ মানব কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য এই ষড় রিপুর তাড়নায় যে চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত হইবে ইহা অতি সাধারণ কথা। ভগবান্ বুদ্ধকেও কঠিন ভাবে তপস্যা করিয়া তবে মার-বিজয়ী হইতে হইয়াছিল। যখন মানুষ এই ষড়রিপুজয়ী হয় তখন তাহার মন হয় স্থির, নির্ব্বিকার ও বিভেদবিহীন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"শুচি অশুচিরে লয়ে,
দিব্য খাটে যবে শুবি;
যবে দুই সতীনে পিরীত হবে
(তখন) শ্যামা মাকে দেখতে পাবি।"

শুচি অশুচির বিভেদবিহীন মনই একমাত্র তাঁহার পূজার অধিকারী; তখন তিনি পার্থিব সমস্ত জিনিসের মধ্যে তাঁহার লীলা ও তাঁহার রূপ দেখিতে পান। এই নির্ব্বিকার বিভেদ-বিহীন মনের উপর কিছুই ছায়াপাত করিতে পারে না। মন্দির-গাত্রের সম্মুখেই নরনারীর এই দৈহিক মিলনমূর্ত্তি এবং চিত্র যখন পূজারীর মনকে লেশমাত্র চঞ্চল করিতে পারে না, যখন পূজারী সম্পূর্ণরূপে রিপুগুলিকে দমন করিয়া তাঁহার করায়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন—তখনই পূজারী কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মন্দির মধ্যে পূজার্থ প্রবেশের অধিকারী। বিশ্বকবির ভাষায়—"তিনি জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, মিলন বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁর চিরন্তন মন্দির।" সমস্ত পার্থিব লীলার মধ্যে সেই লীলাময় বিরাজমান, আবার তাঁহার মধ্যেই সব লীলা বর্ত্তমান—এই সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া পূজারী যখন কোন বস্তুর মধ্যে সেই লীলা-ময়ের লীলা ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পান না, যখন তিনি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ডাকে আর সাড়া দিবেন না তখনই তিনি তাঁহার ইষ্টদেবকে আরাধনার উপযুক্ত পাত্র।

প্রথম এই মিথুনমূর্ত্তির প্রয়োগ আমরা জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরের গাত্রে ও প্রবেশ-পথের সম্মুখে দেখিতে পাই। ইহাদের নিকট হইতে হিন্দুগণ এই চিহ্নটি গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার নানারূপ স্বাধীন ব্যাখ্যা সৃষ্টি করিতে থাকেন। উত্তরকালে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই মূর্ত্তিটির ব্যাপক প্রকাশ হয় এবং কোন কোন স্থলে ইহা স্বাধীন দেবতার স্থান লাভ করে।

উড়ন্ত বোমা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে মলোটভ ব্রেড-বাস্কেট, রেডিও চালিত ট্যাঙ্ক, ম্যাগ্নেটিক মাইন, ক্র্যাসিং-ওনিয়ন প্রভৃতি কতকগুলি ভীষণ প্রকৃতির মারণাস্ত্র এবং শত্রু-সন্ধানী যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগের কথা শুনা গিয়াছে। সম্প্রতি মিত্রশক্তি ফরাসী উপকূলে অবতরণ করিবার পর ১৬ই জুন, শুক্রবার হইতে ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনব এক মারণাস্ত্রের উৎপাত সুরু হইয়াছে। এই মারণাস্ত্র



রেডিও-চালিত চালকবিহীন বোমারু বিমান

সাধারণতঃ ফ্লাইং বম্ বা উড়ন্ত বোমা নামে পরিচিত। ইহা দেখিতে ঠিক ছোট একখানি এরোপ্লেনের মত; কিন্তু ইহাতে কোন চালক থাকে না। জার্ম্মানরা সাধারণতঃ অধিকৃত ফ্রান্সের ক্যালে, বোলন প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে ইংলণ্ডের দিকে এগুলি ছাড়িয়া দেয়। এই রবট-প্লেন প্রায় ২৫০০ ফুট উপর দিয়া ঘণ্টায় ৩০০ হইতে ৩২০ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে। একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে উপনীত হইবার পর ইহার দম ফুরাইয়া যায় এবং নীচের দিকে মুখ করিয়া কিঞ্চিৎ ঢালু ভাবে ভূমিতে অবতরণ করে। চলিবার সময় ইহা হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হয় এবং ভীষণ শব্দ হইতে থাকে। শব্দ বন্ধ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ ঘটে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। কাজেই রবট আসিবার পর তাড়াতাড়ি আশ্রয় গ্রহণ করিবার সময় পাওয়া কঠিন। রাত্রিবেলায় রবট-প্লেনের গতিবিধি সহজে ধরা পড়ে, কারণ ইহার লেজের দিকে একটা হলদে রঙের আলোকচ্ছটা দেখিতে পাওয়া যায়। সার্চ্চ লাইট ফেলিলে ধোঁয়ার রেখার উপর আলো প্রতিফলিত হইবার ফলে ইহার গতিবিধি বুঝিতে অসুবিধা হয় না। ইংলণ্ডের সমর-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, যখন চালকহীন উড়ো-জাহাজের শব্দ বন্ধ হইবে এবং আলো নিবিয়া যাইবে তখনই বুঝিতে হইবে, বিস্ফোরণ ঘটিতে আর বিলম্ব নাই—পাঁচ হইতে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে উড়ন্ত বোমার আবির্ভাবের পর অনেকেই ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল এবং পরিচালন-প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। কেহ বলেন, বোমা-নিক্ষেপকারী চালকবিহীন প্লেন রেডিও-তরঙ্গ সাহায্যে পরিচালিত হয়। কাহারও মতে—ইহার সহিত রেডিওর কোন সম্পর্ক নাই। ইহা রবট-প্লেন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসাহায্যে হাউই-এর মত নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে প্রেরিত হয়। মোটের উপর এই চালকবিহীন বোমারু সম্বন্ধে এখনও কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। সম্প্রতি সরকারী ভাবে এই চালকবিহীন বিমানের একটি খসড়া নক্সা প্রকাশিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিবরণ হইতে রবট-প্লেনের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিলেও ইহার যান্ত্রিক কৌশল এবং পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝিবার উপায় নাই। প্রকাশিত নক্সা হইতে দেখা যায়—ইহা সাধারণ একটি মনোপ্লেনের মত; কিন্তু সম্মুখভাগে কোন "প্রোপেলার" বা বৈদ্যুতিক পাখার মত কোন 'ব্লেডে'র অস্তিত্ব নাই। উড়িবার জন্য কেবল ডানা ও লেজ রহিয়াছে। পিছনের দিকে কামানের নলের মত একটা সরুমুখ নল শয়ান ভাবে স্থাপিত। প্লেনটির মধ্যস্থলে অতি উচ্চ চাপের বায়ু ধরিয়া রাখিবার জন্য কতকগুলি পাত্রের ব্যবস্থা আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে পেট্রোল রাখিবার স্থান প্রায় লেজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্লেনটির গতি অথবা দিক নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য লেজের দিকে অভ্যন্তরভাগে রবট বা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা হইতে বুঝিতে পারা যায়—পেট্রোল এবং উচ্চ চাপের বাতাস একত্র মিশ্রিত হইয়া উক্ত শয়ান নলের মধ্যে উপস্থিত হয়। সেখানে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এই উগ্র বিস্ফোরক দাহ্য পদার্থে অগ্নি-সংযোগের ফলে নলের সরু মুখ দিয়া পিছনের দিকে অতি প্রচণ্ড বেগে গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। এই গ্যাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় প্লেনটি ভীম-বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। সাধারণ হাউই-বাজীর কথা মনে করিলেই ব্যাপারটি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। প্লেনটিকে এমন ভাবে ছোড়া হয়—যাহাতে একবারেই উড়িয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পড়িতে পারে। যাত্রাপথে রবট বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-সাহায্যে

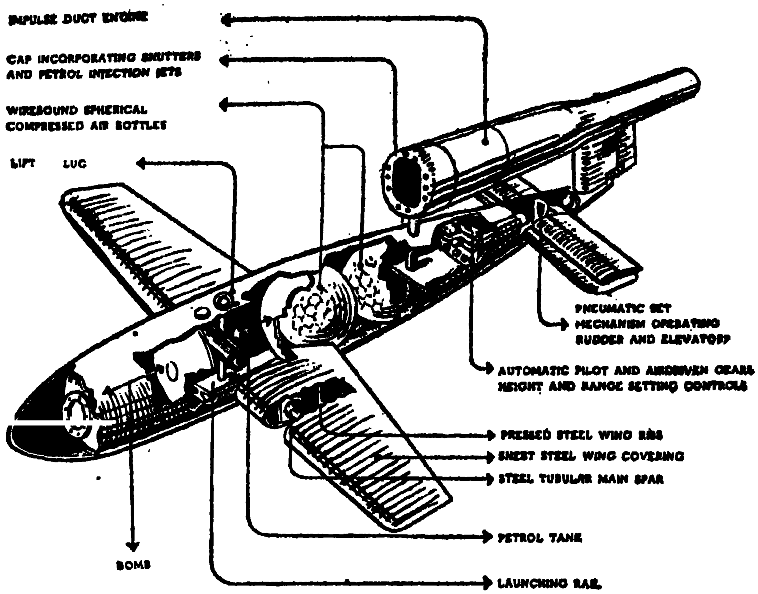


রেডিও-চালিত উড়ন্ত বোমা একখানি জাহাজের গায়ে আঘাত করিয়াছে

নির্দ্দিষ্ট দিক রক্ষা করিয়া চলে। নির্দ্দিষ্ট দিক ঠিক রাখিয়া চলিবার জন্য টর্পেডোর মধ্যে যেমন জাইরোস্কোপের ব্যবস্থা থাকে ইহাতেও সেরূপ কোন ব্যবস্থা থাকিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছিবার মত প্রয়োজনীয় জ্বালানি পদার্থের বেশী কিছু উহাতে দেওয়া হয় না; অথবা এমনও হইতে পারে যে, নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর একটা 'টাইম-সুইচ্' আপনা আপনি এঞ্জিনের সহিত যন্ত্রের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটি ভূমির দিকে মুখ করিয়া প্রায় খাড়া ভাবে মাটিতে নামিতে থাকে অথবা গ্লাইডারের মত ক্রমশঃ ঢালু ভাবে ঘুরে গিয়া অবতরণ করে। ভূমি হইতে উপরের দিকে ঢালু ভাবে স্থাপিত রেল হইতে রবট-প্লেনটিকে কোন বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে হাউই-এর মত ছুড়িয়া দেওয়া হয়।

ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ক্যালে, বোলনের বিভিন্ন ঘাঁটি হইতেই এইগুলি বেশী পরিমাণে ছোড়া হইতেছে। বিগত নয় মাস ধরিয়া ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বোমারুগুলি এই সকল ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে। ইহার ফলে কতকগুলি ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও আরও কতকগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে। এখনও এগুলি নষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

"নিউজ ক্রনিকল" পত্রিকার সংবাদদাতা রোনাল্ড ওয়াকার, জার্ম্মানীর এই গোপন অস্ত্রের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এ সকল প্লেনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেছে—প্রকাণ্ড একটি বোমা। এই বোমাটিকে ঘিরিয়া বেশীর ভাগ কাঠ এবং কিছু ইস্পাতের সাহায্যে সাধারণ এরোপ্লেনের মত একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাতে এমন একটি সস্তা দরের এঞ্জিন বসান থাকে যাহা কেবল মাত্র একবারের জন্ত প্লেনটিকে শতাধিক মাইল চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে।



সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে উড়ন্ত বোমার উৎপাত সুরু হইয়াছে তাহার নক্সা

যত দূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়—বিস্ফোরণের পর ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ভীষণ বেগে গ্যাস নিক্রান্ত হইবার সময় যে ধাক্কা লাগে তাহারই প্রতিক্রিয়ায় প্লেনখানি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। কাজেই ইহাতে প্রোপেলারের কোন প্রয়োজন নাই। এই ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল এঞ্জিনকে 'জেট-প্রোপেলড' বা 'রকেট' এঞ্জিন বলা হয়। ইহাদের কার্য্য পন্থা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। সংবাদদাতার মতে এই মারাত্মক অস্ত্র নাৎসীদের নূতন আবিষ্কার নহে। কারণ যুদ্ধের পূর্ব্বেই বিমান-বিধ্বংসী কামানের সাহায্যে অব্যর্থ লক্ষ্য-ভেদ অভ্যাস করিবার জন্ত ইংরেজরা "কুইন বী" নামে বেতার চালিত এক প্রকার উড়ো-জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছিল। জার্ম্মানরাও কয়েক বছর পূর্ব্ব হইতে বল্টিক সমুদ্রতীরে পিনেমুণ্ডিতে চালকবিহীন প্লেন নির্ম্মাণ করিবার জন্ত পরীক্ষা চালাইতেছিল। এই সকল স্থান ধ্বংস করিবার জন্ত 'রয়েল এয়ার ফোর্স' গত আগষ্ট মাসে ভীষণ ভাবে বোমা বর্ষণ করে।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডাঃ চার্লস কেটারিং ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার হাওয়াই-বোমা আবিষ্কার করেন; সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে নাৎসীদের এই মারণাস্ত্র নূতন কিছু আবিষ্কার নহে। পূর্ব্বেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের একটি আবিষ্কার হইয়াছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পরে তাহা বাতিল করিয়া দেয়। ১৯১৯ সালের ২৫শে আগষ্ট ডাঃ কেটারিং স্বয়ংক্রিয় বিমান-টর্পেডো পেটেণ্ট করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন, ইহাও বিস্ফোরক পদার্থ-পরিপূর্ণ উড়ো-জাহাজের মত। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে মিঃ লরেন্স বাটস্পেরী অনুরূপ একটি মারণাস্ত্রের নক্সা প্রস্তুত করেন। নাৎসীদের উড়ন্ত বোমা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ রকমের এক প্রকার অস্ত্র।

যাহা হউক, ইতিমধ্যে বর্ত্তমান জুন মাসের আমেরিকার একখানি বৈজ্ঞানিক কাগজে জার্ম্মানীর উড়ন্ত বোমা সম্বন্ধে যে খবর বাহির হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। বিবরণটি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত। তিনি যে জাহাজে আসিতেছিলেন সে জাহাজখানি এই প্রকার একটি উড়ন্ত বোমা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। এই বিবরণে দেখা যায়—বিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ এই মারণাস্ত্রের সম্মুখের দিকটার আকৃতি সাধারণ একটি জার্ম্মান বোমার মত। পিছনের দিকে দিক এবং গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের স্বয়ংক্রিয় কৌশল এবং বেতার-তরঙ্গ সংগ্রাহক যন্ত্র স্থাপিত। বাতাসে উড়িবার জন্ত যন্ত্রটিতে সাধারণ এরোপ্লেনের মত ডানা ও লেজের পাখনা থাকিলেও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত 'প্রোপেলারে'র ব্যবস্থা নাই। লেজের দিকের সরু নলের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে নিক্রান্ত গ্যাসের ধাক্কায় যন্ত্রটি হাউইএর মত প্রচণ্ড বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। বোমাটির চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠনির্ম্মিত সাধারণ কাঠামোর সাহায্যে ডানা, লেজ ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় অংশ নির্ম্মিত। যে 'রকেট' অথবা হাউইয়ের মত পদার্থের সাহায্যে ইহা সম্মুখের দিকে পরিচালিত হয় তাহা থাকে বোমাটির নীচের দিকে একটা আলাদা খোলের মধ্যে। এই উড়ন্ত-বোমাটিকে দূরে অবস্থিত অপর একটি এরোপ্লেন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চলিবার সময় যন্ত্রটার লেজের দিক হইতে ধূমকেতুর পুচ্ছের মত উজ্জল



আধুনিকতম 'রকেট' বা 'থার্ম্মেল জেট-প্লেন'। ঘণ্টায় ইহা ৫০০ মাইলেরও বেশী চলিতে পারে।

আলো নির্গত হইতে থাকে। ঐ আলো দেখিয়া বেতার-তরঙ্গ যোগে দূরস্থিত এরোপ্লেন হইতে ইহাকে লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করা হয়।

প্রোপেলার-বিহীন এই ধরণের উড়ো-জাহাজকে সাধারণতঃ জেট-প্লেন (Jet plane) বলা হয়। মোটের উপর এগুলি গ্যাস, উত্তপ্ত বায়ু বা বাষ্পের ধাক্কায় চালিত সাধারণ প্রতিক্রিয়া-শীল এঞ্জিন ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি একটা খেলনা বেলুন ফুলাইবার পর মুখ বন্ধ না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কিরূপ অবস্থা ঘটে? সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—নলের মত সরু মুখ দিয়া জোরে বাতাস বাহির হইয়া যাইবার ফলে বেলুনটা যেন দিশাহারা হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে। বাতাসের ধাক্কাতেই বেলুনটার এরূপ অবস্থা ঘটে। ইহাই 'জেট-প্রোপেল্‌ড' বা প্রতিক্রিয়াশীল এঞ্জিনের কার্য্যকারিতার মূল রহস্য। খেলনা-জাহাজ সকলেই দেখিয়াছেন। খেলনা-জাহাজের পিছনে দুইটি সরু-মুখ-নলের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে বাষ্প নির্গত হওয়ার ফলে বেশ জোরে ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কায় জাহাজটি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। জেট-প্লেনগুলিও এই ভাবেই চলে। সহজ দাহ্য বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে ইহাতে এত জোরে ধাক্কা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে যে, প্লেনটি খুব উঁচুতে উঠিয়া ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করিতে পারে।

সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে প্রোপেলার-বিহীন ফাইটার প্লেন নির্ম্মিত হইতেছে সেগুলি সাধারণতঃ Thermal Jet System-এ পরিচালিত হইয়া থাকে। দুই রকমের ব্যবস্থায় এই Jet Systemকে কার্য্যকরী করা হইয়াছে। রকেট বা হাউই-এর মত এক প্রকারের ব্যবস্থায় সুদৃঢ় সিলিণ্ডারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিস্ফোরক জ্বালানী পদার্থ সঞ্চিত রাখা হয়; তাহাই যান্ত্রিক কৌশলে ক্রমশঃ বিস্ফোরিত হইতে হইতে উড়ন-যন্ত্রটিকে হাউইয়ের মত সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া যায়। কিন্তু Thermal Jet System-এ উড়ন-যন্ত্রটি চলিবার সময় স্বয়ংক্রিয় পাম্পের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতে বাতাস টানিয়া লইয়া একটি আবদ্ধ পাত্রে প্রেরিত হয়। এই উচ্চ চাপের বাতাস যান্ত্রিক কৌশলে সেখান হইতে দহন-প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া গ্যাসোলিনের সহিত মিশ্রিত হইবার পর উগ্রদাহ্য পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলে এই দাহ্য পদার্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাহায্যে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রবল চাপ উৎপন্ন করে এবং তদুৎপন্ন গ্যাস লেজের দিকে অবস্থিত সরু নলের মুখ দিয়া ভীষণ বেগে নির্গত হয়। ইহার ধাক্কায় প্লেনটি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই গ্যাস বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে একটি টারবাইন যন্ত্রকে ঘুরাইয়া বাতাসকে আবদ্ধ পাত্রে সঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। লেজের দিকে গ্যাস বাহির হইয়া যাইবার নলের মুখটিকে যে-কোন দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বেতার-তরঙ্গ যোগে 'রিলে'র সাহায্যে এই নলের মুখ ঘুরাইয়া চালকহীন প্লেনটিকে ইচ্ছামত যে-কোন দিকে পরিচালন করা কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নহে।

প্রতীক্ষা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিগন্তের তীর হইতে বিনির্ম্মল ভোরের রৌদ্র যখন শালবনের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া সম্মুখের মাঠের মধ্যে লুটাইয়া পড়ে, তখন তাহাদেরই জানালার পাশ দিয়া একটি ট্রেন ছুটিয়া চলিয়া যায়। কারখানার ভোঁ বাজিয়া গিয়াছে, স্বামী এইমাত্র কাজে গিয়াছেন, ঠিকা ঝি কলতলায় বাসন মাজিতে বসিয়াছে, উনুনে ভাত চাপাইয়া স্নান সারিয়া ইন্দিরা সবে মাত্র সিঁদুরের টিপ কপালে ছোঁয়াইয়াছে, এমন সময় ঝিকি ঝিকি করিতে করিতে বহুদূর হইতে ট্রেনখানা আসে, কোয়ার্টারগুলিকে পাশ কাটাইয়া অনতিদূরের ষ্টেশনে গিয়া একটু থামে, তার পরেই আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। সব কাজ নিমেষের মধ্যে ভুলিয়া গিয়া ইন্দিরা জানালায় দাঁড়ায়। দূরে, পাহাড়ের কোণ হইতে সূর্য উঠিয়া রেল-লাইনের উপর অপূর্ব মমতায় ঝলমল করিয়া উঠে—পিছনে যতক্ষণ না ঝি ডাক দেয়, ততক্ষণ জানালার শিক ধরিয়া সেই দিকে তাকাইয়া ইন্দিরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

গুনিতে গেলে দিনগুলি কম নয়, সুদীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া এম্‌নি করিয়াই ইন্দিরা জানালায় দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটি প্রভাত অতিবাহিত করিয়াছে। ভাবিতে গিয়া অবাক্ হইতে হয়, এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে আটটা বৎসর কেমন করিয়া কাটাইয়া আসিল সে! সেই রোজ ভোর রাত্রে উঠিয়া রান্না চাপানো, সেই কারখানার ভোঁ, সেই দুই প্রকোষ্ঠের ঘন ঘন ক্ষুদ্র কোয়ার্টার, সেই

চিরন্তন মাত্র দুইটি প্রাণী তাহারা, কোনো অসুখও নাই, বিসুখও নাই—সেই একই কারখানার গল্প দুই জনের মধ্যে, ইহার ভিতরে কেমন করিয়া তাহাদের দিনগুলি পার হইতেছে !

মধ্যে মধ্যে ইন্দিরার তাই কিছুই ভাল লাগে না। সাজগোজ, বেড়ানো, না, কিছুই না। ডান পাশে থাকে এক পাঞ্জাবী পরিবার, তাহাদের সঙ্গে ত তার আলাপ জমেই না, উপরন্তু বাঁ পাশে যে বাঙালী পরিবারটি আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গেও না। গিন্নীটি ত অদ্ভুত মানুষ—কারো সহিত আলাপ করে না, ঘরে এক পাল ছেলেমেয়ে, রাতদিন কান্নাকাটি, মারধোর লাগিয়াই আছে। ছেলেপিলে ইন্দিরার ভালই লাগে—নিজের হয় নাই বলিয়া অপরের ছেলেমেয়ে ভাল লাগিবে না, এমন কোন কথাও নাই—কিন্তু ওদের ছেলেপিলেকে যদি কোনও দিন কাছে ডাকিয়াছে ত তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ছেলেমেয়েদের উপর গিন্নীর কি শাসন! লজ্জায়, বিস্ময়ে ইন্দিরা কাঠ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ভাল লাগে না ইন্দিরার। ইচ্ছা হয়, সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া অনেক দূরে কোথাও নির্জনে চলিয়া যাইতে! মনে পড়ে, সেই তাহাদের গ্রাম। ঝিকি ঝিকি করিতে করিতে ট্রেন 'শালবনি' ষ্টেশনে গিয়া থামে, এখান হইতে কোন্ দিকে—কত দূরে তাহাও সে সঠিক জানে না—'শালবনি' হইতে গরুর গাড়ীতে কয় ক্রোশ গেলেই তাহাদের গ্রাম, "বউটি"। বিস্তৃত মাঠের পারে একটা বড় টিলার উপরে বটগাছ-ঘেরা তাহাদের গ্রাম এক লজ্জাশীলা বউয়ের মতই দেখায় দূর হইতে।—অদ্ভুত—অবর্ণনীয় তাহার সৌন্দর্য !

চাপিতে পারা যায় না, একটা নিঃশ্বাস আপনিই বাহির হইয়া পড়ে—জানালা ছাড়িয়া ইন্দিরা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘরের সামনে ছোট্ট দালান; দালানের সংলগ্নই রান্নাঘর। দালান পার হইতে গিয়াই অতর্কিত বিস্ময়ে ইন্দিরা দাঁড়াইয়া পড়ে। ব্যাপারটা তাহার কাছে একটা বিস্ময়ই বই কি! সেই যে কারখানায় ঢুকিয়াছে, একটি দিনের জন্তও বিশ্রাম যাহার মেলে নাই—সেই একঘেয়ে সময়-বাঁধা যাওয়া আর আসা—কাজ আর কাজ ছাড়া যাহাকে সে এক দিনও দেখিতে পায় নাই—নিতান্ত অসময়ে তাহাকে পাওয়া—একটা দুর্বিবহ বিস্ময় ছাড়া কি-ই বা হইতে পারে! দরজা ঠেলিয়া ধীর পদক্ষেপে অনাদি ঘরের দিকেই আসিতেছে—চোখের দৃষ্টি আর দেহের ভঙ্গী, সব মিলিয়া কেমন অদ্ভুত ক্লান্ত দেখাইতেছে তাহাকে।

"এ কি, কি হয়েছে! এমন অসময়ে ফিরে এলে যে?"

স্ত্রীর দিকে শ্রান্ত চোখ দুটি ক্ষণকালের জন্ত রাখিয়া মুখে একটা ম্লান হাসি টানিয়া আনিল অনাদি, বলিল, "একটু-আধটু জ্বর হয়েছে বোধ হয়, ডাক্তার শুনলে না, দিলে 'সিক্' ক'রে।"

স্বামীর কাছে চকিতে সরিয়া আসিল ইন্দিরা, গায়ে হাত রাখিয়া চমকিয়া উঠিল, কহিল,—"একটু নয়, এ যে বেশ জ্বর! নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে শীগ্‌গির শুয়ে পড়, আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।"

কেবল অকুণ্ঠিত স্বামী-সেবার জন্য নহে, দৈনন্দিন জীবনে কিছু বৈচিত্র্য আনিবার জন্যও ইন্দিরা ধোপাদস্ত ধব্‌ধবে বিছানার চাদর আর বালিসের ওয়াড় বাহির করিয়া আনিয়া অতি যত্নে বিছানা করিতে বসিল। হাসিল অনাদি, কহিল, "ঘটা ক'রে অত বিছানা বদলাচ্ছ যে? নতুন ক'রে ফুলশয্যা করবে নাকি, বল ত ফুল এনে দি!"

"না গো, অমন ঠাট্টা কোরো না। আমার বড় ভয় করছে, তোমার ত হঠাৎ এমন অসুখ-বিসুখ হয় না!"

"আরে, সে-ই ত হয়েছে যত গণ্ডগোল! নয়ত কুলি মজুর-দের এই একশ' টেম্পারেচার,—একে আবার আমল দেয় কে? ফোরম্যান-ব্যাটা ত নজরই করলে না—শেষকালে সাহেব নিজে এসে ধরে ফেললে। হাজার হোক্ খাঁটি সাহেব, ও-ত আর 'ট্যাস্' নয়! এসেই বললে 'ঘোষ, তোমায় আজ বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে যে, তুমি কি অসুস্থ?' বললাম, "হ্যাঁ সাহেব, মাথাটা কামড়াচ্ছে বড্ড, সামান্য একটু জ্বর হয়েছে হয়ত!" সাহেব অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল, বললে, 'তোমার ত হঠাৎ এরকম অসুখ করে না।' ওদিকে ফোরম্যান্‌টার মাথায় যেন বাজ পড়েছে, ব্যাটা যেন তাই হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে বললে, 'ও কিছু নয়, ফ্যানের নীচে বসলে এখ্‌খুনি সেরে যাবে।' আরে সাহেব কি একেবারে অতই বোকা? শত হলেও একটা ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট—হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, সে কি আর ওর ঐ ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করবে, দিলে সে অমনি আমায় পাঠিয়ে ডাক্তারের কাছে, ডাক্তার দিলে 'সিক' ক'রে। এইবার ঠ্যালা বুঝুক গিয়ে ঐ ব্যাটা ট্যাস্-ফোরম্যান্‌টা। আমি বাড়ী চলে এসেছি, এইবার চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম ক'রে বসে কেমন ও-ব্যাটা সিগারেট ফোঁকে দেখা যাবে!"—বলিয়া আপনার কৌতুকে আপনিই হাসিয়া উঠিল অনাদি।

বিছানা ততক্ষণে পরিপাটীরূপে সাজানো হইয়া গিয়াছে ইন্দিরার। খাট হইতে নামিয়া স্বামীর কাছে দাঁড়াইল, বলিল, "পোযাকটা বদলে নিয়ে আগে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়, তার পরে গল্প হবে'খন।" বলিয়া আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল রান্নাঘরে। খানিকক্ষণ পরে যখন ঘরে চলিয়া আসিল, দেখিল, পোষাক বদলাইয়া বিছানায় শান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়া অনাদি বিড়ির পর বিড়ি টানিয়া চলিয়াছে। "নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না, আবার ঐ ছাইগুলো টানছ অত করে?" ঠিক কৌতুকও নয়, আবার ভয়ও নয়, কণ্ঠে এক অদ্ভুত অনুনয়ের স্বর আনিয়া অনাদি বলিয়া উঠিল, "দোহাই তোমার, সব গিয়ে শেষ-কালে এই সামান্য বিড়িতে এসে ঠেকেছি, এর ওপর আর কৃপা-দৃষ্টি কোরো না, তোমার কথায় একে একে সবই ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছি।"

"ইস্, ছেড়েছ না আরও কিছু! পরশুদিন রাত্তিরেও তোমার মুখে আমি গন্ধ পেয়েছিলাম।" নিরুপায়ের মত হাসিয়া ফেলিল অনাদি, বলিল, "তোমার কাছ থেকে যে কিছুই লুকোনো যায় না দেখছি! সে-দিন কিন্তু আমার দোষ ছিল না; ঐ হতচ্ছাড়া মহেন্দ্রটা, মহেনকে চেনো ত? ঐ যে পাৎলা ঢ্যাঙাপানা কালো লোকটি, কেমন কেমন ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে, সামনের দুটো দাঁত

নেই—আরে, আগে আগে আমাদের বাড়ীতেও আসত যে গো!—ঐ মহেনটাই সে-দিন টান্‌তে টান্‌তে মিয়ে গেল ঐ ষ্টেসন ছাড়িয়ে লাইনের ওপার—একটা টিন-ঘেরা নতুন দোকান করেছে নাকি—সেইখানে। তা বেশী কিছু নয়, সামান্য···।—বাধা দিয়া ইন্দিরা বলিয়া ওঠে, "থাক, ও সব বাজে কথা ত শুনতে চাই নি। কথা হচ্ছে, এই যে জ্বর গায়ে হাসপাতাল ঘুরে এলে, ওষুধ কই? ডাক্তার কি ওষুধ দেয় নি?"

"আরে রেখে দাও তোমার ওষুধ। ভারি তো এক ফোঁটা জ্বর, তার আবার ওষুধ! ডাক্তার লিখে দিয়েছিল,—ও আর আমি আনি নি।"

"তাহলে···"

"তাহলে—কি? আরে, আমার জ্বর হয়েছে বলে তোমার ভাবনা হচ্ছে নাকি? হায় রে কপাল, কুলি-মজুরদের এই সামান্য জ্বর, এর জন্ত আবার এত ভাবনা, এর জন্ত আবার এত মন খারাপ! নাও, বিছানায় ওপর উঠে এসো, ভালো ক'রে বসো দেখি আমার কাছটাতে। ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও, বল, একটা গল্প বল।"

—বলিবার মত এক সাংসারিক দু-একটা কথা অথবা প্রতি-বাসীদের এর-ওর-তার দু-একটা মুখরোচক নিন্দা অথবা কার-খানারই শোনা কোন আত্মকলহের পল্লবিত কাহিনী ভিন্ন ইন্দিরা আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া থাকে; এবং খুঁজিয়া যে আর কিছু পাওয়া যাইবেও না, ইহা জানিয়াই হয়ত অনাদি গল্প শুনিবার আর আগ্রহ প্রকাশ করে না,—বহুকালের পুরনো যে ক্যালেণ্ডারখানার শেষ পাতাটি আর ছেঁড়া হয় নাই, নিতান্ত মলিন্ হইয়া দেওয়ালে এখনও ঝুলিয়া আছে—তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় দিনের দিন অনাদির জ্বর ছাড়িয়া গেল। সাত দিনের দিন কারখানার বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু কাজে গেল না। উনুনে চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া ইন্দিরা রান্না-ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অনাদি আবার শুইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে।

"এ কি,—শুয়ে পড়ছ যে, কাজে যাবে না?"

"নাঃ, আর ভাল লাগছে না।"

"জ্বর-টর আসছে না ত?"

"না।"

আর কথা অগ্রসর হইল না; ইন্দিরা জানালায় গিয়া দাঁড়াইল; ভোরের ট্রেনখানা আসিতেছে বুঝি।

"ইন্দিরা!"

ট্রেনখানি ততক্ষণে সামনে আসিয়া পড়িয়াছে; মুখ না ফিরাইয়াই ইন্দিরা বলিল, "কি বলছ?"

বিছানা ছাড়িয়া অনাদি স্ত্রীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, ট্রেন ততক্ষণে ষ্টেসনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে একখানা হাত রাখিল সম্মোহিতা ইন্দিরার কাঁধের উপর, বলিল, "এখানে আর ভাল লাগছে না, ইন্দিরা চল, কোথাও চলে যাই আমরা।"

আনন্দ কি বেদনা, সুখ কি দুঃখ ইন্দিরা কিছুই বুঝিতে পারিল না—তাহার সমগ্র স্নায়ু-তন্ত্রীর উপর দিয়া একটা অপূর্ব্ব তরঙ্গ খেলিয়া গেল যেন! কহিল, 'যাবে?"

সমস্তই আজ ভুলিয়া গিয়াছে তাহারা, ঘর-সংসার—সব কিছু। জানালাগুলি খোলা, পূবের রৌদ্র সদ্য ঘুমভাঙা দুরন্ত শিশুর মত ভিতরে আসিয়া খেলা জুড়িয়া দিয়াছে।

একটা অনির্বচনীয় স্বপ্নের জড়িমা মাখিয়া অনাদির কণ্ঠস্বর ইন্দিরার কাছে ভাসিয়া আসে—"কোথায় যাব, জান? এই রেলের লাইন যেখানে 'শালবনি' ষ্টেসনকে ছুঁয়ে বেঁকে চলে গেছে তারই পাশ দিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে গিয়ে টিলাটির উপর ছবির মত যে গ্রামখানি, সেইখানে।"

"বউটি!"

"হাঁ—গো—হাঁ, বউটি! এত ভাল লাগে আমার ও-জায়-গাটা। ওখানে থাকতে পেলে আমি আর কিছুই চাই না। এক-এক সময় মনে হয়, দিই এ সব ছেড়ে-ছুড়ে, চলে যাই ওখানে, ঐ চুপচাপ নিরিবিলির মধ্যে! আচ্ছা, সত্যি করে বল ত ইন্দু, তোমার কি ওখানে যেতে মোটেই ইচ্ছা করছে না? তোমার ত নিজের বাপের বাড়ী, একেবারে নিজের গ্রাম, তোমারও কি ভাল লাগে না ওকে?"

ইন্দিরা তবু চুপ করিয়া থাকে, উত্তর দিতে পারে না—মনের কামনা নিতান্ত যাযাবর পাখীর মত আকাশে সাঁতার দিয়া যাইতে থাকে!

ঘন বাবলা-বনের ছায়ায় পানা পুকুরটি যখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, কলমী-দামের ফাঁকে জলের উপর কাগজের নৌকা ভাসাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে কিশোরী ইন্দিরার সে-দিন দেরি হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে সে পায়ে-চলা ক্ষুদ্র পথটি ধরিতে যাইবে—এমন সময় দেখা হইয়া গেল সেই নবাগত অচেনা ছেলেটির সঙ্গে, কোন্ এক কারখানায় চাকরি পাইয়া দিন কয়েকের জন্য মাত্র সে নাকি তার মামার বাড়ীতে আসিয়াছে বেড়াইতে।

"তোমার নাম কি খুকী?"

"পথ ছাড়ুন, আমি যাব।"

"আহা, আগে বলই না নামটা।"

"বলব না। ছেড়ে দিন।"

"ছাড়ব না।"

রাগে দুঃখে লজ্জায় শঙ্কায় ইন্দিরার সে-দিন চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল যেন, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল "না ছেড়ে দিলে আমি এখখুনি চীৎকার করে উঠব কিন্তু।"

উত্তরে ছেলেটি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। সারা প্রাণটাকে বিহ্বল করিয়া দিয়া সেই হাসি যেন এখনো ভাসিয়া আসিতেছে ইন্দিরার কানে।

অনাদি বলে, "কি ভাবছ?"

"ভাবছি, ভাবছি সেই অনেক দিনের পুরোনো একটা কথা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অনাদি হাসিয়া ফেলে, বলে "ও, সেই পানাপুকুরের কাছ থেকে তোমায় যে ডাকাতি করে নিয়ে এসেছিলাম, সেই কথা ভাবছ? বাবাঃ

আমাকে দেখে কি ভয় মেয়ের! তারপরে, সেই পানাপুকুরেরই পাশের বাড়ীতে যখন শুভদৃষ্টির সময় মুখ টিপে টিপে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি হচ্ছিল, তখন ও ভয়টা কোথায় ছিল শুনি?"

"যাও!"

অনাদি হাসিয়া উঠে। পাশের বাড়ীর ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করিয়া কয়টা যেন বাজিয়া যায়, কাণ পাতিয়া তাহারই ধ্বনি খানিকক্ষণ শোনে অনাদি, তারপরে আবার বলে, "সেই মামার বাড়ী এখন একেবারে খালি পড়ে আছে। যাবে ইন্দিরা, চল অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও বেড়িয়ে আসি, মাসখানেকের না হোক অন্ততঃ পনেরো দিনের ছুটি আমি ঠিক নেবই। আজ চারটের পরই যাব সেই ট্যাস্ ফোরম্যান্টার কাছে, এত দিন কাজ করছি একটি দিনও ছুটি নিই নি, কিন্তু আজ ছুটি চাই, মন যখন করেছি। তুমি সব গুছিয়ে তৈরি হ'য়ে নাও, যেমন ক'রে হোক্ আমরা যাবই।"

সূর্য তখন ঘুরিয়া আসিয়াছে পশ্চিমে। কিছুক্ষণ হইল, ফর্সা জামা পরিয়া, ছড়ি হাতে অনাদি বাহির হইয়া গিয়াছে। সংসারের প্রত্যেকটি তুচ্ছ জিনিসপত্রের স্পর্শে বীণার মত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে ইন্দিরা! একটির পর একটি জিনিস গুছাইয়া তুলিতেছে, আর সমগ্র স্নায়ু-তন্ত্রীর উপর দিয়া একটির পর একটি অনির্বচনীয় সুখানুভূতি আসিয়া বারে বারে সঙ্গীত তুলিয়া যাইতেছে! এই দারিদ্র্য, এই নিষ্পেষণ, এই বন্ধন, এই কারাগার এই অন্ধকার হইতে অনেক দূরে গিয়া তাহাদের বিনির্মুক্ত স্বপ্ন যেন অপূর্ব স্বর্ণ-বিভায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে!

সন্ধ্যা ঘন হইবার কিছু পূর্বেই অনাদি ফিরিয়া আসিল। আসিয়া হাতের ছড়ি ফেলিয়া দিল দূরে, গায়ের ফর্সা জামাখানি নিতান্ত অনাদরে খুলিয়া রাখিল, তারপরে চাহিল স্ত্রীর দিকে। ভারি সুন্দর একখানা শাড়ী পরিয়াছে সে, কপালে সিঁদুরের টিপ, পায়ে আলতা, সর্ব অবয়বে এক অনাবিল স্নিগ্ধতা। ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপরে কহিল, "হ'ল না ইন্দু, ট্যাস্ ব্যাটা কিছুতেই ছুটি দিলে না। ভাল কথায় চাইলাম ছুটি, ব্যাটা যেন খেঁকী কুকুরের মত তেড়ে এল। শুধু কি তাই, সে কি যাচ্ছে-তাই গালাগাল! বলে কিনা সাহেবের কাছে আমরা সব ওর নামে লাগাই, ওর মন্দ করবার চেষ্টাতেই নাকি আমরা আছি।"

মেঝেতে বাঁধা অবস্থায় যে বিছানাটা পড়িয়া আছে, তাহার উপর বসিয়া পড়িল ইন্দিরা। বলিল "তারপর?"

"তার পর আর কি? তুমি মনে করছ এতে আমাদের যাওয়া আট্‌কাবে? মোটেই না, একবার যখন মন করেছি তখন যাবই এবং আজই, দশটার ট্রেনেই যাব, দেখি কে আমাদের আট্‌কায়! চাক্‌রি? রইল কোম্পানীর চাক্‌রি কোম্পানীতে, দরকার হ'লে শালবনিতে গিয়ে চাষ ক'রে খাব, তবু ঐ ছাই চাক্‌রি আর নয়!"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া ইন্দিরা বলে, "চাক্‌রি ছেড়ে দেবে?"

"আর চাক্‌রি"—অনাদি সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, "একে তুমি চাক্‌রি বল? সেই যে কোন্ যুগে সুপারভাইজারীর চাক্‌রি পেয়েছিলাম কারখানার ঐ ছোট্ট ডিপার্টমেণ্টে, আজ আট বৎসর হয়ে গেল সেই একই চাক্‌রি করে চলেছি। ওঠা নেই, পড়া নেই সেই একঘেয়ে একই কাজ আর সঙ্গে সঙ্গে একই গালাগালি! আমার নীচে যারা কাজ করত খোসামোদ করে করে আজ তারাই দেখ গিয়ে এক-এক জন ফোরম্যান্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমি? কষ্ট করে লেখাপড়া যা-কিছু শিখেছিলাম, কোন কাজে লাগল তা? সেই যে এক টাকা বারো আনার রোজে ঢুকে-ছিলাম আজও ক্রমাগত তারই ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি। সেই ভোরে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে কারখানায় গিয়ে ঢোকা, আর বেরিয়ে আসা সেই বেলা পড়ে এলে চারটের সময়; সমস্ত দিনটাই যায় খাটুনির মধ্যে। ঘরে ফিরে এসে শরীরটা থাকে অবসন্ন, সারা রাতটা যায় হাত-পা-গুলোকে একটু বিরাম দিতে দিতেই। এর চেয়ে সারাদিন মাঠে চাষার কাজ করাও যে ভাল, সেখানে আনন্দ আছে। সেখানে যাচ্ছে-তাই গালাগালি দেবার জন্য কোন অভদ্র উপরওয়ালা নেই। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই যে উদ্দেশ্যহীন আনন্দহীন ভারবাহী পশুর মত জীবন কাটিয়ে দেওয়া—একে তুমি চাক্‌রি বলো? এ যদি চাক্‌রি হয়, তবে এর মায়া আমি এখনই ছাড়লাম।"

ইন্দিরা চুপ করিয়া থাকে। পুরুষের ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে যে নারীর জীবনও পাকে পাকে জড়াইয়া গেছে, এই শূন্যতার হাহাকার হইতে সে দূরে সরিয়া রহিবে কেমন করিয়া? প্রাণ-মনের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে ইন্দিরার এই নিদারুণ অনুভূতি ভরিয়া আছে। তবুও ধীর কণ্ঠে তাহাকে প্রশ্ন করিতে হয়, "রিজাইন্ লিখে দিয়েছ?"

"রিজাইন্ লিখে দিতে গেলে আরও দু-দিন থাক্‌তে হয়। কোন দরকার নেই। আর একটি মুহূর্ত্তও আমার এই কয়েদখানার মধ্যে থাকতে ইচ্ছা করছে না।"

খানিকক্ষণ অস্থির ভাবে পায়চারি করিবার পর অনাদি বলে, "আমি এখন চল্‌লাম। যে জিনিসগুলো আমরা সঙ্গে নিতে পারলাম না, এক বন্ধুকে বলে যাই, সেগুলো সে পরে বিক্রী করে দেবে। তুমি তৈরি হয়ে থাক—আমি একটা ট্যাক্সিকে বলে রেখে আসি; দশটার ট্রেনে আজ আমরা চলে যাবই।"

সারি সারি ক্ষুদ্র কোয়ার্টারগুলি ছাড়াইয়া যে পথটা উঁচুনীচু হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া ষ্টেসনের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সে পথে ট্যাক্সি করিয়া যাওয়া হইল বটে, কিন্তু দশটার ট্রেন ধরা আর ঘটিল না। ট্যাক্সি যখন ষ্টেসনে সবে পৌঁছিল, তখন দশটার ট্রেন তাহাদের ছাড়াইয়া অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছে।

মাটিতে পা দিয়াই নিরুপায়ের মত ইন্দিরা বলে, "কি হবে!"

"কি আবার হবে? তুমি কি মনে করেছ আবার ফিরে যাব সেই খাঁচার মধ্যে! কখ্‌খনো না, সারারাত ব'সে থাকব ওয়েটিং-রুমে—রাতটা কেটে গেলেই আসবে ভোরের ট্রেন—আমাদের যাওয়া আটকাবে কে, ইন্দিরা?"

স্ত্রীকে ওয়েটিং-রুমে ঠিকমত বসাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ পরে অনাদি বাহিরে আসিয়া সেই নির্জন অন্ধকার প্লাটফর্মের উপর পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল।

রাত্রি গভীর। মিট্‌মিটে কতকগুলি মাত্র ক্ষুদ্র প্রদীপের নক্ষত্র জ্বালাইয়া রাখিয়া ভরা অমাবস্যা আকাশ আর পৃথিবী ঘনান্ধকারে একাকার করিয়া দিয়াছে। ষ্টেসনের ওপারে কুখ্যাত পল্লী হইতে মাঝে মাঝে উন্মত্ত কোলাহল ভাসিয়া আসে। প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া খানিকটা দূরে ডিস্‌ট্যান্ট-সিগন্যালের ঐ যে লাল আলোটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া অনাদি দাঁড়াইয়া রহিল।

কেহ যদি আসে—যাহাকে সে চেনে না, জানে না এমন এক অদ্ভুত কেহ—যদি ঐ অন্ধকারের মধ্য হইতে অকস্মাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করে—জীবন কাহাকে বলে, বলিতে পার? কি উত্তর দিবে অনাদি—জীবনকে কি সে জানে, না চিনিয়াছে কোন দিন? সারাটা দিন কাটে যন্ত্রের ঘরঘরানিতে, আর রাত কাটে শরীর ও মনের অবসন্নতা ঘুচাইবার জন্য অস্থানে-কুস্থানে কোলাহলের মত্ততার মধ্যে—ইহাকে যদি জীবন বলে ত জীবন একটা প্রাণহীন পুতুল-নাচ।

ঐ যে আকাশে নক্ষত্রটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে, একটা ব্যাকুল পিপাসায় উহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল অনাদি। তারপর এক পা এক পা করিয়া আবার পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। টিকিট ঘরের কাছে গ্যাসের আলোটা যেখানে মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে, উহার কাছাকাছি হইতেই কে একটি লোক একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। চমক্ ভাঙিয়া গেল অনাদির; স্পষ্ট করিয়া চাহিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল লোকটিকে, বলিল, "আরে, মহেন, এত রাত্রে তুমি এখানে কোথা থেকে?"

সামান্য একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল মহেন, সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, "এই একটু···বুঝলে কিনা···ষ্টেসনের ওপারে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার খবর কি, বল ত? রাত দশটার পর কারখানা থেকে এসে আগেই তোমার বাসায় গেলাম, দেখি—তালাবদ্ধ দরজা! আর এখন দেখছি ষ্টেসনে, বলি ব্যাপারটা কি?"

"এখান থেকে আমরা চলে যাচ্ছি, ভাই।"

"চলে যাচ্ছ! তার মানে? বলি, খবর শুনেছ? আজ সকালে তোমাদের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে তোমাদের ফোরম্যান্ ট্র্যাপারের যে এক খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল।"

"কি রকম?"

"আর বল কেন, তিন নম্বর ফার্নেসে করেছে 'ব্রেক্ ডাউন', সাহেব এসে ট্র্যাপারকে করলে ভীষণ গালাগাল। ট্র্যাপারও ছাড়ে নি, সে-ও সমানে কথা-কাটাকাটি করে, তারপরে তথ্‌খুনি এক দরখাস্ত লিখে কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়ে বাসায় চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, তার 'রিজাইন্' যে সাহেব 'অ্যাক্‌সেপ্ট' করেছে, সে খবরও পাওয়া গেছে।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতেছিল অনাদি, কহিল, "তারপর?"

"তারপর আর কি, তোমাদের ওখানে ঐ এক ব্যাটাই ছিল 'ট্যাস্',—এইবার সব ফোরম্যান্-ই তোমাদের বাঙালী হয়ে যাবে আর কি!"

"তার মানে?"

"মানে কি এখনও বোঝো নি? ওসব চলে যাচ্ছি টলে যাচ্ছি ছেড়ে দাও। তুমি ছিলে সুপারভাইজার, ফোরম্যানের পরেই। আর তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে সবচেয়ে সিনিয়র এখন তুমিই; তুমি যদি এ চান্সটা না পাও ত আমি নাক-কান কেটে ফেলে দেবো।"

একান্ত আগ্রহে তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল অনাদি, কহিল, "সত্যি বলছ?"

"সত্যি না ত কি মিথ্যা বল্‌ছি? শুধু তা-ও নয়, তোমাদের ব্যানার্জীর কাছে শুনলাম, সাহেব নাকি একথাও আভাসে বলেছে যে, 'ঘোষই হচ্ছে উপযুক্ত লোক, ওকেই আমি এবার চান্সটা দেব।' এর পরেও সন্দেহ হচ্ছে নাকি তোমার? যাও, এ সব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে, কাল ভোরেই গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করো, আমি বল্‌ছি, আর কারুর নয়, এটা তোমার ভাগ্যেই আছে।"

আকাশে সেই নক্ষত্রটা এখনও সমানে দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মহেনকে ডাকিয়া এক প্রকার ছুটিতে ছুটিতেই অনাদি ওয়েটিং-রুমের দিকে অগ্রসর হইল। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, যে পথটা ষ্টেসন ছাড়াইয়া সারি সারি ক্ষুদ্র কোয়ার্টারগুলির মধ্য দিয়া কারখানার দিকে গিয়াছে সেই পথেই একখানা মোটর রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে।

কোথাও এতটুকু ছন্দপতন হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দিগন্তের তীর হইতে নির্ম্মল ভোরের রৌদ্র শালবনের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া সম্মুখের মাঠের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়াছে। স্বামী চলিয়া গিয়াছে কারখানায়; এমন সময় বহু দূর হইতে একটা অস্ফুট শব্দের লহরী তুলিয়া ভোরের ট্রেনখানি আসিতে লাগিল। এই দীর্ঘ আট বৎসর একান্ত আগ্রহে জানালায় দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটি প্রভাত যেমন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, তেমনি করিয়াই আবার ইন্দিরা জানালার শিক চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"বউটা"! মাঠের পারে একটা বড় টিলার উপরে বটগাছ-ঘেরা তাহাদের গ্রাম এক লজ্জাশীলা বউয়ের মতই দেখায় দূর হইতে—অদ্ভুত—অবর্ণনীয় তাহার সৌন্দর্য! দুই চক্ষু ভরিয়া সেই অবারিত অপরূপ সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল ইন্দিরা।

গাড়ী বোঝাই যাত্রী লইয়া ট্রেনখানি আসিল, আর চলিয়া গেল। আর কত দিন—কত দিন যে তাহাকে এই একান্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা কে জানে?

সাহিত্যে জাতীয়তা

শ্রীসুলতা কর

সাহিত্য বিশ্বমানবের সম্পত্তি, দেশকালের অতীত তার রূপ। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না, এমন একটা কথা বর্তমান যুগে শিক্ষিতদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু এ কথার মধ্যে সত্য কোথায়? সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে দেখা যায় যে জাতীয়তার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। এই জাতীয়তার প্রভাবের ফলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা সঙ্কীর্ণ ও অনুদার না হয়ে সুন্দর ও মহান্ হয়ে উঠেছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা বিশ্বজনীনতাকে ভুলে যান না, তাঁদের রচনা এ কথারও সাক্ষ্য দেয়। তাঁদের বিশেষত্ব এই যে, জাতীয়তার মধ্য দিয়েই তাঁরা বিশ্বজনীনতার অভিমুখে যান, দেশমাতৃকার রূপের মধ্য দিয়ে বিশ্বমায়ের রূপ ফুটিয়ে তোলেন।

বাংলা সাহিত্যেও জাতীয়তার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। অতীত কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই জাতীয়তাবাদী।

বাল্মীকির রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেছেন বাঙালী কবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে বসে দেখতে পাই জাতীয়তা কবিকে কত দূর প্রেরণা দিয়েছে। নিজের দেশের ফল-ফুল, নদ-নদী, আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করার জন্য তিনি বাল্মীকির রচনার অনেক পরিবর্ত্তন করেছেন, তার ফলে তাঁর কাব্য এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য ঘটেছে বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক কবির অন্তরের প্রেরণা পেয়ে বাংলা রামায়ণে এক নব সৌন্দর্য্যলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

গঙ্গা পৃথিবীতে নেমে যে পথ ধরে চলেছেন তার দু-পাশের গ্রামের বর্ণনাচ্ছলে কবি নেড়াতলা, নদীয়া, আকনামহেশ এই সব বাংলার গ্রামের পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ রামের সেনাদের হারিয়ে বাংলার ঢোলক বাজিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন :—

> "বানরের শুন এবে ক্রন্দনের রোল।
> লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল।"

বাঙালীর প্রিয় খাদ্য পিঠা, পান্তুয়া, খাজা প্রভৃতির নাম ও বাংলার ফল, রামরম্ভা, জাম প্রভৃতির নামও কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্থান পেয়েছে। রাবণের হাসি বর্ণনা করে কৃত্তিবাস লিখেছেন—

> "কুড়ি পাঁতি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
> কেতকী কুসুম যেন ফোটে ভাদ্র মাসে।"

ঋষি ভরদ্বাজ যে অন্ন দিয়ে অতিথি-সেবা করছেন তা—

> "নির্ম্মল কোমল অন্ন যেন যূথি ফুল।"

রাবণের ভয়ে সীতা—"জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুরি।"

হনুমানের কথায় বানর-সেনার ভয় দূর হ'ল যেন ময়ূর 'হাঁড়িয়া মেঘ' দেখল।

এই 'যূথি ফুল' 'কেতকী কুসুম' 'কলার বাগুরি' 'হাঁড়িয়া মেঘ' কি বাংলার পল্লী-শোভা মনে করিয়ে দেয় না?

এ ছাড়া কবি বাঙালীর সামাজিক জীবনের আচার-ব্যবহারের নিপুণ বর্ণনা করেছেন। বাঙালী বিবাহের "কালরাত্রি যাপন" রামসীতার বিবাহে স্থান পেয়েছে। সঙ্গিনীদের মধ্য থেকে বধূকে খুঁজে বার করার যে সুন্দর প্রথা বাঙালী বিবাহে অনুষ্ঠিত হয় তাও বাংলা রামায়ণে রয়েছে—

> "করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি।
> হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি।"

বাংলা রামায়ণে বাঙালী বঙ্গমায়ের নিবিড় স্পর্শ গভীর ভাবে অনুভব করে।

নদ-নদী, পুষ্পভারাক্রান্ত বাংলার পল্লীশোভা, সুখে দুঃখে স্পন্দিত বাঙালীর প্রাণ, রামসীতার চিরমধুর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাঙালীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এমনি ভাবে দেখতে পাই জাতীয়তার সুরে কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যখানিকে এরূপ একান্তভাবে ধ্বনিত করে তুলেছেন যে বাংলা রামায়ণ আমাদের কাছে জাতীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে।

চার-শ বছর আগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম জন্মেছিলেন বাংলাদেশে। তাঁর রচিত চণ্ডীকাব্য সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এখনও আমরা সে কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হই।

তাঁর জীবন-কাহিনী পড়লে দেখা যায় যে দেশপ্রেম তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, শুধু তাই নয় দেশপ্রেমই তাঁকে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিল। তখন মুসলমান শাসকের অত্যাচারে প্রজার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে অস্থির হয়ে কবি এক দিন গোপনে সপরিবারে দামুন্যা থেকে পালালেন। পথে নিদারুণ কষ্ট পেতে লাগলেন। 'তৈল বিনা করি স্নান' 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে' এই দু-একটি কথায় তাঁদের শোচনীয় দুরবস্থা বোঝা যায়। অনেক কষ্টের পর কবি মেদিনীপুরের হিন্দুরাজার আশ্রয়ে এসে পৌছলেন। রাজানুগ্রহে তাঁর অর্থকষ্ট দূর হ'ল ও তিনি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করে কবির

মনে যে গভীর দেশপ্রেম জেগে উঠেছিল তাই তাঁর কাব্যের প্রেরণা জোগাল।

"পশুগণের প্রতি চণ্ডীর প্রশ্ন" চণ্ডীকাব্যের এই অধ্যায়ে দেশপ্রেমিক কবি রূপকচ্ছলে মুসলমান শাসকের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন। পশুরা যুদ্ধে হেরে ভগবতীর নিকট কাঁদছে,—

"চণ্ডী—সিংহ তুমি মহা তেজা, পশুমধ্যে তুমি রাজা,
তোর নখে পাষাণ বিদরে।
শুনিয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব্ব গা,
কি কারণে ভয় কর নরে।
সিংহ—বীর ক্ষত্রি অদভুত, দ্বিতীয় যমের দূত,
সমরে হানয়ে বীর রথ।
দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান
পলাইতে নাহি পাই পথ।
চণ্ডী—আমি ক্ষত্রি ক্ষুদ্র বাঘ কে পায় তোমার লাগ,
পবন জিনিতে পার জোরে।
তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার
কি কারণে ভয় কর নরে।
বাঘ—যদি পাই নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই,
কি করিতে পারি আমি দূরে।
ব্যর্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ,
দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে।"

চণ্ডী ও পশুদের এই সব কথোপকথন পড়লে স্পষ্টই মনে হয় কবি পশুযুদ্ধ উপলক্ষ্য করে মুসলমান শাসকের প্রবল অত্যাচারে পীড়িত হিন্দু প্রজার মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন। ভালুক চণ্ডীকে কেঁদে বলছে,

"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক।'

এই অংশটিতে মামুদ শরিফের অত্যাচারে বিব্রত কবি তাঁর নিজের দুরবস্থার পরিচয় দিয়েছেন।

অত্যাচারী শাসকের পীড়নে তাঁকে চিরদিনের জন্য দামুন্যা ত্যাগ করতে হ'ল, এই দুঃখ তাঁর মন থেকে কখনও মুছে যায় নি। স্বদেশ-নির্ব্বাসিত কবির মনে দামুন্যা গ্রামের সুন্দর ছবিখানি চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল। চণ্ডীকাব্যের সূচনায় তিনি নিজের গ্রামের বর্ণনা করেছেন। সে গ্রামের সকল লোকই ধার্ম্মিক, সকলেই সুন্দর,

"দামন্যার লোক যত শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী।"

দামুন্যার দক্ষিণ পাড়ায় যে-সব ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য থাকেন, তাঁরা সকলেই কুলে শীলে অতি উচ্চ। এই সজ্জন-প্রধান দক্ষিণ পাড়া সুপণ্ডিত ও সুকবির আবাসভূমি,—

"কুলে শীলে নিরবদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামিন্যাতে সজ্জন প্রধান।
অতিশয় গুণ বাড়া সুখদ দক্ষিণ পাড়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমান।"

গ্রামের সজ্জনদের সাধুচরিত্রের প্রশংসায় তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন। এই গ্রামে ভাগ্যবান্ হরি নন্দী শিবকে ভূমিদান করেছেন,—

"হরি নন্দী ভাগ্যবান্ শিবে দিলা ভূমিদান
মাধব ওঝা ধামাদিকারণী।"

বেদান্ত ও নিগম শাস্ত্রে নিপুণ ঈশান পণ্ডিত মহাশয় সেখানে বাস করেন,—

"কাটা দিয়া বন্দী ঘাটী বেদান্ত নিগম পাটী
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।"

দামুন্যা গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া তাঁর মনে আঁকা হয়ে গেছে। কবি নিজের গ্রামের দেউলটি পর্য্যন্ত সকাতরে স্মরণ করেছেন,—

"বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিল দুরন্ত
কতকাল তথাই বেহার।"

সে গ্রামের রত্নাম্বু নদের নাম মনে পড়াতে তাঁর প্রাণে অব্যক্ত বেদনা জেগে উঠেছে।

"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল তোমার চরণ জল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।"

এই বলে শিবচরণ-নিঃসৃত রত্নাম্বু নদের নাম করেছেন। সেই পবিত্র জল পান করার জন্যই তিনি কবি হতে পেরেছেন,—

"সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।'

এই রত্নাম্বু নদের কূলে শঙ্কর অবতীর্ণ হয়ে দামুন্যাকে তীর্থভূমি করেছেন।

"ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নাম্বু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামিন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর।"

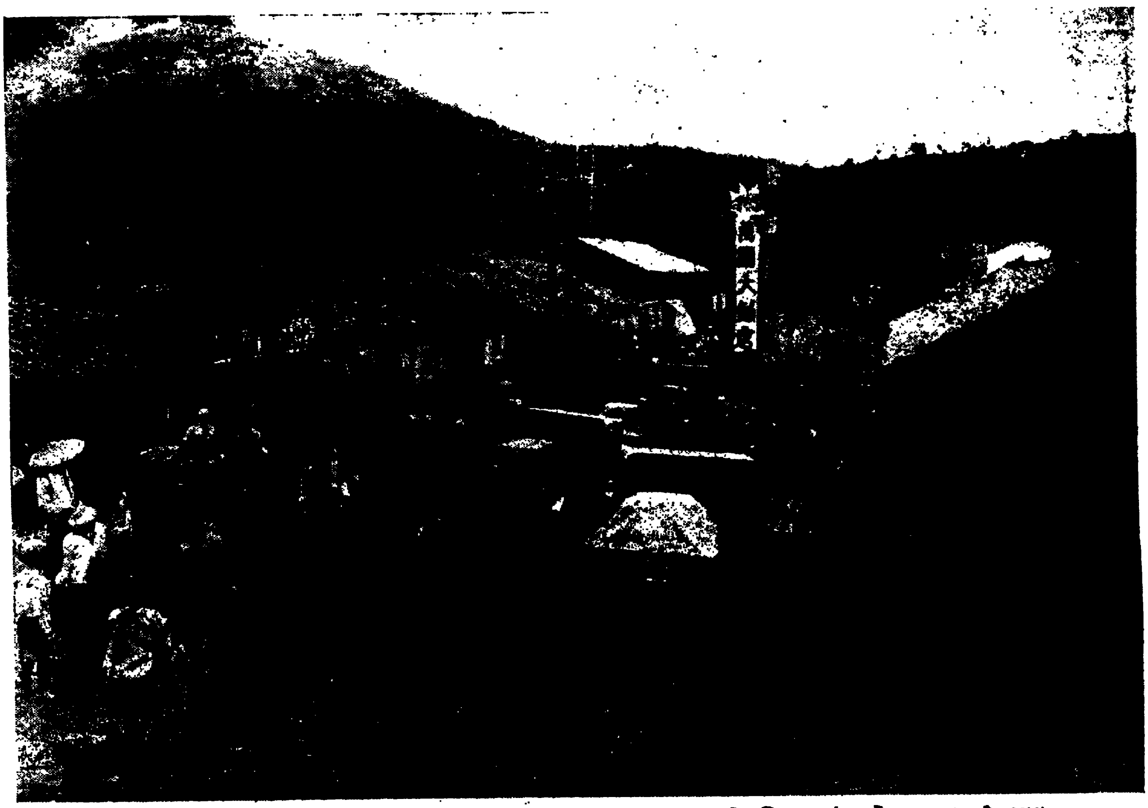
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হতে ভিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে বিতাড়িত কবির মনোবেদনা আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করে তোলে। দেশের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা কাব্যের উৎসে উৎসারিত হয়ে উঠেছে দেখতে পাই।

পুরনো বাংলা-সাহিত্যের অনেক কাব্যেই আমরা কবিদের জাতীয়তা-প্রীতির পরিচয় পাই। এই জাতীয়তার সুর, দেশকে অতিপ্রিয়রূপে ভালবাসার সুর সাহিত্যক্ষেত্রে লোপ পায় নি। অতীত কাল থেকে এ কাল পর্য্যন্ত বয়ে এসেছে তার ধারা। তারই পরিচয় পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনায়।

বঙ্কিম প্রতিভার মূল উৎস এই দেশাত্মবোধ। কতভাবে কত প্রসঙ্গেই না তিনি এই গভীর চেতনা ব্যক্ত করেছেন। 'আনন্দমঠে' দেখি দেশকে অরাজকতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বাংলার বীর যুবকেরা সন্তানের ব্রত নিয়েছে। তারা এক দিকে সন্ন্যাসী অপর দিকে যোদ্ধা।



ব্রহ্মদেশের চীনা অঞ্চলে গিরি-মন্দিরের সম্মুখে চীনা সৈন্যদের সাহায্যকারী মার্কিন সৈন্যগণ



বর্মা-রোডের উত্তর অংশে একটি চায়ের দোকানের সম্মুখে কতকগুলি জিপের নিকট সমবেত চীনাগণ



মার্কিন ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্ত্তৃক লেডো রোড হইতে 'বুলিডোজার' যন্ত্র-সাহায্যে কর্দ্দমাদি নিষ্কাশন—(USOWI)



ব্রহ্ম-রণাঙ্গনে ব্যবহৃত অগ্নি-ক্ষেপণকারী যুদ্ধাস্ত্র—(USOWI)

অত্যাচারীর ধনরত্ন অপহরণ করে নির্য্যাতিতকে দান করা, অরাজক রাজ্য উদ্ধার করা তাদের ব্রত।

এই 'আনন্দমঠের' ভিতর দিয়ে পরাধীনতার অন্ধতমসাচ্ছন্ন যুগে বঙ্কিম বাঙালীকে শুনিয়েছেন মায়ের বন্দনা-গান। সন্তান ভবানন্দ গাইছেন :—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং　　মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

ভবানন্দের এই অপূর্ব্ব মাতৃবন্দনা শুনে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করছেন—"এ ত দেশ এ ত মা নয়।" তখন ভবানন্দ মাতৃবন্দনার অর্থ বুঝিয়ে বললেন :—

আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা—

এই আনন্দমঠের ভিতর দিয়ে বঙ্কিম বাঙালীকে দেখিয়েছেন মায়ের তিন রূপ।

"ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে?

ব্রহ্ম। মা—যা ছিলেন।

*　　*　　*

ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পিছু পিছু চলিলেন। * * *ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, দেখ মা যা হইয়াছেন। মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন—কালী।

ব্রহ্ম। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, এই-জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা।

*　　*　　*

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"এই পথে আইস।" * * *

সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। * * * দেখিলেন এক মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন—"এই মা যা হইবেন।"

*　　*　　*

"দিগ্ভুজা—নানা প্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ * *।"

'দেবীচৌধুরাণী'তেও দেখি ভবানীঠাকুর সন্ন্যাসী যোদ্ধাদল গঠন করে অরাজক রাজ্য উদ্ধারের ব্রত নিয়েছেন।

যেমন তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে তেমনি তাঁর নানা-প্রবন্ধের মধ্য থেকে নানা ভাবে নানা রূপে দেশাত্মবোধের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 'আমার দুর্গোৎসব' এই প্রবন্ধে লিখেছেন :—

"চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—একণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত।"

* * * দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল। জল-কল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল। তখন যুক্তকরে সজল নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি। উঠ মা। এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব।"

এ ছাড়া 'স্বদেশপ্রীতি', 'অনুশীলন', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' এসবের মধ্যেও বঙ্কিমের দেশপ্রেমের প্রেরণায় উজ্জ্বল রচনা দেখতে পাই।

রবীন্দ্রকাব্যেও দেখি দেশপ্রীতি বিশ্বকবির কাব্যের কতখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। কবির রচিত শত শত গান, কবিতার মধ্য দিয়ে দেশের উপর একান্ত ভালবাসার পরিচয় ফুটে উঠেছে। দেশকে ভালবেসেই তিনি বিশ্বের প্রিয় হয়েছেন।

বাংলা-মায়ের ভালবাসায় মুগ্ধ কবি গেয়েছেন :—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,　তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে (মরি হায় হায় রে)
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি।"

বাংলা-মায়ের রূপ দেখে দেখে মুগ্ধ কবির চোখের পলক পড়ে না—

"ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোণার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট নেত্র আগুন বরণ।"

পরাধীন মাতৃভূমির ব্যথায় ব্যথিত কবি মায়ের দুঃখ দূর করবার জন্য সন্তানদের আহ্বান করেছেন।

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

কবি বলেছেন দেশের উপর একান্ত ভালবাসাই বিশ্ব-প্রেমের জন্ম দেয়। তাই তিনি দেশমাতৃকার রূপের ভিতর দিয়ে বিশ্বদেবের দেখা পেয়েছেন।

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে?
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

*　　*　　*

সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ' পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছো ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।"

'ভারততীর্থ' কবিতাটিতেও কবি এই কথাই বলেছেন। তাই তিনি ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে মহা-মানবের মিলনের গান গেয়েছেন :—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।"

এমনিভাবে দেখতে পাই যে অতীত থেকে আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে জাতীয়তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যুগে যুগে কবিরা দেশমাতৃকার বন্দনার ভিতর দিয়ে বিশ্বজনীনতার উদ্বোধন-গান গেয়েছেন। সকল দেশের, সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে জাতীয়তাকে বহু ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও বিরোধ

চিদ্‌ঘনানন্দ

সর্বত্রই রহিয়াছে মতের পার্থক্য ; শুধু ধর্ম্মমত লইয়া নহে, রাষ্ট্রনীতি এবং কর্ম্মপ্রণালী লইয়াও। অদূরদর্শী অসহিষ্ণুরা, অশিক্ষিতেরা করে তাই লইয়া ঝগড়া, বিবাদ, লুণ্ঠন, নারীহরণ, হত্যা, বহিষ্কার প্রভৃতি ; জ্ঞানীরা করে মিলনের ব্যবস্থা, ত্যাগ ও ধীরতা গ্রহণ করিয়া, সুপথ বাহির করিয়া, নিয়মের অধীন থাকিয়া, অযথা উন্মাদনা পরিত্যাগ করিয়া,—এক লক্ষ্যে চলিবার জন্য, সম্প্রীতির জন্য, শক্তি ও শান্তির নিমিত্ত। বহুতর বহুবিধ জটিল সমস্যাযুক্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চলে কেমন করিয়া ?

হিন্দু মুসলমানে বিরোধ সাম্প্রদায়িক রূপে, সর্বসাধারণ মধ্যে কোন দিনই প্রকাশ পায় নাই, যদি না কেহ বা কোন দল তাহাদিগকে উস্কাইয়া দিয়াছে ; আর তাহাও স্থায়ী হয় নাই অধিক কাল। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই বিদ্বেষটা প্রকাশিত হয় আগে, পরে তাহা ছড়ায় নিম্ন স্তরে। মারে আর মরে ইহারাই, বড়রা থাকেন দূরে। এই বিদ্বেষ ও বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এই বিংশ শতাব্দীতে, কাহা হইতে, কি উদ্দেশ্যে, কি প্রকারে, তাহা এখন শিক্ষিত দূরদর্শী লোকের ভিতর কাহারও আর অজ্ঞাত নাই।

অশান্তির বৃদ্ধি আর ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে পিছাইয়া দেওয়া ব্যতিরেকে এই বিবাদে হিন্দু-মুসলমানের কি লাভ হইতেছে ? উহা হইতে সমাজের কি স্বার্থ সিদ্ধি বা উন্নতি হইয়াছে, স্বার্থপর দুই-চারি জন লোকের ব্যক্তিগত সুবিধা ব্যতিরেকে ? কৃষককুল, নিম্ন শ্রেণীর লোক, মধ্যবিত্ত লোকের ধন-বিত্ত, সুখ-সুবিধা বাড়িয়াছে কি কোন সম্প্রদায়ের ? মরিয়া যায় নাই কি অনাহারে ও রোগে পঁচিশ লক্ষেরও অধিক লোক বাংলায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, যাহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ছিল অধিক, মুসলমান-চলে নাই কি দিন দিন বৈদেশিক শোষণ হইতে নানা পথে ?

শক্তি, শান্তি আর সমৃদ্ধি আসিতে পারে না সেই পরিবারে, সমাজে বা দেশে, যখন নিজেরাই বিবাদ করে। তাহা হইতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয়, লাভ হয় শত্রু পক্ষের।

সকল সম্প্রদায়েরই ভাল লোকেরা এই সব কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, আর ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার নিমিত্ত, এক লক্ষ্যে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাফল্য আসিতেছে না সেই চেষ্টায়, কতকগুলি উত্তেজক প্রতিক্রিয়ার জন্য।

বিরোধ বিদূরিত হইয়া সকল সম্প্রদায় মধ্যে বর্তমান অবস্থায়ও কি উপায়ে শান্তি আসিতে পারে ?

দুইটা পথ আছে : স্থায়ী ও অস্থায়ী। প্রথম হইতেছে—উভয় পক্ষের মিলন ; দ্বিতীয় হইতেছে—পরস্পরের শক্তি সামঞ্জস্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম পথটিই শ্রেয়ঃ।

প্রথম পথে আবশ্যক (ক) পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ; (খ) সমান দৃষ্টি ও ন্যায় বিচার ; (গ) একই প্রকার স্বার্থ ; (ঘ) সংযম ও সহিষ্ণুতা।

এই গুলির ব্যাখ্যা হইতেছে :—

(ক) হিন্দু যদি অহিন্দুকে ঘৃণা না করে, অশ্রদ্ধা না করে, সেও আমারই মত মানুষ ইহা মনে করিয়া তাহাকে যথোচিত মর্য্যাদা দেয়, অপরেরাও যদি হিন্দুর সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করে, ধর্ম সম্পর্কে কোন বিতর্ক না করিয়া, তাহা হইলে এইখানেই গোলযোগের প্রধান কারণের অবসান হইতে পারে।

(খ) দেখিতে হইবে সকলের স্বার্থকে সমান ভাবে,

(গ) ব্যাপক বা সার্বজনীন বিষয়ে সকলেরই স্বার্থ যদি একই প্রকার হয়।

(ঘ) সকলকেই সকল স্থলে সংযম ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্ম সম্পর্কে এই সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রমাণ দিতে হইবে বিশেষ রূপে। ইহার দৃষ্টান্ত বলিতেছি।

নমাজের সময় মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্য বাজাইয়া না গেলে কাহার কি ক্ষতি হইতে পারে? অন্য সময়ে বাদ্য বাজাইয়া প্রতিমা লইয়া গেলেই বা কাহার কি ক্ষতি হয়?

বাড়ীর পাশে হিন্দুর বাড়ী বা দেবালয় রহিয়াছে; আবশ্যক মত সে ঢোল কাঁসি বাজায়, ইহাতে এমন কি ক্ষতি হয় খ্রীষ্টানের বা মুসলমানের?

হিন্দুর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে কি অপরাধ হয় ঈশ্বরের নিকট? তুমি যাও কেন সেই দিকে? অপরকে তোমার ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে তোমার বাস্তব জীবনে?

গো-হত্যা সমাজের দিক হইতে সকলের পক্ষেই ক্ষতি-কর। গো-বধ হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। মুসলমান কোরবানি করিবে, সেই হেতু সে গরু মারিতে হয় মারুক, হিন্দুর সাক্ষাতে না মারিলেই ত গোল হয় না।

ধর্ম লইয়া বিরোধ হইতেছে একটা হাস্যকর ব্যাপার, যেহেতু ধর্ম একটা ভাবাত্মক ব্যক্তিগত বিষয়।

ঢাকার একজন সুধী মুসলমান বলিয়াছিলেন, মুসলমান ঘৃণা করে হিন্দুর ধর্মকে, হিন্দুকে নয়; আর হিন্দু ঘৃণা করে মুসলমানকে, তাহার ধর্মকে নয়।

বুঝিয়া দেখিবার কথা রহিয়াছে এখানে কিছু। ধর্মকে ঘৃণা করিতে পারে না কেহ, যদি সে বাস্তবিকই পোষণ করে আস্তিক্য বুদ্ধি। কেহ বুঝিতে না পারিলেই অপরের ধর্ম মিথ্যা হইয়া যায় না। কেহই কদর্য কাজকে ভাল বলে না। মানুষ সকলেই; উপেক্ষার বিষয় নহে কিছুতেই।

দ্বিতীয় পথ—শক্তি সামঞ্জস্য।

বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি লইয়া মিত্রতা অসম্ভব। সবলের সহিত দুর্বলের মিত্রতা অভিলাষ দয়া বা উপেক্ষার বিষয়। সমাজে ন্যায়বান্, সদিচ্ছাসম্পন্ন লোক থাকিলেও কতকগুলি লোক থাকে স্বার্থপর, অল্পবুদ্ধি, অদূরদর্শী আর উদ্ধত। কোন সমাজে বা দেশে এই প্রকার লোকের সংখ্যা বা ক্ষমতা যখন অধিক হইয়া পড়ে, তখন এই পথ গ্রহণ করাই অপরের একমাত্র কর্তব্য।

হামিদা এদিব নামে এক তুর্কী বিদুষী মহিলা ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভারত সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন—"Hindus are in the melting pot, Mussalmans are in the melting pot." বলিতে পারি না কি সূত্রে তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তবে দুই পক্ষই যদি গলিয়া আসে, তখন মিলন হইতে বিলম্ব থাকে না অধিক—এই কথা সত্য।

এই মিলনের জন্য আবশ্যক উভয় পক্ষে কতকগুলি বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার ও সহিষ্ণুতা। সেই সব হইতেছে এই:—(ক) ভাব; (খ) ভাষা; (গ) পরিচ্ছদ; (ঘ) সংস্কৃতি।

(ক) পরস্পরের প্রতি অনুকূল ভাবকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) সর্বত্রই নিয়ম আছে, যে দেশে বাস করিবে সেই দেশেরই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে।

(গ) দেশ অনুযায়ী পরিচ্ছদ পরিতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-সব এসিয়াবাসী যায় তাহারা সেই দেশের বেশই পরিয়া থাকে। ইহা হইতে ধর্মহানি ঘটে না নিশ্চিত।

(ঘ) যে দেশে বাস করিতে হয়, সেই দেশেরই সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে হয়। ইহা হইতে ধর্মহানি বা মর্যাদার হ্রাস হইবে কেন? ভারতে অনেক খ্রীষ্টান রহিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্মের পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত, বুঝিবার সাধ্য নাই যে, তাঁহারা হিন্দু নহেন।

রাষ্ট্র-গঠনের জন্য এই সব পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বিশেষ।

উড়িষ্যার সোমবংশ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি

কিছুকাল পূর্ব্বে উড়িষ্যা প্রদেশের সম্বলপুর অঞ্চলস্থিত পাটনা রাজ্য হইতে আমার নিকট দুইখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের আলোক-চিত্র এবং প্রতিলিপি প্রেরিত হইয়াছিল। তাম্রলিপিদ্বয় পাটনারাজ্যের রাজধানী বলাঙ্গীর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী কালিভেলা নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। উহা স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হস্তগত হইলে ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় ফলকগুলি যথাযথরূপে পরিষ্কার করেন এবং লিপিদ্বয়ের পাঠ প্রকাশের জন্য আমার সাহায্যপ্রার্থী হন। শাসন দুইটি প্রাচীন ত্রিকলিঙ্গ দেশের অর্থাৎ আধুনিক সম্বলপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের

সোমবংশীয় নরপতি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহাভবগুপ্ত জনমেজয় কর্ত্তৃক তদীয় রাজত্বের ষষ্ঠ এবং চতুস্ত্রিংশ বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল। কালিভনার তাম্রশাসনদ্বয় সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সোমবংশী রাজগণের বিষয়ে সাধারণ ভাবে কিছু নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙালী প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় উড়িষ্যার সোমবংশী নরপালগণের সহিত বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধমূলক একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বীজ পুঁতিয়া গিয়াছিলেন। বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা-সমিতির পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি সোমবংশীয় নরপতি মহাশিব গুপ্ত যযাতির জটেশিঙ্গাড়ুংরী তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশ করেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠের এক স্থলে উল্লিখিত নরপতির একটি বিশেষণ দেখা যায়—"শীতাজবঙ্গবিমলাম্বর পূর্ণচন্দ্রঃ"; অন্যত্র রাজা বলিতেছেন, "অস্মদ্বঙ্গাম্বয়ে ক্ষীণে যঃ কশ্চিন্ন্‌পতির্ভবেৎ" ইত্যাদি। পরে মজুমদার মহাশয়ের পাঠের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের ন্যায় প্রবীণ লেখবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশেই উড়িষ্যার সোমবংশী রাজগণের আদি নিবাস ছিল। দুঃখের বিষয়, এই সিদ্ধান্তটি সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক। কারণ ঐ লিপিতে রাজাকেও বঙ্গাম্বরের পূর্ণচন্দ্র বলা হয় নাই, রাজবংশটিও বঙ্গান্বয়রূপে উল্লিখিত হয় নাই। জটেশিঙ্গাড়ুংরী লিপির পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি স্থলের প্রকৃত পাঠ—"শীতাণ্ড শুবণ্ড শবিমলাম্বরপূর্ণ চন্দ্রঃ" এবং "অস্মদ্বংশেক্ষয়ক্ষীণে যঃ কশ্চিন্ন্‌পতির্ভবেৎ" ইত্যাদি। সুতরাং স্বর্গীয় মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয়দ্বয়ের ভ্রান্ত পাঠের উপরেই এত দিন বঙ্গদেশে সোমবংশীদিগের আদি বাসরূপ অমূলক সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আসলে ঐ সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, সোমবংশীগণের লিপিতে কোনস্থলে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অন্তর্গত কোন জনপদের নাম থাকিলে, উহা মজুমদার মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। বক্রতেঁতুলী তাম্রশাসনের গ্রহীতা ব্রাহ্মণের সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"রাঢ়ায়াং বল্লিকন্দরবিনির্গতায়"; অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণের পরিবার রাঢ়দেশের অন্তর্গত বল্লিকন্দর গ্রাম হইতে গিয়া উড়িষ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু মজুমদার মহাশয় ব্রাহ্মণপরিবারের আদিবাসস্থানের নাম পাঠ করিয়াছেন—"রাঢ়াকং বল্লিকন্দর", এবং এই অদ্ভুত শব্দটিকে উড়িষ্যার অন্তর্গত রেঢ়াখোলের প্রাচীন নাম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন! দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত সকলেই এই ভ্রান্ত পাঠে সায় দিয়া গিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সোমবংশীয় একমত ছিলেন। এই বংশলতা অনুসারে সোমবংশের প্রথম চারি জন নরপতির নাম নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

১। শিবগুপ্ত। কেহ কেহ ইহাকে প্রথম শিবগুপ্ত বলিতে চান; কারণ তাঁহারা এই নরপতির এবং তদীয় পৌত্রের নাম মূলতঃ অভিন্ন মনে করেন। এই রাজার সময়ের কোন লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সোমবংশী রাজগণ আপন আপন তাম্রশাসনে অংশতঃ পিতৃনামের উল্লেখ করিতেন। এই রাজার পুত্রের লিপি হইতে ইঁহার নাম জানা গিয়াছে। ইঁহার পুত্র—

২। প্রথম মহাভবগুপ্ত জনমেজয়। এই নরপতির রাজত্বকালে প্রদত্ত নিম্নলিখিত তাম্রশাসনসমূহ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে।—তৃতীয় রাজ্যবর্ষের সোনপুর শাসন; ষষ্ঠ বর্ষের পাটনা শাসনত্রয় এবং কালিভনা শাসন; অষ্টম বর্ষের সতল্মা শাসন; সপ্তদশ বর্ষের সোনপুর শাসন; একত্রিংশ বর্ষের কটক শাসন; এবং চতুস্ত্রিংশবর্ষের কালিভনা শাসন। তাঁহার পুত্র—

৩। প্রথম মহাশিবগুপ্ত যযাতি। যাঁহারা এই রাজা এবং তদীয় পিতামহের নাম মূলতঃ অভিন্ন মনে করেন তাঁহাদের মতে দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি। পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত তাম্রশাসনসমূহ ইঁহার রাজত্বকালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। তৃতীয় রাজ্যবর্ষের জটেশিঙ্গাড়ুংরী তাম্রশাসন; অষ্টম বর্ষের পাটনা শাসন; নবম বর্ষের কটক শাসন; পঞ্চদশ বর্ষের সোনপুর শাসন; এবং চতুর্ব্বিংশ ও অষ্টাবিংশবর্ষের পাটনা শাসনদ্বয়। ইঁহার পুত্র—

৪। দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথ। পণ্ডিতগণের মতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার দুইখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয় রাজ্যবর্ষের কটক তাম্রশাসন এবং ত্রয়োদশ বর্ষের কুদোপল্লী শাসন।

কয়েক বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকর একটি নূতন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া উপরিলিখিত সোমবংশলতাটিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে জটেশিঙ্গাড়ুংরী তাম্রশাসনের দাতা মহাশিবগুপ্ত যযাতি পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকার প্রথম রাজা শিবগুপ্তের সহিত অভিন্ন; এবং কুদোপল্লী তাম্রশাসনটি ঐ তালিকার দ্বিতীয় নরপতির রাজত্বকালে প্রদত্ত হইয়াছিল, উহার চতুর্থ রাজার শাসন সময়ে নহে। সিদ্ধান্তটির দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ কুদোপল্লী লিপিসম্পর্কিত অংশের অনুকূলে কোনই যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই; কিন্তু প্রথমাংশের পক্ষে বলা হইয়াছে যে, জটেশিঙ্গাড়ুংরী তাম্রশাসনে রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতিকে স্বভুজোপার্জ্জিত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলা হইয়াছে এবং তাঁহার পিতা মহাভবগুপ্তকে কোন রাজোপাধি দেওয়া হয়

প্রথম রাজা এবং তিনিই ত্রিকলিঙ্গদেশ জয় করিয়া নবীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি যাঁহারা সোমবংশী রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ভাণ্ডারকরের অভিনব সিদ্ধান্তটিকে বিনাবিচারেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত মোটেই প্রমাণসহ নহে।

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকরের মত অনুসারে সোমবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও কতিপয় আদিম রাজার পরিচয় নিম্নলিখিত রূপ হইবে :—

১। প্রথম মহাভবগুপ্ত। ইনি রাজা ছিলেন না; কেবলমাত্র জটেশিঙ্গাডুংরী তাম্রশাসনদাতা নরপতির পিতৃনাম হিসাবে ইঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্র—

২। প্রথম মহাশিবগুপ্ত যযাতি। ইনি জটেশিঙ্গাডুংরী শাসনের দাতা এবং সোমবংশের প্রথম নরপতি। ইনিই পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশলতিকার প্রথম রাজা শিবগুপ্ত। তৎপুত্র—

৩। দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত জনমেজয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকার দ্বিতীয় নরপতি। তৎপুত্র—

৪। দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি। ইনি পূর্ব্বের তালিকার তৃতীয় রাজা। তৎপুত্র—

৫। তৃতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথ। ইনি পূর্ব্বতালিকাবর্ণিত চতুর্থ নরপতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে স্থলে চারি জন রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইত, ভাণ্ডারকরের মতে সে স্থলে পাঁচ জন সোমবংশীয় ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, জটেশিঙ্গাডুংরী লিপিতে যদি মহাভবগুপ্তের পুত্র নিজেকে মহাশিবগুপ্ত বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিজ পুত্রের দশখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে শুধু শিবগুপ্ত বলা হইয়াছে কেন? কোন সোমবংশী নরপতিই পিতৃনাম উল্লেখের সময় নামগুলির আদিতে সংযুক্ত মহৎ শব্দ বিলুপ্ত করেন নাই। সুতরাং যাঁহার নিজের নাম মহাভবগুপ্ত তিনি তাঁহার পিতার প্রকৃত নাম "মহাশিবগুপ্ত" ছাটিয়া "শিবগুপ্ত" করিবেন, তাঁহার উপর স্বর্গীয় পিতার প্রতি এইরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহার আরোপ করা নিতান্তই অযৌক্তিক। আসল কথা এই যে, শিবগুপ্ত অর্থাৎ উড়িষ্যার সোমবংশের প্রথম রাজার সময়ে রাজনামের আদিতে মহৎ শব্দ যোগ করিবার প্রথাটি এই বংশে অপ্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকর মহাশয় মহাভবগুপ্তের রাজোপাধির অভাব এবং তৎপুত্র মহাশিবগুপ্তের "স্বভুজোপার্জিত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি" বিশেষণটির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন! কিন্তু জটেশিঙ্গাডুংরী লিপিতে অসংখ্য লিপিকরপ্রমাদ আছে; মহাভবগুপ্তকে রাজোপাধি বর্জ্জিত করাও সেই প্রমাদের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত বিশেষণটিও মামুলী প্রশস্তিমাত্র। অনেক ক্ষেত্রে রাজসিংহাসনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদারকে পরাজিত করিয়া অথবা অনুরূপ কোন বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াও রাজগণ অত্যুক্তিমূলক বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পল্লববংশীয় নরপতিগণের ওংগোডুলিপিতে মহারাজ কুমারবিষ্ণুর পুত্র স্কন্দবর্ম্মাকে "স্ববীর্য্যাধিগতরাজ্য" বলা হইয়াছে।

আমার বিবেচনায় সোমবংশী রাজগণের তাম্রশাসনে উল্লিখিত তাঁহাদের মহাসান্ধিবিগ্রহী অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহ বিভাগের মন্ত্রীদিগের নাম বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপর অনেক খানি আলোকপাত করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিবগুপ্তের কোন তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পুত্র প্রথম মহাভবগুপ্ত জনমেজয়ের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসর হইতে একত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ধারদত্ত-পুত্র মল্লদত্ত মহাসান্ধিবিগ্রহী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই রাজার চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কালিভনা তাম্রশাসনে উল্লিখিত মহাসান্ধিবিগ্রহীর নাম ধারদত্ত। সম্ভবতঃ এই ধারদত্ত পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রী মল্লদত্তের পুত্র ছিলেন। যাহা হউক, দ্বিতীয় ধারদত্ত প্রথম মহাভবগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম মহাশিবগুপ্ত যযাতির রাজত্বের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই রাজার অষ্টাবিংশ বৎসরের লিপিতে একই দত্ত-পরিবারের অপর এক ব্যক্তিকে মহাসান্ধিবিগ্রহীরূপে দেখা যায়। তাঁহার নাম সিংহদত্ত এবং সম্ভবতঃ তিনি দ্বিতীয় ধারদত্তের পুত্র ছিলেন। প্রথম মহাশিবগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের তাম্রলিপিতেও মহাসান্ধিবিগ্রহী সিংহদত্তের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু জটেশিঙ্গাডুংরী তাম্রশাসনে দেখিতে পাই যে তখন সিংহদত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র রুদ্রদত্ত মহাসান্ধিবিগ্রহী ছিলেন। সুতরাং জটেশিঙ্গাডুংরী শাসনের দাতা মহাশিবগুপ্তের শাসনকাল দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথেরও পরে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আবার এই তাম্রশাসনের রাজা মহাশিবগুপ্ত এবং তদীয় মহাসান্ধিবিগ্রহী রুদ্রদত্তের পরিচয় সম্পর্কে বলিব়ারী তাম্রশাসনের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান্। এই তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথের পর তাঁহার তিন পুত্র ধর্ম্মরথ, নহুষ এবং দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি রাজা হন এবং তৎপর দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্তের পুত্র তৃতীয় মহাভবগুপ্ত উদ্দ্যোতকেসরী সিংহাসন লাভ করেন। এই উদ্দ্যোতকেসরীর রাজত্বের চতুর্থ বর্ষেও পূর্ব্বোক্ত রুদ্রদত্তকে মহাসান্ধিবিগ্রহী দেখা যায়। সুতরাং জটেশিঙ্গাডুংরী-লিপির রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি উদ্দ্যোতকেসরীর পিতা এবং ভীমরথের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত ব্যতীত অপর কেহ নহেন। পূর্ব্বপুরুষ দ্বিতীয় ধারদত্ত ও সিংহদত্তের ন্যায় রুদ্রদত্তও পিতাপুত্রের শাসনকালে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভাণ্ডারকরের মতে শিবগুপ্ত-পুত্র প্রথম মহাভবগুপ্ত কুদোপল্লী তাম্রশাসনের দাতা। এ অনুমানটিও প্রমাণসহ নহে। কারণ এই লিপির মহাভবগুপ্ত মহাশিবগুপ্তের পুত্র এবং যযাতি নগরবাসী। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবগুপ্ত-মহাশিবগুপ্ত সমীকরণ অযৌক্তিক। আবার যযাতিনগর নামক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা যযাতি নামধেয় কোন নরপতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঘটিতে পারে না। অথচ প্রথম মহাভবগুপ্তের পুত্র প্রথম মহাশিবগুপ্তের পূর্ব্বে উড়িষ্যার সোমবংশে অপর কোন যযাতির অস্তিত্বের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। প্রথম মহাশিবগুপ্তের সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম সোমবংশী লিপিতে যযাতিনগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কুদোপল্লী লিপির শাসনদাতা হয় দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথ, না হয় তৃতীয় মহাভবগুপ্ত উদ্দ্যোতকেসরী। এই শাসনটি সোমবংশী রাজগণের একজন সামন্তকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। নানা কারণে আমাদের মনে হয়, ইহা উদ্দ্যোতকেসরীর সময়ের পূর্ব্বেকার নহে।

সোমবংশী রাজগণ প্রথমে সম্বলপুর অঞ্চলে রাজত্ব করেন। পরে কটক ও পুরী জেলার কিয়দংশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কলচুরি ও গঙ্গবংশীয় রাজগণের প্রাধান্যের যুগে সোমবংশীদিগের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ সোমবংশের প্রথম তিন পুরুষ অর্থাৎ শিবগুপ্ত তৎপুত্র প্রথম মহাভবগুপ্ত জনমেজয় ও তৎপুত্র প্রথম মহাশিবগুপ্ত যযাতি আনুমানিক ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের পরবর্ত্তী তিন পুরুষ অর্থাৎ প্রথম যযাতি-পুত্র দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ, নহুষ ও দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি এবং দ্বিতীয় যযাতিপুত্র তৃতীয় মহাভবগুপ্ত উদ্দ্যোতকেসরী সম্ভবতঃ আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোমবংশী সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কেলগাঁ, খণ্ডগিরি ও ভুবনেশ্বর লিপির উদ্দ্যোতকেসরীকে আরও পরবর্ত্তীকালের রাজা বলিয়া মনে হয়।

সোমবংশীয় রাজগণের কালনির্ণয় সম্পর্কে কেবলমাত্র দুইটি সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যে (২৬শ শ্লোক) কোসল (দক্ষিণ কোসল অর্থাৎ সম্বলপুর-রায়পুর-বিলাসপুর অঞ্চল) দেশের কামিনীগণের ক্রীড়াভূমি যযাতিনগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, "কোসলীনাং" শব্দটি এ স্থলে লিপিকরপ্রমাদবশতঃ "কেরলীনাং" রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক, বুঝা যায়, যযাতিনগর-প্রতিষ্ঠাতা সোমবংশীয় প্রথম যযাতি অবশ্যই দ্বাদশ শতাব্দীর পরে আবির্ভূত হন নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ চোলবংশীয় প্রথম রাজেন্দ্রের তিরুমলৈ লিপিতে যাতি বা যযাতি নগরের জনৈক চন্দ্রকুলোদ্ভব অর্থাৎ সোমবংশীয় নরপতির নামোল্লেখ আছে। এই নামটি ইন্দ্ররথ বা ধীরতর পড়া হইয়াছে, কিন্তু সম্ভবতঃ ইনি ভীমরথের পুত্র ধর্ম্মরথ ব্যতীত অপর কেহ নহেন।

টিনের মাংস

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

এ গাড়ীখানা প্যাসেঞ্জার। যাতে থার্ড ক্লাস থেকে সকল ক্লাসেই অনুচিত ও যথোচিত যাত্রী ঠাসা ও ভরা। এখানা অতি সসম্ভ্রমে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের সোজা পাশের লাইনটা ছেড়ে দিয়ে একটা সাইডিঙের লাইনে সঙ্কুচিত ভাবে বহুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে ছিল।

অনেকক্ষণ পরে একখানা গাড়ী আসার আভাস দেখা গেল, সিগন্যালটা পড়ল। 'পাখা পড়েছে' বলে জন তিন-চার কুলি একটু নড়ে-চড়ে বেড়াল।

দেখতে দেখতে একখানা প্রকাণ্ড লম্বা মিলিটারি গাড়ী এসে পড়ল। লালচে চুল নীল চোখওয়ালা সাদা সাদা অসংখ্য মুখ জানলা ভরে সুন্দর সুস্থ সামঞ্জস্যময় শরীর দেখা যেতে লাগল।

ক্রমে রুগ্ন সৈন্য, বিকলাঙ্গ সেনা, সবল সহজ সেপাইয়ের গাড়ী একে একে দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জারের যাত্রীদের দৃষ্টির পথ পার হয়ে গেল। তার পর আসতে লাগল রেশনের গাড়ী, অর্থাৎ ভাঁড়ারের গাড়ী, রান্নার গাড়ী, তারপর রজকারী কালো সেবকদের গাড়ী—তারপর কয়লার গাড়ী ইত্যাদি। গাড়ী আর যেন শেষ হয় না।

বহুক্ষণ নির্ব্বিকার বসে থেকে থেকে প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানায় ঘুম এসে গেল যেন। হঠাৎ বহু সমবেত গলায় চেঁচামেচি হৈ হৈ শুনে সে-গাড়ীর সকলে সচকিত হয়ে মুখ বাড়াল জানলা থেকে। দেখা গেল, মিলিটারী গাড়ীর দুধারে অসংখ্য কণ্ঠের গোলমাল। কালো কালো জীর্ণশীর্ণ-তনু যত ভিখারী নিরন্ন যেখানে যা ছিল সকলে এসে দাঁড়িয়েছে—ঐ গাড়ীটার জানলার পাশে পাশে। খানিক আগেও এই গাড়ীটার পাশে ওদের দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অত জন ওরা কোথায় ছিল আর কেমন করে বা এখনি এসে জুটল। আর নির্ভয়ে চীৎকার করছে গোরাদের জানলার পাশে। লাল মুখকে ভয় নেই, গাড়ীর তলায় পড়বার আতঙ্ক নেই, পিছনের লাইনে অন্য গাড়ী এসে পড়বার কথাও ভাবছে না। কিসের ভিড়, কি জন্য ওরা দাঁড়িয়ে, দেখবার জন্য এ গাড়ীর সকলেই ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

বেশী ঝুঁকতে হ'ল না, গোরাদের জানলা থেকে রুটী, বিস্কুট,

কাগজে-মোড়া ভুক্তাবশিষ্ট মাংস, কলা, কমলালেবু, নানারকম খাদ্যের ছোট ছোট টিন ঝুপ ঝুপ করে তাদের দিকে পড়তে লাগল, দেখতে পাওয়া গেল।

কুখাদ্য ভোজন, অনশন ও আসন্ন মৃত্যুর শেষ ধাপে পৌঁছে আর আজ তাদের গোরাদের সঙ্কোচ বা সৈন্তদের কোনো ভয় নেই। অনায়াসে বিশীর্ণ মুখে ভিক্ষা চাইছে, গোলমাল করছে। আর গাড়ীভরা নীল চোখেরা অদ্ভুত কৌতূহলের সহিত আশ্চর্য্য ভাবে সমবেদনা ভরে তাদের দিকে চেয়ে আছে। হয়ত তারা ভাবছিল, এই উষর মাটির মত বিবর্ণ রঙের কঙ্কালসার দেহের জীবদের কি মানুষ বলা হয়? অথবা এরা মানুষ নয়। ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রকার জীবজন্তুদের মত এরাও এক রকম জীব। হয়ত তেমনি ধারাই কারুর বা এরা খাদ্য! কিন্তু ওই শীর্ণ কঙ্কালরা কারুর খাদক কিনা কে জানে!

কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে এল কয়েকজন। দুজনের হাতে দুটি টিন। প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানার বিসর্পিত ছায়ায় কয়েকজন এসে তারা বসল।

একজন টিনের ভেতরে দেখে বললে "ভাই এডা কি?"

অপর জন নিজের হাতের টিনের সবটুকু মুখটা খোলবার চেষ্টায় ছিল। সে বললে, 'খায়ে দ্যাখ না, মুই কি জানি।'

অপর জন মুখে দিয়ে বললে, 'মনে লাগে মাংস ক্যানো।'

'তা ওনারা তো মাংসই খায়—গোরা সিপুইরা।'

যে মাংস খেয়েছিল সে টিনটা হাত থেকে মাটিতে রাখল, তারপর বললে, 'ভাই, কিসের মাংস হবি?'

অন্তজন নিজের টিনের ভিতরের খাদ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে বিরক্তভাবে বললে 'তা কে জানে।'

যে মাংস খেয়েছিল সে চুপ করে শুয়ে পড়ল ক্লান্ত ভাবে, আর খেল না। এ নিজের টিন থেকে খেতে আরম্ভ করেছিল, বললে, 'শুলি যে, খ্যায়ে ফ্যাল? কুকুরে নিয়ে যাবে, ওই দেখ্ কুকুর।'

যে শুয়েছিল সে বললে, 'দিক্।'

অন্ত জন বললে, 'ক্যানো কুকুরকে দিবি ক্যানো—খা না, দে—মোরে, খাই।'

সে নির্লিপ্তভাবে দিয়ে দিল টিনটা, বললে, 'খা।'

এ আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'কি হল তোর, খ'না কেনে?'

এবারে এর চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, বললে 'ভাই মাংসটা কিসের বটে! সাহেবরা তো সব মাংসই খায়।'

অন্ত জন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তুই হিঁদু?'

এ চোখ বুজেই বললে, 'হাঁ।'

এবারে অন্ত জন একটু দূরে সরে বসল, তার পর একটু পরে বললে, 'বাই আমি তো মোছলমান।'

এ আশ্চর্য্য হয়ে উঠে বসল, তার পর আবার শুয়ে পড়ল। কিছুই বললে না।

কিন্তু মুসলমানটিও আর খেল না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বাই, ওরা তো হারামও খায়। মুইও তো খ্যায়েছি ওদের মাংসর টিন।'

মিলিটারী গাড়ী চলে গেছে। লাইন খালি হয়ে গেছে। এবারে প্যাসেঞ্জারখানাও তার দীর্ঘ বিসর্পিল দেহ নিয়ে এই লাইনে এগিয়ে এল। ভিখারীরা যে যেখানে পারে চলে গেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ছায়াতলে আশ্রিত হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই গায়ে অপরাহ্ণ রৌদ্রের সমস্তটা এসে পড়ল।

রৌদ্রের তাপে তারা এবারে সচকিত হয়ে উঠে বসল। দেখলে মাংসের টিন দুটো তাদের পাশে নেই। কুকুরে নিয়ে গেছে বোধ হয়।

দুজনেই উঠে দাঁড়াল। কিছু দূরে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। বহুক্ষণ পরে সহসা হিন্দুটি বললে, 'ভাই ভিখেরীর আর জাতধর্ম্ম কোথা? মোরা তো ভিখিরীই হয়েছি বটে।'

ক্ষুধিত ক্লান্ত মুসলমান নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল শুধু। হয়ত বহুদূরস্থিত নিজেদের দেশ, স্বজন ও গ্রামের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু গ্রামে কি আর কেউই বেঁচে আছে? অথবা সে আর কোনদিন ফিরে যেতে পারবে?

রোপট্রিক

যাদুকর পি. সি. সরকার

একদা ভারতের স্বর্ণযুগে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এমন বিদ্যা ছিল না, যাহা নিষ্ঠা সহকারে অধীত বা আলোচিত না হইত। সে ছিল ভারতের জাগরণ-যুগ! তারপর পতনযুগের এক অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে ভারতের সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রবাহে ভাঁটা ধরিল। জ্ঞানচর্চ্চা লোপ পাইল। সব কিছুকে গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি জাগিল এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া নিবদ্ধ হইল বংশ বা গুরুপরম্পরার মধ্যে। সম্মানের সিংহাসন-চ্যুত অস্তিত্ব আজিও লক্ষ্যে পড়ে, তন্মধ্যে 'সম্মোহনবিদ্যা' ও 'ভারতীয় দড়ির খেলা বা 'রোপট্রিক' অন্যতম। পথের বেদিয়ারা নিছক অর্থোপার্জ্জনের উপায়-স্বরূপেই এমন অনেক জিনিসকে অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিল।

তুচ্ছ হইলেও, আমার আলোচ্য বিষয়টি হইতেই ভারতের সে যুগ ও এ যুগের উন্নতি-অবনতির কথঞ্চিৎ ধারণা করা সম্ভব হইবে। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে, বিশেষ করিয়া বয়স্কেরা বেদিয়াদের বহু আশ্চর্য্য যাদুর কথা

এই অদ্ভুত বাজি দেখাইত, এখনও দেখাইয়া থাকে। বাঁধা ষ্টেজের বালাই নাই। নিজে যাদুকর হইয়াও যখন ভাবি এই সকল নগণ্য উপেক্ষিত পথের বাজিকরদের কথা—শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মাথা নত হইয়া পড়ে তাহাদের কৃতিত্বের কাছে। এই ভারতীয় বাজিকরেরা যে-সকল খেলা দেখাইত, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ছিল 'দড়ির খেলা' বা 'রোপ ট্রিক'।

এই 'দড়ির খেলা'র বিবরণ বিভিন্ন স্থানে ভিন্নরূপে শুনা যায়। লণ্ডন যাদুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্ব্বতন সভাপতি উইল গোল্ডষ্টন সাহেবের মতে,—খোলা মাঠে বসিয়া যাদুকর একটি দড়ির এক প্রান্ত ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া মারে এবং ১৫ ফুট কখনও কখনও ২০।২৫ ফুট দড়ি শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তখন একটি ছোট বালক ঐ দড়ি বাহিয়া উপরে উঠে; পরমুহূর্ত্তে যাদুকরের নির্দ্দেশমাত্রে অদৃশ্য হইয়া যায়। এর পর দড়িটি মাটিতে পড়িয়া যায় এবং বালক নিকটস্থ ঝুড়ির ভিতর হইতে অথবা দূরে জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে।

পাশ্চাত্য দেশে এই খেলাটি লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়াছে। ভারতীয় বেদিয়াদের প্রদর্শিত 'দড়ির খেলা' ও-দেশবাসীদের নিকট আজিও একটা মহা সমস্যা হইয়াই রহিয়াছে। এই জন্যই উইল গোল্ডষ্টন সাহেব বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :—'এই খেলা উন্মুক্ত ময়দান ব্যতিরেকে রঙ্গমঞ্চে করাও অসম্ভব। এই খেলার উপযুক্ত কৌশল অদ্যাপি শিক্ষিত সভ্য সমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই।' তিনি তাঁহার যাদুকর জীবনের বহু দিনের লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা বিচার করিয়াও এ খেলার কৌশল নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

ইউরোপ ও আমেরিকায় এই খেলা লইয়া প্রচুর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কেহ বলেন 'রোপ ট্রিক' ভারতবাসীর অমূল্য সম্পদ এবং অনেকেই ইহা করিতে দেখিয়াছেন—আবার অপর দল ইহার অস্তিত্বকেই উড়াইয়া দেন এবং বলেন যে ইহা গল্প মাত্র।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের লিসনার পত্রিকাতে দেখা গেল,—

আগামী কল্য লণ্ডন, ম্যারিলিবোন রোডে অবস্থিত অক্সফোর্ড থিয়েটার গৃহে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ও ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আম্পহিল-এর সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইবে—পৃথিবীর বিখ্যাত যাদুকর ও সম্মোহকদিগকে এই সভায় আহ্বান করা যাইতেছে। বিলাতের প্রসিদ্ধ চক্ষুবিজ্ঞানবিশারদ লেঃ কর্ণেল আর, এইচ ইলিয়ট, লণ্ডন ম্যাজিক সার্কেলের 'অকাল্ট কমিটি'র সভাপতি মহোদয়, এই সভার উদ্যোগ করিয়াছেন—প্রতিপাদ্য বিষয় 'ভারতীয় দড়ির খেলা' বা রোপট্রিক সম্বন্ধে গবেষণা।

পরের পর দিন আবার সেই লিসনার পত্রিকাই দেখেন—

গতকল্য উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, ম্যাজিক সার্কেল 'চ্যালেঞ্জ' করিয়াছে, কেহ রোপট্রিক দেখাইতে পারিলে ৫০০ গিনি পুরস্কার দেওয়া হইবে। সভায় এই সম্বন্ধে আলোচনার সময় এস, ডব্লিউ ক্লার্ক নামক জনৈক অকাল্ট কমিটির সভ্য বলেন যে, এই খেলার কথা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইবন বাতুতা তাঁহার Volume of Travels-এ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক অকাল্ট কমিটির সভাপতি, লেঃ কর্ণেল আর, এইচ, ইলিয়ট সাহেব ইহাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে ডাঃ এডুইন স্মিথ, স্যার মাইকেল ওড়েয়ার, স্যার লিউনার্ড রোজার্স, স্যার ফ্রান্সিস গ্রিফিটস, প্রভৃতি সকলেই ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বক্তৃতা দেন। তাঁহারা কেহই এই খেলা দেখেন নাই—এবং বলেন, এই খেলা অন্য কেহ কখনও নিশ্চয়ই দেখেন নাই। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট হালিফ্যাক্স (লর্ড আরউইন) ও লর্ড মেষ্টন প্রভৃতিও সেই মত পোষণ করেন। এই খেলা "হয় নাই" (Not Proved) বলিয়া সভায় সিদ্ধান্ত হইল।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য রাখিবেন, সভার এক দিন পূর্ব্বে হইল ঘোষণা আর পরের দিনই সমস্ত প্রসিদ্ধ যাদুকর ও সম্মোহক উপস্থিত হইলেন এবং কেহই ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেন না!

ভারতীয় সৈন্য বিভাগের মেজর এল, এইচ, ব্রানসন তাঁহার ইণ্ডিয়ান কনজুরিং নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বহু বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন কিন্তু এমন একজন লোকও পান নাই, যিনি 'রোপট্রিক' দেখিয়াছেন। তিনি বলেন,—

'এই খেলা বাহিরে কখনও প্রদর্শিত হয় নাই। অর্থাৎ দড়ি ছুড়িয়া মারিবার পর কখনও উহা শূন্যে ঝুলিয়া থাকে নাই, তারপর উহা বাহিয়া কেহই উপরে উঠে নাই ও উপর হইতে অদৃশ্য হয় নাই। অদৃশ্য হইবার পর রক্তাক্ত খণ্ডিত দেহ লইয়া অথবা অন্যরূপে কেহই পুনরায় উপস্থিত হয় নাই।'

লণ্ডন যাদুকর সম্মিলনী আমাকে তাঁহাদের সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্ত সমিতির মুখপত্র *Magical Quarterly*তে প্রকাশিত হয় যে, মিষ্টার মারে 'রোপট্রিকে'র তথ্য জানিতে পারিয়াছেন—আগামী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহা দেখাইবেন। অথচ 'লণ্ডন ম্যাজিক সার্কেল', ১৯৩৪ জুন সংখ্যা Vol. 28, *Magic Circular* পত্রিকাতে "Exit—The Indian Rope Trick" বা "রোপট্রিক—বিদায়" শীর্ষক একটি বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল।

যাদুকর সম্মিলনী কেহই ইহা দেখেন নাই ও করিতে পারিবেন না এই ওজুহাতে 'রোপ ট্রিক'কে বিদায় দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিরূপে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল তাহা প্রমাণ করা যাইতেছে।

বিলাতের বিখ্যাত মনোবিদ্ পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আলেকজান্দার ক্যানন কে-সি-এ, এম ডি, পিএইচ-ডি, এম-এ বলেন যে তিনি 'রোপ ট্রিক' স্বয়ং দেখিয়াছেন এবং তিনি নিজেও ইহা করিতে সক্ষম।

এতদ্ব্যতীত 'জিন্‌মার পত্রিকা'র ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ তারিখে উইম্বিলডন্‌-এর ফ্রান্সেস ডি ওডহাম্‌স্‌ সম্পাদকের নিকট লিখিয়াছেন,—

আমি বাল্যকালে আমার পিতার সহিত ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরে একটি বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময়ে একদিন এক-জন বেদিয়া আসিয়া এই 'ভারতীয় দড়ির খেলা' দেখাইয়াছিল। ইহা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি কিন্তু কি করিয়া উহা সংঘটিত হইয়াছিল, তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝি না।

বিলাতের 'চেল্‌টেনহাম' পত্রে ১৯৩০-এ ২৭শে জুন সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার "নিজস্ব সংবাদদাতা" লিখিয়াছেন যে, তিনি এই খেলা দেখিয়াছেন এবং দড়ি বাহিয়া একটি মেয়ে উপরে উঠিবার সময়ে ফটোও তুলিয়া লইয়া-ছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া 'ডেভেলপ' করিয়া দেখিলেন, মেয়েটির ফটো উহাতে নাই অথচ ফটো ঠিকমতই তোলা হইয়াছিল। এই মজার ফটোগ্রাফ সহ সংবাদটি 'ডেলি মেল' পত্রিকাতে ১৯৩৪এর মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের ধারণা ইহা সম্মোহন সাহায্যে করা হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডশায়ারের সর রাল্‌ফ পিয়ার্‌সন বলিয়াছেন,—

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পশ্চিম খন্দেশ জিলায় তিনি সেই সময়ে নির্ম্মিত তাপ্তীভেলী রেলপথের পার্শ্বে এই খেলা দেখিয়াছেন…যাদুকর চিৎকার করিয়া ও নানাভাবে হাত, পা, বুক চাপড়াইয়া একটি দড়ি উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে এবং উহা ভূমি হইতে দশ ফুট শূন্যে ঝুলিতে থাকে। তৎকালে একটি বালক উক্ত দড়ি বাহিয়া উপরের প্রান্তে উঠিয়া যায়।

তাঁহার স্ত্রীও ইতিপূর্ব্বে ঐ খেলা দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্লিমাউথ শহরনিবাসী মিষ্টার জর্জ্জ এস. ক্রিক্‌স্‌ বলেন যে তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসেন এবং চিলি জাহাজের ডেকের উপর জাহাজেরই একখণ্ড দড়ি দ্বারা একজন ভারতীয় কুলি ঐ খেলা দেখাইয়াছিল।

'করাচী' ছদ্মনামে জনৈক যাদুকর বিলাতের প্লিমাউথ, ডেভেনপোর্ট প্রভৃতি স্থানে এই খেলা দেখাইয়াছেন। 'করাচী' ১৯৩৫ সালে ৩০শে জানুয়ারী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—

বহু বৎসর পূর্ব্বে একজন বৃদ্ধ সৈন্যকে মৃত্যুমুখে বহু পরিচর্য্যা করাতে সে আমাকে এই খেলার কৌশলটি শিখায়, সে আমাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে শপথ করাইয়াছে যে, বিশেষ না ঠেকিলে কখনও লাভের প্রত্যাশায় আমি ইহা করিতে পারিব না। আমি এই খেলা দেখাইব, বিলাতের ম্যাজিসিয়ান ক্লাবকে আমি 'চ্যালেঞ্জ' করিতেছি। বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের টাকা তৃতীয় পক্ষের হাতে জমা রাখা হউক, আমি ইহা দেখাইব।

তারপর 'করাচী' (আর্থার ক্লড ডার্বির স্টেজ-নাম) এই খেলা দেখাইয়া পুরস্কার দাবী করেন কিন্তু 'ম্যাজিক সার্কেল' হইতে প্রত্যাখ্যাত হন। কেহ বলেন যে, 'করাচী' করাচীর 'রোপট্রিক'টি 'দৃষ্টিভ্রম' দ্বারা করা হয় নাই, 'ট্রিক' দ্বারা করা হইয়াছে—কাজেই পুরস্কারের টাকা পাইবে না। কিন্তু বক্তব্য এই যে 'রোপট্রিক' কথাটিতেই 'ট্রিক' কথাটি রহিয়াছে, কাজেই 'ট্রিক' করিয়া করিলে ক্ষতি কি?

অপরাপর বিখ্যাত যাদুকরদিগের মধ্যে যাহারা 'রোপট্রিক' করিতে সক্ষম বলিয়া দাবী করিয়াছেন তন্মধ্যে বিলাতের যাদুকর সম্মিলনীর সভাপতি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর 'হরেস গোল্ডিন' সাহেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৬ তারিখের বিলাতের ডেলি স্কেচ পত্রিকায় প্রকাশ যে ভারতীয় দড়ির খেলা অবশেষে করা হইল (Indian Rope Trick done at last)! ইহার পর ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে লণ্ডন যাদুকর সম্মিলনীর সভাপতি হরেস গোল্ডিন স্বয়ং বার্ম্মিংহাম হইতে আমার নিকট পত্র লিখেন এবং তাঁহার কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠান। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন,—

আমার সমগ্র জীবনের সাধ ছিল যে আমি রোপট্রিক করিব এবং এই খেলাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত ১,০০০ পাউণ্ডেরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন রেঙ্গুনে ছিলাম তখন একজন যোগীর সাক্ষাৎ পাই—সেই যোগী পা উপরের দিকে দিয়া এবং মস্তক নীচের দিকে রাখিয়া সাধনা করিতেন। পরে তিনি জানিতে পারেন যে উক্ত সাধু 'রোপট্রিক' করিতে জানেন এবং উহা তাঁহার ধর্ম্মের ও পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট। আমি যোগীর নিকট যাইয়া কথা বলি—কিন্তু তিনি কোন উত্তরই দেন না। তৎক্ষণাৎ যোগীর একদল শিষ্য আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং ছোরা দেখাইয়া বলিল যে যোগীর সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তখন আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হই কিন্তু খেলার মূল কৌশল সমাধানে চেষ্টিত থাকি। ইহার পর আমি উক্ত যোগীর জনৈক শিষ্যকে ঘুষ দিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পাই। তিনি কিছুতেই খেলার কৌশল প্রকাশ করিতে চাহেন নাই কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এমন কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহা হইতে আমি খেলার কৌশল বুঝিতে পারি। সেদিন হইতে পরীক্ষা করিতে করিতে আজ আমি রোপট্রিক করিতে সক্ষম হইয়াছি।

যাদুকর হোরেস গোল্ডিন ইহার পর বিলাতের অনেক স্থানে 'ফকির করিম দাখিলা' নাম লইয়া এই খেলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিলাতের মিষ্টার ম্যাজিক সার্কেলের সভ্য প্রিন্স বারহাম খাঁন বলেন যে তিনি নিজেও 'রোপট্রিক' দেখাইতে সক্ষম এবং একথা বহু পূর্ব্বেই তদ্দেশীয় সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমেরিকার যাদুকর গিবসন সাহেবও বিলাতের যাদুকর ক্রফোর্ড কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উপায় তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রবার্ট হেল্লার সাহেব সেন্টপলে এই খেলা দেখাইয়াছেন। জার্ম্মানীতে আবুনসের প্রদর্শিত খেলা যাহা Berliner Illustrate Zeitung পত্রিকাতে Steinscheider অর্থাৎ

দড়ির খেলা'। ইহার পর বিখ্যাত জার্মান যাদুকর Herr Tonessen সাহেব এই খেলা দেখাইয়াছেন।

এই যাদুকরের প্রদর্শিত ধারাবাহিক ছবি পৃথিবীর নানা-দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতের *Sketch* পত্রিকাতে পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী এক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে একজন বালক দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াছে।

এই রোপট্রিকের আরও নানারূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বেলজিয়ামের 'Psychology Foundation'-এর সুপ্রসিদ্ধ মনোবিদ্ এলসার ই নোয়েলস্ এই খেলার অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন এবং ইহার কৌশল বর্ণনা করিয়াছেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বরচিত আত্মজীবনীতে এই খেলার অন্য এক প্রকার বিবরণ দিয়াছেন। একবার জাহাঙ্গীরের দরবারে একদল বাঙ্গালী যাদুকর খেলা প্রদর্শনের জন্য আসেন এবং তাঁহারা এই 'দড়ির খেলা' বাদেও আরও বহু অত্যাশ্চর্য্য যাদুর কৌশল দেখাইয়া যান এরূপ বর্ণনা উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার রচিত বেদান্তসূত্রের টীকায় পৃথিবী, মায়া প্রভৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া শুধু এই খেলার বিবরণ উদ্ধৃত করেন নাই, পক্ষান্তরে উহার একটি প্রণালীও বর্ণনা করিয়াছেন।

Twentieth Century পত্রিকাতে প্রফেসর নিকোলাস রোএরিক মাক্সিম গোর্কী সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেখানে গোর্কী ভারতীয় দড়ির খেলা আংশিকভাবে দেখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

ভারতীয়গণ বাস্তবিকই মহৎ। আমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কেই বলিতেছি। ককেশাসে একবার একজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়—তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অত্যাশ্চর্য্য গুজব শুনা যাইতেছিল। সে সব শুনিয়া আমি অবিশ্বাসই করিয়াছিলাম কিন্তু অবশেষে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি। সে একটি লম্বা সূতা লইয়া উপর দিকে হাওয়ায় ছুড়িয়া দিল, আমরা অবাক হইলাম যে উহা শূন্য আকাশ হইতে ঝুলিতে লাগিল···

পূর্ব্বোক্ত বিবরণসমূহ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিলাতের যাদুকর সম্মিলনী যে 'রোপ-টি্ক'কে বিদায় দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতীয় দড়ির খেলা আদৌ দেখান হয় নাই, ইহাও সত্য নহে। 'ভারতীয় দড়ির খেলাটি' 'রোপট্রিক' নামে জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। হয়ত বর্ত্তমানের যাদুকরদের মধ্যে উহার মূল কৌশল-জানা লোকের অভাব আছে। কিন্তু যাদুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা গোল্ডষ্টোন সাহেব যে বলিয়াছেন, এই খেলা রঙ্গমঞ্চেও অসম্ভব—ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

'ভারতীয় দড়ির খেলা',—পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত অদ্ভুত খেলাসমূহের অনুরূপ একটি খেলা মাত্র। প্রত্যেকটি বড় খেলার কৌশল অতি সহজ, ভারতীয় দড়ির খেলার মূল কৌশলও নিশ্চয়ই অত্যন্ত সহজ। কিন্তু পর্য্যটকেরা এই খেলাকে গল্পস্থলে বলিতে বলিতে অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। গুজবের ক্ষেত্রে যেমন একটি সাধারণ ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ আকার ধারণ করিয়া উঠে, সেই ভাবে রোপট্রিকের বিবরণও অতিরঞ্জিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের রূপকথাতেই স্বর্গ-মর্ত্ত্যের যোগাযোগ সম্পর্কে নানা ঘটনা শুনা যায়। কাজেই উপরে উৎক্ষিপ্ত দড়ি বাহিয়া স্বর্গে যাওয়া, ইন্দ্রের রাজসভায় যুদ্ধ করা প্রভৃতি কাহিনীর প্রচলন হওয়াও বিচিত্র নহে।

শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

শুভঙ্করী।—পঞ্চাননবাবু শুভঙ্করী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে 'শিশুবোধক' ছিল। 'শিশুবোধক' দেখি নাই। প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে শিশুবোধকের একটি পাতা ছিল—তাহা দেখিয়াছি। তাহারও পূর্ব্বে 'শিশুবোধ' ছিল শুনিয়াছি। শুভঙ্কর 'শুভঙ্করী' বলিয়া কোনও পুস্তক লিখিয়াছিলেন কিনা জানা নাই। শুভঙ্কর 'কাগজসার' পুস্তক লিখিয়াছিলেন। 'কাগজসার' পুঁথি পাইয়াছি। শুভঙ্করের আর্য্যার পুঁথি এবং খাতা পাঁচ-ছয়খানি পাইয়াছি। একটিতেও 'শুভঙ্করী' বলিয়া লেখা নাই। প্রত্যেকটিতেই 'আর্য্যা লিখ্যতে' আছে। তখনকার পাঠশালার পণ্ডিতগণ শুভঙ্করের আর্য্যা সংগ্রহ করিতেন —খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। হয়ত তাঁহারা ঐ খাতাকে শুভঙ্করী বলিতেন। পঞ্চাননবাবুর 'শুভঙ্করী'র আর্য্যার সহিত প্রাচীন পুঁথি এবং খাতার আর্য্যা মিলাইয়া দেখিয়াছি। একটিও মিলে না। পঞ্চাননবাবুর 'শুভঙ্করী'তে শুভঙ্করের আর্য্যা নাই বলিলেই হয়। যাহা আছে তাহা অপরের রচনা।

আর্য্যা-লেখক।—শুভঙ্করের পূর্ব্বে কেহ আর্য্যা লিখিয়াছিলেন কিনা জানি না। বরজমাপের একটি ডাকবাক্য পাইতেছি। শুভঙ্করের পরে অনেকে আর্য্যা লিখিয়াছিলেন। নিম্নলিখিতগণের আর্য্যা পাইয়াছি—

নাম	আর্য্যা সংখ্যা	নাম	আর্য্যা সংখ্যা
১। ভৃগুরাম দাস—	৮	১৩। জনমিথি—	১
২। বিশেষর দাস—	৩	১৪। ফকিররাম দাস—	১

৩। শিবচরণ দাস—	২	১৫। রামানন্দ—	১
৪। গোবিন্দরাম—	৪	১৬। মহাদেব—	১
৫। নবীনমোহন—	৪	১৭। ভূষণ—	১
৬। চিন্তামণি—	২	১৮। ভুবনমোহন	১
৭। পেলারাম দাস—	১	১৯। নারায়ণ—	১
৮। ডাক—	১	২০। হরেকৃষ্ণ দাস—	১
৯। শ্রীহেমন্ত দাসী—	১	২১। জয়রাম—	১
১০। ধূলদত্তি—	১	২২। বিজয়রাম—১+(স্যাখত)	
১১। সদাশিব দত্ত—	১	২৩। রাম—	১
১২। দত্ত রঘুনাথ—	২	২৪। শুভঙ্করের শীষ—	১

আর্য্যা চুরি।—ইহাদের মধ্যে অনেকে শুভঙ্করের আর্য্যা চুরি করিয়াছিলেন।

শুভঙ্কর ও ভৃগুরাম।—'শুভঙ্কর'—উপাধি, একথার কোনও হেতু নাই। দেড় শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন একখানি পুঁথির আর্য্যাতে 'শুভঙ্কর সেন' ভণিতা আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাসিক বসুমতীর প্রবন্ধে একখানি শুভঙ্করের পরিচয়-পত্রের কথা পড়িয়াছিলাম। যত দূর মনে আছে উহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্কুল-পাঠ্য অঙ্কপুস্তক প্রণেতাগণ সকলেই শুভঙ্করের নাম ভৃগুরাম বলিয়াছেন। ভৃগুরাম নামক একজন আর্য্যা-লেখক ছিলেন। তিনি কোনও রাজার আমিন ছিলেন। একটি অঙ্ক আছে।—

অকস্মাৎ সৈন্যতে ভাঙ্গিল সর্ব্বগ্রাম।
নিজ গ্রামে আমিন আইল ভৃগুরাম।
গ্রামের কাগজ নাই শুনিয়া খাঁকর।
বহুদিন নিবাসী আছয়ে অনুচর।
গ্রামের সন্ধান সব চয়েতে কহিল।
রাজার আমিন তবে কাগজ করিল। ইত্যাদি।

কিন্তু তিনি বাঁকুড়াবাসী ছিলেন না। তাঁহার কোনও আর্য্যায় 'পাই' 'কোনা' ইত্যাদির উল্লেখ নাই। একই আর্য্যা—'শুভঙ্কর' ভণিতায় একরূপ ও 'ভৃগুরাম-ভণিতায়' অন্যরূপ দেখা যায়।

শুভঙ্করের আর্য্যা—

হার বিশের লেখা বলি শুন শিশুগণে।
আড়িতে যত পাই হয় হারের ধরনে।
কুড়ি হার মাপিলে এক বিণি হয়।
ইবে কিছু কহি শুন লেখার নির্ণয়।
যত বিণি মাপিবে হার তার গড়া।
যত পাই তত সলি না লইবে বাড়া।
কোনা প্রতি পাঁচ পাই চৌঠিতে পাঁচ কোনা।
মৌটি প্রতি পাঁচ চৌঠি লেখা কর জানা।
দমন প্রতি পাঁচ মৌটি শুন শিশুগণে।
হার বিশের লেখা এই শুভঙ্কর ভণে।

ভৃগুরামের আর্য্যা—

হার বরাতের কথা শুন শিশুগণ।
যত বিশ হয় তাহা করিবে লিখন।
হারি যত সের হয় বিশ প্রতি সজি।
পুরা প্রতি পাক সের বড় করি বজি।

ছটাক থাকিলে তাহে লবে দুয়া সের।
ভৃগুরাম দাস কহে ভেজে গেল ফের।

শুভঙ্করের 'অষ্টকোঠা বর্ণন' আছে। ভৃগুরাম মাত্র দুই একটি কোঠার পাতন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন।

শুভঙ্করের বড়কোঠা :—

পক্ষ ঋষি রত্নাকর অঙ্ক ইহ তার।
ডাহিনেতে নেত্র চোক আছয়ে তথায়।
বড় কোঠার অঙ্ক হয় শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার বদন দিয়া করহ পূরণ।

ভৃগুরামের বড়কোঠা :—

গজ পক্ষম বেদহ সাথে।
চন্দ্রহ নেত্রহ ভাগহ তাথে।
ইহাতে বড় কোঠা জানহ জাম।
অনুভাবে ভাবিত দাস ভৃগুরাম।

শুভঙ্কর অঙ্ক লিখিয়াছেন, ভৃগুরাম সে অঙ্কের উত্তর করিয়াছেন। শুভঙ্করের অঙ্ক :—

সত্যযুগে কপিল মুনি হৈল পাতালবাসী।
বার শত বাহাত্তোরি সঙ্গে লয়া দাসী।
স্নান করিবারে ঋষি করিল পয়ান।
ঋষি প্রতি সহস্রেক শিষ্যের যোগান।
ঋষি প্রতি দিন এক হরিতকি খায়।
শিষ্য প্রতি চৌউখাই হরিতকি পায়।
চারি যুগে কত হয় লেখা করি বল।
শুভঙ্কর বলে বুঝ ছাওয়াল সকল।

ভৃগুরামের উত্তর :—

দুই লক্ষ ষোল হাজার যতনে রাখিবে।
ইন্দ্রজিতা তার হাতে তাহাকে পুরিবে।
ইহাতে চারি যুগের বৎসর।
তিন শত বিশ দিয়া পূরহ সত্বর।
বার লক্ষ বাহাত্তোরি হাজার পুরি জাম।
শিশুগণ বুঝি কহ বাদণ ভৃগুরাম।

শুভঙ্করের বাসস্থান।—শুভঙ্কর বাঁকুড়াবাসী ছিলেন। বাঁকুড়ায় শুভঙ্করের দাঁড়া আছে। বাঁকুড়া ছাড়া অন্য কোথাও পাই, কোনা ইত্যাদি মাপের প্রচলন নাই। শুভঙ্কর ছাড়া অন্য কাহারও আর্য্যায় পাই, কোনা ইত্যাদির উল্লেখ নাই। একমাত্র ধান্যের লেখায়ই শুভঙ্করের ১২টা আর্য্যা আছে। পঞ্চাননবাবু বাঁকুড়ায় বসিয়া 'শুভঙ্করী' লেখেন নাই। শুভঙ্করের 'ধান্যের লেখা'র কথা তিনি জানিতে পারেন নাই। অনেকের মতে পলাশডাঙ্গার নিকট পথরা গ্রাম ছিল তাঁহার বাসস্থান। আবার অনেকে বলেন তিনি হদল নারায়ণপুরের নিকট রামপুর গ্রামে বাস করিতেন।

শুভঙ্করের কাল।—আর্য্যার দুই-একটি বিশেষ শব্দ ধরিয়াই শুভঙ্করকে অতিবৃদ্ধের কোঠায় ফেলা যায় না। প্রবাদ—তিনি বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে রত্নন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা'র কথা লিখিয়াছি। রত্নন

কবিরাজ গোপাল সিংহের কালের লোক। তিনি বলিয়াছেন—'আইলেন ভাস্কর: খবর কহে শুভঙ্কর।' বাঁকুড়া কালেক্টরীর রোবকারীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তিনি যে রাজকর্মচারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অঙ্ক :—

নৃপতি সহিতে শুভঙ্কর গেল মৃগয়া করিতে।
হেন কালে পুষ্করিণী দেখে আচম্বিতে।
পুষ্করিণীর ষোল যোজন ধনু দুই ষোল জল।
জলের মধ্যে মৎস্য করে কলবল।
অর্দ্ধ অঙ্গুলি ছাড়া মৎস্য নাচিতে লাগিল।
রাজা বলে শুভঙ্কর কত মৎস্য হৈল। ইত্যাদি

বর্গী হাঙ্গামা সম্বন্ধে শুভঙ্করের অভিজ্ঞতারও পরিচয় আছে :—

অঙ্ক :

সাগর ঘোষ নামে এক গোয়ালা আছিল।
দৈবের কারণে বর্গী আসিয়া পড়িল।
সর্ব্বস্ব লইল গোপের না লইল গাই।
সাত ভাই মধ্যে তার রহিল তিন ভাই।
কনিষ্ঠ চারি ভাইকে বর্গী বাঁধি লয়া গেল।
কথোদিনে তিন ভেয়ে পৃথক হইল। ইত্যাদি

ইহা রতন কবিরাজের উক্তি সমর্থন করিতেছে।

শুভঙ্করের আর্য্যা।—প্রাচীন পুঁথিতে শুভঙ্করের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আর্য্যা পাওয়া গিয়াছে :—

তেরিজ ধরণ, জমা খরচ, কাজিল ধরণ, হরণ পূরণ, কড়াভাঙ্গানী, আনার কড়ি, পাকাগণ্ডার ধরণ, টাকা কেন করিবার ক্রম, ভগ্নিতের লেখা, ধান্যের লেখা, হারবিষের লেখা, হারমিশ গেছে হারবসা, বেণমোক্রাহারবিশ, ধান্য কচিবার ক্রম, ভাচাধান্য খুয়া দিবার বিবরণ, টাকার দরে আনার ধান্য, তঙ্কা দরে গণ্ডার ধান্য, সেরের কড়ি, টাকায় পণ দরে আটার দাম, ছটাকের লেখা, কারবারী লেখা, রতির আর্য্যা, বিরাশি সিক্কার মত, তৌলের লেখা, আনার লেখা মণকরা, মণকরা পাকাগণ্ডা, পশুরিকরা আনা দর, মণকরা তঙ্কাদরে আনার জিনিষ, সেরের লেখা, মণেতে যতেক তঙ্কা তার সেরে পড়ে কত, মণেতে যতেক তঙ্কা তার পুয়াতে পড়ে কত, মণেতে যতেক তঙ্কা তার ছটাকে পড়ে কত, মণেতে যতেক তঙ্কা তার তোলাতে পড়ে কত, তঙ্কাকে যতেক মণ তার মাসাতে পড়ে কত, পুয়ার দাম সেরকরা, সেরে যতেক তঙ্কা তার পুয়াতে পড়ে কত, ছটাকের দাম সের করা, তোলার দাম সের করা, বাহাত্তরী সিক্কার মত, পণদরে ছটাকের দাম, তঙ্কাদরে সিক্কার জিনিষ সের করা, মণদরে তঙ্কা প্রতি আধপুয়ার দাম, টাকা মণ করা, টাকা সের করা, আনার জিনিষের লেখা মোকরা, পাকাগণ্ডার লেখা, আনার লেখা সেরকরা, মোক্রা মণকরা, সোনা কেন, মোহরের লেখা, শয়রতির কাত রতির দাম, সোনা কেনা মোহর, রতিব কাত মাসা পডে কত, রতির কাত ধানে পড়ে কত, ছিয়ানব্বই রতির কাত রতির দাম, সোনার রতির আর এক মত, রূপার লেখা, রূপার আনার দাম, আর একমত আনার দাম, রূপার রতির লেখা, তামা কাঁসার লেখা, তামা কাঁসা পিতল, সের প্রতি আনা দরে ছটাকের দাম, রাজ্‌ খাপ্‌রা তঙ্কা দরে আনা প্রতি, কাঠাকুড়া, এককাবলি, নলখাড়ি, পঞ্চবটিকাখড়ি, জমাবন্দী, মোকরা, বিঘার দাম, পুষ্করিণী মাপ, নৌকাকালি, বরূজাকালি, পানের লেখা, কাগজ কেনন, মাস মাহিনা, বৎসর মাহিনা, বাট্টাকসা, সুদকরা, আসল লাফা, মাথা অঙ্কের নাম, অষ্ট কোঠা, আউটী, বৃদ্ধআউটী, অতিবৃদ্ধ-আউটী, বাসবাসের জন্ম, মুনিমুনির জন্ম, চারি চারির জন্ম, পনের বাইশা, আউটীর জন্ম, যুগবানের জন্ম, বৃদ্ধ আউটির জন্ম, তুরাসর, অতিবৃদ্ধ আউটীর জন্ম, মণিকা-আউটী, পণকে আউটী, বটিকা আউটী, চৌদ্দ বাইশা, নবকোঠা, দ্বাদশকোঠা, ভাঙ্গানী, ইত্যাদি।

কাগজ সার।—শুভঙ্করের কাগজ সারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে :—

ওরথ্‌ প্রমাণ, মহলের স্থান, একাদশ মহল, একাদশ মহলের বিস্তার, মহল স্থাপন বিধি, প্রথম চারি মহলের এককাবলী; সাহেব নৃপ, সুবা, চাকলা, সরকার। পরগণা, তপা, ডিহি, আমলা, সিকদার, ইত্যাদির সংজ্ঞা; কাগজের স্থাথত, রোজনামা, মহসুলি, বাজেজমা, রোজনামা আধাস নগদক, আয় নগদ কাগজ প্রমাণ, তুর্কীস্থানী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় ছত্রিশ কারখানার নাম ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতে কর নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা

শ্রীশিশিরকুমার বসাক

রাজা প্রজার নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করেন তাহাই রাজকর। রাজ্যরক্ষাকার্যে এই রাজকরই তাঁহার প্রধান অবলম্বন কারণ প্রজাদিগের শিক্ষাদান, চিকিৎসা, বিচার, শাসন, বার্ত্তা-বহন, রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সকল কাজই উক্ত রাজকরের উপর নির্ভর করে, অধিকন্তু রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষাদি দেখা দিলে রাজার যে প্রচুর অর্থব্যয় হয় তাহাও এই রাজকরের উপর নির্ভর করে, সুতরাং এক দিকে যেমন প্রজাসাধারণেরই রাজাকে কর দেওয়া উচিত

অন্ত দিকেও তেমনি রাজা প্রজার উপর সুবিবেচনার সহিত এমন ভাবে কর স্থাপন করিবেন যেন প্রজার উহা দিতে কোনরূপ কষ্ট না হয়।

প্রাচীন ভারতে রাজকর নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে হইত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে নিয়ে তাহার আভাস দেওয়া গেল,—

বাণিজ্যদ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য তাহা কত দূর হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার উপর ভক্তাদিতে (খাই-খরচাদিতে) কত খরচ পড়িয়াছে, দস্যু-তস্কর হইতে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যে ব্যয় এবং ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, এই সকল হিসাব করিয়া বাণিজ্যদ্রব্যের উপর কর স্থাপন করা হইত।

মনুর মতে কোন প্রকারে মূলধনের অণুমাত্রও ক্ষতি না হয় এইরূপ ভাবে বৎসের দুগ্ধপানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায় অল্পে অল্পে প্রজাদের নিকট হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য।

মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে, কর নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম রাজা সর্ব্বার্থকুশল সচিব নিয়োগ করিবেন, তিনি রাষ্ট্রমধ্যে ক্রয়, বিক্রয়, পথ, ভক্ত (অন্ন অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য), পরিচ্ছদ (বস্ত্রাদি) ও যোগক্ষেম (বাণিজ্য-দ্রব্যের ভাটক অর্থাৎ ভাড়া ও খরিদ) দেখিয়া বণিকগণের প্রতি কর ধার্য্য করিবেন। উৎপত্তি, দানবৃত্তি, (কাটুতি ও ব্যবহার) এবং শিল্পকার্য্য দেখিয়া শিল্প ও শিল্পিগণের উপর কর নির্দ্ধারণ করিবেন। প্রজাগণ যাহাতে অবসন্ন না হয় সেইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা প্রজাদের উপর উচ্চনীচ কর সংস্থাপন করিবেন। রাজা প্রজাবর্গের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশরূপ যে বলি (রাজস্ব) প্রাপ্ত হন এবং শাস্ত্রানুসারে অপরাধিগণের দণ্ড ও পথিমধ্যে বণিকগণকে রক্ষার নিমিত্ত যে বেতন প্রাপ্ত হন তাহা দ্বারাই ধন সঞ্চয় করিবেন। রাজা এইরূপে ধান্যাদির ষষ্ঠাংশরূপ কর প্রজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন। ইহাতে যদি তাহাদের বার্ষিক আহার-যোগ্য ধান্যাদি অবশিষ্ট না থাকে তাহা হইলে তাহাদের আহারের উপায় করিয়া দিবেন।

বিভিন্ন দ্রব্যের করভাগ

স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু এবং রত্নাদি ব্যবসায়ের লভ্যফলের পঞ্চাশভাগ, ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণ-ব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ ও বৃক্ষ, মাংস, ঘৃত মধু, ঔষধি, গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষনির্য্যাস, ফলমূল এবং পুষ্প এই সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়লব্ধ অর্থের ষষ্ঠাংশ ; তৃণ, পত্র, শাক, মৃন্ময় পাত্র, বংশপাত্র, চর্ম্মপাত্র এবং পাথরের দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয়লব্ধ অর্থের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। খনিজ পদার্থ মাত্রেরই ব্যয় অবশিষ্ট হইতে অংশ গ্রহণ করা হইত, এই-রূপে স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ, রজতের তৃতীয়াংশ, তাম্রের চতুর্থাংশ, লৌহ, বঙ্গ ও সীসের ষষ্ঠাংশ, রত্নাদির অর্দ্ধ, ক্ষারের (লবণাদির) অর্দ্ধ ও কর্ষকাদির লাভানুসারে তিন, পাঁচ, সাত বা দশাংশ এবং তৃণ-কাষ্ঠাদি বাহকের নিকট হইতে বিংশতি অংশ ; অজা, মেষ, গো, মহিষী, অশ্বের বৃদ্ধির অষ্টমাংশ এবং মহিষী, অজা, মেষী ও গবীর দুগ্ধের ষোড়শাংশ রাজার প্রাপ্য।

ভূমিকর

কৃষকেরা করভারে পীড়িত হইয়া যাহাতে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে তদ্বিষয়ে রাজার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তৎকালে প্রথমে বহুফলা মধ্যফলা বা অল্পফলা ও ভূমির পরিমাণাদি জ্ঞাত হইয়া পরে রাজা শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতেন। কর্ষক (কৃষক) যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই ভাবে তাহার নিকট হইতে কর লওয়া হইত। বহু, মধ্য ও অল্প ফলানুসারে তারতম্য দেখিয়া যাহাতে কৃষিকার্য্য হইতে রাজভাগাদি দিয়া দ্বিগুণ লাভ হয়, সেইরূপ কৃষি শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা হীন কৃষি দুঃখকর। কৃষিকার্য্যের উপযোগী জমিতে জল-সেচের জন্য তড়াগ-বাপিকা, কূপ-মাতৃক ও নদনদীবহুল দেশ হইতে তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধাংশ এবং অনুর্ব্বর পাষাণাদিসমাকুল দেশ হইতে ষষ্ঠাংশ লওয়া হইত—শুক্রনীতি হইতে এরূপ জানা যায়।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক

স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে তদনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক (মাশুল) লওয়া হইত। ইহাই রপ্তানি মাশুল। পরদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে উহার মূল্যের বিশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক (মাশুল) লওয়া হইত, ইহাই আমদানি মাশুল। আপণিকের (ব্যবসায়ীর) নিকট হইতে পণ্য-স্থানের কর এবং পথিকের নিকট পথ সংস্কার ও রক্ষার জন্য পথকর লওয়া হইত।

লাভ বা মুনাফা-কর

সর্ব্বপণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দ্রব্যের মূল্য ঠিক করিয়া দিতেন। রাজাও তাহার বিশ ভাগের একভাগ শুল্ক গ্রহণ করিতেন। বিক্রেতা ও ক্রেতার নিকট হইতে রাজ-প্রাপ্য অংশকে শুল্ক কহে, তৎকালে শুল্ক গ্রহণ স্থান, হট্টমার্গ ও শুল্কসীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিত। বস্তুজাতের একবার মাত্র শুল্ক গ্রহণ করা হইত, ছলপূর্ব্বক বারংবার গ্রহণ করা হইত না। বিক্রেতা ও ক্রেতার নিকট হইতে মূল্যের বিরোধ না হয় এভাবে দ্বাত্রিংশ, বিংশাংশ ও ষোড়শাংশ শুল্ক লওয়া হইত। বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত মূল্যাপেক্ষা কমই হউক বা ক্রীত মূল্যের সমানই হউক

এরূপ মূল্যাপেক্ষী শুল্ক লওয়া হইত না, লাভ দেখিয়া রাজা ক্রেতার নিকট হইতে শুল্ক লইতেন।

অল্পকর ও নিষ্কর

সামান্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, অতি সামান্য অবস্থাযুক্ত প্রজার নিকট হইতেও বার্ষিক কর-স্বরূপ যৎসামান্য গ্রহণ করা হইত। বিষ্ণুসংহিতা হইতে এরূপ জানা যায় যে, কারুশিল্পী ও শূদ্র প্রভৃতি যাহারা কেবল মাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা করের পরিবর্ত্তে প্রতি মাসে এক দিন রাজকার্য্য করিয়া দিত। রাজা ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন না; কারণ তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজে যে-ধর্ম্ম আচরণ করেন তাহার কতক অংশ রাজা প্রাপ্ত হন।

অন্ধ, জড়, কুব্জ, সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ এবং ধন-ধান্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সর্ব্বদা উপকার করেন, তাহাদের নিকট রাজা কোন কর লইতেন না, শুক্রনীতিতে আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা রাজ্যবৃদ্ধির জন্য তড়াগ, বাপিকা, কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিত, যাহারা নবোত্থিত ভূমি কর্ষণ করিয়া উর্ব্বরা করে, অথবা এইরূপ অন্যান্য হিতকর কার্য্য করে, তাহারা ব্যয়ের দ্বিগুণ লাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে রাজকর লওয়া হইত না। পরিবারের প্রয়োজনানুরূপ গবাদির দুগ্ধ এবং ধান্য-বস্ত্রাদি ক্রেতার নিকট হইতে রাজা কর লইতেন না।

কর আদায়ে ও অনাদায়ে দণ্ডনীয়

রাজা প্রতি কর্ষককে ভাগপত্র (রাজাংশের লেখ্য বা পাট্টা) দিতেন, অথবা গ্রাম ও ভূভাগ নিরূপণ করিয়া একজন ধনিকের নিকট জামিন বা তৎসম ধন গ্রহণ করিতেন, অথবা প্রতি মাসে, প্রতি ঋতুতে বিভাগক্রমে উক্ত গ্রাম ও ভূমির রাজস্ব আদায় করিয়া লইতেন। রাজা প্রজার নিকট ষোড়শাংশ, দ্বাদশাংশ, দশাংশ বা অষ্টাংশ যেরূপ অংশই গ্রহণ করিতেন সেই রাজ্যাংশের ষষ্ঠাংশ বেতন দিয়া গ্রামপালক অধিকারী নিযুক্ত করিতেন।

নৌশুল্ক নির্দ্ধারণ

নৌভাড়াদির নির্দ্ধারণ এখন যেমন রাজাই করিয়া থাকেন পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল। রাজা নদী পার হইবার জন্য নৌশুল্ক নিরূপণ ও নৌকায় যাতায়াতের বিধি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। মনুসংহিতা হইতে তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়, যথা :—

১। রিক্ত (খালি) শকটাদি পারের মাশুল এক পণ লাগিত।

২। একজন পুরুষে বহনযোগ্য ভারে অর্দ্ধপণ দিতে হইত।

৩। পশু এবং স্ত্রীলোক পার করিতে চতুর্থাংশ পণ দিতে হইত।

৪। ভারশূন্য মানুষ পার করিতে পণের অষ্টমাংশ শুল্ক দিতে হইত।

৫। দ্রব্যপূর্ণ যান সকল পার করিতে হইলে, দ্রব্যের গুণাগুণ অনুসারে শুল্ক দিতে হইত।

৬। দ্রব্য রহিত গুণ (চটের বস্তা), ভোল প্রভৃতি খালি ভারের যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করা হইত।

৭। পরিচ্ছদবিহীন পুরুষকে পার করিতে হইলেও যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হইত।

৮। জলপথে দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা এবং গ্রীষ্মাদি কাল বিবেচনায় তর-মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইত। বর্ত্তমানেও পূর্ব্বের ন্যায় নদনদী ও খালবিলাদিবিশেষে কোন কোন স্থানে মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা আছে।

৯। সমুদ্রে সে নিয়ম চলে না, তাহার পণ্য বুঝিয়া সম্ভবমত গ্রহণ করা হইত।

১০। দ্বিমাস বা তদূর্দ্ধকালের গর্ভিণী স্ত্রী, পরিব্রাজক, ভিক্ষু, বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণদের পারাপারে তর-পণ্য (পার হইবার মূল্য) গ্রহণ করা হইত না।

১১। নাবিকের দোষে নৌকারোহীদের দ্রব্য নষ্ট হইলে নৌকাস্থিত নাবিকেরা মিলিয়া নিজ নিজ অংশ হইতে ঐ ক্ষতি পূরণ করিয়া দিত, কিন্তু দৈববিপাকে নষ্ট হইলে নাবিকেরা তজ্জন্য দায়ী থাকিত না।

আমোদ-কর

বর্ত্তমানের ন্যায় হিন্দু রাজত্বের আমলেও দেশের আমোদ-প্রমোদাদি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তখন উহাদের আয়ের $\frac{1}{5}$ ভাগ Amusement Tax স্বরূপ রাষ্ট্র গ্রহণ করিত। দ্যূতক্রীড়া ও গণিকা-গমনেও রাষ্ট্রের এইরূপ তীক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। দ্যূতক্রীড়াদি অধ্যক্ষ দ্বারা নিরূপিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও হইতে পারিত না ও ইহাদের আয়ের শতকরা পাঁচ টাকা রাজ-কর হিসাবে পাইত; গণিকাদের তত্ত্বাবধায়ককে। (Superintendent of prostitutes) তাহাদের দৈনিক ভোগ (fees) এবং যে-সকল পুরুষ গমন করিত তাহাদের নাম ধাম জানাইতে হইত; তাহাদের আয়ের $\frac{1}{5}$ ভাগ রাজ-সরকারের দিতে হইত—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে এরূপ জানা যায়।

ষষ্ঠাধিকৃত—যাঁহারা রাজপ্রাপ্য ধান্যাদির ষষ্ঠভাগ আহরণ বা আদায় করিতেন সেই 'ভাগহার'দিগের নায়ককে ষষ্ঠাধিকৃত পুরুষ বলিত।

শৌল্কিক—শৌল্কিক বা শুল্কাধ্যক্ষ (Superintendent

of tolls) প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রে বর্ণিত একজন প্রধান রাজপুরুষ। রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র যাহারা পণ্যবাহী বণিকগণ হইতে রাজার প্রাপ্য শুল্ক আদায় করে, তাহাদের উপর অধ্যক্ষতার কাজ যিনি করেন তাঁহাকেই শৌল্কিক বলা হইত। কোন্ পণ্য শুল্ক দিয়া রাজ্য-সীমান্ত পার হয়, কোন্ পণ্য শুল্ক ছাড়া চলে তৎসম্বন্ধে সকল ব্যবস্থা তিনিই করিতেন। কোন্ দ্রব্যের উপর কত হারে শুল্ক বসিবে তাহাও তিনি নির্দ্ধারণ করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানেই রাষ্ট্রের পক্ষে অনিষ্টকর এমন কোন দ্রব্য রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না এবং রাষ্ট্রের যে-কোন মহোপকারী দ্রব্য বিনা শুল্কে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত। এইরূপ আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্কের ব্যবহার এই রাজ-পুরুষের আয়ত্তে ছিল, শুল্ক দানে ত্রুটি হইলে জরিমানা হইত এবং ইহার সূক্ষ্ম বিচারের ভারও ছিল উক্ত শুল্কাধ্যক্ষের উপর।

"দাসী"

শ্রীশান্তা দেবী

জালালপুরে "দাসাশ্রম" প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে কলিকাতায় 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহারই আট মাস পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' প্রকাশ করেন। 'সাধনা'র উদ্দেশ্য ছিল নিছক সাহিত্য-সাধনা, 'দাসী'র উদ্দেশ্য ছিল জনসেবা। 'দাসাশ্রমে'র সেবক আর সেবিকারা নিজেদের 'দাস' ও 'দাসী' বলিতেন। জনহিতৈষণা প্রবর্ত্তন, দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য সভা-পতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই জনহিতৈষণা-বিষয়িণী পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। দাসী'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ছিল মাত্র এক টাকা। কাগজটি ইংরেজী মাসের ২১শে প্রকাশিত হইত। গ্রাহকেরা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বহুকাল ফেলিয়া রাখিতেন, তাগিদ দিয়া আদায় করিতে হইত। 'দাসী'র ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা থাকিত সমস্ত আয়ই সম্পাদক দাসাশ্রমে দিতেন।

যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধের কৃতিত্ব ও বীরত্ব যেমন তার একলার নয়, তেমনি আতুরের সেবা যিনি স্বহস্তে করেন সেবার কৃতিত্ব শুধু তাঁর একলার নয়।

'দাসী'র সূচনার পূর্ব্বেই রামানন্দ মানবসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ জীবিকার ব্যবস্থা হইবার আগেই জনহিতের নানা কল্পনা ও কাজ তাঁহাকে দিবারাত্রি মাতাইয়া রাখিত। একটি কোন আশ্রম কিম্বা 'কুলি সংরক্ষিণী সভা' খুলিবার ইচ্ছা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসম্বল অবস্থাতেই তাঁর মনে ঘুরিতেছিল। কাজে কাজে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া একটু আনন্দের আশায় মন বালিকা-পল্লীর সান্নিধ্য চাহিত কিন্তু অর্থাভাবে যখন তাঁকে আনা সম্ভব হইত না তখন ক্লান্ত শরীরে ডায়রীতে লিখিতেন :—

"মনে হল সেবাব্রতের ক্লান্তি ও কষ্ট সহিতে সমর্থ করিবার জন্য পিতা দাম্পত্য সুখ দিয়াছেন। একত্রে থাকার সুখ কল্পনা করিলাম। অমনি একটি অনাথ নিবাস কিম্বা দরিদ্র ছাত্রাবাস খুলিবার ইচ্ছা জন্মিল।"

কলিকাতায় দাসাশ্রম প্রথম দিকে পতিতা রমণীদের কন্যাদের উদ্ধারের ভারও গ্রহণ করেন। তাঁরা স্থির করেন এই রকম কয়েকটি বালিকাকে সেখানে রাখিয়া নানা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং সেই বাড়ীতেই কয়েকটি রোগী রাখিয়া বালিকাগুলিকে সেবাধর্ম্মের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। কিছু দিন পরে দেখা গেল আইনের মারপ্যাচে এই বালিকাদের উদ্ধার করা সহজ নয়। কাজেই উদ্ধার-কমিটি উঠিয়া গেল। কিন্তু বাড়ী ভাড়াটা পড়িল সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্কন্ধে। কেবল একজন সভ্য তাঁকে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মেয়েগুলিকে তখন উদ্ধার করা গেল না বটে, কিন্তু সম্পাদক 'দাসী'তে নিয়মিত 'পতিতা রমণীর দুর্দ্দশা মোচন,' 'স্ত্রীজাতির দুঃখ বিমোচন,' এমন কি পতিত পুরুষগণের উদ্ধার বিষয়েও লিখিতেন এবং আলোচনা করিতেন। পুরুষ পতিত না হইলে নারী পতিতা হয় না, এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের চরিত্রহীনতাই সমাজের পক্ষে সমান হানিকর, ইহা তাঁর বিশ্বাস ছিল বলিয়া ইউরোপে পতিত পুরুষদের উদ্ধারকল্পে যে-সব কর্ম্মী কাজ করিয়াছেন তাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি 'দাসী'তে লিখিতেন। পতিতা নারীদের উদ্ধার চেষ্টায় রামানন্দ অনেক আইন পুস্তকাদি পাঠ করেন, এবং আইন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা ১২৯৯-এর দাসীর একটি প্রবন্ধ হইতে আমরা কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাই :—

আদালত সাহায্য করিলে অনায়াসে বেশ্যাগণের ক্রীত বালিকাগণের উদ্ধার সাধন করা যায়। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি প্রত্যেক বেশ্যাকে এইটি প্রমাণ করিতে বাধ্য করা হয় যে, তাহা-দের গৃহরক্ষিতা বালিকা তাহাদের নিজ গর্ভজাত কন্যা, তাহা হইলে এই শ্রেণীর বালিকাগণের মহদুপকার সংসাধিত হয়। প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহাদের দণ্ড হওয়া উচিত। কারণ ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে তাহারা পাপবৃত্তি অবলম্বন করাইবার জন্যই বালিকাগণকে পালন করিতেছে। বাস্তবিক এরূপ একটি আইন হওয়া উচিত যে বেশ্যাগণ নিজ গর্ভজাতা কন্যা ব্যতীত অপর কোন বালিকাকে গৃহে রাখিতে পারিবে না; এবং নিজ গর্ভজাতা কন্যাগণের সম্বন্ধেও ইহা আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহাদিগকে পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত করা হইবে না এবং তাহাদিগকে সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ করিবার জন্য কোন সদ্ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন। কোন

উপযুক্ত সভা বা ব্যক্তি তাহাদের ভার লইতে চাহিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর ভার দিতে পারেন। ঠিক এইরূপ কারণে না হউক ইংলণ্ডে পিতামাতাকে অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরের হস্তে বালিকাগণের ভার দিবার নিয়ম আছে।

আর একটি প্রবন্ধে অনেক ইংরাজী আইন উদ্ধৃত করিয়া লেখা হইয়াছিল :—

১৮৮৫ খ্রীঃ বিলাতে পেল্ মেল গেজেটের সম্পাদক মহাত্মা ষ্টেড লণ্ডন সহরে ··· কিরূপে অনেক বালিকাকে · বেশ্যাগণের নিকট বিক্রয়ের জন্য চালান দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অনেক ভীষণ রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন।···ঐ আন্দোলনের ফলস্বরূপ Criminal Law Amendment Act আইন পাস হয়। তন্মধ্যে বেশ্যাগৃহ উঠাইয়া দিবার জন্য ধারা বিধিবদ্ধ হয়।···আমাদের দেশে বেশ্যাগৃহ উঠাইয়া দিবার জন্য উল্লিখিতরূপ আইন হওয়া উচিত।

দেশে দুঃখের ত অভাব নাই। নিরক্ষরতা, দুর্ভিক্ষ, রোগশোক, অধর্ম, মাদকতা, পশুপীড়ন কত কি? রামানন্দের মন কৈশোর হইতেই দেশহিতব্রত ও নিষ্কাম মানবপ্রীতিতে অর্পিত ছিল। প্রথম যৌবনে বহু কাজের মধ্যে তিনি ঝাঁপ দিয়াছিলেন; কিন্তু মানবপ্রীতির যে অন্তহীন উৎস তাঁর অন্তরে সতত উৎসারিত হইত, তা কোন একটা মাত্র কাজে তৃপ্তি পাইত না। তিনি অনাথ-নিবাস করিবেন, কি দরিদ্র ছাত্রাবাস খুলিবেন, কুলিদের রক্ষা করিবেন কি পতিতা বালিকাদের উদ্ধার করিবেন, আতুরের সেবা করিবেন কি নিরক্ষর দেশে শিক্ষা বিলাইবেন কংগ্রেসের কর্ম্মী হইয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িবেন অথবা মাসে মাসে ধর্ম্ম-পুস্তিকা লিখিয়া ও পয়সা মূল্যে বেচিয়া মানবাত্মাকে ভগবৎ প্রেমে অভিষিক্ত করিবেন, বুঝিতে পারিতেন না। কোন কাজই তুচ্ছ মনে হইত না। অথচ যে কাজেই আকণ্ঠ ডুবিয়া যান মনে হয় অন্য অনেক কাজ হয় নাই; বিধাতার সেবা, বিধাতার প্রিয় কার্য্য ত ঠিক হইতেছে না! অনাথ, আতুর, দুঃখী, দরিদ্র, পরাধীন, পতিত, নাস্তিক সকলকেই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, এক-জনের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া আর একদিকে কি করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবেন? অথচ সমস্ত কাজ করার মত সামর্থ্য, অর্থ, সময়, সহায় ইত্যাদি ত তাঁর ছিল না। আপাততঃ ব্রাহ্মসমাজের কাজ আর দাসাশ্রমের কাজেই তিনি মন দিলেন। লেখনী ধারণের অধিকার তাঁর ছিল। তার সাহায্যে যদি দাসাশ্রমে কিছু অর্থ আসে এই উদ্দেশ্যে তিনি লেখনীই তুলিয়া লইলেন। আগেই ডায়েরীতে দেখিয়াছি বিধাতা যেন তাঁকে বলিলেন, "Do with all your might whatever your hands find nearest to do." দাসাশ্রমের আতুরেরা তাঁর তখনকার লক্ষ্য হইলেও তিনি জনহিতব্রতের কোনও অঙ্গকে ভুলিতে পারিলেন না, যতটুকু শক্তি, যতখানি জ্ঞান তাঁর ছিল তিনি নির্ব্বিচারে সর্ব্বমানবের সেবায় তা ঢালিয়া দিলেন। ক্রমে পরবর্তী যুগে তিনি যেন তাঁর দেশের অতন্দ্র প্রহরী ও অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইলেন, যেন এই দুর্ভাগা দেশকে অসংখ্য আঘাতের হাত হইতে কিছু পরিমাণে অন্ততঃ রক্ষা করিতে পারেন।

একজন 'দাস' লিখিয়াছিলেন :—

দাসী জন্মগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে সেবাধর্ম্ম প্রচারের ভার আপন মস্তকে লইল। দাসাশ্রমের কাজ যেন উপন্যাসের মত চলিয়াছে।"

জনসাধারণের মনে সেবার ইচ্ছা জাগাইবার জন্য কুমারী ডীন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ভগিনী ডোরা, গ্রেস্ ডার্লিং প্রভৃতি পাশ্চাত্যের পরহিতগতপ্রাণা মহিলাদের জীবনী 'দাসী'তে প্রথম বর্ষ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। কেবলমাত্র রোগীর সেবাই মানব-হিতৈষণা নয়। মানবের শারীরিক ও মানসিক অন্যান্য দুর্গতি ও দুর্দ্দশা নিবারণও মানবের ধর্ম্ম। দাসী-সম্পাদক অন্ধ, মূক ও বধিরদের দুঃখমোচনের জন্য লিখিতেন। তিনিই যে বাংলাদেশে অন্ধদের জন্য বাংলায় ব্রেইল অক্ষর উদ্ভাবন করেন একথা পঞ্চাশ বৎসর লোকে ভুলিয়াছিল। এখন ডাঃ সুবোধচন্দ্র রায় নামক অন্ধ-হিতৈষী পুরুষের চেষ্টায় সে তথ্য পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় সিটি কলেজে মূক-বধির বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর তার আলাদা বাড়ীও ভাড়া হয়।

মানুষের অবিচারিত দানের ফলে আতুরেরা পথে অনেক পয়সা পায়, এই জন্য দাসাশ্রমের মত স্থানে রুগ্ন ভিখারীরা আসিতে চাহিত না, তাদের সেখানে আনায় সাহায্য সাধারণে কি ভাবে করিতে পারেন, এবং দেশে Poor Law, অনাথ আবাস ইত্যাদি থাকার উপকারিতা কি—এই সকল বিষয়ই দাসীতে আলোচিত হইত। ইতর প্রাণীরাও মানুষের দয়ার পাত্র একথা দাসী-সম্পাদক ভুলিতেন না। গো-মাতাকে রক্ষা করার চেষ্টা দেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের দেশে গো-মহিষাদি বোবা জীবের দুঃখ তাঁকে বিচলিত করিত। কেবল মাত্র খ্রীষ্টীয় রীতির অনুকরণে জনহিতৈষণার চেষ্টা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি চাহিতেন আমাদের দেশের পুরাতন ছায়াবৃক্ষ রোপণ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, জলসত্র দান এই সব রীতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জন্যই চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি স্থানের ছোট বড় জলাশয়গুলি পুনরুদ্ধার করিয়া মানুষের জল-কষ্ট নিবারণ করিতে তিনি বলিতেন।

দাসাশ্রমের সেবকেরা সবরকম রোগীই কুড়াইয়া আনিতেন। অস্থায়ী রোগীদের দুই-এক দিন পরে হাস-পাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। 'স্থায়ী' রোগীদের আশ্রমেই রাখা হইত। দাসী-সম্পাদক কিছুদিন দাসা-শ্রমের সহিত এক বাড়ীতেই অন্য অংশে থাকিতেন। এই জাতীয় আতুরদের আশ্রয় দিবার।তাঁর দেখা 'আতুরাশ্রম'

মাত্র আশ্রম ছিল। সেটি খ্রীষ্টীয় ভগিনী সম্প্রদায়ের Little Sisters of the Poor। হিন্দু আতুররা সেখানে যাইতে সম্মত হইত না। তা ছাড়া তাঁরা ৬০ বৎসরের কম বয়স্কদের তাঁদের আশ্রমে স্থান দিতেন না। এইজন্য যে-কোন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ স্থায়ী রোগীদের আশ্রয় দেওয়াই দাসাশ্রমের প্রধান কাজ ছিল। দাসাশ্রমের সেবক ও সেবিকারা সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন। সেখানে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা হইত। কমিটিতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান্ হিন্দুও ছিলেন, তবে প্রাচীনপন্থী কোনও সেবক কি সেবিকা ছিলেন না। তখনকার হিন্দু-সমাজের অবস্থায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর পক্ষে স্বহস্তে সর্ব্বজাতির মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা বা পদসেবা করা সম্ভবপর ছিল না। 'দাসী'তে এইরূপ আলোচনা দেখা যায়। 'দাসাশ্রমে'র কাজ কলিকাতাতেই আবদ্ধ ছিল না, ইহাদের উদ্যোগে জালালপুর, বাঁকুড়ার স্বর্ণানগর, নলধা, কোঁড়ামারা, চেরাপুঞ্জী, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে সাতটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এক সময় দাসাশ্রমের সেবালয় গিরিডিতে স্থানান্তরিত হয়। পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। কলিকাতায় দাসাশ্রমকে সাহায্য করিবার জন্য এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক দুটি ডিস্পেন্সারী ছিল।

'দাসী'তে আসামের কুলিদের কথাও বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচিত হইত। সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

ছোটনাগপুরের মূর্খ দরিদ্র লোকেরা কুলি-ডিপোর নরপিশাচ বাবু ও আড়কাঠিগণকে সরকারের কর্ম্মচারী মনে করে, এবং তজ্জন্যই অনেক সময় সব জানিয়াও ইহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয় না। যদি কোন সাহসী, স্বার্থত্যাগী যুবক কুলি-ডিপোর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা একটি অতীব সাধুকার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাঁহাকে আবশ্যক হইলে প্রাণের আশা ছাড়িতে হইবে। কারণ কুলিসংক্রান্ত লোকদিগের অসাধ্য কিছু নাই।···সঙ্গীতের ক্ষমতা অদ্ভুত। তজ্জন্য আমরা প্রস্তাব করি, যে, যেমন নীলকরদিগের বিরুদ্ধে "নীলবাঁদরে সোণার বাঙ্গলা করলে ছারখার" প্রভৃতি গান রচিত হইয়াছিল তদ্রূপ চা-কর ও কুলির আড়কাঠির বিরুদ্ধে প্রচলিত সুরে কতকগুলি বাংলা ও হিন্দী সংগীত রচিত হউক। এরূপ সঙ্গীতের বহুল প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু এত লিখিয়া কি হইবে? লিখিতে ইচ্ছা করে না। আমরা যদি কাপুরুষের জাতি না হইতাম, তাহা হইলে একদিন, যাহারা দেশের কত পরিবারের সর্ব্বনাশ করিতেছে, সেই দুরাত্মা কুলিসংগ্রাহকগণ ও তাহাদের ডিপোগুলো সমূলে বিনষ্ট হইত। মনে হয়, যেমন বিষধর সর্পকে বধ করিলে পাপ হয় না, তদ্রূপ এই নরপিশাচগণের প্রাণবধ করিলেও বুঝি কোন অপরাধ হয় না।···

'দাসী'তে দেখি ১৮৯৩ খ্রীঃ নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে অহিফেন কমিশনের সভ্য, পার্লামেন্টের মেম্বর উইলসন সাহেব কলিকাতায় আসেন। সেই সময় টাউন হলে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা উদ্দেশ্যে বিরাট সভা হয়। যে-সব সাহেবেরা ইউরোপ হইতে নানা প্রলোভন দেখাইয়া বালিকাদের এদেশে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিত তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা মফঃস্বল হইতে এদেশের অল্পবয়স্কা মেয়েদের এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ভুলাইয়া আনে তাদের বিরুদ্ধে সভায় বক্তৃতাদি হয়। এই সভা এবং অহিফেন কমিশন বিষয়ে সম্পাদক 'দাসী'তে বিবিধ প্রসঙ্গ লেখেন। তিনি অন্য কথায় শেষে বলেন,

যেমন আফিং-এর পক্ষে অনেকে সাক্ষ্য দিতেছেন, তেমনি আফিং-এর বিপক্ষেও যাঁহারা পারেন তাঁহাদের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত।

পুরা প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের অর্দ্ধেক সময় 'দাসী'র অধিকাংশ লেখা সম্পাদক স্বয়ং লিখিতেন। গল্প এবং কবিতাও তিনি মাঝে মাঝে লিখিয়াছেন। একজন পুরাতন সেবক বলেন, "'দাসী'র তিন-চতুর্থাংশ লিখিতেন রামানন্দ বাবু আর এক-চতুর্থাংশ ইন্দু বাবু।" কেবল সেবাধর্ম্ম ও জনহিতৈষণার কথায় সাধারণ মানুষের আনন্দ হয় না এবং গ্রাহকসংখ্যা ইচ্ছামত বৃদ্ধির আশা করা যায় না। এইজন্য দেড় বৎসর পরে স্থির হয় যে 'দাসী'তে উপন্যাস, কবিতা, বৈজ্ঞানিক কথা, পুরাতত্ত্ব, পুস্তক-সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখা বাহির হইবে।

এই সময় হইতে 'দাসী'তে রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করেন। সম্পাদকের বিবিধ প্রসঙ্গে তখন রাজনৈতিক বিষয় দেখা দিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোথাও তখন নারীদের পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। কেবল নিউজীল্যাণ্ড উপনিবেশে নারীরা পুরুষের মত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে অধিকার পাইয়াছিলেন। নারীরা ক্ষমতা পাইয়াই দুশ্চরিত্র লোকদের সভ্য হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা মাদক দ্রব্যেরও বিরোধী হন। এই সংবাদ লইয়া 'দাসী'-সম্পাদক সানন্দে আলোচনা করিয়াছেন। 'অশ্লীল বিজ্ঞাপন' বিষয়ে তখন হইতেই তিনি অনেক বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বাভাস 'ধর্ম্মবন্ধু'তে আছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিষয়ের নূতন নূতন খবর সংগ্রহ করা ও সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা 'বিবিধ প্রসঙ্গে' তখন হইতে চলিত। সব খবর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। নারীহিতৈষণা, মানব জাতির জ্ঞান বৃদ্ধি ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজর থাকিত। 'ভারতবর্ষের দারিদ্র্য' তাঁকে চিরদিন ভাবাইয়াছে। এই জন্য 'দাসী'র দ্বিতীয় বৎসরেই দেখি এই বিষয়ে statistics দেওয়া সুবৃহৎ প্রবন্ধ। দারিদ্র্যের প্রতিকার হিসাবে তখনই তিনি ভারতে অধিক বেতনের সরকারী কাজে দেশীয় লোক নিয়োগ করিতে

এবং যুদ্ধ বিভাগ ও সৈনিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করিতে বলিয়াছেন। যৌথ কারবার স্থাপন, বিদেশে ভারতীয়দের উপনিবেশ করা, অর্থকরী শিল্প শিক্ষা ইত্যাদি আরও বহু উপায়ের কথাও আছে।

বহু অধর্ম্ম, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় আইনতঃ দোষণীয় নয়। কিন্তু ধর্ম্মতঃ সেগুলি যে পাপ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া মানুষের মনে দয়া ধর্ম্ম ও বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা 'দাসী'র ছিল। দাসাশ্রমের আয় বৃদ্ধির চেষ্টায় আনন্দমোহন বসু মহাশয় 'দাসী'র গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ আবেদন করেন। প্রথম বৎসরে 'দাসী' পত্রিকা হইতে দাসাশ্রম ৪৭৮৷৷৵১০ সাহায্য পান, দ্বিতীয় বৎসর পান ৫১১৸৵৫। গ্রাহকদের নিকট অনেক টাকা আদায় হয় নাই। না হইলে দ্বিতীয় বৎসরে ২০০০ টাকা সাহায্য করা যাইত। এই জন্য সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

আমরা স্থির করিয়াছি যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিশেষ পরিচিত গ্রাহককেও "দাসী" পাঠাইব না......দাসাশ্রমের কার্য্য আমাদের দেশে নূতন। আমরা ক্রমে এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা এবং সহৃদয়তার অভাবে এ পর্য্যন্ত দাসাশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই।

কিন্তু দাসাশ্রমের অর্থের অভাব হইলে একবার রামানন্দ তাঁর সামান্য বেতনের প্রায় সবটাই দান করিয়াছিলেন। এসব দানে মনোরমা দেবী আপত্তি করিতেন না।

তখন দাসী ও দাসাশ্রম কলিকাতার সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিল। দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক সভার রিপোর্টে দেখি মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতি। বক্তাগণের মধ্যে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি এল, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাসবিহারী ঘোষ, হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। দাসাশ্রম কমিটির সভ্যগণ ছাড়া উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস, শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ, ডাঃ নীলরতন সরকার, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ধনী ও গণ্যমান্য লোকেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লেখেন। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, 'দাসাশ্রমে'র মত এত বড় একটি সেবাশ্রম ৭.৮টি শাখা চিকিৎসালয় লইয়া চলিত—কোনও বড় ফণ্ডের সাহায্যে নয়, কোনও ধনীমণ্ডলীর দানে নয়। 'দাসাশ্রমে'র সভাপতি ও 'দাসী'র সম্পাদক 'দাসী' পত্রিকার সাহায্যে প্রতি বৎসর ৫০০৲ টাকার বেশী সেবাকার্য্যে দিতেন। প্রথম দিকে অধিকাংশ লেখাই থাকিত তাঁহার, তাছাড়া সম্পাদকের কাজ ও দায়িত্ব ত তাঁর ছিলই। সুতরাং দেখা যাইতেছে তিনি এইরূপে স্বোপার্জ্জিত মোটামুটি ৫০০৲ টাকা প্রতি বৎসর 'দাসাশ্রমে' দিতেন। কিন্তু এই টাকা 'দাসী'র সাহায্য-নামেই চলিত। ইহা ছাড়া নিজের সংসার নির্ব্বাহের জন্য তিনি যে কলেজে অধ্যাপনার কাজ কিম্বা ২।১ খানা ছোট বই লেখার কাজ করিতেন তাহা হইতেও তাঁহাকে কখনও এককালীন ৬০৲ কখনও ৪০৲ দিতে দেখা যায়। মানুষটির বেতন ছিল মাত্র ১০০৲। শেষের দিকে বেতন দাঁড়াইয়াছিল ১৪০৲ পর্য্যন্ত। একজন সংসারী গৃহস্থের পক্ষে এই দান কত বড় তা যাঁদের মাসে ১০০৲ আয় তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, ধনীর পক্ষে বুঝা সহজ নয়। জনসাধারণের যে 'দাসাশ্রমে'র কাজে সহানুভূতি ছিল তা প্রতি মাসে সাধারণের দানের হিসাব হইতেই বুঝা যায়। সাধারণের দান বেশী নয়, মাসে গড়পড়তা ১৭৫৲ আন্দাজ ১৮৯৩-এর হিসাবে দেখি। সে দানে ৫ হইতে ২০৲।২৫৲ পর্য্যন্ত আছে। তবে অধিকাংশ দান ।০ কি ১৲। শুধু যে ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যেই এই জনসাধারণ আবদ্ধ ছিলেন তা নয়, বৃহত্তর হিন্দু সমাজেই অধিকসংখ্যক দাতা ছিলেন। সুপরিচিত নামের মধ্যে গুণাভিরাম বড়ুয়া, মোহিতচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহারাজকুমার বর্দ্ধমান, চন্দ্রশেখর কালী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, কাশিমবাজার, K. N. Roy, রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র, দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্র ওহ্‌দেদার, কালীনারায়ণ গুপ্ত, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, সুকুমার হালদার, মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীনাথ দাসের বাড়ীর মহিলারা, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, J. T. Sunderland প্রভৃতির নাম দেখা যায়। দাসাশ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগী দাতা বোধ হয় ছিলেন মানিকদহের জমিদার বিপিনবিহারী রায়। তিনি নিজে এবং তাঁর প্রজারা মিলিয়া প্রতি মাসেই ১৫৲।২০৲।৩০৲।৪০৲ দান করিতেন। তাছাড়া তাঁহার পত্নী স্বরাজমোহিনী রায়ের মৃত্যুর পর ২৬০০৲ টাকার স্বর্ণালঙ্কার রায় মহাশয় দাসাশ্রমে দান করেন। সেই অলঙ্কার বিক্রীর টাকায় স্বরাজমোহিনী স্থায়ী ফণ্ড হয়। আরও অনেক ধনী ব্যক্তি চাঁদা দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নামের পিছনে ।০ কি ১৲ টাকা মাত্র উল্লেখ আছে বলিয়া তাঁহাদের নাম না বলাই ভাল। বহু মুসলমান ভদ্রলোক ও মহিলা এখানে দান করিতেন। মাড়োয়ারী নামও অনেক দেখি। তবে দান সামান্য।

দাসাশ্রমের মফস্বলের চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে চেরাপুঞ্জী ছিল প্রধান। সেখানে মাসে প্রায় ১০০ লোকের চিকিৎসা হইত। কখনও বা তিন সপ্তাহে ১৫৩ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

১৮৯৩-এ 'দাসী'তে 'ঐতিহাসিক তীর্থ যাত্রা' বিষয়ে সম্পাদক যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের কূপমণ্ডুক ছাত্রদের দেশের শিল্প ও ইতিহাসের গৌরবময় স্থানগুলির প্রতি আকৃষ্ট করা। সেই প্রবন্ধটি

দেখি নাই। কিন্তু তাহার পরের মাসেও এই প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। 'প্রবাসী' প্রকাশের অধ্যায়ে সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ পরে উদ্ধৃত হইবে।

'দাসী'র আকার ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে ঔপন্যাসিক প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বসুমতীর বর্ত্তমান সম্পাদক হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ, পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত হন। প্রভাত বাবুর প্রথম গল্প "একটি রৌপ্য মুদ্রার আত্মজীবনী" ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স ১৯।২০ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের দীর্ঘ সমালোচনা অনেকে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র-বিষয়ক সুদীর্ঘ রচনাগুলি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের। তিনি কবিতাও লিখিতেন। প্রভাত বাবু তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত কাব্য-বিষয়ে পত্রালাপ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন দুটি পত্র বহু বৎসর পরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিগুলির ছাপ প্রভাত বাবুর 'দাসী'র প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

দাসী-সম্পাদক ও দাসাশ্রমের সভাপতি রামানন্দ এলাহাবাদে চলিয়া যাইবার পরও 'দাসী'র কাজ করিতেন। তবে 'দাসী'তে এই সময় তাঁর নিজের রচনা পূর্ব্বের মত প্রচুর দিতে পারিতেন না। 'দাসী' এ সময় ক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক কাগজ হইয়া দাঁড়ায়। সেবা বিষয়ক রচনা প্রায় নাই। দীনেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন প্রভৃতিও ক্রমে 'দাসী'র লেখক হইয়া ওঠেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, লিখিত, "আমাদের অবস্থা", "আমাদের উন্নতি", "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা ভাষা," "দেবী দানবী ও মানবী", "দেশীয় বস্ত্র" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের দারিদ্র্য, সামাজিক দুর্গতি, বিধবা বিবাহ, শিক্ষা, বস্ত্র সমস্যা এবং ভাষা সমস্যা প্রভৃতি সকল রকম প্রয়োজনীয় বিষয়ে লেখক এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় যে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক প্রবন্ধটি তার পূর্ব্বেই লেখা। অবশ্য কিছু কাল হইতে ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। অবিনাশচন্দ্র দাসের 'পলাশবন' উপন্যাস এই সময়ই 'দাসী'তে প্রকাশিত হয়। বোম্বাই হইতে বাংলা দেশে যখন প্লেগ মহামারী সংক্রামিত হয়, তখন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদ ও প্লেগ বিষয়ে একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'দাসী'র সূচীতে এই প্রবন্ধটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত বলিয়া উল্লেখ আছে।

'দাসী' সম্ভবতঃ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বন্ধ হয়। শেষ দিকে কিছু দিন গোবিন্দচন্দ্র গুহ, এম্-এ, 'দাসী'র সম্পাদক ছিলেন। 'দাসী'তে যখন বহু লেখক লিখিতে আরম্ভ করিলেন তখনও 'দাসী'র একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার জিনিষ ছিল। দক্ষ সম্পাদকের সম্পাদনায় ফলে নানা বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আদর্শবাদ সুস্পষ্ট থাকিত। ভাষার সুমার্জ্জিত ও সংযত ভাব দেখিয়া অনেক সময় অন্যের স্বাক্ষরিত লেখাও সম্পাদকের লেখা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার আদর্শোচিত না হইলে তিনি কোনও লেখা ছাপিতেন না বোঝা যায়। তাছাড়া তাঁহার সম্পাদকীয় কলমের প্রসাধন-নৈপুণ্যে সমস্ত লেখার মধ্যেই রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। তাঁহার নিজের মত ছিল যে একই সম্পাদকের সম্পাদনায় যে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে কোন একটা জায়গায় সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। তবেই তাহা এক নামের ধ্বজার তলায় প্রকাশ পাইবার অধিকার পায়। সামান্য কিছু তথ্য আছে অথচ লেখার বাঁধুনি নাই এমন অনেক লেখা কাটিয়া ছাঁটিয়া মাজিয়া ঘষিয়া তিনি নিজেই দাঁড় করাইয়া দিতেন। তলায় অন্যের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সে লেখাগুলি তাঁহারই। বার বার এইরূপে সংশোধিত হইয়া লেখকেরাও ক্রমশ তাঁহার ধারায় লিখিতে অভ্যস্ত হইতেন এবং ক্রমে পাকা হইয়া উঠিতেন।

রামানন্দ প্রদীপে ভাল বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনা অনেকগুলি করিয়াছিলেন। 'দাসী'তেই ইহার সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নদী' ও 'চিত্রা'র বড় সমালোচনা 'দাসী'তে প্রকাশিত হয়। তখনই সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে রবিভক্ত ও রবিবিরুদ্ধ দুইটি বড় দল হইয়াছিল। সে-কথার উল্লেখ 'দাসী'তে প্রভাত বাবুর এই প্রবন্ধেই আছে। গোঁড়া রবিভক্তেরা ছিলেন অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি নব্য-যুবক। প্রভাতবাবুর ভাষায় বলিলেন :—

> কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটা কথা বলিল অমনি রণং দেহি রণং দেহি বলিয়া তাহারা গর্জ্জন করিয়া উঠে।

'দাসী' যে রবিভক্তের দলে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সেইজন্যই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫ পৃষ্ঠা জুড়িয়া 'চিত্রা'র সমালোচনা এই পত্রে করিয়াছিলেন। 'নদী'র সমালোচনা সম্পাদক স্বয়ং লিখিয়াছিলেন।

শিশুদের সম্বন্ধে রামানন্দ যে কতটা দরদ দিয়া ভাবিতেন তা তাঁহার লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'নদী'র সমালোচনা পড়িয়া বুঝা যায়। এটি 'দাসী'তে মার্চ্চ ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় :—

> অনেকে মনে করেন, মানব প্রকৃতিটা ভগবানের একটা মস্ত ভুল : বিশেষত শিশু-প্রকৃতি। বাস্তবিক স্বর্গে যদি একটা টেক্সট-বুক কমিটী থাকিত এবং ভগবান যদি তাহার, কিম্বা তথাকার গুরুমহাশয়দের পরামর্শ লইয়া, শিশু-প্রকৃতি গড়িতেন, তাহা হইলে শিশুরা এত খেলা ভালবাসিত না। দুপুর রোদে ধরমর দাপাদাপি

করিত না, ঠাকুরমার কাছে বসিয়া সন্ধ্যার আধ আলো আধ আঁধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না এবং এতটা স্বপ্নপ্রিয় ও কল্পনার দাস হইত না। ভগবানকেও কষ্ট পাইয়া বেতগাছের সৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যা হবার নয় তার জন্ম দুঃখ করিয়া কি হইবে? শিশুগুলিকে ভগবান আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া দেখা গেল যে ঠেঙ্গাইয়া শিশুদিগকে গোপালের মত সুশীল ও সুবোধ করা গেল না। তাহারা ক্রমাগত নামতা পড়িতে ত চায়ই না; এমন কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবিগণ যে এমন চৌদ্দ অক্ষরের মিলযুক্ত নীতিগর্ভ কবিতানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ও অভিনিবেশপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে চায় না! টেক্সট-বুক কমিটির চেয়ে ত ছেলেদের বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান অধিক নয়। তাঁহারা এ সকল কবিতাকে অতি উপকারী বলিয়াছেন। তবু শিশুরা সে-গুলি আপনা হইতে পড়ে না। এখন উপায় কি? আমাদের বরাবরই একটা সন্দেহ আছে; ভয়ে বলিতে পারি নাই। সন্দেহটা এই, যে, আমরা অবশ্য খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ জীব: কিন্তু হয়ত ভগবান্ নিতান্ত কাঁচা কারিগর না হইতেও পারেন। শিশুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া পিটিয়া আমাদের মনের মত করিয়া গড়িতে ত পারা গেল না। এখন ভগবানের উপর হাতিয়ার না চাপাইয়া শিশুদিগকে তাহাদের প্রকৃতির গতি অনুসারে বাড়িতে দিলে মন্দ হয় না। তাহাদের জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যেও ক্রীড়াশীলতা আসুক তাহাতে ক্ষতি কি? বিড়াল ছানাগুলি লেজ নাড়িয়া লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করে, নীতি ও গাম্ভীর্য্য ভাল বলিয়া ভগবান ত তাহাদের লেজ-গুলি কাটিয়া সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই? ক্রীড়াশীলতা বোধ হয় পাপ নয়।…আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশু-দের বন্ধুত্বলিপ্সু দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার 'নদী'র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানাদেশে ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব।

জগদীশচন্দ্র বসু বাংলা কাগজে প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে কখনও বোধ হয় লেখেন নাই। রামানন্দ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধটি 'দাসী'র জন্য লেখান। এই প্রবন্ধটির কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও কল্পনা উল্লেখযোগ্য। পরে এটি প্রবেশিকার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য হয়। জগদীশচন্দ্র "কলুজার যুদ্ধ" নামক আর একটি প্রবন্ধও 'দাসী'র জন্য লেখেন।

এই বৎসরের 'দাসী'তেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'চিত্রা'র সমালোচনা করেন। প্রভাত বাবুর বয়স তখন কম, লেখাটি খুব উঁচুদরের সমালোচনা নয়। যাই হোক সমালোচনার অংশ বাদ দিয়া ভূমিকার অংশের একটু নমুনা দেওয়া যাক্ ঃ—

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। এক দল রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি নব্যযুবক;— ইহারা প্রায় সকলেই এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মানুষের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কাণে দাশুরায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দ-পারিপাট্য এমনি লাগিয়া আছে যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।… তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাদোষে দোষী— তিনি অল্পবয়স্ক। (খ) প্রৌঢ়…ইহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহার কারণ, হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র ইহাদের হৃদয়বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়া টুং টাং শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড়্‌ছড়্ শব্দমাত্র করিয়া থামিয়া যায়। (গ) যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইংরাজি প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমালোচক হইয়া দাঁড়ায়। (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক)। ইহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরী" বিষয়ে 'দাসী'তে সৌদামিনী গুপ্তা একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তার শেষ পাঁচটি লাইন :—

> প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গণতলে যারা
> ঢালিতেছে স্বাভাবিক সঙ্গীতের ধারা
> শতবার শুনেছি সে সকলের স্বর;
> "কিন্তু মম প্রিয়তম-কণ্ঠস্বর ছাড়া
> আর কিছু শুনি নাই অমন মধুর।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'দাসী'র গ্রাহক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে যে মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকার আছে সেটি ছাপার ভুল বলিয়াই মনে হয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মাধবিকা"র সমালোচনা 'দাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখাটি সম্পাদকের নয়। 'দাসাশ্রমে'র ফণ্ডে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের এককালীন ২৫৲ দানেরও উল্লেখ দেখা যায়।

'দাসী'তে সেবাধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ক ছোট ছোট নিবন্ধ কিম্বা কাহিনী অন্য পত্রিকা হইতে অনেক সময় উদ্ধৃত করা হইত। ১৮৯৩-এর 'দাসী'তে আছে,

সাধনা হইতেও "পরিবারাশ্রম" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধের বাংলা সারসংগ্রহ উদ্ধৃত হয়।

ইহা বাংলা ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠের 'সাধনা' হইতে ১৩০০ সালের 'দাসী'তে উদ্ধৃত। 'সাধনা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৮-৯৯ সালে, 'দাসী' প্রকাশিত হয় ১২৯৯-১৩০০ সালে।

'দাসাশ্রম' ও 'দাসী'র যুগে যে-সকল পরিবারের সঙ্গে রামানন্দ ও তৎপত্নীর ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং যাঁদের সঙ্গে তাঁরা একবাড়ীতে ছিলেন কিম্বা বন্ধুভাবে যাঁদের কাছে যাওয়া-আসা করিতেন তাঁদের ইঁহারা চিরদিনই পরমাত্মীয়ের মত মনে করিতেন। ইঁহারা তখন যেন ছিলেন একই পরি-বারের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, জীবনে ইহাদের তাঁরা কখনও বিস্মৃত হন নাই। বাহিরের যোগসূত্র অনেক জায়গায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অন্তরের প্রতিষ্ঠা সমানই ছিল। বহু বৎসর পরে ইঁহাদের দেখিয়াও রামানন্দ যেন সেই পূর্ব্ব জগতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন দাসাশ্রমের কর্ম্মী ও সাধক ইন্দুভূষণ রায়।

গরীবের হাতের কাজ

শ্রীনিশাপতি মাজি

বর্ত্তমান যুদ্ধ-জনিত অবস্থায় পল্লীর কোন কোন গরীব শিল্পীদের হাতের কাজের দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এ দুর্দিনে পল্লীর গরীব কলু স্বীয় শক্তিকে সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে আংশিক সহায়তা করতেও অক্ষম। কেন না, সরিষার অভাবে তাদের ঘানিতে যথেষ্ট তৈল তৈরী হচ্ছে না। কাগজীরা এইরূপ দেশের বিদ্যা বিস্তারের জন্য আংশিক সহায়তা করতে পারত কিন্তু তাদেরও দ্রব্যাদির অভাবে প্রায়ই হাত গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে। কামারেরাও হাতুড়ি তুলে রেখেছে; তাদের চড়া দামে লোহা কিনে ফাল, কোদাল প্রভৃতি তৈরী করবার সামর্থ্য নেই। চাঁড়ালরা রাতে ঢেঁকিতে চিঁড়া তৈরী করত কিন্তু কেরোসিনের আলোর অভাবে পল্লীর আবশ্যক চিঁড়া তৈরী করতে পারছে না। চামারের চামড়া তৈরীর মাল-মসলারও অভাব দেখা দিয়েছে। দেশী মুচিরা চালানী চামড়ার দর বেশী বুঝে পাদুকা তৈরী ছেড়েই দিয়েছে। অনেকে বিদেশী কোম্পানীর চামার হয়েছে। অথচ এই বাংলাদেশের মুচিরাই এক দিন সৈনিকের পায়ের জুতা, ঘোড়ার সাজ ও রণবাদ্যের নানা দ্রব্য তৈরী করে দিয়ে যুদ্ধে সহায়তা করেছিল। ডোমেদের বাঁশ ও তালবেত দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। তথাপি ডোমেরা মোড়া, চেয়ার, টুকরি ও টুপী তৈরী করে দু'পয়সা উপায় করছে। শুনা যায়, বাংলাদেশে লোহারগণ লোহা গালাই করত। কিন্তু বর্ত্তমানে এরা স্বীয় জাত-ব্যবসার নিকট বিদায় গ্রহণ করে কৃষি-কার্য্যে মজুরি খাটছে। বাংলার হাড়ী বাগ্দী প্রভৃতি জাতির দ্বারা তাল ও খেজুর গুড় তৈরী হয়। বর্ত্তমান বাংলার কোন কোন স্থানে মাদক দ্রব্যের চাহিদা এত বৃদ্ধি হয়েছে যে তাল খেজুরের রস হতে আর গুড় তৈরী হচ্ছে না, তাড়িই তৈরী হচ্ছে। বর্দ্ধমান ও বীরভূমের মুসলমানগণ খেজুরের মাহাল তৈরী করে গুড় উৎপন্ন করে। কিন্তু তারাও মাদক দ্রব্যে অনুরক্ত হয়ে গোপনে খেজুর রস হতে তাড়ি তৈরী করছে। সব চেয়ে গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের পল্লীর অসহায়দের প্রধান অবলম্বন যে ঢেঁকি-শিল্পটি যেন তেন প্রকারে টিকে ছিল—সেই ঢেঁকিগুলি সরকারী এজেন্টদের অর্থলোলুপতার জন্য আপাততঃ অচল হয়ে পড়েছে। কলের তৈরী চাউল বাড়্তি অঞ্চলে এজেন্টরা ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল অপেক্ষা বেশী মূল্যে ক্রয় করছেন। ফলে পল্লীতে অসহায়দের খুদ-ভাতের সংস্থানের উপায় নষ্ট হয়েছে। এমন কি গরুর খাদ্য কুঁড়া-তুষ খুদ প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। মোট কথা, যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পল্লীর গরীব শিল্পীদের যাবতীয় আয়োজনই বিগড়ে গিয়েছে। পল্লীবাসী যদি এর আশু প্রতি-বিধানের জন্য যত্নবান্ না হন তাহলে অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। অবশ্য পল্লীর আত্মরক্ষা এবং খাদ্য-সমস্যা, আরও বহুবিধ প্রধান সমস্যা উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কৃষি ও শিল্প-সমস্যাই আজ সবচেয়ে গুরুতর হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতির কথাও বাদ দেওয়া যায় না।

আজ তাই কেবলমাত্র গরীব শিল্পীদের এই দুরবস্থা হতে কি প্রকারে রক্ষা করা যায় সেই বিষয় আলোচনা করছি। সকলেই বোধ হয় স্বীকার করবেন বাইরের কোন সাহায্য গ্রহণ না করেই পল্লীর ছোট ছোট শিল্পগুলিকে এই দুর্দ্দিনে খুব সহজেই গড়ে তুলতে পারা যায়। এমন কি যদি কাঁচা মাল উৎপাদনের স্থায়ী ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে করা সম্ভবপর হয় তাহলে শিল্পগুলির যথেষ্ট উন্নয়ন করাও সুদূরপরাহত হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে গ্রামে যদি তুলা ও সরিষা-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় তা হলে চরকার সূতার ও ঘানির তৈলের কোন অভাবই থাকে না। তাঁতি, কলু, কামার, ছুতার ও মুচি দু-পয়সা উপায় করে মোটা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। এ ছাড়া যে-সমস্ত কাঁচা মাল দেশে প্রচুর রয়েছে সেগুলিরও সদ্ব্যবহার হতে পারে। নিম্নে তাই বাঁশের, তালগুড়ের ও তালপাতার টুপীর কথা উল্লেখ করছি।

বাঁশ শিল্প। বাঁশ বাংলাদেশের সর্বত্রই হয়। পাহাড়ে বাঁশ ষ-বাঁশ ও র-বাঁশ তন্মধ্যে প্রধান। বাঁশ হতে বহু-বিধ শিল্পদ্রব্য ও গৃহ-নির্ম্মাণ ও মেরামতি হয়ে থাকে। বাঁশচাষ ও বাঁশের শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ ক'রে অনেকে অনেক টাকা উপায় করেন। এখন বাঁশের তিন গুণ দর বৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে বর্দ্ধমান বিভাগের ডোমদের বাঁশই প্রধান উপজীবিকা। বাঁশের মোড়া, চেয়ার, বাস্কেট, ঝাবরী, ঝুড়ি, কুলা, পেতে, চালুনী, সাজি, টপ্পর, ধানের হামার, মই, ডোল, গাড়ী, খাল্লা, মাচা প্রভৃতি আবশ্যক ও কৃষিকার্য্যের জিনিষ তৈরী করে ডোমরা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে। অনাবাদী জমিতে, নদী তীরে, খোয়াইয়ে ও গৃহের সন্নিকটে বাঁশ-ঝাড় দেখা যায়। পাহাড়ের বাঁশের ব্যবসাও খুব আয়কর। ভাল বাঁশঝাড়ে বৎসরে বর্ত্তমানে কম পক্ষে ২৫৲ টাকা আয় হচ্ছে। এক বিঘা জমিতে ১৫ ঝাড় ভাল বাঁশ হতে পারে। প্রথম বছর বাঁশের গোঁড়া বসিয়ে দ্বিতীয় বছরে ধানের চিটা ও মাটি দিতে হয়। তৃতীয় বছরে তাহলে বহু বাঁশের কোঁড়া বেরুতে পারে। পাঁচ বছরে দু-একটা বাঁশ কাটিবার মত হয়। এবং যতটা

কাটা যায় তায় তিনগুণ কোঁড়া গোড়া হতে ফুটে উঠে। আজকাল অনাবাদী জমিতে এইরূপ বাঁশের চাষ করলে পল্লীর আয়বৃদ্ধির কাজে বিশেষ সহায়তা করা যায়। দেশের বাঁশশিল্পীরা উল্টো পথে মরতে বাধ্য হয় না। এমন কি শিল্পীরা মানব-স্বভাবের মধ্যে যে সহজাত সৃষ্টি-শক্তি রয়েছে তার প্রতি অন্যান্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে। অর্থ-লোলুপগণ ক্রেতার স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থকে ষোল আনার উপরে সতের আনা ছিনিয়ে নিতে পারে না। সকলেই জানেন দেশে বাঁশের মোড়ার যথেষ্ট চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে। আপাততঃ বোলপুর থেকে ভকতভাই এজেণ্ট দ্বারা প্রতিদিন এক মালগাড়ী মোড়া বোঝাই হয়ে কলকাতায় চালান যাচ্ছে। যানবাহনের অসুবিধার জন্য এই মোড়া দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না—নতুবা আমেরিকাতেও মোড়া চালান যাচ্ছিল। এই মোড়া তৈরী করে পূর্ব্বে ডোমেরা ঘরে ঘরে ভাত-কাপড় ভিক্ষা করে বেড়াত। পুরাতন কাপড় দিয়ে আজও পশ্চিম বঙ্গে বাঁশের জিনিষ কিনবার রেওয়াজ রয়েছে। ১৯২৭ সালের পশ্চিম বঙ্গের দুর্ভিক্ষের সময় স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয় গরীব শিল্পীদের হাতের কাজ কিনবার ব্যবস্থা করেন। এই সময় বাঁশের জিনিষ কেনা হত। অতঃপর তিনি এই শিল্পটির প্রতি বিশ্বভারতীর শিল্পভবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। শ্রীনিকেতন শিল্প বিভাগ দুইজন ডোমকে মোড়ার উপর নূতন ধরণের কারুকার্য্য শিক্ষা দান করেন। বাঁশ ও তাল বেত দিয়ে শিল্পীরা 'দেখ-নাই-সই' জিনিষ তৈরী করতে থাকে। গঠনের বৈচিত্র্যে মোড়া শিল্পটি সকলের দৃষ্টিতে আসে। অতঃপর শিল্পিগণ মোড়ার উপরে চামড়ার গদি বসাবার ব্যবস্থা করেন। শিল্পীর ছোঁয়াচে জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজনের জন্য মোড়ার খরিদ্দার ও বাজার সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে এই মোড়ার দ্বারা যেমন সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা যৎসামান্য তৃপ্ত হচ্ছে সেইরূপ দেশের এমন অনেক শিল্প রয়েছে যার সামান্য উদ্যোগ ও আয়োজন করলে শিল্পিগণ অন্নসংস্থানের উপায় করতে পারে, এবং দরদী শিল্পীর সাহায্যে অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প কাজগুলিও মোড়ার মত উন্নত হতে পারে। অবশ্য যাঁরা সখের অথবা সুনামের জন্য এই কাজ করতে চান তাঁদের উন্নয়ন কাজে হাত না দেওয়াই ভাল। যাঁদের বাস্তবিক পল্লীর মঙ্গলের জন্য খাঁটি ব্যবসায়ীর মত এই কাজ করবার অথবা করাবার যোগ্যতা আছে তাঁদেরই ভার গ্রহণ করা উচিত।

তালগুড় তৈরী—সারা বাংলাদেশের কথা জানি না। বীরভূমে ১১ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭ লক্ষ লোক ইউনিয়ন বোর্ডের করভার বহন করে। এরা অনেকেই হয়ত আবশ্যক মত চিনি পাচ্ছে না। কিন্তু মোটামুটি বলা যায় সাত লক্ষ পাচ্ছে, আর চার লক্ষ লোক চিনি কিনবার পারমিট পায় নাই। গরীব বলে এদের সাত আনা সেরের চিনি কিনবার অধিকার নাই। বার আনা ও দশ আনা সের গুড় কিনতে হচ্ছে। পথ্য ও অন্যান্য কাজের জন্য চিনিও দেড় টাকা মূল্যে কিনতে বাধ্য হয়। গ্রামের মাঠে দশ বছর আগে যতটা ইক্ষুচাষ হত আজ তার স্থান বড় জোর দু-দশ কাঠা বেড়েছে। গুড় ও চিনির অভাবে গ্রামের অধিকাংশ লোকই নানা কথা বলাবলি করছে, কাজের বেলায় কেউ এক পা অগ্রসর হচ্ছে না। তালগুড় তৈরী করবার লোক নিযুক্ত করে যদি গ্রামের যাবতীয় তালগাছের রসকে কার্য্যকরী করা যায় তাহলে পল্লীর চিনি-সমস্যার সমাধান কিছুটা হয়। এক মণ গুড় প্রতিদিন তৈরী করবার জন্য প্রায় দেড়শ গাছের প্রয়োজন। দশটা করে গাছের জন্যও যদি এক জন করে লোক রাখা যায় তাহলে প্রতিদিন সতের আঠার টাকা খরচ করে এক মণ তাল গুড় পাওয়া যায়। এই গুড় অন্যান্য গুড়ের অপেক্ষা সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর এবং উপাদেয়।

তালগাছের পাতা হতে চাটাই, ঝুড়ি এবং ছাতা তৈরী হয়। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে তালপাতার টুপী করিয়েছিলেন। আজ সেই টুপীর এত খরিদ্দার হয়েছে যে, কারিগরগণ বরাতি টুপী তৈরী করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। গাছ হতে পাতা কেটে ভাল ভাবে পাতাগুলিকে জাঁত দিয়ে এক দিন রাখতে হয়। তার পর দিন বাঁশের মিহি বাতা করে একটা টুপীর মত ছক তৈরী করতে হয়। ছকের উপর পাতাগুলি ছাতার মত ছাইয়ে দিতে হয়। তারপর শণের মিহি সুতা দিয়ে তালপাতাগুলিকে সেলাই করলেই টুপী হয়। যদি একটা গলাবন্ধ দেওয়া যায় তাহলে মাথা হতে টুপীটা উড়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে না। সোলার টুপীর চেয়ে এই টুপী মাথাঠাণ্ডা রাখে। প্রখর রোদে কুলীরা এইরূপ ছাতা মাথায় দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। তবে ছাতার অপেক্ষা টুপীর একটা বৈচিত্র্য শিল্পীর ছোঁয়াচে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্য এই ছাতাকে এখনকার ছাতার ন্যায়ই অনেকে ব্যবহার করছেন। দামও খুব সস্তা—মাত্র এক টাকা। বাঁশ দড়ি ও পাতার মূল্য মাত্র দু-আনা। ব্যবসায়ীকে কিছু দিয়ে চৌদ্দ আনার কাছাকাছিই গরীব শিল্পী পেতে পারে। ভাল অভিজ্ঞ কারিগর প্রতিদিন অন্ততঃ আটটা টুপী করতে পারে। টুপীগুলির সমান মাপ করবার জন্য একটা কাঠের ফরমা করতে বড় জোর পাঁচ টাকা খরচ করতে হয়। হাটে বাজারে ও ছোট বড় শহরে এইরূপ ছাতা হাজির করলেই খরিদ্দারগণ ছুটে আসে। এইরূপ তালবেতের দ্বারা শীতল পাটীর অপেক্ষা ভাল মসৃণ ও চকচকে পাটী তৈরী হয়। মোড়ার উপর যাবতীয় কারুকার্য্য এই তালবেতের দ্বারাই হয়। তালবেত চাঁচিলে যদি [illegible] কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা

যায় তাহলে ইচ্ছামত সাদা কালো ও বাদামী রং করতে পারা যায়। এ থেকে আরও বিভিন্ন রকমের শিল্পদ্রব্য গড়ে উঠতে পারে।

দেশের কর্ত্তব্য। এখন আসল কথা হচ্ছে, তালপাতার টুপী মোড়া ও তালগুড় প্রভৃতি করবার উপায় কি? গ্রামের অর্থলোলুপগণ যদি এ কাজের গোড়াপত্তন করতে চান তাহলে গরীবের অবস্থা পূর্ব্ববৎ থাকবে। গরীবদেরই পল্লীতে পল্লীতে এ কাজের আয়োজন করা উচিত। তাতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতার অভাব হবে না। পরস্পরের প্রয়োজনের তাগিদে সহজেই তারা এক হতে পারবে। আজকে কুমোরের ঘরে সকলকে হাজির হতে হচ্ছে। কলুকে সরিষার ও তিলের ঘানি দিয়ে অনেকে তৈল তৈরীর মতলব করছে। কিন্তু কাগজীরা মাথা ঠুকে খড়-বাঁশ-শর জোগাড় করেও মালমশলার অভাবে কাগজ তৈরী করতে পারছে না। সেদিন গুলজারবাগে গৃহশিল্পগুলির জন্য বিহার-সরকারের যে উদ্যোগ-আয়োজন দেখে এসেছি তাতে মনে হয় কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁরা গৃহশিল্পের নূতন যুগ সৃষ্টি করবেন। আমাদের বাংলা-সরকার যদি গরীব শিল্পীদের কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে করতে পারেন তাহলে দেশের গরীবরা সোজা-সুজি মরতে পায়—উল্টো পথে ধুকপুক করে মরে না। বাংলা-সরকার যত টাকা কারখানা-শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যয় করছেন তত টাকাই যদি গরীবদের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যয় করেন তাহলে দেশের বুকে সত্যই শিল্প উন্নয়নের নূতন শিকড় চালাতে পারেন। তাতে গরীবের নাম ভাঙিয়ে অর্থলোলুপদের সন্তানরা আরও পুষ্ট হয় না। গরীবরা মোটা খেয়ে-পরে যেন তেন প্রকারে এ দুর্দিনে টিকে থাকতে পারে। আজকাল গরীবরা পরবার একখানা কাপড়ের জন্য কি দুর্গতি ভোগ করে তা লিখে শেষ করা যায় না। উচিত মূল্য দিয়ে সে দোকানদারের নিকট কাপড় কিনতে যায়, কিন্তু দোকানদার বলে "শুধু একখানা শাড়ি বিক্রী হবে না, সঙ্গে আরও দুখানা ছোট-বড় ধুতি নিতে হবে।" এক সের চাউল কিনে ভাতের মাড় খেয়ে একটা বেলা কাটাবার ইচ্ছে করে, কিন্তু কলের চাউলের মাড় খেতে পারে না। দু-কাঁকর নুনই ভাত ও খাবারের প্রধান সম্বল, কিন্তু সপ্তাহে আধ সের নুন ৩৫টা মাথা দেখিয়ে পেয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে এক-কাঁকরও পায় না। দুমকা হতে যদি কেউ বর্দ্ধমান যায় তাহলে তাকে কোন দোকানদার রেশন-কার্ড নেই বলে নুন দেবে না। তাকে গোপনে বার আনা কিংবা এক টাকা সের দরেই নুন কিনতে হবে। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করেও যাদের ডাল-ভাত জোগাড় হয় না তাদের রাতে তিন-চার ঘণ্টা কাজ করা দরকার—কিন্তু গরীব বলে কেরোসিন কিনবার পারমিট পায় না। অথচ চোখের সামনে গরীবদের খাওয়ানোর নাম করে অর্থ-লোলুপগণ কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি ক্রয় করে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করছেন। সমাজের সৃষ্ট এরূপ দুর্নীতির জন্য রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রতিকার হচ্ছে না—তাতে গরীবই বিনা বাধায় মরছে। চিকিৎসার বর্ত্তমান ব্যয় নির্ব্বাহের সাধ্য গরীবের নাই। খাদ্যপ্রাণ ও জীবনীশক্তির অভাবে যদি এই ভাবে শুধু রুগ্ন ও দুর্ব্বলদের মৃত্যু হ'ত তাহলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ চোখের উপরেই সক্ষমদের এবং পল্লীর শিল্পীদের এইভাবে মরণ দেখতে হচ্ছে। এই দুর্দিনে মূলধন দিয়ে, উন্নয়ন কাজ শিক্ষাদান করে যদি দেশের লোক দেশের দরিদ্র শিল্পীদের রক্ষা না করে তাহলে শুধু সরকারকে গালাগালি দিয়ে সমস্যার কোন সমাধান হবে কি?

রাজাজীর "ফরমুলা"

শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ

ব্রিটিশরাজের শাসন-পরিষদের (His Majesty's Government) পক্ষ হইতে যে-প্রস্তাব লইয়া সার ষ্টার্ফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ সাহেব দূতিয়ালী করিতে আসিয়াছিলেন, দিল্লীতে আলোচনার সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সে প্রস্তাব অচল বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর উহার সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক অংশ সম্বন্ধে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এলাহাবাদে সুস্পষ্ট ভাষায় মতামত ব্যক্ত করিয়াছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক ভূখণ্ডগুলির (territorial units) যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার যে অধিকার ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবে পরিকল্পিত ছিল, তাহা যে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া কংগ্রেসের অখণ্ডতাকীয় সাধনা পণ্ড করিবার নির্দিষ্ট হয়—এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক্ হইয়া যাওয়ার স্বাধিকার নীতি স্বীকৃত হইলে ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবের প্রথমাংশে অঙ্গীকৃত "ডোমিনিয়ন মর্য্যাদা" যে অর্থহীন হইয়া পড়িবে, ইহা বুঝা শক্ত নহে। ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবের বাগ্‌জালের অন্তরালে যে ভেদনীতি লুক্কায়িত ছিল, সে সম্বন্ধে কংগ্রেস অত্যন্ত সচেতন ছিল। দিল্লীতে এবং এলাহাবাদে উভয় স্থানেই কংগ্রেস সুস্পষ্ট ভাষায় ঐ নীতির বিরোধিতা করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লালের প্রস্তাব এলাহাবাদে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ৯২-১৭ ভোটে গৃহীত হয় এবং শ্রীরাজগোপালাচারীর প্রস্তাব ১৩০-১৫ ভোটে পরাজিত হয়। শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লালের প্রস্তাবে ছিল—"নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অভিমত এই যে, ভারতের কোন

ভৌগোলিক অংশের (territorial unit) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার অধিকার মানিয়া লইলে ভারতবর্ষকে বহুধাবিভক্ত করা হইবে এবং ঐ প্রকার ব্যবস্থা-বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলি জনস্বার্থের পরিপন্থী হইবে। সেই কারণে ঐ ধরণের প্রস্তাবে এই কমিটি সম্মত হইতে পারেন না।"

দিল্লীতে গৃহীত উপরিউক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—"স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব্ব হইতেই প্রদেশবিশেষের যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ-বিরতির অভিনব নীতি স্বীকৃত হইলে ভারতের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। ...যে সময়ে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সদ্ভাবের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, সেই সময় ব্রিটিশ সমর-পরিষদের এই প্রস্তাব ভেদনীতির প্ররোচনা দিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ব্বাহ্নেই দলাদলি সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দিতেছে।..."

এ দেশের করদরাজ্যগুলিকে ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিকে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য নষ্ট করিবার যে কৌশল ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত ছিল, তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস বার-বার স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু রাজগোপালাচারী মহাশয় ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাবে এতদূর মুগ্ধ এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে অংশ লইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার এত তীব্র যে, তজ্জন্য মুস্‌লিম লীগের সকল আব্দার মানিয়া লইতে প্রস্তুত। তাঁহার মতে ভারতের ঐক্যের ধুয়ায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট রচনায় বাধা দেওয়াটা অত্যন্ত মূঢ়তার কাজ। এলাহাবাদে তাঁহার যে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, তাহাতে তিনি বলিতেছেন—"বিপদ, সমূহ বিপদ—জাপান ওই যে আসিতেছে—ইংরেজ ভারতের যে স্বাধীনতায় তা দিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে আসিতেছে, সুতরাং 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'। বাংলা-দেশকে যাইতে দাও, পঞ্জাব লইয়া কি হইবে—National Government তো হউক। নহিলে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। ফুটো নৌকাই যে পাল তুলিয়া ফর্ ফর্ করিতে করিতে ছুটিবে।" তাঁহার প্রস্তাবে ছিল :

"To sacrifice the chances of the formation of a National Government at this grave crisis . . . . is a most unwise policy and it has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation . . . ."

মনে রাখিতে হইবে যে ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাবের যুদ্ধকালীন "National Government" সম্পূর্ণ তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট হইবে। যুদ্ধের ওজুহাতে যে ফাসিজ্‌ম্ ভারতে চালু হইবার উপক্রম হয়, সেই ফাসিষ্ট রাজতন্ত্র সুবোধ বালকের মত মানিয়া চলাই হইবে ক্রীপ্‌স্ পরিকল্পিত "National" Governmentএর কর্ত্তব্য। এইরূপ একটি "আচাভুয়া বোম্বাচাকের" জন্য রাজাগোপালাচারী মহাশয় বরাবরই ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত। ভারতের রাষ্ট্রীয় সংঘবদ্ধতার মূল্য তাঁহার কাছে কম—তাঁবেদার ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টে প্রবেশ করার মূল্যই অনেক বেশী।

তিনি যে "ফরমুলা"টি এখন সর্ব্বজনসমক্ষে প্রচার করিয়া জিন্না সাহেবের সহিত একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে উভয়পক্ষ মনোভাব বেশ প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা কংগ্রেস-নীতির সমর্থক এবং কংগ্রেসপক্ষীয় তাঁহারা সরাসরি এ "ফরমুলা" উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু এই "ফরমুলা"তে মহাত্মাজীর সম্মতি আছে বলিয়া তাঁহারা বিপদে পড়িয়াছেন! মহাত্মাজী এখনও পরিষ্কার ভাবে তাঁহার সম্মতির প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করেন নাই। এমতাবস্থায় কংগ্রেসপক্ষীয় লোকের রাজগোপালাচারী মহাশয়ের প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সংঘশক্তির অপহ্নব হইতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা এখন এমন জটিল এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক যে, মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের প্রকাশ্য আলোচনায় আমেরীর দলকে শুধু প্রশ্রয় দেওয়া নহে, রীতিমত সাহায্য করা হইবে।

এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও, আচারী মহাশয়ের "ফরমুলা"র মধ্যে বাংলার পক্ষে যে বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনা নিহিত আছে, তাহার আলোচনার প্রয়োজন। কেন না, হয়ত এই প্রস্তাবের সেই দিকটা বাংলার বাহিরের নেতাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কেন স্বাভাবিক, বলিতেছি।

ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য ইংরেজ ভারতবর্ষকে কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছে। এই প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের ভাষা ও কৃষ্টির দিক দিয়া কোন ঐক্য নাই। মাদ্রাজ—তামিল, তেলেগু ও মালয়ালম কৃষ্টির খিচুড়ী; বোম্বাই—কোঁকন, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটী কৃষ্টির অপূর্ব্ব মিলন। মাদ্রাজ বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সিকে ভাঙ্গিয়া তিন টুকরা করিলেও বিশাল ভারতীয় পটভূমিতে কোন বিসদৃশ সমস্যা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিভাগ করিলে বাঙালীর কৃষ্টির সর্ব্বনাশ সাধন করা হইবে। বাঙালী বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যধিক আন্দোলন করিয়াছে, তাহার উচ্ছেদসাধন কল্পে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। সেই কারণে বাংলাদেশকে ভাঙিয়া চুরিয়া বাঙালীকে দুর্ব্বল করিয়া তোলাই ব্রিটিশ নীতির একটা মূলতত্ত্ব।

"বাংলা" হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির একটা নিগূঢ় সমন্বয়। পূজা-পদ্ধতির পার্থক্য বাঙালীর সামাজিক জীবনের ঐক্য কোনও দিন বিনষ্ট করে নাই। বাংলা সাহিত্য ও চিন্তাধারার পরিপুষ্টি ইংরেজ-পূর্ব্ব আমল হইতে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ এই শতাব্দীতেই সেই ঐক্য বিনষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্যেই বাংলার কার্জ্জনীয় বিভাগ হইয়াছিল। অনেক বিপদ বরণ করিয়া বাংলার যুবশক্তি সেই প্রচেষ্টা রদ করিয়াছিল। দেখিতে হইবে যে জিন্না সাহেবের দালালিতে ইংরেজের সেই চেষ্টা সফল না হয়। আচারীর "ফরমুলা" ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতি-বিভাগ স্বীকার করিতেছে। ইহা আধুনিক ও প্রগতিসম্পন্ন চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনে (Federation) অবশ্য প্রত্যেক অঞ্চলের আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্বাধীনতার একটা সীমা আছে। মার্কিন দেশে "সিভিল ওয়ার" দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোনও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া যাইবার অধিকার স্বীকৃত হয় না। আজকাল বৃহৎ জাতিদের সাম্রাজ্যবাদের যুগে, ভারতের ঐক্য নষ্ট করিয়া [illegible]

খণ্ড খণ্ড অংশের স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। জার্মাণ-শক্তির আতঙ্কে ভের্সাই সন্ধির পর মধ্য-ইউরোপকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (self-determination) ধুয়া তুলিয়া যে-ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে জার্মানীর অভ্যুত্থান তো ঠেকান গেলই না, বরং সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও তাসের ঘরের মত ফুৎকারে উড়িয়া গেল। ভারতবর্ষকে সেই বিপদের মধ্যে লইয়া গিয়া কোনও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করা চলে না।

বলা যাইতে পারে, প্রাদেশিক ভূখণ্ডের স্বাধীন সত্তা কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছে। ঠিক কথা; কিন্তু তাহা কৃষ্টি ও ভাষার ঐক্যের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ব্বে ভাষা ও সামাজিক কৃষ্টির ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা না থাকার অধিকার সেই সকল অঞ্চল নিজেরা সাব্যস্ত করিবে।

রাজাজীর "ফরমুলা" আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (self-determination) দিকটা উপেক্ষা করিয়া কৃপ্‌স্ প্রস্তাবের দুরভিসন্ধিরই পরিপোষক হইয়াছে। রাজাজীর "ফরমুলা"তে বলা হইয়াছে যে জেলা হিসাবে সাবালক-ভোট (Plebiscite লওয়া হইবে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত অংশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য আছে,—ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ (জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং বাদে) এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ (খুলনা, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা বাদে)। এই বিভাগগুলি আধুনিক বাংলা প্রদেশের চার ভাগের তিন ভাগ। ১৯৪১ সালের সুমার অনুসারে বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা ছয় কোটী তিন লক্ষের কিছু বেশী। বাংলার পাকিস্থানী অংশে শতকরা ৭০ জন মুসলমান। সুতরাং সেখানে গণভোট লইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। ভৌগোলিক বাংলার এই বিরাট অংশকে বাদ দিলে থাকিবে বর্দ্ধমান বিভাগ, কলিকাতা, ২৪-পরগণা আর খুলনা। এই অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য বটে, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ১,৭৮,৭০,৪৬৪। বর্দ্ধমান বিভাগ, খুলনা ও ২৪-পরগণা লইয়া যে হিন্দু-বাংলা, রাজাজীর "ফরমুলা" অনুসারে তাহাকে কেন্দ্রীয় ভারত কিংবা পাকিস্থানী ভারতের সহিত মিলিত হইবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলকে বিশেষ বিপদে ফেলা হইয়াছে। এই অঞ্চলের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সঙ্গতি এতাদৃশ নহে যে স্বাধীনভাবে একটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের খরচ বহন করিতে পারে। ভের্সাই সন্ধিতে অষ্ট্রিয়াকে যেরূপে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছিল, এই অঞ্চলের সেইরূপ পরিস্থিতি দাঁড়াইবে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুরকে উড়িষ্যায় মিলিত হইতে বলিবে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূমকে বিহারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে বলিবে। রাজাজী এই উপায়ে মুস্কিল আসান করিবেন বটে, কিন্তু "বাঙালী" বলিয়া বিশিষ্ট কৃষ্টির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যাইবে। মাঝখানে জলপাইগুড়ি জেলা পাকিস্থান পরিবেষ্টিত হইয়া ডানজিগ ও মেমেলের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। জলপাইগুড়িকে বাধ্য হইয়া পাকিস্থানী বাংলার সহিত মিলিত হইতে হইবে।

সুতরাং কাগজেকলমে যদিও হিন্দুপ্রধান বাংলাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাজাজী দিয়াছেন বলিবেন, বাস্তবক্ষেত্রে মুসলমান প্রধান অঞ্চলের ভোটের ফলেই তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাদিগকে নিরুপায় করিয়া ফেলা হইবে। লীগকে খুশী করিবার চেষ্টায় কৃষ্টি ও শিক্ষায় মুসলমানদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ একটা ভূখণ্ডের জনসমাজকে "হারিকিরি" করিতে বাধ্য করা হইবে।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, কৃপ্‌স্ প্রস্তাব অপেক্ষা রাজাজীর প্রস্তাব কতখানি অনিষ্টকর। বাংলার ভাষা, কৃষ্টি ও ভৌগোলিক একতা রাজাজীর "ফরমুলা" দ্বারা একেবারে জাহান্নামে প্রেরিত হইবে।

মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৭০ জন হওয়ায় গণভোট লওয়ার যে কোন প্রয়োজন নাই তাহা বলিয়াছি। গণভোট লইতে গেলে আবার এক বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। ভোট লওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন ও তোড়জোড়ের ফলে "পাকিস্থানী" মনোবৃত্তি খুব প্রবল হইয়া উঠিবে। ভোট-গণনায় যখন তোড়জোড় আরম্ভ হইবে তখন স্বার্থান্ধ এক শ্রেণীর লোক "পাকিস্থান" হইয়া গিয়াছে, এই প্রচার আরম্ভ করিবে এবং অজ্ঞ ও নিরক্ষর মুসলমানদের বিরাট্ ইস্লাম-রাজ্যের ধাপ্পা দিয়া সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। হিন্দুরা এবং জাতীয়তা-বাদী মুসলমানেরা যখন এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা প্রোপাগাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিবেন তখন দাঙ্গা ও খুনাখুনি আরম্ভ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহার সুদূর-প্রসারী ফল কি হইবে, এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া সমগ্র বাংলাদেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের খাসমহল করিয়া রাখিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতেও যে পারেন, তাহার সম্ভাবনা ঐ কৃপ্‌স্ প্রস্তাবের মধ্যেই রহিয়াছে। রাজাজী হয়তো বাংলাবিহীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিত্ব-গৌরবে সুখী হইবেন। কিন্তু এইরূপ একটা অঙ্গহীন ভারতবর্ষের (Vivesected India) সম্ভাবনা স্মরণ করিলেও মহাত্মাজী যে অসুখী হইবেন, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং মহাত্মাজীকে এই সমস্যার পূর্ণরূপটা বাৎলাইয়া দেওয়া জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমানমাত্রেরই কর্ত্তব্য। গণভোটে আমরা বিশ্বাসী কিন্তু কংগ্রেসের নীতি অনুসারে ভাষাগত প্রদেশের সৃষ্টি প্রথমে করিয়া তাহার পর সেই সকল প্রদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেওয়া-না-দেওয়ার অধিকার দিলে আমাদের আপত্তি হইতে পারে না। ভাষাগত প্রদেশ সৃষ্টি করিতে গেলে এখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে নিম্নলিখিত অঞ্চল সংযোজিত করা একান্ত সমীচীন—পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ, সমগ্র মানভূম ও সিংভূম জেলা, রাঁচী জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশের বুন্দু ও খুঁটী অঞ্চল; এবং সমগ্র শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা। এই সমগ্র অঞ্চলে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভাবে একই কৃষ্টি বর্ত্তমান। এই বিরাট ভূখণ্ড ভারত-বর্ষের যুক্তরাষ্ট্রের এক শক্তিমান্ অংশ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিদেশী প্রভুদের পক্ষে এই ভূখণ্ডের একতা বড়ই অসুবিধাজনক। সুতরাং এই ভূখণ্ডের কৃষ্টির বিলয় চেষ্টাই

ইহারা করিতেছেন। কিন্তু এই ভূখণ্ডকে টুকরা টুকরা করিয়া দিলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রেরও শক্তি ক্ষুণ্ণ করা হইবে। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির (International Politics) কথা স্মরণ করিলে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ব্বলতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে মঙ্গল সূচনা করিবে না। যদিই বা ইংরেজ ভারতবর্ষে না থাকে, তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে পূর্ব্বদিকে সাম্রাজ্যলোলুপ এবং অতিশয় ক্রূর স্বভাবের এক জাতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যন্তদেশ দুর্ব্বল হইলে, ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে না। ভারতের বহিঃরাষ্ট্রনীতি ও আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি—এই উভয় বিচারেই রাজাজীর "ফরমুলা" শুধু যে প্রমাদপূর্ণ তাহা নহে, সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

রাজাজীর প্রস্তাবে মহাত্মাজীর সম্মতি আছে, ইহা আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু মহাত্মাজী কোনও দুরূহ সমস্যা সম্বন্ধে কখনও নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নীরব থাকেন না। তিনি তাঁহার মতবাদ যত্নসহকারে যুক্তিদ্বারা লোক-সমক্ষে উপস্থিত করেন। রাজাজীর "ফরমুলা"র এখনও মহাত্মাজী সেরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। মনে রাখিতে হইবে যে মহাত্মাজী ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব অচল ইহা স্বীকার করিয়াছেন। রাজাজীর "ফরমুলা" ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবকে গ্রহণ করাইবার একটা উপায় বটে, কিন্তু ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব অপেক্ষা উহাতে অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা বর্ত্তমান। সুতরাং মহাত্মা ও রাজাজীর মধ্যে এখনও আকাশপাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। সেইজন্যই রাজাজীর প্রচেষ্টায় মহাত্মাজীর সম্মতি আছে, ইহা জানিয়াও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, নূতন করিয়া বাংলায় হৃৎপিণ্ড নিষ্কাশনের ষড়যন্ত্রে মহাত্মাজীর সহযোগিতা রহিয়াছে। এই জন্যই মহাত্মাজীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁহাকেই ভারতের রাষ্ট্রনায়ক স্বীকার করা সত্ত্বেও, আমরা রাজাজীর "ফরমুলা"র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে লীগের সকল দাবী মানিয়া লইতেও আমাদের আপত্তি হইত না, যদি জিন্না-অধ্যুষিত লীগের স্বাধীনতার জন্য সত্যকার দরদের কোন প্রমাণ থাকিত। "পাকিস্থানী" ভারত "হিন্দুস্থান" অপেক্ষা জনবলে ও অর্থবলে অনেক দুর্ব্বল রহিবেই। শক্তিমান "হিন্দুস্থানে"র ভয়ে "পাকিস্থান" তৃতীয় পক্ষকে আশ্রয় করিবেই। ইংরেজ ভাবিতেছেন সেই পরিস্থিতির সুযোগ লইবেন। রাজাজীর "ফরমুলা" সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতেছে মাত্র।

বড়োর কথা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিরাট্ মহাবংশধারার ভস্মোপরে প্রাণ দিতে সব কঙ্কালেরি বক্ষে
যেই নদীটি নাম্‌লো হেথায় বিপুল বেগে আবেগভরা রঙ্গে,
সেই নদীটি জন্মাবে কি এই ধরণীর ক্ষুদ্র গিরির অন্ধকারের গর্ভে?
কক্ষণো নয়,—সেই নদীটি জন্মালো তাই হিমালয়ের অঙ্গে।
সেই নদীটির মর্ত্ত্যে নামার গান গাবে কি রামা শ্যামা বাজিয়ে বাঁশের বংশী?
কক্ষণো নয়,—শ্রীভগীরথ শঙ্খেতে তাই গাইলো তাহার গীতটি শতরঙ্গা,
সেই নদী কি অজয় এবং ইচ্ছামতী রূপনারায়ণ কাঁসাই নামের যোগ্যা?
কক্ষণো নয়,—বিপুলবেগের ছন্দেতে তাই বিশ্বে তাহার নামটি হ'ল গঙ্গা।
বিশ্বজোড়া কর্ম্ম লাগি' যেথায় কোনো মহাব্রত মহান্ মানব-মর্ম্মে,
উচ্ছ্বসিয়া উঠলো ফুলি, সেই ব্রত কি রচবে কোনো গ্রামের মাঝে গণ্ডী?
কক্ষণো নয়—সেই ব্রতেরি কর্ম্মসাধনক্ষেত্র হবে নিখিলজোড়া বক্ষে,
বিরাট্ মহান্ ভাবধারাতে লক্ষ হাজার নরের হৃদয় রাখবে সে যে মণ্ডি'।
বিরাট্ হরি শোবেন যেথায় সেথায় কি গো থাক্‌তে পারে সুতায় রচা শয্যা?
কক্ষণো নয়,—অনন্তেরি বিরাট্ ফণা দুলবে সেথায় লক্ষ মাথায় রঙ্গে।
নলের মতো শিল্পী যেথায় বাঁধবে ওরে রাবণ-বধের বিরাট্ সেতুবন্ধ,
রামের মতন বিরাট্ নরের ধনুর আশীষ নিত্য যে গো থাকবে তাহার সঙ্গে।
বিরাট্ যাহা সত্য তা' কি চলতে গিয়ে থম্‌কাবে কি সমাজবিধির কক্ষে?
কক্ষণো নয়,—চলবে তাহা নিষেধবিধির হাজার বাধার শাসন করি' ভঙ্গ,
প্রণয় যেথায় উদ্বেল হ'ল রসোচ্ছ্বাসে আত্মহারা মহান নারীর বক্ষে
ক্ষুদ্র নরের ভোগ্য সে কি?—কক্ষণো নয়, শ্যামের মত বিরাট্ বুকেই হবেই সে যে লগ্ন।
পদ্মানদীর বানের মত দুকূলভাঙা শ্রেষ্ঠ যাহা আবেগময়ী কাব্য
সে কাব্য কি থাকবে কি গো বধূর মতো ক্ষুদ্র দেহের ঘোমটাটিকে বন্দি'?
কক্ষণো নয়,—রসোত্তরী যুগপ্লাবী—বিশ্বে অতুল মহান যেটি কাব্য,
হিল্লোলিয়া দুলিয়ে কটি চলবে সে যে রসোল্লাসে বিপুল দেহে ছন্দি'।
বিরাট্ কোনো কল্পনাতে দীপ্ত যাহা আবেগময়ী থাকবে না সে ক্ষুদ্র কভু অঙ্গে,

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ফ্রান্সে যুদ্ধের রূপ ক্রমেই ঘোর হইতে ঘোরতর হইতেছে। লিখিবার সময় দক্ষিণ-ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে মিত্রপক্ষের সৈন্যদলের অবতরণের সংবাদ আসিয়াছে। দক্ষিণ-ফ্রান্সের সমুদ্রতীরের অঞ্চলের পূর্ব্বভাগের সুপ্রসিদ্ধ "রিভিয়েরা" অংশ ইউরোপের বিলাসী ধনীদিগের লীলা-ভূমি। এই স্থানের সমুদ্রতটে বালুকাময় ঢালু পাড় অনেক স্থলেই আছে যেখানে আক্রমণকারী সৈন্যশক্তি দ্রুত অবতরণ করিতে পারে। কিন্তু সমুদ্রতটের অল্প দূরেই পর্ব্বতমালার আরম্ভ এবং সেই পর্ব্বতমালা ক্রমেই ঘন হইয়া ফ্রান্সের "মারিতিম আল্পসের" পার্ব্বত্য অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য পশ্চিমের দিকে এই পর্ব্বতমালার মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে এবং সেই পথে টুলঁ হইয়া ক্রমে মার্সাই এবং তাহার পর রোননদের উপত্যকায় পৌঁছান যায়। পূর্ব্বমুখে ইটালীর সীমান্তের দিকের পর্ব্বতমালা ঘনসন্নিবিষ্ট এবং দুরারোহ। এইখানেই ১৯৪০ সালে মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্য ইটালীর আক্রমণ স্থাণু করিয়া রাখিয়াছিল। উত্তর মুখে সুইস সীমান্তের দিকেও ছোট-বড় পর্ব্বতমালায় সমস্ত প্রদেশ আচ্ছন্ন। এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় চিরবসন্ত, সুতরাং মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণ অতি অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে পারে। জলে, স্থলে ও আকাশে, তিন ক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের শক্তি এখন সর্ব্বত্রই বিপক্ষ হইতে বহু গরিষ্ঠ, কিন্তু আকাশ-পথে মিত্রপক্ষ এখন যেরূপ প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে স্থলে তাহার অনুরূপ কিছু এখনও হয় নাই। সুতরাং দক্ষিণ-ফ্রান্সের আক্রমণে জার্ম্মান রক্ষীদল এখন ইটালীস্থিত মিত্রপক্ষের আকাশবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে পড়িবে মনে হয়।

উত্তর-ফ্রান্সে মার্কিন সেনা অবিশ্রাম প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জার্ম্মান রক্ষাব্যূহকে প্রসারিত এবং কয়েক স্থলে বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হওয়ায় ব্রিটানী এবং দক্ষিণ-নর্ম্মাণ্ডি অঞ্চলে জার্ম্মান সেনার পরিস্থিতির কিছু অবনতি ঘটিয়াছে। এই আক্রমণের পর ব্রিটিশ ও কানাডীয় সৈন্যও প্রচণ্ড আক্রমণ চালনার পর দক্ষিণ-মুখে কিছু অগ্রসর হওয়ায় জার্ম্মান রক্ষীবাহিনীর এক অংশ বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বেড়াজালে এখনও সঙ্কীর্ণ ফাঁক আছে এবং জার্ম্মান রক্ষীদল এখনও প্রবল যুদ্ধ দান করিতেছে এবং সুসংবদ্ধ ভাবেই সৈন্য চালনায় তৎপর রহিয়াছে, সুতরাং আরও কিছু দিন এখানে যুদ্ধ না চলিলে ফলাফল বুঝা যাইবে না। উপকূলস্থ অঞ্চলের দুর্গরক্ষীদলও প্রচণ্ড বাধাদান করিতেছে। এই সকল একত্রে দেখিলে মনে হয় উত্তর-ফ্রান্সের রণাঙ্গনে এখনও খণ্ডযুদ্ধসমষ্টিই চলিতেছে, তবে সেখানে ক্রমেই যন্ত্রবাহিত যুদ্ধ-অভিযানের বিস্তৃত ও সচল রূপ ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। দশ সপ্তাহের ঘোরতর রণের ফলে মার্কিন সেনাধ্যক্ষগণ উত্তর-ফ্রান্সের যুদ্ধের স্থাণু-ভাবের মধ্যে কিছু পরিমাণে রূপান্তর আনিতে সমর্থ হইয়াছে মনে হয়। তবে এই অঞ্চলের খণ্ডযুদ্ধগুলির সমাপ্তি হওয়ার পূর্ব্বে জার্ম্মানদল নূতন রক্ষণব্যূহ গঠনে সমর্থ হয় কি না তাহার উপর দ্বিতীয় রণপ্রান্তের নূতন রূপ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। এখন যে পরিস্থিতি রহিয়াছে তাহাতে মিত্রশক্তি নূতন সেনা ও যন্ত্রবাহিনী উত্তরোত্তর যুদ্ধে যোজনা করিতে সমর্থ হইবে এবং ইহাই মিত্রপক্ষের দশ সপ্তাহের যুদ্ধের প্রধান ফল।

রুশ যুদ্ধপ্রান্তে প্রায় পাঁচ সপ্তাহের আপেক্ষিক যুদ্ধ-বিরতির পর পুনর্ব্বার অগ্নি-প্রবাহের সূচনা দেখা দিয়াছে। জার্ম্মানদল তিন সপ্তাহের মধ্যে বহু দূর পিছু হটিবার পর কার্পাথিয়ান পর্ব্বতমালা হইতে বল্‌টিক অঞ্চল পর্য্যন্ত প্রায় সরল রেখায় ব্যূহ স্থাপন করিয়া যুদ্ধ দান করে। এখন রুশ সেনা উত্তরের দিকে জার্ম্মানির পিতৃভূমির সীমান্তের অতি অল্প দূরেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং আরও দক্ষিণে জার্ম্মানির অন্যতম অস্ত্রশিল্পকেন্দ্র সাইলেসিয়া হইতেও বেশী দূরে নাই। জার্ম্মানির মূল যুদ্ধ-পরিকল্পনা (Master Plan) কি বা কোন্ সূত্রের উপর স্থাপিত তাহা এখনও বুঝা যায় নাই, কিন্তু আর পিছু হটিলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জার্ম্মানির শক্তির উৎসগুলি বিপন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য দিকে ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলের গ্রীষ্মকাল অতীতপ্রায়, এবং শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রযুদ্ধের সময়ের সীমা নিকটতর হইয়া আসিবে। এই বৎসর শরৎকালের মধ্যে রুশ-সেনা কার্পাথিয়ান পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন, জার্ম্মান-পোলাণ্ড সীমান্ত অতিক্রম এবং বল্‌টিক অঞ্চল শত্রুশূন্য না করিলে, শীতকালীন অভিযান চালনা তাহাদের পক্ষে অতি কঠোর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে, কেননা রুশসেনা এখন সোভিয়েটের সরবরাহ কেন্দ্র হইতে বহুদূরস্থ, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অঞ্চলে রহিয়াছে। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে মনে হয় সামান্য মাসাধিক কালের মধ্যেই রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধ চরমে উঠিবে।

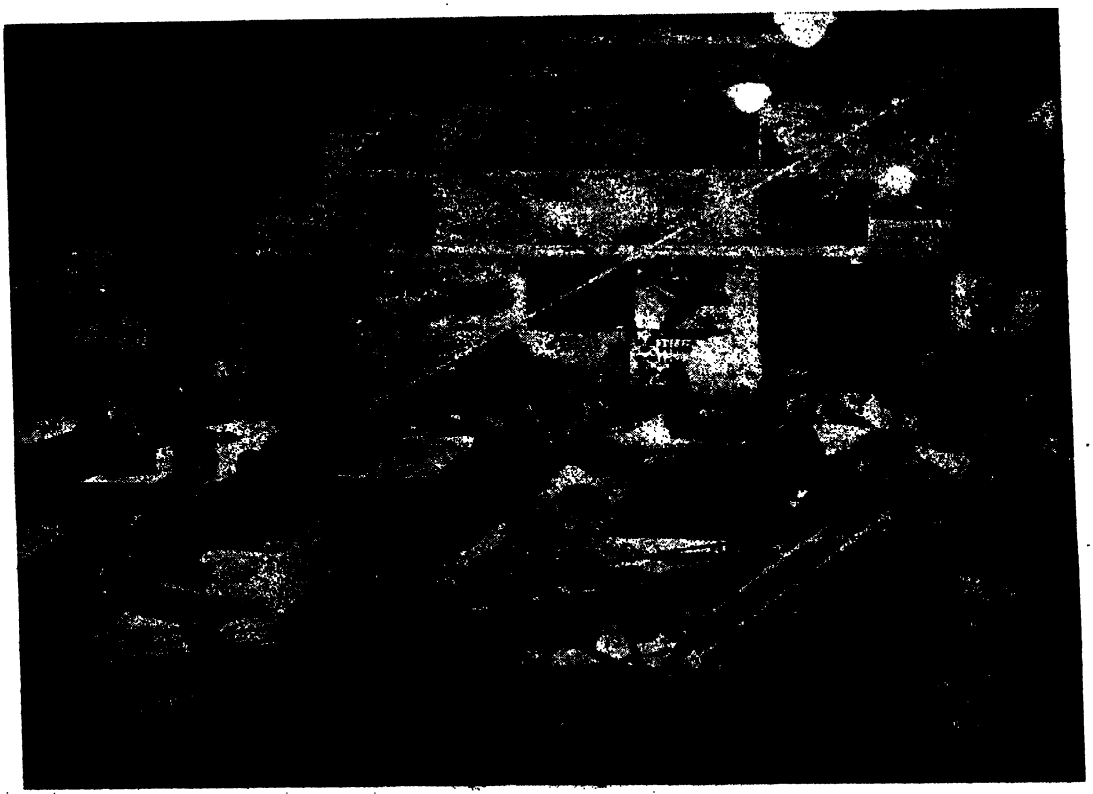
যদিও এখনও বিচারের সময় আসে নাই, কেননা মিত্র সৈন্যশক্তি কোন্ মুখে প্রবাহিত হইবে তাহার কোনও নির্দ্দেশ এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে দক্ষিণ-ফ্রান্সে মিত্রসেনার অবতরণ রুশ যুদ্ধপ্রান্তে সোভিয়েট অভিযানের সাহায্য করার জন্যই এই সময় করা হইয়াছে। যেখানে আক্রমণ করা হইয়াছে সেখান হইতে ফ্রান্স দখল অতি দুরূহ ব্যাপার এবং উত্তর-ফ্রান্সের মিত্রবাহিনীগুলির সঙ্গে যোগস্থাপনও সময়সাপেক্ষ কিন্তু এখানে প্রবল আক্রমণ চালাইলে জার্ম্মানির শক্তির পুঁজির উপর টান

পড়িবেই, যাহার ফলে সোভিয়েট সেনার স্কন্ধের ভার লাঘব হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে। অবশ্য আক্রমণের গতিমুখ যদি অতি প্রচণ্ডভাবে ইটালীর সীমান্তের দিকে চালিত হয় তবে ইটালীর অভিযানেরও রূপান্তর ঘটিতে পারে, কিন্তু সেরূপ অভিযান গঠনও সময়সাপেক্ষ এবং মিত্রপক্ষ এখন কোনও সময়সাপেক্ষ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য চালনা করিবে মনে হয় না। চার্চ্চিলের অল্পদিন পূর্ব্বের এক ঘোষণায় ইহা স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছিল যে, ইউরোপের যুদ্ধ আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যেই শেষ হইতে পারে—অর্থাৎ আর দশ সপ্তাহের মধ্যেই জার্ম্মানীর পতনের সম্ভাবনা আছে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিত্রপক্ষের তিনজন উচ্চতম অধিকারীর একজন, সুতরাং এই উক্তির পিছনে অনেক নিগূঢ় তথ্যের ইঙ্গিত থাকা সম্ভব যাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। ইতিপূর্ব্বে চার্চ্চিলের এক বক্তৃতায় গ্রীষ্মকালের মধ্যেই জার্ম্মানীর পতনের সম্ভাবনার নির্দ্দেশ ছিল, যাহাতে হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিত সুস্পষ্টই ছিল কিন্তু জগতের সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং চার্চ্চিলের উক্তিতে আমরা এইমাত্র নির্ণয় করিতে পারি যে, মিত্রপক্ষ এখন ইউরোপের যুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টিত ও আশান্বিত। আশার প্রকাশ্য কারণ দুইটি; প্রথম, মিত্রপক্ষের পূর্ণশক্তির সহিত জার্ম্মানীর যুদ্ধশক্তির বিষম তারতম্য এবং দ্বিতীয় সোভিয়েট সেনার শত্রুতাড়নে সাফল্য এবং দ্রুত অগ্রগতি। পূর্ব্বপ্রান্তে জার্ম্মানশক্তির বিরোধ-চেষ্টায় ভাটা পড়িলে সোভিয়েট সেনা প্লাবনের জলস্রোতের ন্যায় জার্ম্মানীতে প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ফ্রান্স, ইটালী এবং রুশপ্রান্ত এই তিন ক্ষেত্রের অভিযানই পরস্পর সংবদ্ধ পরিকল্পনার বিভিন্ন অঙ্গ এবং একের উপর অন্যের প্রগতি নির্ভর করিতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও দ্রুত নিষ্পত্তির সম্ভাবনা একমাত্র পূর্ব্ব প্রান্তেই এ পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে এবং তাহাও আগামী পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যে কি ঘটে, তাহার উপর নির্ভর করে। উত্তর-ফ্রান্সের দিক হইতে দ্রুত নিষ্পত্তির ইঙ্গিত আমরা জেনারেল আইজেনহাওয়ারের বিবৃতিতে পাই নাই এবং দক্ষিণ-ফ্রান্সে তো সবেমাত্র গোড়াপত্তনের কার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল স্টালিনগ্রাডে এবং তাহাও কিছু অংশে ঋতুবৈষম্যের ফলে ঘটে। সেরূপ কিছু পুনর্ব্বার ঘটিলে বা অন্তর্বিপ্লবের আগুন জ্বলিলে জার্ম্মানীর পতনের সূত্রপাত যে কোনও দিক থেকেই হইতে পারে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহার কোনও নির্দ্দেশ আমরা পাই নাই। যুদ্ধ এখন ইউরোপের সকল ক্ষেত্রেই ক্রমে ঘোর হইতে ঘোর-হইতে থাকিবে ইহা নিশ্চয়, কিন্তু এখনও সকল ক্ষেত্রেই চলিতেছে জার্ম্মান জাতির পিতৃভূমির বাহিরে এবং আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বিচারে জার্ম্মানীর সহিত শেষ নিষ্পত্তি সম্ভব একমাত্র জার্ম্মানীর নিজ ভূমিখণ্ডের উপরে।

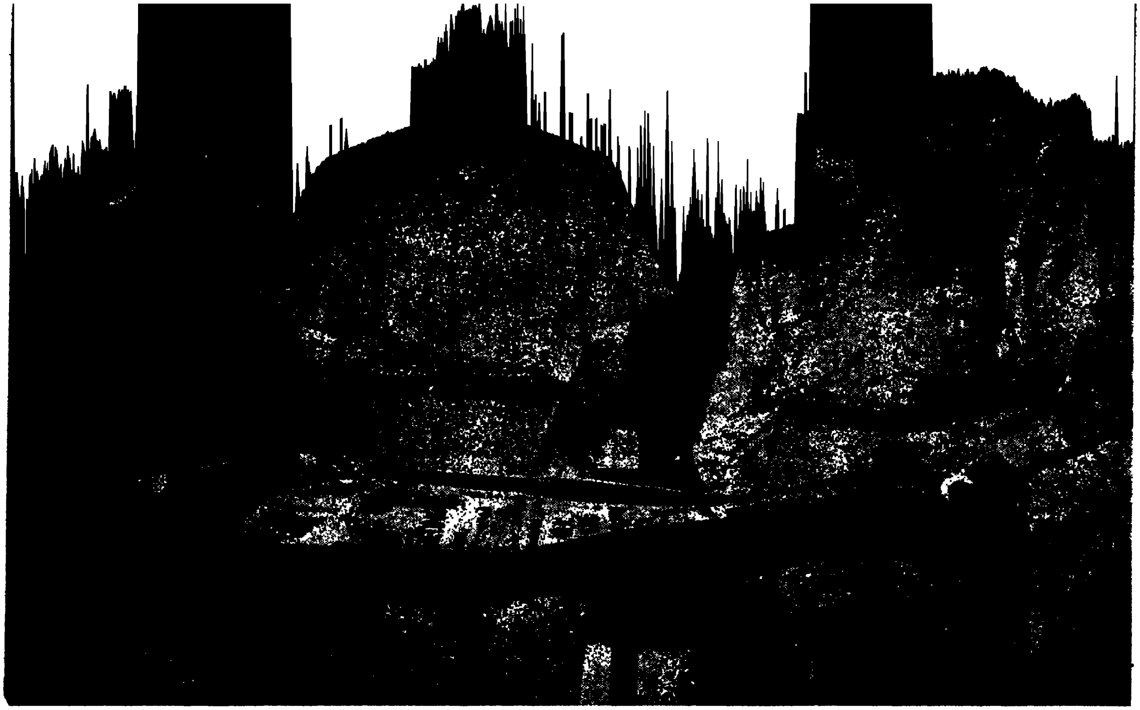
এশিয়ায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন বিভিন্ন রূপে চলিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান প্রচণ্ড "মরণপণ" যুদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে হটিতেছে। এই যুদ্ধপ্রান্তের কোথাও জাপান পুনরধিকারের যুদ্ধ গঠনে সমর্থ হয় নাই। মার্কিন আকাশবাহিনীর প্রাধান্যের ফলে জাপানের নৌবল এখন সীমাবদ্ধ, স্থলশক্তিও কেন্দ্র হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নপ্রায়। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জে জাপান এখন কেবল মাত্র প্রতিরোধ-চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু জাপানের স্থল-সেনা এই প্রতিরোধের চেষ্টায় এখনও প্রবল ভাবেই যুদ্ধ দান করিতেছে। মার্কিন দেশের এক-জন উচ্চ অধিকারী সম্প্রতি বলিয়াছেন যে প্রশান্ত মহা-সাগরে দশ লক্ষ মার্কিন সৈন্য এখন পর্য্যন্ত প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, মার্কিন দেশ এখন জাপানের বিষয় সজাগ এবং চার্চ্চিলের "এসিয়া অপেক্ষা করুক" উক্তির সহিত মার্কিন দেশ এখন আর সম্পূর্ণ একমত নাই। ইহার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের পরি-স্থিতির কিছু অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরী যথেষ্টই হইয়া গিয়াছে এবং আরো দেরী হইলে জাপা-নের পক্ষে তাহার সমূহ বিপদ কিছু মাত্রায় কাটাইয়া উঠা একেবারে অসম্ভব নহে। জাপানের নৌবল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার আকাশবাহিনী প্রাধান্য হারাইয়া ফেলায় তাহার সকল যুদ্ধ-পরিকল্পনাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চলিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য যে, জাপান নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নাই, ঘরেও নহে, যুদ্ধক্ষেত্রেও নহে। ঘরে তাহার যুদ্ধযন্ত্র নির্ম্মাণের ও উন্নতির চেষ্টা অবিশ্রাম চলি-তেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার স্থলসেনা এখনও চীনদেশে পূর্ণ উদ্যমে লড়িতেছে এবং অন্যান্য প্রান্তে প্রবল বাধা দান করিতেছে। হেঙ্গয়াঙের যুদ্ধে এবং তাহার পরে যে ভাবে জাপান সৈন্য চালনা করিতেছে তাহাতে জাপানে নৈরাশ্যের প্রবাহ বহিতেছে এরূপ ভাবিবার কোনও অবকাশ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মার্কিন শক্তির আকাশবাহিনীর প্রতাপে জলপথ বিপদসঙ্কুল হওয়ায় জাপান এখন স্থলপথে ভারতমহাসাগর, ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় ও ব্রহ্মদেশের সহিত যোগসূত্র গঠনের চেষ্টায় ব্যস্ত। এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইলে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান আরও অধিক প্রবল হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা অদূর ভবিষ্যতে হইলে চীনের পক্ষে মঙ্গল। বলা বাহুল্য, এই চেষ্টা সফল হইলে মিত্রপক্ষের কার্য্যক্রম আরও বাধা-বিপত্তিপূর্ণ হইবে এবং সেইজন্যই স্বাধীন চীন সেনা এখন প্রাণপাত করিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে।



সমররত ব্রিটেনে রণ-সম্ভারপূর্ণ বজরা চালনার কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষার্থিনীদের উপদেশ দান



আর-এ-এফ্-এর আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদিগকে দিক্-নির্ণয়-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে



চুংকিঙে জেনারেল ষ্টিলওয়েলের প্রধান কর্ম্মস্থলে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ওয়ালেসের অভ্যর্থনা



চুংকিঙে রেড-ক্রশ ক্লাবের বালিকারা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ওয়ালেসকে মাংস ও কফি পরিবেশন করিতেছে

প্রাগৈতিহাসিকী

পাঁচ হাজার বৎসর বা তার চেয়েও আগের মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন নগর 'সুমের' বা 'আক্কড়ে'র কথা যখন শুনি, মিশরের নীল নদীর বন্যাপ্লাবিত দুই তীরে মানুষের সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাই, প্রাচীন সিন্ধুর লুপ্তধারার কোলে, 'মহেঞ্জদারো'র মত ভূ-গর্ভলীন নগর-স্তূপের সন্ধান লাভ করি তখন মানুষের সভ্যতার প্রাচীনত্বের কথা ভেবে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। সেই সুদূর অতীতেও দেখা যায়, বর্তমান নাগরিক জীবনের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্যেরই আভাস আছে।

এখনকার মরুভূমি নয়, তখনকার ইউফ্রেটিসের উর্ব্বর উপকূলে নাতিগৌর দ্রাবিড়াত্মক 'সুমের'বাসীরা গৃহ-নির্ম্মাণ থেকে আরম্ভ করে বয়ন পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, মৃৎ-শিল্পে তাদের নিপুণতা সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের নাগাল পেয়েছে, লিপিচিহ্নের ব্যবহার পর্য্যন্ত তাদের অজ্ঞাত নয়। তাদের লিখনের আধার অবশ্য ছিল স্থূল মাটির টালি মাত্র। কিন্তু সেই মৃৎ-ফলক খোদিত নাতিস্ফুট লিপিই সভ্যতার প্রথম কাহিনী সংগ্রহ করে রেখেছে ভাবী-কালের জন্য।

সে কাহিনীর পুরানত্ব আমাদের বিস্মিত করে বটে, কিন্তু সত্যই আমাদের সভ্যতার বয়স এমন কিছুই নয়। সৌরমণ্ডল বা এই পৃথিবীর কল্পাতীত আয়ুর তুলনায় বলছি না। সৃষ্টি-প্রভাতের ঘন বাষ্পাচ্ছাদিত আকাশের তলায় উষ্ণ, উদ্বেলিত আদি সাগরে, প্রথম যেদিন অপূর্ব্ব ঘটনাসমাবেশে আদি প্রাণকলিকার আবির্ভাব হয়েছিল, সেই দিনকার অন্তহীন দূরত্ব স্মরণ করেও নয়; জীব-জগতের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে মানুষ যতদিন পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে তারই হিসাবে এ সভ্যতা ক্ষণকালের; মানুষের উদ্বর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষের কটি লাইনে মাত্র এ সভ্যতার সূচনা দেখা যায়।

পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপ ভূতত্ত্বের হিসাবে বেশী দিনের নয়। দুই মেরুর তুষারাবরণ নির্ম্মমভাবে অভিযান করে সমস্ত পৃথিবীকে একাধিক বার মরণ-আলিঙ্গনে বেষ্টন করে ধরেছে। আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবী নাকি শেষ তুষার-আলিঙ্গন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় নি। প্রথম পৃথিবীর তুষারবেষ্টন অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষই অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়েছিল, না অরণ্যই মানুষের আদি পূর্ব্বপুরুষকে অসহায় ভাবে ফেলে সরে গেছল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু অরণ্য-আবেষ্টন থেকে মুক্ত আদি মানুষকে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করবার আগে, হাজার নয়, বহু অযুতবর্ষ ধরে যে ভবিষ্যৎ নিয়তির জন্য আর সমস্ত বন্যপ্রাণীর সহচররূপে প্রস্তুত হতে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন-কার অতিকায় গুহা-ভল্লুক আর বিশাল অসি-দন্তী শার্দ্দূলকে এড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় লোমশ হস্তীর বিচরণক্ষেত্রে সে তৃণভোজী পশুপালের পিছু পিছু শিকার করে ফিরেছে। যে পশুযূথকে সে মৃগয়ার জন্য অনুসরণ করেছে তারাই ক্রমশঃ আশ্রিত হয়ে উঠে তাকে নিশ্চিন্ততার স্বাদের সঙ্গে সভ্যতার প্রথম সুযোগ দেবে একথা তখন কে জানত।

যন্ত্র-বিজ্ঞান-মুখরিত বর্ত্তমানের মধ্যে বাস করে আমরা সে সুদূর অতীতের কথা ভুলতে পারি কিন্তু আমাদের দেহ এখনও তা ভোলে নি। সত্য কথা বলতে কি এখনও এ সভ্যতাকে সে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেনি। আদিম আরণ্য শিকারীর জীবনের ধারার সঙ্গেই এখনও তার সঙ্গতি। সভ্য জীবনের সঙ্গে সেইজন্যে সব সময়ে তার বনিবনাও হয় না। আমাদের বৃহদন্ত্রে দৈর্ঘ্যতা এমনি ছিল আরণ্যজীবন ও আহার সম্বন্ধে তার অনিশ্চয়তায় উপযোগী। সভ্যতার খাদ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে বদলায় নি বলেই, অনেক সময়ে গোলযোগ বাধে, শরীরের আবর্জ্জনা যথারীতি নিষ্কাশিত হয় না, এবং বিবাদ এড়াবার জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় বেঙ্গল ইমিউনিটির 'বাই আগার অয়েল' ব্যবহার করে।

মাতা ও শিশু

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি একত্র করিলে দেখা যাইবে তাহাদের অধিকাংশকে একটি বিষয় অনুপ্রাণিত করিয়াছে—সে বিষয় মাতা ও শিশু। ইহার ভিতর এত মাধুর্য্য সঞ্চিত যে যুগে যুগে নানাভাবে আঁকিয়াও শিল্পীরা তাহা নিঃশেষ করিতে পারে নাই। চিত্রজগতের বাহিরেও এই পবিত্র রূপের মহিমা মানুষের কল্পনাকে চিরকাল অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ খৃষ্টান-ইউরোপ মেরী ভিন্ন যীশুকে পৃথক্ ভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে যশোদা ও কৃষ্ণের কাহিনী চিরন্তন অপরূপ রসধারা সৃষ্টি করিয়াছে। মাতা ও শিশুর মিলিত রূপের প্রতি মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কারণ সৃষ্টির গভীরতম অর্থ ও মহিমা এই সম্মিলিত রূপের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার জগতেই মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া থাকিবে না? সুস্থ প্রফুল্ল শিশু, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি এই অপরূপ সমাবেশ দেখিবার জন্য কি আমাদের চিত্র-শালায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। বাংলা দেশের চারিদিকে চাহিয়া ত সেই সন্দেহই জাগে। শিল্পীকে আজ তাহার আদর্শ খুঁজিতে যে বহুদূর ব্যর্থ পর্য্যটন করিতে হইবে। চারিধারে রুগ্ন, বিবর্ণ মাতৃমূর্ত্তি—নয়নে মাতৃত্বের মমতা আছে কিন্তু নাই জ্যোতিঃ, নাই স্বাস্থ্য। দেশব্যাপী এই দৃশ্যের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া শুধু কল্পনায় কেমন করিয়া আমরা সান্ত্বনা পাইতে পারি। সেই কল্পনা দাঁড়াইবেই বা কিসের আশ্রয়ে?

শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু মাতা ও শিশুর কল্যাণ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে নষ্ট হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জগতের দিকে চাহিয়া আর কিছু না হউক এ বিষয়ে আমরা অনেক শিখিতে পারি, তাহারা শুধু শিল্পে নয়, ব্যবহারিক জগতেও মাতৃত্বের মর্য্যাদা দিতে জানে। আমাদের দেশের জনমত যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহা নহে। বলিকার মাতৃত্ব, অস্বাস্থ্যকর আঁতুরঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বদলাইতেছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া যতটুকু পারা যায় আমাদের করিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে প্রসূতি-কল্যাণের তথ্য প্রচার করিতে হইবে। দেশে শিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা যাহাতে বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। শিল্পকলা হইতে ঔষধের প্রথা অনেক দূর হইলেও সে কথাও না পাড়িয়া উপায় নাই। বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষিত ঔষধের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত, যেমন সন্তান-সম্ভবা জননীর জন্য এবং প্রসবের পর প্রসূতির নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেঙ্গল ইমিউনিটির **"ভাইনো মল্ট"**—এই ঔষধের কথাও সকলের জানা কর্ত্তব্য।

পুস্তক-পরিচয়

কালিকামঙ্গল—বলরাম কবিশেখর বিরচিত। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা।

বাংলার প্রাচীন কবিদের অনেকেই মঙ্গল-কাব্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কবিশেখর বলরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত কালিকা মঙ্গল প্রকাশ করিয়া শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী পাঠকসমাজের নিকট আর একখানি মঙ্গল-কাব্যের সন্ধান দিয়াছেন। আবার, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, 'কালিকামঙ্গলে'র কবিও তাঁহাদের অন্যতম। সম্পাদকের মতে কবিশেখর বলরামকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করা যাইতে পারে। পুস্তকে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত একটি মুখবন্ধ আছে। সম্পাদকমহাশয়ের ভূমিকা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ভূমিকায় তিনি ভারতচন্দ্র ছাড়া চৌদ্দ জন বিদ্যাসুন্দরের কবির পরিচয় দিয়াছেন। বিস্তৃত পাদটীকায় পাঠককে যথেষ্ট সাহায্য করে। শেষে কয়েকটি টিপ্পনী, শব্দসূচী ও রাগরাগিণীর সূচী সন্নিবেশিত হইয়াছে। কালিকামঙ্গল যে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আদর লাভ করিয়াছে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : (৪৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (৪৪) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড। কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে বার আনা ও ছয় আনা।

যে-সকল চিন্তানায়ক উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার চিন্তাধারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ভূদেব মধুসূদনের সমসাময়িক ও তাঁহারই সহপাঠী। বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা দশ বৎসরের বড় হইলেও তিনি বঙ্কিমেরও বন্ধু ছিলেন। উপন্যাস-রচনায় তিনি বঙ্কিমের অগ্রবর্ত্তী। তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূদেবের প্রচলিত জন্ম-তারিখ ১৮২৫ সাল। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আবিষ্কৃত কোষ্ঠী সাহায্যে ব্রজেন্দ্রবাবু স্থির করিয়াছেন তাঁহার জন্ম ১৮২৭ সাল। ভূদেবের প্রস্তাবে বিহারের আদালতসমূহে ফার্সীর পরিবর্ত্তে হিন্দী প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' প্রভৃতি পড়িয়া পাঠক আজও আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করে।

"ভুবনমোহিনী প্রতিভা"র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনমোহিনী দেবী এই ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখিতেন। সে-সময় তাঁহার কবিতা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী—তিন কবির তিনখানি বই অবলম্বন করিয়া একদা তরুণ রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুরে' এক সমালোচনা লেখেন। নবীনচন্দ্রের জীবন বৈচিত্র্যময়। এ পুস্তকে তাঁহার অপ্রকাশিত আত্মচরিত হইতে কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার মধ্য দিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর অনেকগুলি বিস্মৃত ও অর্দ্ধবিস্মৃত লেখকের সহিত পাঠকসমাজের পরিচয় স্থাপন করাইয়াছেন।

অসি ও বাঁশী—শ্রীশান্তি পাল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই কবিতার বইখানিতে দুই ধরণের কবিতা আছে—লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, অসিখেলা, কুচকাওয়াজ, সাত মাইল, ওয়াটার পোলো প্রভৃতি কবিতার এক ভঙ্গী, ভুল, প্রণতি, ওপার, পূজারিণী প্রভৃতির আর এক ভঙ্গী। শেষোক্তগুলির সুর মিষ্ট, কিন্তু প্রথম ধরণের বলিষ্ঠ কবিতাগুলির ভাবে পৌরুষ এবং ছন্দে বৈচিত্র্য আছে। ইহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছন্দের মধ্য দিয়া শ্রীশান্তি পালের কবিত্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কালপুরুষের সাতপাঁচ—শ্রীসুবোধ ঘোষ। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৭৮, মূল্য দুই টাকা।

বাংলা কথা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁহার বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন, মননশীলতা, এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম 'সাতপাঁচের' নিবন্ধগুলিতে। পুস্তকখানিতে লেখকের তথ্যানুসন্ধিৎসা এবং তত্ত্ববিচারে দক্ষতার পরিচয় সুপরিস্ফুট, কিন্তু তত্ত্ব এবং তথ্যকে ছাপাইয়া তাঁহার শিল্পী-মনের গভীর অনুভূতি এবং ভাবুকতাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। রূপময় ভাষা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা-ভঙ্গীর গুণে ইতিহাসের 'কঙ্কাল'ও যে কিরূপ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারে তাহার পরিচয় পাই 'মহেঞ্জো তরুণীর মৃত্যু' নামক নিবন্ধে। "মধুসূদনের দান" এবং "বাংলার ওমর খৈয়াম" লেখক কাব্যের একেবারে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে 'দিব্যানুভূতি' নামক নিবন্ধে শিলাবৃষ্টির হাত হইতে সন্তানকে রক্ষা করিতে ব্যগ্র নিরাবরণ সাঁওতাল জননীর বর্ণনাটি। এ যেন রূপদক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় আঁকা একটি মাতৃমূর্ত্তি। এমনভাবে ছবির রস উপলব্ধি করিয়া পাঠকের মনে তাহা সঞ্চারিত করা এবং বস্তুজগৎ হইতে তাহার মনকে ভাবলোকে লইয়া যাওয়া, ক্ষমতার পরিচায়ক। উপসংহারে লেখক বলিতেছেন—"এ ছবির প্রসাদে পেলাম ক্ষণিকের জন্য সেই দিব্যানুভূতি। সৃষ্টির পিছনে মাতৃরূপেণ সংস্থিতা দুর্দ্দমা প্রকৃতির স্বরূপ। শুধু প্রাণের প্রসূতি নয়, প্রাণের ধাত্রী—the biological mother."

যে-সমস্ত 'আধুনিক সাহিত্যিক' বাংলা ভাষাকে বেওয়ারিশ মাল মনে করিয়া তাহার উপর যথেচ্ছাচার চালাইতেছেন তাহারা লেখকের 'ভাষাগুণ' নামক নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়া পড়িলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

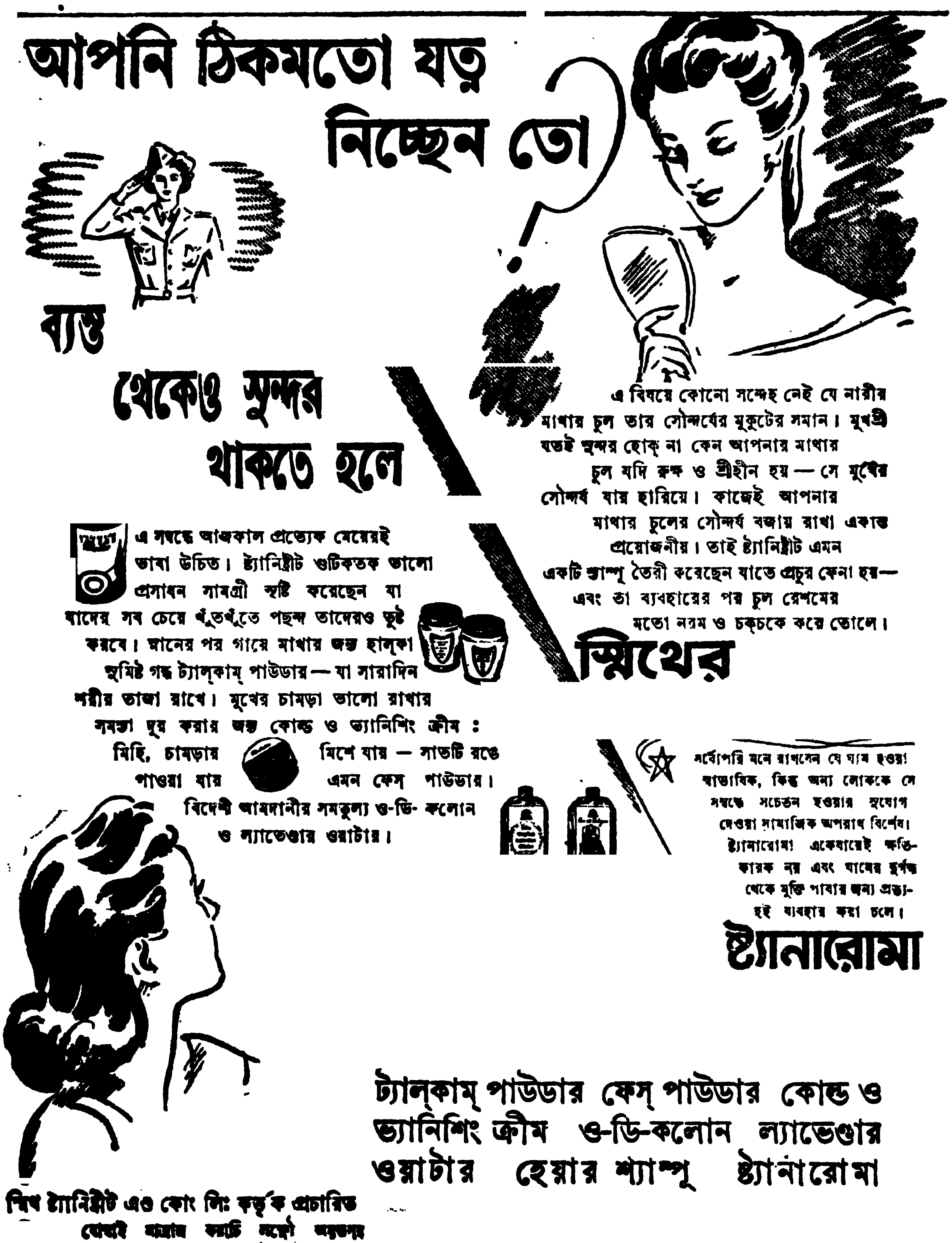
গ্রহচ্যুত—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবিসম্মিলনী। ১৯, ষ্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া। দাম দুই টাকা।

কয়েকটি মৌলিক, কয়েকটি অনুবাদ কবিতা। ভাবালুতা-স্পৃষ্ট চলনসই রচনা। বইয়ের আকারের অনুপাতে দাম অত্যন্ত বেশী।

কেন লিখি—বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের জবানবন্দী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ পুস্তকখানি প্রকাশ করেছেন। পনের জন লেখক তাঁদের লেখার প্রেরণা বা উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি কৌতুহলজনক সন্দেহ নেই। কেউ বলেছেন, 'জীবিকার দায়ে' লিখি, কেউ 'মানুষের মমতায়', কেউবা 'মুক্তির জন্য'। বোধ হয় সকলের কথাই আংশিক সত্য। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র কেন আর লেখেন না তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন: "সত্যিকার লেখা শুধু প্রাণের দায়েই লেখা যায়—জীবনের বিরাট্ বিপুল দায়। অতবড় দায় হেলা ফেলায় নিয়ে যখন তখন কলম ধ'রতে আমার ভয় করে।" শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে মার্ক্স্, এঙ্গেলস্ ইত্যাদির নাম উল্লেখ ক'রে কাব্যে রূপান্তরের ভরসা নিয়েছেন "শ্রেণীহীন জটিল কিন্তু সহজ সমাজে।" "সেই ভরসায়" তিনি লেখেন এবং চেষ্টা করেন "চর্য্যাপদ থেকে ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু অবধি যে বাংলা লৌকিক সাহিত্য…তার মধ্যে উৎস খুঁজে পেতে।" তাঁর লেখায় লৌকিক সাহিত্যের সারল্য, এমন কি খাঁটি বাংলা রূপ দেখতে পেলে আমরা খুশি হতাম। চর্য্যাপদের সঙ্গে তার যা-কিছু মিল তা দুর্ব্বোধ্যতায় নিতে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়


আপনি ঠিকমতো যত্ন নিচ্ছেন তো
ব্যস্ত থেকেও সুন্দর থাকতে হলে
এ সম্বন্ধে আজকাল প্রত্যেক মেয়েরই ভাবা উচিত। ষ্ট্যানিষ্ট্রীট গুটিকতক ভালো প্রসাধন সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন যা যাদের সব চেয়ে খুঁতখুঁতে পছন্দ তাদেরও তুষ্ট করবে। স্নানের পর গায়ে মাথার জন্ত হাল্কা সুমিষ্ট গন্ধ ট্যাল্কাম্ পাউডার — যা সারাদিন শরীর তাজা রাখে। মুখের চামড়া ভালো রাখার সমস্তা দূর করার জন্ত কোল্ড ও ভ্যানিশিং ক্রীম : মিহি, চামড়ায় মিশে যায় — সাতটি রঙে পাওয়া যায় এমন ফেস পাউডার। বিদেশী আমদানীর সমতুল্য ও-ডি-কলোন ও ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার।
এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে নারীর মাথার চুল তার সৌন্দর্যের মুকুটের সমান। মুখশ্রী যতই সুন্দর হোক্ না কেন আপনার মাথার চুল যদি রুক্ষ ও শ্রীহীন হয় — সে মুখের সৌন্দর্য যায় হারিয়ে। কাজেই আপনার মাথার চুলের সৌন্দর্য বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এমন একটি শ্যাম্পু তৈরী করেছেন যাতে প্রচুর ফেনা হয় — এবং তা ব্যবহারের পর চুল রেশমের মতো নরম ও চক্চকে করে তোলে।
স্মিথের
সর্বোপরি মনে রাখবেন যে ঘাম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অন্য লোককে সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সুযোগ দেওয়া সামাজিক অপরাধ বিশেষ। ষ্ট্যানারোমা একেবারেই ক্ষতিকারক নয় এবং ঘামের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রত্যহই ব্যবহার করা চলে।
ষ্ট্যানারোমা
ট্যাল্কাম্ পাউডার ফেস্ পাউডার কোল্ড ও ভ্যানিশিং ক্রীম ও-ডি-কলোন ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার হেয়ার শ্যাম্পু ষ্ট্যানারোমা
স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত
বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি লক্ষ্ণৌ

ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ—অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। ৮নং গড়পার রোড, কলিকাতা।

লেখকের মতে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমস্ত পৃথিবী সংগঠিত না হইলে কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহা ভারতবর্ষে কত দূর সম্ভব, পুস্তকে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। উক্ত মহান্ আদর্শ লইয়া বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে কোন পক্ষই এমন কি সোভিয়েট রুশিয়াও নামে নাই। রুশ-জার্ম্মান সংঘাতের পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে চুক্তি এবং বর্ত্তমানে রুশ-জাপান মৈত্রীই তাহা প্রমাণ করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় তাই সমাজের কল্যাণ বা প্রয়োজন অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাবই দেখা যায়। দুর্ব্বলকে দাবানো ও শোষণই রাজনীতি এবং অর্থনীতি—ইহা ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাস্তব। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সকলের কর্ত্তব্য। সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষই ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হইবে। এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ে যে তাহা সম্ভব হইবে না লেখক সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। পুস্তিকাখানিতে চিন্তার খোরাক রহিয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পূরবী—এস্ এ জাফর। প্রকাশক—সালাহ্ উদ্দীন আজাদ। পি ২, সুরাবার্দ্দি এভেনিউ, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা। পৃঃ ২১৬, মূল্য ২৲।

নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাজালে বিচিত্রিত এই উপন্যাসখানি একটি জমাট ফিল্ম-প্লের আখ্যানবস্তু হইতে পারিত। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, এই তরুণ লেখকের গল্প বলিবার শক্তি আছে, বাংলার পল্লীসমাজের পটভূমিকা তিনি ভালই আঁকিয়াছেন, অপূর্ব্ব, পূরবী, ওয়াজেদ প্রভৃতির চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িকতার জঞ্জাল তাঁহার রচনাকে স্পর্শ করে নাই।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

জীবনবীণার বিচিত্র সুর—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, তৃতীয় খণ্ড মূল্য ।০ আনা। প্রকাশক—শিলচর শিক্ষাপরিষদের পক্ষে শ্রীআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বইখানি লণ্ডনপ্রবাসী বিদ্যার্থীর আত্মনিবেদন। লেখকের ঈশ্বরাভিমুখী চিন্তাধারা সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বইখানি সুলিখিত।

আমার কবিতা—৺আভা দেবী মিত্র; প্রকাশক শ্রীপলাশকুমার মিত্র, ২, কালী লেন, কলিকাতা, মূল্য ১৲ টাকা।

কবিতার বই। স্বর্গীয়া আভা দেবী প্রাণের দরদ দিয়া কবিতাগুলি রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছন্দ এবং ভাষার ত্রুটি সত্ত্বেও লেখিকার কবি-অন্তর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এই কাব্যটিতে।

ঝিলম ও অন্যান্য কবিতা—শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস। ৪৪৬।১, কালীঘাট রোড, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য বার আনা।

প্রথম দিকের কবিতাগুলি দুর্ব্বোধ্য হইলেও শেষ দিকের কয়েকটি কবিতা ভাল লাগিল। ভারতের যুগার্জ্জিত ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি কবিতায় যে বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা অন্তরকে স্পর্শ করে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বেদশতক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্তশাস্ত্রী সম্পাদিত এবং মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ), ছোট হিস্যা, বড়তরফ হইতে শ্রীযুক্তা বিজলীপ্রভা আচার্য চৌধুরাণী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (পৃঃ ।০+৯২) মূল্য এক টাকা।

বেদাবলম্বী হিন্দুদের প্রত্যেক ধর্ম-কার্যে বেদমন্ত্র অপরিহার্যরূপে ব্যবহৃত অথচ ঐসব মন্ত্রের সম্যক তাৎপর্য বিষয়ে ক্রিয়াশীল পুরোহিত-যজমান অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরিজ্ঞাত। দুরূহ বৈদিক মন্ত্র সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে চারি বেদের চারি সার কথা, চতুর্বেদীয় শান্তিপাঠ, সঙ্কল্প-সূক্ত, প্রশস্তিবন্দন, ঘটস্থাপন, স্বস্তিবাচন, পঞ্চগব্য শোধনাদির একশত মন্ত্র ও সরল বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্' মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াও অনুবাদে বাদ পড়িয়াছে, পরবর্তী সংস্করণে অনুবাদ থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্পাদকীয় ভূমিকাটি বেদ ও বেদের আদি মন্ত্র, প্রণব বিষয়ে গবেষণা এবং নানা তথ্যে পূর্ণ।

দেশ-বিদেশের কথা

বাহাদুর সিং সিংঘী

বিগত ৭ই জুলাই তারিখে ভারতীয় জৈন সম্প্রদায়ের নেতা, দানবীর বাহাদুর সিং সিংঘী তাঁহার বালিগঞ্জস্থ সিংঘী পার্ক ভবনে মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় জৈন সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বাহাদুর সিং সিংঘী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আজিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন।



বাহাদুর সিং সিংঘী

কোনো কলেজে অধ্যয়ন না করিয়াও তিনি নিজের চেষ্টায় প্রভূত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি হিসাবে তিনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মধ্য ভারতের কোরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত তাঁহার ঝাগড়াখণ্ড কয়লার খনি ভারতের অন্যতম প্রধান কয়লার খনি। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আগ্রার জৈন পুস্তক প্রচার মণ্ডল, উদয়পুরের জৈন বিদ্যাভবন ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। জৈন সাহিত্যের পুস্তকাদি সম্পাদন ও প্রকাশের জন্যও তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা জৈন ভবনে তিনি ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দানের পরিমাপ করা যায় না। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাকে একখানি দশ হাজার টাকার চেক দিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং কবির আগ্রহাতিশয্যে শান্তিনিকেতনে জৈন-দর্শনের 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সংস্কৃতি এবং শিল্পকলারও একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার প্রাচীন মুদ্রা-সংগ্রহ ভারতে অদ্বিতীয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার আরবী ও পারসী ভাষায় হস্তলিখিত পুথি, শিল্পকলা এবং চিত্রবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক এবং প্রাচীন তাম্রশাসন ইত্যাদির সংগ্রহও অতুলনীয়। তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি, (লণ্ডন এবং বাংলা শাখা) সাহিত্য-পরিষদ, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। লেডি মেরী হার্ব্বার্ট ওয়ার ফণ্ড, 'রেড ক্রশ ফণ্ড' ইত্যাদিতেও তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দারুণ দুর্দ্দিনে চাউলের মণ যখন চব্বিশ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল তখন নিজে বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদিগকে ৮ টাকা মণ দরে চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পুণ্যকর্ম্মের জন্য বাঙালী জাতি চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদের দুর্গতদের দুঃখহরণকল্পে তিনি ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

সর নীলরতন সরকারের স্মৃতি-রক্ষা

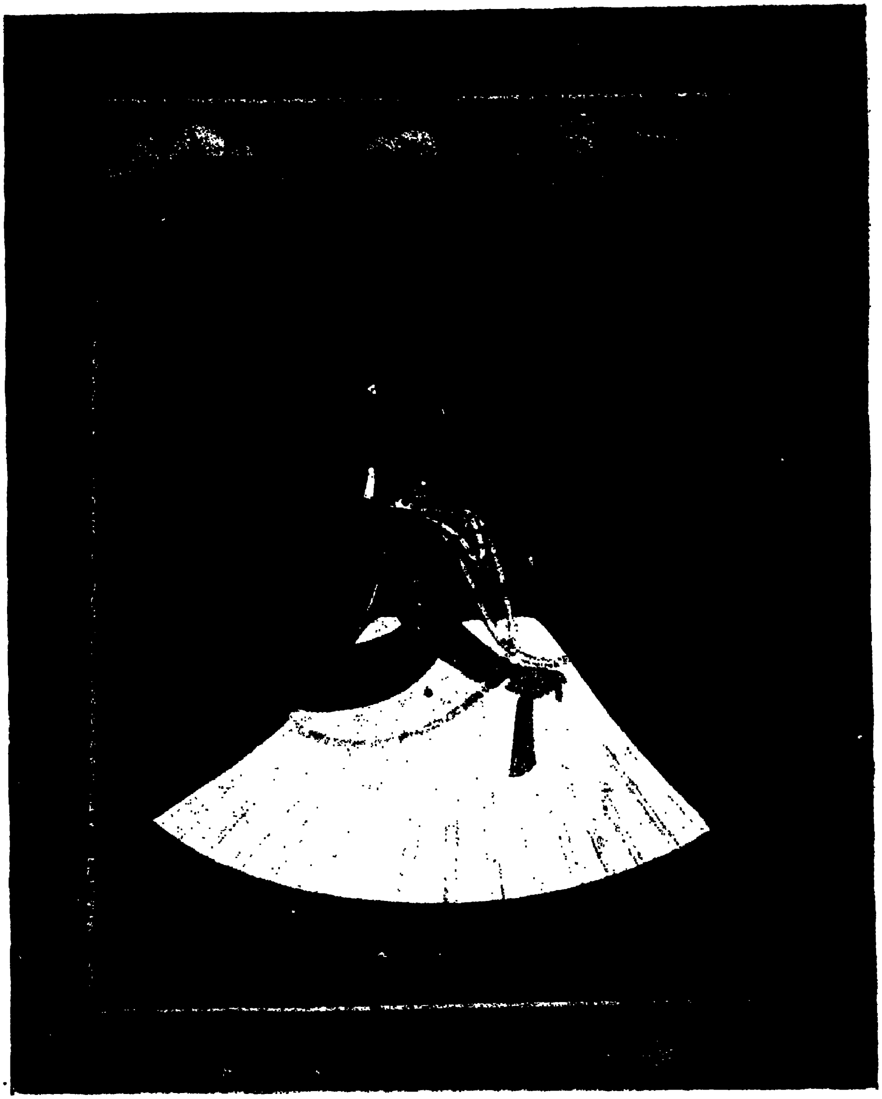
ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব উহার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি সর নীলরতন সরকার কেটি, এম-এ, এম-ডি মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে ২৫০০০ টাকার এক তহবিল খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে এই টাকার সুদ হইতে সর নীলরতন সরকার স্মৃতি-বক্তৃতা নামে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা যাইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এক একজন চিকিৎসক প্রতি বৎসর ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। কমিটি উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছেন। টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

অনারারী সেক্রেটারিজ, ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব, সি, এম, সি হাউস, ৯১ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

চিত্র-পরিচয়

মহারাজ বসুদেবের সহিত ভগিনী দেবকীর বিবাহ হইলে পর কংস সারথিরূপে নিজ স্বর্ণরথে বিপুল শোভাযাত্রা সহ ভগিনীপতির রাজ্যে পৌঁছিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথে হঠাৎ দৈববাণীতে এই ভগিনী-গর্ভজাত সন্তান হইতে নিজের বিনাশবার্ত্তা শুনিয়া কংস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তরবারি নিষ্কাশন করিয়া ভগিনী-বধে উদ্যত হইলেন।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মহারাজা জগৎ সিংহ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

[রাজপুত চিত্র

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৫১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধী-জিন্না আলোচনা

গান্ধী-জিন্না আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার সাফল্যে উৎসাহিত বা ব্যর্থতায় নিরুৎসাহ হইবারও কোন কারণ আমাদের নাই। উহা শেষ হইলেই দেশ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে ভাগ হইয়া যাইবে এবং ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করিয়া এদেশ হইতে প্রস্থান করিবে এরূপ ধারণারও কোন হেতু নাই। তথাপি এই আলোচনার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বাঙালীর অবহিত থাকা দরকার।

বাংলা দেশ যত দিন প্রগতিশীল ছিল, যত দিন বাংলা ভারতবর্ষের অপর প্রদেশকে বিদ্যা ও সংস্কৃতি দান করিয়াছে, যত দিন উচ্চ আদর্শের জন্য স্বার্থ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, তত দিন সমগ্র ভারতে বাঙালীর সম্মান ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল। আজ বাঙালী আহার্য্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে বাহির হইয়াছে, শুধু তাই নয়, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী আজ পরমুখাপেক্ষী, অপর প্রদেশের উপর নির্ভরশীল। আত্মবিস্মৃত ও আত্মনীতিভ্রষ্ট বাঙালী আজ চায় শুধু চালাকির দ্বারা কার্য্যোদ্ধার, ঈপ্সিত বস্তুর ন্যায্য মূল্য দানে সে কুণ্ঠিত।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন একবার বঙ্গবিচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন ছিল শক্তি ও প্রতিপত্তির চরম শিখরে। কার্জনের সিদ্ধান্ত টলিবে না, এ ঘোষণাও ব্রিটেন সেদিন করিয়াছিল। কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী এবং অমিত শক্তির অধিকারী ব্রিটেনের সে প্রকাশ্য ঘোষণা সঙ্ঘবদ্ধ বাঙালী সেদিন একাই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

তখন যে পথে বাঙালী বাহির হইয়াছিল তাহার প্রতি পদে ছিল বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ এবং পথের সাথী কেহই জুটে নাই বরঞ্চ যাহারা কাছে আসে তাহারা বাঙালীর দেশভক্তির সুযোগ লইয়া বাঙালীর সর্ব্বস্বাপহরণই করে। কেহ বা নিকৃষ্ট কাপড় উৎকৃষ্ট বিদেশী দ্রব্যের চতুর্গুণ দামে বিক্রী করিয়া বাংলার স্বর্ণে রৌপ্যে ফাঁপিয়া উঠে, আবার কেহ বা বাঙালীর স্বাধীনতার সংগ্রামকে "বিদ্রোহ" বলিয়া ঘোষণা করিয়া, বিদেশী রাজ ও বিদেশী বণিকের খোসামোদ করিয়া বাঙালীর আয়ের পথে কাঁটা পুঁতিয়া নিজের উপাধি রেখে। কিন্তু এ সকল বাধাবিঘ্ন সত্বেও বাঙালী তাহার আত্ম সংকল্প হইতে হটিয়া যায় নাই, সর্বস্বান্ত হইয়া এমন কি মৃত্যুবরণ করিয়াও বাঙালী তাহার সিদ্ধান্ত বজায় রাখে। তাহার কারণ, তখন যাঁহারা পথপ্রদর্শক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী কপট নেতা ছিলেন কম, চাটুকার সুবিধাবাদী ছিল ঘৃণার পাত্র। আর এখন সেই বাঙালী পরভোজী, ভিক্ষুক!

ভিক্ষুক বাঙালীর দিকে কেহ তাকাইয়া দেখিবে না। পদে পদে ইহার পরিচয় প্রতিদিন মিলিতেছে। বাংলাকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আজ প্রমাণ করিতে হইবে, দয়ার ভিখারী বাঙালী নয়। আপনার ন্যায্য প্রাপ্য, আপনার অধিকার আপনি অর্জন করিবে, আদর্শ উপলব্ধির জন্য ন্যায্য মূল্য দানে, এবং যথোচিত ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকারে কুণ্ঠিত হইবে না, এই দৃঢ় সঙ্কল্প যদি বাঙালী আজ গ্রহণ না করে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। প্রগতির পথে চলিবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং নিজের সামর্থ্যের উপর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। জাতীয়তাবাদের নামে মেকি চালাইয়া যাহারা স্বার্থসিদ্ধির পথ দেখিতেছে, এখন সময় আসিয়াছে তাহাদের সরাইবার। এখন প্রয়োজন হইয়াছে প্রকৃত পথপ্রদর্শককে খুঁজিয়া আনিয়া শ্রদ্ধার সহিত নেতৃপদে বরণ করিবার।

হিন্দু নারীর অধিকার

হিন্দু নারীর অধিকার সম্বন্ধে যে বিল প্রস্তুত হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টা যখনই হইয়াছে তখনই কতক লোকে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, "সমাজ গেল, ধর্ম গেল" রব তুলিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে তাহারাই নিজেদের পরিবারের মধ্যে সেই সমস্ত সংস্কার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা, নারীদের অঙ্গবাস পরিবর্তন, পর্দা-প্রথা নিবারণ প্রভৃতি আন্দোলন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীর আধুনিক অঙ্গবাস গ্রহণ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মিরর পত্র তীব্র আপত্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন ইহাতে বাঙালী নারী ভ্রষ্টা হইয়া যাইবে। নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে আজ যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের নেত্রীস্থানীয়া শ্রদ্ধেয়া মহিলাগণ শিক্ষালাভে ও প্রাচীন অঙ্গবাস পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক পরিচ্ছদ গ্রহণে কুণ্ঠিতা হন নাই। ইহাতে তাঁহারা বা অপর কেহ ভ্রষ্টা হইয়াছেন স্বপ্নেও ইহা কেহ

মনে করে না, তাঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তার উপর দেশবাসীর শ্রদ্ধা অটুটই রহিয়াছে। আজ ইঁহারা যে প্রগতির প্রতিবাদ করিতেছেন সেই প্রগতি আজ না হয় কাল গৃহীত হইবেই এবং যাহারা গ্রহণ করিবে তাহাদেরই পরিবার মধ্যেই ২৫ বৎসর পরে হয় ত নূতন প্রগতির পথে এইভাবেই বাধাদানের প্রবল চেষ্টা চলিবে ইহা অসম্ভব নয়।

প্রগতির পথ রোধের জন্য প্রাচীনের দোহাই ভারতবর্ষে বা বাংলায় নূতন নয়। পুরাতনের কথা টানিয়া প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির ফলে বাঙালী এক দিনের পথ এক বৎসরে অতিক্রম করিতেছে, ফলে জগতের প্রগতিশীল সমস্ত আন্দোলন হইতে বাঙালী পিছাইয়া পড়িতেছে। অথচ এই বাঙালীই এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়া দেশের অবিমিশ্র শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিল। প্রগতিবিরোধীদের বাধা দেশের উন্নতি বন্ধ করিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষতি করিয়াছে যথেষ্ট। মনু-পরাশর প্রভৃতি যে-সব স্মৃতির অভ্রান্ততা আজ দাবী করা হইতেছে তাহাদের মূল ও শুদ্ধ পাঠ একেবারে বিরল। যে-সব পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ এত অধিক যে বহুক্ষেত্রে অর্থ পরস্পরবিরোধী। মনু পরাশর হাজার হাজার বৎসর পূর্বে কি পাঁতি দিয়া গিয়াছেন, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে তাহা উদ্ধারের চেষ্টার পরিবর্তে নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকার করিয়া নূতন আইন রচিত হওয়াই সর্বপ্রকারে সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়।

জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, জাতি যখনই অতীতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চাহিয়াছে, সর্বপ্রকারে সে পিছাইয়া গিয়া দেশকে অধঃপাতের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা প্রগতির পথেই চলিতে চাই, সম্মুখের পানে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে চাই, অদূর ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করিয়া সুদূর অতীতের ব্যর্থ আলোচনায় দিন কাটাইতে চাহি না। পিছনের দিকে মুখ রাখিয়া সম্মুখ পথে চলা অসম্ভব। ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ এক বস্তু, আর অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাকেই এক মাত্র বরণীয় বলিয়া গ্রহণের চেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতীতের দিকে সর্বতোভাবে তাকাইয়া চলিবার একমাত্র পরিণাম মৃত্যু।

বাংলায় নাগরিক অধিকারের সীমা

বাংলার নাগরিক অধিকার কি ভাবে ক্রমাগত পদদলিত হইতেছে এবং কত তুচ্ছ অছিলায় বিশিষ্ট নাগরিকগণকে কি ভাবে হয়রাণ করা হইতেছে, ১৪ই ভাদ্র তারিখের দৈনিক নবযুগ তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কয়েক জন বিশিষ্ট নাগরিকের বিরুদ্ধে পুলিস চারিটি একই ধরণের মামলা উত্থাপন করে, তন্মধ্যে তিনটি রায় প্রকাশিত হইয়াছে, একটি এখনও বিচারাধীন। নবযুগ লিখিতেছেন: "নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমাগুলিতে যে-সব তথ্য প্রমাণিত হইয়াছে এবং সে-সবের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলে নাগরিক অধিকার বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্বই এ প্রদেশে নাই; মন্ত্রীমণ্ডলীর রুচিও প্রয়োজন অনুসারেই নাগরিক অধিকারের সীমা নির্ধারিত হইয়া থাকে।"

মামলা তিনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:

(১) কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ সনৎকুমার রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে এই মর্মে এক অভিযোগ আনীত হয় যে, পুলিস কমিশনরের বিনা অনুমতিতে আহূত এক সভায় তিনি সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করা হয় যে তিনি 'ফেরার' (absconding) আছেন। যাহা হউক, শুনানীর দিন মিঃ রায়চৌধুরী যথাসময় আদালতে হাজির হন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সকল অবস্থা অবগত হইয়া এইরূপ মন্তব্য করেন যে, মিঃ রায়চৌধুরীর ফেরার হওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা (absolutely unfounded and preposterous)। ইহার পরে সরকারপক্ষ হইতে এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হয়।

(২) দ্বিতীয় দফায়, প্রায় তিন মাস পরে ঐ একই সভা সম্পর্কে মিঃ রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ আনা হয়। এইবার সুর বদলাইয়া বলা হয় যে, যে আলোটা তাঁর টেবিলের উপর ছিল তাহাতে উপযুক্ত ঢাকনা ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর ওয়ালি-উল-ইসলাম মিঃ রায়চৌধুরীকে অব্যাহতি দিয়া নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করেন: "উপযুক্ত সময়ে মোকদ্দমা দায়ের করা হয় নাই। তাহা ছাড়া প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করারও কোন চেষ্টা হয় নাই। আইনের যে অছিলা ধরিয়া আসামীদের বিচারার্থে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা গৃহীত হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ করা হইবে।"

(৩) তারপর কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা মিঃ কিরণশঙ্কর রায় এবং প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ মণীন্দ্রনাথ মিত্রের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ আনীত হয়। অভিযোগে বলা হয় যে, মিঃ রায় পর পর দুইটি সভার সভাপতিরূপে কাজ করেন এবং সেই সব সভায় উপযুক্ত ঢাকনা ছাড়া আলো ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, এক স্থলে মিঃ রায় আদতেই যান নাই। মিঃ মিত্রের বিরুদ্ধেও অভিযোগকারিগণ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই মোকদ্দমাও ফাঁসিয়া যায়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকে খ্যাতনামা পদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহাদের একমাত্র দোষ তাঁহারা বর্তমান মন্ত্রীদের কার্য্যনীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। নবযুগ প্রশ্ন করিয়াছেন, "এই জন্যই ইঁহারা এই ভাবে হয়রাণ হইতেছেন, এইরূপ অনুমান যদি কেহ করে তবে কি তাহা খুব অন্যায় হইবে? যদি এঁদের যে-কোন মতেই হউক হয়রাণ করিবার পরিকল্পনা নাজিম-মন্ত্রীসভার না থাকিবে, তবে এইরূপ কতকগুলি বাজে মোকদ্দমা এঁদের বিরুদ্ধে দায়ের হইবে কি কারণে?" অতি উৎসাহী পুলিস কর্মচারীরাই এজন্য দায়ী হইয়া থাকিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে?

মেদিনীপুরে চাউলের অভাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত ১১ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরে চাউলের অভাব সম্বন্ধে একটি মুলতুবী

প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি এই: "মেদিনীপুর শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে চাউলের অভাবের জন্য যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার আলোচনার জন্য সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হউক। কর্তৃপক্ষ গত ২৬শে জুলাই হইতে সেখানে চাউল সরবরাহ বন্ধ করেন। এখন চোরাবাজারে সামান্য পরিমাণ চাউল আট আনা হইতে দশ আনা সের দরে পাওয়া যায়। গত ১১ই আগষ্ট টাউন ফুড কমিটির এক সভায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।" প্রস্তাবের সমর্থনে বঙ্কিমবাবু বলেন, "৫ই আগষ্ট মেদিনীপুরে পৌছিয়া আমি বিস্মিত হইয়া শুনি, বাজারে কোন দোকানে চাউল পাওয়া যায় না। একটি দোকানের মালিকের সহিত আমার এ বিষয়ে আলাপ হয়। বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে তাঁহাকে চাউল সরবরাহ করা হয়। তিনি বলেন যে এই বিভাগ হইতে চব্বিশটি দোকান চাউল পাইতেছিল। ২৬শে জুলাই নাগাদ চাউল দেওয়া বন্ধ হয় এবং ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বাজারে দোকানদারদের নিকট চাউল কিনিতে পাওয়া যায় নাই। আমি জানিতে পারি চোরাবাজারে অল্প পরিমাণে চাউল আট আনা হইতে দশ আনা সের দরে পাওয়া যায়। আমাকে জানান হয় যে ইস্পাহানী কোম্পানী মেদিনীপুরে চাউল ক্রয়ের এজেন্ট এবং ইহারা মেদিনীপুর জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতেছেন। ইহারা কি দরে কত চাউল কিনিয়াছেন, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট আমি তাহা জানিতে চাহি।"

মিঃ সুরাবর্দী বঙ্কিমবাবুর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ১০ই আগষ্ট তারিখে প্রেরিত এক টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া তিনি বলেন মাঝারি চাউলের বর্তমান দর সাড়ে ছয় আনা, মেদিনীপুর শহরে চাউল পাওয়া যাইতেছে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে চাউলের অভাবের কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। এই সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামের জোরে মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে প্রস্তাব উত্থাপনকারীর বিবৃতি ভ্রান্ত ও অসত্য সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুলতুবী প্রস্তাবটি ১৩-২২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। মেদিনীপুরে আট দিন চাউল ছিল না, এ কথা কিন্তু মিঃ সুরাবর্দী জোর করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এ প্রশ্ন তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন।

মেদিনীপুরে চাউলের অভাব নাই, সাড়ে ছয় আনা দরে চাউল পাওয়া যায় মিঃ সুরাবর্দী এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই ঘোষণার প্রায় এক মাস পরে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মেদিনীপুরের অবস্থা দেখিবার জন্য সেখানে যান। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, "কাঁথি হইতে ১৭ ও ৭ মাইল দূরে এগ্রা ও সাতমাইল বাজারে আমরা মোটেই চাউল দেখিতে পাই নাই। এই স্থান দুইটির প্রত্যেকটিতে একটি দোকানে খুব সামান্য চাউল ছিল। এগ্রায় পনর টাকা চারি আনা ও সাতমাইলে সতর টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছিল।"

মেদিনীপুরবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে পণ্ডিত কুঞ্জরুর উক্তি

পণ্ডিত কুঞ্জরু তাঁহার ৯ই সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে মেদিনীপুর-বাসীর সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন:

"এখানে সঙ্গত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য আদৌ পাওয়া যায় না। চাউলের মূল্য হ্রাসের পূর্বে ডাল ও সরিষার তৈল যেরূপ দুর্মূল্য ছিল, এখনও সেরূপ দুর্মূল্য। দুধ তরিতরকারী ও মাছের দর গত বৎসর অপেক্ষা আরও দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। গুড় আট আনা সের হইতে বার আনা সের দরে পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতেছে। এইরূপে দেশের লোকেরা সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এমন কি, মধ্যবিত্ত লোকেরা সামান্য পরিমাণে ভিন্ন দুধ ও তরিতরকারী ক্রয় করিতে পারে না।

পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সংস্থানের অভাবে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া ছিল, সেই সময় হইতে এখানকার লোকদিগের জীবনীশক্তি কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাহারা শীঘ্র ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইতেছে। সমস্ত মহকুমায় ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করিতেছে। আমরা জানিতে পারিলাম যে, গত বৎসর হইতে সরকারী ঔষধালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে এবং সেগুলিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইন সরবরাহ করা হইয়াছে; কিন্তু ম্যালেরিয়া এখনও আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই। এক মাসের পর মহামারী আরও সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এইরূপ অবস্থা হইলে হাসপাতালগুলি (যদিও গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর হাসপাতালের সংখ্যা বেশী) রোগী-দিগের সংখ্যার অনুপাতে অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠিবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস না পাইতেছে ও পর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার মত লোকেরা অর্থোপার্জন না করিতেছে ততক্ষণ সমস্যার কোন সমাধান হইবে না।"

শুধু মেদিনীপুর নহে বাংলার বহু স্থানে এই অবস্থা বিদ্যমান। যে-সব স্থানে রেশন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেখানকার অবস্থা আরও শোচনীয়। কাঁথিতে রেশন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু চাউল দেওয়া হয় মাত্র এক ভাগ, অবশিষ্ট তিন ভাগ আটা; এই খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা সম্বন্ধেও পণ্ডিত কুঞ্জরু বলিয়াছেন, চাউল খুব নিকৃষ্ট, তাহার মধ্যে কাঁকর, তুষ এবং পোকাও থাকে। আটা আরও কদর্য্য।

কৃষ্ণনগরের ২১শে আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ: সরকারী গুদামে আটা ও গম মজুদ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেগুলি এখন সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইয়াছে। আটা মানুষের অখাদ্য হইয়াছে। গমগুলি কীটদষ্ট হইয়াছে।" কলিকাতার রেশনিঙে অভিজ্ঞতার পর মফঃস্বলের রেশনিঙের অবস্থা অনুমান করা মোটেই কঠিন হইবে না।

ভারতবর্ষে খাদ্য আমদানী

মহিলা আন্তর্জাতিক লীগের ম্যাঞ্চেষ্টার শাখার সেক্রেটরী এস. এফ. ফিলিপ্স 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে ভারতের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিয়াছেন:

"দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ও ভারত-সরকার গত ১২ মাসে অনেক কিছু করিয়াছেন; কিন্তু প্রাপ্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এখনও আরও অনেক কিছু করা আবশ্যক। ব্রিটিশ সরকার বিদেশ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত খাদ্যশস্য প্রেরণের একটি কার্য্যক্রম স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু

জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা সমিতি যে পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রেরণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহার ৭ লক্ষ টন এখনও বাকী রহিয়াছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা সমিতি যে ব্রিটিশ সরকারের কার্য্য "অত্যন্ত অসন্তোষজনক" বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঐ পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট থাকা সম্বন্ধে মিঃ আমেরী কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, জাহাজের অভাব। এই কৈফিয়তে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা জানে, ব্রিটেনে বিদেশ হইতে খাদ্য সরবরাহকে সর্বদাই অন্যান্য বিষয়ের পূর্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃই প্রশ্ন করিবে, খাদ্য সম্বন্ধে যখন ভারতবাসীর জীবন-মরণ সমস্যা তখন জাহাজে করিয়া খাদ্য আমদানীর বিষয়কে কেন অন্যান্য বিষয়ের পরে স্থান দেওয়া হইবে?"

গত দুর্ভিক্ষে ভারতবাসী স্বাধীনতা ও পরাধীনতার পার্থক্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। ভারত সরকার নিজে কমিটি বসাইয়া জানিয়া লইলেন যে অবিলম্বে পনর লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানী না করিলে ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব মিটিবে না। অথচ নিজেদের এই সিদ্ধান্তকেই তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিলেন না। এক বৎসরে প্রয়োজনের মাত্র অর্ধেক ফসল আনা হইল, অপর অর্ধেকই বাকি রহিয়া গেল। অজুহাত সেই চিরন্তন জাহাজে স্থানাভাব। অথচ মদ আনিবার বেলায় জাহাজে স্থানাভাব হয় নাই। ভারতবর্ষে জাহাজ তৈরির পথে শত অন্তরায় স্থাপন করিয়া রাখায় ভারতবাসী নিজেই যে নিজের জাহাজে ফসল আনিবে তাহারও পথ রুদ্ধ। পরাধীন ভারতবাসী দেখিয়াছে স্বাধীন ব্রিটেন প্রচণ্ডতম সংগ্রামের মধ্যেও জাহাজ তৈরি করিয়াছে এবং বিদেশ হইতে সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানী করিয়াছে। যত অভাব ভারতবাসীর বেলায়।

দুর্ভিক্ষে প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব

বিলাতের ও আমেরিকার কোন কোন পত্রিকা বাংলার গত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙালী বা ভারতবাসী এই দুর্দিনে যথাসাধ্য করে নাই। এই অভিযোগ সত্য নয়। সর্বাঙ্গে শৃঙ্খলিত হইয়াও বাঙালী ও ভারতবাসী দুর্ভিক্ষ নিবারণে এবং দুর্ভিক্ষের দুর্দশা প্রশমনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের সর্বপ্রধান উপায় খাদ্য আমদানী, তার জন্য চাই জাহাজ রেলগাড়ী এবং অন্যান্য সর্ববিধ যানবাহনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। বাঙালীর বা ভারতবাসীর হাতে সে কর্তৃত্ব ছিল না, নৌকাগুলি পর্যন্ত সর জন হার্বার্ট ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর দরকার টাকা। তার জন্য সময় থাকিতে দেশে ও বিদেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষের সংবাদ জানাইয়া আবেদন করিতে হয়। বাংলার গত দুর্ভিক্ষে তাহাও হয় নাই। প্রথম হইতেই দুর্ভিক্ষের সংবাদ অত্যন্ত সতর্কতা ও কঠোরতার সহিত চাপিয়া রাখা হইয়াছে। বিদেশ তো দূরের কথা, দেশের লোকেও সময় থাকিতে এই মহাবিপদের সংবাদ জানিতে পায় নাই।

দুর্ভিক্ষে প্রাণ রক্ষার দায়িত্বের প্রশ্ন সকলের আগে উঠে। আমরা দেখিয়াছি বড়লাট লর্ড লিনলিথগো গত দুর্ভিক্ষে একেবারে উদাসীন ছিলেন, ভারত-সচিবও উহা নিবারণে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। অথচ পূর্ববর্তী বড়লাটদের মধ্যে অনেকেই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের, জনসাধারণ চিকিৎসা ও কাপড় যোগান প্রভৃতিতে সাহায্য করিবে এই মাত্র। কয়েকজন বড়লাটের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮৬৮-৬৯ সালের বুন্দেলখণ্ড ও উত্তর-ভারতের দুর্ভিক্ষে বড়লাট লর্ড লরেন্স এই নিয়ম প্রণয়ন করেন যে অনশনে মৃত্যু নিবারণের জন্য সরকারী কর্মচারিগণকে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এরূপ কোন মৃত্যু ঘটিলে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা হইবে। ১৮৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে লিখিয়াছিলেন, "বাংলার দুর্ভিক্ষে একটি মাত্র প্রজারও যাহাতে প্রাণহানি না হয় তার জন্য ভারত-সরকার যে-কোন উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিবেন না এবং ইহার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হইবে তাহাও তাঁহারা সংগ্রহ করিবেন এই ভরসা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট রাখিতে পারেন।" বাংলার লাট সর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "সরকারী কর্মচারীদের আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে তাহাদের কাহারও দোষে একটি প্রজারও জীবন নাশ হইলে তাহাকে অভিযুক্ত ও পদচ্যুত করা হইবে।" ১৮৭৬-৭৮ সালের মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে বড়লাট লর্ড লিটন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য যত অর্থ লাগে তাহা দেওয়া হইবে, যত চেষ্টা দরকার তাহা করা হইবে। কোন কারণেই কোন দুর্গত সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইবে না।"

তারপর লর্ড কার্জন। কার্জনের আমলে অনাবৃষ্টির জন্য ভারতবর্ষে দীর্ঘকালব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলের আয়তন ছিল ৪,৭৫,০০০ বর্গ মাইল এবং এই অঞ্চলের লোকের সংখ্যা ছিল ছয় কোটি। ১৮৯৮ সালে এই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। ১৯০০ সালে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ। প্রায় নয় কোটি টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল, লর্ড কার্জন স্বয়ং দূরতম গ্রামে পর্য্যন্ত গিয়া সাহায্য দান ও চিকিৎসা তদারক করিয়াছেন, কাজেই প্রদত্ত অর্থের প্রায় সবটাই দুর্গতের হাতে গিয়াছে। কর্মচারীদের দিয়া তিনি কাজ করাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দেন নাই, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের প্রত্যেকটি কাজ তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষে অর্থ ব্যয়ের কথা উঠিলে কার্জন ১৯০০ সালের ১২ই জানুয়ারী ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, "মানুষের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব যেখানে, সেখানে অর্থব্যয়ে আমি কুণ্ঠিত হইব না; মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার এবং চরম দুর্দশা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোষাগারের শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে গবর্মেণ্ট বাধ্য, গবর্মেণ্টের এই চূড়ান্ত দায়িত্ব আমি স্বীকার করিতেছি।" কলিকাতা টাউন হলে এক সভায় জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়া লর্ড কার্জন বলেন, "প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব আমার, দুর্ভিক্ষপীড়িতকে বস্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি যোগাইয়া তাহাকে একটুখানি স্বস্তি দিবার জন্য আপনাদের নিকট সাহায্য চাহিতেছি।"

লরেন্স, নর্থব্রুক, লিটন, কার্জন ও টেম্পলের মধ্যে ব্রিটিশ-

লিথগো ও হার্বার্টে তুলনা চলে না। এক দলের লক্ষ্য ছিল মানবতার প্রতি কর্তব্য পালন, অপর দল করিয়াছেন চাকুরী। তীব্র জনমত প্রশমনের জন্য যেটুকু না করিলে নয়, লিনলিথগো এবং হার্বার্ট সেটুকুও করেন নাই।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য

দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানে বাঙালী কিছু করে নাই, ইহাও অসত্য কথা। গত দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামলাইয়া যাহারা বাঁচিয়া উঠিয়াছে তাহাদের প্রাণরক্ষার ব্যয়ের শতকরা আশি ভাগ বাঙালী নিজে বহন করিয়াছে। বাংলা-সরকারের দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের জন্য ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের এক সার্কুলারে জানাইয়াছিলেন যে তিন মাস শতকরা দশ জন লোককে দশ টাকা করিয়া দিলেও আঠার কোটি টাকা দরকার এবং এই টাকা বাংলা-সরকারের মোট বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশী। অতএব দেশের লোকের সাহায্যদান-প্রবৃত্তি যেন জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ শতকরা দশ জন লোকের, অর্থাৎ মোট যাট লক্ষ লোক সাহায্য না পাইলে বাঁচিত না, ইহা সত্য, প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম হইবে না। এই যাট লক্ষ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মধ্যে সরকারী হিসাবে মরিয়াছে সাত লক্ষ, অবশিষ্ট ৫৩ লক্ষ অন্ততঃ ঐ ত্রিশ টাকা সাহায্য পাইয়া তবে বাঁচিয়া গিয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ নিবারণে গবর্মেণ্ট সাহায্য দিয়াছেন সাড়ে তিন কোটি টাকা, বে-সরকারী সাহায্য সমিতিগুলি সংগ্রহ করিয়াছে প্রায় ৫৫ লক্ষ। তন্মধ্যে ৩০।৩৫ লক্ষ বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছে, অবশিষ্ট বাংলায় সংগৃহীত। অতএব সরকারী ও বাংলার বাহিরে সংগৃহীত মোট টাকা দাঁড়ায় ৪ কোটি। ৬০ লক্ষ লোকের জন্য দরকার ছিল ১৮ কোটি, পাওয়া গেল ৪ কোটি, অবশিষ্ট দিয়াছে বাঙালী নিজে। বে-সরকারী হিসাবে অনুমান এক কোটির উপর লোক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হয়, এবং আনুমানিক ত্রিশ হইতে চল্লিশ লক্ষ লোক মারা যায়। এদিক দিয়া দেখিলেও হিসাব ঐরূপই দাঁড়ায়। দুর্ভিক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে যিনি যে ভাবে পারিয়াছেন, তিনি তাহাই দান করিয়াছেন। ছোট ছোট বালক-বালিকারা পর্যন্ত নিজেদের আহারের কতকাংশ বাঁচাইয়া তাহা বুভুক্ষুর মুখে তুলিয়া দিয়াছে ইহাও বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে।

তার পর বাঙালী এই দান করিয়াছে কত কষ্টে, কি ভয়ানক অবস্থার মধ্যে তাহাও বিচার্য্য বিষয়। সর জন হার্বার্টের নৌকা-পসারণ আদেশের ফলে সহস্র সহস্র চাষী ও ধীবর উপার্জনের একমাত্র পন্থা হইতে বঞ্চিত হইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। চাকুরীজীবী ভিন্ন উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বাঙালী মধ্যবিত্তের সচ্ছলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কৃষকের অবস্থার উপর। ৪০।৫০ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য ইঁহাদের এমনিতেই নাই, তদুপরি কৃষকের চরম দুর্দশার সহিত ইঁহাদেরও অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তৎসত্ত্বেও ইঁহারা গ্রামের বা পাড়ার বুভুক্ষুকে সাহায্য-দানে কুণ্ঠিত হন নাই। তফাৎ শুধু এইখানে যে, সে দানের হিসাব কেহ রাখে নাই।

বাংলায় নৌকা নির্মাণ

শ্রীরামপুরে বাংলা-সরকারের জন্য যে পাঁচ হাজার দেশী নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, তাহার প্রথমখানি বাংলার লাট মিঃ কেসি জলে ভাসাইয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে এক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। উৎসবে মিঃ কেসি বলেন, জলযান দেশের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে নৌকা যে কত অপরিহার্য্য গত দুর্ভিক্ষে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সর জন হার্বার্ট কর্তৃক নৌকাপসারণ দুর্ভিক্ষের একটি মূল কারণ, ইহা অনেকেই আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। দক্ষিণ-বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকা ভিন্ন ক্ষেতের ফসল কাটিয়া আনা যায় না, যে মাছ বাঙালীর এক প্রধান খাদ্য তাহা ধরিবার সর্ব প্রধান উপকরণ নৌকা, মফস্বলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান বাহন নৌকা। খালে বিলে ও ছোট নদীতে যেখানে ষ্টীমার চলে না, নৌকা সেখানে অনায়াসে পণ্য বহিয়া লইয়া যায়, এবং এরূপ খাল বিল ও নদীর সংখ্যা বাংলা দেশে বহু। বাঙালীর জীবনযাত্রায়, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক জীবনের এই প্রধান উপকরণটি এক গবর্ণর ধ্বংস করিয়াছেন, আর এক জন উহা পুনরায় গঠনের চেষ্টা করিতে গিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন জলযান বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় "গুরুত্বপূর্ণ স্থান" অধিকার করিবে! নৌকাগঠন সম্বন্ধে ৮ই ভাদ্র তারিখের দৈনিক বসুমতী কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, আজ (২৮শে ভাদ্র) পর্য্যন্ত বাংলা-সরকার তাহার কোন উত্তর দেন নাই।

গুরুত্ব বোধে উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল:

যুদ্ধ শেষ হইলে আবার ষ্টীমারের স্বার্থরক্ষার্থ নৌকা সম্বন্ধে সরকার অনবহিত হইবেন না-কি?

যদি তাঁহারা অনবহিত না হন, তাহা হইলেও প্রতিযোগিতা কিরূপ হইবে?

এই যে লক্ষ লক্ষ নৌকার কথা মিষ্টার কেসি বলিয়াছেন, এ সবই কি সরকারের টাকায়—সরকারের শিল্প-বিভাগের তাঁবে প্রস্তুত হইবে? যদি হয়, তবে তাহাতে কি সাধারণ শিল্পপতি-দিগের ক্ষতি করা হইবে না?

যদি সরকারের ব্যয়ে ঐ সকল নৌকা প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহার জন্য কাঠ সংগ্রহ করিতে কি মিষ্টার সাহাবুদ্দীনের ঢাকার জঙ্গলে কাঠ সন্ধান করা হইবে? আর নৌকা নির্মাণের ঠিকা কি শিল্প-বিভাগই দিবেন?

প্রস্তুত হইলে নৌকাগুলি কি লোককে দেওয়া হইবে? যদি হয়, তবে কিরূপ সর্তে দেওয়া হইবে?

এ সব সমস্যার সমাধান কে করিবে?

আমরা যখন বাংলার করদাতা তখন যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি—এই নৌ-নির্মাণে বাংলা-সরকারের কত টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে এবং সে ব্যয়ে যাহাতে অপব্যয় প্রবেশ না করিতে পারে সেজন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে?

অনুষ্ঠানের বিবরণে আমরা দুই জনের নাম দেখিতে পাই (অবশ্য শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টার ব্যতীত)—

(১) রায় সাহেব এম, জি, গুপ্টা।

(২) মিষ্টার আলেকজাণ্ডার কোভাক্স। মিষ্টার কোভাক্স না-কি বাংলা-সরকারের "নৌকা বিষয়ে পরামর্শদাতা।"

এই দুই জনের নামে মনে হয়, ইঁহারা কেহই বাঙালী নহেন। যদি তাহাই হয় তবে নৌকাপসারণে যে বাঙালীরা

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বাংলা-সরকারের নৌকা নির্মাণের কাজে সেই বাঙালীরাই যথাসম্ভব লাভ পায় নাই। কেন?

মিষ্টার ক্রটা কে?

মিষ্টার কোভাক্স কেন—কোন্ গুণে সরকারের নৌ-নির্মাণে পরামর্শ দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন? তাঁহার মাসিক বেতন কত? তিনি কোন্ বিভাগের অধীন? বাংলায় কি সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের উপযুক্ত বাঙালী পাওয়া যায় নাই?

বাংলার গবর্ণর যে লক্ষ লক্ষ নৌকা গঠনের কথা বলিয়াছেন, তাহার কয়খানি আগামী ফসলের সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব হইবে?

ব্যাধিকবলিত বাংলা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যাধিকবলিত বাংলার অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ডাঃ কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতসভা গৃহে বাংলার বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি-দিগের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন:

"বাংলায় দুই কোটি লোক মহামারীর কবলে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক আজ মরিতেছে। স্বল্পাহারের জন্য অনেকের শরীর জীর্ণ হইয়াছে। বাংলার ছয় কোটি লোকের মধ্যে দুই কোটি লোক মহামারীগ্রস্ত। আরও দুঃখের কথা, বাংলার যে-যে অংশে শস্য বেশী উৎপন্ন হয় সেখানকার কৃষকরাই মহামারীর কবলে পতিত হইয়াছে। অবস্থা যদি এরূপই চলে, তবে আগামী বৎসর দুর্ভিক্ষ আরও ভীষণতর হওয়ার আশঙ্কা আছে। যুক্তপ্রদেশের অবস্থা ভাল নয়; উৎকল ও বিহারের অবস্থা ভয়াবহ। দক্ষিণ-ভারতে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক। সুতরাং তাহারা রোগগ্রস্ত থাকায় শস্যোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিবে। বাংলায় যে অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহা শুধু বাংলার সমস্যা নয়—সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা। আশার কথা, সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাংলা দেশ জাগিয়াছে। কিন্তু আজ যুদ্ধের ফলে সমগ্র বাংলায় যে অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষকে সমস্যা সমাধানকল্পে অগ্রসর হইতে হইবে।"

সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহাতে বলা হয়:

"দুর্ভিক্ষ সাময়িকভাবে শেষ হইলেও তাহার জের এখনও চলিতেছে। দুর্ভিক্ষের ফলে ব্যাধি ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাতে বিপুল সংখ্যায় লোক মহামৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতেছে। ম্যালেরিয়া ব্যাপকরূপ ধারণ করায় অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে, সমগ্র বাংলায় আজ দুই কোটি লোক ব্যাধির কবলে। এই দুই কোটি লোক ব্যাধিকবলিত থাকায় গ্রাম্যজীবন বিপর্য্যস্ত, কুটিরশিল্প ধ্বংসোন্মুখ এবং সামাজিক জীবন শতধাবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

অথচ এ অবস্থা অপ্রত্যাশিত নয়। আট মাস পূর্বে গত ১১ই জানুয়ারী মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়া এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন:

(১) দুর্ভিক্ষে ও তাহার পরবর্ত্তী কলে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে গ্রামে লোকের জীবনযাত্রার ব্যাপারে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি গ্রাম্যজীবনে শিল্পীরা অনেক স্থলে মরিয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের শূন্য স্থান পূর্ণ করা দুরূহ।

(২) সামরিক কর্মচারীরা চিকিৎসাকার্য্যেই বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। উত্তর বঙ্গে ১৭টি কেন্দ্রে "ফিল্ড" হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) ৪০টি যাযাবর চিকিৎসা-কেন্দ্রেও কাজ হইতেছে। সে পর্য্যন্ত এক লক্ষ ৩০ হাজার লোক চিকিৎসিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে এক লক্ষ ২০ হাজার ম্যালেরিয়ার রোগী।

(৪) এক জন চিকিৎসক একাই দিনে ছয় শত লোককে টীকা দিয়াছেন ও সাড়ে চার শত লোককে কলেরার টীকা দিয়াছেন।

(৫) চিকিৎসা-ব্যবস্থার বিশেষ অভাব। ম্যালেরিয়া সাধারণ সময়ে যেরূপ থাকে, তাহার চার বা পাঁচ গুণ হইয়াছে এবং তিনি যে গৃহেই গিয়াছেন, সেই গৃহেই হয় কেহ মরিয়াছে, নহে ত কেহ রোগে শয্যাগত।

(৬) তখনও আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া যায় নাই।

(৭) কলেরায় বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে; বসন্তও নিবৃত্ত হয় নাই।

মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্টের এই সতর্কবাণীর আট মাস পরেও অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে খাদ্যাভাব এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। দুর্ভিক্ষে যাহারা মরে নাই, তাহাদের শতকরা অন্তত: ৭৫ জন অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া জীবিত রহিয়াছে বটে; কিন্তু স্বাস্থ্য তাহাদের ভাঙিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, একবার দীর্ঘকাল পূর্ণাহারে বঞ্চিত থাকিলে তাহাদিগের যে স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহা আর কখনও সারে না—লোক না মরিলেও মরণাহত হইয়া থাকে—যে-কোন সামান্য কারণেও তাহাদের মৃত্যু ঘটিতে পারে। এবার লোকে খাদ্য পায় নাই—চিকিৎসার আবশ্যক ব্যবস্থা গবর্মেণ্ট করেন নাই। তদুপরি সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া রেশনের নামে লোককে অখাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা হইতেছে। যাহারা অনাহারে মরে নাই তাহারা সহজেই ব্যাধিতে প্রাণ হারাইতেছে।

শিক্ষাবিভাগের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ডিরেক্টরের উক্তি

বাংলার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ জেঙ্কিন্সের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ডাঃ জেঙ্কিন্স বলেন:

"শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদিগের স্থান বহু উর্দ্ধে। তাঁহারাই ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈয়ারী করেন। জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে তাঁহাদিগের অবদান অপরিসীম; সুতরাং শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।"

শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন যে শিক্ষা বিস্তারের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, ইহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ইংরেজের হাতে আসিবার পর হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। শিক্ষকদের বেতনের পরিমাণ এত কম করিয়া ধরা হইয়াছে যে একমাত্র ঐ আয়ে কাহারও

চলিতে পারে না। বাধ্য হইয়া শিক্ষককে জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত আয়ের উপায় অনুসন্ধান করিতে হয় এবং ইহাতে শিক্ষকতা কার্য্য সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাহত হয়। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে সংবাদ প্রভাকর পত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহা লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, পরেও বহু আন্দোলন হইয়াছে, কিন্তু স্কুল শিক্ষকের বেতন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজও ২৫ টাকার গণ্ডী ছাড়াইয়া বেশী উপরে উঠে নাই। ডাঃ জেঙ্কিন্স নিজে এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা করিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় নাই।

নোয়াখালীতে নৌকাডুবি

নোয়াখালী হইতে প্রেরিত ২৪শে আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৯শে আগষ্ট রাত্রিতে সন্দীপ খালে খেয়া নৌকা ডুবির ফলে ১১৯ জন আরোহী নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। নৌকাখানি দ্বিপ্রহর রাত্রিতে চরবাটা হইতে ১৫০ জন আরোহী ও ৩টি গরু লইয়া চরবক্সুর দিকে যাইবার সময় হঠাৎ প্রবল বানের মুখে পড়িয়া সমস্ত আরোহী সহ উল্টাইয়া যায়। ১৫০ জন আরোহীর মধ্যে মাত্র ৩১ জন আরোহী সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠে। সংবাদে ইহাও প্রকাশ যে, অবশিষ্ট আরোহীদিগের কোনও সন্ধান ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুর্ঘটনার ৫ দিন পরেও মিলে নাই।

নোয়াখালী জেলার সন্দীপ, হাতিয়া, রামগতি প্রভৃতি দ্বীপে ও বিভিন্ন চরে যাতায়াত কালে প্রায়ই নৌকাডুবি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই বর্ষাকালে ঐ সব স্থান হইতে নৌকাডুবির সংবাদ পাওয়া যায়। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে বর্ষাকালে এই প্রকার দুর্ঘটনায় বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার প্রতিকারকল্পে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তখন হইতে খেয়া নৌকার ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রবর্তন করে এবং খেয়া নৌকার 'বয়া' (লাইফ বয়) রাখার ব্যবস্থাও করা হয়। নৌকার সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় খেয়া নৌকায় অতিরিক্ত আরোহী ও মাল বোঝাই হইতেছে কি না তাহা দেখা দরকার। সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নদে এক নৌকাডুবিতে বহু লোকের প্রাণহানি হইয়াছে এবং উহাতে অতিরিক্ত আরোহী বোঝাই করা হইয়াছিল বলিয়াও অভিযোগ উঠিয়াছে। খেয়া নৌকা পরিদর্শন ও নৌকায় বয়া রাখা বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যক।

বাংলায় কাপড়ের অভাব

এবার একই সঙ্গে পূজা ও ঈদ পড়িয়াছে। এই উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নববস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু এবার বাংলায় কাপড় সরবরাহের বন্দোবস্ত ভালরূপে না হওয়ায় কাপড়ের বাজারে আগুন লাগিয়াছে বলা চলে। মিলের কাপড়ে ছাপ দেওয়া আছে, তাঁতের কাপড়ে নাই, এই সুযোগে দোকানদারেরা মিলের কাপড় দোকানে না রাখিয়া ৪ টাকার তাঁতের কাপড় ২৪ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। মিলের কাপড়ের অভাবও ঐ সঙ্গে রহিয়াছে বলিয়া অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিতেছে। কয়েক দিন মাত্র পূর্বে টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোডি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং পূজা ও ঈদের পূর্বে যথেষ্ট কাপড় পাঠাইবার প্রতিশ্রুতিও যথারীতি দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বাজারের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় সে কাপড় এখনও আসে নাই। বাংলায় উৎপন্ন কাপড়ে বাংলার প্রয়োজন মিটে না, ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনিতে হয়। পূজা এবং ঈদের তারিখ জানুয়ারী মাসে ক্যালেণ্ডার তৈরির সময়েই জানা ছিল। এই সময়ে বাংলায় কাপড়ের চাহিদা যথেষ্ট বাড়িবে ইহা তখনই অনুমান করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া পূজার মাত্র মাসখানেক পূর্বে এই গুরুতর ব্যাপারের প্রতি মন দেওয়া হইয়াছে, কাজ এখনও হয় নাই। বাংলায় সাধারণ অবস্থাতেই গত দুই বৎসর যাবৎ কাপড়ের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। ক্রেতারা কাপড় পায় না, কিন্তু সরকারী বিবৃতি প্রভৃতিতে জানিতে পারে বাংলার প্রয়োজনীয় কাপড় পাঠানো হইয়াছে! এই রহস্য ভেদ হওয়া আবশ্যক। পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ রহিয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু কাপড়ের অভাবের ইহাই একমাত্র কারণ নয়। কর্তৃপক্ষ বাংলার প্রয়োজন কি ভাবে হিসাব করিয়াছেন তাহা জানা দরকার। শুধু গজ মাপিয়া সরবরাহ দেখাইলেই চলে না। কারণ গজ মাপে জামার থান হইতে কম্বল পর্য্যন্ত সবই পড়িতে পারে এবং গজের হিসাব ঠিক থাকিলেও পরিধেয় বস্ত্রের অভাব ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া কলিকাতার এবং মফস্বলের প্রয়োজনেও তারতম্য আছে, উভয় স্থানের ক্রেতার ক্রয়শক্তি বিভিন্ন বলিয়াই চাহিদার তারতম্য খুব বেশী হইবে। কলিকাতার প্রয়োজনও দুই বৎসর পূর্বে যাহা ছিল বর্তমানে তদপেক্ষা অনেক অধিক। নানা কারণে কলিকাতার জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। মফস্বলের ব্যবসায়ীদের অনেকে কলিকাতায় আসিয়া কাপড় কেনেন। এই সব দিক দিয়া কলিকাতা ও মফস্বলের প্রয়োজন যথাসময়ে বিচার করা হইয়া থাকিলে বাংলায় বস্ত্রের অভাব ঘটিত না। ভারতবর্ষে মোট যত কাপড় তৈরি হইতেছে দেশের সাধারণ চাহিদার তুলনায় তাহা খুব কম নয়। বিলি-ব্যবস্থার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তাঁহাদের অকর্মণ্যতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই কাপড়ের অভাবে দেশবাসীর এই অকারণ লাঞ্ছনা। গত দুর্ভিক্ষেও কাপড়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে। বহু দুঃস্থ নারী বস্ত্রের অভাবে ঘরের বাহির হইতে না পারায় সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। টেক্সটাইল কমিশনর মিঃ ভেলোডি চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদিগকে কাপড়ের অভাবের জন্য দায়ী করিয়াছেন। কতকগুলি সমাজদ্রোহী ব্যক্তির কারসাজি বস্ত্রের অভাবের একটা বড় কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই একমাত্র কারণ নহে। বস্ত্রের চোরাবাজার বন্ধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কলিকাতায় অনেক দোকান নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাপড় বিক্রয় করে। পাইকারদের মারফৎ খুচরা দোকানীদের কাপড় সরবরাহ না করিয়া টেক্সটাইল বোর্ড কলিকাতায় নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিজ গুদামে মাল আমদানী করিয়া সেখান হইতে সরাসরি খুচরা দোকানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ঐ সঙ্গে অধিক মূল্য আদায় কেহ করিলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার উপযুক্ত সুযোগ জনসাধারণকে দেওয়াতে চোরাবাজার অনায়াসে বন্ধ হইতে পারে।

শীতবস্ত্রের অভাব

শরতের বাতাসে শীতের সজ্জায় শীঘ্রই সুরু হইবে। এ সময় গায়ে আবরণ প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন এবার অন্যান্য বৎসরের চেয়ে বেশী হইবে। কারণ দুর্ভিক্ষে অনাহারে ও স্বল্পাহারে লোক এখনও দুর্বল এবং বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক ব্যাধি-গ্রস্ত। প্রায় এক বৎসর পূর্বে মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছিলেন তিনি যে গৃহেই গিয়াছেন সেখানেই দেখিয়াছেন হয় লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে নয় তো ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে। এই অবস্থা এখনও বিদ্যমান, এবং শীতবস্ত্রের প্রয়োজন এই কারণে অত্যন্ত অধিক। গত যুদ্ধে ইনফ্লুয়েঞ্জায় বহু লোকের মৃত্যু হইলে তাহার কৈফিয়তে ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন গাত্রবস্ত্রের অভাবে লোক অধিক পীড়িত হইয়াছে, অনেকে মরিয়াছে। এবার বাংলার অবস্থা তদপেক্ষা অনেক বেশী শোচনীয়।

মদের দোকান এবং পুলিস কমিশনর

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি সেবাকার্য্যের জন্ত বাঙালীর ধন্তবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের একটি গুরুতর অভিযোগ দৈনিক বসুমতীতে ১৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এই :

"এই সোসাইটি যে ভবনে অবস্থিত ঠিক তাহার পরবর্তী বাড়ীতে একটি মদের দোকান থাকায় সোসাইটির দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাজ বহুলভাবে ব্যাহত হইতেছে। ঐ স্থানে অসম্ভব গণ্ডগোল ও হৈ-চৈ হয়, ফলে কাজের ব্যাঘাত ঘটে। দৈনিক সর্বশ্রেণীর প্রায় এক হাজার নরনারী এবং শিশু এই চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইতে আসে। জরুরী অস্ত্রোপচারের সময় সার্জনরা মাতালদিগের উচ্ছৃঙ্খলজনক চীৎকারে খুবই অসুবিধা ভোগ করেন। যে-কোন সময় ইহাতে বিপদ ঘটিতে পারে।

এই ব্যাপার আমরা পুলিস কমিশনরকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি। উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে, সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেও এই স্থানে মদের দোকান ছিল। সুতরাং এখন উহা স্থানান্তরিত করার কারণ কি থাকিতে পারে, তিনি তাহা বুঝিতেছেন না। অতএব আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, একটি কল্যাণকর কাজের জন্তও পুরাতন পাপ ও অন্তায়ের উচ্ছেদ হইতে পারে না ?"

মদের উপর এ দেশের গবর্মেণ্টের টান নূতন নয়, ভারতে ইংরেজ শাসনের সুরু হইতেই এই পাপ এ দেশে ব্যাপক ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ কাহারও প্রতিবাদে কোন ফল হয় নাই। কংগ্রেস আমলে মাদ্রাজে কয়েকটি জেলায় মদ বন্ধ হইয়াছিল, প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট খাস ইংরেজের হাতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পুনরায় মদের দোকান খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষে এ দেশে যে সময় জাহাজের অভাবে আহার্য্য ও ঔষধ আনা যায় নাই, সেই সময়ে মদ আনিতে বাধা হয় নাই। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ পুলিস কমিশনর মদের দোকান বন্ধ করিতে আপত্তি করিয়া ব্রিটিশ শাসন নীতির পারম্পর্য অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছেন।

কলিকাতায় মৎস্যের অভাব

কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে বাংলা-সরকারের ডিরেক্টর অফ ফিশারিজ ডাঃ সুন্দরলাল হোরা এক বক্তৃতায় কলিকাতায় ও মফস্বলের বাজারে মৎস্যের মহার্ঘতার কারণ প্রদর্শন করেন। ডাঃ হোরা বলেন :

"কলিকাতার বাজারে মাছের আমদানী হ্রাস এক চিরন্তন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সামরিক বিভাগের দাবী মিটাইতে মৎস্যসঙ্কট আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক বিভাগের দাবীর পরিমাণও সামান্ত নহে, তাহার পর বরফের অভাব, কলিকাতার লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি, সুন্দরবন এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ, জেলেদিগের নিয়ন্ন অবস্থা, খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহে তাহাদিগের অসুবিধা, বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি বাজারে মৎস্যের উচ্চমূল্যের কারণ বলা যাইতে পারে। যাহাদিগের নির্দিষ্ট আয় তাহাদিগের অবস্থা কাহিল সত্য, কিন্তু ব্যবসায়ী কণ্ট্রাক্টর ও শ্রমিকরা জিনিষের মূল্যের প্রতি বর্তমানে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না।

"কলিকাতার বাজারে স্থানীয় অঞ্চল হইতে আমরা মোট প্রয়োজনের শতকরা ১০ ভাগ সরবরাহ পাইয়া থাকি, অবশিষ্ট ৯০ ভাগের জন্তই বাহিরের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। কলিকাতা হইতে মাত্র ৪০ মাইল দূরবর্তী হাসনাবাদ গেলেই দেখিতে পাইবেন, ঐ স্থানে চারিদিক হইতে যত মাছ সংগৃহীত হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশই বরফের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং নদীতে ফেলিয়া দিতে হয়। হাসনাবাদ মাছের একটি বড় সরবরাহ কেন্দ্র। উড়িষ্যা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং আসাম হইতেও বাংলায় প্রচুর মাছ আসিয়া থাকে ; কিন্তু কোন কোন প্রাদেশিক সরকার মৎস্য চালান নিয়ন্ত্রণ করায় ঐ সকল অঞ্চল হইতেও কলিকাতার বাজারে অতি সামান্ত পরিমাণ মাছই আসিতেছে।"

সামরিক বিভাগের কণ্ট্রাক্টরগণ কর্তৃক বেপরোয়াভাবে মাছ তরকারী ক্রয় এই সব দ্রব্যের দর অত্যধিক বৃদ্ধির প্রধান কারণ এ অভিযোগ বহু পূর্বেই উঠিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ সব সময়েই উহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সামরিক বিভাগের প্রয়োজন আলাদাভাবে মিটানো হইতেছে প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়ের সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই ইহা তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন। ডাঃ হোরা সরকার-বিরোধী দলের লোক নহেন, মৎস্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্মচারী। তিনিও সাধারণের এই অভিযোগের সত্যতা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন। বরফ সরবরাহ করিয়াও গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে যতটা সাহায্য করিতে পারিতেন তাহাও তাঁহারা করেন নাই।

রেশন দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহে বাধা

বাংলা-সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারিগণকে রেশন দোকানে বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যের নমুনা না দিবার জন্ত দোকানগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। বেঙ্গল রেশনিং অর্ডারের ৬ ও ৭ ধারা অনুসারে গৃহস্থের আহারের প্রয়োজন ব্যতীত রেশনের দোকান হইতে মাল সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারিগণকে নমুনা সংগ্রহের সুযোগ দেওয়ার জন্ত উক্ত দুইটি ধারা হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিতে বাংলা সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু এই অতি সঙ্গত অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কলিকাতা মিউনিসিপাল

আইনের বিধান অনুসারে মানুষের আহারের অযোগ্য কোন খাদ্য-দ্রব্য যাহাতে বাজারে বিক্রীত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্পোরেশনের কর্তব্য। উক্ত আইনের ৪০৬ ধারানুসারে কেহ কোন ভেজাল দ্রব্য কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে বিক্রয় অথবা মজুত করিতে পারে না এবং উহার ৪১৯ ধারানুসারে হেল্‌থ অফিসার পরীক্ষার জন্ম খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দোকানদারকে বাধ্য করিতে পারেন। কিন্তু রেশন অর্ডার অনুসারে কেহ রেশন কার্ড ব্যতীত কোন খাদ্যদ্রব্যের নমুনা পাইতে পারেন না। ইহা লইয়া বাংলা-সরকারের সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরোধ চলিতেছে এবং মুসলিম লীগ ও শ্বেতাঙ্গ দল কর্পোরেশনের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর বিরোধিতা করিতেছেন।

রেশন দ্রব্যের নমুনা দিতে সরকারের আপত্তির একমাত্র কারণ লোকে এই বলিয়া মনে করে যে বিক্রীত খাদ্যদ্রব্য যে অতিশয় নিকৃষ্ট এবং বহু ক্ষেত্রে মানুষের আহারের অযোগ্য গবর্মেণ্ট ইহা জানেন এবং ঐ সব দ্রব্যই তাঁহারা জোর করিয়া রেশন অর্ডারের বলে বিক্রয় করিতে চাহেন। এই কারণেই খাদ্যদ্রব্যের নিকৃষ্টতা লইয়া কোন প্রকাশ্য আলোচনা বা আন্দোলন তাঁহারা হইতে দিতে চাহেন না। বিক্রীত খাদ্য দ্রব্য ভাল হইলে অনায়াসেই এই অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিত। কর্পোরেশনের সভায় এ বিষয়ে বাংলার গবর্ণরকে সচেতন করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু জবাবে মেয়র বলেন উহাতে কোন লাভ নাই। লাভ যে নাই তাহা ভাল-রূপেই বুঝা যাইতেছে। যে গবর্ণর চৌরঙ্গী প্রভৃতি সাহেব-পাড়ার সম্মুখে আবর্জনা দেখিয়া তাহা অপসারণের জন্ম প্রচণ্ড গ্রীষ্মে স্বয়ং ঘোরাঘুরি করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র শহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা জানিয়াও রেশন দ্রব্য ভাল করিবার জন্ম চেষ্টা করেন নাই। যে মেয়র আবর্জনা অপসারণ ব্যাপারে গবর্ণরের সঙ্গে শহর পরিদর্শনে দিনের পর দিন বাহির হইয়াছিলেন তিনিই আশঙ্কা করেন যে এই ব্যাপারে গবর্ণরের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না। সাহেবপাড়ার দোকানগুলিতে বিক্রীত দ্রব্য ভাল থাকিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। কলিকাতা রেশনিঙে যে ভাবে মানুষকে চতুর্গুণ মূল্যে অখাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশে, এমন কি নাৎসী-অধ্যুষিত দেশেও তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ।

হাজার হাজার মণ খাদ্য নষ্ট

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন :

"প্রায় দুই শতখানি লরীর সাহায্যে হাজার হাজার বস্তা পচা ও আধ পচা চাউল, আটা, ময়দা, ছোলা, বাজরা, সুজি প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী লইয়া গিয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে হাওড়া বেল-গাছিয়া অঞ্চলে কোন একটি স্যাঁৎসেঁতে স্থানে গাদা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, এই মর্মে একটি সংবাদ পাইয়া গত ২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আমার দুই জন বন্ধুর সহিত গিয়া দেখি যে, এই সংবাদটি সম্পূর্ণ সত্য। এই অঞ্চলে অনেকটা স্থান লইয়া বস্তা বস্তা পচা খাদ্যসামগ্রী স্তূপীকৃত করিয়া রাখায় সেখান হইতে নরককুণ্ডের মত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। এই খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ কয়েক হাজার মণ হইবে। যেস্থানে এইগুলি স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা মেসার্স আর, এন, চ্যাটার্জি এণ্ড সন্সের কারখানার পাশে এবং হাওড়া ২নং সাব-এরিয়া রেশনের দোকানের সন্নিকটে। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবস্থিত গুদাম হইতেই আনিয়া ফেলা হইতেছে।"

গত দুর্ভিক্ষেও হাজার হাজার মণ চাউল মজুত থাকা সত্ত্বেও তাহা যথা সময়ে বাহির করা হয় নাই এরূপ অভিযোগও প্রকাশ্যে হইয়াছে। চাউল ও আটা মজুত রাখিবার বন্দোবস্তের দোষে হাজার হাজার মণ ইহার পূর্বেও নষ্ট হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাই বিভাগ জিনিসের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন মাত্র না করিয়া সরকারী গুদাম হইতে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্ম কয়েক বার প্রকাশ্যে টেণ্ডারও আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীর অভিযোগ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন নাই, তাঁহারা শুধু উহার গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা মাত্র করিয়াছেন। গত বৎসর আউস ধান উঠিবার পর প্রায় লক্ষ মণ ধান খুলনা লাইনে রেলওয়ে প্লাটফর্মে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছিল। মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করিবার পূর্বেই ধান আনিয়া উন্মুক্ত প্লাটফর্মে বোঝাই করাতে এই ব্যাপার ঘটে। দুর্ভিক্ষের মধ্যে বা অব্যবহিত পরে এইরূপে খাদ্যদ্রব্যের অপচয় পরাধীন দেশ ছাড়া আর কোথাও ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাসে দেখা গিয়াছে জনসাধারণের জন্য খাদ্য অপচয়ের অভিযোগে গবর্মেণ্ট সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের গুলি করিয়া প্রাণদণ্ড দিয়াছেন। এ দেশে ইঁহাদের পদোন্নতি হইলেও আমরা বিস্মিত হইব না।

বিভিন্ন জেলায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে বিশৃঙ্খলা

১৯৪৪ সালে বাংলার খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা সম্বন্ধে লাহোরের ট্রিবিউন পত্রে শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায়ের এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায় বিহার উড়িষ্যা আবগারী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনর এবং ভারতসভা কর্তৃক ফেমিন কমিশনে সাক্ষ্যদানের জন্ম যে চারি জন নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ট্রিবিউনে প্রকাশিত বিবৃতিতে ইনি মফস্বলের মাল সরবরাহের বিশৃঙ্খলা এবং তাহার কুফলের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"মাল সরবরাহের বন্দোবস্ত বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বে-সামরিক লোকেরা ইহার কারণ জানে না। অনেক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল প্রেরণ করা হইতেছে না অথচ অনেক স্থলে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল ১৬ টাকা মণ দরে কিম্বা তদপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। আবার কয়েকটি স্থানে গত বৎসর যে মূল্য ছিল প্রায় সেই মূল্যে চাউলের দর উঠিতেছে। দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে অবস্থার গুরুত্ব গোপনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। জুন মাসে পরিষদের বিতর্কে খাদ্যসচিব চট্টগ্রামের সরবরাহের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া কাছাকাছি ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় ১৩ কিম্বা ১৪ টাকা মণ হিসাবে চাউল বিক্রয়ের সংবাদের উপর জোর দিয়াছিলেন। (পরিষদে কয়েকজন সদস্য তাহার প্রতিবাদ করেন।) ১০ই জুলাই গবর্ণর তাঁহার রেডিও বক্তৃতায় সাফল্যের কথা বলিয়াছেন। এই সাফল্যের তুলনায় "কতকগুলি ক্ষুদ্র স্থান রহিয়াছে—সেখানে অসুবিধার কারণ আছে, বিশেষতঃ সরবরাহের অসুবিধা—ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি যে বক্তব্য করিয়াছেন তাহাতে এই সান্ত্বনার বাণী আছে যে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমরা সঞ্চয়, সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। তাহা ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ও তৎপরবর্তী বৎসরের ভিত্তিস্বরূপ হউক। কারণ, বাংলার খাদ্য বিষয়ে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমাদিগের বিপদ কাটিয়া যাইবে না।'

১৯শে জুলাই কাউন্সিলে সচিবের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে, চট্টগ্রামে ৩০ টাকা হইতে ৩২ টাকা মণ-দরে চাউল বিক্রীত হইতেছিল। এই দর অনুমোদিত দরের দ্বিগুণ। সচিবের স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গেই (সম্ভবতঃ পরে) এক সারকুলার পত্র দেওয়া হয়। তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে বলা হইয়াছিল যে, গেজেটে প্রকাশের জন্ম তাহাদিগের প্রেরিত চাউলের মূল্যের সংবাদে সরকার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব তাঁহারা পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে যথার্থ উচ্চ মূল্য না দেখাইয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যের সহিত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল পাওয়া যাইতে পারে না এই মন্তব্য যুক্ত করিয়া দেখাইবেন।"

বাংলা-সরকার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে প্রথমাবধি যে ভাবে সত্য গোপন করিয়া আসিতেছিলেন এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে বজায় আছে। এইরূপে সত্য গোপনের দ্বারা সরকার ক্রমাগত জনসাধারণের আস্থা হারাইতেছেন এই সাধারণ সত্যটুকুও আজ তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম। বিপদের কথা অকপটে জনসাধারণকে জানাইয়া দিয়া তাহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রার্থনা করিলে তাহা লাভ করা সহজ হয়, বিপদও অপেক্ষাকৃত সহজেই কাটাইয়া উঠা যায়।

বহরমপুরের পচা আটা

বহরমপুরের ১৩ হাজার মণ পচা আটার বিবরণ ভাদ্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১লা ভাদ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ণ বিবৃতি দানের প্রতিশ্রুতি খাজা সর নাজিমুদ্দীন দিয়াছিলেন।

"বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত ১৩ হাজার মণ আটা আটক করার ফলে ঐ আদেশ জারি করা হইয়াছে এবং ঐ আটা আহারের অযোগ্য দেখা গিয়াছিল। ঐ আটক করা আটা সরকারের সম্পত্তি এবং সরকার উহা পশুখাদ্যরূপে বিক্রয় করিতে চাহেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটী তাহাতেও আপত্তি করিয়া বলেন, ঐ আটা পশুর পক্ষেও অখাদ্য, উহা নষ্ট না করিলে চোরাবাজার ঘুরিয়া লোকের আহার্য্যে ব্যবহৃত হইবে।"

৭ই আগষ্ট এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, ১৭ই পর্য্যন্ত বাংলা-সরকার তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহা লইয়া মুলতুবী প্রস্তাব উঠিলে প্রধান মন্ত্রী বিস্তৃত বিবরণ জানাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্ধারিত তারিখে সর নাজিমুদ্দীন প্রতিশ্রুত বিবৃতি দেন নাই, পর দিন তাঁহার পরিবর্তে মিঃ সুরাবর্দী বলেন :

তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, ১৩ হাজার মণ আটা সাড়ে ছয় হাজার বস্তায় প্রেরিত হইয়াছিল—সরকারের ও বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের অজ্ঞাতে কেহ ৭টি নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাহার পরীক্ষাফলে ঐ ১৩ হাজার মণ আটা আটক করিবার চেষ্টা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করেন—খুচরা দোকানে অস্বাস্থ্যকর আটা থাকিলে মিউনিসিপ্যালিটি তাহা লইতে ও নষ্ট করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে সরকারের সব মজুদ আটা নষ্ট করিতে পারেন না।

মিঃ সুরাবর্দী সদস্যগণকে জানাইয়া দেন যে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তিনি যে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন তাহার বলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ সমর্থন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের মূল আদেশ সভায় পাঠ করা হয় নাই। সভায় সে কথা জিজ্ঞাসা করা হইলেও তাহার উত্তর পাওয়া যায় নাই। মূল আদেশ পঠিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম সমর্থন করা চলিত না, এই অভিযোগেরও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। ব্যাবস্থাপক সভার সভাপতি সরকার পক্ষের বক্তব্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন এবং মুলতুবী প্রস্তাব তুলিয়া বিষয়টির আলোচনা হইতে দিতে অস্বীকার করেন।

বাংলায় কুইনাইন সরবরাহ

বড়লাটের শাসন-পরিষদের সর যোগেন্দ্র সিং বলিয়াছেন যে, বাংলা-সরকারকে ডাক্তার ও ঔষধাদি সরবরাহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা বাংলায় ৬৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন, ৩৫ হাজার পাউণ্ড সিনকোনা ও কুইনাইনের অনুকল্প ৬ কোটি বড়ি প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বহুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট।

কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা-সরকারকে কুইনাইন দিয়াছেন কিন্তু উহা ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণের হস্তগত হইতেছে কি না তৎপ্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সাধারণ লোকের পক্ষে কুইনাইন প্রাপ্তিতে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। কলিকাতায় ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন দেখাইলে তবে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে অর্থাৎ সাত আনায় নয় বড়ি কুইনাইন পাওয়া যায়। ডাক্তার ডাকিয়া প্রেসক্রিপসন লেখাইতে হইলে অন্ততঃ ৪৲ দরকার। অর্থাৎ ৯ বড়ি কুইনাইনের দাম প্রকৃতপক্ষে পড়ে ৪।৵০। সরকার ইহা সস্তা ও সহজ মনে করিলেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্ত দুর্মূল্য ও দুঃসাধ্য। বিনা পয়সায় প্রেসক্রিপসন লিখিয়া দেওয়ার মত পরিচিত ডাক্তার সকলের থাকে না। তদুপরি প্রেসক্রিপসনটি একটি নির্দিষ্ট বাঁধা গৎ অনুসারে হওয়া দরকার, উহার এক তিল ব্যতিক্রম হইলে প্রেসক্রিপসন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ফলে সময় নষ্ট ও হয়রানি উপরিপাওনাস্বরূপ জোটে। মফস্বলে ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য বর্তমানে কয়জনের আছে তাহা বিবেচ্য। যে-দেশে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়াই পোষ্টাপিসে কুইনাইন কিনিয়া লোকে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়িত সে দেশে উহা দেওয়ার এত বিপুল ও ব্যয়সাধ্য আয়োজনকে কুইনাইন সরবরাহ বলা কঠিন।

পরলোকে মণীন্দ্রনাথ মিত্র

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র ২৪শে ভাদ্র শনিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মিত্র নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটিরও সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর ছিলেন। নিজ জেলা যশোহরের এবং কলিকাতার বহু জনসেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কলিকাতার রেফিউজ নামক অনাথ নিবাসের তিনি যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সংগঠনশক্তিসম্পন্ন একজন অকৃত্রিম স্বদেশ ও সমাজ-সেবকের তিরোধান ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ৭ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) হইতে ২০শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের তৃতীয় পর্ব্বের চরম পরিণতির জন্য সম্মিলিত জাতির রণ-পরিচালকগণ প্রবল চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে জার্ম্মানির অবস্থা অবরুদ্ধ দুর্গের, এবং এখন পশ্চিমে মিত্রপক্ষ জার্ম্মান সীমান্তের জিগফ্রিড এবং ম্যাজিনো দুর্গমালার শক্তিকেন্দ্রগুলির দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাহা ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে যে-সকল সংবাদ মিত্রপক্ষের সংবাদপ্রেরকদিগের নিকট হইতে আসে তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে কয়েক স্থলে মিত্র-পক্ষের সেনাদল জার্ম্মানির পশ্চিম-দুর্গ-প্রাকার ও রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া জার্ম্মানির ভিতরে কিছুদূর প্রবেশ করিয়াছে। পরের খবরে দেখা যাইতেছে যে, এখন তাহারা মূল দুর্গ-মালার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যে অঞ্চলে তাহারা অগ্রসর হইয়াছে তাহা বেলজিয়মের অন্তর্গত এবং এখানে জিগফ্রিড় দুর্গমালা অত্যন্ত চওড়া; খাল, নদী ও দুর্গ পরিপূর্ণ রক্ষাব্যূহ বিশেষ। কিন্তু এই অঞ্চলে ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইন ছিল না, সুতরাং এই একমাত্র স্থলে জার্ম্মানির প্রসিদ্ধ পশ্চিম দুর্গ-প্রাকারে এক স্তর দুর্গ বা রক্ষাকেন্দ্র আছে। লুক্সেমবুর্গ হইতে সুইস্ সীমান্ত পর্য্যন্ত জিগফ্রিড দুর্গমালার অব্যবহিত পশ্চিমে ম্যাজিনো দুর্গমালা থাকায় সেখানকার রক্ষাব্যূহে দুই স্তর দুর্গ আছে। সুতরাং সেখানে মিত্রপক্ষকে প্রথমে ম্যাজিনো লাইন পার হইয়া তাহার পর জিগফ্রিড লাইন আক্রমণ করিতে হইবে। এখনও ঐ সকল অঞ্চলে কোন বিশেষ আক্রমণ আরম্ভের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

জার্ম্মানির জিগফ্রিড লাইন বা "পশ্চিম প্রাকার" সম্বন্ধে কোনও সবিশেষ বিবরণ সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩৯ সালে হিটলারের বক্তৃতায় ইহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দৃঢ়তম দুর্গমালা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সেই বক্তৃতায় আরও বলা হয় যে, জার্ম্মান জাতি আশ্বস্ত থাকিতে পারে যে জগতের কোনও শক্তি এই দুর্গপ্রান্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ বক্তৃতার পর উহার নির্ম্মাতা ডাক্তার টট্ আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া উহা দৃঢ়তর করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। এতদিনে ঐ দুর্গমালার প্রকৃত মূল্য কি তাহার পরীক্ষার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে।

জিগফ্রিড লাইন প্রায় ৪০০ মাইল দীর্ঘ। ইহা উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মানি হইতে সুইস্ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার প্রসার স্থলে স্থলে ৩০ মাইলের অধিক। ইহাতে তিন সারি—স্থানে স্থানে চার সারি—দুর্গ বা শক্তিকেন্দ্র আছে যাহার অধিকাংশই ভূগর্ভে লুকানো। এইরূপ ১৭০০০ দুর্গ ও শক্তিকেন্দ্র পরস্পরের সহিত সুড়ঙ্গ বা লুকানো পথে সংযুক্ত করিয়া এই প্রসিদ্ধ দুর্গমালা রচনা করা হয়। যেখানে প্রাকৃতিক বাধা—যথা নদনদী বা গিরিমালা—আছে সেখানে এই দুর্গমালার সে সকলকে রক্ষাব্যূহের অন্তর্গত করা হইয়াছে। তবে ফ্লাণ্ডার্স ও ওলন্দাজ দেশে এরূপ ব্যবস্থা বিশেষ কি ভাবে আছে তাহা সাধারণের অজ্ঞাত। ম্যাজিনো লাইন সমস্তটাই ভূগর্ভস্থ কেল্লা ও সুড়ঙ্গপথ দ্বারা রচিত তবে এই দুর্গমালার প্রসার বিশেষ কিছু নহে এবং বেলজিয়াম সীমান্তে ইহার অস্তিত্বই নাই।

হিটলারের "ইয়োরোপ দুর্গ" ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চিমে জার্ম্মানীর মূল দুর্গমালায়, দক্ষিণে ইটালির উত্তরের মালভূমি ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে, পূর্ব্বে বল্টিক সাগরতীরস্থ দেশগুলির অংশবিশেষে ও পোলাণ্ডের ভিষ্টুলা নদের কূলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতশ্রেণীতে গিয়া ঠেকিয়াছে। এই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহা বলা চলে যে জার্ম্মানি প্রায় সকল দিকেই তাহার মূল রক্ষাবেষ্টনীর প্রথম দুর্গমালায় সরিয়া আসিয়াছে। এই সকল স্থলেই এখন আক্রান্ত অপেক্ষা আক্রমণকারীর কার্য্যক্রম দুরূহতর। তবে সম্মিলিত জাতিবর্গের আকাশশক্তি এখন জার্ম্মানি অপেক্ষা বহুগুণ ক্ষমতাযুক্ত।

জার্ম্মানি এখন সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষাকার্য্যে ব্যস্ত এবং কোনও যুদ্ধপ্রান্তেই সে উন্মুক্ত রণাঙ্গনে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইতেছে না। ফ্রান্সের যুদ্ধের প্রথম অঙ্কে—এবং মার্কিন সেনা সমুদ্রতীরস্থ ব্যূহচ্ছেদ করার পর অল্পকালের জন্য দ্বিতীয় অঙ্কেও—জার্ম্মান সেনা যে ভাবে অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড যুদ্ধদান করিয়াছিল তাহাতে সাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে আরও ঘোরতর যুদ্ধ হইবে এবং মিত্রপক্ষকে বিষম শক্তি পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু হঠাৎ সে সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং জার্ম্মান রক্ষী সেনা সরাসরি ভাবে হটিয়া জিগ-ফ্রিড লাইনের দিকে চলিল। এরূপভাবে সম্মুখ সমরে পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ কি? জার্ম্মানির পতন কি এই রূপেই হইবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব কেননা ইয়োরোপের যুদ্ধ এখন মিত্রপক্ষের আক্রমণের হিসাবে চরমে উঠিবার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থায় রহিয়াছে এবং আর সামান্য চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে স্থলে ও আকাশে দারুণ অগ্নি প্লাবনের মধ্য দিয়া জার্ম্মানির শক্তি পরীক্ষার প্রচণ্ডতম পর্ব্ব চলিবে। জার্ম্মানির এখন "শিয়রে সংক্রান্তি" এবং বোধ হয় সেইজন্যই জার্ম্মান সেনা এখন চতুর্দ্দিকে দুর্গাশ্রয় লইয়া ঝড় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং অন্য দিকে রুশ ও মিত্রপক্ষ এখন দুর্গমালা ছেদনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত, সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানির ভিতরে ভিতরেও বিপ্লবের চেষ্টা নিশ্চয়ই চলিতেছে। জার্ম্মানির আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত অবনতি হইলে ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের শেষ নিষ্পত্তি অপেক্ষাকৃত সহজেই হইতে পারে, নহিলে সম্মিলিত জাতি-বৃন্দের প্রচণ্ড সৈন্য ও অস্ত্রক্ষয় অনিবার্য্য।

রুমানিয়ার অক্ষশক্তির রক্ষাব্যূহ ভিতর হইতে ভাঙিয়া

পড়ায় শুধু যে রুশসেনা সহজে কার্য্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইল তাহাই নহে, এইরূপ অকস্মাৎ এবং অভাবিতভাবে রুমানিয়ার পতনে জার্মানদল বিপন্ন হইয়া বোধ হয় পশ্চিম-ইয়োরোপে গচ্ছিত সৈন্যবলের উপর টান মারিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে আসন্ন দুর্ব্বিপাক ঠেকাইতে বাধ্য হয়। এবং বোধ হয় গচ্ছিত শক্তির অভাবে ফ্রান্সের রণপ্রাঙ্গণে যুদ্ধরত সেনাকে বাধ্য হইয়া দুর্গাশ্রয়ে হটিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই যে, জার্মানি রুমানিয়ার পতনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য এই ঘটনায় জার্মানি শুধু যে তাহার পেট্রোলের ব্যবস্থার শতকরা ৪০ ভাগ হারাইয়াছে তাহাই নহে, বরঞ্চ তাহার বিপক্ষদল লক্ষ লক্ষ সৈন্যক্ষয়ে যে কার্য্যে এই বৎসরে সফল হইত কিনা সন্দেহ তাহাও রাষ্ট্রনীতির কৌশলে নিমেষের মধ্যে হইয়া গেল।

বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-ইয়োরোপে জার্ম্মান রক্ষীদল সমানেই লড়িয়া যাইতেছে, কেবল মাত্র বল্কান অঞ্চলে রুশ সেনার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বল্কানে রুশ সেনা সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া বসিলে জার্মানির রক্ষাব্যূহ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং জার্মানির অবরোধও অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হইবে কিন্তু তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির দিন ঘনাইয়া আসিবে না। অন্তর্বিপ্লব না হইলে শেষ নিষ্পত্তি হইবে জার্মানির মর্ম্মস্থলের উপর। এবং তাহার পূর্ব্বে উভয়পক্ষে সৈন্যবল ও অস্ত্রবলের ভীষণ ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নহে, যদিও বর্ত্তমানে সেরূপ সংঘর্ষের কোনও পূর্ব্ব লক্ষণ পশ্চিম-ইয়োরোপে দেখা যাইতেছে না। অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিলে এখন সর্ব্বশেষে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, জার্মানি যদি সত্য সত্যই পতনোন্মুখ হইয়া থাকে, যদি সত্যই এরোপ্লেনে বোমা ক্ষেপণের ফলে তাহার অস্ত্র-নির্মাণ-ক্ষমতা সাংঘাতিক ভাবে কমিয়া গিয়া থাকে, যদি দেশে অন্তর্বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়া থাকে, তবে আগামী দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্মানির রক্ষণের ব্যবস্থায় বিষম ফাটল সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইবে।

ইটালিতে মিত্রপক্ষের সেনাদলগুলি এখন "গথিক লাইন" নামক রক্ষাব্যূহের উপর গিয়া পড়িয়াছে। সেখানে আর একবার প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিবে বোধ হয়, কেননা জার্মান রক্ষীদল এখনও ঐ যুদ্ধপ্রান্তে সমানেই লড়িয়া চলিতেছে এবং মিত্রপক্ষের গতিরোধের চেষ্টায় তাহারা এখনও পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত।

বল্কানে কি ঘটিতেছে তাহার অতি আবছায়া পরিচয় আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। জার্মান সেনা কয়েকটি অঞ্চল হইতে হটিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পশ্চাদপসরণ না বিপক্ষের প্রবল চাপের ফলে পলায়ন তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। রুশদল কোন্ দিকে প্রবলতম শক্তিপ্রয়োগ করিতেছে তাহাও এখন পর্য্যন্ত স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। রুমানিয়ার পতন এবং বল্কানের অন্যান্য অঞ্চলে ভাঙন ধরি-বার পর অগণিত রুশসেনা প্লাবনের জলের ন্যায় সমস্ত বল্কান ছাইয়া ফেলিয়া সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত হাঙ্গেরীর রক্ষাব্যূহের উপর প্রবল আঘাত করিবে এরূপ কথাই সহজে মনে হয়, কিন্তু এখনও সেরূপ সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। বরঞ্চ যাহা আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন রুশসেনার যে অংশগুলি জার্মান ও হাঙ্গেরীয় রক্ষীদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে সেগুলি অতি সন্তর্পণে চতুর্দ্দিক দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সেখানে কি ঘটিতেছে তাহা এখনও সম্যক্‌ভাবে বুঝা যায় না। রুশ প্রান্তের অন্যান্য অঞ্চলেও এখন সোভিয়েট সেনার অগ্রগতি সেরূপ ব্যাপকভাবে হইতেছে না। রুশসেনাও কি তবে জার্মানিতে অন্তর্বিপ্লবের প্রতীক্ষা করিতেছে, না রুশ যুদ্ধ-প্রান্তে জার্মান সেনাদলগুলি এখনও শক্তিক্ষয়ে সেরূপ ক্ষীণ হয় নাই? কিম্বা রুশ রণচালকবর্গ পশ্চিমে মিত্রপক্ষের অভিযানের বিস্তৃতি এবং প্রচণ্ডতম ঘাত-প্রতিঘাতের অপেক্ষায় নিজশক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছে? মনে হয় এসকল প্রশ্নেরও উত্তর অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সাময়িক ভাটা পড়িয়াছে মনে হয়। এই যুদ্ধপ্রান্তে এখন দুই পক্ষই উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত, কেননা বর্ষাকালের শেষ আর বেশী দূরে নাই।

চীন দেশের কোয়াংসী ও হুনান প্রদেশে জাপানী সেনা পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। এখানে জাপানী সেনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ, চীনদেশে মার্কিন বিমান বহরের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিগুলি দখল বা নষ্ট করিয়া জাপানের উপর আকাশপথে আক্রমণের আশঙ্কা দূর করা এবং দ্বিতীয়তঃ ক্যাণ্টন-হাংকাও রেলপথ সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া ইন্দো-চীন শ্যাম মালয় ও ব্রহ্মদেশের সহিত এক নূতন যোগসূত্র স্থাপন করা, যাহার প্রভাব দ্বীপময় ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এবং যাহার ফলে জাপান স্থলপথেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি রাখিতে পারে। জাপান এই চেষ্টায় খুব দ্রুত কিছু করিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে তাহাদের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিরুদ্ধ হয় নাই বরঞ্চ এই নূতন অভিযানের ফলে স্বাধীন চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ কথা উঠিতেছে, নানাপ্রকার অভিযোগ এবং প্রত্যভিযোগের সৃষ্টিও হইয়াছে।

স্বাধীন চীন সাত বৎসর যাবৎ যুদ্ধ চালাইয়া ক্ষতির পর ক্ষতি সহ্য করিয়া প্রায় সম্বিৎহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার এই প্রচণ্ড যুদ্ধদানের ফলে এবং অশেষ আত্মত্যাগ ও ক্ষতিস্বীকারের ফলে মিত্রপক্ষ রক্ষা পাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এমন কি চীন অস্ত্রত্যাগ করিলে এবং তাহার ফলে জাপানী সেনা সাইবিরিয়া আক্রমণের সুযোগ পাইলে সোভিয়েট রুশও যে ডুবিয়া যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং জাপানের বর্ত্তমান অভিযানে অগ্রগতির জন্য স্বাধীন চীনের উপর দোষারোপ করা অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে।

(বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত)

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois

প্রীতি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

নেপালবাবু, আমার খ্যাতিতে আপনার মনে যে উৎসাহ জাগরূক হয়েছে তাতে করে আপনার কল্পনাকে অনেক দূরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। কল্পনার পক্ষে ওড়া সহজ কিন্তু আমার মত একটি আস্ত মানুষের পক্ষে তার সমস্ত বোঝা সমেত অতটা উর্দ্ধগামী হওয়া সম্ভব মনে করেন? আপনি ত দেখেছেন আমি কোনো কাজ আজ পর্য্যন্ত নিজে থেকে করিনি—কিছু যে করে কর্ম্মে নেব সে রকম শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়নি—কোনো পরীক্ষার জন্যেই আজ পর্য্যন্ত কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারিনি, গোলেমালে দৈবাৎ যা ঘটে উঠেছে তাই ঘটেছে। আমার শেষ পর্য্যন্ত এই রকমই চলবে। থেকে থেকে হঠাৎ চমকে উঠে দেখব একটা কিছুর মধ্যে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়ে গেছি—সেটার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মনটা অহরহ ব্যস্ত হয়ে থাকবে অথচ যতক্ষণ তার মধ্যে আছি ততক্ষণ তার দায় এড়াতেও পারব না। বরাবর এমনি করেই আমার কাজ চলে এসেছে। তা যদি না হ'ত, তাহলে খুব সম্ভব আমেরিকা থেকে কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারত—কিন্তু তা করতে হলে তাল ঠুকে মল্লভূমিতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়—নকীবের মুখ দিয়ে খুব লম্বা করে নিজের পরিচয় ঘোষণা করতে হয়—খবরের কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলোর সর্ব্বোচ্চ শিখরে চড়ে বসতে হয়—তুরি ভেরী দামামা জগঝম্প ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াতে হয়। আমাদের দেশের অনেকে সে কাজ করচেন—নিজের নানা বেশের ছবি সমেত নানা লোকের অভিমতসম্বন্ধ পরিচয়-পত্র নির্লজ্জ-ভাবে চারি দিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্চেন এবং আশ্চর্য্য এই, তার ফল পাচ্চেন। অথচ মূলধন তাদের অতি যৎসামান্য—কিন্তু অন্ন বস্ত্র আদর অভ্যর্থনার অভাব নেই। আমি ও রাস্তার ধার দিয়েও চলতে পারলুম না। এখানে এসে অবধি ভয়ে কোনো বড় সহরে ঢুকিনি—শিকাগো থেকে বারবার নিমন্ত্রণ পাচ্চি কিন্তু সেদিকে ভিড়িনি। রচেষ্টারে একটা কন্‌গ্রেস হবে, সেখান থেকেও পালাবার চেষ্টায় ছিলুম কিন্তু অনুরোধ কাটাতে পারচি নে। দেখুন, আপনি রামানন্দবাবুকে একটা কথা বলবেন—এখানকার যে কোনো ছাত্র তাঁর কাগজে নিজের জয়ঢাক বাজায় সেটা তিনি কেন ছাপান? তাঁর কাগজ এদেশেও আসে—অনেক সময় ছাত্রদের কীর্ত্তিকাহিনী তাদের পরিচিতবর্গের কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকে। আমেরিকায় আত্মঘোষণাটা অত্যন্ত বেশি চলিত—আমাদের ছাত্ররা সেইটে সর্ব্বাগ্রে শিখে নেয়—আমার কাছে সেটা নিরতিশয় সঙ্কোচজনক মনে হয়।

যাই হোক্ ধীরে ধীরে আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে এখানকার একদল লোকের ঔৎসুক্য জাগরিত হয়ে উঠবে এরকম আশা করা যেতে পারে—কিন্তু যাতে সেটা সত্য সীমার মধ্যে থাকে সে আমাদের দেখতে হবে। কথা কইতে গিয়ে কথা বেড়ে যায়—একবার সুরু হলে সেটা সামলে ওঠা শক্ত। যাই হোক্ বিদ্যালয়ের পরিচয় এখানে যতই বিস্তীর্ণ হোক্ না, সেটাকে আর্থিক লাভের সীমায় পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারব কিনা সে আমি কিছুই জানি নে। সে সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ না করে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করাই সব চেয়ে ভাল—যা কিছু পাবার মত জিনিষ তা এমনি করেই পাওয়া যায়—যা চেয়ে চিন্তে কেঁদে কেটে পাই তার দায় সামলানো শক্ত—তা পেতে গেলে মাথা বিকিয়ে দিতে হয়—যত পাই তার চেয়ে অনেক বেশি দিই। কেবল ভগবান আমাদের যা দেন তা ষোল আনা দেন, তার মজুরি কেটে নিয়ে তাকে ছিন্ন করে দেন না। সেই দানের জন্য অপেক্ষা করব এবং সেই দানের যোগ্য হতে চেষ্টা করব—সেই যোগ্যতা হয়নি বলেই যত কিছু দারিদ্র্য দেখতে পাচ্চেন—নইলে অভাব কিছুই ছিল না। এখনো সময় আছে—এখনো হবে আশা করচি—ভয় করবেন না। ইতি
২৪শে পৌষ ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

C/o Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus London
May 6, 1913.

প্রীতি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

নেপালবাবু, আশা করচি এখানকার কাজ সমাধা হতে আমার আর বেশি দিন লাগবে না। আমি বেশ দেখতে পাচ্চি গত বারের চেয়ে এবারে আমাকে অনেক বেশি ভিড়ের মধ্যে ভিড়তে হবে—অথচ আমি ভিড়ের জীব নই, কি করব তাই ভাবচি। Quest Societyর বক্তৃতার বন্ধনে জুনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে বদ্ধ আছি—তার পরে যদি সুবিধা পাই তাহলে ব্রিটিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে একবার য়ুরোপে যাবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই সমস্ত ঘোরাঘুরিতে আমার মন আর সায় দিতে পারচে

না—এতদিন পথের টানে ত অনেক ঘোরা গেল এবার আসনের ডাক পড়েছে। একটা স্থবিধা এই হ'ল পথের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে যাওয়া গেল—বেশ বুঝতে পারচি মাঝে মাঝে হঠাৎ সকাল বেলায় আবার বেরিয়ে পড়ব, পাখীর ডাক শুনলে মন উতলা হবে এবং এক এক দিন গভীর রাত্রের স্বপ্নে সমুদ্রের গৃহহীন ঢেউগুলো হাত তুলে তুলে ডাক দেবে। আমার মত নিতান্ত কোণের মানুষকে সমুদ্রের পশ্চিম পার যে এমন করে টানাটানি করবে একথা গেল বছরের বৈশাখ মাসে স্বপ্নেও মনে করি নি। দূরের সঙ্গে এই সম্বন্ধের দ্বারা কাছের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারবে এইটে আমার লাভ। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষা পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি প্রবল হয়ে জেগে উঠবে, আমার পূর্ব্বের সেই নিরালা জায়গাটি হয়ত ঠিক তেমন করে আর ফিরে পাব না এই কথা চিন্তা করে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা এবং বেদনা বোধ করচি। একথা বেশ বুঝতে পেরেছি চুপ করে বসবার দরবার আমার এখনো পর্য্যন্ত মঞ্জুর হল না। যত দিন বেঁচে আছি আমার ছুটি নেই, পেন্সন নেই।

বিদ্যালয়ের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন চেয়েছেন। একটা ভাল ম্যাজিক লণ্ঠন ছিল সেটা রথীরা শিলাইদহে পল্লীর কাজে নিয়ে গিয়েছিলেন আমি রথীকে বলেছি সেটি তাঁরা বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দেবেন। তার জন্যে কতকগুলো Slides-এর সংস্থান করতে হবে। Mirroscope বলে আজকাল একটা নতুন যন্ত্র বেরিয়েছে তাতে দামী স্লাইডের দরকার হয় না—যে কোনো ছবি দিয়ে কাজ চালানো যায়—খবর নেব তার দাম কত। আজকাল এ দেশের শিক্ষাবিধি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয় উঠেছে। সেইজন্যে এখানকার ভাল বিদ্যালয়ে গিয়ে আমি বিশেষ কোনো ফল পাই নে—যে প্রণালী একেবারেই আমাদের অসাধ্য তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লাভ কি। আমার ত মনে হয় এত অত্যন্ত বেশি আয়োজনের জটিলতা সফলতার লক্ষণ নয়। যেমন বড় মানুষের ছেলেরা অত্যন্ত বেশি খেলনা পায় বলে তাদের খেলার যথার্থ সুখ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি ছাত্রদের মনকে বাইরের থেকে নানা উপায় ও কৌশলের দ্বারা অত্যন্ত বেশি নাড়া দিতে থাকলে বাইরের দিকটাতে তাদের চিত্তের গতিকে বাড়িয়ে তোলা হয় বটে, কিন্তু ভিতরের দিকে নিশ্চয়ই জড়ত্ব সঞ্চার করা হয়। মনকে অতিশয় অনুকূল্য করলে তার স্বাভাবিক সৃজন চেষ্টা এবং সেই চেষ্টায় আনন্দকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। একথা আমি জোর করে বলতে পারি এই সমস্ত আসবাবগুলোকে বিদায় করবার জন্যে একদিন এদের মালগাড়ি ডাকতে হবে। কেননা আসবাবের আধিক্যে মানুষের জায়গা কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে আসচে—ধন যত বড় হয়ে উঠচে ধনী ততই ছোট হতে চলেছে। আমার বোধ হচ্চে যেন একথা এরা এখনি বুঝতে আরম্ভ করেছে—এখন থেকে এরা রিক্ত হবার সাধনায় প্রবৃত্ত হবে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি লাভের জন্যে এদের বীরকে প্রাণপাত করে সংগ্রাম করতে হয়েছে—এবার বহির্বস্তুর বিপুল বন্ধনজাল থেকে মনকে মুক্তি দেবার জন্যে এদের অনেক তপস্বীকে তপস্যা করতে হবে। আমাদের মুস্কিল হবে এই যে এরা যেগুলো ফেলে দিতে থাকবে আমরা সেগুলো সস্তায় পাব বলে কুড়িয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে থাকব। য়ুরোপের আবর্জ্জনার বোঝা বোধ করি এক দিন আমাদেরি টানতে হবে, আমাদের ধনীদের ঘরে এখনি তার লক্ষণ দেখা যায়। উপায় নেই। বস্তুর মোহের মধ্য দিয়ে না গিয়ে বোধ হয় তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় না। দরিদ্র বোধ হয় সত্যভাবে মহৎভাবে দরিদ্র হতে পারে না—দুহাতে ধন ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে তবে তাকে দরিদ্র হতে হবে – যে পূর্ণ হয়েছে সেই ত রিক্ত হবার আনন্দ ভোগ করতে পারে, যে শূন্য সে কেমন করে পারবে? সেইজন্যই দেখচি য়ুরোপের বস্তুর বোঝা আমাদের মত দীনদরিদ্রের মন কেবলি মুগ্ধ করচে। আমরা হাত বাড়িয়ে বলচি ঐ মোট মাথায় তুলতে না পারলে আমাদের আর মুক্তি নেই। অথচ দেখতে পাচ্চি এই বোঝার ভারেই য়ুরোপের চিত্তের মধ্যে একটা গভীর ক্রন্দন উঠতে আরম্ভ করেছে। সে এক দিন নিশ্চয়ই বলবে যেনাহংনামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ আজ তারই ভূমিকা হচ্চে। য়ুরোপ যখন বলবে আমি অমৃত চাই, তখন হয়ত আমরা বলতে থাকব আমরা উপকরণ চাই। মানুষের আত্মার চেয়ে তার উপকরণকে বিশ্বাস করবার অন্ধ প্রবণতা আমাদের মধ্যে খুব দেখা দিয়েছে সে ত দেখতেই পাচ্চেন। আমরা কেবলি লোভ করচি। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—এ কথাটার মানে আমরা ভুলে বসেছি। একথার মানে এই, বস্তুর কাছে হাত বাড়িয়ো না, তাঁর দ্বারে দাঁড়াও। তিনি যা দেন সে ত হাতের মুঠোর উপরে দেন না, তার ত ভার নেই, সে তিনি জীবনের ভিতরে সঞ্চার করেছেন—সে সম্পদ আমাদের আত্মারই অংশ হয়ে যায় সুতরাং তাকে লোহার সিন্দুকে ভরতে হয় না। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" একথার উপরে আমরা ভরসা রাখতে পারিনে—কেন না, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এ কথাটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। আমরা নিজেকে দিয়েই সমস্তকে আবৃত করেছি। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক হতে হবে। বস্তুর উপরে বিশ্বাস, যান্ত্রিক প্রণালীর উপরে নির্ভর আমাদের আশ্রমের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে কখনো মোহন বেশে কখনো বিভীষিকার আকারে দেখা দেয়। কিন্তু তার প্রতি যদি দৃক্‌পাত না করেন তাহলে দেখতে পাবেন সে নিশ্চয়ে অন্তর্ধান

করবে। আমাদের আশ্রমের ইতিহাসে যা দৈন্যরূপে বাধারূপে দেখা দিয়েছে তা ছায়ার মতই নিজের কোনো পদচিহ্ন না রেখে চলে গিয়েছে তা বারবার দেখেছি—ধনীর সাহায্যের দ্বারা আমরা ধনবান হইনি এ কথাটি কোনো দিন ভুলবেন না। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩২০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নেপালবাবু, Hornell সাহেবকে আমি জানি। আপনি আমার নাম করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ করবেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা ছিল তিনি বিদ্যালয় দেখতে যাবেন। লোকটি যথার্থই ভাল এবং আমার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা আছে। তার পরে আপনাদের ভূগোলের বইটা ওঁকে দেখালে নিশ্চয়ই তিনি মনোযোগ দেবেন—এ সম্বন্ধে তাঁকে স্বতন্ত্র-ভাবে কিছু লেখবার কোনো দরকার নেই। ম্যাকমিলান-দের সঙ্গে আমার কি রকম এগ্রিমেণ্ট হয়েছে সে ত আপনি শুনেছেন—এটা যদি জমিয়ে তুলতে পারা যায় তাহলে আমাদের কাজে লাগতে পারবে।

আমার বক্তৃতার পালা আপাতত শেষ হয়ে গেল। এগুলি এখানকার লোকদের মনে লেগেছে। রোটেনস্টাইন বলচেন এ বইটি বের হলে গীতাঞ্জলীর মতই সমাদর লাভ করবে এবং প্রচুর বিক্রী হবে। এ হলে শান্তিনিকেতনের গঙ্গাজলেই শান্তিনিকেতনের পূজা হবে। ইংরেজি ভাষাটাকে নিয়ে যদি সহজে ব্যবহার করতে পারতুম তাহলে এখানে অনেকটা কাজ এগিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম কিন্তু এ যাত্রায় সে আর হবে না। কোনো দিন যে এই শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজার পূজা করিনি এইজন্যে তিনি আমাকে যেটুকু দয়া করেছেন তার মধ্যে কৃপণতা আছে—আমার ভারতের ভারতীর দয়াই আমার সম্বল। আমার বাঙালী পাঠকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পাচ্চি তাতে তাঁরা লিখছেন যে আমার ইংরেজি তর্জ্জমা বাংলার চেয়ে ভাল হয়েছে। এমন কথা বলবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁরা যে আমার লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি তার কারণ আমার লেখা যথেষ্ট ভাল ছিল না। একথা যদি সত্যও হয় তাহলে আমার তরফে বলবার কথা এই যে, যেখানে ভাল লাগবার শক্তি ক্ষীণ সেখানে বাজিয়ের হাতে বীণা পুরো-পুরি বাজে না।

এণ্ড্রুজ সাহেব হয়ত এতদিনে আপনাদের ওখানে গিয়েছেন। যাতে তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন কোনো বাধা না পান সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যাঘাত আছে সেগুলি তাঁর মধ্যস্থতায় কেটে যাবে এইটেই আশা করি। বাইরের দিক থেকে প্রীতির জোয়ার এসে পড়লে আমাদের ভিতরের দিককার সঙ্কীর্ণতা কেটে যাবে। আমরা যখন আপনাকে ছোট করে জানি তখন ছোট হয়ে যাই। বাইরের পূজার সাহায্যে আমাদের বিদ্যালয়ের বড় পরিচয় আমরা লাভ করতে পারব। এণ্ড্রুজ সাহেবকে আমার আন্তরিক প্রীতির অভিবাদন জানাবেন।

এণ্ড্রুজ সাহেব যখন এদেশে আমার সঙ্গে দেখা করেন তখন আমাকে আমার নিজের জীবনের ভিতরকার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি দু-চারটে কথা তাঁকে বলেছিলুম। কিন্তু তার মধ্যে কোনো অহঙ্কারের সুর ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। বস্তুত আমার জীবনের ইতিহাসের মধ্যে যে দীনতা আছে সে আমি কোনো দিনই ভুলি নে। যেমন করেই আমি নিজেকে দেখি না কেন এটা আমার স্পষ্ট চোখে পড়ে যে আমার মধ্যে ফুল যত ফুটল ফল তত ধরল না। আমার সাধনা কবিত্ব-লোকে এসে থেমেছে তার উপরে যেখানে শব্দহীন জ্যোতির্ম্ময়লোক সেখানে পৌঁছতে পারে নি। এই কারণে জীবনের সাধনা নিয়ে আমি অহঙ্কার করতে পারিনি। কিন্তু এণ্ড্রুজ সাহেব বোধ করি তাঁর প্রীতির আবেগে আমার পরিমাণ বাড়িয়ে লোকের কাছে ধরেছেন। এতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি। য়েটস্ প্রভৃতি সমালোচকেরা আমাকে সাহিত্যের নিক্তিতে ওজন করে যা বলেছেন তা ভুল হোক সত্য হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না—কেন না যে জিনিষটা বাইরে এসে পৌঁচেছে তার বিচার প্রত্যেকে নিজের বিচারশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন করবেন এই হচ্চে প্রথা। কিন্তু আমার ভিতরের কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন—সেখানকার খবর দেবার বেলা খুব সাবধানে কথা কওয়া উচিত—সেখানে সকল প্রকার অত্যুক্তিই সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। বরঞ্চ সেখানে খাটো করে কথা কওয়া কর্ত্তব্য। আমি যে কবি এ কথা বলতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই—আমি আমার রাজার দেউড়িতে রসুনচৌকি বাজাবার বায়না পেয়েছি একথা আমি নিজেই লোককে বলে বেড়িয়েছি—কিন্তু অন্দরে যে আমার বসবার আসন আছে একথা উচ্চারণ করবার জো নেই। আমি কবি কিন্তু আমি গুরু নই একথা বলে বলে আমি হয়রান হলুম—দয়া করে এ কথাটা আপনারা গ্রহণ করবেন এবং এণ্ড্রুজ সাহেবকেও আমার এই পরিচয়টা সমজিয়ে দেবেন।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রগুলি স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায়কে লিখিত এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় গণিতশাস্ত্রেও দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল, এ সংবাদ হয় তো অনেকে জানেন না। অনেক সময়ে দেখা যাইত, দার্শনিক চিন্তা বা লেখার পরে দিবাবসানে তিনি গণিত আলোচনা করিতেন। কী করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'এই একটু recreation'। একখানি কাগজকে কিরূপে বহুভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় তিনি তাহা সম্পাদন করিতেন।

তিনি কাগজের নানা রকমের ছোট-বড়-মাঝারি বাক্‌স তৈয়ার করিতেন। ইহা তাঁহার একটা বিশেষ প্রিয় বিষয় (hobby) ছিল। ইহাতে তাঁহার অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা যাইত। চিঠির কাগজ, খাম, কলম, দোয়াত, চশমা প্রভৃতি নানা জিনিস-পত্র রাখিবার জন্য তিনি কাগজের নানারকমের বাক্‌স করিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে এই উপহার প্রচুর পাইয়াছিলাম। শান্তিনিকেতনের সেই সময়কার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত কাগজের বাক্‌সের বিশেষ বৈচিত্র্য ইহাই ছিল যে, এগুলি তৈয়ার করিতে কোন সুতা, বা আঠা, বা আলপিন প্রভৃতি লাগিত না, কেবল কাগজেই কাজ হইয়া যাইত। ইহার জন্য সব সময়েই তাঁহার টেবিলের এক পাশে একখানি কাঁচি ও কিছু বাদামি রঙের একটু মোটা কাগজ থাকিত।

এই সেদিন আমার পুরাতন কাগজ-পত্রের মধ্যে এইরূপ একখানি ছোট খাতা পাইলাম। ইহা তিনি আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহার নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন "স্মৃতিব্যঞ্জনী"। পর পৃষ্ঠায় নিম্নে মুদ্রিত প্রথম কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তারিখটি দিলেও সালটি উল্লেখ করেন নাই।

দ্বিতীয় কবিতাটি ঐরূপ আর একটি বাক্‌স উপহার দিয়া লিখিয়াছিলেন। ইহা কী চমৎকার, পাঠকগণ অনুভব করিবেন।

স্মৃতি-ব্যঞ্জনী

১২ই আষাঢ় শুক্রবার

[১]

বাক্‌সো পেয়ে খুসী খুবই !
কাণ্ড এগো আজগুবি !
বিনাসূতায় মালা যেন গাঁথা।
মিলায়েছে খিল কাঁটা
বিনা আটায় আঁটা,
বাতাসে যেন ফাঁদা পাতা ॥

[২]

ওঁ

শ্রীমদ্‌ বিধুশেখর শাস্ত্রিচূড়ামণি করকমলেষু

শান্তিনিকেতন

২৭ বৈশাখ। ১৩২৯

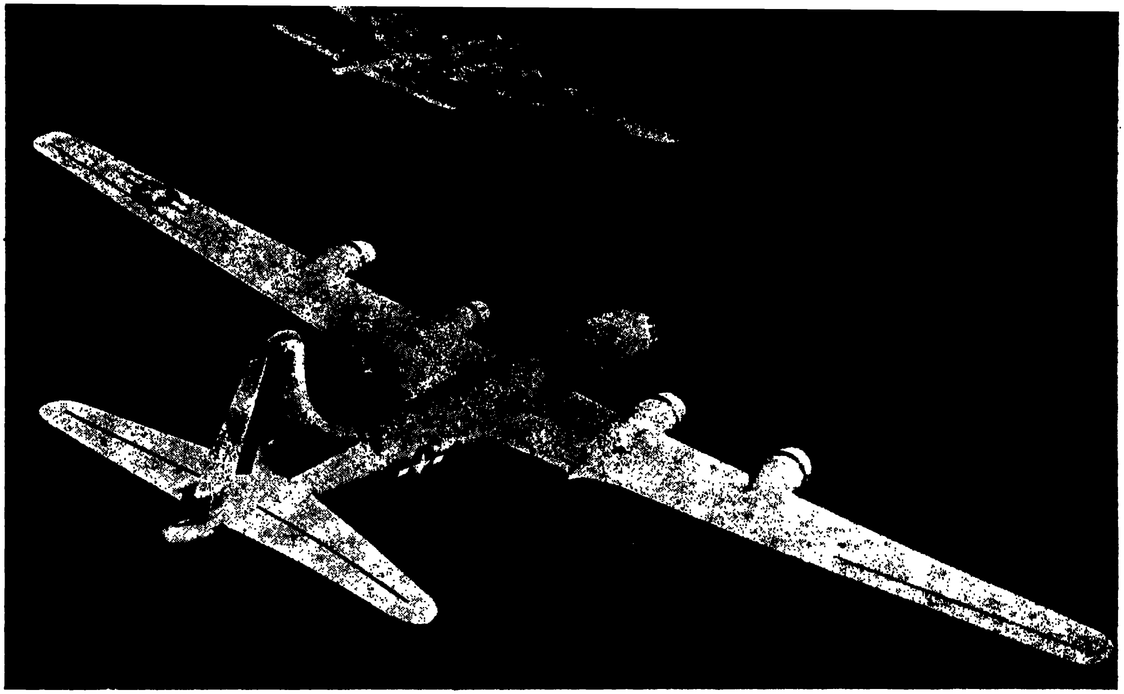
সেবি দেবী সরস্বতী, কাগচেই রতিমতি,
বিরচিনু কাগচের বাক্‌সো।
লোকে বলে মূল্য এ'র, একটি টাকাই ঢের,
বাঙ্‌মা জানে মূল্য এ'র লাখ্‌সো ॥
বুলাইয়া শিশু ঝাঁটা, আটায় নহেক আঁটা
গাঁথা নহে পিনে বা সুতায়।
কেবল কাগজ ভাঁজি, খেলিনু ভেল্কি বাজি,
এ'র তুল্য শিল্প কোথায় ॥
কাগচ করিয়া ভাঁজ, করি কাগচের কাজ,
গঙ্গাজলে গঙ্গা আমি পূজি।
ভালে ধর নিশাপতি, শিরে বিন্তা ভাগীরথী,
এবে ধর দ্বিজের এই পুঁজি ॥

শারদোৎসব

শ্রীকমলরাণী মিত্র

ঝরা-শেফালির মালা প'রে এলো
শারদোৎসব রাতি,
মেঘের আড়ালে খনে খনে ডোবে চাঁদ ;
তবুও হৃদয় ছলকে ছলকে পুলকে উঠিবে মাতি',
তবু মনে মনে জাগিবে খুশির সাধ ?
সকল ভবনে হয়তো জলে নি আলো,
হয়তো বাজে নি বাঁশি ;
হয়তো সবার পরনে সজ্জা নাই ;
সবার নয়নে হয়তো ফোটে নি নিরুদ্বেগের হাসি ;
তবুও জলিবে ঘরে ঘরে রোশনাই ?

হোক ঝরা-ফুল, জ্যো'স্না মলিন,
সামান্য আয়োজন,
শঙ্কাপহারী শঙ্খ উঠুক বেজে—
যারা এলো, যারা আসিতে পেল না—সবার সম্মেলন
সফল হউক দুঃখে অমিত তেজে !
ঝরা-শেফালির ফুলবনে আজ
শারদোৎসব হবে,
কোন ক্ষতি নাই, নাই থাক সমারোহ,
একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রেখো দুঃখের গৌরবে,
একটি ব্যাকুল জ্বালা অতি দুঃসহ !



মিত্রপক্ষের সমস্ত বোমারু বিমানের মধ্যে বৃহত্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী একটি অভিনব ইউ-এস, বি—২৯ 'সুপার ফর্ট্রেস'

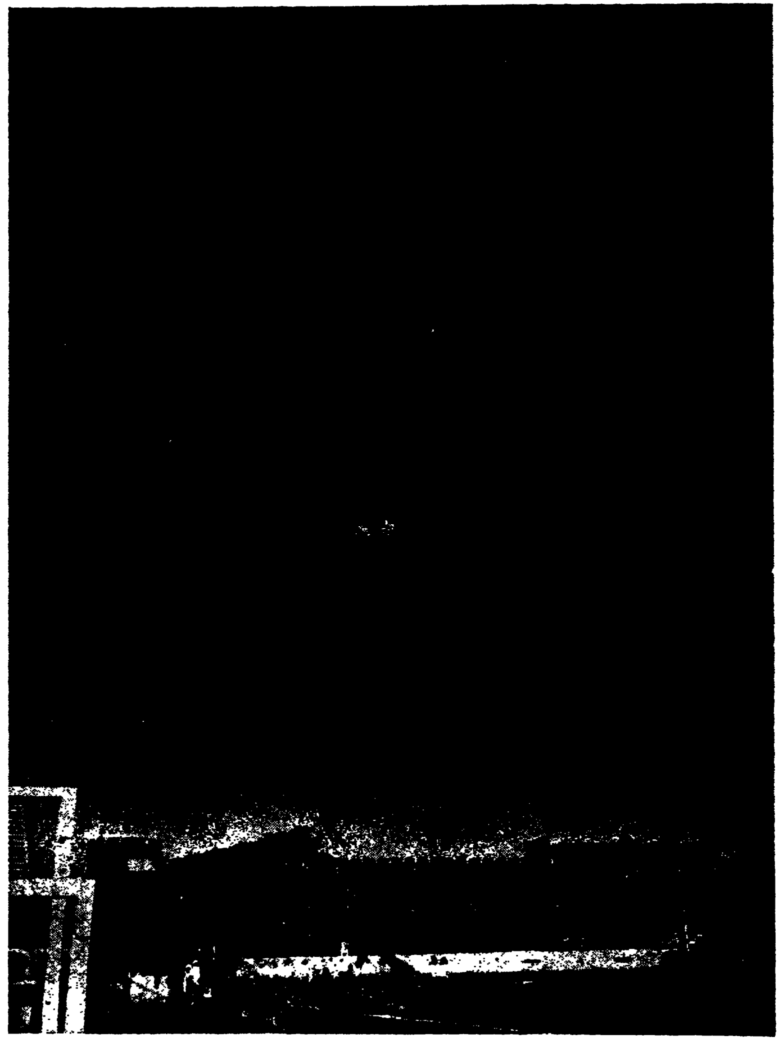


ইউ-এস-এর একটি ভাসমান জিপ ব্রহ্মদেশের মগাউং নদী পার হইয়া কামাইং শহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে

USOWI



একটি ইউ-এস হেলিকপ্টার কর্ত্তৃক সৈন্যদের উদ্ধারকার্য্য এবং শত্রুপক্ষের সন্নিবেশ-স্থান পর্য্যবেক্ষণে স্বীয় উপযোগিতা প্রদর্শন



ইউ-এস-এর বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুস্তরের তাপমানের বিভিন্নতা নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে 'কস্‌মিক'-রশ্মির উপকরণবাহী বেলুনসমূহ আকাশে উড্ডীন করিতেছেন

USOWI

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীবিমলাচরণ দেব

বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে একটি ব্রাহ্মণবালক ভিক্ষার জন্য আসে। বোধ হইল, বিহার বা যুক্তপ্রান্তবাসী, এবং ভিক্ষাব্যবসায়ী নহে। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, সে বিদ্যার্থী, বড়বাজারে একটি চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে ও মাধুকরী দ্বারা নিজ দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহ করে। "বিদ্যার্থী" কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় একটি শ্লোক বলিল—

কাকচেষ্টঃ বকধ্যানী শ্বাননিদ্রস্তথৈব চ।
অল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণঃ।

অর্থাৎ এইরূপ পাঁচটি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই বিদ্যার্থী—খাদ্য সংগ্রহের জন্য কাকের যেরূপ সর্ব্বদা চেষ্টা, বিদ্যার্থীরও জ্ঞানের জন্য সেই রূপ চেষ্টা। বকের মত ধ্যান, অর্থাৎ এত একাগ্র যে বক মাছ ধরিবার জন্য একমনে জলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, জ্ঞান নাই যে ব্যাধ তাহাকেই মারিবার জন্য তীর যোজন করিতেছে। কুকুরের মত নিদ্রা, "স্বনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ"। অল্পাহারী, অর্থাৎ ভোজনবিলাসী নয়। গৃহত্যাগী—অর্থাৎ বিদ্যার জন্য বিদেশে যায়। বস্তুতঃ-পক্ষে "ব্রাহ্মণশ্চাংপ্রবাসী" আমাদের দেশে নিন্দার পাত্র। যাহার সমস্ত "জ্ঞান" নিজগৃহে অর্জ্জিত, তাহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। কূপমণ্ডূক বা কুণো ব্যাঙের মত। তাহাকে "গৃহজ্ঞানী" বা "গৃহেজ্ঞানী" বলিয়া নিন্দা আছে। অর্থাৎ বিদ্যার জন্য নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া দূরে গুরুগৃহে বাস করিবে। সেখানেও "আহুতাধ্যায়ী" অর্থাৎ গুরু পাঠ লইতে আহ্বান করিলে তবে তাঁহার নিকট গিয়া পাঠ লইবে।

গুরুর কৃপায় ও বিচারে শিষ্যের পাঠ ও বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হইলে উপকুর্ব্বাণ শিষ্যকে গুরু সমাবর্ত্তন করান—অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অনুমতি দেন। সেই সময়ে তিনি শিষ্যকে শেষ উপদেশ দেন। তন্মধ্যে আছে—"স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১, ১১, ১) স্বাধ্যায় ও প্রবচন হইতে যাবজ্জীবন বিচ্যুত হইও না। এখানে শাঙ্করভাষ্য বলিতেছেন—"স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নং প্রবচনমধ্যাপনম্"। অর্থাৎ যাহা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া বসিয়া থাকিবে না, নিত্যই বিদ্যার্জ্জন করিবে—ইহা স্বাধ্যায়—প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—শুধু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বসিয়া থাকিবে না। দান করিবে। ইহাই প্রবচন।

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দান না করা ভারি দোষ। এই কথাই আছে মনু, ২, ১১৩ মেধাতিথি ভাষ্যে—

"তথা চ শ্রুতিঃ—যো হি বিদ্যামধীত্যার্থিভ্যো ন ব্রূয়াৎ স কার্য্যহা স্যাৎ। শ্রেয়সো দ্বারমপাবৃণুয়াৎ। অথাপরমহমেতদ্ যথৈতৎ বাক্যোঽবিকারং ক্ষয়ো বদন্তি। অস্মিন্ যোগে সর্ব্বমিদং প্রতিষ্ঠিতম্। য এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"।

বিদ্যা দান করা বিদ্বানের এত বড় কর্ত্তব্য যে, তাহা না করিলে সে "কার্য্যহা" পদ বাচ্য হয়।

শিক্ষিত ব্যক্তির এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বেশ জোর করিয়া বলা আছে লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রে। সেখানে ঋত্বিক্ সম্বন্ধে বলা আছে—যিনি ঋত্বিক্ হইবেন তাঁহার নয়টি গুণ থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে একটি হইতেছে—তিনি "অনূচান" হইবেন। অর্থাৎ "শিষ্যেভ্যো বিদ্যাসংপ্রদানং যঃ কৃতবান্।"

তাহা হইলে নিয়ম—অর্থীকে বিদ্যা দিবে। কিন্তু, যেই আসিয়া চাহিবে, সেই কি অর্থী, তাহাকেই কি দিতে হইবে? ইহা হইতে পারে না। উপযুক্ত, অর্থাৎ অধিকারী না হইলে দিবে না। উপযুক্ত অর্থী যদি না আসে, তাহা হইলে সে বিদ্যা লইয়া মরিবে, তবু অপাত্রে দিবে না—

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ।

মনু ২, ১১৩

এখন—"উপযুক্ত" বলিয়া কাহাদের বিদ্যা দান করা যায়—

১। মনু ২, ১০৯ মতে দশ জন—

আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ।

এখানে মেধাতিথি মতে—"আপ্তঃ" অর্থে "সুহৃদ্-বান্ধবাদিঃ প্রত্যাসন্নঃ"। "স্বঃ" অর্থে "পুত্রঃ"।

২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪,২,৫ শাঙ্করভাষ্য মতে—ছয় জন—

ব্রহ্মচারী ধনদায়ী মেধাবী শ্রোত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ।
বিদ্যয়া বা বিদ্যাং প্রাহ তানি তীর্থানি ষণ্মম।

৩। নারদ মতে (স্মৃতিচন্দ্রিকা, ১, পৃ. ৫২ পং ২৭১) তিন জন—

গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপলভ্যতে।

এখানে একটু কৌতূহলের বস্তু দেখিতেছি—মনু মতে—"অর্থদ", ছান্দোগ্যোপনিষৎ শাঙ্করভাষ্য মতে "ধনদায়ী", নারদমতে "পুষ্কলেন ধনেন"—অর্থাৎ টাকা দিয়া বিদ্যা পাওয়া যায়। বাংলায় বলে—ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শেখা। কিন্তু ঠিক এই জিনিসই নিন্দিত ব'লে পাই—ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিত, অর্থাৎ যে টাকা নিয়া পড়ায় ও যে টাকা দিয়া পড়ে উভয়েই নিন্দিত। মনু ৩, ১৫৬

এই সমস্যার কতকটা সমাধান আছে মনু ২,২৪৫এ—

"ন পূর্ব্বং গুরবে কিঞ্চিদ্ উপকুর্ব্বীত ধর্ম্মবিৎ"। অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণের আগে গুরুকে কিছু (অর্থাদি) দান করিবে না। পরে গুরুদক্ষিণা দিবে। এই কথাই বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪. ১. ২.এ আছে—"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাঽননুশিষ্য হরেতেতি"। শিষ্যকে বিদ্যাদান দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধন গ্রহণ করিবে না। আগে দিলেই গুরু ও শিষ্য যথাক্রমে ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিত হইয়া গেলেন।

কিন্তু—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪,২,৩এ যখন রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ উপদেশের জন্য সযুগ্বা রৈক্কের নিকট গেলেন "ষট্‌শতানি গবাম্ অয়ং নিষ্কঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ" লইয়া—তাহাতে রৈক্ক ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে শূদ্র বলিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এখানে শাঙ্করভাষ্য "শূদ্র" কথাটির তিনটি অর্থ দিয়াছেন—"১। রাজা হংসদিগকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার অপেক্ষা রৈক্ক শ্রেষ্ঠ। ইহাতে তাঁহার মনে শোক হইয়াছিল। তাই তিনি "শূদ্র"। ২। টাকা দিয়া বিদ্যা লইতে আসিয়াছেন, শূদ্রের মত বুদ্ধি, সবই কেনা যায়। "ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শেখা"। ৩। রৈক্ককে দিবার জন্য রাজা যাহা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা রৈক্কের মনের মত হয় নাই। ইহাতে রৈক্কের রাগ হইল, তাই রাজাকে গালি দিলেন "শূদ্র" বলিয়া। রাজার নজর "ক্ষুদ্র"।

এই শেষ অর্থটিই ঠিক মনে হয়। কারণ রাজা প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া গিয়া যখন ছয় শত স্থলে এক সহস্র গরু, ও তৎসহ নিষ্ক ও অশ্বতরী রথ ও তদুপরি একটি দুহিতা লইয়া হাজির হইলেন, তখন আর রৈক্ক রাগ করিলেন না। ঐ সমস্ত লইয়া খুসি হইয়াই উপদেশ দিলেন।

কি জানি, এই উপাখ্যানে মনে হয়—টাকার বদলে বিদ্যাদান দোষের হইত, যদি টাকাটা গুরুর মনের মত না হইত। এখানে ত আগে টাকা লইয়া পরে বিদ্যা দিলেন। দোষ হইল বলিয়া দেখি না। ইহা কি "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা" (ভাগবত ১০, ৩৩, ২৯)?

এখন—এই "অর্থ" (তাহার সঙ্গে "ধর্ম্ম" ও "শুশ্রূষা" সম্বন্ধে) এবং কাহাকেও বিদ্যা দিবে না এই নিষেধ সম্বন্ধে আছে – মনু ২,১১২তে—

"ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাঽপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বক্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে।"

মনু ২,১১৪তে আছে—অসূয়ককে বিদ্যা দিবে না। নিরুক্ত ২,৪,১ (—বাসিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র ২.৮—সায়ণভাষ্য, ঋগ্বেদ, উপোদ্‌ঘাত—ললিতাসহস্র নাম, ১৫, সৌভাগ্যভাস্কর ভাষ্য) তে আছে—"অসূয়কায়াঽনৃজবেঽযতায়" দিবে না।

আরও—শ্রদ্ধাবান্ না হইলে দিবে না। শ্রদ্ধা না হইলে "শুশ্রূষা" আসে না, গ্রহণের ইচ্ছা বা শক্তি ঠিক হয় না।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ গীতা ৫, ৩৯
"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" গীতা ৪, ৪০

ললিতাসহস্র নাম ১১, সৌভাগ্যভাস্কর ভাষ্যে "শ্রদ্ধা"কে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া আছে—"ততঃ শ্রদ্ধাভাবে পৃচ্ছকায়াঽপি ন বক্তব্যং কিমুতাঽপৃচ্ছকায়" অর্থাৎ যদি কেহ খুব আগ্রহের সহিত কোন প্রশ্ন করে, তাহাকেও বলিবে না, যদি দেখ তাহার শ্রদ্ধা নাই।

এখানে আবার পাইতেছি "পৃচ্ছক", অর্থাৎ যে জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে। জিজ্ঞাসা না করিলে কিছুই বলিবে না।

মনু ২,১১০এ আছে—"নাঽপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ"। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২০,২০তে রাজপুত্র ঋতধ্বজের অন্যান্য গুণমধ্যে একটি হইতেছে তিনি "অনাপৃষ্টকথ", কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলেন না। বৃহৎসংহিতা ২,১এ—দৈবজ্ঞ হইবেন "পৃষ্টাভিধায়ী", অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত হইলে তবে কথা বলিবেন।

কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, সে অবস্থায় "যেচে আগ বাড়িয়ে" কথা কহিলে অপমান ডাকিয়া আনা হয়। এই কথাই মহাভারত ১৩,৮২,১৪তে আছে "স্বয়ংপ্রাপ্তে পরিভবো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ"। জিজ্ঞাসিত হইলে তবে কথা কহিবার উপযুক্ত সময় হয়। তাই বলে—

"অপ্রাপ্তকালবচনং বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্।
প্রাপ্নোতি বুদ্ধ্যবজ্ঞানমপমানং চ শাশ্বতম্।"

ইহা হইতে মোটামুটি বুঝা যায়, যে প্রণিপাত করিয়া (অর্থাৎ সরল নম্র ভাবে) উপস্থিত হয়, সে "উপসন্ন"। সে ব্যক্তি "পরিপ্রশ্ন" করিলে হয় "পৃচ্ছক", সে "সেবা" অর্থাৎ "শ্রদ্ধা" দ্বারা বিদ্যা প্রাপ্তি ও গ্রহণের অধিকারী হয়। তাই গীতা ৪, ৩৪এ—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"।

"পৃষ্ট না হইলে বলিবে না" এই নিয়মের একটি "অপবাদ" আছে—অপৃষ্টস্তু তদ্ ব্রূয়াদ্ যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবম্"। এই কথাটি উদ্ধার করিয়াছেন ললিতাসহস্রনাম ১১, সৌভাগ্যভাস্কর ভাষ্য। আর বলিয়াছেন—এই "অপবাদ" সকলের জন্য নয়—"তদপি শ্রদ্ধালুপ্রশ্নাসমর্থশিষ্যপরম্"" অর্থাৎ, যে শিষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কিন্তু প্রশ্ন করিতে অসমর্থ, তাহারই উপকারের জন্য।

এইরূপ—পৃচ্ছককেও অবস্থা বিশেষে বলিবে না। মনু ২, ১১০এ আছে—যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্থাৎ শিখিবার জন্য নহে, প্রত্যুত বিরুদ্ধবুদ্ধি লইয়া জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে বলিবে না। এই কথাই আছে—নিরুক্ত ২,৩,৯ দুর্গাচার্য্যের টীকায়।

এই নিষেধ কেন দেওয়া আছে নিরুক্ত ২,৩,৫,৮এ—

"নাহবৈয়াকরণায়"—ব্যাকরণ না জানিলে কথাই বুঝিতে পারিবে না। "অব্যাকরণজনস্তব্ধঃ"।

"নাহনুপসন্নায়"—নম্র সরল প্রার্থী না হইলে দিবে না।

"অনিদংবিদে বা"—"ইদংবিদ্" অর্থাৎ আত্মবিৎ না হইলে দিবে না। কারণ—

"নিত্যং হ্যবিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানেঽসূয়া"—যাহার "বিজ্ঞান" হয় নাই, তাহার অসূয়া হইবেই যাহার "বিজ্ঞান" হইয়াছে, তাহার উপর। অসূয়ক অপাত্র।

এই পর্য্যন্ত হইল "নিষেধপর্ব"। এই বারে "বিধিপর্ব"। অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তিকে বিদ্যা দিবে। নিরুক্ত ২,৩,৯ বলিতেছেন—

"উপসন্নায় তু নিব্রূয়াদ্ যো বাঽলং বিজ্ঞাতুং স্যান্মেধাবিনে তপস্বিনে বা"।

বিদ্যা দিবে যে "উপসন্ন", যে "মেধাবী", যে "তপস্বী", বা যে "অলং বিজ্ঞাতুংস্যাৎ", তাহাকে।

১। "উপসন্ন" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

২। "তপস্বী"—তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই এবং তপস্যা না থাকিলে কিছুই হয় না। তপঃ কি ?—

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যো স ধর্মঃ পর উচ্যতে।"

মহাভারত ১২.২৫০.৪

একাদশ ইন্দ্রিয়ের একান্ত একমুখী ভাবই তপঃ।

"যদ্ দুস্তরং যদ্ দুরাপং যদ্ দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্বং হি তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্।"

মনু ১১.২৩৮ (মহাভারত ১৪.৫১.১৭)

"তপস্বী" না হইলে "প্রত্যক্ষ" অর্থাৎ সাক্ষাৎ অর্থদর্শন অর্থাৎ ঠিক ঠিক অনুভূতি হয় না।

"ন হ্যেষু প্রত্যক্ষম্ অনৃষেরতপসো বা" (নিরুক্ত ১৩.১২).

৩। "তপস্বী" হইলেই হইবে না! "মেধাবী" হওয়া চাই। ভট্ট উৎপল "বৃহৎসংহিতা" ৬৭.৩৬এ টীকাতে বলিয়াছেন—"অতিতানস্মৃতির্মেধা" অর্থাৎ যে স্মৃতি বা স্মরণশক্তি অতিবিস্তৃত, তাহাকে মেধা বলে। বিস্তৃত স্মরণশক্তি ব্যতীত পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান সম্ভব নয়। মনে পড়ে রাস্কিন্ তাঁহার এক শিক্ষক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"He had a capacious memory, the most indispensable prerequisite of all sound learning."

এখানে কিন্তু দুর্গাচার্য্য অন্য একটি অর্থ দিয়াছেন—"মেধাবী" অর্থাৎ "অন্যজন্মান্তরানুভাবিতয়া প্রজ্ঞয়া যুক্তঃ"। যাহার পূর্ব্বজন্মার্জিত এই সম্পদ্ (মেধা) নাই, তাহার হাজার চেষ্টাতেও কিছু হয় না। "মেধাবী" হইয়া যদি তপস্বী হয়, তাহা হইলেই তাহার "প্রত্যক্ষ" হয়।

৪। ইহা ছাড়া, যদি গুরু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারেন যে, কোনও প্রার্থী "অলং বিজ্ঞাতুম্" অর্থাৎ (দুর্গাচার্য্যমতে) "যো বাঽন্যঃ কশ্চিদ্ অলং পর্য্যাপ্তো বিজ্ঞাতুম্ এতচ্ছাস্ত্রং ভবেদ্ দৃঢ়গ্রাহী স্থিরবুদ্ধিঃ"—এরূপ যদি বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকেও বিদ্যাদান করিতে পারেন।

এই কথাই আছে নিরুক্ত ২,৪,৪ (—বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র ২,৯)এ—

"যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহস্তস্মৈ মা ব্রূয়াঃ নিধিপায় ব্রহ্মন্।"

বিদ্যা বলিতেছেন—সেই রকম লোককে আমায় দিবে, যাহাকে বেশ বুঝিবে শুচি, অপ্রমত্ত, মেধাবী, ব্রহ্মচর্য্যোপপন্ন, যে দ্রোহ করিবে না কখনও, কারণ সে লোক আমাকে পাইলে "নিধিপ" হইবে। অর্থাৎ আমি (বিদ্যা) যে "নিধি", তাহার "পালক" (custodian) হইবে। তাহার দায়িত্ব অনেক।

বিদ্বানের এই দায়িত্বের কথা আছে—শতপথ ব্রাহ্মণ ১,৭,৩,এ—"ঋষীণাং নিধিগোপ ইতি হ্যনূচানমাহুঃ"। অর্থাৎ যিনি "অনূচান" হইয়াছেন, সাঙ্গ সরহস্য বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি ঋষিদের নিধি প্রাপ্ত হইয়া সেই নিধির "গোপ" অর্থাৎ রক্ষক (custodian) হইয়াছেন। তিনি custodian of the riches of the Rishis, যে-সে লোক নহেন, তাঁহার দায়িত্ব সোজা নয়। ইহার কারণ "ঋষি" সর্বোচ্চস্তরের মনুষ্য—যিনি "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" (নিরুক্ত ১,২০,২), যাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মের অপরোক্ষ অর্থাৎ সোজাসুজি সাক্ষাৎ হইয়াছে। কাহারও মারফতে, বা বইপত্রের মধ্য দিয়া, বা শোনা বলা কথার মধ্য দিয়া নয়। যাঁহাদের খুব পড়াশুনা প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞান, তাঁহারা "ঋষি" নহেন, "শ্রুতর্ষি"। (নিরুক্ত ১,২০,২১, দুর্গাচার্য্যটীকা)। "শ্রুতর্ষি" যে "ঋষির"র বহু নিম্নে বলা বাহুল্য।

এই "অপরোক্ষ" বা "প্রত্যক্ষ" বা "সাক্ষাৎ" জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান - এই দুইয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে বলা আছে, মহাভারত ১২-২৬৮,১৭তে—"ঋতে ত্বাগমশাস্ত্রেভ্যো ব্রূহি তদ যদি পশ্যসি", অর্থাৎ "আগম" (বহুস্থলে "আগড়ম্ বাগড়ম্") শুনিতে চাহি না, কি দেখিতেছ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কি জ্ঞান, তাহাই বল।

এই কথাই আবার আছে মহাভারত ১২-২৬৯,৪২-৩এ

"প্রত্যক্ষমিহ পশ্যন্তো ভবন্তঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
কিমত্র প্রত্যক্ষতমং ভবন্তো যদুপাসতে।
অন্যত্র তর্কশাস্ত্রেভ্য আগমার্থং যথাগমম্।"

এই "প্রত্যক্ষ" ও "শোনা কথা"র প্রভেদ এবং "প্রত্যক্ষ"-কে অবিসম্বাদী ভাবে উচ্চ স্থান দেওয়ার কথা আবার পাই, শতপথ ব্রাহ্মণ ১,৩,১,২৭এ—"সোৎবেক্ষতে সত্যং বৈ চক্ষুঃ, সত্যং হি বৈ চক্ষুস্তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতাম্ অহমদর্শম্ অহমশ্রৌষমিতি য এব ব্রূয়াদ্ অহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তৎ সত্যোনৈবৈতৎ সমর্ধয়তি"। (এখানে বোধ হয় "চক্ষুঃ" অর্থে লক্ষণাদ্বারা একাদশ ইন্দ্রিয়)। প্রত্যক্ষ-এর এত দাম।

এই সম্পর্কে ভাগবত ১১, ৭, ২০ মনে পড়ে—

"আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়সাবনুবিন্দতে।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি "পুরুষ", অর্থাৎ "আমি পুরুষ" এই অভিমান রাখে, তাহার গুরু সে নিজে। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও তজ্জনিত অনুমানের দ্বারা সে তাহার শ্রেয়ঃ লাভ করে। আপ্ত বাক্য, শোনা কথার স্থানই নাই।

এমন যে কঠোর প্রত্যক্ষলব্ধ জিনিস, বিদ্যা, ইহা কি যাহাকে তাহাকে দেওয়া যায়? ঐ "বিধি", ঐ "নিষেধ" মনে রাখিয়া উপযুক্ত অর্থীকে দিবে। তাহা না হইলে বিদ্যা "বীর্য্যবতী" থাকিবেন না। অনুপযুক্ত লোককে বিদ্যা দিলে তাহার গ্রহণ ধারণ শক্তির বৈকল্য জন্য বিদ্যার কদর্থ ও অপব্যবহার হইবে এবং তজ্জন্য সংসারের প্রভূত ক্ষতি হইবে। দাতা ঘোরতর অপরাধী হইবেন।

এই পর্য্যন্ত বিদ্যাদানের কথা। সময়ান্তরে বিদ্যা গ্রহণ পদ্ধতির কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৬

সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর বিদেশ হইতে যত বার যোগমায়া বাড়ি আসিয়াছেন—তত বারই এই বাড়ি অপরূপ শোভায় তাঁহার মন হরণ করিয়াছে। পূর্ণিমার স্ফীত সমুদ্রের মত সর্ব্ব ইন্দ্রিয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অসীম আনন্দ ও তৃপ্তির তরঙ্গে তিনি দোলা খাইয়াছেন। বিদেশের কত প্রাসাদ, মর্ম্মর হর্ম্ম্য—প্রশস্ত লনের বুকে যমুনার তীরে ফুলবাগানের মধ্যে রাজা-মহারাজার প্রমোদভবন দেখিয়া চক্ষুর তৃপ্তি ও মনের বিস্ময় বাড়িয়াছে—তবু নিজের ঘরখানির মত একান্ত মমতার আপন বলিয়া মানিতে পারেন নাই। চক্ষুর বিস্ময়কে বৃদ্ধি করে যে বস্তু তাহা দেখিয়া গৌরবে স্ফীত হওয়া চলে—তাহাকে ভালবাসিয়া অসমতল মেঝের ধুলায় আঁচল বিছাইয়া শয়ন করা বুঝি চলে না। মর্ম্মর হর্ম্ম্যে ফুলের মালা দোলাইয়া পূজা দিয়া মন পরিতৃপ্ত হয়, সে পরিতৃপ্তি সম্মার্জ্জনী প্রহারে জঞ্জালস্তূপ হইতে গৃহকে মুক্তি দিবার কালে পরিতৃপ্তির মত প্রগাঢ় নহে। পরের বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভারে যেখানে মাথা নামাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করা চলে, নিজের বলিয়া সেইখানেই উৎফুল্ল পদতাড়নায় জিনিসপত্র ছড়াইয়া দিয়াও কোমল বৃত্তিগুলিকে শাসন করিবার কথা মনেই জাগে না। আম গাছ ও কাঁঠাল গাছ মিলিয়া উপরের রৌদ্র ঠেকাইয়া ছায়া-সুশীতল চন্দ্রাতপ রচনা করিয়াছে। মাথার উপর আকাশ যেমন ঘন নীল, চারিপাশের লতাগুল্মের শ্রী তেমনই নিবিড় সবুজে শোভাময়। ভালবাসার সাথী পাইলে প্রকৃতিও যে প্রাণের কপাট খুলিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানায়—সে কথা প্রবাস হইতে ফিরিয়া প্রতিবারই যোগমায়া অনুভব করিয়া থাকেন।

এই পরিপূর্ণ শান্তির মাঝে সব জিনিসই ভাল লাগে! সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা বলিতে সাধ যায়।

প্রতিবেশিনীরা একে একে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কুশল-প্রশ্নের আদান-প্রদানে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া উঠিল।

লতা আসিয়া বলিল, মা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় কেচে নিন, আমি রান্নার উদ্যোগ করে রেখেছি।

—এরই মধ্যে রান্নার উদ্যোগ করেছ? ভাবছিলাম এই অবেলায় আর কিছু খাব না।

তাই কি হয়! কত দূর থেকে না খেয়ে তেতেপুড়ে আসছেন।

ভারি মিষ্ট শুনাইল লতার এই অনুযোগপূর্ণ কথা! সে কথা যেন লতা বলিতেছে না—রেবা বলিতেছে, মাসীমা, কিছু জল-খাবার যদি করে দিই—

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, তা ছাড়বে না যখন তুমিই না হয় চড়িয়ে দাও। নেয়েধুয়ে উঠতে আমার দেরি হবে ত।

লতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, খুশিভরা কণ্ঠে সে কহিল, তবে ডালটা আগে চাপিয়ে দিই গে—

—না না, এই অবেলায় পঞ্চ ব্যঞ্জনে আর কাজ নেই, শুধু ভাতে ভাত···। আর শোন বউমা, গঙ্গাজল আছে ত ঘরে?

—হুঁ, আপনি আসবেন বলে কাল আমি ছ'ঘড়া আনিয়ে রেখেছি।

আহার শেষ হইলে লতা বলিল, মা ভাবনায় আমার দিন কাটত! আপনি এলেন—আমি নিশ্চিন্ত।

যোগমায়া বলিলেন, তোমার খুবই কষ্ট গেছে মা।

—না, কষ্ট আর কি। তবে ভয় ভয় করত বড়। এই বার আপনার ঘর-সংসার বুঝে পেড়ে নিয়ে আমায় ছুটি দিন।

—ছুটি! সংসার থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় যাবে? এ সংসার কি তোমার নয়?

—রক্ষে করুন, এত বড় দায়িত্ব নিয়ে চলবার সাধ্যি আমার নেই।

—কিন্তু এই দায়িত্ব ত একদিন তোমায় নিতেই হবে।

—না মা, ও কথা বলবেন না।

—পাগল মেয়ে, আমি না বললে শমন রাজা কি আমায় ছেড়ে দেবেন! চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাবেন না।

—না মা, ও কথা বলবেন না।

লতার পাংশু মুখের পানে চাহিয়া মমতায় যোগমায়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সস্নেহে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া

বলিলেন, এমনি মায়ার ডোরে বাঁধছ মা। চিরদিনই কি বদ্ধজীব হ'য়ে থাকব?

—থাকলেনই বা। আমাদের ছেড়ে মুক্তি নিয়ে আপনি কি করবেন মা।

—সে ভাগ্যি আমার হ'ল কই বউমা! নইলে তাঁর শ্রীচরণ ছেড়ে সংসারমায়ায় বদ্ধ হতে এলাম কেন!—বলিয়া গুণ্ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন:

মিছে মায়া বদ্ধ হয়ে সংসারেতে আইনু।
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে॥

রাত্রিতে যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বিনিদ্র রহিলেন। এই বাড়ির একটা ভাষা আছে। গভীর রাত্রিতে সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়ে—সেকালের সলজ্জ ভীরু বধূটির মত মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে বাড়ি তখন কথা কহিতে থাকে। যার শুনিবার কান আছে—সেই বুঝিতে পারে অস্ফুট কণ্ঠের সেই ভাষা। ধ্বনিতে সে ভাষা অর্থময় হইয়া উঠে না; অতীত ঘটনার স্মৃতির মধ্য দিয়া প্রথমে সে অস্ফুট বাক্—পরে সঙ্কেতে ভবিতব্যকে যেন প্রকাশ করে। হয়ত টুপ্ করিয়া গাছের পাতা খসিয়া পড়ে, ঝপ্ করিয়া কোন রাত্রিচর পাখী গাছের ডালে আসিয়া বসে, সর্ সর্ করিয়া সরীসৃপেরা উঠানে চলাফেরা করে, শিবমন্দিরের চূড়ায় বসিয়া লক্ষ্মীপেঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ করিয়া ডাকে, গ্রামের কোন দূর প্রান্তে কুকুর ভেউ-ভেউ করিয়া উঠে। নিত্যই এসব ঘটে, কিন্তু এ সবের অর্থ দৈবাৎ কোন বিনিদ্র রজনীতে চিন্তাভারগ্রস্ত মস্তিষ্কের আগল ঠেলিয়া জ্ঞানের রাজ্যে বড় গোলযোগ বাধায়। দিনের বহু-কর্ম-নিপীড়িত মস্তিষ্কে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে ঠাঁই দেওয়া মুশকিল—রাত্রি পরম সখীর মত আসিয়া এই সমস্ত শব্দ ও ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট করিয়া সুপরামর্শ দিয়া থাকে।

সকালে উঠিয়া বিমলকে ডাকিলেন, খোকা, একবার পাঁজিখানা দেখত—কবে যাত্রার শুভদিন আছে।

—কেন মা, আবার কোথায় যাবে?

—ভয় নেই, তুই আন না বাপু পাঁজিখানা।

পাঁজির পাতা উল্টাইয়া বিমল বলিল, কাল পরশু দুটো দিনই ভাল। যাত্রা উত্তম—মহেন্দ্র যোগ।

—তোর ছুটি আর ক'দিন আছে?

—তা তিন চার দিন। কলকাতায় সেইজন্যই ত নামলাম—আরও ক'দিন ছুটি বাড়িয়ে নিলাম কি না।

—বেশ, পরশু তাহলে বউমাকে নিয়ে যাত্রা করবে।

বিস্মিত কণ্ঠে বিমল কহিল, পরশু?

—হাঁ, ভেবে দেখলাম—এই ভিটেয় বিঘ্ন হয়েছে অনেক। গৌরীর বেলায় কি কাণ্ডটাই না হ'ল। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন না করে এখানে সাহস করতে পারি না।

—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে আর ক'দিন লাগে।

—যত দিনই লাগুক—প্রথম সন্তান বাপের বাড়িতে হওয়াই নিয়ম। তাঁদেরও একটা সাধআহ্লাদ আছে ত। একটু থামিয়া বলিলেন, তা বেয়াইরা কলকাতায় আছেন ত?

—হাঁ, বালিগঞ্জে বাড়ি করেছেন যে।

ভালই হয়েছে। জোড়া মাসে ত বউমাকে বাড়ি থেকে পাঠাব না—পরশুই তুমি ব্যবস্থা কর।

এ বিষয়ে লতার আপত্তি বেশি হইবার কথা নহে, তবু সে বার কয়েক আপত্তি করিল। আপত্তি কানে না তুলিয়া যোগমায়া ইহাদের যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

বিমল মনঃক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু অভিযোগ সে একবার মাত্রই বা উত্থাপন করিয়াছিল। যাত্রার আয়োজনে তাহার উৎসাহ বা অনিচ্ছা কোনটাই তেমন প্রকট হইয়া উঠিল না।

একবার শুধু বলিল, মা, একা থাকতে তোমার ভয় না করুক—আমাদের ভাবনা যথেষ্ট হবে।

যোগমায়া শুধু হাসিলেন।

বিমল বলিল, একটা কুকুর পুষে রেখো—তবু রাত্রিতে বাড়ি পাহারা দেবে। না—কুকুরে ঘেন্না করবে?

যোগমায়া বলিলেন, তোরা কেবল আমার ঘেন্নাটাই দেখলি খোকা—নয়?

বিমলকে মাথা নীচু করিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা দিস একটা বিলিতি কুকুর পাঠিয়ে—বাড়িও আগলাবে—তোর মাকেও দেখবে।

যথাসময়ে চোখের জল ফেলিয়া পুত্রবধূ রওনা হইয়া গেল। যোগমায়া জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া হাসিবার মত মুখভাব করিলেন—কিন্তু কান্নার চেয়ে করুণ সেই মুখভাবের প্রতি বিমল চাহিতে পারে নাই—নতমুখে পা ছুঁইয়া প্রণাম সারিয়া নতমুখেই নিঃশব্দে বাড়ির বাহির হইল।

নিস্তারিণী বলিলেন, আজ কি রান্না-বান্না কিছু হবে না, দিদি?

ধরা গলায় যোগমায়া উত্তর দিলেন, না।

—ও কি, এখনই শুয়ে পড়লে যে।

—কাল রাত্তিরে ঘুমুই নি ভাল করে—দুয়োরটা ভেজিয়ে দিয়ে যা নিস্তার।

সন্তর্পণে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া নিস্তারিণী বাহির হইয়া গেল।

সেই রাত্রি ঘুমাইবার রাত্রি নহে, তবু শেষ রাত্রির দিকে যোগমায়া স্বপ্ন দেখিলেন। আশ্চর্য্য স্বপ্ন! যোগমায়ার জীবন হইতে বহু বৎসর যেন মুছিয়া গিয়াছে। পুরাতন—প্রায়-বিস্মৃত দিনগুলির মধ্যে আবার যেন তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই শহরতুল্য গ্রামের পথঘাট, বিপণি, বাজার, আচার-নিয়ম ইত্যাদিতে বালিকা কালের পরিবেশটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ঘোড়ার গাড়ি পথে চলিতেছে না; ছইঘেরা গরুর গাড়ি বা পাল্কীতে করিয়া অন্তঃপুরিকারা দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিতেছেন। তক্তানামায় করিয়া রাজবেশ পরিয়া গ্যাসের বাতি জ্বালাইয়া ও ইংরেজি বাজনা বাজাইয়া বিবাহের শোভাযাত্রা আর গ্রাম কাঁপাইয়া ছেলে-বুড়া-স্ত্রী-পুরুষকে পথের ধারে টানিয়া আনিতেছে না। নিঃশব্দ পাল্কীর সঙ্গে দেশী রোশনচৌকির ধ্বনির সঙ্গে কেরোসিন-সিক্ত ঘুঁটের মশাল জ্বালিয়া কাগজের ফুলের ঝাড় ও আশাসোটা পুরোভাগে রাখিয়া কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া এই কল্যাণ-অনুষ্ঠানটি প্রাণ লাভ করিতেছে। জাগিয়া উঠিতেছে—ঘন আসশ্যাওড়া ঝোপ ঠেলিয়া ঊর্দ্ধমুখী কাঁঠাপা

গাছের ঈষৎ হলুদ ফুলের স্তবক, শুষ্‌নি-কলমি ভরা ডোবার ধারে সেই বৈঁচিবন, বেল গাছে ঝাঁপাইয়া-পড়া মধুমালতীর লতায় সাদা ফুলের গুচ্ছ, শিথিলবৃন্ত কামিনী ফুলের পাপড়ী-আকীর্ণ অঙ্গন, ঝাঁকড়া কুলগাছের ডাল নাড়া দিয়া টোপা কুল পাড়ার ধুম, নিস্তব্ধ চৈত্রদুপুরে ছায়াময় বটের ঝুরিতে দোল খাওয়া ও কাঁচা আম সংগ্রহের চেষ্টায় আম বাগানে আঁচলে নুন বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো।

তারপর বিবাহ। অস্পষ্ট সে কাল, একালের পুতুলের বিবাহের মতই কৌতুকপ্রদ। তবু সে কালের অনেক স্মৃতি—অনেক কাহিনী একেবারে অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই। খুড়িমার প্রাঙ্গণে সেই ঝাঁকড়া লেবু গাছটাও যেন ফিরিয়া আসিল। যোগমায়ার বিবাহিত জীবনে অভিশাপের মত সেই ঘটনাগুলি একদা ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। অস্পষ্ট ছায়ার মত সঙ্গিনীরা ফিরিয়া আসিতেছে—তবু তাহাদের ঠিকমত চেনা যায় না। আটচালাযুক্ত ঘরখানি উঁচু দাওয়া সমেত দেখা দিয়াছে। সেই তক্তাপোষ, জোড়া কুলুঙ্গির মাথায় দেবদেবীর পট, কড়ির ঝাঁপি, কড়ি-বাঁধানো আলনা, জলচৌকিতে ঝক্‌ঝকে বাসন, রেড়ির তেলের প্রদীপে নিবু-নিবু শিখা—শুধু লবঙ্গলতা কোথাও নাই—রামজীবনও নাই! এদিকে শ্বশুরবাড়ির উঁচু প্রাচীর ওদিকের কায়েতদের পড়ো ভিটার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, অধুনা সুসংস্কৃত সিংদরজার সেকালের পতনোন্মুখ চেহারাটাও আবার ভীতি উদ্রেক করিতেছে। উঠানে আম-কাঁঠালের ঝোপ, খোয়া-ওঠা সঙ্কীর্ণ রোয়াকে কম্বলের কুটা আসনখানি পাতা; সেই আসনে বসিয়া শাশুড়ী মালা জপ করিতেছেন না। ও ঘরের চরকার ঘ্যানর-ঘ্যানর আওয়াজ উঠিতেছে—পিসিমা কোথাও নাই। ঘরের মধ্যেও কেহ নাই, অথচ পুষ্পসার সুরভিতে ঘর আমোদিত। রামচন্দ্র বুঝি নিকটে কোথাও দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু কই? শ্রান্ত যোগমায়ার দেহে অসীম ক্লান্তি; চোখের তারায় সে শ্রান্তি পরিস্ফুট। একটু আশ্রয়—সামান্য ক্ষণের জন্ম বিশ্রাম—অতীতের পক্ষপুটে ফিরিয়া গিয়া মা বা শাশুড়ী অথবা স্বামীর উপর সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যভার ছাড়িয়া দিয়া দু'দণ্ডের জন্ম নিঃশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তিলাভ করা—মনের এই ব্যাকুল বাসনা কে মিটাইবে? অতীত ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে বর্ত্তমানের দিকে—আলো তীব্রতর হইতেছে। মাথার উপর দায়িত্বগুলি অহোরাত্রব্যাপী অবিচ্ছিন্ন বস্তুপুঞ্জে স্তূপীভূত হইয়া পীড়া দিতেছে। কাহার হাতে এ ভার সমর্পণ করিয়া যোগমায়া নিশ্চিন্ত হইবেন? এ গুরুভার—দম যে আটকাইয়া আসে। বুকখানি কি এই চাপে ফাটিয়া যাইবে? মাগো।

সুন্দর প্রভাত। প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ দ্বিতলের পূব দিকের জানালা দিয়া সবেমাত্র মেঝের উপর শায়িত যোগমায়ার শিথিল পা দু'খানি ছুঁইয়াছে। 'গোবিন্দ'—'গোবিন্দ' বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। রাত্রির স্বপ্ন মনকে সামান্যক্ষণ মাত্র আলোড়িত করিল। প্রভাতের কোমল রৌদ্রস্পর্শে দেহে শক্তির জোয়ার নামিল। লঘুপক্ষ মেলিয়া নানাদিকের নানাচিন্তাবাহিত নিশ্চল কর্ত্তব্যগুলি প্রভাত-আকাশে সাঁতার দিয়া ফিরিতে লাগিল। কি সুন্দর প্রভাত! সেই নবরৌদ্রস্নাত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যে বাড়িটাও ঝলমল করিতেছে। জীবন নূতন কর্ম্ম-রসায়নে আবার শক্তি সংগ্রহ করিয়া অর্থযুক্ত হইয়া উঠিল বুঝি।

পিতলের ঘড়া কাঁকে করিয়া নিস্তারিণী আসিয়া ডাকিলেন, কইগো দিদি, কোথায়? আজ তো আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা বিশেষ নেই, চল গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

একহাত কাদা মাখিয়া যোগমায়া রান্নাঘর হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

নিস্তারিণী তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ওমা, সকাল বেলায় কালিকাদাঝুল মেখে এ কি চেহারা করেছ! কালই না হয় হত্তো ওসব।

—তা কি হয়? জিনিসপত্তর অগোছালো—ঘরের অযত্ন আমি দেখতে পারি নে ভাই। গায়ে যেন কাঁটার ছড়ি মারতে থাকে।

—তা শীগ্‌গির সেরে সুরে নাও—আমি না হয় একটু বসি।

—নারে, সারতে আমার অনেক বেলা হবে। শুধু কি রান্নাঘর? গোয়াল আছে, শোবার ঘর আছে, কুয়োতলা আছে, উঠোন আছে, নল পরিষ্কার আছে। চারটি খাবার ফুরসৎ হলে হয়।

—ওমা আমার কি হবে! সারাদিন ধরে এই দাসীবিত্তি করবে! না হয় কালই হ'ত।

যোগমায়া শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

নিস্তারিণী বলিলেন, আজ যে মস্ত বড় যোগ।

—তবে একটু গঙ্গাজল আমার মাথায় দিয়ে যাস, ভাই। তুই যা ভাই, রোদ চড়লে কষ্ট হবে বড্ড। বলিয়া হাসি মুখখানি ফিরাইয়া রান্নাঘরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

ঘরের মধ্যে যে. প্রিয় সব-ভুলানো সঙ্গ লইয়া অপেক্ষা করে—তাহাকে কোন নারী কোন যুগেই হয়তো অস্বীকার করিতে পারেন নাই, যোগমায়াও পারিলেন না।

সমাপ্ত

সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রফুল্লকুমার সরকার

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে আপনারা আমাকে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার এত কথা আছে যে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বলা সম্ভবপর নহে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি, তৎসম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে কিছু বলিব।

গত অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া তিনি দেশ ও

জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। গত উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে-সব মনস্বী দেশপ্রেমিক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশকে সমগ্র ভারতের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, জাতীয় আন্দোলন নানা দিক দিয়াই তাঁহার দান অসামান্য। কিন্তু আমার বিবেচনায়, সাংবাদিক হিসাবে দেশের যে-সেবা তিনি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। বাংলাদেশে আরও অনেক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনন্য-কর্ম্মা হইয়া সংবাদপত্রের সেবা করেন নাই, রাজনৈতিক নেতা বা সাহিত্যিক রূপেও তাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রামানন্দ বাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সংবাদপত্র-সেবাকেই তিনি জীবনের প্রধান বা মুখ্য ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তরুণ বয়স হইতেই সংবাদপত্রসেবার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল। অল্প বয়সেই "দাসী" নামক একখানি মাসিকপত্র তিনি সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা "প্রদীপ"ও কয়েক বৎসর বেশ ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। আমাদের ছাত্রাবস্থায় ঐ মাসিকপত্রখানি পড়িয়া আমরা যথেষ্ট শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিতাম। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"—বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের নিকট এই দুইখানি মাসিকপত্র তাঁহার বিশেষ দান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালায় অধ্যক্ষতা কালে তিনি প্রবাসী এবং এই পদ ত্যাগ করিয়া 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকপত্র বাহির করেন।

দৈনিক সংবাদপত্রের তুলনায় মাসিকপত্রের যে নানারূপ অসুবিধা আছে, তাহা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া সম্পাদক দেশ-বিদেশের ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সর্ব্বদা যোগ রাখিতে পারেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যস্থলে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হয়। প্রতিদিন সম্পাদকীয় মন্তব্যের দ্বারা দেশের জনমত গঠন করিবারও তিনি যথেষ্ট সুযোগ পান; কিন্তু মাসিকপত্র মাসে একবার মাত্র বাহির হয়, সাধারণতঃ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েই তাহাতে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। সুতরাং মাসিকপত্রের মধ্য দিয়া সম্পাদকের পক্ষে দেশের নানাবিধ আন্দোলন বা ভাব-প্রবাহের সঙ্গে যোগরক্ষা করা কঠিন, দেশ ও সমাজের চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করাও তাঁহার পক্ষে সহজ হয় না। রামানন্দবাবুর অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে, ঐ সমস্ত প্রবল বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও ইংরেজী ও বাংলা দুইখানি মাসিকপত্রের মধ্য দিয়াই তিনি দেশের জনমত গঠনে সহায়তা করিতে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" ব্যতীত এদেশে আর কোন মাসিকপত্রের এরূপ সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। "প্রবাসী"র সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গ এবং "মডার্ণ রিভিউ"-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যের ("Notes") ভিতর দিয়া রামানন্দবাবুর বিশ্লেষণ শক্তি, নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি, নির্ভীক তেজস্বিতা পাঠকদের মনের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিত সন্দেহ নাই। এই কারণেই "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" খুলিয়া পাঠকেরা সম্পাদকীয় মন্তব্য সর্ব্বাগ্রে পড়িত। কেবল সম্পাদকীয় মন্তব্য নয়, এই দুইখানি পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও রামানন্দবাবু স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেন।

সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার এই অসাধারণ কৃতিত্বের মূলে কোন্ শক্তি নিহিত ছিল? সে-কথার উত্তরে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও তথ্য সংগ্রহের নিপুণতা। কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইলে তিনি মাত্র ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হইতেন না, নিপুণ সাংবাদিকের মত সমস্ত তথ্য সঠিক ভাবে সংগ্রহ করিতেন এবং তাহারই উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। এইজন্যই তাঁহার সিদ্ধান্ত এমন গুরুত্বপূর্ণ হইত এবং প্রতিপক্ষের পক্ষে তাহার প্রতিবাদ করা দুঃসাধ্য হইত।

দ্বিতীয়তঃ, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা ছিল তাঁহার সহজাত। অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে বা অন্যায় ও অবিচারের উপর আঘাত করিতে তিনি কখনই পশ্চাৎ-পদ হইতেন না। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যে কখনও অসংযম থাকিত না, বিদ্বেষের গন্ধও থাকিত না; সেইজন্য বিপক্ষ-পক্ষও উহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত।

তৃতীয়তঃ, গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতিই ছিল তাঁহার সকল কর্ম্মের মূল উৎস। তরুণ বয়সেই তিনি দেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংবাদপত্র সেবার মধ্য দিয়া আজীবন সেই ব্রতই পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ও সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই জীবনের নানাক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন দিন যশ মান ও খ্যাতির কাঙ্গাল ছিলেন না, নীরবে অন্তরালে থাকিয়াই কাজ করিতেন। তবু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তিনি বেশী দিন আত্মগোপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার যশ ও খ্যাতি স্বতঃই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। নব্য বাঙালী জাতিকে যাঁহারা গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণে যাঁহারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলেন এবং জগতের সম্মুখে ভারতের

স্বাধীনতার দাবী নির্ভীক ভাবে যাঁহারা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাংবাদিক হিসাবে আমরা তাঁহার জন্ত গৌরবান্বিত; সংবাদপত্রসেবার যে মহান্ আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন আমরা অনুসরণ করিতে পারি।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বলিতে হইলে পৃথিবীর সব কথাই বলা যায়, অথচ একটি প্রবন্ধের মধ্যে সব কথা বলিতে গেলে কোন কথাই বলা হয় না। অতএব গণ্ডী ছোট করাই ভাল। রাষ্ট্রিক সমস্যার দিনে চিন্তানায়কেরা রাজনীতি বাদ দিয়া ত ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেই পারেন না। সত্যই ত, এই প্ল্যান, প্রোগ্রাম, প্যাক্ট ও পোষ্টওয়ার রিকন্‌ষ্ট্রাক্‌সনের দিনে আলোচনার মধ্যে এক সর্ব্বদুঃখবিমোচন অনবদ্য পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠা যদি না করিতে পারিলাম তাহা হইলে কোন্ স্বপ্ন মূর্ত্ত হইল এবং কোন্ স্বর্গই বা রচিত হইল!

স্বর্গ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, সাহিত্যালোচনা করিতে বসিয়াছি। সাহিত্যের সহিত জীবন এবং জীবনের সহিত সাহিত্য একাঙ্গীভূত। জীবনকে বাদ দিয়া সাহিত্য এবং বাস্তবকে বাদ দিয়া জীবনের আলোচনা চলে না। সমাজ, রাষ্ট্র, যুগ, ইতিহাস এবং সাহিত্য একান্তভাবে পরস্পরের সহিত জড়াইয়া আছে। আমরা সকলেই ত জীবনের সব ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারি না। কোন কোন বিষয়ে আমরা দর্শক মাত্র। রাষ্ট্রিক ব্যাপার আমাদের আলোচ্য নয়। তথাপি সাহিত্যের মধ্য দিয়া সে-ব্যাপার গোচরীভূত হইলে তাহার আলোচনা আমাদের পরিহার্য্য নয়, কেন-না সাহিত্যে সমগ্র জীবন প্রতিফলিত। হয়ত জীবনের সকল বাস্তবতার সহিত আমরা সমানভাবে যোগ দিতে পারি না, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত জীবন আমরা সকলেই উপভোগ করি। Lady of Shallot মুকুরে প্রতিবিম্বিত জীবনযাত্রা অবলোকন করিয়া নির্জ্জন দ্বীপে দিন কাটাইয়া দিত। মানব-মনের নিভৃত গহনেও কে জানে কোন অভিশপ্তা শ্যালটবাসিনী কন্যা বাস করে!

And moving thro' a mirror clear
That hangs before her all the year,
Shadows of the world appear.

আমরাও অনেকে হয়ত সাহিত্যের প্রতিফলিত জীবন-ছায়ার সঙ্গী হইয়া জীবন কাটাইয়া দিই? তারপর সাহিত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া বাস্তব জীবনের প্রতি যখন চাহিয়া দেখি তখন মানস-মুকুর বিদীর্ণ হইয়া যায়।

She saw the helmet and the plume,
She looked down to Camelot.

Out flew the web and floated wide;
The mirror crack'd from side to side;
'The curse is come upon me,' cried
The Lady of Shallot.

কিন্তু সাহিত্য কি সত্যই এমনি মায়া-মুকুর? তাহাতে কি শুধু জীবনের প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিতে পাই? ছায়ার আকার আছে স্পর্শ নাই। যে স্পর্শ, যে উত্তাপ, যে স্পন্দন সাহিত্যের মধ্যে অনুভব করি তাহা ত জীবন হইতে ভিন্ন নয়। প্রাণের স্পর্শেই প্রাণের আলো জ্বলে। এক দিকে জীবনের স্পর্শে সাহিত্য প্রাণবান হয়, অন্য দিকে সাহিত্যও জীবনকে অনুপ্রাণিত করে।

অতএব সাহিত্যকে দেখিতে গিয়া আমরা বর্ত্তমান ও বাস্তবকে অবহেলা করিব না। যুগের সহিত সাহিত্যের একটি গভীর যোগ আছে। সাহিত্য যে দেশ-কালের অতীত বস্তু নয় সে-কথা সকলেই জানে। বর্ত্তমান পুষ্পিত হইয়া ভবিষ্যতে পরিণত হয়, অতীতের মধ্যে বর্ত্তমানের বীজ নিহিত থাকে। ভাবনা শুধু ধারাবাহিক ভাবেই চলে না। এক দেশের চিন্তা অন্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে দেশান্তরেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হয়।

উনবিংশ শতাব্দী প্রতীচ্য সভ্যতার পরম অভ্যুদয়ের কাল। প্রাচ্যের ঐশ্বর্য্যে পশ্চিম অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের কল্যাণে ইয়োরোপ লক্ষ্মীর আবাসভূমি। বণিকশ্রেণী ধনিক আখ্যা লাভ করিয়া সকলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আহরণের পর বিশ্রামের অবসর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত প্রায়-অব্যাহত শান্তির ফলে পশ্চিমের প্রধান দেশগুলি একরূপ ধরিয়াই লইয়াছে—বিরাট্ কোন পরিবর্ত্তনের আর সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞানচর্চ্চা এবং বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে রণসজ্জার বিপুল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় শান্ত আকাশে বজ্র বাজিয়া উঠিল। আরাম-লালিত বিলাস-অলস মনকে সচকিত করিয়া ইয়োরোপের উপর দিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয়-ঝটিকা বহিয়া গেল। প্রচণ্ড আলোড়নে পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিল। শান্তির জড়তার মধ্যে যে গ্লানি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল মনে হইল তাহা বুঝি শোণিতপ্রবাহে ধৌত হইয়া নির্ম্মল হইয়া যাইবে। অবিচার লুপ্ত হইবে, অত্যা-

চারের অবসান হইবে। ধনী দরিদ্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবে না। প্রবল দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন করিবে না। প্রভুত্বের প্রভাবমুক্ত হইয়া নির্জ্জিত জাতিগুলি চরিতার্থতা লাভ করিবে। ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যুদ্ধপ্রারম্ভের আশা যুদ্ধান্তে স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইল। যে প্রেরণা আসিয়াছিল দেখা গেল তাহা নিতান্তই ক্ষণ-স্থায়ী। যুদ্ধের স্মৃতি ম্লান না হইতেই বিজয়ী জাতিসমূহের আহৃত অর্থসম্পদ অমিত এবং গর্ব্ব অভ্রংলিহ হইয়া উঠিল। ভোগবিহ্বল মন আপৎকালের সঙ্কল্প ভুলিয়া গেল। শুধু কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর চিত্ত অশান্ত হইয়া রহিল। এবং পশ্চিমের এক অবজ্ঞাত বৃহৎ দেশে নূতন পরীক্ষা সুরু হইল।

যুদ্ধোত্তর সামাজিক অসন্তোষের সাহিত্য ইহারই ফল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর সাহিত্য দেখা দিল—নির্ব্বিঘ্ন শান্তি, নিশ্চিন্ত আরাম ও নিরুদ্বেগ উপভোগের মধ্যে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়—আত্মকেন্দ্রিক, আদর্শে অবিশ্বাসী, সংশয়াত্মক সাহিত্য। যৌন বিষয়ের আলোচনার আতিশয্য, পীড়িত মনের ভাববিশ্লেষণের প্রাবল্য, মহত্ত্বে অশ্রদ্ধা, শ্রেয় বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা, জীবনের তুচ্ছতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, বিদ্রোহে নয় ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও কামনা পরিতৃপ্তির জন্য সামাজিক বিধিলঙ্ঘনের স্পর্দ্ধিত মনোভাব—এইগুলি যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের লক্ষণ। চিরন্তন নহে ইহা পাশ্চাত্যের বিলসিত জীবনের অবসাদ-মুহূর্ত্তের সাহিত্য।

আমাদের দেশেও ইয়োরোপের তৎসাময়িক সাহিত্যের অনুসরণে এক যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর কথাটি নিরর্থক, কেন-না প্রথম মহাসমর আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারে বাস্তব জীবনে সে খণ্ডপ্রলয়ের সংঘাত আমরা উপলব্ধি করি নাই। দূর রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনীত হইয়াছিল। যুদ্ধ নয় কিন্তু যুদ্ধোত্তর সাহিত্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অথচ ইয়োরোপীয় যুদ্ধের ফলে আমরা বাস্তবিক কোন যুদ্ধোত্তর মনোভাবের অধিকারী হই নাই।

পশ্চিমের অভিজ্ঞতা ও পশ্চিমের অবসাদ পশ্চিমের নিজস্ব। আমাদের জীবনঘটিত ও জীবনগ্রাহ্য নহে বলিয়াই আমাদের মানস-ব্যাপারে সেই অভিজ্ঞতা ও অবসাদের আমদানী করিতে গেলে তাহা সত্য ও সার্থক হইবে না। আমাদের চিন্তাধারায় তাহারই সঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছে। তাহার ফলে যে সাহিত্য আসিয়াছে তাহা ঘরেরও নয় পরেরও নয়, ভারতেরও নয় ইয়োরোপেরও নয়, তাহা গোত্রহীন, তাহা কৃত্রিম।

মহাযুদ্ধের প্রেরণাজাত যে অসন্তোষের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারও প্রভাব আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের উপর পড়িয়াছে। ইয়োরোপীয় মনের পক্ষে সে অসন্তোষ স্বাভাবিক। যে সমাজ-ব্যবস্থায় সকল লোক স্বাধীন রাষ্ট্রের সকল সুখ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করিতে পারে না সেই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভাব এই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি। ইয়োরোপের এই যে সামাজিক অসন্তোষ ইহার সহিত পরাধীন দেশের অসন্তোষের মিল নাই।

এন্টি-ফ্যাসিষ্ট সাহিত্যের কথা সম্প্রতি শোনা যাইতেছে। সাহিত্য-কাননে কুইনিনের চাষ সুরু হইলে সংসার-বৃক্ষের মধুরফললোভীরা কিঞ্চিৎ বিপাকে পড়িবে বৈ-কি। এন্টি-ম্যালেরিয়া পিলের মত এন্টি-ফ্যাসিজ্‌ম বটিকা সেবন ও বিতরণের পালা সুরু হইলে কারো কারো হয়ত ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িবে কিন্তু কম্পজ্বরের সহিত কম্পান্বিতকলেবর সাহিত্য বেচারাও দেশ ছাড়িয়া পলাইবে। এন্টি বা বিরোধী কথাটি নেতিবাচক। 'না'-র সাহায্যে ধ্বংস চলে, গড়া চলে না। যে ভাবনা সদাত্মক—positive—তাহাই গঠনক্ষম। 'প্রো' নয় 'এন্টি' নয়, সপক্ষ নয় বিপক্ষ নয়, মানবজীবনের নিরপেক্ষ আলোচনাই সাহিত্য।

আর একটা কথা উঠিয়াছে, অর্থনীতির দ্বারা সাহিত্য এমনি ভাবেই নিয়ন্ত্রিত যে শ্রেণীবিশেষের ইকনমিক মুক্তি ব্যতিরেকে যে-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহা সাহিত্যই নয়। অর্থাৎ অর্থসম্পদ সকল শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বণ্টিত না হইলে সত্যকার সাহিত্য জন্মিতে পারে না। যাহার ভাবনা যেদিকে সাহিত্যকে সে সেই দিক দিয়াই দেখে। শুধু অর্থনীতি কেন, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন—বিশ্বের এমন কিছুই নাই যাহার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ নিগূঢ় নয়। সকল চরিতার্থতার মত, শুধু শ্রেণীবিশেষের নয় সমগ্র দেশের ইকনমিক চরিতার্থতা সাহিত্যে প্রেরণা জাগাইবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক—যতই অভিনব হোক—কোন মতই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারে না। মনই সাহিত্য গড়ে। ব্যক্তির হোক, জাতির হোক সে মন যে-ক্ষণে গভীর ভাবে আন্দোলিত হয় তাহাই সাহিত্য সৃষ্টির পরম ক্ষণ।

ও দেশের যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের সহিত এ দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের যোগাযোগের কথা বলিয়াছি। এ সাহিত্য আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত নয়। ইহা আশ্রিত সাহিত্য—বিদেশী সাহিত্য ইহার আশ্রয়। নামে আধুনিক হইলেও এ সাহিত্য দেশান্তরের অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে। এবার বর্ত্তমান এবং বাস্তবে ফিরিয়া আসা যাক।

আজ দিকে দিকে রণভেরী নিনাদিত। নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্যে পৃথিবী প্রকম্পিত। আকাশে বহ্নির লীলা, বাতাসে কামানের গর্জ্জন। জলস্থলব্যোম পরিব্যাপ্ত করিয়া যুদ্ধ চলিতেছে। প্রতীচ্যের প্রায় সকল দেশ যুদ্ধের জালে

জড়াইয়া পড়িয়াছে। যে দু-একটি বাকি আছে তাহারাও পড়িল বলিয়া। এক প্রচণ্ড উন্মত্ততা জাতিসমূহকে পাইয়া বসিয়াছে। জাতির সমস্ত শক্তি যুদ্ধের আয়োজনে নিয়োজিত। অজস্র জলস্রোতের মত জাতির অর্থ ও রক্ত উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রবহমান—জীবনের প্রয়োজনে নয়, ধ্বংসের কার্য্যে। কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে রণপোত নির্ম্মিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে সমাধিলাভ করিতেছে। অসংখ্য বিমান ভস্ম হইয়া, চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। চলন্ত লৌহদুর্গের মত ভীমাকৃতি ট্যাঙ্কগুলি গোলার আঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। অন্ধ অতলে সহস্র সাবমেরিণ নিমগ্ন। বিরাট্ বোমার বিস্ফোরণে নগর-নগরী নিশ্চিহ্ন। মানুষের প্রাণের কোন মূল্য নাই, গোলাগুলির মত অসংখ্য সৈন্য শত্রুর উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ক্ষিতি শোণিতসিক্ত, গগনে রক্ত আভা, পবনে ধূমের গন্ধ। জনপদ বিধ্বস্ত, পল্লী জনহীন।

ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য, মানসিক উৎকর্ষ-বিধানের জন্য, দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, রোগ নিবারণের জন্য, জাতিকে সুন্দর, সবল, সুস্থ, শিক্ষিত করিবার জন্য যেখানে টাকা পাওয়া যাইত না, উৎসাহের অভাব হইত, আজ কোথা হইতে এই মরণযজ্ঞে অবিশ্রান্ত ধারায় সেই অর্থ ও প্রাণের আহুতি প্রদত্ত হইতেছে।

যুদ্ধ যদি দূরে থাকিত সংবাদপত্রে তাহার বর্ণনা পড়িয়া এবং বৈঠকখানায় আলোচনা করিয়াই আমরা আনন্দলাভ করিতাম। সেবারের মত ম্যাপ দেখিয়া এবং নক্সা আঁকিয়া আমাদের কল্পনা চরিতার্থ হইত। এমন কি যুদ্ধের ষ্ট্র্যাটেজি লইয়া উভয় পক্ষের সৈনাপত্যের অপূর্ব্ব সমালোচনা করিতেও পশ্চাৎপদ হইতাম না। আজ আর আরাম-কেদারায় বসিয়া তর্কে কুলাইবে না। যুদ্ধ একেবারে গৃহের পূর্ব্বদ্বারে হানা দিয়াছে।

আমরা যদি অন্যান্য যুযুৎসু দেশের লোকের মত সংগ্রাম করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম, তাহার মধ্যে একটা ভয়ঙ্করতা থাকিত সন্দেহ নাই, উহার মধ্যে বীর ও করুণ উভয়বিধ রসের সমাবেশ থাকিত নিশ্চয়, তাহা হইলেও ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইত, কেন-না দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গ করাই সুস্থ জাতির লোকের সাধারণ রীতি।

আমরা মরি, কারণ মরণই আমাদের পক্ষে একমাত্র সুগম পন্থা। আমরা মরি, কারণ বাঁচিবার উপায় আমাদের জানা নাই। আমরা মরি, সমরে নহে—দুর্ভিক্ষে। দুর্ভিক্ষের রেওয়াজটা ম্যালেরিয়ার মত ইয়োরোপ হইতে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যেখানে নিত্য লীলায় প্রকট হইয়া আছে "আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।"

মানুষের পক্ষে মৃত্যু নিতান্তই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু না খাইতে পাইয়া মরাটা এমনিই অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক যে এ-ব্যাপার শুধু আমাদের মত সৃষ্টিছাড়া দেশেই ঘটিতে পারে। আমরা সাগরপারে কাঁচা মালের রপ্তানী করি কিন্তু বৈতরণীপারে পাঠাইবার জন্য মৃতের এমন mass production আর কোন দেশেই সম্ভব নয়।

সেদিন যাহা দেখিয়াছি যুগ-যুগান্তরে মানুষ একবারই তাহা প্রত্যক্ষ করে। শহরের লোক কাগজে পড়ে, জলপাইগুড়ি জেলার ধানকূড়া গ্রামে একজন নারী অনাহারে মরিয়াছে এবং একজন পুরুষ অনশনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। বেদনার কাহিনী পড়িয়া আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সংবাদান্তরে মনোনিবেশ করি। তারপর সে-সব করুণ কথা ভুলিয়া যাই। জীবনযাত্রা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে। সেদিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা বাংলার স্মৃতিতে চিরদিন সঞ্চিত হইয়া থাকিবে, শতাব্দীর এই ছাপ বহু শতাব্দীতেও বিলুপ্ত হইবে না।

বিস্তীর্ণ রাজপথে ছায়ার মত বিশীর্ণ মানুষের সারি অবিশ্রাম চলিয়াছে—গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সমাজসম্বন্ধহীন—শিশু, বয়স্ক, বৃদ্ধ—কঙ্কালসার, কোটরগতচক্ষু, অস্থি ও চর্ম্মের সমষ্টি—নারী ও পুরুষ—লক্ষ্যহীন, ভাগ্যবিতাড়িত। আর কোন বোধ নাই শুধু আছে ক্ষুধা। সেই নিদারুণ অনুভূতির বশে তাহারা দীর্ঘ—সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছে। দিবারাত্র একটিমাত্র করুণ আর্ত্তনাদ সেই অসংখ্য ছায়ার কণ্ঠে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—মা, মাগো। হায় রে হতভাগ্যের দল, কোন্ মা আজ উপবাসদীর্ণ জীবনের নিদারুণ ক্ষুধা মিটাইতে পারে? ক্ষুধাতুরের কাতর ক্রন্দনে দেশ যে ভরিয়া গেল, মূর্চ্ছিত দেশজননীর সাড়া ত মিলিল না। লক্ষ্যহীন বুভুক্ষু ভিক্ষুকের দল ক্রমাগত চলিয়াছে। রাজপথের ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বে এই রিক্ততার যাত্রা, রাজধানীর উল্লাসকোলাহলের মধ্যে মা-গো রবের এই অন্তহীন আর্ত্তনাদ—নগরের জীবনকে এক দুঃসহ অস্বাভাবিকতার ভারে ক্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বস্বহারা এই দুর্ভাগ্যের দল। পথেই ইহাদের বাস, পথেই ইহাদের শয়ন, পথেই ইহাদের চির-বিশ্রাম।

যে-সব পুরুষ দেখিতেছি ইহাদেরও পরিবার-পরিজন ছিল, যে-সব নারী দেখিতেছি ইহাদেরও স্বামী-সন্তান ছিল, যে-সব শিশু দেখিতেছি ইহাদেরও পিতা-মাতা ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মরিবে, কিন্তু যাহারা বাঁচিবে সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ চ্যুত হইয়া তাহারা দুর্ব্বহ জীবন বহন করিবে। এমনিভাবে অকারণে অগণ্য জীবন নষ্ট হইয়া গেল।

আজ আমরা নিতান্তই অভিভূত, মন মূর্চ্ছাহত, তাই বেদনার প্রকাশ নাই।

মনোবিজ্ঞান বলে বিস্মৃত স্মৃতি পরবর্ত্তীকালে আমাদের

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। পৃথিবীব্যাপী এই মহাসংগ্রাম এক দিন থামিয়া যাইবে। যুদ্ধজনিত দুর্দ্দশার একদিন অবসান হইবে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ক্রমে কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। তবু ইহার মর্ম্মান্তিকতা, ইহার বেদনা অন্তর্গূঢ় হইয়া সুদীর্ঘকাল জাতীয় জীবনকে জ্বালাময় করিয়া রাখিবে। কেন? কেন? কেন?— এ প্রশ্ন চিরজাগরুক থাকিয়া যুগে যুগে আমাদের রাত্রির নিদ্রা ও দিনের অবসরকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে। ঘটনা ভুলিয়া যাইব কিন্তু অন্তর্দাহের তীব্রতা কমিবে না। আঘাতের স্মৃতির অপেক্ষা ক্ষতের যন্ত্রণা মানুষের প্রাণে অস্থিরতা আনে। যেদিন অন্তরসঞ্চিত উত্তাল ক্ষোভ সাহিত্যে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিবে সেদিন এই ব্যথার উপশম হইবে। সেই ভাবী সাহিত্য সূর্য্যকরোজ্জ্বল, আলোকহাস্য-উদ্ভাসিত হইবে না। তাহা হইবে গম্ভীর, অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। তাহা হইবে মেঘাড়ম্বরময়, শঙ্করের ডম্বরু-নিনাদিত। ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে গড়া সেই সাহিত্য হইবে বজ্রবিদ্যুন্ময়। তারপর সেই সঞ্চিত বেদনার মেঘভার অপার করুণায় বিগলিত হইয়া অশ্রুজলে ঝরিয়া পড়িয়া অন্তরভূমি সিক্ত করিবে। হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়া, বেদনা শান্ত করিয়া, মানসক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়া, জাতির জীবন সফুল করিয়া সেই সাহিত্য সার্থক হইয়া উঠিবে।

তারপর আসিবে ভারতের সেই ভবিষ্যৎ—গৌরবে উজ্জ্বল, মহিমায় বিরাট্—জগৎ সভায় যেদিন সে আপনার শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া লইবে। আজ বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় সেই মহান্ ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

বহুদিন এ মন্দির শূন্য পড়িয়া আছে। কোথায় গেল বাল্মীকি, ব্যাস, ভাস, কালিদাস? কোথায় গেল আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, লীলাবতী, নাগার্জ্জুন? কোথায় গেল অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য, সমুদ্রগুপ্ত? কোথায় গেল অজন্তার চিত্রকর, এলোরার ভাস্কর, মাদুরা-মন্দিরের স্থপতি?— অতীতের গৌরব কি অতীতের মধ্যেই অবসানলাভ করিয়াছে? বর্ত্তমানের নিদারুণতার মধ্য দিয়া অতীতের বিরাট সম্ভাবনা যেদিন ভবিষ্যতে সার্থকতা লাভ করিবে, সেদিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। সেদিন ভারতের তরণী সাগরে সাগরে ভারতের পণ্যরাশির সহিত তাহার মানসিক ঐশ্বর্য্য বহন করিয়া লইয়া যাইবে, দিকে দিকে ভারতের উদার সভ্যতা বিস্তার লাভ করিবে, দেশে দেশে ভারতের সংস্কৃতি বৃহত্তর, মহত্তর, সুন্দরতর জীবন পরিস্ফুট করিয়া তুলিবে। The world's great age begins anew. আজিকার অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া কবে সেই নবদেবতার আবির্ভাব হইবে! সেদিন ভারতের বাণী নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া অমৃতময় হইয়া উঠিবে। সেদিন যে কবির কণ্ঠে ভারতের জয়সঙ্গীত উচ্চারিত হইয়া পৃথিবীর প্রাণে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিবে, ভাবীকালের সেই মহাকবিকে আমি প্রণাম করি।

স্ত্রী-সাহিত্যিক

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

নগরের এই অংশের বাড়ীগুলি অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট। বাতাসের যথেচ্ছ ভ্রমণের নিতান্ত অসুবিধা হয়। চারিদিকে লোহার বেড়া দেওয়া একটা ছোট সরকারী মাঠ মঞ্জুর করা আছে, বাতাস সেখানে সকাল সন্ধ্যায় ইচ্ছামত বিচরণ করে। কেবল বাতাসই বিচরণ করে; তাহার সহিত যোগদান করিতে অপর কেহ বড় একটা যায় না। পল্লীর সকলেই ব্যস্ত, দিবারাত্র কাজের মধ্যে ফুরসৎ কাহারও নাই। নলিনী এই পল্লীর বধূ। ব্যস্ত সে নহে, বরং ব্যস্ততার অভাবে মন তার উদ্‌ব্যস্ত। বাড়ীটা ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছে, একটু হাওয়া লাগে না গায়ে! নলিনী পিছনের অংশে একটা ভাঙা অলিন্দে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইবার চেষ্টা করে। কারণ, সেই পাশের বাড়ীতে আর একটি বালিকা-বধূ আছে। নির্জ্জনতার নিষ্পেষণে প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া উঠিলে এখানে আসিয়া আলাপ করিয়া শান্তি পায়। বাড়ীর কোণ দিয়া একটা কিশোর বটবৃক্ষ, একপাশে শৈবাল ও কতকগুলি আগাছা, উপরে অপর বাড়ীর ছাদে কয়েকটা টব ও ভাঙা কলসীতে কৃষ্ণকলির গাছ। এইগুলির পাশে দাঁড়াইলে দর্পণ-ফলকের ন্যায় মনের পাতে একটা ছায়াপাত হয়, নলিনী তাহাই দেখে।—প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়, তার মধ্য দিয়া ঘাটে যাইবার বাঁকা পথ। শুষ্ক বাঁশ পাতার গন্ধ, স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া দুই তিন হাত উচ্চ শেওলা গাছের চূড়া, পাখীর গানের সঙ্গে ঋতুর আগমন ঘোষণা, আরও কত কি।

নলিনী গ্রামের বালিকা, শহরের বধূ। এদেশে স্ত্রীলোকের কোন বৃত্তি হয় না, জিজ্ঞাসা করাও ভদ্রতাবর্জ্জিত। সকলেরই একরূপ অতি সাধারণ বৃত্তি। নলিনীও সেইরূপ পূর্ব্বে বালিকা-বৃত্তি করিত, এখন বধূবৃত্তি করিতেছে। তবে তাহার মনোবৃত্তি আছে। এই মনোবৃত্তিতেই স্ত্রীলোকেরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। নলিনী একটু কাব্যপ্রবণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বুঝিয়াছে, নারী বলিয়া এই চর্চ্চা তাহার অনধিকারভুক্ত। পল্লীর সহজ শোভার মধ্যে লালিত, এই শক্তির বাহ্যপ্রকাশে অবকাশ না মিলিলেও অন্তরে তাহার অনুভূতি আছে এবং অনেক সময় তাহার তীব্রতার

উপভোগও করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; বাহিরে তেমন স্ফুরণ কোন দিনও হয় নাই। অন্যমনস্কতায় কখন বা অল্পস্বল্প স্ফুরণ হইলেও প্রকৃতির শোভার মতই তাহা একবার দর্শন দিয়াই কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, স্মৃতি কিছু নাই! তবে, ক্ষমতা আছে চেষ্টা করিলে লিখিতে পারে,—ইহাই সম্বল! ইহাতে তৃপ্তি যেমন অতৃপ্তিও প্রচুর।—রাজা হইয়াও রাজ্য নাই!

কাব্যচর্চ্চায় লেখাপড়ার আবশ্যক হয়, নলিনীর পিতৃস্থানে তাহার অভাব। আপন চেষ্টায় যতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তত-দূরই সম্ভব। কাহারও প্রেরণা বা সহানুভূতি সাহচর্য্য পাওয়া যাইবে না। নলিনী সরলবর্ণ সমাপ্ত করিয়া অতি কষ্টে জটিল বা যুক্তবর্ণের পরিচয় লাভ করিয়াছিল। সাহায্য করিবার লোকের অভাব! একে লেখাপড়ার প্রচলন নাই, তাহাতে আবার মেয়ের লেখাপড়া;—প্রথম হইতেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ! বর্ণবোধ না হইতেই নানা কথা!—"মেয়ের যে লেখাপড়ায় বড্ড চাড় দেখছি! একেবারে এণ্ট্রেস্ পাস করে ছাড়বে! ব্যস, তারপর আর কি? কলকাতা গিয়ে খৃষ্টান হয়ে মাষ্টারি—! ও সব দরকার নেই! আমাদের ঘরের মেয়ে—লেখাপড়া না করলেও বর জুটবে!"

সকল বিষয়ের ঠাট্টা বরদাস্ত হয়, কিন্তু কোথায় কোন্ দেশে বর আছে তাহাকে লইয়াও তামাশা! নলিনীর সহ্য হয় না। সে সকলের সমক্ষে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়িয়া দিল। তাহার দিদি একটু লেখাপড়া জানিত। অনেক শ্লোক ছড়া কাটিতে পারিত, মুখে মুখে কত কবিতা আওড়াইত। সেও তাহার নিকট হইতে এই অল্প বয়সেই 'পূর্ব্ব গগন সোনার বরণ' প্রভৃতি কয়েকটা ভাল ভাল কবিতার কতকগুলি পদ আবৃত্তি করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং দিদিই এখন উপযুক্ত শিক্ষক, সে যখন শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিত তখন তাহাকে লইয়া গোপনে বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ হইত।—ওঃ দিদির কত জ্ঞান, দিদির মত শিখিতে পারিলে কত জানা যায়। তাও সে সকল সময় থাকে না। বৎসরের মধ্যে কত সময় বই পাকাইয়া শিকার উপর তেঁতুলের কলসীর মুখে সরায় তুলিয়া রাখিতে হইত।—তারপর দিদির বিদ্যা এক দিন ধরা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় ভাগের শেষের দিকে আসিয়া তাহার আটকাইয়া যাইতে লাগিল।—সেই দিন হইতেই আর দিদির উপর আস্থা নাই!—অমন মুখরা, অত ছড়া-পড়া—শেষে দ্বিতীয় ভাগেই মুখ ভোঁতা হইল! দিদি মান বাঁচাইতে বলিল, "—নে, আর কত পড়বি? আমরাও ঐ পর্য্যন্তই পড়েছি! ওতেই হবে। মনে রাখতে পারলে তো? আশ্চর্য্য! দিদি এই সামান্য মূলধন লইয়া পসার তো বড় কম করে নাই! তার শুধু বিজ্ঞাপনই সম্বল?

নলিনীর লেখাপড়ার ধারা সেইখানেই শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা সুযোগে বর্ষণ পাইয়া কূলপ্লাবিনীর মত ছুটিয়া চলিল। গ্রামের মধ্যে রামবাবু একজন পাশ-করা লোক—কলিকাতায় মাষ্টারি করেন। স্বগ্রামে কোন দিন মাষ্টারি না করিলেও সেইখানে তাঁহার রাম মাষ্টার বলিয়াই খ্যাতি, সেইবার কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার কলিকাতার মাষ্টারির চাকুরী ঘুচিয়া যায়। তারপর সদাগরী আপিসে, মারোয়াড়ীর দোকানে অনেক চেষ্টা করিয়াও একটা কাজ জুটাইতে না পারিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি এখন গোবিন্দ খুড়োকে বলিয়া তাহাদের পুরাণ গোয়াল-ঘরের চালার নীচে পাঠশালা খুলিয়াছেন। গোবিন্দ নলিনীর পিতা, সুতরাং ভাগ্যগুণে পাঠশালা তাহার বাড়ীতেই আসিয়া হাজির হইল। গ্রামের মধ্যে লেখাপড়ার চলন নাই। ছোট ছোট মেয়েরা শৈশব হইতেই গৃহকাজে অভ্যস্ত হয়। আর ছেলেরা দূরের গ্রাম হইতে অল্পবিদ্যা ঋণ গ্রহণ করিয়া ঝগড়া-কলহে ব্যয় করিতে করিতে ক্ষেতের কার্য্য আরম্ভ করে। রাম মাষ্টার গ্রামবাসীর সুবিধার জন্য বিদ্যালয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিল না। সকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে স্নানাহারের সময় বাদ দিয়া যখন হোক আসিলেই চলিবে। পড়া হইয়া গেলেই ছুটি। অযথা কাহাকেও বসিয়া থাকিতে হইবে না। স্কুলের কোন কর্ত্তৃ-পক্ষ নাই। রাম মাষ্টার কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না।

নলিনীর এইবার মস্ত সুযোগ। পাঠশালা যখন বাড়ীতেই আসিল তখন আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। সে মার কাছে অনুমতি লইয়া রীতিমত যাতায়াত আরম্ভ করিল। সময় সময় দিনে দুই বার তিন বার করিয়াও যাইতে লাগিল। এক পড়া লইয়া আসিয়া কতক্ষণ পরে আবার গিয়া হাজির হইয়া দেয়—"গুরুমশাই, হয়ে গেছে সেটা!"—আবার আসিয়া আবার যায়। তাহার বিশ্বাস লেখাপড়া তাহার কপালে টিকিবে না। সুতরাং যত তাড়া-তাড়ি পারা যায় শেষ করিয়া লইতে হইবে। রাম মাষ্টার শেষে বিরক্ত হইয়া আইন করিল একবারের বেশী কেহ দুই বার পড়া দিতে পারিবে না! কারণ দেখাইল 'বেশী প'ড়লে মাথার দোষ আসে। ছুটি হ'লেই সকলে বাড়ীর কাজ অথবা খেলা করবে। সেই দিন আর পড়বে না; পাঠশালায় আর আসবে না। অবশ্য ঘরে ইচ্ছে করলে পড়তে পার।" পাছে একসঙ্গে আসিয়া সকলে হৈ চৈ গোলমাল করে সেই জন্য যাহার যখন ইচ্ছা আসিবার অনুমতি দিয়াছিল; কিন্তু এক এক জন যদি দিনে দুই তিন বার করিয়া আসিতে আরম্ভ করে তবে আর সামলান যায় না। তাই নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল।

নলিনী এখন কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। দিদিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখন সে বোধোদয় কথামালার ঘরে পৌঁছিয়াছে, ইংরেজীরও অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে তাহার এখন বেশ সুনাম। সেই দিন পিতা বাড়ী ছিলেন না; তাঁহার নামে আদালতের একখানা শমন নলিনী দস্তখত করিয়া রাখিয়াছিল। আর এক দিন ডাকবাহকের নিকট হইতে বকলমে সই করিয়া টাকা রাখিয়াছিল, সুতরাং গৃহেও তাহার খাতির হইল। লেখাপড়ার আবশ্যকতা তার বাড়ীর লোকেও বুঝিল। কিন্তু, হইলে কি হইবে ঐ পর্য্যন্তই; তাহার অতিরিক্ত আর পাইতে চায় না। যতটুকু পাইয়াছে তাহার উপরই ভরসা করিতে ভালবাসে। উপরের পদার্থে আস্থা নাই। ইহা বুঝি পল্লীগ্রামেরই ধাত। নলিনী যখন সরকারী খাতায় নাম লিখিয়াছে, ডাকঘরে সই দিয়া টাকা রাখি-য়াছে তখন আর ভাবনা নাই—অনেক শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। সরকারী খাতায় সই দেওয়া কি যার তার কর্ম্ম—না যে সে লোকের সই তারা নেয়! কত বড় বড় লোক সেই সমস্ত খাতা দেখে! আগেকার দিনে নাম সই করতে পারলে সরকারের ঘরে চাকরী

হত।—এই বিদ্যে বড় একটুখানি নয়! বড়মেয়ে নারাণী যে অতখানি লেখাপড়া শিখিয়াছিল সে পারে নাই কোন দিন সরকারী খাতায় নাম লিখিতে।

নলিনীর বিদ্যায় বাটীস্থ সকলেই খুসী। রাম মাষ্টারকে একটা বড় দেখিয়া ভোজ্য পাঠাইয়া দিল।

—নলিনী পাশ করেছে, সে সরকারী খাতায় যখন নাম লিখতে পেরেছে তখন আর দরকার নেই, ওই পর্য্যন্তই থাক! গবরমেণ্টের লোক সে লেখাটা মেনে নিয়েছে তো? আর তো ফিরে আসে নি? নলিনী শুনিল না। সে অল্প সময়ের জন্যও যাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে বাদ দিয়াও বজায় রাখিল। একেবারে বন্ধ করিল না!

তারপর আর এক পরিচয়। রাম মাষ্টারই এক দিন গোবিন্দ খুড়াকে জানাইয়াছিল—নলিনী পদ্য মেলাতে পারে। মুখে মুখে না হলেও লিখে লিখে ও ছড়া কাটতে পারে। সেদিন তালপত্রে দুই ছত্র ছড়া কাটিয়াছিল, গুরুমহাশয় তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া দিলেন।—ও নারাণীর চাইতে ভাল ছড়া আওড়াতে পারবে। সে তো শুনে মুখস্থ করেছে, ও নিজেই বানাতে পারবে।

ইহাতে নলিনীর নাম ও সম্মান যেমন বাড়িল, ব্যঙ্গবিদ্রূপও সেই অনুপাতে বাড়িয়া গেল।

—বচনা করে! নলিনী আজকাল বচনা ধরেছে; অর্থাৎ বচন মুখে আরম্ভ না করিয়া লেখায় আরম্ভ করিয়াছে, সেইজন্য তাহা রচনা না হইয়া বচনা হওয়াই ঠিক।—কখনও যদি আনন্দ-সহকারে নলিনী দুই ছত্র লেখা কাহাকেও দেখাইত সে তাহাকে কবিত্ব-বচনা প্রভৃতি বলিয়াই সংবর্দ্ধিত করিয়া বিদায় দিত। এক রাম মাষ্টার ব্যতীত সকলেই এক পক্ষে। সমবয়সী বান্ধবীরাও ভাল সময়ে না হোক কলহের সময়ও তাহাকে পদ্য লেখার খোঁটা দিত, বচনা বলিয়া বিদ্রূপ করিত।

বয়স যত দিন অল্প ছিল এই সমস্ত কটূক্তিকে প্রশংসার পর্য্যায়েই ফেলিয়া রাখিত। এখন বয়স বাড়িয়াছে, সে গম্ভীর হইয়াছে। তাহার রচনাকে উপলক্ষ করিয়া বচন চালাইতে সুযোগই কেহ পায় না। নলিনী এখনও সেইরূপ ছেলেবয়সের মত কিছু লিখিবার চেষ্টা করে কিনা সেই সম্বন্ধে কেহ অবহিতই নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধ জন্মিয়াছে, কাজের ভার আসিয়াছে—ক্ষেত-খামারের কাজ ইহা ছাড়িয়া বচনা করিবার অবসর কই? অবসর কখনও পাইলেও নানা কথায় মনের স্থিরতা থাকে না, এক লিখিতে গিয়া আর হইয়া পড়ে, সব নষ্ট হইয়া যায়, বিরক্তি আসে, শেষে মানসিক যন্ত্রণা হইতে থাকে।—ইহার উপর অবকাশ করিয়া তাহাকে বসিতে দেখিলেই মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য আয়ত্ত করিবার হুকুম হয়। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাহাকে সুর বসাইয়া পাঠ করিতে হইত। বাড়ীর এবং পল্লীর কর্ত্রীগণ তাহাতে পুণ্য অর্জ্জন করেন। গ্রামের মধ্যে একটা মেয়ে লেখাপড়া শিখিয়াছে সকলেই তাহাকে দিয়া পরকালের পথে বাতি জ্বালাইয়া লইতে চাহেন। নলিনীর তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সকল সময় বিরক্ত করিলে নিজের চিন্তা যে ভাসিয়া যায়।

একটি মাত্র লোক রাম মাষ্টার—নলিনী যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে তাহাকে। এখনও কখন কখন তাহার কাছে যায়, যদি কখন কিছু লেখে, দেখাইয়া আসে তাহাকে। কেবল তাহারই চেষ্টায় সে গ্রামের মধ্যে নারী-সংসদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গৃহের অথবা গ্রামের দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সংবাদ রাখে না। রাম মাষ্টার তাহাকে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র পড়াইয়াছে—কয়েকখানা পুস্তক পুরস্কারও দিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য তাহারই দেওয়া।

তারপর একদিন নলিনীর বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী শহরে। বিশেষ কোন ঝামেলা নাই! ছেলে আর মা এই লইয়া সংসার। গ্রামের লোক তৃপ্ত হইয়াছে—নলিনী লেখাপড়া শিখিয়া ভাল ঘরে বর পাইয়াছে! নলিনী কিন্তু খুসী হইতে পারে নাই! পরিজনের পরিচয় পরিপূর্ণ ভাবে না পাইলেও আবহাওয়া অস্বাস্থ্য-কর ইহা সে ভাল ভাবেই বুঝিয়াছে। বাতাস এখানে মুক্ত নয়, যদৃচ্ছা বিচরণের অধিকার নাই। আকাশ সঙ্কীর্ণ, সরলতাবর্জ্জিত। মনগুলিও সেইরূপ, যেন সব সময়ই আবদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে আছে—হদিস আর পাওয়াই যায় না। কাঁদিয়া কাকুতি জানাইলেও কেহ দ্বার খোলে না। না খুলুক, ইহা শ্বশুরবাড়ী, ইহজীবনের স্বর্গ। যেমন অবস্থা হোক ইহাকেই মানাইয়া লইতে হইবে। নলিনী ইহারই মধ্যে মনের খোরাক সন্ধান করে। সকল সময় জোটেও না! অনাহারে, অর্দ্ধাহারে চিত্ত তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইলে সকলের পরে আসিয়া নিকৃষ্ট আহার গ্রহণ করে আর কবে কোন্ কালে ঘি খাইয়াছিল তাহাই ভাবিতে থাকে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী পিঞ্জরের মধ্যেই এ পাশ ও পাশ করিয়া নীচের মৃৎপাত্রে চারাগাছ দেখিয়া বন-বিচরণের সাধ মিটাইয়া লয়। বাড়ীতে খাঁচায় ধরা একটা পাখী ছিল নলিনী তাহাকে দেখিয়া তাহার বাপের বাড়ীর দাঁড়ের পাখীটাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রথম পত্রেই অনুরোধ করিল। তাই বলিয়া মাঠে ঘাটে ছুটাছুটি করিবার জন্য নিজে যে সে ছুটি পাইবে না ইহা সে বোঝে।

এতখানি অতৃপ্তির মধ্যে একটা বিষয়ে সে সামান্য সুবিধা দেখিতে পায়। অবকাশ থাকে সমস্ত দিন, ইচ্ছা করিলে কাব্য-চর্চ্চা করা যাইতে পারে। সেই দিক দিয়া কিছু সুযোগ পাওয়া যায়। কাগজ কলমের অভাব হইবে না, বিরক্ত করিবারও কেহ নাই, ঠাট্টা-বিদ্রূপও শুনিতে হইবে না। নলিনী নিকটবর্ত্তী একটা পাঠাগারের সভ্য-শ্রেণীতে নাম পাঠাইয়া দিল। অবশ্য, প্রথমটা শাশুড়ীর ইচ্ছায়। দুপুরবেলা কাজকর্ম্ম থাকে না, রোজ রোজ ঘুমাইলে অভ্যাস খারাপ হইয়া যাইবে সেইজন্য। শাশুড়ী পাকা গৃহিণী। সাজানো-গোছানোর ব্যবস্থা, শাসন, সংস্কার প্রভৃতি ভাল ভাবেই জানা আছে। সম্পূর্ণ আধুনিকও নয়, সেকালেরও নহে। মাঝামাঝি মধ্য-যুগের মহিলা বলা যাইতে পারে। বেশী পড়াশুনা পছন্দ করেন না, একটু আধটু না জানাও ঠিক নয়!—বধূ তাঁর অপছন্দ হয় নাই! মাটি ভাল আঁট ধরে—ইচ্ছামত ভাঙিয়া চুরিয়া গড়া চলে।

নলিনীর পর্য্যাপ্ত সময়। একখানা সে খাতা করিয়াছে, লিখিবার চেষ্টা করে। ইহার পরিচয় এখনও সকলে পায় নাই। নলিনীর স্বামী একজন নব্য বয়সের ছোকরা, কোন সদাগরী কার্য্যা-

লয়ের হিসাবনবিশ। পেশাদারি লেখাপড়ায় বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। কারণ অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। তবে, সখের লেখাপড়া—অর্থাৎ নাটক নভেলের চর্চ্চা কতক করিয়াছিল, অশিক্ষিত একেবারে বলা চলে না। নলিনীর কাব্যচর্চ্চার সন্ধান পাইয়া বেশ আনন্দিতই হইল। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিল! বিদুষী-কবি স্ত্রী তার! নলিনীর শাশুড়ীও একটু খুশী হইয়াছে :— বউ লেখাপড়া জানে—বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব হবে না! বাড়াবাড়ি না হইলেই হইল! বিবাহের পূর্ব্বে যখন মেয়েকে বাজাইয়া যাচাই করিতে গিয়াছিল তখন লেখাপড়ার সন্ধান করিয়াছে। নিজের নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম বেশ ভাল হস্তাক্ষরেই লিখিয়া দিয়াছিল। তাহারা তাহাতেই খুশী হইল, কিনারা কত দূরে অনুসন্ধান করিল না। যাই হোক, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কিছু নাই!

বিবাহ একটু পুরান হইয়াছে। মাঝে মাঝে শাশুড়ী বউকে বুঝাইয়া দেয়—মেয়েমানুষের বেশী লেখাপড়া ভাল না ঠিক? গরীব গেরস্তর মেয়ে বউ এদের ঘর-করনা করতে হয় কি না তাই জন্তে!

নলিনীর পর পর দুইটি লেখা সাময়িক কাগজে বাহির হইল। অবশ্য তাহা স্বামীর চেষ্টায়। একখানা পত্রও আসিয়াছে। পরবর্ত্তী লেখার জন্ত অনুরোধ আছে তাহাতে। নলিনী কাহাকে দেখাইবে? এ আনন্দ রাখিবার পাত্র খুঁজিয়া পায় না। এমন একটা লোক নাই এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে। বাপের বাড়ীর দেশ অনুসন্ধান করিয়া এক রাম মাষ্টারকে দেখিতে পাইল। মার কাছে চিঠি লিখিয়া সেই লেফাফার মধ্যে রাম মাষ্টারের নামেও একখানা পত্র দিল। পাশের বাড়ীর বৌ—সে আলাপ করিতে একটু সমীহ করে। আর তেমন ভিড়ে না। বোধ হয় ইহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় তাহাকে একটু হীন প্রতিপন্ন করিয়াছে। শাশুড়ী এখন আর খুঁটিনাটি দোষত্রুটি মার্জ্জনা করে না, কথা শুনাইয়া দেয়। স্বামী এতদিন ইহাকে গৌরবজনক মনে করিত— এখন অন্যরূপ ভাবে। একখানা চিঠি আসিয়াছে—ঘন ঘন এই রকম আসিতে পারে তো? মোটে এখন আরম্ভ! এই রকম চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইলে আলাপ-পরিচয় হইয়া যাইবে, বাহিরে যাইতে শিখিবে। সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রণ—এ সমস্ত কি ভাল? বউমানুষ, অনেক কেলেঙ্কারী আসিতে পারে। অর্থাৎ কি না, অপর পুরুষের সহিত আলাপ থাকা মোটেই উচিত নয়। স্বামী হইয়া এরূপ সূত্রপাত করিয়া দেওয়া ঘোরতর অনুচিত। যাই হোক, সে মুখে কিছু বলিল না, অন্তরে সতর্কতা অবলম্বন করিল।

নলিনী লেখে, খুব কম। সময় বড় বেশী পায় না! এখন আর সেই রকম অবস্থা নাই, কাজকর্ম্ম অনেক দেখিতে হয়। শাশুড়ীর খোঁটাও আছে। হয় তো কখন কিছু লিখিতে বসিল অথবা চিন্তা করিতে—এমনই কথাবার্ত্তার ধরণ এমনই আচরণ —কার সাধ্য কথা না কয়। যদি বা নলিনী সংযত হইয়া রহিল, কথা কিছু কহিল না, তাহার চিন্তা ব্যাহত হইল, রচনার উপাদান নষ্ট হইয়া গেল। এমনি ভাবেই নষ্ট হয়! এক দিন দুধ পুড়িয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য ঝঙ্কার দিয়া শাশুড়ী বলিয়া উঠিল—"চোখের মাথা না হয় খেয়েছ, নাকের মাথাও কি খেলে নাকি? দুধটুকু যে সব পুড়ে গেল। অত লেখাপড়ার চিন্তে মাথায় ঢোকালেই এই হয়! এই যে আমরা লেখাপড়া শিখিনি তাতে কি আমরা কিছু কম বুঝি? না আমাদের জ্ঞানগম্যি হয় নি?"

যদি কখনও সময় হয়, ভাবও যদি আসে প্রবৃত্তি আর হয় না। একটি ছেলে হইয়াছে—খাটুনী বাড়িয়াছে তাহাতে। কত দিন হইল মা অনুযোগ দিয়া একখানা পত্র পাঠাইয়াছিল,—লেখাপড়া শিখে চিঠি লিখতে এত আলস্য কেন?—সেই চিঠির জবাব লিখিতেছিল দুপুর বেলা। ছেলেটা হঠাৎ মেঝের উপর পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

"—হাঁ গো ছেলেটা চোখের সামনে পড়ে গেল? কি ক'রছ ব'সে? কি ভাবছ? যত বারণ করি কিছুতেই শুনবে না? সেই লেখা। কি সর্ব্বনাশ! এমন তো দেখিনি! কোথাকার মানুষ গো! সাধে বলে—মেয়েমানুষের লেখাপড়া···" ইত্যাদি।

নলিনী ছেলেটাকে কোলে তুলিয়াছিল, শাশুড়ী আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল। সে হতভম্ব হইয়া অপরাধীর মত একপাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝাইয়া বলিতে পারিল না যে, সে কবিতা-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছে, লেখাপড়াও ছাড়িয়া দিয়াছে—মা'র কাছে একখানা চিঠির জবাব দিতেছিল মাত্র! কি করিবে, সাহস নাই! ভাষাও পাইল না; সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া এক-পাশেই দাঁড়াইয়া রহিল।

এই শেষ, নলিনী আর লিখিবে না। কোন কিছু নয়, চিঠি-পত্রও না। লেখাপড়ার পাট একেবারে তুলিয়া দিবে। যাহার জন্য এত অনর্থ তাহার কিছু রাখিবে না। নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাই তার অনধিকার! পুরুষ মানুষের কোন অসু-বিধাই থাকে না। স্নেহই বাধা দিবার নাই। সংসারের যত বাধা-বিপত্তি সব কি নারীর জন্ত! তাহারই পথে যত সব আসিয়া জড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নলিনী সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছে! লেখাপড়া বলিতে কিছু করে না। তবু বিপদ তো তাহাকে ছাড়ে না! মনটাকে লইয়াই যত বিড়ম্বনা! সবশুদ্ধ বর্জ্জন করিয়াও মনটাকে সামলান যায় না।

তখন বর্ষার পূর্ব্বাভাব। রান্নাঘরের চিরবদ্ধ জানালাটার ছিদ্রপথ দিয়া নলিনী দেখিতেছে—মেঘেরা আকাশময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে,—এখনই কি যেন একটা সংঘটিত হইবে। যাত্রাগান আরম্ভের পূর্ব্বে আসরের ছোট ছোট ছেলেদের মত চাঞ্চল্য ও আনন্দ! ছিদ্রপথ সামান্য, কিন্তু অতিদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়! অতীত ভবিষ্যৎ—শৈশব, বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত!—এই মেঘেরা এক একদিন এমন দলবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, সকাল বেলায়ই সন্ধ্যার ভ্রম হয়। কাক-পক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল না অথচ সূর্য্য অস্ত যায়। বাছুরগুলি মাঠ হইতে ছুটিয়া আসিল। হয়তো বা ভয় পাইয়াছে! আবার তখনই কোথায় মেঘ ভাসিয়া গেল। ছিনি-মিনি খেলা আর কি! কিংবা হয়তো ভীষণ ভাবে বর্ষণ আরম্ভ হইল তিন চার দিনের মধ্যেও বিরাম নাই। ছেলেবেলা বৃষ্টি দেখিলেই ভিজিতে বাহির হইয়াছে। একটু বয়স হইলে টোকা ছাড়া এক দিনও বাহিরে যায় নাই। আবার হয়তো আরও

বয়স হইলে গায়ে হাট লাগাইতেই ভয় হইবে। না, তা কি হয়! সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বর্ষার ভরা নদীর মতই কূলে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

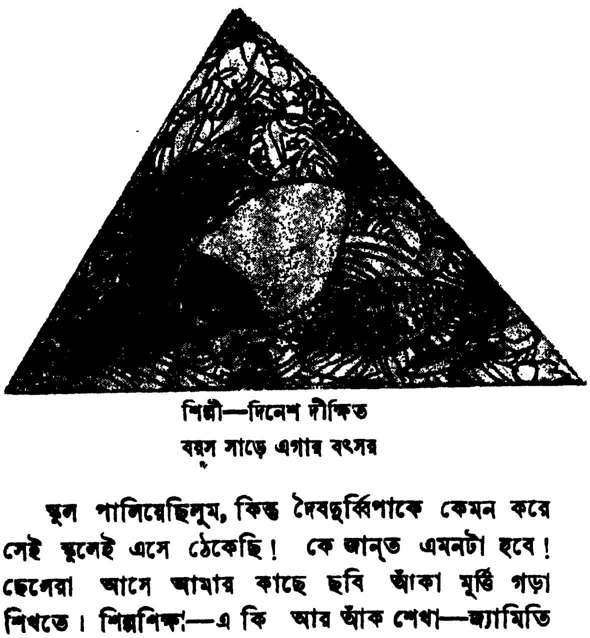
"—বৌমা! এ কি কাণ্ড! তুমি সামনে বসে বসে ভাতগুলো পোড়াচ্ছ? নাকে কি হয়েছে? আমি ওঘর থেকে ছুটে এলুম গন্ধ পেয়ে—ঘরে বুঝি কেউ নেই! ওমা! তুমি সামনে বসে রয়েছ? ঝিমোচ্ছ না কি? ছিঃ, ছিঃ, এরকম হ'লে কি কাজ চলে?"

কাগজ কলম বর্জ্জন করিয়া, কাব্য-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াও নিস্তার নাই! আবার সেই অনর্থ! মনটাই হইয়াছে কাল। মনটাই যত গণ্ডগোল করে! পুরুষের তো কোন গোলই নাই! ইচ্ছামত চিন্তা করে লেখে কোন বাধাই পায় না! আর যত বাধা বালাই কি মেয়েমানুষের জন্য? নলিনীর কানে তিরস্কারের অবশিষ্টাংশ কিছুই প্রবেশ করিল না। সে ভুল সংশোধন করিতে বসিয়া নারীজন্মের উপর ধিক্কার দিতে দিতে আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

শিল্পশিক্ষা

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

স্কুলে যখন পড়তুম তখন পড়ায় মন ছিল না—মন ছিল আঁকায়। তারপর কেমন করে পড়াশোনা সব ছেড়ে কেবল মাত্র আঁকা ও গড়ার কাজে লেগে গেছি—সে খবর সব খুলে বললে অনেক অপ্রীতিকর কথা এসে পড়ে—তাই সে কথা এখন থাক।

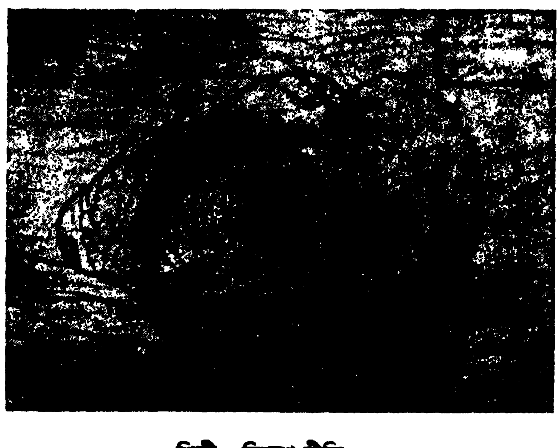


শিল্পী—দিনেশ দীক্ষিত
বয়স সাড়ে এগার বৎসর

স্কুল পালিয়েছিলুম, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে কেমন করে সেই স্কুলেই এসে ঠেকেছি! কে জানত এমনটা হবে! ছেলেরা আসে আমার কাছে ছবি আঁকা মূর্ত্তি গড়া শিখতে। শিল্পশিক্ষা—এ কি আর আঁক শেখা—জ্যামিতি ডেসিমেল আর শূন্য বসানো! এ কি আর ধাপে ধাপে শেখানো যায়? তবে মাষ্টার হয়ে বসেছি—ছেলেগুলোকে নিয়ে করি কি? নিজে ছবি এঁকে মূর্ত্তি গড়ে ঘর বোঝাই করতে লাগলুম। ছেলেগুলো তাই দেখে—যখন কাজ করি—উঁকিঝুঁকি মারে—ক্রমে ক্রমে পেন্সিল, তুলী, কাগজ, রং নিয়ে তারাও লেগে গেল। বলতে হ'ল না—এটা কর্, ওটা কর্!—তাদের যা খুশি তাই তারা করে। ড্রইঙে ফেল হলে প্রমোশন পেতে ত অসুবিধা নেই। আর ড্রইঙের পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া গেছে। যা আঁকে ছেলেরা, তাই বেছে বেছে নিয়ে ছবির প্রদর্শনী করে দিই বছরে দু-এক বার—কি খুশী ছেলেরা, যেন পরীক্ষায় ডবল প্রমোশোন পেয়েছে সব!

সুরু করেছিলুম এমনি ক'রেই। বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। শেখানোর কাজ নিয়ে নিজেই শিখছি—এ মজা মন্দ নয়! ছোট ছেলেগুলোই সব চেয়ে বড় বড় শিল্পী এক-এক জন। তাদের ভয়ডর নেই কাগজ পেলেই হ'ল, পাতার পর পাতা এঁকে চলবে। কোথায় পাহাড়-নদী, নৌকা, বন-জঙ্গল, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেলগাড়ী, মোটর-কার—সব ছবিতেই সূর্য্য-মামা থাকবেন, তাঁকে কি আর বাদ দেওয়া চলে!

অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেগুলো বাড়ী থেকে কিছু শিখে কিম্বা অন্য স্কুল থেকে যারা আসে তারা দেখি—কাগজ, রং দিলে চুপ করে বসে থাকে। তাদের মাথায় কোন আইডিয়া নেই যেন—কাগজে একটুখানি আঁচড় কাটতে কি ভয় তাদের! 'কপি' করতে চায় কেবল—গেলাস,



শিল্পী—দিনেশ দীক্ষি

বাটি, বোতল—বড়জোর চায়ের কাপ পর্য্যন্ত তাদের কল্পনার দৌড়!—কোথায় পড়ে রইল তেপান্তরের মাঠ, সাত সমুদ্দুর তের নদী—ঠাকুরমার ঝুলির বেঙ্গমা-বেঙ্গমী—বুদ্ধু-ভুতুম!—ঠেক্‌ল এসে চায়ের কাপে!—কি করে এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যায়—এই হ'ল সব চেয়ে বড় ভাব্‌না।

নানারকম ভাল ভাল ছবি যোগাড় করা স্থরু কর্‌লুম। না আঁক্‌তে পারলে ক্ষতি নেই—ছবি দেখুক। ছবি দেখিয়ে সে-বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলা মন্দ নয়—বেশ কিছু কাজ হয়।



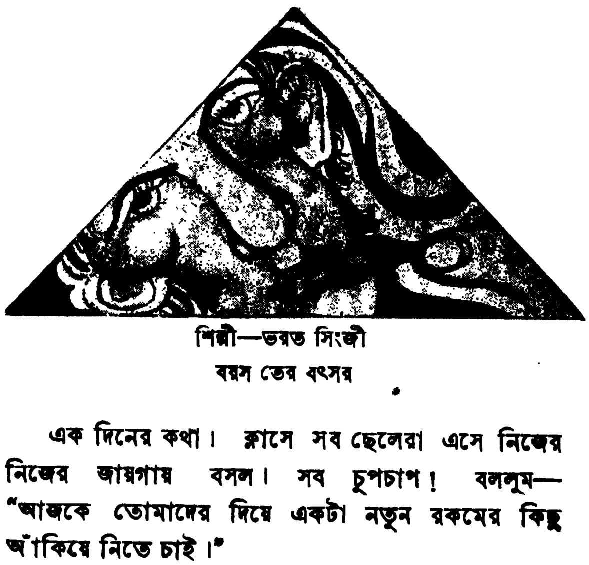
শিল্পী—ভারত মাহে
বয়স সাড়ে বার বৎসর

নানাদেশে নানারকম ভাবে ছোটদের হাতের কাজের উৎসাহ বাড়াবার চেষ্টা চল্‌ছে—তাদের কাজের নমুনা দেখে বেশ বুঝতে পারি—সব দেশের ছেলেরা আঁকা-গড়া বিষয়ে একই রকম। তারা দেখে শুনে ও করে একই পদ্ধতিতে। একঘেয়ে কাজে তাদের মন লাগে না। নতুন নতুন উপায়ে তাদের কাজে মন লাগাতে হবে। তাদের ভাল লাগছে না মনে হবার আগেই পদ্ধতি বদলাতে হবে—তবেই তাদের কাছে নতুন কিছু পাওয়া যাবে। নিজের কল্পনা থেকে যাতে আঁকতে বা গড়তে পারে সেইটাই বড় দরকার।

ভাল ভাল ছবি যাতে তারা দেখতে পায় তার ব্যবস্থা রাখা চাই। যখনই তাদের ছবি দেখবার ইচ্ছে জাগবে—ভাল ছবি যেন তারা দেখ্‌তে পায়। আমাদের দেশে পানওয়ালা বিড়ীওয়ালা, মুদীর ও ছোট ছোট মনোহারী দোকানে যে-সব দেবদেবী এবং সিনেমা-ষ্টারদের ছবি দেখতে পাওয়া যায়—বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরের দেওয়ালেও ঐ জাতীয় ছবি বা বড়জোর দু'একখানা ছবিওলা ক্যালেণ্ডার ঝুলতে দেখা যায়। ভাল ছবি ছেলেরা দেখবার মোটেই স্থযোগ পায় না। স্থতরাং ছেলেদের পছন্দ, অপছন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করার কোনো মানেই হয় না। স্কুলে যায় ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে—সেখানেও যদি তারা ভাল ছবি দেখবার স্থবিধা না পায় তবে তাদের রুচি বদলাবার আর কোনোই আশা থাকে না।

এইসব কারণেই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের দেখা উচিত স্থরুচিসম্পন্ন শিল্পীকে যেন শিল্প ও ড্রইং শেখাবার ভার দেওয়া হয়। "ড্রইং মাষ্টার"দের যুগ আর নেই। দু-চারটে বোতল পেয়ালা বাটি নকল করায় মন আর ভরে না—শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না।

শিল্প শেখাবার কাজে দিনের পর দিন শিল্প-শিক্ষক যে নূতনত্ব রাখতে পারবেন এও জোর করে বলা যায় না। কারণ কাজটা বড় সোজা নয়। সেই কারণে নানারকম ফন্দিরও দরকার। একটি ফন্দির কথা বলে আজকের প্রবন্ধ শেষ করব।



শিল্পী—ভরত সিংজী
বয়স তের বৎসর

এক দিনের কথা। ক্লাসে সব ছেলেরা এসে নিজের নিজের জায়গায় বসল। সব চুপচাপ! বললুম—"আজকে তোমাদের দিয়ে একটা নতুন রকমের কিছু আঁকিয়ে নিতে চাই।"

—"সে আবার কি রকম সর?"

গল্পের ছলে আরম্ভ করলুম—"তোমাদের যখন অস্থুখ ক'রে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে—ফুটবল খেলে কেউ পা ভেঙেছে—ডাক্তারে চলাফেরা করা বারণ ক'রে গেছে—কেউ বা হাম বা জলবসন্তে ভুগেছ—একলা ঘরে কড়ি বরগা গুনেছ—সময় যখন একেবারে কাটতে চায় না তখন আর কি করেছ আমায় বলতে পার?

"আমার জলবসন্ত হয়েছিল সর। ঘরের দরজা

জানলায় ক'খানা কাচ আছে, জানলায় কতগুলো লোহার শিক বসানো আছে—দেওয়ালে কতগুলো পেরেক পোঁতা আছে, দেওয়ালের গায়ে কত জায়গায় চুণ খসে পড়েছে, ঘরের তিনটে টিকটিকি কতগুলো পোকা দিনে খায়, মাকড়সার জালে কতগুলো পোকা পড়ে দিনে—সবই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল স্যার।"



খেলনা
শিল্পী—শঙ্কর রমনন্। বয়স চৌদ্দ বৎসর

"চুণ খসে পড়েছে নাকি তোমার ঘরের দেওয়ালে? সে কি রকম বল ত? কতটা চুণ খসেছে বলতে পার?"

"বেশী না স্যার—তবে খানিকটা ভারতবর্ষের ম্যাপের মত—"

"তাই নাকি—তোমার ভূগোলের জ্ঞান আছে দেখছি—"

"আর একটা জায়গায় চুণ খসে ঠিক যেন হাঁসের মতো দেখতে হয়েছিল—"

আর একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "স্যার, মেঘের মধ্যেও ঐ রকম বাঘ সিংহ ভালুক দেখা যায়—আমি দেখেছি। হঠাৎ হঠাৎ এক এক রকম দেখতে হয়—

ব্যস, ক্লাসে গুঞ্জন সুরু হয়ে গেল। ঠিক এইটেই আমি চাইছিলুম।

হঠাৎ খড়ি নিয়ে বোর্ডের ওপর ঝাঁ ক'রে একটা ত্রিকোণ এঁকে ফেললুম। একটি ছেলেকে ডেকে বল্‌লুম, "এই ত্রিকোণের ভেতর হিজিবিজি কাট্‌তে পার?"

—"কেন পারব না স্যার—এই দেখুন—"

সে খুব খানিকটা হিজিবিজি কাট্‌লে। বল্‌লুম, বেশ হয়েছে—এবার নিজের জায়গায় গিয়ে বস। বাঃ কি চমৎকার ছবিখানা—তুমি হিজিবিজি কাটলে আমি বেশ একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি হিজিবিজির মধ্যে—তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?"

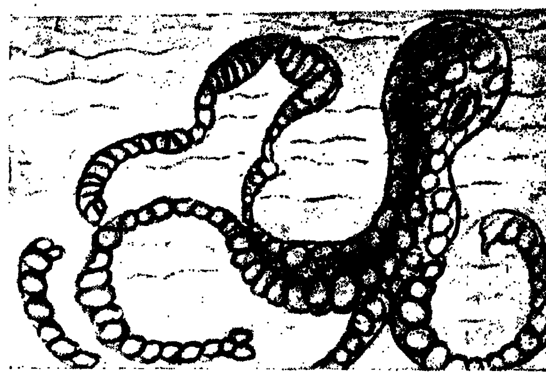
"হ্যাঁ স্যার—ঐ ত একটা সাপ ব্যাঙ গিলছে।"

"না না, মাছ—মাগুর মাছ দু'দু'টো—"

"আমি দেখতে পাচ্ছি—মানুষের মাথা দুটো।"

"কি যে বলিস্—দুটো কাঠবিড়ালি।"

হৈ হৈ পড়ে গেল ক্লাসে। খড়ি দিয়ে এখানে সেখানে জোড়াতাড়া দিয়ে সাপ ব্যাঙ গিলছে বেশ পরিষ্কার করে এঁকে দিলুম—বদ্‌লাতে বিশেষ কিছুই হ'ল না।—ক্লাসে হৈ হৈ পড়ে গেল।



অক্টোপাস
শিল্পী—শঙ্কর। বয়স চৌদ্দ বৎসর

ছেলেটি বললে, "দেখলি আমার কথাই ঠিক"—তুমুল ঝগড়া লাগল—যা যা বকিস্ নে।"

স্যার ইচ্ছে করলে মাছও বানিয়ে দিতে পারতেন—ঐ ত ঐখানে চোখ—আর ল্যাজটা একটু এঁকে দিলেই চমৎকার হয়ে যেতো।"—

দেখলুম—বেশ জমে আসছে। আরো দু-তিন বার ঐ রকম ভাবে খড়ি দিয়ে ঘর কেটে, হিজিবিজি করে ছবি এঁকে দিলুম ঝাঁ ক'রে।

ছোট ছোট কাগজের টুকরো তৈরি করাই ছিল সঙ্গে। বললুম—"সবার সঙ্গে পেন্সিল আছে ত? দু-একটি ছেলে ছাড়া সবাই তৈরি—কাগজগুলো বিলি করে দেওয়া গেল।

আচ্ছা এইবারে সুরু কর! প্রথমে ঘর কাটো—ত্রিকোণ—চতুর্ভুজ—যা খুশি তোমাদের। এইবারে তার ভেতর কাটো দেখি হিজিবিজি—এইবারে ভাল করে দেখ কি দেখতে পাও হিজিবিজির ভেতর।'

"ব্যস পাঁচ মিনিট ত দেখলে, এইবারে এঁকে ফেল দেখি জোড়াতাড়া দিয়ে খেয়াল-খুশির ছবি।"

ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলে কাজে ব্যস্ত। পেন্সিল ছিল না যাদের কাছে তারাও পেন্সিল জোগাড় করেছে। দেখতে দেখতে রকমারি ছবিতে কাগজগুলো ভরে উঠ্‌ল। সবই যে ভাল হল তা নয় তবে সবাই তাদের সাধ্যমত আঁক্‌ল। কিছুদিন আর বিরাম নেই, যখন-তখন যেখানে-সেখানে—এই খেলা চলল—অঙ্কের খাতার পাতায়—ইংরেজি হোমওয়ার্কের খাতায়—কোথাও

বাদ নেই। কয়েকজন ত দেখলুম বেশ আর্টিষ্ট হয়ে উঠ্‌ল—মন থেকে কিছু আঁকতেই পারত না আগে। এ মজা মন্দ নয়।

আমাদের ছেলেদের এই রকম কাজের কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল এখানে। এগুলি দেখে যদি কেউ বলেন যে গুরুর অঙ্কন-পদ্ধতি ছাত্রেরা নকল করছে—তা'হলে আমার আর কিছু বলবার নেই।*

* এই ধরণের খেয়াল-খুশির ছবি অন্যান্ত প্রদেশেরও কোনো কোনো স্কুলে করানো হয়েছে—তাদের ছবির নমুনার সঙ্গে আমাদের দেশের ছবির নমুনার বিশেষ পার্থক্য নেই।

ধ্যান-পদ্ধতি সার

ত্রিপিটকাচার্য কুমারজীব অনুদিত[১]

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বায়ু পিত্ত ও কফজনিত শারীরিক ত্রিবিধ ব্যাধির দুঃখ স্বল্প ও তুচ্ছ। কিন্তু মানসিক ত্রিবিধ ব্যাধির দুঃখ গুরু এবং গভীর। উহা এক বার আরম্ভ হইলে কয়েক কল্প ব্যাপিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়। বৈদ্যরাজ বুদ্ধ এ ব্যাধির ঔষধ জানেন। শৈক্ষ্য (শিক্ষানবীশ) অসংখ্য জীবলোকের মধ্যে সর্বদা এই ব্যাধিতে জড়িত ছিলেন। এখন ব্যাধিমুক্ত হওয়ার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার উচিত চিত্তকে স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করা; একাগ্র করা। দেহ ও প্রাণের মায়া ত্যাগ করা। দস্যুদল মধ্যে প্রবেশকারী ব্যক্তি স্থিরচিত্ত, দৃঢ়সংকল্প না হইলে দস্যুদের দমন করিতে পারে না। বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তির সেনাসমূহকে দমন করাও অনুরূপ ব্যাপার।

সেইজন্য বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—"রক্ত ও মাংস যদি বা নিঃশেষিত হয়, চর্ম ও স্নায়ুমাত্রই যদি অবশিষ্ট থাকে, উদ্যম পরিত্যাগ করিও না।" শরীরের আচ্ছাদন বস্ত্র যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন যেমন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা অগ্নি নির্বাপন, মনে আর অন্য কোনো চিন্তা থাকে না, রাগ দ্বেষ ও মোহের দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলেও সেইরূপ ঐ উদ্ধার লাভের একাগ্র আকাঙ্ক্ষাই চিত্তে জাগ্রত রাখিতে হইবে।

ব্যাধি, দুঃখ, ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণতা, দ্বেষ, বৈর ইত্যাদি সম্বন্ধে ধৈর্যের প্রয়োজন। বিক্ষোভ এড়াইয়া চলিবে। নির্জনবাস পছন্দ করিবে। কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে প্রবেশের ন্যায়, সর্বপ্রকার শব্দই ধ্যানের ব্যাঘাত-জনক, যাঁহারা প্রথম ধ্যান[২] আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারা প্রথমে সর্বপ্রকার ভাবনা অভ্যাস করিবেন। যথা চতুর্বিধ—"অপরিমেয় চিত্ত-ভাবনা",[৩] অথবা "অশুভ-ভাবনা" অথবা "হেতুপ্রত্যয়-ভাবনা",[৪] অথবা "বুদ্ধের সমাধিবিষয়ক ভাবনা", অথবা আনাপান (অর্থাৎ প্রাণায়াম) করিবেন। তাহা হইলে "প্রথম ধ্যানে" সহজেই প্রবেশ করিতে পারিবেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষ "প্রথম ধ্যান" আকাঙ্ক্ষা করিয়া যদি নানা দোষ ও দুঃখযুক্ত পঞ্চকাম[৫] সম্বন্ধে এইরূপ ভাবনা করেন যে, উহা অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়, মলাধারের ন্যায় এবং প্রথম ধ্যানভূমিকে যদি শীতল হ্রদের ন্যায় অথবা উচ্চ প্রাসাদের ন্যায় ভাবনা করেন, তাহা হইলে পঞ্চপ্রকার নিবরণ (বা বাধা)[৬] দূরীভূত হয়। "প্রথম ধ্যান" প্রাপ্তি হয়।

বলি ঋষি যখন "প্রথম ধ্যান" শিক্ষা করিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তিনি এক নারীদেহ দেখিতে পান। উহা পচিয়া ফাঁপিয়া তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছিল। ঋষি তত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অন্তরে সেই গলিত শবদেহের রূপ গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং নিজ দেহকেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর নির্জন স্থানে চিত্তবৃত্তি-সমূহকে একাগ্র করিয়া "প্রথম ধ্যান" লাভ করিলেন।

যাঁহারা বুদ্ধমার্গ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা প্রথমে চতুর্বিধ অপরিমেয় চিত্ত অভ্যাস করিবেন। চতুর্বিধ চিত্ত যেমন অপরিমেয় উহার পুণ্যও তেমনি অপরিমেয়।

চতুর্বিধ অপরিমেয় চিত্তের অভ্যাস

জীবগণের তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগ—

১। এই গ্রন্থ কুমারজীব অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মূল গ্রন্থের প্রণেতা কে, তাহা কিছু বলা হয় নাই।

২। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয় প্রকার ধ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে চারিটি (যথা প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান) রূপ ধ্যান। চারিটি অরূপ ধ্যান। নবমটি হইতেছে ধ্যানের সর্বশেষ অবস্থা, যখন সর্বপ্রকারের চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ধ্যানের এই অবস্থায় মৃতদেহের সহিত ধ্যানীর দেহের প্রায় কোনো প্রভেদই থাকে না। মৃতের সহিত তাঁহার প্রভেদমাত্র এইটুকু যে, দেহ তাঁহার উষ্ণ থাকে, প্রাণ তাঁহার বহির্গত হয় না, এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নষ্ট হয় না।

৩। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা—ইহাদিগকে বৌদ্ধশাস্ত্রে "অপরিমেয় চিত্ত" বলা হইয়াছে। "অপরিমেয় চিত্ত-ভাবনা" পরে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে।

৪। হেতু—মূলকারণ, প্রত্যয়—সহকারী কারণ, তদ্বিষয়ক ভাবনা।

৫। পঞ্চকাম বা পঞ্চকামগুণ—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ স্পর্শ হইতে প্রাপ্ত সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ।

৬। পঞ্চ নিবরণ বা পঞ্চ বাধা—(১) কাম, (২) দ্বেষ, (৩) দেহ ও মনের জড়তা, (৪) অনুশোচনা, (৫) সংশয়।

পিতামাতা, আত্মীয় প্রতিবেশী, পরিচিতাদি। দ্বিতীয় বিভাগ—শত্রু জুগুপ্সিত ব্যক্তি; যাহারা সর্বদা হিংসা করে, আঘাত করে। তৃতীয়, উদাসীন ব্যক্তি, যাহারা আত্মীয়-বন্ধুও নহে, শত্রুও নহে।

শৈক্ষ্য (শিক্ষানবীশ) এই তিন শ্রেণীর সকল মনুষ্যকে মৈত্রীচিত্তে দেখিবেন। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের পিতামাতার ন্যায়, মধ্যবয়সীদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায়, এবং অল্পবয়স্কদের সন্তানের ন্যায় জানিবেন। সর্বদা এইরূপ মৈত্রী ভাবনা করিবেন ও তাহা বর্ধন করিবেন।

অকুশল নিমিত্ত[৭] হেতু মানুষ শত্রুতা করে।* ঐ অকুশল নিমিত্ত নষ্ট হইলে মৈত্রী হইবে। সুতরাং শত্রুতা ও মৈত্রী স্থির নহে। এ জন্মে বা এ জগতে যে শত্রু, পর জন্মে বা পর জগতে সেই বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পারে।

যাহার চিত্ত ঘৃণা ও দ্বেষ পূর্ণ, সে নিজেরই মহৎ হিত নষ্ট করে। ক্ষান্তি ভঙ্গ করিয়া (অর্থাৎ ক্ষমাগুণ নষ্ট করিয়া) মৈত্রী চিত্তের কুশল কর্ম নষ্ট করিয়া, সে আপনারই বুদ্ধমার্গ লাভের সুযোগে বাধা সৃষ্টি করে।

অতএব শত্রুকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ করা উচিত নহে। শত্রুকে প্রতিবেশী বন্ধুর ন্যায় দেখা উচিত। কেননা এই শত্রুই আমাকে বুদ্ধমার্গের সুযোগ লাভ করায়। আমার প্রতি যদি তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় না থাকিত, তাহা হইলে আমার ক্ষান্তি লাভ হইত না। সুতরাং শত্রু আমার হিতকারী বা উপকারী। সেই আমাকে ক্ষান্তি-পারমিতা লাভ করাইল।[৮]

যখন শত্রুর প্রতিও মৈত্রী লাভ হইবে, তখন দশ দিকের সমস্ত জীবের উপর, সমস্ত বিশ্বের উপর মৈত্রী ও বাৎসল্য বিস্তৃত হইবে।

যখন তিনি (মৈত্রী অভ্যাসকারী) দেখেন—সমস্ত জীব অনিত্য, পরিণামী, সকলেরই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু আছে, সর্বপ্রকার দুঃখই সকলকে পীড়িত করে, অতি ক্ষুদ্র জীবও নিরাপদ নহে, তখন তাঁহার চিত্তে করুণা উৎপন্ন হয়।

যখন তিনি দেখেন—জীবগণ ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ত্র সুখলাভ করে, দেবলোকে জাত হওয়ার সুখ, এবং ঋষিমার্গের সুখও লাভ করে, তখন তাঁহার মুদিতা উৎপন্ন হয়।

যখন তিনি জীবসমূহের সুখ দুঃখাদি দেখিতে পান না, তখন তাঁহার দৌর্মনস্য বা সৌমনস্য থাকে না। তখন তিনি প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবগণের প্রতি উপেক্ষা উৎপন্ন করেন।

ইহাই চারি প্রকার "অপরিমেয় চিত্ত" বলিয়া অভিহিত। দশ দিকের সমস্ত (অর্থাৎ অপরিমেয়) জীবের প্রতি প্রসারিত হয় বলিয়া ইহা অপরিমেয়।

শৈক্ষ্য সর্বদা এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন করিবেন এবং বর্ধন করিবেন। যদি কখনো চিত্তে দ্বেষ জাগে তবে তৎক্ষণাৎ দেহস্থ সর্পের ন্যায় এবং দেহস্থ অগ্নির ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

যদি চিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পঞ্চ কামের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পঞ্চ বাধার দ্বারা আবৃত হয়, প্রজ্ঞা ও বীর্যের দ্বারা বলপূর্বক তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিবে।

মৈত্রী ভাবনাকারী সর্বদা জীবগণের বিষয় চিন্তা করিবেন এবং তাহাদিগকে বুদ্ধের সুখ লাভ করাইবেন।

যদি কেহ ইহা অবিরত ভাবনা করেন, তাহা হইলে তিনি পঞ্চকাম হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। তাঁহার পঞ্চ বাধা নিবৃত্ত হইবে। তখন তিনি "প্রথম ধ্যানে" প্রবেশ করিবেন।

"প্রথম ধ্যান" প্রাপ্তির লক্ষণ হইতেছে এই যে, যিনি উহা লাভ করিয়াছেন তাঁহার সমস্ত শরীরে আনন্দ স্ফুরিত হইবে। সমস্ত কুশল ধর্মে[৯] তিনি আনন্দ পাইবেন এবং বিচিত্র নিগূঢ় রূপ দর্শন করিবেন।

ইহা বুদ্ধমার্গে, ধ্যানের প্রথম দ্বারে প্রবেশ বলিয়া অভিহিত। ইহা পুণ্যের কারণ।

এই চারি প্রকার "অপরিমেয় চিত্ত" লাভ হইলে সমস্ত জীবের প্রতি ক্ষান্তি পারমিতা উৎপন্ন হয়—দ্বেষ থাকে না। ইহা সত্ত্বক্ষান্তি (জীববিষয়ক ক্ষমা বা ধৈর্য) নামে অভিহিত।

"সত্ত্বক্ষান্তি" প্রাপ্তির লক্ষণ হইতেছে এই যে, যদি গঙ্গা-বালুকার ন্যায় অসংখ্য সত্ত্ব (প্রাণী) নানারূপ ক্ষতি করে, তথাপি চিত্তে দ্বেষ উৎপন্ন হইবে না। তাহারা যদি নানারূপ সম্মান দেয়, তথাপি মন আহ্লাদিত হইবে না।

অশুভ ভাবনা পদ্ধতি

রাগ দ্বেষ মোহ হইতেছে মানুষের মহাব্যাধি। ইহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হইলে "অশুভ ভাবনা" করা উচিত।

৭। কুশল—পুণ্য, অকুশল—পাপ। অতীতে সঞ্চিত পাপ কর্মই দ্বেষাদি উৎপত্তির কারণ বা নিমিত্ত। দ্বেষাদি উৎপত্তির কারণ, ঐ পাপ-কর্ম নষ্ট হইলেই দ্বেষাদিও নষ্ট হইবে, সুতরাং শত্রুতা থাকিবে না।

৮। "অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো শত্রু ক্ষমা সিদ্ধির কারণ। তাহার অপকারের অভিপ্রায় না থাকিলে তো ক্ষমার প্রসঙ্গই উঠিত না, অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া, যদি বৈদ্যের মতো তিনি আমার হিত চেষ্টা করিতেন, তবে কি তাঁহার উপর আমার দ্বেষের সম্ভাবনা থাকিত, না, ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত?

"তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই আমার ক্ষমা উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই ক্ষমার কারণ, সদ্ধর্মের ন্যায় তিনিও আমার পূজনীয়।"

মৈত্রী সাধনা, পৃ. ৪৫।

৯। কুশলধর্ম—সদ্গুণ, সৎ মনোবৃত্তি।

'অশুভ ভাবনা'-পদ্ধতি হইতেছে এই যে, আমাদের জানা উচিত এই দেহ অপবিত্র স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আবির্ভূত হইয়াছেও অপবিত্র বস্তু হইতে। এই সূক্ষ্ম চর্মের অন্তর একান্তই অপবিত্র। বহির্ভাগে চারি মহাভূত[১০] আমাদের আহার্য ও পানীয় বস্তু হইয়া অন্তর পূর্ণ করিতেছে।

আমরা যদি আমাদের মন একাগ্র করিয়া ভাবনা করি, চরণ হইতে কেশ এবং কেশ হইতে চরণ পর্যন্ত, এই চর্ম-পুটের (অর্থাৎ দেহের) অন্তরে কোন একটি বস্তুও পবিত্র নহে। অশ্রু, লালা, পুঁষ, রক্ত, মল, প্রস্রাব আদি অপবিত্র বস্তু ইহার মধ্যে রহিয়াছে। সংক্ষেপে বলিলে ৩৬ এবং বিস্তৃত করিয়া বলিলে অপরিমেয়।

শৈক্ষ্য তাঁহার মনশ্চক্ষুর দ্বারা যখন এই দেহের ভাণ্ডার খোলা অবস্থায় দেখিতে পান, তখন দেখেন, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্ মলাশয়, পাকস্থলী আদি বিবিধ প্রকারের জুগুপ্সিত বস্তু উহার মধ্যে রহিয়াছে।

কীট সমূহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আহার করিতেছে। নয়টি বহির্দ্বার হইতে অবিরাম অপবিত্র বস্তু বাহিরে আসিতেছে। চক্ষু হইতে অশ্রু ও পিঁচুটি বাহির হইতেছে। কর্ণ হইতে কর্ণমল, নাসিকা হইতে কফ, মুখ হইতে লালা ও থুথু, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দ্বার হইতে মল ও প্রস্রাব। যদিও বস্ত্র ও খাদ্যের দ্বারা আবৃত ও আচ্ছাদিত, তথাপি বস্তুত ইহা একটি চলন্ত মলাধার। দেহের অবস্থা যখন এমন তখন উহা কেমন করিয়া পবিত্র হইবে!

পুনশ্চ, যদি আমরা এই দেহের ভাবনা করি তাহা হইলে দেখি, মিথ্যাই ইহাকে মানুষ বলা হইয়াছে। চারি-মহাভূত মিলিতভাবে একটি গৃহের ন্যায়। মেরুদণ্ড কড়ির ন্যায়। পঞ্জরসমূহ কড়িধারক বরগার ন্যায়। কঙ্কাল স্তম্ভের ন্যায়। চর্ম চারি প্রাচীরবৎ। মাংস মৃত্তিকার ন্যায়। শূন্য ও অসত্যের কল্পিত সংযোগ—মানুষ কোথায়? ইহা বিনাশী, বিধ্বংসী, ক্ষণভঙ্গুর, অসত্য, মায়া এবং ক্ষণিক!

চরণের অস্থির উপর জানুর অস্থি সংযুক্ত। জানুর অস্থির সহিত কটির অস্থি যুক্ত। কটির অস্থির উপর পৃষ্ঠাস্থি যুক্ত। পৃষ্ঠাস্থি বা মেরুদণ্ডের উপর শিরোস্থি যুক্ত। এক অস্থি অপর অস্থির সহিত যুক্ত। এ যেন স্তূপীকৃত ডিম্বরাশি! ভাবনা ও বিচার করিলে এই দেহে গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই। এইভাবে দেহের প্রতি চিত্তের ঘৃণা হইবে, বিরক্তি জন্মিবে।

সর্বদা ৩৬ প্রকারের অশুভের স্মরণ করিবেন এবং বিচার করিবেন। দেহের ভিতর এইরূপ, বাহিরও তাই, তফাৎ নাই। মন যদি ঘুরিয়া বেড়ায়—জোর করিয়া উহাকে ফিরাইয়া আনিবেন। বিশেষ করিয়া "অশুভ-ভাবনা" করিবেন।

কাহারো যদি দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরাগ জন্মে, তাঁহার উচিত "কঙ্কাল ধ্যানে" প্রবৃত্ত হওয়া। ইহার দ্বারা প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করা যায়।

শ্বেত কঙ্কাল ধ্যান-পদ্ধতি

শ্বেত কঙ্কাল ধ্যান এইরূপ—দেহ হইতে চর্ম, রক্ত, স্নায়ু, মাংস সমস্ত একেবারে নিঃশেষিত। অস্থিই কেবলমাত্র বর্তমান—তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, শঙ্খের ন্যায়—তুষারের ন্যায় শুভ্র এবং উজ্জ্বল।

যদি কেহ এইরূপ না দেখে? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দেখিবে, উদ্যমে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে চিকিৎসক তাহার পরিবারবর্গকে বলেন যে, যদি তাহারা রক্তকে শ্বেত-বর্ণ দুগ্ধ বুঝাইয়া ঐ কুষ্ঠরোগীকে পান করাইতে পারে, তাহা হইলে সে ব্যাধি মুক্ত হইবে।[১১]

তাহার পরিবারে যাহা কিছু আছে সমস্ত শ্বেতবর্ণ করিতে হয়। তাহার পর শুভ্র রজত নির্ম্মিত পাত্রে রক্ত ভরিয়া তাহাকে বলিতে হয়—"দুগ্ধ পান কর। রোগ সারিয়া যাইবে।" রোগী যদি বলে ইহা রক্ত, তবে তাহার উত্তরে বলিতে হয়, "রক্ত নহে—ইহা শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ। তুমি কি দেখিতেছ না, গৃহের সমস্ত বস্তুই শ্বেতবর্ণ। তোমার পাপের জন্যই তুমি রক্ত দেখিতেছ। মন তোমার একাগ্র কর। এবং ভাবো যে ইহা দুগ্ধ। কখনও বলিও না যে ইহা রক্ত!"

সাত দিন এইরূপ করিলে রক্ত দুগ্ধে পরিণত হয়। ইহাও যদি সম্ভব হয়, তবে যাহা যথার্থই শ্বেতবর্ণ, সেই কঙ্কাল কেন শ্বেত দেখা যাইবে না।

চিত্ত যদি শান্ত থাকে, তাহা হইলে চক্ষু মুদ্রিত থাকুক অথবা খোলা থাকুক—কঙ্কাল স্পষ্টই দেখা যাইবে। জল পরিষ্কার ও শান্ত থাকিলে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কর্দমাক্ত হইলে দেখা যায় না। শুষ্ক হইলেও দেখা যায় না।

বুদ্ধের সমাধি-ভাবনা-পদ্ধতি

বুদ্ধ ধর্মরাজ; তিনি নানা প্রকারের কুশলধর্ম মানুষকে লাভ করাইতে পারেন। অতএব ধ্যান অভ্যাসকারী প্রথমে বুদ্ধকে চিন্তা করিবেন। বুদ্ধকে চিন্তা করিলে অপরিমেয় কল্পকৃত পাপরাশিও ক্ষীণ হয়। ধ্যান-সমাধি-

---

১০। ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও মরুৎ।

১১। এইরূপ কোনো চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের দেশে অথবা চীনে পূর্বে ছিল কিনা বা এখনো কোথাও আছে কিনা আমাদের জানা নাই। বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন।

প্রাপ্তি হয়। যদি কেহ একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের চিন্তা করেন, তাহা হইলে বুদ্ধও তাঁহার চিন্তা করেন।

শত্রুগণ ও উত্তমর্ণগণ যেমন রাজার প্রিয় ব্যক্তির (রাজা যাঁহার কথা চিন্তা করেন) নিকটে যাইতে পারে না, অকুশলধর্ম সেইরূপ যাঁহারা বুদ্ধের চিন্তা করেন (এবং বুদ্ধ, যাঁহাদের বিষয় চিন্তা করেন) তাঁহাদের বিরক্ত করিতে আসে না। বুদ্ধের চিন্তা করিলে বুদ্ধ সর্বদা সেখানে থাকেন।

কি ভাবে বুদ্ধের চিন্তা করিবেন? মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে তাহার চক্ষু। যখন কেহ কোনো সুন্দর মূর্তি দেখেন, যাহা যথার্থই বুদ্ধের ন্যায়, তাঁহার উচিত, প্রথমে তিলক স্থান, তাহার পর ভ্রূযুগের মধ্যবর্তী স্থান, নীচে চরণ পর্য্যন্ত, পুনরায় চরণ হইতে তিলক পর্যন্ত, মূর্তির প্রত্যেক অংশ অতি যত্নের সহিত চিত্তে গ্রহণ করত নির্জন স্থানে গমন করা এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, চিত্তকে মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ করত ধ্যান অভ্যাস করা।

অন্য কোনো চিন্তা আসিতে দিবেন না। যদি অন্য কোনো চিন্তা মনে আসে, মনকে সংযত করিবেন। তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিবেন।

এই ভাবে মনশ্চক্ষে ভাবনা করার পর, তাঁহার যেমন ইচ্ছা তেমনি দেখিতে পাইবেন। ইহাকে "মূর্তিধ্যানসমাধি প্রাপ্তি" বলা হয়।

শৈক্ষ্য এইরূপ চিন্তা করিবেন:—"আমি মূর্তির নিকট যাই নাই, মূর্তিও আমার নিকট আসে নাই। আমি ইহা দেখিলাম, ইহার ভাবনায় ও মনের একাগ্রতায়।"

ইহার পর তিনি মূর্তির জীবন্ত দেহই দেখিতে পাইবেন, অবিকল দেখিবেন, মুখোমুখি দেখিবেন।

মানুষের মন ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহাতে অকুশল-ধর্ম-প্রত্যয়ই (অশুভের বীজই) বেশী। ধাত্রীর ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন। প্রতিপালন করিবেন। কূপে, খানায়, বিমার্গে, কুমার্গে স্খলিত হইতে দিবেন না।

চিত্ত অপত্যের ন্যায়। শৈক্ষ্য জননীর ন্যায়। চিত্ত যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, শৈক্ষ্য তাহাকে ভৎর্সনা করিবেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিবেন। তাহারা যেন অতি নিকটেই বর্তমান—এইরূপ মনে করিবেন। কোথাও নিস্তার নাই। স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেও কামে আসক্ত হইতে হয়। সেখানে এমন কোনো কুশলধর্ম নাই—যাহার দ্বারা চিত্তকে সংযত করা যায়। যদি ত্রিবিধ অকুশল মার্গে পতন হয়, তাহা হইলে সর্বদাই দুঃখ ও ভয়। কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় না। এখন যখন তুমি পরমধর্ম লাভ করিতেছ, তখনও কি একাগ্র হইয়া চিন্তাধারাকে সংযত করিবে না?

পুনশ্চ, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। ধর্ম যখন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এমন সময় জন্ম হইয়াছে; সেই ক্ষীণ ধর্মও লুপ্ত হইতে চলিল।

কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বন্দীগণের মুক্তির জন্য দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে। সেই ধ্বনি প্রায় থামিতে চলিল। কারাগারের একটি কপাট ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারামুক্তির এমন সুযোগ কি উপেক্ষা করিবে? এখনও কি বাহির হইবে না?

অস্মরণীয় যুগ হইতে যত জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, সমস্তই সর্ব প্রকার দুঃখে পরিপূর্ণ। যে-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা এখনও সাধিত হয় নাই। অনিত্য মার-দস্যু হইতে এক মুহূর্তের জন্যও রক্ষা পাইবার উপায় নাই। আবার কি অসংখ্য কল্প ধরিয়া, জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ প্রাপ্ত হইতে চাও?

এই ভাবে বহু প্রকারে চিত্তকে ভৎর্সনা করিয়া তাহাকে স্থির, প্রতিষ্ঠিত করিবেন। রূপের (রূপ ধ্যানের) মধ্যে চিত্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষণ এই যে—ভ্রমণে, শয়নে, উপবেশনে, সর্বদা বুদ্ধের দর্শন লাভ হইবে। ইহার পর অধিকতর অগ্রসর হইবেন।

বুদ্ধের সংভোগকায় দর্শন ও ধর্মকায় দর্শন

প্রথম দর্শন লাভ হইলে ইহা সহজ হয়। সংভোগকায়[১২] দর্শন হইতেছে এই যে, যখন মূর্তিদর্শন লাভ হইয়াছে, অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে, যখন শৈক্ষ্য তাঁহার চিন্তাসমূহকে সংযত করিয়া সমাধিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তিনি সংভোগকায় দর্শন করিবেন। তিনি তখন সেই (পূর্বের) মূর্তিকে অবলম্বন করিয়া "সংভোগকায়ে"র ভাবনা করিবেন। তিনি দেখিবেন—বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আছেন, জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে, আকৃতি তাঁহার সুন্দর, অলৌকিক! অথবা তিনি দেখিবেন—বুদ্ধ মৃগদাবে বসিয়া পঞ্চভিক্ষুকে চতুরার্য সত্যের[১৩] উপদেশ দিতেছেন। কিংবা দেখিবেন—গৃধ্রকূট পর্বতে মহাজ্যোতির্ময় বুদ্ধ মহাসংঘকে প্রজ্ঞাপারমিতার উপদেশ দিতেছেন। এইরূপে নিজ রুচি অনুযায়ী যে-কোনো একটি স্থানের বুদ্ধকে বাছিয়া লইবেন। ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে চিন্তাধারাকে বদ্ধ করিবেন। অন্য কোনো বাহ্য চিন্তাবৈচিত্র্য আসিতে দিবেন না।

চিত্ত যদি এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধকে দর্শন করিবেন, উহা কতক গ্রীষ্মে শীতল হ্রদে এবং শীতে উষ্ণগৃহে প্রবেশের ন্যায়। তবে উহার সহিত সংসারের সুখের তুলনাই হয় না।

ধর্মকায় দর্শন পদ্ধতি

যখন বুদ্ধের সংভোগকায়ের দর্শন লাভ হইবে, তখন সেই

১২। বুদ্ধ, ধর্মসংভোগের জন্য যে দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই "সংভোগকায়"।

১৩। চতুর্ আর্য সত্য—(১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ, (৩) দুঃখের নিরোধ, (৪) দুঃখ নিরোধের পথ।

সংভোগকায় অবলম্বন করিয়া, আভ্যন্তরিক "ধর্মকায়"[১৪] দেখিবেন। ধর্মকায় হইতেছে—দশ বল, চতুর্ অভয়, মহামৈত্রী, মহাকরুণা, অপরিমেয় কুশলকর্ম। যেমন কোনো ব্যক্তি প্রথমে সোনার বোতল দর্শন করে, এবং তাহার পর তাহার মধ্যস্থিত মণিসমূহকে দেখে—সেইরূপ সংভোগকায় দর্শনের পর, ধর্মকায়ের দর্শনলাভ হয়।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ শ্লাঘ্য জ্ঞান অনুপম নিরুত্তর। দূরে হউক নিকটে হউক, সহজ হউক কঠিন হউক, অসীম জগতের সমস্তই যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে। এক জনও তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে নাই। সকল পদার্থ তিনি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। তিনিই মানবকে নানাপ্রকারের নানাজাতীয় আনন্দ দান করিতে সমর্থ! মানবীয় আনন্দ, দৈবী আনন্দ নির্বাণের আনন্দ, সমস্তই তিনি দান করেন। সর্ব যুগের সর্ব বুদ্ধ সর্ব জীবের জন্য তাঁহাদের দেহ ও প্রাণ বিসর্জন দেন।

শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন রাজকুমার ছিলেন, তখন তিনি এক দিন ভ্রমণকালে পথিমধ্যে এক কুষ্ঠরোগীকে দেখেন। তিনি উহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য বৈদ্যকে আদেশ দেন। বৈদ্য বলেন, "যদি উহাকে দ্বেষহীন ব্যক্তির রক্ত পান করিতে দেওয়া হয় এবং সেই ব্যক্তির মজ্জা যদি উহার দেহে প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হয়।"

রাজকুমার ভাবিলেন, এইরূপ ব্যক্তি পাওয়াই কঠিন এবং যদি বা পাওয়া যায় এইরূপ কাজে তাহাকে লাগান যায় না। তখন তিনি তাঁহার নিজ দেহ দিয়া ঐ কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য বৈদ্যকে আদেশ দেন।

সমস্ত জীবের প্রতি বুদ্ধের এইরূপ স্নেহ। এই স্নেহ অতি গভীর—পিতামাতার স্নেহকেও ইহা অতিক্রম করিয়াছে।

জগতের অসংখ্য জীবের মাত্র একজন হইলেন বুদ্ধ। সমস্ত জীবজগতের তিনি এক অংশ মাত্র। জগতের সমস্ত জীবই যদি আপনার পিতামাতা হইতেন, তথাপি সেই সমস্তকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বুদ্ধের ভাবনা করাই আপনার কর্তব্য হইত। তাঁহার স্নেহ এমনি গভীর।

বুদ্ধের এই বিচিত্র গুণরাশি, আপনি যাহা ভাবনা করিতে চান, তাহাই ভাবনা করাইবে। যদি এই সমাধি সাধন করেন, তাহা হইলে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইবে।

দশদিকস্থ বুদ্ধদর্শন-পদ্ধতি

দশ দিকের বুদ্ধগণের ভাবনা এইরূপ :—

পূর্বমুখে উপবেশন করুন। পূর্ব দিক যাহা পরিষ্কার, শুভ্র, আলোকোজ্জ্বল যেখানে কোন পর্বত নদী, এমন কি সামান্য প্রস্তরখণ্ড পর্যন্ত নাই—সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে কেবল একটি মাত্র বুদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় অনবদ্য রূপ মানস চক্ষে এই রূপ দর্শন করুন। আপনার সমস্ত ভাবধারা ঐ বুদ্ধের মধ্যে আবদ্ধ করুন। অন্য কোনো বিষয়বস্তু চিত্তে আসিতে দিবেন না, চিত্ত যদি অন্য কোনো বিষয় আহরণ করিতে চায় তাহাকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করিবেন।

যখন ইহার দর্শন লাভ হইবে, তখন এইরূপ একটির স্থানে দশটি বুদ্ধের ভাবনা করুন। উহা দর্শন হইলে শত সহস্র। অবশেষে সংখ্যাতীত বুদ্ধের ভাবনা করুন। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সংখ্যাতীত বুদ্ধের দ্বারা সেই উন্মুক্ত প্রান্তর পূর্ণ হইয়া যাইবে। সমীপে স্থান-সংকীর্ণতা হেতু বুদ্ধগণ পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু দূরে স্থানের প্রশস্ততা হেতু বুদ্ধগণ পরস্পর হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। যাহা হউক, বুদ্ধগণের দেহজ্যোতি পরস্পর সংলগ্ন দেখিবেন।

মনশ্চক্ষে যখন এইভাবে দর্শনলাভ করিবেন, তখন পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মুখ পরিবর্তন করিয়া পুনরায় সেইভাবে দর্শন করুন। তাহা হইয়া গেলে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। তাহার পর পশ্চিমে। তাহার পর উত্তর-পশ্চিম কোণে। তাহার পর উত্তর দিকে। তাহার পর উত্তর পূর্ব কোণে। ক্রমে ঊর্ধ্ব এবং অধোদিকে। যখন পূর্ব দিক হইতে আরম্ভ করিয়া এই ভাবে সর্ব দিকের সর্ব বুদ্ধের দর্শনলাভ হইয়া যাইবে, তখন ঋজুভাবে বসিয়া একবার সাধারণ ভাবে সর্ব দিকের সর্ব বুদ্ধকে দর্শন করিবেন।

এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে চিন্তা করিবামাত্র সর্ব দিকের সর্ব বুদ্ধের দর্শনলাভ হইবে। ইহার জন্য কোনো বিশেষ দিকে বসিতে হইবে না।

যাঁহারা ঐ সমাধি লাভ করেন, তাঁহাদের ঐ সমাধির মধ্যে দশ দিকের সমস্ত বুদ্ধ তাঁহাদের জন্য ধর্মোপদেশ দান করেন। তখন সংশয়-মেঘজাল দূরীভূত হয়।

পূর্বকৃত পাপবশত যদি কেহ বুদ্ধগণের দর্শন লাভ না করেন, তাহা হইলে দিবা ও রাত্রির মধ্যে ছয় বার বুদ্ধগণের নিকট তিনি নিজ পাপ নিবেদন করুন এবং প্রতিজ্ঞা করুন যে আর কখনও তাহা করিবেন না। নিজের এবং অন্যের কুশলধর্মে তিনি আনন্দ লাভ করুন। দশ দিকের বুদ্ধগণকে তিনি পৃথিবীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতে অনুনয় করুন। ইহা করিলে ক্রমে ক্রমে তিনি (বুদ্ধগণের) দর্শন লাভ করিবেন। যদি বা বুদ্ধগণ তখন তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দান না করেন, তখন চিত্ত তাঁহার প্রসন্ন হইবে। ইহা "দশদিকস্থিত বুদ্ধদর্শন" বলিয়া অভিহিত।

১৪। বুদ্ধের অপরিমেয় গুণরাশিই তাঁহার "ধর্মকায়" বলিয়া অভিহিত।

সুইডেনের বনসম্পদ

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

ইউরোপের উত্তর দেশসমূহ বৃহৎ বন, কাঠ ও কাঠ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। স্কাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের মধ্য অংশ, তথা সুইডেন দেশটি দিগন্তবিস্তৃত বন, বনজ ও কাঠজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী। ইহার প্রতিবেশী ফিনল্যাণ্ড দেশ বনজ সম্পদের দিক দিয়া ইউরোপের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সুইডেনের কৃষি-প্রধান দক্ষিণস্থ স্কোনে প্রদেশের পত্রবহুল আবাদী বৃক্ষের মুষ্টিমেয় বন ব্যতীত বড় বড় অরণ্যানীগুলি যুগযুগান্তর ধরিয়া স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর সহায়তায় লালিত পালিত হইয়া আসিতেছে এবং ইহারাই বনদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। বনবিভাগ দেশের রাষ্ট্রকোষে প্রচুর ধন যোগায়। কোমল কাষ্ঠ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত দেশসমূহের মধ্যে সুইডেন শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ দেশের নদনদীর অবস্থান ও জলবায়ু কোমল বনবৃক্ষের বৃদ্ধির সহায়ক। বহুসংখ্যক নদনদী উত্তর-পশ্চিমস্থ তুষারমণ্ডিত উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে গভীর খাদ কাটিয়া বোথ্নিয়ান উপসাগরে পতিত হইতেছে। এই নদনদীগুলির সমবেত দৈর্ঘ্য ১৮,০০০ হাজার মাইল হইবে, অর্থাৎ বিষুব-রেখার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। উচ্চ ভূমিজাত বড় বড় বন হইতে কাটা গাছ সরবরাহের পক্ষে এই নদনদীগুলি বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বর্গগজ কাঠ এই ভাবে নদীর স্রোতের সহায়তায় এবং দশ লক্ষ ঘন বর্গগজ কাঠ ট্রেনে প্রতি বৎসর চালান দেওয়া হয়। স্রোতঃশীলা নদীর শীতল জলে কাঠের বহু রোগ ও দোষ নষ্ট হইয়া যায়; কাঠ ফাটিয়া যাওয়া বা সঙ্কুচিত হওয়ার কারণও অনেকটা দূরীভূত হয়। স্বভাবজাত বৃহৎ বনগুলি জাতীয় আয়ের যেমন একটা অবিশ্রান্ত উৎস, তেমনি বনবিভাগ বহু লোকের জীবিকার্জ্জনের পথ করিয়া দেয়।

বন-বিভাগ হইতে রাজকোষে অর্থাগম ভিন্নও বন ও বন-কোলে অবস্থিত পত্রপুষ্পজগৎ এই জাতির স্বভাব ও চরিত্র গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। একজন বিখ্যাত সুইডিস লেখক বলিয়াছেন—"ধ্যানগম্ভীর পাইন বনের মর্ম্মর ধ্বনি ও সুবাসিত হাওয়ার গুঞ্জনে দেশের প্রতি অধিবাসী অন্তরের আহ্বান শুনিতে পায়। ইহা তাহার বাল্য জীবনের মধুময় স্মৃতিগুলিকে পুনরুদ্দীপিত করে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ যুগ যুগ ধরিয়া যে সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন পাইন বনের গুঞ্জনে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।" এই বনজ সম্পদ দেশের কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর ও বহু বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা ও প্রেরণা জাগাইয়াছে। এই বনানীই মনীষী কার্ল ফন লিন্নের (Carl Von Linne) বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের কাজ করিয়াছিল।

ভূতত্ত্ববিদদের মতে বর্ত্তমান গ্রীনল্যাণ্ডের ন্যায় অতীত তুষার-যুগে স্কাণ্ডিনেভিয়ার ভূমিখণ্ডও তুষারে আবৃত থাকায় সুদূর অতীতেও পত্রপুষ্প ও প্রাণীবিহীন ছিল। সময়ের ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, খণ্ডাকারে তুষার-পর্ব্বতগুলি আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া ঐ দেশকে অনাবৃত করে, ধীরে ধীরে দেশটিও বাসোপযোগী হইতে থাকে।

আবহাওয়ার এই বিপুল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা-জাতীয় বৃক্ষলতা ও পত্রপুষ্প দেশের ভূমিতে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে, প্রাণীরও আবির্ভাব হয়। আজকাল দেশে যে সকল উদ্ভিদ পাওয়া যায় ইহার অধিকাংশই দেশের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথম যুগের গাছ-পালা ক্রমশঃ উত্তরগতি লইয়া এখন সুমেরু-রেখা (Polar Line) অতিক্রম করিয়া মেরুপ্রান্তের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে শিকড় গাড়িয়াছে। ক্রমশঃ অনেক পত্রবাহী গাছ-গাছড়া ও পাইন দেশে আবির্ভূত হয়। কিন্তু দেশের বড় সম্পদ 'স্প্রুস' বনানী ফিনল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়া অর্থাৎ দেশের পূর্ব্ব দ্বার অতিক্রম করিয়া দেশে শিকড় গাড়িয়াছে। সর্ব্বশেষ যে-সকল বৃক্ষ দেশে আবির্ভূত হয় তাহাদের সংখ্যা অনেক; তাহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বীচ। স্কাণ্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপের পূর্ব্বদিকস্থ বৃহত্তম অংশটি হইল সুইডেন, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে দেশটি ১১৫০ মাইল। উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত দেশের এরূপ বিস্তৃতির ফলে জলবায়ুর পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে বৃক্ষজগৎও প্রদেশবিশেষে বিভিন্ন রূপ লইয়াছে। ফলতঃ এই নৈসর্গিক প্রভেদ দেশের উদ্ভিদ-জগৎকেও কতকগুলি স্বাভাবিক প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছে। যে-কোন বিদেশী পর্য্যটক ভ্রমণকালে এই বিভিন্নতা আপনা হইতেই লক্ষ্য করিতে পারেন। উদ্ভিদ প্রদেশগুলির বিভাগ এইরূপ :—

(ক) আলপাইন প্রদেশ, (খ) বার্চ্চ বন-প্রদেশ, (গ) কনিফেরাস প্রদেশ। ইহা আবার দক্ষিণ ও উত্তর দুই

ভাগে বিভক্ত। (ঘ) সর্ব্বশেষ দেশের দক্ষিণস্থ বীচ বন-প্রদেশ।

আলপাইন প্রদেশটি উত্তর ও সর্ব্বোচ্চ ভূভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের মধ্যবর্ত্তী ডালাকার্লিয়া প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত বন-প্রদেশের শীত-প্রধান পার্ব্বত্য জলবায়ু গাছপালা বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু পর্ব্বতকোলের সমভূমিগুলি ও সেখানকার বনপুষ্পলতাদি এই বন-প্রদেশের একটি বিশেষত্ব। উক্ত আলপাইন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আমি প্রায় সকল ঋতুতেই পরিভ্রমণ করিয়াছি। শীতকালে শ্বেতশুভ্র বরফ পুরু গালিচার মত সমস্ত বনভূমির উপর একটা আবরণ টানিয়া দেয়। সেইজন্য তখন এই প্রদেশে দেখিবার কিছুই থাকে না। বসন্তকালে সূর্য্যরশ্মি গ্রীষ্মের আগমনবার্ত্তা লইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আলপাইন সমভূমিগুলি নিজের রূপ লইয়া হঠাৎ শীততন্দ্রাবেশ কাটাইয়া পত্রপুষ্পে সূর্য্যালোককে অভিনন্দিত করে। তখন বরফ গলিয়া গর্ত্তবহুল সমভূমির স্থান বিশেষে জলাধিক্য হয় বলিয়া জলীয় পত্রপুষ্পও গজাইয়া উঠে; এক বার মে মাসে সুমেরুবৃত্ত হইতে প্রায় তিন শত মাইল উত্তরে নরওয়ে-সুইডেনের সীমান্তে গিয়াছিলাম। ফলতঃ সেখানকার বিশাল বিস্তৃতির বসন্ত-সৌন্দর্য্য সেখানকার সভ্যতা হইতেও বেশী হৃদয়গ্রাহী। সেখানকার বহু দৃশ্য আজও আমার হৃদয়পটে নিবদ্ধ। সেখানে কতকগুলি চির-তুষার খণ্ড রহিয়াছে; ইহাদের চারিদিক, ঢালু ভূমি, জলা ভূমি আবার কখনো পার্ব্বত্য বিশাল তর্ণে হ্রদের তীরে বামন জাতীয় বার্চ্চ বনাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। বামন জাতীয় বার্চ্চ গাছ সেই অঞ্চলের বিশেষ সম্পদ। এই বার্চ্চ বন-মধ্যে যে মাসে প্রকৃতিদেবী সবুজ ঘাস (Lichen) ও নানাজাতীয় বিভিন্ন রঙের শৈবালে গালিচা রচনা করিয়া বনভূমির উপর যেন বিছাইয়া দেন। ইহার উপর সেই প্রদেশের আদিম বাসিন্দা ল্যাপরা নিজেদের হস্ত-নির্ম্মিত লাল নীল পোষাক ও রঙীন টুপী পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পার্ব্বত্য সমভূমির উপর তাহাদের বন্য হরিণগুলিকে চরিতে দেয়।

তর্ণে হ্রদের তীরে নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশের নদীর পাশে কখনও ভোরবেলা উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। সেখানে কত রকম ফুলের বাহার; মে মাসের রবিচ্ছটা নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে পত্রপুষ্পকে যেন আরও আলোকিত করে। সেখানে আমার সেদেশীয় ফুলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। ডিয়াপেনসিয়া লাপ্লোনিকা (Diapensia Lapponica), Mountain bride অর্থাৎ গিরি-বধূ, 'সিলেনে আকুলিস (Silene Aculis), রোডেনড্রন লাপ্পনিকুম (Rhodendron Lapponicum), কাসিয়োপে তেত্রাগোনা (Casiope-tetragone), লাল, ফিকে হলদে রান্থন কুলি (Raunun culi) প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ফুলের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম।

আলপাইন প্রদেশের উচ্চ অংশে পত্রপুষ্পের সংখ্যা কম। কিন্তু নিম্নদিকটা বিচিত্র পুষ্পগন্ধে সমৃদ্ধিশালী। একটানা আলপাইন সমভূমির রূপে স্থানে স্থানে বাধা পড়িয়াছে পত্রপুষ্পের বিচিত্রতায়। নদনদীগুলি ও ছোট-বড় হ্রদতীরের উপর ভূমিজাত ফুল-পত্রও বিচিত্রতা দান করিয়াছে। উচ্চ আলপাইন সমভূমিকে ডিয়াস ফরমেসন (Dyras Formation) বলা হয়। এরূপ স্থানের বিশেষত্ব এই যে, ইহার অগণিত আলপাইন আনেমন ফুল ও তদ্ভিন্ন সবুজ তৃণ ঘাসে পূর্ণ থাকে। এখানে সেখানে ডিয়াসকে অবর্ণনীয় শোভা দান করিয়াছে নীল, সাদা, হলদে রঙের সাক্‌সিফ্রাগ‌স্ (Saxifrages), বেগুনি লেগমিনজি (Leguminugi), হলদে ফিকে লাল রঙের রান্থন কুলি গাঢ় নীল। জেনসিয়ান (Gentian) জাতীয় পুষ্পসকল ঐ সকল স্থানকে অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করিয়া অবর্ণনীয় করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি কতকগুলি লিচেন (Lichen) পাহাড়ের দিকে ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থায় চির তুষার-স্তবকের কিনারা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। ল্যাপল্যাণ্ডের নিম্নাংশে যে-সকল ফুল দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের মধ্যে জুনিপেরাসই (Juniperus Communis) অন্যান্য প্রদেশেও জন্মিয়া থাকে। সমগ্র ল্যাপল্যাণ্ডের আয়তন ৬০,০০০,০০ ষাট লক্ষ হেক্টর বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। উত্তর ল্যাপল্যাণ্ডে বৃক্ষবনের সীমানা আলপাইন বন-প্রদেশের ৫০০ শত মিটার (সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে) উপর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। আর ডালাকার্লিয়া প্রদেশে ইহা প্রায় ৯৫০ ফুট পর্য্যন্ত।

আলপাইন প্রদেশের নিম্নভূমির জলবায়ু বন-বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। শীতের বৃষ্টি ও শীতের বরফ উক্ত ভূমিকে জলসিক্ত ও শুষ্ক, উষ্ণ গ্রীষ্ম ঋতুতেও ফল-ফুলের বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে। সেখানকার গড়পড়তা উত্তাপ ৬৬° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত।

আলপাইন প্রদেশের নিম্নে বার্চ্চ বনরাজি চক্রাকারে নগ্ন আলপ্সের কোমর-বন্ধনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উত্তর প্রান্তস্থ বার্চ্চ বনানীর বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উত্তরে অবস্থিত বার্চ্চ বনানীর নিম্নাংশও সমুদ্র হইতে ৪০০ হইতে ৯০০ মিটার ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

বার্চ্চ বনগুলি সকল স্থলে খুব ঘন হইয়া জন্মায় না। রোয়েন আস্পেন প্রভৃতি গাছ অনেক সময় বার্চ্চ-বনে জন্মিয়া থাকে। বার্চ্চ-বনের কোন কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত শস্যাদি জন্মে, বিশেষতঃ যে-সকল জমি জল ও উর্ব্বরা-শক্তিতে শক্তিশালী।

সেইখানে গ্রীষ্ম ঋতুতে হুর্টেল (Whortle) রেড

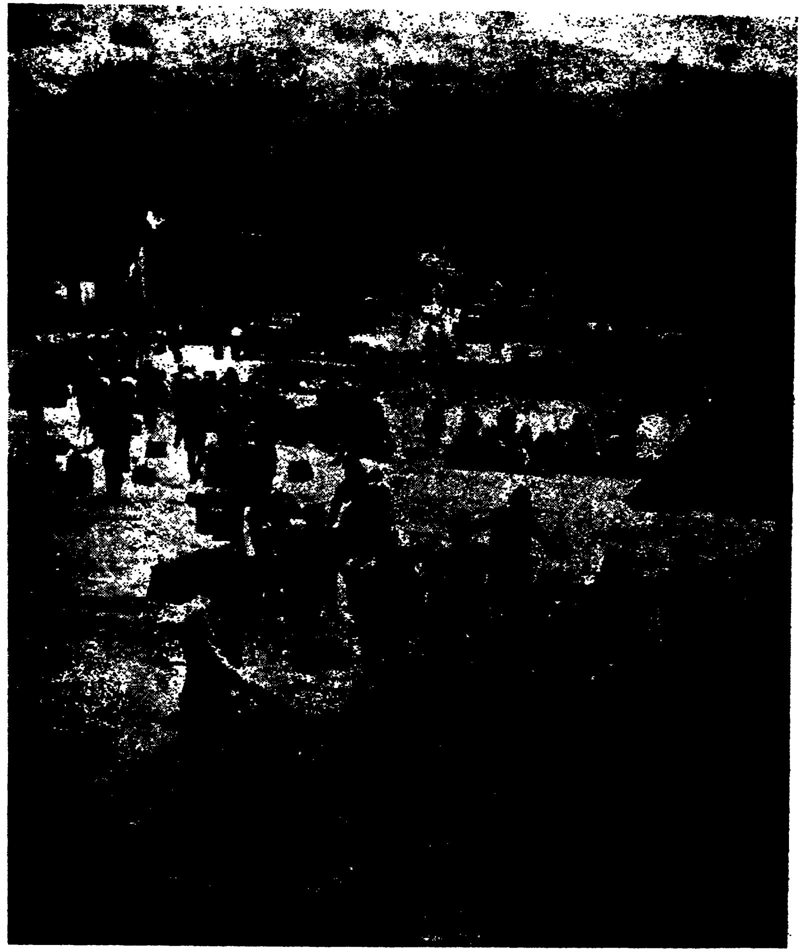




সুইডেনের বনসম্পদ। উপরে—বনানীমণ্ডিত পাহাড়ের কোলে অবস্থিত হ্রদে প্রস্ফুটিত জলপদ্ম
নীচে—ডালাকার্লিয়ার সূচীকেআকার বনের দৃশ্য



সামরিক প্রয়োজনে নির্মিত একটি সেতুর উপর দিয়া চীনা এবং মার্কিন-বাহিনীর মগাউং নদী অতিক্রমণ



জেনারেল ষ্টিলওয়েলের উত্তর-ব্রহ্মস্থ চীনা-বাহিনীতে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে চীনা-সৈন্যদলের বর্মা-রোড অতিবাহন করিয়া সালউইন নদীর দিকে অগ্রগতি

কারেন্ট ইত্যাদি লিকেন ও শেওলার পুরু পরদা ভেদ করিয়া প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

বার্চ-বনের পরেই কনিফেরাস বন। ইহা দিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তর অধিকার করিয়া গভীর অরণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে যে-ছবিটি দেওয়া হইল ইহা ডালেলবেন নদীর উপত্যকার বিশাল কনিফেরাস বন-ভূমির একটি দৃশ্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এইগুলি দেশকে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। (ফটোটি জুয়ম রুক পাহাড় হইতে তোলা হইয়াছিল।) এই প্রদেশের নদ-নদী, জলাভূমি ও হ্রদগুলি একঘেয়ে বনের দৃশ্যকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

কনিফেরাস বন সাধারণ ঝাউ জাতীয় (Pine—ইহাও আবার অনেক প্রকার)* গাছ ও স্প্রুস গাছের সমষ্টি। এবং অল্পস্বল্প অন্যান্য গাছও যেমন আসপেন, রোহান, চেরি (বার্ড চেরি ও কমন চেরি), কুঞ্চিত বার্চ ইত্যাদি বর্ষাধিক গাছেরও সমাবেশ এখানে-সেখানে হইয়াছে। কনিফেরাস বনের তৃণগুল্মাদির সংখ্যা অধিক নহে। লিকেন ও শেওলা ঘাস হইতে অধিক হয়। আর ইহাদিগকে ভেদ করিয়া যে-সকল ফলফুল স্থান পাইয়াছে ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরভিত আমও অপূর্ব্ব লিনিয়া (বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ লিন্নের নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে) নানা প্রকার পাইরোলা ও লাইকোপোডিয়াম এবং গাছগাছড়ার মধ্যে বগমস স্ফাগনাম (bogmoss-Sphnum), বিয়ার মস পলিট্রিকম কমুনে (Bear moss—Poly trichum commune), সেজ কারেক্স গ্লোবিউলারিজ (Sedge—Carex globularis), হর্স-টেল ইকুইসেটাম সিলবেটিকাম (Horsetail-Equisetum Silvaticum) ও ক্লাউড বেরি রুবাস চামিমরাস (Cloud-berry—Rubus chamaemorus) ইত্যাদি।

দক্ষিণ কনিফেরাস বনের প্রধান বৃক্ষ ওক। এই বনে এল্ম (Almus—montomus), স্বাক্‌ল (Secr-plantanoides), লিণ্ডেন (Liaulmifolia) ইত্যাদিও জন্মিয়া থাকে। এই বনপ্রদেশের কোথাও কোথাও শুধু ঝাউয়ের গাছ, কোথাও শুধু স্প্রুসের গাছ, আবার কোথায় দুইয়ের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সব কারণে এই সকল তারতম্য হইয়া থাকে তাহার কারণও জানা গিয়াছে—কিন্তু এখানে সেই আলোচনা সম্ভব নহে।

কনিফেরাস বনের পরেই দেশের দক্ষিণস্থ সমভূমিজাত বীচ বন। এই অঞ্চল উর্ব্বরা এবং কৃষি ও তরকারীর জন্য বিখ্যাত। অবারিত তরঙ্গায়িত শ্যামল প্রান্তর বীচ বনের দ্বারা মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত হইয়াছে, দৃশ্যপটে বিচিত্রতা দিয়াছে। বীচ বনাঞ্চল কর্ষিত ক্ষেত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পত্রবাহী বৃক্ষ যেমন ডালওয়ালা ওক, ডালশূন্য ওক বীচ বনের অংশবিশেষ। বসন্তের প্রারম্ভে বীচ বনে কচি সবুজ পাতা মুকুলিত হইবার পূর্ব্বে অগণিত আনেমন এই অঞ্চলকে বিচিত্র করিয়া তুলে। অন্যান্য ফুলও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইয়েলো রুট এবং মাস উড্রাপ। ইহারা বসন্তের আগমনবার্ত্তা জানাইয়াই গ্রীষ্মকালে আবার অদৃশ্য হইয়া যায়।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল গাছপালা জন্মিয়া থাকে ইহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন। উত্তর ইউরোপে ফল-ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান দুইটি—যথা, গথল্যাণ্ড ও ওল্যাণ্ড দ্বীপ। এই দুইটি দ্বীপ দুর্লভ ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ। এই ফুলগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভায়োলা এলাটিওর (viola elatior), অনোপোরডাম একান্থিয়ম (Onopordum—acanthium) ও রেনান কুলাস স্কিলেরাটাস ইত্যাদি।

১৯২৭ সালে প্রথম উপশালা শহরের নিকটে অবস্থিত হাম্মারবি নামক গ্রামে মনীষী লিন্নের বাড়ী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। লিন্নেকে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভিন্ন আমি তখন তাঁহার সম্বন্ধে অল্পই জানিতাম। উত্তর-ইউরোপ ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে ১৯৩৬ সালের মে মাসে আবার লিন্নের বাড়ী যাই। লিন্নে ছিলেন একজন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক আর মানুষ হিসাবে এক মহান্ পুরুষ। একটি অতি সাধারণ বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। ইহার একটি কামরা এখন মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে। অপরটিতে তাঁহার ছোট টেবিলটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহার উপর রহিয়াছে তাঁহার ব্যবহৃত দোয়াত ও কলম। এই মহাপুরুষের জীবনী পড়িয়া আমার বার বারই মনে হইত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক মহাজনদের চিন্তাসূত্র চিরকালই একসূত্রে গাঁথা নয় কি? লিন্নে প্রকৃতির গবেষণাগারে বসিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন:—আমি প্রকৃতির সর্ব্ব ক্ষেত্রেই তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াছি এবং সর্ব্বত্রই সেই অসীম জ্ঞানবান ও শক্তিমানের পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে কিরূপে সমগ্র প্রাণিজগৎ ও গাছপালা জীবন পাইতেছে, জীবন-দাতা সূর্য্যদেবের চতুর্দ্দিকে ভূমণ্ডল দিবারাত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। যদি কেহ তাঁহাকে ভাগ্যদাতা বলিয়া জানে তবে ইহাতে কোন অসংলগ্নতা নাই। কারণ এ জগতে সমস্ত বস্তুই তাঁহার হস্তের পুত্তলি। কেহ যদি তাঁহাকে প্রকৃতি বলিয়া জানে, তবে তাহাতে কোন ভুলের কারণ থাকিতে পারে না। কারণ প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার নিকট হইতে আসে। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বা রক্ষাকর্ত্তা মনে করিলে ঠিকই করা হয়। কারণ তাঁহার ইচ্ছায়ই তাঁহার সৃষ্টি পরিচালিত ও রক্ষিত হইতেছে।

আমি যখন লিন্নের দেশের পর্ব্বত ও বনাঞ্চলে নিজের ভ্রাম্যমাণ জীবনের কথা স্মরণ করি তখনই সেই মহাপুরুষের অক্ষয় বাণী আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়।

নীতি-কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্তত মিনিট দশেক বাড়ির ছেলেমেয়েদের ধর্মগ্রন্থ হইতে কিছু পড়িয়া শোনানো অথবা সৎ উপদেশ দেওয়া আমার অভ্যাস। গৃহিণীর কাছে এই নীতি-প্রচার মূল্যহীন; ছেলেমেয়েরাও যে খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনে—তাহা নহে, তবু নীতি-কথার মধ্যে গল্পাংশ তাহাদের ভাল লাগে। ভাল ছেলে-মেয়ে হইবার লোভ এবং লজেঞ্জ, বিস্কুট প্রভৃতির উপহারও এ বিষয়ে আমাকে খানিকটা সাহায্য করে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পড়িতেছিলাম। দরিদ্রের মধ্যে কি ভাবে নারায়ণকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন···দুয়ারের গোড়ায় কে মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, আজ দু'দিন খাই নি, মা, কিছু প্রসাদ দেবেন।

ছেলেমেয়েরা ভিখারী দেখিতে ছুটিয়া বাহিরে গেল।

প্রসাদ! বত্রিশ টাকা মণ চাউলের প্রসাদ বিতরণ করা আমার মত অল্প আয়ের সাধারণ গৃহস্থের সাধ্যে কুলায় কি? পঞ্চাশের বিভীষিকা বাংলা দেশকে রীতিমত আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঘরের সঙ্গে পথের ব্যবধান ঘুচিয়াছে; সে প্লাবনে গ্রামস্থ সমাজ ভাসিতেছে, আচার-বিচারের নিষ্ঠা শিথিল হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার মুখে। মানুষ পতঙ্গের মত এই দুর্যোগের সুযোগে পাখা মেলিয়াছে—আয়ুর চিহ্নিত রেখায়—তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বদ্ধ। দেখিয়া সাবধান হইবার কথা কে ভুলিতে পারে? অন্তত আমার মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা ত নহে।

মেয়েদের মন স্বভাবতই নরম। যতক্ষণ ঘরে এক কণা ক্ষুদ থাকিবে—ততক্ষণ দয়া বৃত্তিকে ফল্গুধারার মত বহন করিবেই। বইখানা বন্ধ করিয়া গৃহিণীকে কিছু সদুপদেশ দিলাম।

তিনি উপেক্ষা ভরে কহিলেন, যে আনছে নিচ্ছে সেই বুঝুক, আমার কি?

ভিখারীর উদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলাম, ওগো, হাত জোড়া—এখন ভিক্ষে হবে না।

চাল নিয়ে কি করব বাবা, দু'টি প্রসাদ দিও।

আব্দার মন্দ নহে! রুক্ষ কণ্ঠে বলিলাম, প্রসাদ কি এই তিন প্রাতঃকালে নিয়ে বসে আছি! সেই যার নাম বেলা দু'টো।

তবে তোমাদের কাঁঠাল গাছের ছেঁয়ায় একটু বসি বাবা।

কি সর্ব্বনাশ! তাড়াতাড়ি কহিলাম, ওগো—বলছি হবে না, তবু কেন দিক্ কর। আরও পাঁচ বাড়ি তো আছে—চেষ্টা দেখ না।

সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, চলবার ক্ষ্যামতাও নেই। পেটভরা চাই না বাবা, এক মুঠো।

হাঁ—এক মুঠোতে মানুষের পেট ভরে! যত সব—

কিন্তু আমার বিরক্তিতে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। দরজার বাহিরে এক টুকরা জমিতে একটা পত্রবহুল কাঁঠাল গাছ ছিল—তাহারই ছায়ায় শুইয়া পড়িল।

স্ত্রীলোক। শুষ্ক-শীর্ণ বিবর্ণ দেহ। সত্যই কি ইহার গৃহ ছিল? এ রূপে আকৃষ্ট হইয়া কোন পুরুষ কোন দিন গৃহ বাঁধিবার কল্পনা করিয়াছিল কি করিয়া—কে জানে। আমার বাড়ির কুকুরীটা উচ্ছিষ্ট খাইয়া যে যৌবন-শ্যামলতা লাভ করিয়াছে··· মানুষকে দেখিয়া করুণা হয়, এবং ঘৃণাও জাগে। এক বার ওই গৃহহারা—স্বামীপুত্রহারা অনাথিনীর জন্ম মনটা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে, পরক্ষণেই দারুণ বিতৃষ্ণায় ওদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেছি। মরণের আমন্ত্রণ ও এখনও অগ্রাহ্য করিয়া আছে কেন? ওর ধূলিরুক্ষ জটাজালে—কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষুতে—গণ্ডাস্থিপ্রকটিত মুখমণ্ডলে যে ইঙ্গিত পরিস্ফুট—তাহা কি ও বুঝিতেছে না? স্বীকার করিলাম, নম্র স্বভাবের মেয়েরা সবকিছু শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া যায়, কিন্তু আত্মমর্য্যাদার কত নিম্ন স্তরে নামিলেও সেই সহনশীলতার ব্যত্যয় ঘটে না। মর্য্যাদা বা মান অপমান বুঝি গৃহের চারিটি দেওয়ালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, বুভুক্ষু পৃথিবীর বহিরাঙ্গনে তা অকিঞ্চিৎকর।

বেশিক্ষণ ভাবিতে পারিলাম না, ছোট ছেলে একটা বোতল হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, বাবা, শা'দের দোকানে কেরাসিন তেল দেবে আজ, আনব?

নিশ্চয়। কত করে দিচ্ছে রে?

চার পয়সার।

মোটে! তাহ'লে তুই একলা গিয়ে কি করবি। মণ্টু, পুঁটি, খেঁদি, পটলা সবাইকে নিয়ে যা।

ছোট ছেলে নাকি সুরে বলিল, বড়দা বললে এখন মাষ্টার-বাড়ি যাবে।

দুত্তোর মাষ্টার-বাড়ি! আগে তেল না আগে পড়া? বলি তেল না থাকলে আলো জ্বলবে কি আমার মাথা দিয়ে?

আমার ক্রোধ দেখিয়া ছেলেটি প্রথমত থতমত খাইয়া গেল, পরে মুখভাব তাহার প্রফুল্ল হইল। বড়দার নামে আর এক দফা নালিশ রুজু করিল, জান বাবা, পরশু সকালে মল্লিকদের দোকানে চিনি দিচ্ছিল, আমরা সবাই গেলাম, বড়দা গেল না।

তা যাবেন কেন, চা খাবার বেলা তো গরহাজির দেখি না। ছেলেটা দিন দিন পাজী হচ্ছে।

আমার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া গৃহিণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাকে বকছ গা?

মণ্টুকে। শুনলাম—পরশু চিনি দিচ্ছিল—ও নাকি কিছুতে যায় নি।

যাবে কোত্থেকে—পড়ছিল। চাল রে—চিনি রে—কেরাসিন রে—নুন রে—সারা দিন দিন হৈ হৈ করে তো ওদের কাটে। লেখাপড়া শিখে মানুষ আর হতে হবে না।

মানুষ! কথাটা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, মর্ম্ম স্পর্শ করিল না। তের শত পঞ্চাশের ঘূর্ণাবর্ত্তে অনেক ভাল কথাই তো মনে ঠাঁই পাইতেছে না।

ছোট ছেলেটির পানে ফিরিয়া গৃহিণী কহিলেন, বলি এটারও মাথা খেতে হবে নাকি? দ্বিতীয় ভাগখানা কিনে পর্য্যন্ত তো পাতা উল্টালে না।

মানুষ বাঁচলে তো লেখাপড়া! শা'দের দোকানে কেরোসিন দিচ্ছে নাকি।

পোড়াকপাল তেলের! চার পয়সার তেল বোতলের তলায় পড়ে থাকে। ময়লা। মুখভঙ্গী সহকারে তেলের অকৃত্রিমতাকে এবং দোকানীর সাধুতাকে ধিক্কার দিয়া তিনি ডাকিলেন, ওরে পুঁটি, খেঁদি, পটলা—ইদিকে আয়।

খেঁদি উত্তর দিল, রান্নাঘর পরিষ্কার করছি।

মর ছুঁড়ি, ওসব রেখে ইদিকে আয়। কেরাসিন না হ'লে তোর চুলো ধরাব কি দিয়ে। ভিজে কাঠে এই সত্যিকার এতখনি তেল লাগে।

বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, বল কি, কাঠের ফুল্‌কি—কি কাগজ—

ফুলকি আজকাল ছুতোররা দেয় কি না। কাগজ? বলি কাগজের ঠোঙায় কত জিনিসপত্তর আসছে শুনি?

ছুই-ই দুষ্প্রাপ্য। অতএব খেঁদি-পুঁটি-পটলার বাহিনীকে তৈল সংগ্রহে নিযুক্ত না করিলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার হইতে লেখাপড়ার ব্যাপার পর্য্যন্ত বন্ধ।

দুই মেয়ে ও সেজ ছেলে আসিল।

গৃহিণী বলিলেন, কোথায় নাকি তেল দিচ্ছে—সব বোতল আর পয়সা নিয়ে যা। মণ্টু কোথায়?

বড়দা তো পড়তে গেছে।

কি একটা শক্ত কথা বলিতে গিয়া তিনি আত্মদমন করিলেন। তা থাকগে—তোরা যা।

খেঁদি বলিল, বোতল কোথায় এত?

সবাইকে বোতল নিতে হবে এমনই বা কি কথা! যুদ্ধের বাজারে বোতল শস্তা নাকি?

যথাক্রমে কলাইয়ের চটা-উঠা গ্লাস, পিতলের ঘটি, একটি আস্ত এবং একটি গলা-ভাঙ্গা বোতল হাতে লইয়া ছেলেমেয়েরা উঠানে দাঁড়াইল।

গৃহিণী বলিলেন, দাঁড়ালি যে?

খেঁদি নাকি সুরে বলিল, এই ছেঁড়া প্যাণ্ট পরে যাব নাকি?

না তো তোমার জন্তে ফুলপাড় শাড়ী এনে দিই। বলি একি নেমন্তন্ন খেতে চলেছিস?

মায়ের শাসনে মেয়ের শালীনতাবোধ বিলুপ্ত হইল। ক্ষুণ্ণ অভিমানে অন্ত ভাইবোনগুলিকে অনুসরণ করিয়া বাগান পার হইয়া পথে পড়িল।

তা খেঁদির বয়স এগারো ছাড়াইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে থাকে এবং তেমন বস্ত্রও পায় না; গড়নটা ক্ষয়াটে ধরণের। বাড়িতে ঝি নাই, কাজের অনেক ভার ঐ কিশোরী মেয়েটির উপর গিয়া পড়ে। কাজেই—না প্রসাধনে—না হাসি-খুসি-খেলা-ধূলায় যৌবনের কৃপণ কিরণটুকু উহার মুখে পড়িয়া রংটাকে ঈষৎ উজ্জ্বল করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সচ্ছল অবস্থায় আরও পাঁচটি মেয়ের সজ্জ ও পায়। কল্পনায় মনের মুকুলে তাহার অনাগত বসন্ত বায়ুর দোলা লাগে হয়ত। কিন্তু পাঁচ টাকা দামের একখানি আটপৌড়ে শাড়ী দিবার সামর্থ্য আমার নাই, প্যাণ্টেই কাজ চলিতেছে। শাড়ী অবশ্য একখানি আছে, কোথাও নিমন্ত্রিত হইলে সেখানি অঙ্গে উঠে। অন্তথায় বাড়ির ফায়ফরমাস খাটিয়া বাহির হইবার অবসরই বা কোথায়? তবে বয়স সম্বন্ধে মেয়ে যে ক্রমশঃ সচেতন হইতেছে তাহা ওর এই অভিযোগ-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরেই বেশ বুঝিতেছি। মনে মনে বলিলাম, যুদ্ধটা থামুক আগে—

সে কল্পনারও অবশ্য কূলকিনারা নাই। কবে যে থামিবে এই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর!

কাঁদিতে কাঁদিতে পটলা ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার গলাভাঙা বোতলের টুকরা—হাতে ও বুকে ছড়িয়া গিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

—কি রে, কি হ'ল?

ক্রন্দনের আবর্ত্ত ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠস্বর শুনা গেল, দেখ না বাবা, ওদের পুলিন আমায় এমন ঠেলে দিলে—

তা ঠেলাঠেলি করিস কেন? প্রশ্ন করিয়াই কিউয়ি-অজগরের অবয়বটা মনশ্চক্ষে প্রকটিত হইল। বয়োবৃদ্ধেরা যেখানে ঠেলাঠেলি, গালাগালি, মারামারি করিয়া দ্রব্য সংগ্রহ করে সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে শৃঙ্খলা রক্ষার আশাই তো অন্যায়।

তৈল সংগ্রহ করিয়া ছেলেমেয়েরা পুনরায় বাহির হইতেছে—গৃহিণী বলিলেন, আবার কোথায় চললি সব?

পুঁটি বলিল, চিনি দিচ্ছে মা।

তা পয়সা নিয়ে যা। এ ঘরে আসিয়া বলিলেন, পয়সা দাও তো। চারটে দু'আনি দিও।

কেন, একসঙ্গে চার জনের দাম দিলে চলবে না?

খেঁদি বলিল, এক বাড়ি থেকে চার জনকে দেবে কিনা। আলাদা বাড়ি বলে নিই—তবে তো দেয়।

তবে তুই বরং একটা টাকা ভাঙিয়ে নিস, অনেক রেজ্‌কি তো ওরা পায়।

টাকার পয়সা দেয় না।

তাহলে মুশ্‌কিল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মোটে পাঁচ আনা হয়।

গৃহিণী বলিলেন, ঠাকুরের মানত বলে সেদিন খোকার কপালে পাঁচটা পয়সা ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, তাই থেকে দেব কি?

তা দাও।

কিন্তু ঠাকুরের পয়সা—আজই পুরিয়ে রাখতে হবে বলে দিলাম।

বলিলাম, গোদের ওপর এই এক বিষফোড়া জুটেছে। পয়সা আধলা তো উবে গেল—সিকি দুয়ানিও পাওয়া যাচ্ছে না। এই যুদ্ধই আমাদের মারবে।

গৃহিণী বলিলেন, পোড়া যুদ্ধু কবে মিটবে গা?

—যুদ্ধই জানে, মানুষ জানে না।

—তা যে মুখপোড়া এই কাণ্ড বাধালে তাকে ধরে জেল-ফাঁসি বা হয় দিক না।

—সেই মুখপোড়ার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না যে।

মরণ! ঠাকুরের মানত পয়সা আনিয়া তিনি খেঁদির হাতে দিলেন।

পটলা বলিল, আমি যাব।

না না, তোর বুক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ছেলে শুনিল না।

চিনির সের আট আনা। প্রত্যেককে এক পোয়া করিয়া চিনি দিবার কথা। দিয়াছিলাম ছ'আনা, কিন্তু খেঁদিরা চার জনে মিলিয়া এক সের চিনি আনিয়াছে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ রে, আর এক পোয়ার দাম কোথায় পেলি?

—খেঁদি পিতলের ঘড়ায় চিনি ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কেন, অসীমরা যেমন করে পেলে—আমরাও তেমনি করে পেলাম।

পটলা বলিল, বাবা, বড়দি মেজদি ওরা ছ'বার করে চিনি নিয়েছে।

পুঁটি বলিল, বড়দিতে আমাতে চিনি নিয়েই ময়রা দোকানে বেচে দিলাম। ওরা এক পোয়া চার আনা করে দিলে।

—বলিস কি?

—কেন—সবাই তো বেচছে। অসীমরা, দীপালীরা, দেল-জানেরা—

পটলা বলিল, দিদি ছ' আনা পয়সা নিয়েছে বাবা। আমাদের বললে, খাবার খাবি আয়।

খেঁদি প্রতিবাদ করিয়া বলিল, বাঃ রে, ময়রা বললে—ছ-আনার খাবার নাও খুকি—আর খুচরো পয়সা তো নেই। তাই না—

পটলা বলিল, আমায় মোটে একখানা জিলিপি দিয়েছে বাবা।

স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। যুদ্ধ যেমন বিজ্ঞানকে আগাইয়া দেয়, মানুষকেও নানা দিক হইতে সচেতন করিয়া তুলে। অকাল-অভিজ্ঞতা অলক্ষ্যেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংসার চিনাইয়া দিতেছে। কেরোসিনের আস্ত টিন—যাহা কালো বাজারে কিনিয়াছিলাম—অস্পর্শিত আছে; ছেলেমেয়ের সারল্য, সততা ও ভবিষ্যৎ ভাঙাইয়া এই সংগ্রহ চলিতেছে। টাকা ধার করিয়া কিছু চাল ঘরে রাখিয়াছি; কারণ না খাইয়া পথে মরার দৃশ্যটা যত করুণ হইয়াই চোখে আঘাত করুক—মনকে ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় মুহ্যমান করিয়াছে তার চেয়ে বেশি। এখন যেন-তেন-প্রকারে বাঁচিয়া থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হইয়াছে, জীবনের মহত্ত্ব-সততা ওসব যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের জন্য।

—ও মহী—মহী আছিস নাকি?

অতীন—আয়। বাল্যবন্ধু অতীন চায়ের কাপ হস্তে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, একটু চিনি দে তো ভাই, নইলে সকালের নেশা জমছে না।

চিনি!

হাঁ রে, এই তো তোর ছেলেমেয়েরা আনছিল দেখলাম। বেশ বাচ্চু ছেলেমেয়ে! দে আধপোয়াটাক।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতিবেশী এবং বাল্যবন্ধু। এবং বহু সময়ে বহু ভাবেই ওর দ্বারা উপকৃত আমি। চিনি দিলাম—ঈষৎ অপ্রসন্ন মনেই।

অতীন যেন আমার মনোভাব বুঝিয়াই হাসিয়া বলিল, ভয় নেই, ওবেলা তোর চিনি শোধ দিয়ে যাব। বুঝি তো যুদ্ধের বাজার।

ওর হাসিটা তীরের মতই বুকে আসিয়া বাজিল।

সরিষার তেলের বাটিটা লইয়া তেল মাখিতেছি—গৃহিণী বলিলেন, ওগো—অত করে তেল মেখো না—এক পোয়া তেলের দাম সাড়ে পাঁচ আনা।

তবে একটু নারকেল তেল দাও মাথায় মাখি।

নারকেল তেল! ক'মাস আন নি হিসেব আছে! এই দেখ, সরষের তেল মেখে মেখে মাথায় জটা পড়ে গেল।

রহস্য করিয়া বলিলাম, তা ভাল, প্রব্রজ্যা নেবার রাস্তা সহজ হয়ে আসছে।

তোমার রসিকতা ভাল লাগে না, বলে যার জ্বালা সেই জানে। মুখ ঘুরাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

জানি—এই সঙ্কট সময়ে রসিকতা কেহই পছন্দ করিবেন না, কিন্তু বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগে খুব একচোট রসিকতা করিতেছেন না কি!

আহারাদি শেষ হইলে বিছানায় আসিয়া শুইলাম। বড় মেয়ে দু'টি পানের খিলি ও একটু চূণ তর্জ্জনীতে মাখাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পান মুখে দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলাম, মুখপুড়ি, শুচ্ছেক খয়ের দিয়ে পান কুইনিন করে এনেছ।

মেয়ে নাকি সুর টানিয়া কহিল, বাঃ রে, খয়েরই তো তেতো। মিষ্টি খয়ের পাওয়া যায় নাকি!

—বেশ বেশ, আর খানিকটা চূণ নিয়ে আয়—সুপুরিও।

মেয়ে চূণ আনিয়া কহিল, সুপুরি আর হবে না, মোটে একটি আছে, মা বললে—দোক্তা খাব কি দিয়ে।

জানালাটা খুলিয়া শুইলাম। কাঁঠাল গাছতলায় তখন ভিখারিণী উঠিয়া বসিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের বাড়ির পানে চাহিতেছে। কোন্ ঘরের মেয়ে কিংবা বধূ ও জানি না—অতিথি যে গৃহস্থের পক্ষে নারায়ণ সে বোধটুকু নিশ্চয় ওর আছে এবং হয়ত ভাবিতেছে, দুর্ভিক্ষের বাজারে নরের মধ্যে নারায়ণকে ভুলিয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে। ভিখারী আসিলে গৃহস্থের হৃৎকম্প হয়—তেমন যুগের কল্পনাও ও হয়ত কোন দিন করিতে পারে নাই। কিন্তু ভিখারীকে দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার যে নগ্ন চিত্র চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহার তীব্র তাপে দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি-গুলি শুকাইয়া উঠিতেছে ক্রমশঃ। আমরা তো সামান্য প্রাণী; প্রমত্তা নদীর ধারে উচ্ছে-পটোলের ক্ষেত ভাঙনের মুখে পড়িলে অদূরস্থিত বৈঁচি ঝোপে যেমন কাঁপন লাগে—উহাদের দুর্দ্দশায় আমরাও তেমনি কাঁপিতেছি।

ভুক্তাবশিষ্ট কিছু ব্যঞ্জন ও অন্ন আনিয়া গৃহিণী অতিথি সৎকার করিলেন। ভিখারী মেয়েটার চক্ষুতে এই এক দিন বাঁচিয়া থাকিবার কৃতজ্ঞতা উপচিয়া পড়িতে লাগিল। মরণোন্মুখ বুভুক্ষুর কৃতজ্ঞতা সহ্য করা কি কঠিন!

জানালাটা বন্ধ করিলাম এবং বিবেকানন্দ-চরিতখানা বিছানা হইতে তুলিয়া তাকের উপর রাখিলাম।

শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তিনি সত্যকার শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-দান কার্য্য শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া বিরাট্ জনসমাজের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ কারণ তিনি যুবক-বৃদ্ধ সকলেরই সম্মান ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি আমরা তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর ন্যায় মনীষী রাজনারায়ণের আত্মচরিতও বাংলা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে তিনি তাঁহার ছাত্র ও কর্ম্মজীবনের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠে তাঁহার জীবন-কথা অনেককিছু জানা যায়। তথাপি তাঁহার জীবনের এমন বহু বিষয় বা ঘটনা বর্ত্তমানে জানিতে পারিতেছি যাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। আত্মচরিতের পরিপূরক হিসাবে এসব বিষয় সাধারণের গোচরে আনা কর্ত্তব্য।

রাজনারায়ণ সুবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি ভূদেবের সহিত ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠ সমাপন করিয়া হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হন। ইহার পরেই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। তখন খ্রীষ্টানী ও খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলনের মরশুম। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলনের সহায়ক কর্ম্মীরূপে পাইলেন। তিনি এক দিকে যেমন তাঁহাকে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ-কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন অন্য দিকে তেমনি উক্ত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টরের পদেও নিয়োজিত করিলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন রাজনারায়ণের সতীর্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। রাজনারায়ণ এই পদে অধিক দিন অধিষ্ঠিত থাকেন নাই।

রাজনারায়ণ বাবু প্রায় দুই বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে উপনিষদের অনুবাদ-কার্য্যে রত ছিলেন এবং কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৪৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর কার ঠাকুর কোম্পানীর পতন হইলে দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে, উপনিষদের অনুবাদ-কার্য্যও বন্ধ হইয়া যায়। রাজনারায়ণ বলেন, ইহার পর দেড় বৎসর কাল তাঁহাকে বেকার থাকিতে হয়। পরে ১৮৪৯, ১২ই মে তিনি সত্তর টাকা বেতনে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে কার্য্য করিবার সময় তিনি কলেজের ছাত্র ছাড়া বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেও ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। তিনি 'আত্মচরিতে' (পৃ. ৬২-৩) লিখিয়াছেন :

আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত আমার নিকট অল্পবিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসীডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সব ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান।

সংস্কৃত কলেজে প্রায় দুই বৎসর কার্য্য করিয়া ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মেদিনীপুরে সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদ প্রাপ্তির সংবাদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরবর্ত্তী ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের এক পত্রে শিক্ষা-কমিটিকে (Council of Education) জ্ঞাপন করেন :

I have the honour to report for the information of the Council of Education that Babu Rajnarain Bose has resigned his post of the Second Master of the English Department in the Sanskrit College on the 22nd ultimo having been appointed Head Master of the Midnapore School.

Sd.|- *Eswar Chandra Sarma*.

রাজনারায়ণের সত্যকার শিক্ষাব্রতী-জীবন মেদিনীপুরেই আরব্ধ হইল। এখানে তিনি আঠার বৎসর শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া ১৮৬৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। শেষের দুই বৎসর শিরঃপীড়া হেতু তিনি ছুটিতে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এখানে মেদিনীপুর স্কুল সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৩৪ সালের নবেম্বর মাসে কয়েক জন উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় মাত্র আঠারটি ছাত্র লইয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র রসিকলাল সেন এ সময়ে ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৬, ৯ই জুলাই এফ. টীড মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তিনি এখান হইতে বদলী হইয়া ৯ই জুলাই ১৮৪৭ তারিখে ঢাকা কলেজে গমন করেন। তাঁহার স্থলে ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে সিন্‌ক্লেয়ার মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন। প্রায় আড়াই বৎসর কাজ করিবার পর ১৮৫০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।* সিন্‌ক্লেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার এই পদে রাজনারায়ণ বসু নিয়োজিত

---

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭২৬-৭।

হইলেন। টীড ও সিন্‌ক্লেয়ারের সময়ে, ১৮৪৪ ৮ এই পাঁচ বৎসর সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।†

রাজনারায়ণ বাবু আত্মচরিতে টীড ও সিন্‌ক্লেয়ার সাহেবের উল্লেখ করিয়াছেন। উঁহাদের সময়ে বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রায় গতানুগতিক ভাবেই চলিয়াছিল। রাজনারায়ণ ইহার কর্ণধার হইয়া অল্পকাল মধ্যেই ইহার রূপ বদলাইয়া দিলেন। ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিল, শিক্ষক-সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্বে যেখানে সরকারী কলেজ বা স্কুল থাকিত সেখানে স্থানীয় পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী ও মান্যগণ্য বাঙালীদের লইয়া 'লোক্যাল কমিটি' গঠিত হইত। প্রথমে কৌন্সিল অফ্‌ এডুকেশন এবং পরে কৌন্সিল উঠিয়া গেলে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এই কমিটির উপর স্কুল বা কলেজের পরিচালন-ভার অর্পণ করিতেন। কমিটির রিপোর্ট সরকারী রিপোর্টের অঙ্গীভূত হইত। রাজনারায়ণ উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির উপরে মেদিনীপুরস্থ কমিটির ইউরোপীয় সভ্যদের দরদের অভাব দেখিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। আত্মচরিতে তাহাদের কর্ত্তব্যহীনতার কৌতুকপ্রদ কাহিনীও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি কমিটি রাজনারায়ণের কৃতকর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদা সশ্রদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন এবং তাঁহারা শিক্ষা-বিভাগে যে-সব রিপোর্ট পাঠাইতেন তাহাতে ইহার বিশেষ প্রশংসা থাকিত। সরকারী রিপোর্টে ইহার কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ সালের সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টের 'মেদিনীপুর স্কুল' অনুচ্ছেদে পাই:

Midnapore School. "The Head Master Baboo Rajnarain Bose has been connected with the School since the year 1851. The Committee consider him a very zealous officer taking much pains with his boys in his Class and always watchful over the interests of the School. By his exemplary conduct and his attention to the interests of the School he has gained for it a high reputation among the inhabitants of the district who are now showing their appreciation of the benefit of a sound English education. The School appears to have flourished under the management of Baboo Rajnarain Bose." (Appendix A, p. 307).

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটির ভার গ্রহণ করা অবধি রাজনারায়ণের অত্যধিক চেষ্টা-যত্নে ইহা যে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল এবং স্থানীয় অধিবাসীরা যে ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল ইহাই পরিষ্কাররূপে এখানে বিবৃত করা হইয়াছে। ১৮৫৮-৫৯ সালের রিপোর্টে আছে:

"To this may be added that the Head Masters of Midnapore, Cuttack and Pooree Schools have introduced meetings for discussion on educational and literary subjects, in which the other Teachers and pupils of the first class have a share." (Report of the Inspector of Schools, South-West Bengal, E. Roer. Appendix A, p. 104).

কটক ও পুরী স্কুলের ন্যায় মেদিনীপুর স্কুলেও ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে সাহিত্যাদি আলোচনার জন্য বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ছাত্রদের পরীক্ষার ফলও ভাল হইতে লাগিল। উক্ত রিপোর্টেই উল্লিখিত হইয়াছে:

"The results of the examination on the whole cannot, the Committee think, but be considered as satisfactory, shewing that the instructive staff have paid due attention to their laborious work. Baboo Rajnarain Bose, the Head Master, is entitled to the especial thanks of the Committee, for his excellent management of the School, which appears just now to be in as flourishing a condition as could be expected....." (*Ibid.* p. 319).

এই সনে মেদিনীপুর স্কুলে যে-সব উন্নতিমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহারও একটি তালিকা রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে:

"Among the improvements introduced during the session may be noticed—

1. The adoption of the Rules as laid down in the Report of the School Committee for the improvement of Schools bearing on the general management and discipline of Schools. These rules are working well and bear evident marks of improvement over old ones.

2. The introduction of a system of discussion on a given subject amongst themselves conducted by the boys in the presence of the masters. An hour devoted to the subject once or twice a week cannot but be very profitably spent.

3. Extra studies requiring the boys to study a given book, not comprised in the class course and giving marks for the same.

4. With a view to indicate habits of benevolence and a desire to help the poor, a little subscription at the rate of a pice or two from such boys and masters as are able and willing to pay, is raised monthly from which the decrepit and old are paid. (*Ibid.* p. 320).

মেদিনীপুর স্কুলে বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। উপরের তালিকায় বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আরও তিনটি বিষয়ের কথা জানিতে পারিতেছি। ইহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ের সহিত ছাত্রগণ সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। (১) পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে প্রতি ছাত্রকে অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হইত এবং পুস্তকের বিষয়-বস্তুর উপর পরীক্ষা লইয়া তাহাতে নম্বর প্রদত্ত হইত। (২) ছাত্র ও শিক্ষকগণ মিলিয়া একটি দরিদ্রভাণ্ডার খোলা হয় এবং বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত লোকদের ইহা হইতে সাহায্য দেওয়া হইতে থাকে। ইহার পর বৎসরের (১৮৫৯-৬০) রাজনারায়ণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে:

"To the Head Master particularly the thanks of the Committee are due for his vigilance and attention to duties, and unwearied exertions to advance the interests of the school, which seems to be in as prosperous and healthy a condition as could be wished. The school is daily rising in the estimation of the people of the district, the poorer portion of whom actually yearn for instruction in it. Notwithstanding the establishment within the session of a Missionary school in the Town, which admits boys gratis, there are numerous new applications every month for admission into our school,

† সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৬, ৮।

It now numbers 202 boys on its rolls, being 44 more than at the end of the session preceding." (Appendix A, p. 226).

রাজনারায়ণের প্রযত্নে তখন মেদিনীপুর স্কুলের এত উন্নতি ও খ্যাতি হইয়াছিল যে, দরিদ্র ছাত্রগণ সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মিশনরী স্কুলে বিনা-বেতনেও পড়িতে না গিয়া এখানে আসিয়া ভিড় জমাইত। এ বৎসর স্কুলের ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা চুয়াল্লিশ জন বৃদ্ধি পায় এবং মোট দুই শত দুই জনে দাঁড়ায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বিদ্যালয়ের বাহিরে জনসাধারণেরও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের উন্নতি ও মঙ্গলার্থে মেদিনীপুরে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যত প্রকার প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশেরই মূলে ছিলেন মনস্বী রাজনারায়ণ। মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাজনারায়ণ। তিনি ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহা সংগঠনে যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্ম্মাণ সম্পর্কে 'সোম-প্রকাশ' (২২ জুন ১৮৬০) লেখেন :

অত্রত্য কতকগুলি কৃতবিদ্যের উৎসাহবলে শ্রমজীবীদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটি "নাইট স্কুল" সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।...

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর যত্নে এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্ম্মিত হইয়া ইহার কার্য্য অতি উত্তমরূপে চলিতেছে। এবং একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা এখানে ব্রাহ্মের সংখ্যা অধিক, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম অতি অল্প।

এই উদ্ধৃতির শেষাংশে উল্লিখিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

মেদিনীপুরে আমি গত শ্রাবণ মাসে [জুলাই-আগষ্ট ১৮৬২] উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজ অবলোকন পূর্ব্বক ও ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় ভাব সন্দর্শন করিয়া অতীব তৃপ্ত হই-য়াছি। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজ ১৭৬৮ শকে কোননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের দ্বারা স্থাপিত হয়। তাঁহার মেদিনীপুর হইতে কর্ম্মানুরোধে অন্যত্র গমন হইলে সমাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তথায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অবস্থিতি হইলে তাঁহার দ্বারা ১৭৭৩শকে পুনরুদ্দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত হয়। সম্প্রতি গত বৎসরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে একটি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা সময়ে বেদী হইতে উপদেশ দেন এবং তাহার পূর্ব্বে এক অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য ও আর একজন অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পাঠ করেন, অবশেষে ব্রাহ্মসঙ্গীতও হয়...। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিনয় গুণে সকলে একমনা হইয়া সমাজের সাহায্য বিধান করিতেছেন। দৃঢ়ব্রত রাজনারায়ণ বসুর যত্ন ও পরিশ্রমে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন উন্নত বেশ ধারণ করিতেছে। তথাকার সকল ব্রাহ্মেরাই তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহারা মনের সহিত শ্রদ্ধা করেন।...তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে মোহমুগ্ধ মেদিনীপুরে যে জ্ঞানা-লোক প্রকাশ হইয়াছে, যে ধর্ম্মামৃত বর্ষিত হইয়াছে, তাহা আর যাইবার নহে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইবে। এই আশার ভিত্তি-ভূমি তথাকার ব্রাহ্মবিদ্যালয়। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—কার্ত্তিক, ১৭৮৪ শক)

রাজনারায়ণ একান্ত ভাবে মেদিনীপুরকেই নিজ কর্ম্ম-ক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে অবস্থিতি কালে বিবিধ জনহিতকর সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার কোন কোনটির উদ্দেশ্য সুপ্রচারিত হইয়া বঙ্গের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষণ ও পোষণে বিশেষ সহায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ সুদক্ষ শিক্ষাব্রতী ও দূরদর্শী সমাজসেবীরূপে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নয়ন বা নিয়োগের জন্য একাধিকবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নাই। মেদিনীপুরবাসীরা রাজ-নারায়ণের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অবসর গ্রহণের সংবাদ পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে কানপুরে [তখন রাজনারায়ণ বাবু স্বাস্থ্য-লাভোদ্দেশ্যে কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন] ১৮৬৯, ২৯এ মার্চ্চ একখানি মানপত্র প্রেরণ করেন। মেদিনীপুর স্কুল এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দ্বারা কিরূপ উপকৃত এবং উজ্জীবিত হইয়াছিল ইহাতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। মানপত্র হইতে নিম্নে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। মেদিনীপুরবাসীরা লেখেন :

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি আপনার পদের কার্য্য যেরূপ উৎকৃষ্ট-রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতেই এ স্থানের মহোপকার সাধিত হইতেছে। আপনার আগমনের পূর্ব্বে এখানকার গবর্ণমেন্ট ইংরাজী বিদ্যালয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তৎকালে ছাত্রসংখ্যা অশীতি এবং শিক্ষক কেবল ছয় জন মাত্র ছিলেন। তখন ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এমন কি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ফোর্থ নম্বর রীডর পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি যে বৎসর আগমন করিলেন সেই বৎসরই দুইটী ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিন শতেরও অধিক এবং ইংরাজী শিক্ষক নয় জন ও পণ্ডিত দুই জন হইলেন। আপনার সময়ে বহু ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি বিদ্যালয়টিকে সম্যক উন্নত করিয়া এ দেশে জ্ঞান ও সুনীতির বহুল বিস্তার সাধন করিয়াছেন।

আপনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমুদায় চিন্তা বিনিয়োজিত করিয়া নিরস্ত হন নাই। যত প্রকারে মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে, তৎসমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যত্নশীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই সকল উপায় ফলোপধায়ী হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন।

অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিক বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান নিবারণী সভাও আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন, এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপাসনা দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।

...আপনার অপ্রতিহত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এখানে ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত, সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আপনার অবস্থান কালে মেদিনীপুরে যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে—রাজভক্তি বা দেশানুরাগের যে সকল উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বা গত দুর্ভিক্ষকালে অথবা তাদৃশ অন্যান্য সময়ে মেদিনীপুরের অন্নরাশি ও অর্থের যে সার্থকতা হইয়াছে, সে সমস্ত কেবল আপনারই উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা দ্বারা সম্পাদিত। মেদিনীপুরের সমুদায় শুভকর কার্য্যে আপনি মূল ও মস্তক স্বরূপ ছিলেন। (আত্মচরিত, পৃ. ১২৪-৫)।

পঙ্গপাল

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পঙ্গপালের ব্যাপারটা কিরূপ এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে পঙ্গপালের ব্যাপক উপদ্রব ঘটিতে দেখা যায় না। পঙ্গপালের উপদ্রব যে কি ভীষণ তাহা যথাযথ বর্ণনা করা দুরূহ; একসঙ্গে অকস্মাৎ অগণিত পতঙ্গের আবির্ভাব একটা অভাবনীয় ব্যাপার। প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে পঙ্গপালের অভিযানের ভীষণতা কিয়ৎপরিমাণেও হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সিনেমা-ফিল্মে পঙ্গপালের অভিযানের দৃশ্য দেখিয়া বাস্তব ঘটনার ভীষণতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। একসঙ্গে লক্ষ কোটি পঙ্গপাল দেখিয়া নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পতঙ্গ কোথা হইতে আসিয়া অকস্মাৎ গাছপালা, পথ সমস্ত উপর নীচ ছাইয়া ফেলিল। আকাশ-বাতাস যেদিকে তাকাও—কেবল পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল। স্থানে স্থানে তিন-চার ফুট উঁচু হইয়া পঙ্গপাল জমিয়াছে। পুঞ্জীভূত ঘনকৃষ্ণ বিশাল মেঘ দেখিতে দেখিতে যেমন করিয়া দিনের আলো আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাহা অপেক্ষাও বহুগুণ গাঢ়তার আবরণে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া পঙ্গপালের অভিযান চলিতে থাকে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। কোথাও ব্যাপকভাবে মড়ক লাগিলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা যেমন ভীতিবিহ্বলতার পরিচয় দিয়া থাকে—বহুদূরে পঙ্গপাল দেখা যাইতেছে—এ কথা শুনিয়া লোকেরা তেমনই আতঙ্কে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। হাওয়া অফিস যেমন ঝড়, জল, ঘূর্ণিবাতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সূচনা দেখিলে তড়িদ্বার্ত্তার সাহায্যে পূর্ব্বেই সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়, কোন স্থানে পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটিলে আজকাল সেরূপ তাহাদের অগ্রাভিযানের সম্ভাবিত পথ সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্ণেই সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরা ইহাদিগকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের অভিযান ব্যর্থ করা অসম্ভব। আকাশে এক দিক হইতে কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় পঙ্গপালের অগ্রগতি দেখিতে পাইলেই গ্রামের লোকেরা একযোগে বিশৃঙ্খলভাবে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, শিঙা ফুঁকিয়া অথবা বিভিন্ন উপায়ে ভীষণ শব্দ করিয়া তাহাদের অভিযানের দিক পরিবর্তন করিবার



পঙ্গপালের অভিযান

অন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে ; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে দিক পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গেলেও মোটের উপর ইহাদ্বারা কোন সুফল লাভ হয় না। যতই কিছু উপায় অবলম্বিত হউক না কেন—মাঠ-ঘাট, আকাশ-বাতাস ছাইয়া পঙ্গপালের অভিযান চলিতে থাকে। আগুন অথবা অন্য কোন উপায়ে স্তূপীকৃত ভাবে ধ্বংস করিলেও ইহাদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না—সংখ্যা ইহাদের এতই অগণিত।



উড়ন্ত অবস্থায় পঙ্গপাল

যে-সকল স্থান শস্য এবং সবুজ তৃণ গুল্ম বা গাছপালায় আচ্ছন্ন ছিল পঙ্গপাল আবির্ভাবের কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, সে-সকল স্থানের চেহারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানেই আর সবুজের চিহ্নমাত্র নাই। ঘাসপাতা, শাকসব্জীর তো চিহ্নই নাই—বড় বড় গাছপালা সকলই পত্রশূন্য অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। পঙ্গপালেরা বহু বিস্তীর্ণ প্রান্তরের যাবতীয় পত্রপল্লব শস্যাদি নিঃশেষে উজাড় করিয়া দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া উড়িয়া গিয়াছে। মোটের উপর কোন স্থানে পঙ্গপাল আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং পরের অবস্থা বিবেচনা করিলে একথা সহজেই মনে হইবে যেন কোন অদ্ভুত ভোজবিদ্যাবলে দেশটা রাতারাতি এভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে খুব পুরু হইয়া বরফ পড়িলে সময় সময় রেল চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। সেরূপ, রেল-লাইনের উপর পুরুভাবে পঙ্গপাল জমিবার ফলে রেল চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এরূপ ঘটনার কথাও উল্লিখিত আছে। ইহা হইতেই পঙ্গপালের সংখ্যার গুরুত্ব অনুমান করা যাইতে পারে।

পঙ্গপালেরা উড়িয়া আসিয়া কেবল যে দেশের পর দেশ উজাড় করিয়াই চলিয়া যায় তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে ডিমও পাড়িয়া যায়। এই ডিম হইতে বাচ্চা উৎপন্ন হইয়া পরবর্ত্তী বৎসরের যাবতীয় শস্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে একবার পঙ্গপালের আবির্ভাব হইলে ক্রমাগত কয়েক বৎসর তাহাদের উৎপাত চলিতে পারে। আবার এমনও দেখা যায়—যেমন অকস্মাৎ তাহারা আবির্ভূত হইয়াছিল অল্প কয়েক দিন পরে তেমন আকস্মিক ভাবেই তাহারা উড়িয়া গিয়াছে। অসম্ভবরূপে বংশবৃদ্ধির ফলে ইহারা যে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এরূপ অবস্থা প্রায় কখনও ঘটিতে দেখা যায় না। কারণ খাদ্যাভাবের সূচনাতেই ইহারা দলবদ্ধভাবে অন্যত্র উড়িয়া যাইতে সুরু করে।

পঙ্গপালের উৎপাত সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরের একটি বর্ণনায় উল্লিখিত আছে—পরমেশ্বর আমাদের দেশের উপর দিয়া সারাদিন সারারাত পূর্ব্ব দিকের বায়ু প্রবাহিত করাইলেন। প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব বায়ু পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটাইল। পঙ্গপালেরা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা যেন পৃথিবীর সর্ব্বস্থান ঢাকিয়া ফেলিল। কাজেই দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দেশের যেখানে লতাপাতা, শাকসব্জি, গাছপালা ছিল উহারা সকলই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। বিস্তীর্ণ মিশরের কোথাও একটু সবুজের চিহ্ন মাত্র রহিল না।

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে আজও পঙ্গপালের উপদ্রব প্রতীকারের তেমন কোন কার্য্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৯২৮ সালে ডানাশূন্য অপরিণতবয়স্ক পঙ্গপালের আক্রমণে প্যালেষ্টাইন এক প্রকার শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে মিশরে পুনরায় পঙ্গপালের আক্রমণ হয় ; কিন্তু কীটতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় মিশর সে যাত্রায় অনেকটা



পঙ্গপাল খোলস বদলাইতেছে। প্রথম অবস্থা

আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। য়্যালজিরিয়া, পারস্য, দক্ষিণ-আমেরিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও রাশিয়ার বহুস্থান কয়েক বৎসর পর পর পঙ্গপালের উপদ্রবে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সালে কোনাক্রিতে পঙ্গপালের উপদ্রব হয়। তাহার ফলে সেখানে খাদ্য-দ্রব্যের

ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে একমাত্র উত্তর-ককেসাস প্রদেশেই প্রায় ৮০,০০০ একর জমির গম, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতি শস্য পঙ্গপালের উদরস্থ হইয়াছিল। ইহা হইতেই পঙ্গপালের উপদ্রবের ভীষণতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইবে।



পঙ্গপালের খোলস পরিবর্তনের দ্বিতীয় অবস্থা

ছোট শুঁড়-ওয়ালা একজাতীয় কয়ার-কড়িংকেই সাধারণতঃ পঙ্গপাল নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় কয়ার-কড়িং এবং অন্যান্য তৃণভোজী পতঙ্গ, এমন কি দলবদ্ধ ঝিঁঝিঁ পোকাকেও পঙ্গপাল নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমাদের দেশে কয়ার-কড়িং বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা ঝোপঝাড়ে এবং শস্যক্ষেত্রেই অনবরত বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের গঠন খুবই দৃঢ়। পিছনের ঠ্যাং দুইখানি দেহের তুলনায় খুবই লম্বা এবং স্থূলাকার। এই ঠ্যাং দুটির শক্তিও অসাধারণ। ঠ্যাঙের সাহায্যে ইহারা প্রায় দশ-বার ফুট দূরে লাফাইয়া যাইতে পারে। প্রায়ই ইহারা ঘাস বা লতাপাতার উপর লাফাইয়া চলে। নেহাৎ দায়ে পড়িলে উড়িয়া যায়। তবে উড়িতে তত পটু নহে। ঘাস পাতা ফুল ফল খাইয়াই ইহারা জীবন ধারণ করে। আমাদের দেশেই অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ রকমের কয়ার-কড়িং দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহারা কেহই দলবদ্ধভাবে উড়িয়া বেড়ায় না। সর্ব্বদাই একক ভাবে বিচরণ করে। কয়েক জাতীয় কয়ার-কড়িং সিকি ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। আমাদের দেশীয় প্রকৃত পঙ্গপাল জাতের কয়ার-কড়িংগুলি প্রায় দুই ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। বিভিন্ন জাতীয় কয়ার-কড়িঙের শরীরে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় অধিকাংশ কয়ার-কড়িংই শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের মিলনরীতিও কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে। ইহাদের পিছনের পায়ের ভিতরের দিকে অতি সূক্ষ্ম করাতের দাঁতের মত এক প্রকার যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের উভয় পার্শ্বস্থিত পাতলা পর্দ্দার উপর উখার মত ঘষিয়া ইহারা এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিতে পারে। একটু মনোযোগ করিলেই এখানে-সেখানে ঘাস-পাতার মধ্যে ইহাদের 'চিড়িক্', 'চিড়িক্' শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে না। মিলনের সময় হইলেই পুরুষ পতঙ্গটা প্রথমে তিন বার অথবা কোন কোন স্থলে চার বার 'চিড়িক্' 'চিড়িক' শব্দ করে। কয়েক দফায় এরূপ শব্দ করিবার পর আশেপাশে কোথাও কোন স্ত্রী-পতঙ্গ থাকিলে সেও তখন তিন বার কি চার বার 'চিড়িক' 'চিড়িক' শব্দ করে। কিছুক্ষণ বাদে পুরুষ পতঙ্গটি আবার অনুরূপ শব্দ করিতে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল পালা-ক্রমে উভয়ে এরূপ শব্দ করিবার পর পুরুষ-পতঙ্গটি উড়িয়া স্ত্রী-পতঙ্গের নিকটে উপস্থিত হয়। স্ত্রী-পতঙ্গের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ডিম পাড়িবার শক্ত অথচ সূচালো একটি লম্বা নলের মত পদার্থ আছে। ইহার সাহায্যে সে গর্ত্তের মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে কতকগুলি ডিম পাড়িয়া রাখে। গুচ্ছাকারে সজ্জিত ডিমগুলির উপরিভাগে একটা শক্ত আবরণী বেষ্টিত থাকে। বাচ্চাগুলি দেখিতে অনেকটা পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের মত; কিন্তু তাহাদের ডানা থাকে না। ইহারা বারংবার খোলস পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।



পঙ্গপালের খোলস পরিত্যাগের তৃতীয় অবস্থা

প্রজাপতি এবং ফড়িঙের যেমন শেষ বার খোলস পরিত্যাগ করিবার পর ডানার পূর্ণ রূপ বিকশিত হয় ইহাদের কিন্তু সেরূপ হয় না। প্রত্যেক বার খোলস পরিবর্তনের পর ডানাগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হইতে থাকে এবং শেষ বারে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চা বয়সে ইহারা সর্ব্বদাই লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। অপরিণতবয়স্ক বাচ্চা-গুলিই বেশীর ভাগ শস্যাদি খাইয়া উজাড় করিয়া থাকে।

Locusta migratoria নামে একজাতীয় পঙ্গপাল দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম-এশিয়ার ভূখণ্ডসমূহে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই জাতীয় পঙ্গপালই একবার উত্তর-ককেসাসে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই পঙ্গপালগুলিকে এবং

বিশেষভাবে তাহাদের ডিমসমেত একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানকে খুব যত্নসহকারে পরীক্ষার ফলে দেখা যায়—তাহাদের ডিম ফুটিয়া পূর্ব্বোক্ত পঙ্গপালের অনুরূপ অনেক বাচ্চা বাহির হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমারি বাচ্চারও অভাব নাই। পূর্ব্বে যে-সকল পঙ্গপালকে স্বতন্ত্র জাতীয় মনে করা হইত ইহারা দেখিতে ঠিক তাহাদেরই মত ছিল। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জাতীয় পঙ্গপাল পূর্ব্ববৎসরে সেস্থানে মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহারা সাধারণতঃ একক ভাবেই বিচরণ করে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গগুলি দলবদ্ধভাবে দেশ হইতে দেশান্তরে উড়িয়াবেড়াইতেই অভ্যস্ত। তারপরে পরীক্ষাগারে এই পঙ্গপাল লইয়া পুনরায় দস্তুরমত গবেষণা সুরু হয়। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয় যে, উড়ন্ত পঙ্গপাল এবং বর্ণবৈচিত্র্যবিশিষ্ট একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালেরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বুঝা গেল, যে পঙ্গপালের দল প্রথম অন্ত স্থান হইতে উড়িয়া আসিয়াছিল তাহাদের সন্তানসন্ততিরাই ভিন্নরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের আকস্মিক আবির্ভাবের পর আবার আকস্মিক তিরোধান ঘটিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের বংশধরেরা থাকিয়া যায়। উড়ন্ত পঙ্গপালের ডিম হইতেই একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। তখন তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কতকগুলি প্রজাপতির মধ্যেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। ইহাদের শীত ও বর্ষা দুই ঋতুতেই বাচ্চা হইয়া থাকে। শীতকালের বাচ্চা বর্ষাকালের বাচ্চা অপেক্ষা আকৃতি, প্রকৃতি এবং বর্ণবৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ পৃথক্। এ বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে মরুভূমির পঙ্গপাল *Schistocerca gregaria* এবং *S. paranensis*, *Locustana pardalina*, *Melanoplu spretus* প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পঙ্গপালের বাচ্চাগুলিও বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।



ডানা গজাইবার পর পঙ্গপালের আকৃতি

পরীক্ষাগারে যথেষ্টসংখ্যক পঙ্গপাল পুষিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি না পাইলে ইহারা একাকী বিচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইলেই ইহাদের মধ্যে উড়িবার প্রবৃত্তি জাগিতে আরম্ভ করে। খাদ্যের প্রাচুর্য্যের ফলে অসংখ্য বাচ্চা জন্মিতে থাকে—সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেলে তখন খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি হইতেই উড়িবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং দুই একটির উড়িবার প্রবৃত্তি দেখিয়া অপর পতঙ্গেরাও ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ হয় এবং উড়ন্ত ফড়িঙের দল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অগ্রান্ত দল একত্রিত হইয়া সকলে একই দিকে উড়িয়া চলে। অভিযানের ফলে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও অবশিষ্টেরা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই ভাবে বিরাট্ দল ক্রমশঃ কমিতে কমিতে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে আবার যখন এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটে তখন কোন এক স্থান হইতে অথবা বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযান সুরু হয় এবং ক্রমশঃ বিরাট্ দলে পরিণত হইয়া দেশকে দেশ উজাড় করিতে করিতে অগ্রসর হয়।



এশিয়া-মাইনরের এক জাতীয় পঙ্গপাল

পঙ্গপালের উপদ্রব প্রতিকারার্থে আজ পর্য্যন্ত তেমন কোন কার্য্যকরী উপায় আবিষ্কৃত না হইলেও ইহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার জন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের অগ্রগতির পথে আড়াআড়ি ভাবে লম্বা লম্বা গভীর নালা কাটিয়া রাখা হয়। তাড়া খাইয়া ইহারা দলে দলে গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া স্তূপীকৃত হইতে থাকে তখন কেরোসিন প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের সাহায্যে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। অনেক স্থলে আবার গভীর গড়খাইয়ের মধ্যে মসৃণ টিনের পাতের লম্বা পাত্র নালার মধ্যে পর পর সাজাইয়া রাখা হয়। পঙ্গপালেরা তাহার নীচে পড়িয়া গেলে টিনের মসৃণ গা বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে পারে না। তখন সেগুলিকে ক্রেনের সাহায্যে উপরে তুলিয়া বস্তাবন্দী করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া পুড়াইয়া মারা হয়।

হুসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রশান্ত,

একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী আছে এই যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি নামক একটি মুসলমান যোদ্ধা মাত্র সতর জন অশ্বারোহী সৈন্ত নিয়ে বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। এই কিম্বদন্তী সত্য হোক্‌ বা মিথ্যা হোক্‌, আজকার যে পাকিস্থানের দাবী, সে দাবী হিন্দুর পক্ষে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গ-বিজয়ের চাইতে বেশি মারাত্মক। কেননা পাকিস্থানের দাবীর পিছনে এমন একটা আইডিয়া আছে যা বখ্‌তিয়ারের তরবারির পিছনে ছিল না। তরবারির খেলা সেই খেলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আইডিয়ার খেলা সুদূরপ্রসারী, নিরবধি কালের মাঝে তা জাগ্রত থাকে এবং শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে। এই কারণেই বলা হয় Pen is mightier than the sword—লেখনী তরবারির চাইতে শক্তিমান্‌। কেননা তরবারি মানুষকে হত্যা করে মাত্র কিন্তু লেখনী আইডিয়াকে জীবিত রাখে এবং বিস্তার করে।

পাকিস্থানের পিছনে হিন্দুদের পক্ষে যে মারাত্মক আইডিয়াটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে বাঙালী হিন্দুর মাতৃভূমি বাংলাদেশ যেখানে সে বহু সহস্র বর্ষ পুরুষানুক্রমে বাস করে এসেছে, যে-দেশের অঙ্গে অঙ্গে উত্তরে হিমাদ্রির চূড়া থেকে দক্ষিণে সাগর-তরঙ্গ পর্যন্ত তার ভাব চিন্তা সাধনা সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সেই বাংলাদেশ হচ্ছে ইসলাম-ভূমি, মুসলমানদের পবিত্র স্থান।

যে মুহূর্তে বাঙালী হিন্দু এই আইডিয়া মেনে নেবে সেই মুহূর্ত থেকে সে আত্মবিলুপ্তির আয়োজন করবে। বাংলাদেশে একটা ঘরোয়া প্রবচন আছে এই যে—"পরভাতী হওয়া বরং ভালো কিন্তু পরঘরী হওয়া একেবারেই উচিত নয়।" নিজের মাথা গুঁজবার স্থানটাকে যে আপনার বলতে না পারে, ঘরে-বাইরে তার কোনো স্থান হয় না। পাকিস্থান যদি বাংলাদেশে পাকাপাকি ভাবে গড়ে ওঠে তবে বাঙালী হিন্দুর এক দিন ইহুদী জাতির মতো অবস্থা দাঁড়াবে। ডিমোক্র্যাসি বা গণভোটের দ্বারা কোনো জাতির আত্মহত্যার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং সেই জাতি তা প্রসন্ন মনে মান্য করেছে এটা এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি। ডিমোক্র্যাসিরও একটা সীমারেখা আছে। যদি কেউ এই প্রস্তাব করেন যে এস গণভোট দিয়ে আজ আমরা ঠিক করি যে আমরা বাঙালীরা সবাই আফিং ধরব কি না—তবে তাঁর সে প্রস্তাব আমরা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেব। আমেরিকার নিগ্রোরা, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তাদের কোনো রক্তসম্পর্কই নেই, সে দেশের লোকসংখ্যার এক-দশমাংশেরও কম হয়ে আজ সমান নাগরিকের অধিকার দাবী করছে আর অতিসভ্য বাঙালী হিন্দু সংখ্যায় বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে প্রায় সমান সমান হয়ে আজ তাঁর মাতৃভূমি হারাতে বসেছে, এ এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

কিন্তু তার চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, আজ এই ঘোর কলিযুগে দেখা যাচ্ছে, বাঙালী হিন্দুর মধ্যে একাধিক দধীচির আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আসল দধীচি আর এই সকল দধীচির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে আসল দধীচি নিজেকেই কেবল উৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু আজকার দধীচিরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সবাইকেই উৎসর্গীকৃত করে দিয়ে যেতে চান। আজ আমরা যেমন জয়চাঁদ উমিচাঁদ ও মিরজাফরকে অভিসম্পাত দিচ্ছি, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আজকার দধীচিদের ঠিক তেমনি অভিসম্পাত দেবে।

তুমি অবশ্য বলতে পার যে ব্যাপারটাকে এমন গাঢ়কৃষ্ণ মসীরঞ্জিত করে দেখবার কি প্রয়োজন? কিন্তু মাতৃভূমির বিলুপ্তি যে কোনো মানুষের জীবনে কেবল আত্মিক দিক থেকেই নয় ব্যবহারিক দিক থেকেও একটা চরমতম দুর্ঘটনা—এটা যদি আজ বুঝে না উঠতে পার তবে বুঝতে হবে যে তুমি উন্মাদ হয়ে উঠেছ এবং তোমার বর্তমানে রাজনীতিতে মাথা না ঘামিয়ে ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকা একান্ত দরকার। স্থূলদৃষ্টি লোকদের ধর্ম হচ্ছে এই যে দুর্ঘটনাটা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের কাঁধের উপরে এসে চেপে না বসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা সে দুর্ঘটনার অস্তিত্ব ধরতে পারেন না। এই সূক্ষ্ম বোধের অভাব জগতে বহু অমঙ্গল ঘটিয়েছে। যখন দুর্ঘটনা একেবারে কাঁধে এসে চেপে বসে তখন আর প্রতিকারের উপায় থাকে না—উপায় থাকলেও তখন চতুর্গুণ পরিশ্রমের ধাক্কা— যা প্রথম থেকে সহজে ঠেকানো যেতে পারত তখন তার জন্যে জল স্থল অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে তুলতে হয়। বর্তমান আফগানিস্থান একদা হিন্দুর দেশ ছিল। আজ ভারতের পূর্ব প্রান্তে যে হিন্দুরা হিমালয়ের এ পারেই আর এক ভবিষ্য আফগানিস্থানের ভিত্তি স্থাপন করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন তাঁদের ভূয়োদর্শনের প্রশংসা করা যায় না। এঁদের উদ্দেশ্য সৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু সৎ উদ্দেশ্য দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নরকের সত্য পথ তৈরি হয়ে ওঠে—এমন একটা কথা ইংরেজরা বলে থাকেন।

ইংরেজরা আরো একটা কথা এই বলে থাকেন যে, অনামধন্য কোনো বিশেষ ভদ্রলোক সুবিধা বুঝলে ধর্মশাস্ত্র আওড়িয়ে থাকেন। কিম্বা যখন স্ব-দেশ বা স্ব-জাতির স্বত্ব

যুদ্ধ বাধে তখন ন্যায়ের পক্ষে যাঁরা তাঁরাও যেমন ঈশ্বরের দোহাই দিতে থাকেন এবং তাঁকে আপনার দলভুক্ত করেন অন্যায়ের পক্ষে যাঁরা তাঁরাও ঠিক তাই করেন। তেমনি আজ পাকিস্থানের কোনো কোনো হিন্দু-সমর্থক ডিমোক্র্যাসির দোহাই দিতে সুরু করেছেন। প্রশ্ন উঠে—এঁরা কি সত্যের পূজারী না ভাঁওতাবাজ? তাঁরা কি আর কোনো ভাল যুক্তি না পেয়ে এই অতিস্পষ্ট মিথ্যা যুক্তিটি দাখিল করছেন? কোন্ ডিমোক্র্যাসিতে এমন বিধান আছে যে, কোনো দেশে একভাষাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে যদি একাধিক ধর্ম প্রচলিত থাকে তবে সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের লোকেরা এ দাবী করতে পারবেন যে, সে-দেশ বিশেষ করে তাঁদের? স্বর্গীয় আলোকে উদ্দীপ্ত আজকার দধীচিরা ডিমোক্র্যাসির এই রূপটা কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? চোখে তাঁরা কোন্ অঞ্জন লাগিয়েছেন যাতে তাঁদের দৃষ্টিতে আজ ডিমোক্র্যাসি ও থিয়োক্র্যাসি এক হয়ে উঠল? এই অঞ্জন কি আজ তাঁরা তিন কোটি বাঙালী হিন্দুকে বিতরণ করতে পারেন না? তা হলে অতি সহজে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আবার পাকিস্থানের আর একটি হিন্দুসমর্থক—নাম এঁর শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, এঁকে এত দিন নিপুণ কর্মী বলেই জানতাম কিন্তু দেখছি ইনি অধুনা ভাবুকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন—ইনি উপমার সাহায্যে পাকিস্থান ব্যাপারটা হিন্দুদের জলের মতো সহজ করে সমঝে দেবার চেষ্টা করছেন। ইনি বলছেন যে, এক ভাই যদি অন্য ভাইদের থেকে পৃথক্ হতে চায় তবে তার সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে ডিমোক্র্যাসিকেই ক্ষুণ্ণ করা হয়। কিন্তু যে-ভাই পৃথক হতে চায় সে ভাই কি এমন কথা বলতে পারে যে পৈতৃক বসতবাটি খানির মালিক একমাত্র সে এবং অন্য ভাইদের তার অনুগ্রহে তার তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে? এবং এমন কথা বললে কি সে অন্য ভাইদের কাছ থেকে কর্ণমর্দন লাভ করে না? ওটা আর যাই হোক্ ডিমোক্র্যাসি নয়—রাম বললেও নয় রহিম বললেও নয়। অথচ পাকিস্থানের দাবী কি ঠিক ঐ ধরণের নয়? আর দাবীটা যদি ঐ ধরণের না হয় তবে পাকিস্থানের কোনো মূল্যই মুসলমানদের কাছে থাকে না।

এই প্রসঙ্গে দাসগুপ্ত মহাশয়ের দিব্য দৃষ্টি একেবারেই খুলে গিয়েছে। তিনি বলছেন—

> কোনো ব্যক্তিকে তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী অবস্থার মধ্যে থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। সেই সহজাত মৌলিক অধিকার অস্বীকার করিলে গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা হইবে।

তা তো "হইবে" কিন্তু কেবল damned হিন্দুকে উক্ত সহজাত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা "হইবে" না? দাসগুপ্ত মহাশয়ের লজিক দেখে পুলকে চোখের কোণ ভিজে ওঠে।

কিন্তু সে যা হোক্, দাসগুপ্ত মহাশয়ের খাদি প্রতিষ্ঠান বলে এক প্রতিষ্ঠান আছে শুনেছি এবং সেখানে কর্মীও নিশ্চয়ই আছেন। এক দিন যদি সেই কর্মীরা বিলিতি কাপড়ের সাহেবী পোষাক পরে তাঁদের কর্মস্থলে হাজির হন তবে কর্মীদের "সহজাত মৌলিক অধিকার"এর খাতিরে দাসগুপ্ত তা প্রসন্ন মনে মেনে নেবেন তো? না, রক্তচক্ষু হয়ে তিনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন? এবং সেই কর্মীরা যদি খদ্দেরদের কাছে খদ্দর বিক্রি করতে করতে বিলিতি কাপড়ের গুণগান করেন তবে মৌলিক অধিকারের খাতিরে দাসগুপ্ত মহাশয়ের কানে তা মধু বর্ষণ করবে তো? না তিনি সে সবের মধ্যে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাণ্ড দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন?

কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ব্যষ্টি যখন সমষ্টিগত রূপে দানা বেঁধে উঠেছে তখন সেখানে আত্যন্তিক স্বাধীনতা—absolute liberty—কারো থাকে না। গণতন্ত্র কতকগুলি মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মূলতত্ত্বগুলির ধ্বংস করে কেউ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে না। এবং এ কথা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে এই মূলতত্ত্বগুলির একটি হচ্ছে এই যে কোনো বিশেষ ধর্মের বিশিষ্ট কোনো দাবীদাওয়া এতে স্বীকৃত হয় না। এবং গণতন্ত্রের এই সহজ তত্ত্বটি যে-মুহূর্তে মেনে নেওয়া হবে সেই মুহূর্তে পাকিস্থানের দাবীর উপর যবনিকাপাত হয়ে যাবে। Demos আর Deus-এর অর্থ এক নয়। অথচ এই ডিমোক্র্যাসির নামে যে আজ পাকিস্থানের দাবী সমর্থন করা হচ্ছে তাতে বোঝা যায় অবস্থাটা স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিকতায় এসে পৌছেচে।

কিন্তু সবার চাইতে চিত্ত-চমৎকারী ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বাঙালী হিন্দুরা তাঁদের মাতৃভূমিকে ইসলামভূমিতে পরিণত হতে দিতে রাজি নন দেখে এই হিন্দু ভদ্রলোকটি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। কোনো মানুষের জীবনে অস্বাভাবিকতা এর চাইতে বেশি আর কিছু হতে পারে কি না সন্দেহ। এই দ্বিতীয় রিপুটির দ্বারা তাড়িত হয়ে দাস গুপ্ত মহাশয় বলছেন,—

> It is therefore highly regrettable that instead of strengthening Gandhiji's hands in this his supreme mission some of our countrymen should be so carried away by longstanding communal outlook as to stand up against the formula.

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এটা মহা-আফসোসের কথা যে সবাই গান্ধীজীর এই তাঁর চরম ব্রত উদ্‌যাপনের সময়ে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াবার পরিবর্তে দেশে এক দল লোক বহুদিনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই ফরমূলার বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

দাসগুপ্ত মহাশয়ের মতো আমার দিব্যদৃষ্টি নেই। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যায় এই কথা যে, যে বাঙালী হিন্দুরা সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে মুসলমানদের সঙ্গে এক দেশে ভ্রাতৃভাবে বাস করবার জন্যে উৎসাহিত হয়েছেন এমন কি উৎকণ্ঠা পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন সেই হিন্দুরা হলেন সাম্প্রদায়িক আর যে মুসলমানরা আজ পাকিস্থানের দাবী তুলেছেন তাঁরাই হলেন অসাম্প্রদায়িক? এই ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ—আজ থেকে নয়, কাল থেকে নয়, পরশু থেকে নয়—আজ হাজার হাজার বছর থেকে। ইসলাম ধর্ম জন্মের বহু পূর্ব থেকে, খ্রীষ্টান ধর্ম আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে হিন্দুর চিন্তা এই দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়ে আছে, তার অস্থিচূর্ণ এর মাটিতে মাটিতে মিলিয়ে আছে। তথাপি যে-হিন্দুরা আজ কোনো বিশেষ দাবী দাখিল করছেন না, ভোটের ক্ষেত্রে চাকুরীর ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ অধিকার, বিশেষ অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করছেন না তাঁরাই হলেন সাম্প্রদায়িক আর যে মুসলমানরা দুই নেশানের ধুয়া তুলে ভারতবর্ষকে ঘরে বাইরে দুর্বল করে তুলবার চেষ্টা করছেন এবং অদ্ভুত সব দাবী দাওয়া তুলে সমস্ত রাজনৈতিক আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলছেন এবং এমন ব্যবহার দেখাচ্ছেন যেন তাঁরা অনুগ্রহ করে এই ভারতবর্ষকে কৃতার্থ করবার জন্যেই এ দেশে জন্মগ্রহণ করছেন তাঁরাই হলেন অসাম্প্রদায়িক? দাসগুপ্ত মহাশয়দের মতো লোকের দৃষ্টি-শক্তি বিদ্যাবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে কি আছে জানি নে। কিন্তু দাসগুপ্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এই সব অসত্য দর্শন অসত্য ভাষণ কোন্ সত্যাগ্রহ-মন্দিরে শিক্ষা করেছেন। মানুষের বুদ্ধি বা বিচারশক্তির perversityর একটা সীমা আছে বলে আমার ধারণা ছিল—এখন দেখছি আমার সে-ধারণা ভুল।

অধীর কামনা মানুষকে অনেক সময় তার মনোমত ঘটনা ঘটবে বলে মনে করায়—একেই ইংরেজীতে বলে wishful thinking। এই wishful thinking অনেক সময় মানুষের মতিভ্রম ঘটায় এবং তখন সে "হয়" কে "নয়" এবং "নয়"কে "হয়" বলে ভাবতে থাকে। এই wishful thinking দ্বারা তাড়িত হয়ে দাসগুপ্ত মহাশয়দের দল আজ ভ্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁদের স্বজাতিকে অযথা গালাগালি দিতে মুখ খুলেছেন।

এই বিংশ শতাব্দীতে ডানকার্ক এবং ফ্রান্সের পতন ইংরেজ জাতির ইতিহাসে এক দারুণ দুর্ঘটনা। কিন্তু সেই নিদারুণ সঙ্কটের সময়েও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা উপহার দেবার কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। তারপর সিঙ্গাপুরের পতনের পর বিচলিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্ভবতঃ মুহূর্তের আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কোন্ সৌভাগ্যক্রমে ক্রীপস্ সাহেবকে এক প্রস্তাব দিয়ে ভারতে পাঠালেন। কিন্তু প্রথম সুযোগেই তাঁরা সে-প্রস্তাব গুটিয়ে নিয়ে আবার দারুভূত জগন্নাথ হয়ে বসলেন। আর এখন ব্রিটিশের সকল দিকেই বৃহস্পতির দশা চলছে এবং আরও স্পষ্ট ব্যাপার যে ব্রিটিশ জাতির পুরোভাগে সর্বেসর্বারূপে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং চার্চিল সাহেব। এই সময়ে যাঁরা মনে করছেন যে জিন্নার সর্তে জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে রাজনৈতিক চালবাজিতে মাৎ করে লজ্জিত করে প্রশ্ন করে স্বাধীনতা আদায় করবেন, তাঁদের এটা wishful thinking ছাড়া আর কিছুই নয়।

তুমি অবশ্য বলতে পার যে তাই যদি হয় তবে তোমরা এখন থেকেই পাকিস্থান নিয়ে এমন সোরগোল তুলেছ কেন—ওটা তো স্বাধীনতা লাভের পরের কথা। সোরগোল তুলছি এই জন্যে যে, স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু সবার অগোচরে পাকিস্থানটা আরও দু-পা এগিয়ে থাকবে।

এ একটা মহা আশ্চর্য ব্যাপার যে হিন্দুকুশের ওপার থেকে ইসলামধর্মী মানুষেরা একদা ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন এবং এদেশে রাজত্ব করেছিলেন; আর আজ এদেশেরই কতকগুলি লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হবার চেষ্টা করছেন। মনে রেখো এই মুসলমানরা হিন্দুবিজেতা মুসলমান নন। এঁরা গোলামিতে হিন্দুদেরই ভ্রাতা—brother-slaves—কিন্তু ইসলাম ধর্মের আওতায় এঁরা হিন্দুর সঙ্গে এই জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করে নিজেদের একটা শ্রেষ্ঠতর জাতির অংশ বলে চালাতে চাচ্ছেন এবং পাকিস্থানের দাবী করছেন। কথাগুলো হয় তো বড় বেশি স্পষ্ট। কিন্তু দেশে আজ এক দল মুসলমান যে-রকম মনোভাব দেখাচ্ছেন তাতে মাঝে মাঝে স্পষ্ট কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য। সে যা-হোক, এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দেখা যাবে যে পাকিস্থানের দাবীর পিছনে কোনো ন্যায় নেই, লজিক নেই এবং যাঁর ঘটে কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে তিনিই বুঝতে পারবেন যে কোনো শুভবুদ্ধি বা কল্যাণ হস্তও নেই। পাকিস্থান ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রজীবনে বিষ-বটিকার মতো কাজ করবে—এটা বুঝবার জন্যে চাণক্যের মতো তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির প্রয়োজন করে না। অথচ সতীশ দাসগুপ্তের দল এরই সমর্থন করছেন এবং বুদ্ধিমান্ যাঁরা এর সমর্থন করছেন না তাঁদের গালাগালি দিয়ে গলা চিরছেন।

পাকিস্থান যদি পাকিস্থানের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তবে তা মুসলমানদের পক্ষে হবে দুর্ঘটনা আর তা যদি তার সীমা ছাড়িয়ে অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় তবে তা হিন্দুদের পক্ষে হবে দুর্ঘটনা। এই দুই সম্ভাব্য দুর্ঘটনা যে-ব্যবস্থায়

সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই ব্যবস্থাকে যে দাসগুপ্ত মহাশয় দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন তার কারণ হচ্ছে এই যে, কর্মী সতীশবাবু হঠাৎ চিন্তাশীলতার চর্চা করতে সুরু করেছেন। অবশ্য দার্শনিক সংজ্ঞানুসারে চিন্তা করাও একটা কাজ—কিন্তু ওটা কাঁচাগোল্লা তৈরির মতো কাজ নয়—ওটা বেশ একটু সূক্ষ্ম কাজ, ওর কায়দা আলাদা। তাই সবার দ্বারা তা ঘটে ওঠে না।

ভারতবর্ষ সমন্বয়ের দেশ। সুতরাং এখানে পাকিস্থানের কোনো স্থান নেই। এ-দেশ হিন্দুর দেশ; মুসলমানের দেশ, খ্রীষ্টানের দেশ, বৌদ্ধ জৈন শিখ পার্শির দেশ। হিন্দুকুশ থেকে কন্যাকুমারী, আফগান সীমান্ত থেকে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত ভারতমাতার সন্তান এই সব হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান বৌদ্ধ জৈন শিখ পার্শিরা। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাণময় শক্তিমান্ সম্পৎশালী চিত্র। ভারতমাতার জননীত্ব যাঁরা অস্বীকার করবেন অন্য ধর্মের লোকদের ভ্রাতৃত্বও তাঁরা অস্বীকার করবেন। সুতরাং তাঁরা এ দেশে হবেন বিদেশী। এটা কেবল ভাবপ্রবণতা বা sentiment-এর কথা নয়, ডিমোক্র্যাসিরও কথা। সুতরাং তাঁদের দাবী-দাওয়া পররাষ্ট্রে বিদেশীদের দাবী-দাওয়া যেটুকু তার চাইতে এতটুকুও বেশি নয়। এই হচ্ছে ডিমোক্র্যাসির অতি স্বচ্ছ মূলতত্ত্ব। গাছেরও খাবো তলারও কুড়োবো-এটা খুব সুবিধার ফরমুলা বটে; কিন্তু এ ফরমূলা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে অনেক অসুবিধা ঘটবেই।

আসছে যুগে, বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার যুগে আন্তর্জাতিক মহলে স্বভাবতই সেই সব রাষ্ট্রকেই শীর্ষস্থানে গিয়ে বসতে হবে যে-সব রাষ্ট্র ধনবলে এবং জনবলে শক্তিশালী সেই সঙ্গে যারা নির্লোভ। শক্তিমান্ ও নির্লোভ দেশের উপরই ছোট ছোট অসহায় রাষ্ট্রগুলি সহজে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে ভরসা পাবে। এবং নির্লোভ হতে পারে তারাই যাদের আপন ঘরেই প্রচুর খাবার আছে। যার পেট ভরা থাকে-তার পক্ষে সাধু হওয়া সহজ। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে এই অবস্থার চারটে দেশ চোখে পড়ে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ। ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তি সম্পর্কে আমেরিকা রাশিয়া ও চীনের নাম ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের নামের পরিবর্তে সেখানে বসেছে ইংলণ্ডের নাম। তার কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতের দেহকে অধিকার করে ইংলণ্ড ভারতের সুখ-সৌভাগ্য আজ দু-শ বছর যেমন ভোগ করে আসছে তেমনি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার অভিনয়ও তার প্রাপ্য বলে সবাই মনে করছে। ভবিষ্য কালে ভারতবর্ষ যাতে নিজস্ব ভূমিকা নিজে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য চাই এক স্বাধীন ও অখণ্ড ভারত। এই রকম ভারতই নির্ভুল ভাবে শক্তিমান্, দীপ্তিমান্ ও আত্ম-প্রত্যয়ী হতে পারে। এবং এই রকম আত্মপ্রত্যয়ী শক্তি-মান্ দীপ্তিমান্ ভারতই দৃঢ় হস্তে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণ করতে পারবে। এই হচ্ছে ভারতের ভবিষ্যতের গৌরবময় চিত্র। এবং এজন্যে আজ চাই কেবল হিন্দু নয়, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন শিখ পার্শী নির্বিশেষে সবার পাকিস্থান এবং আর যে-কোনো খণ্ডিত স্থানের বিরুদ্ধে সমস্বরে প্রতিবাদ তোলা এবং তা অসম্ভব করে তোলা। স্বাধীন অখণ্ড ভারতেই আছে ভারত-বর্ষের সকল ধর্মের সকল মর্মের লোকদের ঘরে সুখ শান্তি ও বাইরে মর্যাদা প্রতিপত্তি। এই অতি স্বচ্ছ সত্যটা যিনি দেখতে না পান বুঝতে না পারেন তিনি হয় অন্ধ নয় ভ্রান্তবুদ্ধি। সুতরাং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করবার কোনোই যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। ইতি হসন্ত

শরৎ-সাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব

শ্রীগীতা বসু

শরৎ-সাহিত্যে জননী বড় একটা নিজ সন্তানকে মানুষ করিবার ভার পান নাই—তাঁহাদের সন্তানগণ সৎমা, জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, দিদি, বৌদি ইহাদেরই হাতে গড়া—সুতরাং স্বভাবতঃ যাহা হইয়া থাকে, শরৎ-সাহিত্যের শিশুগণ তাহাদের শৈশবের ভালবাসা মাকে না দিয়া মাতৃসমাদের ঢালিয়া দিয়াছে—বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পণ্ডিত মশাই, বৈকুণ্ঠের উইল, এই বইগুলি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। "সংসারের সমস্ত ভার অন্নপূর্ণার মাথায় ছিল বলিয়া, তিনি ছেলে মানুষ করিতে পারিতেন না। বিশেষ সমস্ত দিনের কাজকর্মের পর রাত্রে ঘুমাইতে-না পাইলে তাঁহার বড় অসুখ করিত; তাই এ ভারটা ছোট বৌ লইয়াছিল—"(বিন্দুর ছেলে)। "মৃত্যুকালে রামের জননী আড়াই বৎসরের শিশু রাম, এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তের বৎসরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান"-(রামের সুমতি)। 'বৈকুণ্ঠের উইলে' শিশু-চরিত্রের আলোচনা খুব বেশী না থাকিলেও—সৎমা যে কত ভালবাসা দিয়া সপত্নী-শিশুকে মানুষ করিতে-ছিলেন, আর সেই মা-মরা গোকুল তাঁহার কিরূপ অনুগত

হইয়াছিল, তাহার আভাস বৈকুণ্ঠের শেষ দিনে তাহার স্বল্প কথার ভিতরই পাওয়া গিয়াছে; বৈকুণ্ঠ বলিল—"গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেল—আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোন মতেই বিয়ে করতুম না; কিন্তু যখন দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয়তো বাঁচাতে পারবো না, তখনই শুধু বড় কষ্টে বড় ভয়ে ভয়ে রাজী হয়েছিলুম। ভগবান আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোন দিন কোন দুঃখ পাইনি,...।"

শরৎচন্দ্রের শিশু-মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে, আমরা 'রামের সুমতি'র রামকে বাদ দিতে পারি না। বয়সটা মাত্র লক্ষ্য করিলে রামকে শিশু বলিয়া মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু উহার মনের খবর যে রাখিয়াছে, সেই উহাকে শিশু-পর্য্যায়ে ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। শ্রীকান্তের প্রথম জীবনের ইতিহাসটা ঠিক শৈশবকালের না হইয়া কৈশোরের ইতিবৃত্ত বলিয়া তাহা আমাদের বিষয়বস্তুর বাহিরে পড়ে—কিন্তু তাহার মনের ভিতর তখনও যে শিশুসুলভ ভয়, ভাবনা, অন্ধ বিশ্বাসের উত্থান পতন দেখা গিয়াছে সেইগুলির স্থানে স্থানে উল্লেখ হয়তো শরৎ-সাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব বিচারে কিছু সহায়তা করিবে।

আগেই বলিয়াছি, শরৎ-সাহিত্যে শিশু মায়ের অপেক্ষা মাতৃস্থানীয়াদের অধিক ভালবাসে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়-এই সৎমা, জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, দিদি, বৌদির ব্যবহার যে সব সময় বাৎসল্যরসে মধুর এমন নয়—বরঞ্চ তাহাদের অচরণের কর্কশতা স্থানে স্থানে উগ্র হইয়া দেখা দেয়। 'বিন্দুর ছেলে'র কথাই ধরা যাউক—ছেলের দুধ মা যথাসময়ে গরম না করিয়া দেওয়ায় অমূল্যগতপ্রাণা খুড়ীমা শাসাইল যে ইহার পর হইতে সে-ই সে-ভার গ্রহণ করিবে—নিজেই সে-দিন কোল হইতে ছেলেটাকে দুম্ করিয়া মাটিতে বসাইয়া দিয়া "দুধের কড়া তুলিয়া আনিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই, বিন্দু তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, চুপ কর হারামজাদা, চুপ কর্ চেঁচালে একেবারে মেরে ফেলব।" 'রামের সুমতি'তেও দেখি, অপরের বাগান হইতে একটা শশা চুরির অপরাধে ও তাহা অস্বীকার করায় নারায়ণী কম কঠোর হন নাই—নারায়ণী জলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"হাঁ বাঁদর!......বুড়ো ধাড়ী, কাকে চুরি করে বলে, ঐ কচি ছেলেটাও জানে, দাঁড়িয়ে থাক্ এক পায়, পাজি, দাঁড়া বলছি।"

এই একই কারণে শিশুরা তাহাদের মাতৃসমাদের যতটা ভালবাসে ঠিক ততটাই ভয় করে। এইটুকু তাহারা বুঝিয়াছে যে আপন মা যেমন আদর করিবার সময় স্নেহের আতিশয্য দেখান না তেমনি অপরাধের সময় অত কঠোরও হন না—কিন্তু সৎমা, জ্যাঠাইমা, খুড়ীমারা, যেমন নিবিড় করিয়া বুকে টানিয়া লন, তেমনি অপরাধে শাস্তিও চরম দেন। ভালবাসার প্রবাহে এ উগ্রতার সামঞ্জস্য শিশুমন খুঁজিয়া দিশাহারা হয়।—বিন্দুর ছেলেতে বিন্দুর বারণ না মানিয়া অমূল্যের ডাংগুলি খেলা, আর তাহার নেড়া মাথায় জরির টুপী পরিতে আপত্তি, এই দুই অপরাধে যখন যথেষ্ট মার-ধোর করিবার পরও অমূল্যকে উপবাসী কয়েদী থাকিতে হইল—এবং এ ব্যবস্থা যখন স্নেহময়ী ছোট মা করিলেন, তখন অমূল্য এ আচরণের হেতু কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—এটা যে কতদূর অসঙ্গত তাহা ভাবিয়া তাহার ছোট্ট বুকখানি ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। রামের অবস্থাও অনুরূপ। রামের আলাদা হইবার পর তাহার বৌদি তিন দিন তাহার খবর লন নাই, তাহাকে ডাকিয়া খাইতে বলেন নাই তাহার জন্য রান্না করেন নাই—যে-বৌদি আহারের সময় অতি স্নেহে, অতি যত্নে তাহাকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইত তাহার এই বিপরীত আচরণ তাহাকে ব্যথিত ও ভীত করিয়াছিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর এই কথা ভাবিয়া সে সান্ত্বনা পাইয়াছিল যে হয়তো তাহার বৌদির আঘাত গুরুতর, না হইলে এমন নিষ্ঠুরতা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। পণ্ডিত মশাইতেও কুসুম ও চরণের সাক্ষাৎকালে এই ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত আমরা লক্ষ্য করি।

ছোট ছোট ছেলেরা মায়ের কাছে যে-সব শিশুসুলভ আবদার করে, তাহার মধ্য হইতে পাঁচ জনের কাছে বিশেষ কতকগুলি বিষয় লইয়া গল্প করা, ছোটদের বড় লজ্জার কারণ হইয়া পড়ে। ছোটদের এই যে নির্ভরতা, এটা যে একান্ত গোপনীয়, এটা মনে না রাখার ত্রুটি ছোট্ট একটু-খানি প্রাণে কতটা আঘাত দেয়, তাহার খবর শরৎবাবু বার বার দিয়াছেন। অমূল্য তাহার ছোটমার কাছে শয়ন করে, তাঁহার বুকে বাদুড়ের মত আঁকড়াইয়া থাকে—ইহার ভিতর একটা অসীম নির্ভরতা, একটা ভীতু-মনের নিরাপদ আশ্রয়, ভালবাসার একটা গভীর বিকাশ সবই একত্রে মিলাইয়া আছে—কিন্তু এই দুর্ব্বলতা লইয়া যখন মা এবং মাতৃসমারা বাহিরের লোকের কাছে স্বাভাবিক আনন্দে গর্ব্ব করেন, তখন ভুলিয়া যান একটি ছোট হৃদয় কি ভাবে নিপীড়িত হইতেছে।

ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে শিশুরা যাহা কিছু নূতন দেখে তাহাতেই মুগ্ধ হয়। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে যখন তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, তখন আর তাহারা যাহা কিছু নূতন তাহা গ্রহণীয় এ কথা সাহসের সঙ্গে বলিতে পারে না। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, সিগারেটের ধোঁয়া মুখ হইতে

উদগীরণ, হুঁকোর গুড় গুড় আওয়াজ, যাত্রা-দলের কিম্ভুত সাজসজ্জা, নাকিসুরে নাটুকে কথা, এই সব শিশু-জগতে একটা অসীম বিস্ময়কর ব্যাপার। এই সকল কাজ নিষিদ্ধ হইলেও, তাহাদের তখন কৌতূহল নিবৃত্তি হয় নাই—নূতন জিনিষ নিজে করিতে বড় ইচ্ছা হয়—অথচ মনে মনে বড়দের ক্রোধ, বারণ তাহারা অনুভব করে, সুতরাং উপায় না দেখিয়া উঁহাদের অজ্ঞাতে তাহারা প্রথম ছলনার বশবর্ত্তী হয় এবং এক বার দুই বার লুকাইয়া, সেটা যে এমন কিছু অন্যায় কাজ নয় এই ভাবিয়া তাহারা নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। 'বিন্দুর ছেলের' ভিতর শরৎবাবু নরেনের অনুকরণে অমূল্যের চুলকাটার মনস্তত্ত্বের এই বিশ্লেষণ সুন্দর ভাবে করিয়াছেন। এই সঙ্গে বৈকুণ্ঠের উইলে দেখিয়াছি, বই দেখিয়া পরীক্ষায় লেখা যে নিন্দনীয় এ কথা গোকুলকে কেহ না বলিলেও এবং মাষ্টার মশাই নিজে তাহাকে উৎসাহ দিলেও সে নকল করিতে পারে নাই, তাহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি তাহাকে বাধা দিয়াছিল। আগে বলিয়াছি, এ বয়সে গোপন করিবার, ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা ঠিক গঠন হয় না—অমূল্য তাই তাহার বাবা, কাকা এবং ছোটমাকে বিনা সঙ্কোচে বলিয়াছিল—"বেশ যাত্রা ছোট মা! কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার চমৎকার খ্যামটা নাচ হবে। কলকাতা থেকে দু'জন এসেছে, নরেনদা তাদের দেখেচে, ঠিক ছোটমার মত—খুব ভাল দেখতে—তারা নাচবে বাবাকেও বলেছি।" এর পরেই শরৎবাবু দেখাইয়াছেন, এই এতটুকু ছেলেটা সত্যগোপন করিতে শিখিয়াছে।

সেই রাত্রে আমরা বিন্দুকে বলিতে শুনিলাম, "দিদি, কিন্তু এখানে আমার আর থাকা চলবে না। অমূল্য তা হলে একেবারে বিগড়ে যাবে। আমি যদি মানা না করতুম তা হলে একটা কথা ছিল; কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও, এত বড় দুঃসাহস ওর হ'ল কি করে, তখন থেকে আমি এই কথাই ভাবচি। তার ওপর বজ্জাতি বুদ্ধি দেখ! আমার কাছে যায় নি, এসেছে তোমার কাছে; বাড়ী ফিরে যেই শুনেছে আমি ডাকচি অমনি গিয়ে বটঠাকুরকে সঙ্গে করে এনেছে। না দিদি, এতদিন এসব ছিল না ···"।

শ্রীকান্তকে সিগারেট হাতে লইয়া শঙ্কিত হইতে দেখিয়াছি; এই অল্প বয়সে সিদ্ধি সিগারেটের নেশা যে ন্যায়সঙ্গত নয় এ কথাটা সে জানিত বলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল—"চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে?" দেবদাসের বুদ্ধি-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞানটুকু হইয়াছিল, তাই সে সিগারেট, তামাক খাওয়ার জন্য একটা নিরিবিলি গোপনীয় স্থান বাঁশঝাড়ের ভিতর স্থির করিয়াছিল—এর খবর কেবলমাত্র পার্ব্বতী জানিত।

নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের ভিতর কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিলে, ছোটদের দৃষ্টিকে তাহা ফাঁকি দিতে পারে না। বিন্দু সেদিন অমূল্যকে না জানাইয়া বাপের বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, "এমন সময় বই-বগলে করিয়া স্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অনতিপূর্ব্বে সে বাহিরের পথের ধারে একটা পাল্কী দেখিয়া আসিয়াছিল, এখন হঠাৎ পায়ের দিকে নজর পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পায় আলতা প'রেচ কেন, ছোটমা?" কি জানি কেন, বালকের মনে হইল হয়তো, এই পাল্কী যাহা কখনও ঐস্থানে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, আর ছোটমার পায়ের আলতা, যাহা আগে কখনও ছোটমার পদযুগল রঞ্জিত করে নাই, এই দু'য়ের যখন একই সঙ্গে আবির্ভাব, হয়তো তাহা হইলে দু'য়ের ভিতর কোনও যোগাযোগ আছে। 'রামের সুমতি'তে রাম বৌদিকে পেয়ারা ছুড়িয়া আঘাত করিবার পর "সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসম্ভব কল্পনা করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ী ঢুকিল। দেখিল, উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাচা-বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়ীটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে।...রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও ঐ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।···ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গেল।" ছোটদের লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদের ভাবিবার শক্তি আছে, সম্ভব-অসম্ভবে মিশিয়া, ভয়ঙ্কর-মধুরে মিলিয়া তাহাদের কল্পনা-জগৎ বড়দের হইতে ঢের বেশী প্রশস্ত।

ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন মানুষ শৈশবে যেমন দেখে এমন হয়তো জীবনে আর কোনও সময় দেখে না—কারণ তখন সম্ভব-অসম্ভবে গোল বাধে না। যাহা বাঞ্ছনীয় তাহাই সম্ভব এই ধারণাটাই তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। 'দত্তা'তে জগদীশ, বনমালী, রাসবিহারী তিনটী বালকের কি ভালবাসাই ছিল! বটতলায় বসিয়া নেড়া বটকে সাক্ষী করিয়া এই তিনটি বালক ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল এইরূপ স্বপ্ন বহু বালক বালিকা দেখিয়াছে। কোন বালক বালিকাই বিচার করে নাই, ইহার ভিতর কতটা সম্ভব কতটা অসম্ভব—কেমন করিয়াই বা করিবে, তাহাদের সে-শক্তি তখন হয় নাই। একটি ছোট শিকড়-হীন অশ্বত্থ গাছ, বহু যত্নে রাম পুঁতিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু স্বপ্নটাকে যখন বৌদি আঘাত করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন "উঠানের মাঝে অশ্বত্থ গাছ কি হবে!" রাম তখন কম আশ্চর্য্য হয় নাই। বলিল—"কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছাওয়া হবে বলতো! আর এই যে ছোট্ট ডালটি

দেখচ···উটি বড় হলে—গোবিন্দের জন্য একটা দোলা টাঙিয়ে দেব।" ভালটি যখন দোলা বহন করিবার উপযুক্ত হইবে, তখন যে ছোট্ট গোবিন্দের দোলায় বসার প্রয়োজন বা আগ্রহ থাকিবে না, সে কথা রামের মাথায় আসে নাই—সময়ে গাছটি বড় হইবে, কিন্তু শিশু গোবিন্দ শিশুই থাকিবে! এই তো ঠিক কচি মনের ভাবুকতা।

শিশু-মনে নিত্য যে রঙের স্রোত বহিতেছে—তাহার স্থানে স্থানে অল্প কথার প্রকাশ শরৎচন্দ্রের শিশু-চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতার পরিচায়ক। পার্ব্বতীর নিকট দেবদাসের তিনটি টাকা গচ্ছিত ছিল, পারু তিনটি বোষ্টমীকে তাহা দান করিয়াছিল। দেবদাস বলিয়াছিল—"আমি হইলে দু'টাকা দিতাম এবং প্রতিজন দশ আনা তের গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি করিয়া পাইত।" পার্ব্বতী তখন মনে করাইয়া দিয়াছিল তাহারা দেবদাসের মত আঁক জানে না। দেবদাস খুশী হইয়া বলিয়াছিল, "তা বটে—অনুভব করিয়াছিল, বুঝিয়াছিল যে বোষ্টমীরা পাঠশালায় মণ-কষা পর্য্যন্ত পড়ে নাই, তাহাদিগকে তিন টাকার বদলে দুই টাকা দিলে তাহাদের প্রতি কতটা অত্যাচার করা হইত।" তাহারা দুইটি টাকা লইয়া কি সমস্যায় না পড়িত।

গুরুজনদের ব্রত, মানত, ঠাকুর দেবতার কাজে লাগিয়া থাকিতে দেখিলে স্বভাবতঃই ছোটরা সেই সবের উপর আস্থাবান হইয়া উঠে। ঠাকুরের রাগ, 'বে-বারে'র কোন কাজের ফলের প্রতি তাহাদের ভয় বড়দের অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী। রামের মত দুর্দ্দান্ত বালকের কথাই ধরা যাক্—তাহার অশ্বত্থ গাছটি যখন দিগম্বরী ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তখন বাড়ীর সকলেই জানিত আজ বাড়ী ফিরিয়া রাম একটা কাণ্ড করিবে। কিন্তু তাহার স্নেহময়ী বৌদি যখন শান্ত কণ্ঠে 'বে-বারের' দোহাই দিলেন, তখন সমস্ত ব্যাপারটারই একটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। এই সঙ্গে শরৎবাবু দেখাইয়াছেন যে ছোটরা যাহাদের ভালবাসে, তাহাদের অমঙ্গলের মত অঘটন তাহাদের কাছে আর কিছু নাই।

ছোটদের ভালবাসা সুন্দর, নির্ম্মল—তাহারা যাহাদের ভালবাসে তাহাদের সম্পূর্ণভাবে নিজের করিয়া পাইতে চাহে। তাহাদের মধ্যে কোনও অন্তরায় অসহ্য। এই কারণে দিগম্বরী রামের দুই চক্ষের বিষ হইয়াছিল। আলাদা হইবার পর, রামের বিশ্বাস হইয়াছিল তাহার দিদিমা বুড়ীই যত নষ্টের মূল। 'দেবদাসে' পার্ব্বতীরও ভুলোর উপর বড় রাগ হইয়াছিল, তার মনে হইয়াছিল যেন সেই শুধু দেবদাসকে গৃহছাড়া করিয়াছে।

আরও একটা কথা—ছোটরা যাহাদের ভালবাসে তাহাদের আঘাত করিয়া যেমন যন্ত্রণা ভোগ করে তেমন বোধ হয় আর কেহ করে না। রামের হাত হইতে অসাবধানে একটা কাঁচা পেয়ারা বৌদির কপালে লাগিয়াছিল। "সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই একটা কথা ভাবিতেছিল, বৌদির না জানি কত লাগিয়াছে! একটা কাঁচা পেয়ারা লইয়া বারবার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এ কুকর্ম্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদি তাহাকে এখানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সে স্থির করিল সে আর কোথাও চলিয়া গেলে, বৌদি খুশী হইবে।" কার্য্যতঃ সে ইহা করিতেও গিয়াছিল—এই ত্যাগ তাহার ভালবাসার কি গভীর নিদর্শন! পার্ব্বতী রাগের মাথায় দেবদাসের বাবার কাছে নালিশ করিয়াছিল। দেবদাসের লুকাইয়া তামাক খাওয়ার কথা পূর্ব্বে না জানানোর কারণে বলিয়াছিল, তাহার মায়ের ভয় ছিল। "কথাটা কিন্তু ঠিক তা'ই নহে। প্রকাশ করিলে দেবদাস পাছে শাস্তি ভোগ করে, এই ভয়ে সে কোন কথা বলে নাই। আজ কথাটা শুধু রাগের মাথায় বলিয়া দিয়াছে। ···বাড়ী গিয়া বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া ঘুমাইয়া পড়িল—সে রাত্রে ভাত পর্য্যন্ত খাইল না।"

শিশুমহলে বয়সের আর গুণের খাতির আছে। 'শ্রীকান্ত'তে মেজদার অধীনে একটি দল ছিল, যাহার উপর মেজদার নির্দ্দয়তার সীমা ছিল না। রামেরও গোবিন্দ আর ভোলাকে লইয়া একটি দল ছিল, সেখানে রামের কথাই শাস্ত্রবাক্য! মেজদার প্রজারা মেজদার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিত না, কিন্তু ভয়ে কোন দিন বিদ্রোহ করিতে সাহস করে নাই। রামের দুইটা চেলা তাহার গুণমুগ্ধ ছিল, এবং খুবই অনুগত ছিল। গণেশকে যখন বন্দী করা হয় তখন ভোলা ক্ষিপ্রতার সহিত প্রভুকে খবরটা দিয়াছিল, এবং এই বিষয়ে খুব নিপুণতার সহিত দৌত্য-কার্য্য করিয়াছিল। শ্রীকান্ত প্রথম দর্শনেই ইন্দ্রনাথের বশ্যতা ভালবাসার সহিত মনে মনে স্বীকার করিয়াছিল; কোনও কাজে না বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথের লুপ্ত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের জন্য নিত্য কত কষ্টে বৈঁচির মালা সংগ্রহ করিয়া আনিত। মার্কা একটু ছোট হইলে শ্রীকান্ত তাহাকে কত মারিত, কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহাতে এক দিনও অনুযোগ করে নাই, এমনি সে শ্রীকান্তের গুণমুগ্ধ ছিল। কিন্তু সব বালক-বালিকা সমান নয়—পার্ব্বতী দেবদাসের ভক্ত, অনুরাগী হইয়াও অত্যাচার সহ্য করিতে নারাজ ছিল—এবং প্রায়ই বিরুদ্ধাচরণ করিত। পার্ব্বতী বিদ্রোহ করিত বটে, কিন্তু গুরুর প্রতি ভালবাসা তাহারও কম ছিল না, তাই দেবদাসের পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হইলে, সেই ছোট্ট আট বছরের

নগর-দ্বারে অরাতি

কাড়ানাকাড়ায় পড়ল ঘা, বেজে উঠল রণদামামা! শত্রু নগর-প্রাকার ভেঙে ফেলেছে! সংবাদ গেল তৎক্ষণাৎ নগরের শাসন-কেন্দ্রে। সেখানকার আদেশে দেখতে দেখতে নগরের বিস্তৃততর পথ দিয়ে কাতারে কাতারে ছুটল সেনাবাহিনী, সেই সঙ্গে এল যুদ্ধোপকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। শত্রুর আক্রমণে নগর-প্রাকার যেখানে ভেঙেছে সেখানেই চলেছে এই অভিযান।

শত্রু প্রাকার ভেঙে প্রবেশ করতে না করতেই সৈনিকেরা এসে তাদের ছেঁকে ধরলে চারি দিক থেকে। তখন নগরের রুদ্ধ জলস্রোতের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে দুর্ব্বার স্রোতে শত্রুর দলকে ভাসিয়ে বার করে দেবার জন্যে তারই ভেতর আরম্ভ হ'ল সংগ্রাম, ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম। মহাবল নগর-রক্ষী সৈনিকদেরও অনেকে তাতে প্রাণ দিলে কিন্তু অসংখ্য বিপক্ষকে বিনাশ না ক'রে নয়। হতাহতে রণস্থল ছেয়ে গেল। মৃতের স্তূপ হয়ে উঠেছে পর্ব্বত-প্রমাণ। এই রাশীকৃত শবের পাহাড়ে বাধা পেয়েই যে পিছনের সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ যথাস্থানে পৌছাতে পারবে না! না সে ভয় নেই। নগর রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত। যেমন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে রণক্ষেত্রে সৈনিক ও যুদ্ধোপকরণ পাঠান হচ্ছে, তেমন সুশৃঙ্খলায় রণক্ষেত্র থেকে শত্রুমিত্র সকলের মৃতদেহ অপসারিত করেছে বাহকেরা। মৃতের জায়গায় নূতন সৈনিক এসে দাঁড়াচ্ছে।

শেষ অরাতি নিপাত না হওয়া পর্য্যন্ত এমনি চল্‌ল সংগ্রাম। তারপর সৈনিকেরা রণক্ষেত্রের আবর্জ্জনা বয়ে নিয়ে ফিরে গেল। ভগ্ন নগর-প্রাচীর পুনঃনির্ম্মাণের কাজ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধ করেছিল সৈনিকেরা, এখন নগরের কারুরা লেগেছে কাজে। যত শীঘ্র সম্ভব নগর-প্রাকার তারা আবার সংস্কার ক'রে ফেলবে।

শ্রাবস্তী কি উজ্জয়িনী কিম্বা প্রাচীনকালের আর কোন নগর অবরোধের কাহিনী এ নয়। এ কাহিনী আমাদের নিজেদের। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে মানুষের দেহে। শরীরের ক্ষত-মুখে বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করার সঙ্গে যে ব্যাপার ঘটে এ কাহিনী তার সম্পূর্ণ রূপক মাত্র।

আমাদের দেহ সুশৃঙ্খল, সুরক্ষিত নগরের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর। আততায়ীকে বাধা দেবার ও তাকে পরাস্ত করবার শক্তি ও উপায় তার কল্পনাতীত। শরীরের শত্রু বিনাশে বাইরে থেকে সাহায্য করাও দরকার কিন্তু শরীরের নিজস্ব পদ্ধতি না জেনে অন্য পথে তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা।

আক্রান্ত নগরের সাহায্যে যদি এমন সৈন্যদল পাঠান যায়, যারা শত্রু-মিত্র চেনে না; নির্ব্বিকারে সকলকেই সংহার করে, তাহলে উপকারের বদলে ক্ষতিই করা হয় নিশ্চয়। ক্ষত চিকিৎসায় সাধারণ জীবাণুনাশক ঔষধ অনেকটা এমনি শুধু জীবাণু নয় শরীরের সৈনিকরূপী শ্বেত-রক্ত কণিকাও তার দ্বারা বিনষ্ট হয়, শরীরের তন্তু হয় ধ্বংস।

জীবাণু বিনাশ এবং ক্ষত আরোগ্যের জন্য তাই এমন জিনিস প্রয়োজন যা শরীরের নিজস্ব পদ্ধতিতেই তাকে সাহায্য করবে, গভীর ভাবে যত দূর প্রয়োজন প্রবেশ ক'রে শত্রু ধ্বংসের সঙ্গে শরীরের নিজস্ব রোগজয়ী শক্তিকেই নতুন প্রেরণা দেবে। এ রকম ঔষধ শুধু কল্পনার জিনিস আর নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাকে সম্ভব ও সত্য ক'রে তুলেছে বেঙ্গল ইমিউনিটির **'বাই ফ্লাভিষ্টিনএ'**।

বিজ্ঞাপন

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই

রূপকথার একটি গল্পে আছে কোনও এক ব্যক্তিকে ভগবান একবার দেখা দিয়ে বলেছিলেন, তুমি কি বর চাও বল, আমি তাই তোমাকে দান করব।

লোকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বহুক্ষণ ধরে ভগবানের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে পারল না। অর্থাৎ হৃদয়ে সমুদ্র মন্থন করেও সে ঠিক বুঝতে পারল না সমস্ত মন দিয়ে সে কি চায়, কোন বস্তু পেলে জীবনে সে সত্যিকারের আনন্দ ও সুখ পেতে পারে।

দিকে দিকে যে দিকে তাকাই দেখি সকলেরই এই অবস্থা। ভগবানের কাছে কি যে চাই, কি যে আমাদের সমগ্র জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা নিজেরাই জানি না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা হাতড়ে মরি এমন একটা কিছুর জন্য যা অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সত্যিকারের সুখের জন্য এই মিথ্যে খোঁজার তৃষ্ণার শেষে ব্যর্থতার বেদনা মনকে অভিভূত করে' ফেলে। কখনও আমরা ভাবি সারা জীবন ধরে পেট ভরে খেয়ে পরে কোন রকমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারাই বুঝি জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, কখনও ভাবি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে না পারলে জীবন বুঝি বৃথাই গেল। কখনও ভাবি খ্যাতি ও সম্মান যদি না পেলাম তবে অর্থের প্রাচুর্য্যে আমার কিসের প্রয়োজন আবার কখনও ভাবি "ধন নয় মান নয়, এতটুকু আশা—শুধু ভালবাসা!"

এমন করে অর্থে ও সামর্থ্যে, খাদ্যে ও খ্যাতিতে, সমৃদ্ধিতে ও সম্মানে আমরা ক্রমাগত সারা জীবন ধরে কি যে খুঁজি, তাকে খুঁজেই বেড়াই।

এই সকল চাওয়ার মূলে রয়েছে একটি চাওয়া যা আমরা জেনেও জানি না—পেয়েও নষ্ট করি। মানুষ চায় বাঁচতে আর তার জন্যেই চাই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রোগহীন নির্ম্মল দেহ। জীবন-জোড়া সুখের চাবিকাঠি রয়েছে মানুষের সুস্থ সবল সুগঠিত দেহে। দেহকে সতেজ সক্রিয় ক'রে রাখতে পারলে মনও থাকে সদা প্রফুল্ল। সহরের রুদ্ধ প্রাচীরের কারাগারে চিমনীর ধোঁয়ায় কলুষিত আকাশের নীচে আমাদের স্বাস্থ্য আমরা পলে পলে ক্ষীণ, জীর্ণ, দুর্ব্বল করে এনেছি এবং তার জন্য জীবন-জোড়া অনুশোচনায় কাটাতে হয়। আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ঠিক কোন জিনিসের প্রয়োজন, কি আমাদের চাওয়া উচিত এ বিষয়ে যদি প্রথম থেকেই একটু সচেতন হই তাহলে **"বাই-ভিটা-বি"** আমাদের নষ্ট স্বাস্থ্যের অনুশোচনা থেকে মুক্তি দিতে পারে; আমরা বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে পারি।

শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া যে আমাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য অনেক সময় আমরা তা ভুলে থাকি। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলার দরুণ অনেক সময় আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ি এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা রকমের দুরারোগ্য কঠিন রোগ—সামান্য শারীরিক অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতির লক্ষণ থেকে যখন বড় আকার ধারণ করে' আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে তখন জলের মত টাকা ঢেলেও আমরা হারানো স্বাস্থ্য আর ফিরে পাই না। অনেক খাদ্যে 'ভিটামিন বি'র অভাবই শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। গোড়ায় যদি আমরা এই অভাব উপলব্ধি করি এবং 'বাই-ভিটাবি'র কথা মনে করি তা হ'লে অনায়াসে এই স্বাস্থ্যহানির দরুণ গুরুতর বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

আমাদের এই চাওয়ার সামান্যতম ত্রুটির জন্য সারা জীবন আমরা রোগজীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দেহ নিয়ে বেঁচেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকার দুর্ব্বিষহ জ্বালা ভোগ করি এবং অবশেষে একদিন মরে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাই।

বিজ্ঞাপন

বালিকা কি উপায়ে তাহারও পাঠশালায় যাওয়া স্থগিত করিয়াছিল তাহা আমরা সকলেই জানি।

শরৎচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শিশু-চরিত্রের মনস্তত্ত্বের আলোচনা এমন সুচারু সুদক্ষ ভাবে করিয়াছেন যে আমাদের মনে হয়, আমরা এই কচি কচি বালক বালিকাকে দুষ্টামিতে, ভালমানুষিতে, বোকামিতে, চালাকীতে, সারল্যে মাখামাখি হইয়া চোখের সামনে দেখিতেছি—শরৎ-সাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব এত সহজ, এত সুন্দর, এত স্বাভাবিক, এত জীবন্ত।

বিক্রয়-করের অর্থনীতি

শ্রীনিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের দরুন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষভাবে ব্যয়ভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিরও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ যে-সকল প্রদেশ যুদ্ধের আওতায় অবস্থিত যেমন আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতির ত কথাই নেই। যে মুদ্রাস্ফীতি ভারতের হাট-বাট ছাপিয়ে উঠেছে তারই প্লাবনের জলধারা জমাট বাঁধছে বাংলা ও আসামের বুকে। আর সেই প্লাবনের অথই জলে নিমগ্ন হয়েছে বাংলার শতসহস্র অসহায় নরনারী, স্তিমিত হয়ে এসেছে অগণিত জীবনদীপ। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। ভারতবর্ষে অবস্থিত সৈন্যের অধিকাংশই এখন বাংলা ও আসাম অঞ্চলে। যুদ্ধ-ভাতাও তাদের শুধু এই অঞ্চলে থাকাকালীনই প্রাপ্য। যুদ্ধ-ভাতার হার বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। তারপর আমাদের টাকার পরিমাপে আমেরিকান সৈন্যদের বেতনের স্থূল পরিমাণ এবং তাদের ব্যয় বাহুল্যও ভেবে দেখা উচিত।

স্বাভাবিক ভাবেই এমন অবস্থায় পূর্ব্বাঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির আপেক্ষিক প্রকোপ অনেকটা বেশী। দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষার ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এবং একুনে অধিকমাত্রায় নোটের প্রচার-লাভ ঘটে সেরূপ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলিরও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাদের নোটপ্রচারের ক্ষমতার অবর্ত্তমানে নূতন নূতন করস্থাপনই অর্থসমাগমের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বাংলা গবর্ণমেণ্টের বেলায় এই যুক্তিটি বিশেষ

প্রযোজ্য। ব্যবস্থা-পরিষদের বিরোধী পক্ষ এবারকার বজেটকে 'দেউলিয়ার বজেট' বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা ও তার পার্শ্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্টগুলি ত দেউলিয়া হতে বাধ্য। এই দেউলিয়া হবার মূলে রয়েছে যতটা না বাংলা-সরকারের অনবধানতা তার চেয়ে অনেক বেশী ভারতে প্রযুক্ত অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার ভ্রমাত্মক নীতি। এর আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়েছি। তবে, এরূপ অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে আবার রাজনৈতিক অচল অবস্থা। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক-সংগ্রাম পরিচালনা ও রাজনৈতিক সন্তোষ এ দুয়ে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

বিভিন্ন সদস্যের মত হচ্ছে এই যে, এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য নূতন কর ধার্য্য করার পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সাহায্য নিলেই চলত। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান ত হতই না বরং সমস্যাটা জটিলতর হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে গেল।

—মাগিছেন ধন সেই মহীপতি ভিখারী আমার মত।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিপাকে কেন্দ্র নিজেই ত হাবুডুবু খাচ্ছে। শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বারে দ্বারে। আর সেই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হবার ফল হবে কেন্দ্র কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ—নোট ছাপিয়ে টাকার সংস্থান যার ফলেই না আমাদের এই দুর্ভোগ। একথা ভুললে চলবে না যে বা'র থেকে বাংলায় টাকার আমদানী করার অর্থ শুধু বাংলায় আর্থিক প্লাবনকে ছাপিয়ে তোলা ও তারই প্রবাহে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষমান বাংলার অগণিত জনগণের আত্মাহুতি। বাংলার এই দুরবস্থার কথঞ্চিৎ প্রশমনও যদি গবর্ণমেণ্টের কাম্য হয়ে থাকে তবে তার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে নালা কেটে আর্থিক-প্লাবনের জলধারাকে নির্গত করা ও বহিরঞ্চল থেকে সামগ্রী এনে বাংলার বুকে 'চর' সৃষ্টি করার সক্রিয় প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিক-সংগ্রাম পরিচালনার নীতিগত ভিত্তির আলোচনা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। শুধু এই কথা বলেই আমরা ক্ষান্ত হব যে ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার উপর চেপে বসে যদি বিচার করি তা হলে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মায় যে, যে-ব্যবস্থা দ্বারা অর্থনৈতিক-সংগ্রামে লাভ অনায়াসলভ্য তার বিশিষ্ট অংশই হচ্ছে 'করধার্য্য'-করণ।

করস্থাপন ভারতের সাম্প্রতিক অবস্থায় প্রকৃষ্ট উপায় বটে, কিন্তু এর কার্য্যকারিতা ও গুণাগুণ নির্ভর করবে এর ধার্য্য-রীতির ওপর। এটি সহজেই প্রতিপন্ন করা যায় যুদ্ধ-ব্যয় ভার বহনের পক্ষে করস্থাপন ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী voluntary loan-*cum* inflation (ইচ্ছাকৃত ঋণদান গ্রহণ ও মুদ্রাস্ফীতির) এর চেয়ে হেয় ত নয়ই বরং অনেকাংশেই

সুকুমার রায়ের

ঝালাপালা

আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের হাসির নাটক নেই। সুকুমার রায়ের "ঝালাপালা" দেশের সেই অভাব, সেই লজ্জা দূর করল এতদিনে। চার-চারটি নাটক এই বই-এ—প্রত্যেকটি হাসির বারুদে ঠাসা। যেমন মজার গান তেমনি মজার কথাবার্তা। তেমনি সব মজাদার চরিত্র। এমন হাসির ব্যাপার যে ছেলেমেয়েরা শুধু পড়েই শান্তি পাবে না, অভিনয় করে আরো অনেকের মধ্যে সে হাসি সংক্রামিত করে দিতে চাইবে। এ সেই হাসি যে হাসিতে বুদ্ধি খোলে, চিন্তায় শান পড়ে, মনের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়। ছবিতে, ছাপায়, মলাটে, বাঁধাইয়ে অনিন্দ্যসুন্দর। দাম দুটাকা

বহুরূপী

সুকুমার রায় হঁকোমুখো হ্যাংলাদের একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলা দেশ থেকে, এবার তাগাবেন ভেতো ভূতুড়েগুলোকে। এবার ছেলেরা অনেকদিন পরে অনেকক্ষণ ধরে হাসবে, আবার তারা সুস্থ ও সহজ হবে। রহস্য-রোমাঞ্চ নিয়ে যে লেখা সেগুলি যে কত অপদার্থ এবার তারা তা বুঝতে পেরে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে। লেখার সঙ্গে মিলেছে এসে ছবি, সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগা। দাম এক টাকা বারো আনা, কিন্তু মনে হবে যেন হাতের মুঠোতে চাঁদ নিয়ে চলেছি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

রাজ কাহিনী

রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনার ইতিহাসকে নিয়ে আসা হয়েছে রঙীন, রসাল ও রুচিকর উপন্যাসে। নির্জীব পাথরে যে-আগুন ছিল প্রচ্ছন্ন হয়ে তাকেই নিয়ে আসা হয়েছে আকাশের জ্যোতিষ্কের দ্যুতিতে। উজ্জ্বল, প্রসাদ-প্রসন্ন, মধুবর্ষী ভাষা—যে ভাষায় রঙ ও রেখা, ছবি ও ছন্দ, পরস্পরের সঙ্গে মিশে রয়েছে এক হয়ে, আকাশে মেঘ ও রৌদ্র ও বাতাসের মতো। যার হাতে তুলি হচ্ছে লেখনী আর লেখনী হচ্ছে তুলি, শিল্প ও কথায় যিনি সার্বভৌম সম্রাট সেই অবনীন্দ্রনাথের রচনা। বিচিত্র, সোনালি, ত্রিবর্ণ মলাট, নয় খানা বহুবর্ণ ছবি, দুই খণ্ড একত্রিত প্রথম সংস্করণ। দাম দুটাকা বারো আনা

ক্ষীরের পুতুল

ছেলেদের জন্যে তৈরি আজকালকার খেলো বাজে-মার্কা রহস্য-রোমাঞ্চের মাঝে অবনীন্দ্রনাথের "ক্ষীরের পুতুল" যেন ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিকচিকে জল। আগাছা-জঙ্গলের মাঝে বিশল্যকরণী। অধম ও জঘন্য লেখা পড়ে পড়ে ছেলেদের কল্পনা গেছে মরে, স্বাদ গিয়েছে বিগড়ে। মরা-মরা দেশে অবনীন্দ্রনাথ সোনার কাঠি হাতে নিয়ে এসেছেন, মুহূর্তে মৃত-শাখায় জাগছে কিশলয়। ছেলেরা ফের ফিরে পাচ্ছে তাদের ভাষা, স্বাস্থ্য ও লাবণ্য। অমূল্য বই-এর দুর্মূল্য ছাপা, দুর্মূল্য ছবি। এক টাকা বারো আনা দাম, কিন্তু মনে হবে যেন সাত জাহাজ সোনা কিনে বাড়ি ফিরলাম।

জননী জন্মভূমিশ্চ

নব সজ্জায় দ্বিতীয় সংস্করণ। বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের একটি চিরকালিক সমস্যার আধুনিক আলেখ্যায়ন। অন্নপ্রধান সমাজের প্রধানতম প্রসঙ্গ। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের, প্রাপ্তির সঙ্গে অপরিতৃপ্তির। ঘরোয়া ঘটনাও যে লেখার গুণে কতটা রহস্যঘন হতে পারে এ-বই তার প্রমাণ। জীবন্ত ভাষা, উজ্জ্বল চরিত্র ও বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি—যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব, সমস্তই এই উপন্যাসে পরিস্ফুট। অভিনব প্রচ্ছদপট ও ছাপা। দাম দুটাকা

আধুনিক

সোভিয়েট গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সোভিয়েট রাশিয়ার ১২ জন বিখ্যাত লেখকের ১২টি গল্পের বহু প্রশংসিত অনুবাদ। "প্রবাসী" বলেছেন—"অনুবাদকের মনে শিল্প সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থাকার দরুণ প্রত্যেকটি বাক্যের গঠন ও বিন্যাস রস-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। শুধু তর্জমার চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে নেই, চলে এসেছে সাহিত্যের মুক্ততীর্থে। অচিন্ত্যকুমারের মতো শিল্পীর হাতে না পড়ে এ-অনুবাদের ভার আর কারু হাতে পড়লে তা শুধু তর্জমাই হতো, সাহিত্য হতো না।" দাম সাড়ে তিন টাকা

অল কোয়ায়েট্

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় রেমার্কের এই বিখ্যাত বই অতি সুন্দর অনুবাদ করেছেন। নব কলেবরে, বহু নতুন চিত্র সংযুক্ত তৃতীয় সংস্করণ। দাম ২৷০

শিগগিরই বাজারে পাওয়া যাবে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহ বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত "ভেজাল।" অচিন্ত্যকুমারের নতুন নাটকের বই "নতুন তারা"

প্রকাশক—সিগনেট প্রেস
১০৷২ এলগিন রোড, কলিকাতা

শ্রেয়ঃ।* কিন্তু এর ধার্য্যকরণ যদি যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা পরিচালিত হয়, করভারের সুবণ্টন যদি ব্যাহত হয়, তা হলেই বিপদ। তখন এর সহজাত গুণ সকল নষ্ট হয়ে গিয়ে এটা একটা প্রতীপ, দুর্ব্বিবহ দানবে পরিণত হয়ে ওঠে। অধুনা বাংলা গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়-করের হার দ্বিগুণ বাড়িয়েছেন। এই করটি আমাদের দেশে নূতন হলেও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সুপরিচিত ও বহুপরীক্ষিত। এ করভার বহন করবে কে—ক্রেতা না বিক্রেতা—এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় এ করটি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করার ফলে যখন এর সাকারত্ব লাভ ঘটেছে, তখন বলা যায় যে এ করভারটির বণ্টন নির্ভর করবে কোন জিনিসের চাহিদা কিংবা সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতার আপেক্ষিক গুরুত্বের ওপর। ভারবহনকারী যেই হোক, আমেরিকার দৃষ্টান্ত থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঘাট্‌তি বজেট দ্বারা বিব্রত গভর্ণমেণ্টগুলির নিকট করটি বড়ই প্রিয় কিন্তু এই আপাতদুষ্ট হীন করটি স্থাপনের ফলে যে গূঢ় অর্থনৈতিক জটিলতার আবর্ত্তের সৃষ্টি হয় তারই একটু আভাস এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করব।

প্রথমতঃ, জিনিসের হস্তান্তরকরণের ওপরেই করটি স্থাপিত। পূর্ব্বে যে জিনিসটি বহু বার হস্তান্তরিত হয়ে ওর চরম রূপ লাভ করত, করভার এড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীদের চেষ্টা হবে এখন সেই জিনিসগুলির হস্তান্তর করণ ন্যূনতম পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ করা।† এই সীমাবদ্ধ করার প্রণালী হচ্ছে কোন একটা বস্তুর বিভিন্ন খণ্ডের অথবা বিভিন্ন অবস্থার প্রস্তুতকারী ফার্ম্মসমূহের সমন্বয় সাধন (Vertical Integration)। মনে করুন,. জুতো প্রস্তুত করার বিভিন্ন পর্য্যায়ে নিযুক্ত আছে বিভিন্ন ফার্ম্ম যেমন, Leather Tannery, Leather Cutting factories, lace fitting polishing ইত্যাদি। Tannery কাঁচা চামড়া ক্রয় করার সময়ই প্রতি টাকায় দু' পয়সা হারে ট্যাক্স প্রদান করবে। এইরূপ পরবর্ত্তী প্রত্যেক ফার্ম্মই তার পূর্ব্ববর্ত্তী ফার্ম্মের কাছ

* 'Prof. Pigou তাঁর *Political Economy of War* নামক পুস্তকে অকাট্য যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত করেছেন। সর্ব্বোত্তম উপায়, 'বাধ্যতামূলক ঋণদান গ্রহণের প্রয়োগ ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দৃশ্যপটে অবাস্তর বলেই বিবেচিত হয়।

† এ ধারাটি অবশ্য General Sales Tax-এর বেলায়ই বিশেষ করে প্রযোজ্য। বাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে যে বিক্রয়-কর ধার্য্য করা হয়েছে তার নাকি প্রাদেশিক বনাম কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে পারস্পরিক কর-স্থাপন ক্ষমতার প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। মোট কথা, ব্যাপারটি রহস্যাবৃত (Vakil and Patel—'*Finance under P. A.*' Appendix)। যদি তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও নেওয়া যায় তাহলেও যুক্তিটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হতে পারে মাত্র, কিন্তু কোনরকমেই অবাস্তর হয় না।

থেকে নিজ নিজ কাঁচামাল সংগ্রহের সময় উপরিউক্ত হারে ট্যাক্স দিতে বাধ্য। ফল হয় এই যে, যে জিনিসটির পূর্ণাবস্থা লাভ করতে পুরো পাঁচটি ফার্ম ঘুরে আসতে হয়, কর-ভারের দরুন সে জিনিষটির প্রস্তুত-খরচ বৃদ্ধি পায় টাকা প্রতি অন্যূন (২×৫+২ পয়সা) তিন আনা। আর একটি আলপিন প্রস্তুতকরণ-প্রণালীই যদি আঠারটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করা হয় (Adam Smith ১৭৭৬) তা হ'লে আধুনিক যান্ত্রিক যুগের বিরাটকায় যন্ত্রদানবের প্রস্তুতকরণ প্রণালী কত অসংখ্যভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে; এবং সেই স্থলে অপেক্ষা তার মূল্যের বিরাটত্ব কি প্রস্তুত-খরচকে ছাপিয়ে রেখে শুধু ট্যাক্সের মহিমাই প্রচার করবে না?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রস্তুত-খরচ কমিয়ে রাখবার জন্যই ফার্ম্মগুলোর যোগাযোগ সাধন ঘটে।‡ আর যে ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ব্যাহত হয় সে ক্ষেত্রে প্রস্তুত-খরচ বৃদ্ধির ফলে—যে বৃদ্ধির কাছে নাকি সুদের হারও নগণ্য—প্রস্তুত কার্য্যে দেখা দেয় শৈথিল্য ও উৎপাদন পেয়ে যায় হ্রাস।

এটা সত্যি যে এই বড়ো বড়ো ফার্ম্মগুলির সমন্বয় সাধন সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু খরচ বৃদ্ধির হার যখন এতই ভয়াবহ, তখন এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে অনতিকালের মধ্যেই ফার্ম্মগুলি, অন্ততঃ প্রতিযোগিতায় টেঁকবার প্রয়োজনেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে প্রত্যেক দলকে গড়ে তুলবে কোন জিনিসের আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত প্রস্তুত করার কারখানায়। এর ফল হয় এই যে, দেশের জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের হার কমে আসে। এর ইঙ্গিত আমাদের সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির বিভীষিকার দিনে বিশেষ অর্থপূর্ণ। একটু পরে ব্যাখ্যা করছি।

এ ত গেল বৃহৎ ব্যাপার। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কেনা-বেচার ব্যাপারেও (অবশ্য, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের জিনিসগুলির একটা বড় অংশই এ করের আওতা থেকে বাদ পড়েছে) দেখতে পাই যে দ্রব্য-সামগ্রী আমাদের হাতে আসছে সহজ পথে, সংগ্রহকরণ প্রণালীটা সঙ্কুচিত হয়ে এসে শেষ হয়েছে গবর্ণমেণ্টের হাতে। এবং যে মাত্রায় সংগ্রহকরণ প্রণালী সঙ্কুচিত হয়েছে আদান-প্রদানের হারও শিথিল হয়েছে ঠিক সেই মাত্রায়। অবশ্য, গবর্ণমেণ্টের হাতে এসে সঙ্কুচিত হওয়াটা হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রের মতে যাকে বলে কিনা একটা 'accident', কিন্তু এ কথা সত্যি যে বিক্রয়-করের দরুন আদান-প্রদান শিথিল হয়ে আসে নানাভাবে। অধ্যাপক ভকীল এবং পটেল লিখেছেন:—

‡ Joshia Stamp—*Principels of Taxation* পৃ, ৭৯ দ্রষ্টব্য।

"One of the effects of the General Sales Tax is the influence it is supposed to exert towards integration of industries and changing the method of business, such as, the substitution of brokers for wholesalers and the extension of selling in consignments with a view to avoiding taxable transactions."*

এর মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই যে, করপ্রদ বিনিময়ের হ্রাস করবার প্রচেষ্টায় পাইকারের পরিবর্ত্তে উদ্ভব হয় দালালের এবং জিনিসপত্র প্রেরিত হয় বরাবর প্রস্তুতকারক থেকে ক্রেতার নিকট।

এ ত গেল আদান প্রদানের কথা। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। সেটা হচ্ছে এই যে, এই সংক্ষিপ্ত আদান-প্রদানের অন্ততঃ কিয়দংশ আবার সাধিত হচ্ছে এক অভিনব প্রকারে। সেখানে টাকা, নোট, কিংবা চেকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হচ্ছে Book credit, Bills of exchange ইত্যাদি। ফল হয়ে দাঁড়ায় যাকে বলে কিনা "গোদের ওপর বিষফোঁড়া"। বর্ত্তমানের মুদ্রা-বাহুল্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হ'ল Units of Account যার বিরুদ্ধে আমরা বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করে থাকি।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ আমাদের একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ সংজ্ঞার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা দেখেছি যে এ করটি ধার্য্য করার ফলে এক দিকে যেমন জিনিসের উৎপাদন ও তার হস্তান্তর-করণের হার শিথিল হয়ে আসে, তেমনি অন্য দিকে আবার মুদ্রাবাহুল্যের ওপর সৃষ্টি হয় মুদ্রার গুণসম্পন্ন কোন কোন বস্তুর। ধারা দুটিই একমুখী। ফল যা দাঁড়ায় তা ভয়াবহ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "The way to hell is paved with good intentions." অর্থাৎ কিনা, আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারীরা ইষ্ট সাধন করতে গিয়ে অনিষ্টই করে ফেলেন বেশী। আমাদের অর্থসচিব ভেবেছেন যে এই কর দ্বারা তিনি দ্রব্যমূল্যের হ্রাসের প্রয়াস পাবেন; কিন্তু আমরা দেখছি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাই রয়েছে বেশী।

সাধারণ মূল্য নির্দ্ধারিত হচ্ছে বহু খ্যাত ফিশারিয়ান পেঁতে অনুসারে :—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T(t)}$$ যেথায়,

P— দ্রব্যমূল্য
M— প্রচলিত মুদ্রা
V— মুদ্রাচলতির বেগ
M'— চেক্ (ও ঐ জাতীয়)
V'— চেকের চলতির বেগ
T— টাকার পরিবর্ত্তে বিনিময়োপযোগী দ্রব্যসম্ভার
t— এর হস্তান্তরকরণের বেগ।†

আমরা প্রমাণ করেছি যে বিক্রয়-করের ফলে অর্থ-সংজ্ঞাজ্ঞাপক কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কিনা MV + M'V'-এর সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত হয়ে লবকে করে তোলে বৃহৎ; অন্য দিকে জিনিস প্রস্তুত-করণ ও এর হস্তান্তর-করণ শিথিল হওয়ায় T ও t সঙ্কুচিত হয়ে হরকে করে ক্ষীণতর। লবের বৃদ্ধি ও হরের হ্রাস—এর ফল হয় এই যে P এর মূল্য, অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য হয়ে ওঠে স্ফীত। মুদ্রাস্ফীতির প্রকটতার অট্টহাস্য আমাদের কানে আসে ভেসে।

দ্বিতীয়তঃ, করটি ভারতের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য না হয়ে শুধু কয়েকটি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রব্যসামগ্রীর অবাধ চলাচলের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্রব্যসামগ্রীর এই অবাধ চলাচলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে নি। কিন্তু বিক্রয়-কর এই অবাধ চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে খাদ্যসমস্যা ও অন্যান্য প্রধান সমস্যাগুলিকে জটিলতর করে তুলবে। প্রধানতঃ এই কারণেই আমেরিকায় এই করটি সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সে দেশের সাম্প্রতিক অবস্থার বিবেচনায় এরূপ কর ধার্য্য করার অযৌক্তিকতাই বেশী। এর একমাত্র ভিত্তি এই যে এটা প্রথমাবস্থায় বিশেষ ফলপ্রসূ। কিন্তু, কেবল ফলপ্রসূতাই কোন করের একমাত্র— এমন কি, কোন সারবান যৌক্তিকতাই নয়। যে গূঢ় অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ইঙ্গিত আমরা এই প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করেছি তার তুলনায় এই ফলপ্রসূতা অকিঞ্চিৎকর— বিশেষতঃ বাংলার এই বর্ত্তমানের আর্থিক দুরবস্থার দিনে। বিক্রয়-কর সম্বন্ধে শেষ কথাটি আমি Profs. Haig ও Shoup-এর ভাষায়ই বলব, –

"Sales Tax as an emergency form of revenue and certainly as a permanent part of any State's tax system marks an unnecessary and backward step in taxation."§

অর্থাৎ, দীর্ঘকালস্থায়ী বিক্রয়-কর করধার্য্য প্রণালীতে প্রতিক্রিয়াশীলতারই সৃষ্টি করে।

---

* Vakil & Patel—*Finance Under Provincial Autonomy* পৃ. ১৩১।

† বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য একটু রূপান্তরিত করা হ'ল।

§ Profs. Haig, Shoup—*The Sales Tax in American States* পৃ. ১০৮।





পুস্তক-পরিচয়

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫৫ : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩-১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বহু আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘাতে ইহাদের উৎপত্তি। প্রথম দিকে ধর্ম্মান্দোলন প্রবল ছিল, পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবলতর হইয়া উঠে। রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার মূলে ছিল দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা, কর্ম্মশক্তি ও কৃতিত্ব। খ্রীষ্টান মিশনরীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি রাজা রামমোহনের মতই সচেতন ছিলেন। পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রাজার বন্ধু। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম সঙ্ঘবদ্ধভাবে আলোচনা ও প্রচারের জন্ম দেবেন্দ্রনাথ যত্নপর হইলেন।' "বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারে"র জন্ম তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বদেশের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। 'নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবে দেবেন্দ্রনাথের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল।' তাঁহার মতে "ইহার প্রধান কারণ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুজাতিরই পুরাতন ধর্ম্ম।" "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রথমে তত্ত্ববোধিনী সভার, পরে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হয়। দেবেন্দ্রনাথের কয়েকখানি জীবনচরিত আছে। তৎসত্ত্বেও এই পুস্তকখানি মহর্ষির জীবনের কয়েকটি বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। ছাত্রজীবন, সম্পত্তি-পরিচালনা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী বন্ধ হইয়া যাওয়া, এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র কয়েকটি নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি মহর্ষির গ্রন্থাবলীর পরিচয় ও রচনার নিদর্শন দিয়াছেন। এই নিদর্শনগুলি পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যশক্তি কতটা ছিল। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা এক-শ' বার। গ্রন্থকার এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে মহর্ষির জীবন ও চরিত্রের নানা দিক ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কৃষি-প্রবন্ধ—শ্রীবাণেশ্বর সিংহ। কলিকাতা, ১৩ ল্যান্সডাউন টেরেস, পোঃ রাসবিহারী এভেনিউ হইতে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজে বাঁধাই সাড়ে তিন টাকা, কাপড়ে বাঁধাই সাড়ে পাঁচ টাকা।

বাংলার মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিসাহিত্যের অপ্রতুলতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কৃষির প্রতি শিক্ষিতের আকর্ষণ নাই। অশিক্ষিত কৃষক প্রথাগত ভাবে চাষ করিয়া চলে। তাহার প্রকাশের ভাষা নাই, অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয় না। এরূপ অবস্থায় 'কৃষি-প্রবন্ধে'র মত পুস্তকের প্রকাশে শুধু যে একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত হইবে তাহা নয়, ইহা সাধারণ পাঠকের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিবে এবং যাহারা কৃষি-সম্পর্কে উৎসাহশীল তাহাদের কার্য্যেও বিশেষ সহায়তা করিবে। প্রথম সংস্করণ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়, এখানি পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর সংস্করণ। পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে :—কৃষির মূলনীতি ও কৃষকের কর্ত্তব্য, মাটির পরিচয়, ভূমির সার, ভূমিকর্ষণ, গো-মহিষাদি সংরক্ষণ, কৃষিযন্ত্রাদি, বীজ, জলসেচন, বাস্তু-কৃষি, ধানের চাষ, রবিশস্য, শাক-সবজি, ফুলের চাষ, ফলের বাগান এবং কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়। লেখক বার্দ্ধক্যের প্রান্তসীমায় উপনীত। শুধু বই পড়িয়া তিনি বই লেখেন নাই, সারাজীবন হাতে কলমে কৃষির চর্চা করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "দেশের অর্থাভাব দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করাই দরকার।...সেজন্য কৃষিকার্য্যের লাভজনক ও ফলপ্রদ উপায়গুলি লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশে মামুলী প্রণালীতে উৎপাদিত শস্যাদির পরিমাণ কিভাবে বাড়ানো যায় তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবার জন্য একদিকে যেমন আমাকে পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখিতে হইয়াছে।" আজিকার অভাব-অনটনের দিনে এরূপ পুস্তক 'অধিকতর খাদ্য-শস্য উৎপাদনে' সাহায্য করিবে। বইখানি সুলিখিত ও সুমুদ্রিত বলিয়া সুখপাঠ্য। গ্রন্থকারের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী সাধনা সার্থক হউক।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাংলা সাহিত্যের খসড়া : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বিশ্বের দরবারে গৌরব করিবার মত একটি নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতি বাঙালীর গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই সংস্কৃতির মধ্যমণি হইল বাংলার সাহিত্য। এই সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইবে ততই তাহার আত্মচেতনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই বাংলা সাহিত্যের পঠন পাঠন ও আলোচনা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি অতিক্রম করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভের একান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাহিত্যিক ভাষায় সাহিত্য-ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এই দিককার অভাব পূরণের জন্যই 'বাংলা সাহিত্যের খসড়া' গ্রন্থখানি রচিত। ইহাতে প্রথম হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সাধারণ পাঠক, যিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র

হয়, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ইতিকথা অল্প পরিসরের মধ্যে অনায়াসে জানতে চান, তাঁর জন্যই এই বই লেখা হল।" 'বিভালয়ের ছাত্র' বলিতে সম্ভবত গ্রন্থকার বি-এ ও এম-এ ক্লাসের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিদ্যার্থীদের কথাই বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছেন। কারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও 'সাধারণ পাঠক'-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং গ্রন্থখানি তাহাদেরও পাঠযোগ্য। 'বাংলা সাহিত্যের খসড়া'র আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, 'আমাদের সাহিত্যের ইতিকথা' আলোচনার পূর্বে গ্রন্থকার প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদে সাহিত্যতত্ত্ব এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সাধারণ ভাবে সাহিত্যজিজ্ঞাসা এবং বিশেষ ভাবে ভারতের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রারম্ভে এই দুইটি পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল্য বিশেষ ভাবে বর্ধিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

বিচিত্র মণিপুর—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। ডক্টর কালিদাস নাগের 'পরিচায়িকা' সম্বলিত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮-সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

'বিচিত্র মণিপুরে'র প্রকাশ খুব সাময়িক। মণিপুরকে কেন্দ্র করে বিচিত্র ঘটনা আবর্তিত হচ্ছে, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোধ হয় দ্বিতীয় বার মণিপুর একটা সর্বভারতীয় সংবাদ-মর্যাদা লাভ করেছে। এই মণিপুরের সঙ্গে এক সময় এক দিকে বাংলাদেশ এবং অন্য দিকে ব্রহ্মদেশের সম্বন্ধ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। সেই সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে এই তিন ভূমির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে নানা টানাপোড়েনের পরিচয় আজও পাওয়া যায়। তা ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করে মণিপুরের সঙ্গে বাংলার একটা নিকট আত্মীয়তা তো বহুদিন ধরেই আছে। সেই মণিপুরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নলিনীবাবু আমাদের কাছে বহন করে এনেছেন এবং অতীত ও বর্তমান মণিপুরকে একসঙ্গে গেঁথে এই সুন্দর পার্বত্য রাজ্যটিকে আমাদের চিত্তের নিকটতর করেছেন। নলিনীবাবুর ভাষা সহজ ও সুন্দর, তার সরল স্বচ্ছন্দ গতি কাহিনীগুলিকে মধুর করেছে। তা ছাড়া নলিনীবাবু মণিপুর ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন অন্তরের সহানুভূতি দিয়ে, এই দেশখণ্ড ও তার মানুষদের তিনি যে ভালবেসেছেন তা তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট। বইখানির আদর হওয়া উচিত।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

আধুনিক আবিষ্কার—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাঙালী পাঠক সমাজের প্রিয় ও সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচয়িতার 'আধুনিক আবিষ্কার' পাঠক সমাজে সমুচিত আদর পাইবে আশা করি। ইহার ভাষা প্রায় সর্বত্রই সরল, প্রাঞ্জল ও স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করিতে যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদেরও অনুকরণ উপযোগী রচনা-কৌশলে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে ছোট-বড় সাতটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'চুম্বক মাইন্', 'ডুবুরী জাহাজ ও টর্পীডো' এবং 'উড়ন্ত বোমা' বর্তমান যুদ্ধকালে কৌতূহলী পাঠকগণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই।

'প্রকৃতির আবিষ্কার'-এর কোন কোন স্থলে মাত্রা অতিক্রম করা হইয়াছে মনে হইল। অতিরিক্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও সন তারিখ এবং জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সূক্ষ্মক্রিয়া-পদ্ধতির বিশ্লেষণ যথাসম্ভব পরিহার করিলে রচনাগুলি পাঠক-সাধারণের নিকট সুখপাঠ্য ও বোধগম্য হইত। কয়েকটি স্থলে পরিভাষার দুষ্টতা লক্ষিত হইল—'Alkali Earth Metal'কে 'ক্ষারধর্মী মৃত্তিকা' ও 'Fluorescent'কে 'স্বদীপক' বলা সঙ্গত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পরিভাষা অনুযায়ী ইহাদিগকে যথাক্রমে 'মৃৎক্ষার ধাতু' ও 'প্রতিপ্রভ' বলিলে উৎকৃষ্ট হইত। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকার এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করিলে পাঠকবর্গের উপকার সাধিত হইবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন রায়

ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—শ্রীগুরুপদ হালদার। ৪৭ নং হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। রয়্যাল আট পেজি, পৃ ৮৮+৩।০+৭৪৮। মূল্য অনুল্লিখিত।

বিরাট্ গ্রন্থের এই সুবিশাল প্রথম খণ্ডে আলোচ্য বস্তুর অল্পমাত্র অংশ স্থান পাইয়াছে। প্রথম খণ্ডে যে সমস্ত বিষয় উপনিবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান—ব্যাকরণালোচনার প্রয়োজন নিরূপণ, ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর দিগ্দর্শন ও পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে পাণিনি-পরবর্তী বৈয়াকরণগণের বিবরণ প্রদত্ত হইবে এরূপ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। তবে ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ইতিহাস আলোচিত হইবে কিনা তাহার কোনও উল্লেখ নাই। গ্রন্থের ভাষা ও রচনাশৈলী অনেক স্থলে প্রাচীন ধরণের ও বিস্তার-বহুল। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বহু পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মুখ্য বক্তব্যগুলি আধুনিক পদ্ধতি-সম্মত ভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরেজীতে প্রকাশিত হইলে উহা ব্যাপক ভাবে পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে।

ছেলেদের জাহাঙ্গীর—শ্রীবাণী গুপ্ত, এম-এ, বি-টি। ভারত ফোটো টাইপ ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী—শ্রীললিতমোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক মূল্য সত্ত্বেও নানা কারণে ইতিহাসের বই প্রায়শই সাধারণ পাঠকের রুচিকর হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। লেখিকা গল্পের আকারে জাহাঙ্গীরের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন—অথচ ঐতিহাসিক মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। ইতিহাসের বই হইলেও ইহা সাহিত্যিক রসে পরিপূর্ণ। এবং ইহা পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক মাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। লেখিকা বোধ হয় বিনয় সহকারে বইখানিকে ছেলেদের পাঠ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস—বয়স্কারাও ইহা পড়িলে সুখী হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

উপনিবেশ (১ম পর্ব্ব)—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

লেখক-বাংলা সাহিত্যে নবীন কিন্তু অপরিচিত নহেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট গল্পের মারফৎ তাঁহার পরিচয় ইতিমধ্যেই সুধী সমাজকে যথেষ্ট আশান্বিত করিয়াছে। উপনিবেশ তাঁহার প্রথম উপন্যাস। 'ভারতবর্ষে' এটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সমস্তটা শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া মতামত দেওয়া কঠিন। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম পর্ব্ব পড়িয়া লেখকের কল্পনার প্রসার ও বাস্তব-নিষ্ঠাকে অস্বীকার করা যায় না।

এই উপন্যাসে সুদূর বাংলার পটভূমিকায় যেসব বিচিত্র নরনারীর সমাবেশ তিনি করিয়াছেন—তাহা বাংলা কথা-সাহিত্যে বহু ব্যবহৃত নহে। বহির্জগৎ হইতে বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রায় বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ চর ইস্‌মাইল। এক সময়ের দুর্দ্দান্ত জলদস্যু পর্টুগীজ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান, কিছু পরিমাণে মগ ও জনকয়েক বাঙ্গালী লইয়া এই উপনিবেশ। খেয়ালী প্রকৃতির মত মানুষেরও খেয়ালের অন্ত নাই, এবং সমাজ বা নীতি-প্রভাবে তাহারা প্রভাবিত নহে। নদীর খরস্রোত, আকাশের বিস্তার ও ঝড়ের রুদ্র রূপ ইহাদের আপন করিয়া লইয়াছে। ইহাদের বিচিত্র কর্ম্মপ্রণালী ও আচার-ব্যবহার—যেটুকু প্রথম পর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে—কৌতূহলজনক। কাহিনী চর ইসমাইলের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইলেও বিস্তীর্ণ জগতের বিপুল রূপটিকে স্পর্শ করিয়াছে। পরবর্ত্তী পর্ব্বে—ইহার সুষ্ঠু পরিণতি কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ করিয়া দিবে—এই আশা স্বাভাবিক।

রাহু—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

গল্পের বই। রাহু, হানি, বিক্রয়, উত্তরাধিকার, গণ্ডি, খাবা, যান্ত্রিক প্রভৃতি গল্পগুলি এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। রাহুর মতই সর্ব্বগ্রাসী এক শক্তি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহজ গতিটিকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে—প্রায় সবগুলি গল্পের মধ্যেই এই ইঙ্গিত পরিস্ফুট। বলিবার ভঙ্গিতে ও রচনা-কৌশলে ছোট গল্পের গুণ ও রস অধিকাংশ গল্পেই যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

সহজ ক'রে লেখা কাজটা সহজ নয়। লিখতে বসলেই আমাদের মাথার ভিতর থেকে নানা মত, নানা তত্ত্ব স্থানে অস্থানে এসে উপদ্রব সৃষ্টি করতে চায়। লেখক কিন্তু কবিগুরুর স্মৃতিকথা খুব সহজ ও সরস করে বলেছেন। কবি, দার্শনিক বা চিন্তানায়ক নয়, সহজ মানুষ রূপে তাঁকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। আমরা তাঁকে দেখি, চিনি এবং এমন নিকট পরিচয়ের সৌভাগ্যের জন্য গ্রন্থকারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়। ভারতী ভবন, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

চতুর্থ সংস্করণ। এ বারে আরও কিছু নূতন পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা পৃথক না রাখিয়া একসঙ্গে দিলে

পাঠকের বাছাই করিতে সুবিধা হইত এবং মুদ্রণের কাগজ বাঁচিত। বাংলা ভাষায় যাঁহারা বন-বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

হিন্দুনারী— স্বামী অভেদানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩২+১১২+৫৮। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী ইউরোপ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে ব্রতী থাকা কালে ভারতীয় নারী জাতি সম্বন্ধে যে হীন ধারণা খ্রীষ্টান মিশনরীদের দ্বারা বহির্ভারতে প্রচারিত হইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে সুযোগ্য প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া 'হিন্দুধর্ম্মে নারীর স্থান' শীর্ষক সুদীর্ঘ বক্তৃতা আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তথাকার বিদ্বৎসমাজে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। পরেও তিনি নারী জাতির শিক্ষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং উন্নতি বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বহু সুচিন্তিত আলোচনা করেন। তাঁহার সেই সব ইংরেজী মূল্যবান্ উক্তির বঙ্গানুবাদ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এ ছাড়া অবতরণিকায়, পাদটীকায় এবং পরিশিষ্টে শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক প্রতিপাদ্য উক্তির আকরস্থান সহ বহু প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রকাশক কর্ত্তৃক পরিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের তাৎপর্য গ্রহণ করা খুবই সুগম হইয়াছে। অনুবাদ বেশ সরল।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৫১। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বার্ষিক শিশু-সাথী এবৎসরেও শিশু-চিত্তহারী রচনা ও চিত্রসম্ভার লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের সুপরিচিত লেখকগণের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপকথা বার্ষিকীখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দুইটি অপ্রকাশিত রচনা প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। বালক-বালিকারা ইহা পাঠে তৃপ্তি পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাও লাভ করিবে। প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

ইউরোপে (ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী)—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পোঃ গড়িয়া, জিঃ ২৪ পরগণা। মূল্য আড়াই টাকা।

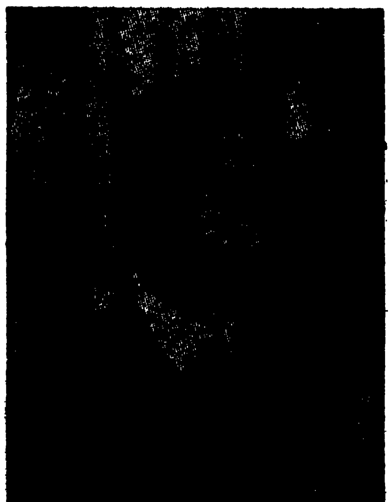
ভূপর্য্যটক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৩ সালে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তখন ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় দেশ দুইটির বর্ত্তমান অবস্থা বুঝা সহজ। লেখক তাঁহার অভিজ্ঞতা বইখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যুদ্ধের প্রাক্কালেও শান্তির ভাব বিরাজিত ছিল। এই শান্তিময় দেশটিও কিরূপে মহাযুদ্ধে বিশেষভাবে লিপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে যুদ্ধ পরিচালনায় অগ্রসর হইয়াছে 'ইংলণ্ড' অধ্যায়ে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর অবস্থা কিরূপ ছিল, ফুয়েরের প্রতি জার্ম্মান জনসাধারণের শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল—এই সব কথা 'জার্ম্মানী' অধ্যায়ে আমরা জানিতে পারি। এই অধ্যায়টি এইজন্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকে কয়েকখানি চিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব

নদীয়া জেলার আমলা-সদরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সাহা মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীনিবারণচন্দ্র সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জীনিয়ারিং বিদ্যা অধ্যয়নার্থ বিলাত যাত্রা করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরূপে গণ্য হন। ১৯৩৯ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জে. আর. কে. ল. স্কলারশিপ পাইয়া তিনি সাফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মেটালার্জ্জি বিভাগে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি এম, এস-সি, এবং ১৯৪৩ সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।



শ্রীনিবারণচন্দ্র সাহা

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা নাট্যকার ও গল্পলেখক নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২রা সেপ্টেম্বর ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। নাট্যকার হিসাবে এককালে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'রাতকাণা' একখানি বিশিষ্ট প্রহসন। 'বীররাজা,' 'নবাবী আমল' প্রভৃতি নাটকগুলি প্রশংসার যোগ্য। পরবর্ত্তীকালে তিনি নানা দেশহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

বিষয়-সূচী, বৈশাখ—১৩৫১

বিষয়-সূচী, বৈশাখ—১৩৫১

ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

মহামান্য ভারতসম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত

১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট 'বসন্ত নিবাস' কলিকাতার বিশ্ববিখ্যাত 'অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী'র প্রেসিডেণ্ট—ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ জ্যোতিষ-তন্ত্র ও যোগাদি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী—আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজজ্যোতিষী, **জ্যোতিষ-শিরোমণি পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব**, এম-আর-এ-এস্ (লণ্ডন) মহাশয়ের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে কোষ্ঠী-বিচার এবং হস্ত ও কপালের রেখা দ্বারা মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নির্ণয় এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য শক্তির কথা বিশ্ববিদিত। ভারতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পৃথিবীর যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান** প্রভৃতি মহাদেশের মনীষিগণ পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যোগ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদি দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় (বন্ধ্যা, হাঁপানী, বহুমূত্র, অর্শ, মৃগী, উন্মাদ এবং কুষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ), জটিল মোকদ্দমার জয়লাভ, বংশরক্ষা, দুর্ভাগ্যের প্রতিকার প্রভৃতিতে তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ।

প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত মনীষী ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতার কথা উপলব্ধি করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা গেল।



হিজ হাইনেস মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, উড়িষ্যা এসেম্বলীর মেম্বর বড়কিমেদির রাজাবাহাদুর, মহারাজকুমার হিন্দোল, লুইসিঙ্গা পাটনা ষ্টেটের কুমার, মাননীয় মহারাজা বাহাদুর সন্তোষ, বর্ত্তমান বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলের বিচারপতি মাননীয় স্যার সি. মাধবন নায়ার, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয় রাজা বাহাদুর মিঃ পি, ডি, রায়কত, উড়িষ্যার এডভোকেট-জেনারেল মাননীয় মিঃ বি, কে, রায়; উড়িষ্যা এসেম্বলীর মেম্বর ও কংগ্রেসনেত্রী মাননীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী; কেউনঝড় ষ্টেট হাইকোর্টের জজ মাননীয় রায় সাহেব মিঃ এস, এম, দাস; মহারাজকুমার বি, এন, রায়চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ডেপুটি মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন; কটকের ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব মিঃ হৃদয়বল্লভ দে; মহারাজকুমার পি, এন, রায়চৌধুরী বি, এ, ভাইস-কন্সাল, স্পেন। রংপুরের আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খান সাহেব মোতাহার হোসেন খান। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, এ, এরেকী, এম-এ (ক্যাণ্টাব), জে, পি। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি মাননীয় ৺সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল; কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণী মিঃ আর, এল, দত্ত; এটর্ণী মিঃ পি, কে, মিত্র; ক্যাপ্টেন মিঃ পি, এন, পি, উনাউয়ালা (আন্দামান); বিখ্যাত ভাওয়াল মামলার মেজকুমার শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায়; দেশনেতা জমিদার চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা), এম-এল-সি, কলিকাতা; খান বাহাদুর মিঃ এম, কে, হাসান, সি-আই-ই, ডেপুটী জেনারেল ম্যানেজার ই, আই, রেলওয়ে; মিঃ ইসাক মামি এটিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা; মিঃ এফ্রিটেম্পি, ইলিওনিস, আমেরিকা; মিঃ জে, এ, লরেন্স, ওসাকা, জাপান, মিঃ কে, রুচপল, সাংহাই, চীন এবং এইরূপ আরও অনেকে।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কয়েকটি মূল্যবান কবচ

উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—বিনায়াসে ধনলাভ করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবশ্যক, চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া পুত্র, আয়ুঃ, ধন ও কীর্ত্তি দান করেন। "ধনং বহুবিধং সৌখ্যং রাজবৎ দিনে দিনে", ইহা ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হয়। মূল্য ৭॥৵০। তন্ত্রোক্ত কল্পবৃক্ষের ন্যায় ফলদাতা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ বৃহৎ কবচ। মূল্য ২৯।৵০।

বগলামুখী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিতে—ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৵০ শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৵০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)।

বশীকরণ কবচ—ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত হয়। মূল্য ১১।০, বৃহৎ ৩৪৵০। ইহা ছাড়াও বহু কবচাদি আছে।

এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

স্থাপিত—১৯০৭ খৃষ্টাব্দ

(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস" (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা।

সাক্ষাতের সময় :—প্রাতে ৮॥০টা হইতে ১১॥০টা **ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫**

ব্রাঞ্চ—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (ওয়েলেসলীর মোড়), ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫-৩০টা—৭॥টা।

লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম-এ-কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন, এস ডব্লিউ, ২০

দ্রষ্টব্য :—আমাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও কবচাদির অবিকল নকল বাহির হইতেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের ও সোসাইটীর নাম ও ঠিকানার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, নতুবা প্রতারিত হইবেন। বহু অভিযোগ আসিতেছে।

বিষয়-সূচী, বৈশাখ—১৩৫১

রঙীন ছবি